সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র

④

সম্পাদনা

উত্তম ঘোষ
সমীরকুমার নাথ

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

SUBODH GHOSH
RACHANA SAMAGRA
PART IV

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৯৮

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
চারু খান

অক্ষরবিন্যাস
ওয়ার্ডওয়ার্কস
৭২/৩এফ/১, আর কে চ্যাটার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০৪২

মুদ্রক
অন্নপূর্ণা এজেন্সি
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র আরো আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে সুবোধবাবু (মার্চ, ১৯৮০) আমাদের ছেড়ে হঠাৎ চলে গেলেন। যাবার আগের দিনও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি তাঁর শেষ সম্পাদকীয় লেখা লিখে রেখে গেলেন : 'ওমর খৈয়াম স্মরণে'।

সুবোধবাবু সম্পর্কে আমি আমার বই 'সম্পাদকের বৈঠকে'--বেশ অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি, যা শুধু লেখক সুবোধ ঘোষকে নয়, ব্যক্তি সুবোধবাবুকেও হয়তো অনেকটা তুলে ধরতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পর আমি আনন্দবাজারে লিখেছিলাম ঃ 'একসঙ্গে যোগ দিই, সেই যোগ'।

এ রচনাবলীতে প্রথম খণ্ডে সুবোধবাবুর 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি স্থান পেয়েছে। এটা কেন জানি না বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। আমার স্পষ্ট মনে আছে--এর কভার এঁকেছিলেন, প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়। সুবোধবাবু যে সময় 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন তখনই পাঠকেরা বুঝে গিয়েছিল, শুধু 'ফসিল' বা 'অযান্ত্রিকে'র মতো অসাধারণ ছোট গল্প নয়, একটি নতুন স্বাদের উপন্যাস রচয়িতা এক বলিষ্ঠ লেখকের আবির্ভাব ঘটলো। সেই সময়কার রাজনৈতিক ডামাডোলের চিত্র--যা তিনি এই উপন্যাসে প্রকাশ করেছিলেন--তা পরবর্তীকালের পুস্তকাকারে বের হবার সময় একটা সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকাশককে কেউ কেউ ভয় দেখিয়েছিলেন--এই বই প্রকাশ করলে তাকে জেলে যেতে হবে।

সুবোধবাবু তখন অসুস্থ, হাসপাতালে। তিনি প্রকাশককে আমার কাছে পাঠালেন। আমি বললাম—আপনি অনায়াসে প্রকাশক হিসেবে আমার নাম দিতে পারেন। আমি জেলখাটা লোক, জেলে যেতে আপত্তি নেই।

তাই হয়েছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশক হিসেবে আমার নামই ছেপে বের হয়েছিল। অবশ্য আমাকে শেষ পর্যন্ত তার জন্য জেল খাটতে হয়নি।

১৯৪০ সালের পয়লা জানুয়ারি আমি আর সুবোধবাবু একই সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিই।.....তার আগে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে প্রুফরিডারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, আর আমি ছিলাম যুগান্তর পত্রিকার একজন জুনিয়র সাব-এডিটর। আনন্দবাজার রবিবাসরীয় বিভাগে মন্মথনাথ সান্যালের তিনি ছিলেন সহকারী আর আমাকে যোগ দিতে হল দেশ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সেই সময় বর্মন স্ট্রীটের পূর্ব দিকে দোতলায় একটি ঘরেই ছিল দেশ ও আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় দফতর।

আমরা একই ঘরে বসে এই দুই পত্রিকার সাহিত্য সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিলাম। সুবোধবাবুকে সে সময় যেভাবে দেখেছিলাম, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিরিশের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দেখে মনে হয় এখনও যেন যৌবনে পা দেননি। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন তিনি, যাকে বলা যায় রোমান্টিক পুরুষ। কথা তিনি খুবই কম বলতেন। সব সময় দেখতাম, ডাকে আসা পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে পড়ায় মগ্ন হয়ে আছেন। কখনও বিভাগীয় সম্পাদকের নির্দেশে তিনি সেই পাণ্ডুলিপি সংশোধনে নিমগ্ন থাকতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হত, এ মানুষটি বোধহয় খুবই অভিমানী ও গম্ভীর। কিন্তু দিনের পর দিন একঘরে বসে কাজ করতে করতে যখন মধুরভাষী মানুষটির হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়ার সুযোগ ঘটল, তখন দেখলাম যে, মানুষটি আসলে নীরব, নিরহঙ্কার, মধুরভাষী। যাকে বলা যায় অত্যন্ত বন্ধুবৎসল এক আড্ডাবাজ মানুষ।

আমাদের চাকুরী জীবন শুরু একই সঙ্গে। মারকাস স্কোয়ারের সংলগ্ন মারকাস বোর্ডিং-এ একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটি ঘরে আমাদের প্রাকবিবাহ যুগের বেশ কয়েকটি বছর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশে কেটেছে। সেই সময় সুবোধবাবুকে নানা দিক দিয়ে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে জানবার নানা সুযোগ আমার ঘটেছিল।

ওঁর চরিত্রের একটি গুণ যা আমাকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে, তা হলো বাঙালী হয়েও 'বাঙালীয়ানা'র কোন ছাপ তাঁর মধ্যে সচরাচর দেখা যেত না। তার একটা কারণ তিনি বাংলাদেশের বাইরে মানুষ হয়েছিলেন। হাজারিবাগ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃঢ়তার প্রভাব তাঁর চরিত্রেও ছিল।'...

সুবোধবাবু বাংলা সাহিত্যকে যে একটি উজ্জ্বলরত্ন দিয়েছেন, সেই 'ভারত প্রেমকথা' 'দেশ'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'শতকিয়া'। অন্য স্বাদের উপন্যাস। তাছাড়া ওঁর বহু গল্প--যা এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে--তার মধ্যে অনেকগুলোই দেশ পত্রিকায় বেরিয়েছে। তাঁর অন্যত্র প্রকাশিত রচনাগুলিও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকালীন মর্যাদা পাবে।

সুবোধবাবুর একটি গল্পসংকলন 'গল্প মণিঘর' শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল ও আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। লিখেছিলেন ঃ 'ভ্রাতৃপ্রতিম দুই বন্ধু--করকমলেষু...।'

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমরা একই প্রতিষ্ঠানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এসেছি। আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল অটুট বন্ধুত্বের, প্রগাঢ় সহমর্মিতার। আমাদের দুজনের ভাগ্য ছিল এক সুতোতেই গাঁথা। তাঁর মৃত্যুতে সেই সুতো ছিঁড়ে গেল। গেল কি? সত্যি?

সম্পাদকের কথা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শংকর লিখেছেন ঃ

'পঞ্চাশ দশকে যখন আমার সাহিত্য ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত প্রবেশ তখন সুবোধ ঘোষ খ্যাতির মধ্যগগনে। চল্লিশ দশকের যে বিস্ময় সৃষ্টির মধ্যে সাহিত্য গগনে তার উদয় তার রেশ কিছুটা কেটেছে, কিন্তু বিপুল পাঠক সমাজের কৌতূহলের অভাব নেই। সকলের মুখে তখন এক প্রশ্ন, তিনি আরও বেশি লেখেন না কেন? সুবোধ ঘোষ তার উত্তর দিতেন না, কিন্তু সাহিত্য কর্মের সঙ্গে যাঁরা কিছুটা যুক্ত তাঁরা সহজেই বুঝতে পারতেন, সুবোধ ঘোষ যে ধরনের গল্প লেখেন, তা বেশি লেখা যায় না, প্রতিটা গল্পের পেছনে থাকে গভীর চিন্তার অদৃশ্য ভিত্তিভূমি।'

সুবোধ ঘোষের রচনা সমগ্র সম্পাদনার সময় আমরা এটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি। সত্যি, বেশি লেখেন নি তিনি। তিরিশ-বত্রিশটি উপন্যাস, তার মধ্যে আয়তনে বৃহৎ মাত্র তিন-চারটি (ত্রিযামা, শতকিয়া ও জিয়াভরলি), আর বাকীগুলি মাঝারি, কতগুলি তো ছোট উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে--যেমন সুজাতা, বর্ণালী, মুক্তিপ্রিয়া, কান্তিধারা, ছায়াবৃতা প্রভৃতি।

গল্পের সংখ্যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) সেই অযান্ত্রিক, ফসিল থেকে শুরু করে সিরিয়াস আলোড়নকারী গল্প থেকে জীবন বিচিত্রার বহু দিক, ব্যক্তি ও মানসিকতা নিয়ে কাহিনীর মধ্য দিয়ে হাল্কা মিষ্টি প্রেমের গল্প--যার সংখ্যা প্রায় ১৬০।

(খ) ভারত প্রেমকথা--২০

(গ) কিংবদন্তীর দেশে--৩১

(ঘ) পুতুলের চিঠি--৮

(ঙ) ক্যাকটাস (জীবজগৎ পশু-পাখি-অরণ্য)--১৪

তাই যার মাত্র তিরিশটা উপন্যাস ও আড়াইশোর কম গল্প (পেশাগত সাহিত্যিক জীবন মধ্য চল্লিশ দশক থেকে সত্তর দশকে শেষ, অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বছর। তাও একটানা নয়--হঠাৎ হঠাৎ কলম থেমে গেছে--বিশেষ করে জীবনের শেষ অধ্যায়ে) তিনি অবশ্যই পরিমাণের দিক দিয়ে বেশি লেখেন নি (তাঁকে ঠিক prolific writer বলা যায় না সেই অর্থে)--যার জন্য গণিতের দিক থেকে বিচার করে তাঁর সমগ্র রচনা বর্তমান বিজ্ঞানের মুদ্রণ যন্ত্রে ৬০০০ পাতার মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধ করা সম্ভব। এবং এর মধ্যে অবশ্যই তাঁর বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ, রম্যরচনা এবং একটি গীতিনাট্যকেও ধরা হয়েছে।

তাই আমরা হয়তো দশটি খণ্ডের মধ্যে তাঁর সমগ্র সাহিতিক ফসলকে গোলায় ভরে ফেলতে পারব, যা অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় অনেক কম--পূর্বসূরী তারাশংকর-বিভূতিভূষণ-সমসাময়িক বিমল মিত্র বা উত্তরসূরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়--যেই হোক না কেন। শংকর সুবোধ ঘোষকে মহৎ স্রষ্টাদের পূর্ণকুম্ভ মেলায় 'নিজস্ব মহিমা' নিয়ে বিরাজ করার কথা বলেছেন। তাঁর জীবন সংগ্রামও বড় বিস্ময় জাগানো জীবন কথা, কিছু লিখিত, কিছু লোকমুখে শোনা যায়। গল্প-উপন্যাস ছাড়াও নানা বিষয়ে গবেষণামূলক রচনা লিখেছেন তিনি, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। প্রধানত ছোটগল্প লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তাঁর কলম দিয়েই বেরিয়েছে বিভিন্ন বই যার বিষয় মনস্তত্ত্ব (ফ্রয়েড), কারুশিল্প (শিল্পভাবনা/রঙ্গবল্লী),

আদিবাসী সমাজ, সামরিক বিজ্ঞান, গান্ধীজীবনী, নৃতত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানের কথা। বিচিত্রপথে যাওয়া তাঁর রচনার এই 'সর্বত্রগামী' দিকটা বহুলাংশে অজানা বলে আমাদের মনে হয়েছে। তাই বোধ হয় চিন্তামণি কর মন্তব্য করেছেন ঃ 'গল্প উপন্যাস পুরাকাহিনী প্রভৃতি লেখার জন্য এই লেখকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সুবিদিত থাকলেও নাট্য, সংগীত, পুরাতত্ত্ব, রূপকথা সম্বন্ধে তাঁর আন্তরিক ও গভীর পরিজ্ঞানসম্ভূত প্রবন্ধগুলি বহুজনের প্রায় অজানা ছিল।'

চতুর্থ খণ্ডে চারটি উপন্যাস স্থান পেয়েছে--ছায়াবৃতা, মুক্তিপ্রিয়া, ভিলা মাধবী ও সুজাতা। মনে হয়, সুজাতা লেখকের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস, বাংলা ও হিন্দী দুই ভাষায় চলচ্চিত্রায়িত। হিন্দী 'সুজাতা' ছায়াছবির জন্য লেখক ফিল্মফেয়ারের নির্বাচনে শ্রেষ্ঠ কাহিনীকারের সম্মান পেয়েছিলেন ১৯৫৯ সালে, সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে। সুজাতা মঞ্চসফল নাটকের মধ্যেও অন্যতম। শুনেছি, জওহরলাল নেহরু চলচ্চিত্রটি দেখে মুগ্ধ হয়ে পরিচালক বিমল রায়কে চিঠি লিখেছিলেন। বলে রাখা ভালো, নানা কারণেই আমরা প্রথাগত সন-তারিখ বা কালক্রম অনুযায়ী খণ্ডগুলোকে সাজাইনি। আমাদের উদ্দেশ্য, প্রতিটি খণ্ড যেন এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহু বিচিত্র হয়ে ওঠে। তাই চতুর্থ খণ্ডে আছে চারটি উপন্যাস, ষোলটি সামাজিক গল্প, এ ছাড়া দুটি গল্প 'ভারত প্রেমকথা'র এবং চারটি 'কিম্বদন্তীর দেশে' থেকে সংগৃহীত। এর সঙ্গে রয়েছে আটটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ--ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে, এবং 'কালপুরুষের সাতপাঁচ' গ্রন্থের সাতটি রম্যরচনা।

অল্পকথায়, এই রচনা সমগ্র সম্পাদনায় আমরা চেয়েছি প্রতিটি খণ্ডে সুবোধ-প্রতিভার 'কামিনী-কাঞ্চন' যোগ হোক (বলা বাহুল্য--বিশেষণটি এখানে রচনাগুলোর বৈশিষ্ট্যের ঐশ্বর্যের কথা ভেবে বলা হয়েছে)। কালপঞ্জি বা অ্যাকাডেমিক পাঠক্রম হিসাবে সাজালে পরিবেশন রসলাভের দিক থেকে ততটা সার্থক হতো না বলে আমাদের মনে হয়েছে। পাঠকরা এটাই বিচার করবেন।

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়নটা আমাদের কাছে সম্পাদনার মানদণ্ড স্থির করতে সাহায্য করেছে ঃ 'তিনি (সুবোধ ঘোষ) সাহিত্য করেছেন। শতকরা একশোভাগ সাহিত্য।...আছে সচেতন বিদ্রোহ, সেই কারণে তিনি এক ভিন্ন নামের নদী। স্রোত কম, অবগাহনে তৃপ্তি।...সব্যসাচী, অজাতশত্রু!'

মহাশ্বেতা দেবী বলেন, 'যে লেখক পরুষ, রুক্ষ ঋজুতা থেকে সহজ সাবলীল মিষ্টিলেখা --তা থেকে সংস্কৃত কাব্যের মতো অলংকার ঝংকৃত বাংলায় এমন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারেন, তিনিই সুবোধ ঘোষ'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন--'ছাত্র বয়সে 'দেশ' পত্রিকা পেলেই দুজনের গল্প আগে পড়ে ফেলতাম--পরশুরাম ও সুবোধ ঘোষ। বাংলার ছোট গল্পের সেই স্বর্ণযুগে কারুর সঙ্গে কারুর তুলনা চলে না। তবু এক একজন লেখক সম্পর্কে কিছু কিছু পাঠকের পক্ষপাতিত্ব থাকেই। আমার পক্ষপাতিত্ব ছিল সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে'--যাকে ব্যক্তিজীবনে তাঁর 'দূর থেকে দেখা'।

সন্তোষকুমার ঘোষ একটি রচনার শীর্ষনাম দিয়েছিলেন--'যে বনস্পতির নাম সুবোধ ঘোষ।'

সমরেশ মজুমদার প্রশ্ন করেছেন নিজেকেই--'এখনও নিজের লেখার পাশে ওঁর লেখা রেখে দেখতে গেলেই লজ্জা পাই...ইনি অবশ্যই আমার পূর্বসূরী, কিন্তু আমি, আমরা কতটা উত্তরসূরী?'

আশাপূর্ণা দেবী মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন : 'তিনি এলেন, দিলেন, জয় করলেন', এই 'দিলেন' শব্দটা লেখিকার তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন--শেক্সপীয়ারের নাটকের বিখ্যাত উক্তি 'vidi'-র (দেখলাম-এর) পরিবর্তে।

সম্পাদনা করতে করতে সম্পাদক হিসেবেই কিছু স্বাভাবিক প্রশ্ন মনে জাগে। বোধ হয় এই ধরনের প্রশ্ন পাঠকদের হয়েই আমরা উপস্থাপনা করতে পারি। সবচেয়ে ভাল, একটি জিজ্ঞাসা আমাদের ভাষায় না বলে, এক প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থার জ্যাকেটে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচিতির উল্লেখ করলেই পরিষ্কার হতে পারে। তাঁরা লিখেছেন :

'...প্রথম গল্প অযান্ত্রিক। বন্ধুদের অনুরোধে লেখা, এরপর ফসিল। বাংলা সাহিত্যে বিস্ফোরণ জাগিয়ে আবির্ভাব। বহু গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত। আনন্দ পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক। এছাড়া অন্য পুরস্কার পাননি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের মতোই বিস্ময়কর এই ঘটনা।'...

সম্পাদনার কাজ করতে করতে যখন মহাশ্বেতা দেবীর কথা স্মরণ বিশেষ ভাবে করছি ('আবার হব মুগ্ধ'), তখন এই 'বিস্ময়কর ঘটনাটা' পাঠকের দৃষ্টিতে একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন থেকে গেছে বলে মনে হয়েছে। রচনা সমগ্রের "সম্পাদকের কথা"য় তাই তার উল্লেখ বা পুনঃ-উল্লেখ। উত্তরের জন্য নয়, আক্ষেপ হিসেবে নয়,--শুধু সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রশ্নটিকে স্থায়ী স্থানদানের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মকে এই বিষয়ে সতর্ক করার দায় অনুভব করেছি আমরা।

তাই বোধ হয় শংকরের দুঃসাহসী মন্তব্য : 'অনেকের কীর্তন গাইবার দল থাকে, সুবোধ ঘোষের (সেসব) কিছুই নেই।'

উত্তম ঘোষ

সমীরকুমার নাথ

সুবোধ ঘোষ
রচনা সমগ্র

④

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

রম্যরচনা

উপন্যাস

ছায়াবৃতা

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না ঃ এই গানটি হলো এই ছোট শহরের প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত। তার মানে এই শহরের ছোট্ট একটি উৎসবের আসরে এই গানটি যেদিন গাওয়া হলো, তার আগে রবীন্দ্রনাথের আর কোন গান এই ছোট শহরের কোথাও কোন উৎসবে গাওয়া হয়েছে বলে কেউ মনে করতে পারে না।

কেউ মনে করতে পারে না বলেই অবশ্য ধারণাটা একেবারে নির্ভুল নয়। প্রতি বছর মাঘোৎসবের সময়ে সমাজবাড়িতে উপাসনার অনুষ্ঠানে দীননাথবাবু যে-সব গান গাইতেন, তার অনেকগুলিই তো রবীন্দ্রনাথের গান। কিন্তু বিমল আর অভয়, যারা দু'জন আজ এই ছোট শহরের জীবনে ওদের গানের গলার গুণে বিখ্যাত হয়েছে, তারাও বলবে, বাণীদির মুখেই আমরা প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছিলাম। আর গানটা হলো এই গান--দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়...।

শহরটা ছোট, কিন্তু অনেক বড়-বড় জ্ঞানী আর গুণী মানুষ এ শহরে আসতেন আর চলে যেতেন। একবার এসেছিলেন কবি কামিনী রায়। সে-সময় এই ছোট শহরের মহিলাদের আর মেয়েদের জীবনে যেন একটা উৎসবের সাড়া জেগেছিল। কত বড় বিদুষী কবি, কী চমৎকার মুখশ্রী, আর কী সুন্দর কথা বলতে পারেন ; এহেন মানুষও বামাচরণবাবুর মত একজন মুহুরী মানুষের বাড়িতে এসে মেয়েদের সঙ্গে কত খুশি হয়ে কত কথা বললেন। এই ছোট শহরের সব মহিলার মন সেদিন যেন বেশ একটা গর্বে, সেই সঙ্গে বেশ একটা তৃপ্তিতেও ভরে গিয়েছিল।

কিন্তু একটা কথা বলে আক্ষেপ করেছিলেন বিদুষী কামিনী রায়--এ শহরের মেয়েরা লেখাপড়ায় এত পিছিয়ে আছে কেন?

একদিন নিজেরই বাড়িতে শহরের সব মহিলা আর মেয়েদের একটা সভা ডেকে সবাইকে অনেক অনুরোধের কথা তিনি বলেছিলেন। শেষে বলেছিলেন--আর চার-পাঁচ বছর পরে এসে আমি যেন দেখতে পাই, এই শহরের একটি গ্র্যাজুয়েট মেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে। আমার আশা যেন বিফল না হয়।

চার-পাঁচটা বছর পার হয়ে গেলেও এই ছোট শহরে আর আসতে পারেননি বিদুষী কামিনী রায়। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে এই ছোট শহরের অনেক বাড়ির মহিলারা কেঁদে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশা বিফল হয়নি। যদি বেঁচে থাকতেন তিনি, আর সেই পুরনো কথা স্মরণ করে সত্যি একবার এ-শহরে আসতে পারতেন, তবে তিনি এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ের সঙ্গে কথা বলে সুখী হতে পারতেন। তিনি দেখে বোধহয় একটু আশ্চর্যও হতেন, ঐ যে সেই মেয়ে, মুহুরী মানুষ বামাচরণবাবুর যে মেয়েকে তিনি তাঁরই লেখা কবিতার বই 'গুঞ্জন' উপহার দিয়েছিলেন, সেই মেয়েটিই হলো এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। সেই মেয়েরই নাম বাণী। আজ বিমল আর অভয়কে জিজ্ঞাসা করলে ওরাও বলবে, হ্যাঁ, বাণীদিই হলেন আমাদের এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে।

বিমল এখনও মনে করতে পারে, পুলিশ ট্রেনিং কলেজের ময়দানটার কিনারা ধরে আরও কিছুদূর এগিয়ে যেয়ে, পোলো কটেজ নামে চমৎকার বাংলো বাড়ির ফটক পার হয়ে, মস্ত লিচু বাগানের পাশে যে হলদে রঙের বাড়িটার গা ঘেঁষে আজও ঝুমকো জবা আর সাদা গোলাপ ফুটে থাকে, সে বাড়িতে মা আর কাকিমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একদিন বিদুষী কামিনী রায়কে দেখেছিল বিমল। মনে আছে, লিচু আর চকোলেট উপহার দিয়েছিলেন কামিনী রায়।

আরও মনে পড়ে, সেদিন সেখানে বাণীদিকেও দেখতে পেয়েছিল বিমল। খুব সুন্দর সিল্কের একটা নতুন ফ্রক পরে বিদুষী কামিনী রায়ের গা ঘেঁষে বসে, আর একটা শ্লেট হাতে নিয়ে অঙ্ক করছিল সেদিনের সেই ছোট্ট বাণীদি।

বাড়ি ফেরবার সময় কাকিমার কাছে কথাটা বলেছিলেন মা, তাই কথাটাও আজও মনে আছে বিমলের ; বাণীকে ঐ নতুন ফ্রক কামিনী রায়ই উপহার দিয়েছিলেন।

এই বাণীদিকে আর-একটি ব্যাপারেও এই ছোট শহরের প্রথম মহিলা বলে মেনে নিতে পারা যায়। বসন্ত পঞ্চমীর দিনে এই ছোট শহরের ছোট ড্রামাটিক ক্লাব যে থিয়েটার করতো, সেই থিয়েটার দেখবার জন্য দর্শকদের জায়গাটা দুভাগে ভাগ করা থাকতো। একদিকে থাকতো চিক দিয়ে ঘেরা মেয়েদের জায়গা, আর একদিকে পুরুষদের খোলা-মেলা জায়গা। বাণীদিই হলেন এই শহরের প্রথম মহিলা, যিনি চিকের বাইরে একটা টুলের উপর বসে থিয়েটার দেখতেন।

আজ থেকে অনেকদিন আগে এই ছোট শহরের ছোট স্কুলটার ছোট ময়দানের ঘাসের উপর বসে আর সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে একদল খুশি পাখির কলরবের মত যে সব কথা বলে গল্প করতো বিমল, অভয়, নীহার আর শেখর, সে-সব কথা আজও ওরা বেশ স্পষ্ট ক'রে মনে করতে পারে ; কোন কথাই ওরা ভোলেনি। তার কারণ বোধহয় এই যে, কথাগুলি ভুলে যাবার মত নয়।

বিমল অভয় আর ওদেরই সমবয়সী বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে গল্প ক'রে ক'রে খুবই খুশির একটা কথা আলোচনা করতো। খুব ভাল হয়, এই শহরের কোন বিদ্বানের সঙ্গে যদি বাণীদির বিয়ে হয়ে যায়। বাণীদির মত মেয়ের যদি অন্য শহরের কারও সঙ্গে বিয়ে হয়, তবে বাণীদিকে নিশ্চয় এ-শহর ছেড়ে দিয়ে সেই শহরে থাকতে হবে। এ-শহর তাহলে যে কানা হয়ে যাবে।

বাণীদি দেখতে চমৎকার, বাণীদি খুব ভাল করে লেখাপড়া শিখে বিদুষী হয়ে উঠছেন, নিশ্চয় বি-এ পাস করবেন বাণীদি। বাণীদি চমৎকার গান গাইতে পারেন, বাণীদি এ-শহরের সবচেয়ে সাহসী মেয়ে, চিকের বাইরে বসে থিয়েটার দেখেন। কোন সন্দেহ নেই, বাণীদি এ-শহর ছেড়ে চলে গেলে এ-শহরের গর্ব করবার কিছু থাকবে না।

দুই

মেয়েকে পড়াবার জন্য কী কষ্টই না স্বীকার করছেন বামাচরণবাবু। দীননাথবাবু জানেন, মেয়ের বই কেনবার জন্য টাকা যোগাড় করতে গিয়ে বামাচরণ একবেলা ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বাণী মেয়েটাও বা কী কম কষ্ট করছে।

বিমলের মা জানেন, মেয়েটা বিছানার পুরনো ছেঁড়া চাদর কেটে আর শেলাই করে সায়া তৈরী করেছে আর সেই সায়া পরেছে। তবু নতুন সায়া কেনেনি। নতুন সায়া কেনবার পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনেছে।

কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষা দিল বাণী ; আই-এ পাসও করলো। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! এমন সময় মারা গেলেন বামাচরণবাবু। বি-এ পড়বার স্বপ্ন ছেড়ে দিল, আর একেবারে নীরব হয়ে গেল বাণী।

বিমলের মা তাই মাঝে মাঝে নীহারের মা'র কাছে আক্ষেপ করেন, বামাচরণবাবু সত্যিই একটা ভুল করে গেলেন। মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে এত চেষ্টা আর এত কষ্ট না করে যদি মেয়ের বিয়েটা দেবার জন্য একটু চেষ্টা আর একটু কষ্ট করতেন, তবে এতদিনে বিয়েটা হয়েই যেত নিশ্চয়। এখন কি উপায় হবে?

নীহারের মা বলেন—বাণীর কলকাতার এক মাসী নাকি একটা সম্বন্ধ এনেছে। ছেলে বেশ

ভাল সরকারী চাকরি করে।

বিমলের মা--জানি না। তবে খুব ভাল হয়, যদি বিয়েটা হয়ে যায়।

শেখরের মা হঠাৎ একদিন বলে ফেললেন--শৈলেশের সঙ্গেই কি বাণীর বিয়ে হবে?

--কে বললে?

শেখরের মা হেসে ফেললেন--কেউ বলেনি, কিন্তু আপনাদের বিমল আর অভয় একটা কথা বলছিল।

--কি কথা?

--ওরা বলছিল, বাণীদির গান নাকি শৈলেশদার ভয়ংকর ভাল লেগে গিয়েছে।

বেশ বড় জমিদারী করেছিলেন, ওকালতী করেও অনেক টাকা উপায় করেছিলেন, এবং এ-শহরের সব চেয়ে বড় আর সুন্দর বাড়িটা যিনি তৈরী করেছিলেন, তিনি হলেন শৈলেশের বাবা মহিমবাবু। স্কুলটা মহিমবাবু অনেক টাকা খরচ করে স্থাপন করেছিলেন। এখনও যে স্কুলটা বেশ ভাল চলছে, সেটা মহিমবাবুরই একটা দানের দয়ার ফল। বিশ হাজার টাকার একটা ফণ্ড রেখে গিয়েছেন মহিমবাবু। তা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট আর জেলা বোর্ডও সাহায্য দেয়। তা ছাড়া, দরকার পড়লে শৈলেশও মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে সাহায্য করে থাকে। প্রাইজের বই কেনবার সব টাকা, আর ফুটবল ও হকিস্টিক কেনবার সব টাকা শৈলেশই দিয়ে থাকে। স্কুলের সেক্রেটারী হয়ে শৈলেশ যেমন তার বাবার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তেমনই নিজেরও সুনাম বাড়িয়েছে। স্কুলটার জন্য মহিমবাবুর যেমন যত্ন ছিল, শৈলেশেরও প্রায় সেই রকমের যত্ন আছে। সেজন্য স্কুলটার দিন দিন উন্নতিও হয়ে চলেছে। স্কুলটা ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠেছে। বিমল, নীহার, শেখর, অভয় আর, আরও প্রায় কুড়িজন ছাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠেছে। আর চারটি বছর লাগবে, ওরাই ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন হয়ে তার পর ক্লাস টুয়েলভ হয়ে যাবে। স্কুলটাও খাঁটি হাইস্কুল হয়ে যাবে।

কিন্তু সেকেণ্ড স্যার বুড়ো জলধরবাবু কাশীবাস করবার জন্য হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলেন ; তাঁকে বিদায় অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে স্কুলেরই ছোট হলঘরে যে উৎসব হলো, সেই উৎসবে বাণী সেই প্রথম ঐ গানটা গেয়েছিল।--দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না।

সে গান শুনে অক্ষয়বাবুর চোখ ছলছল করে।

হরেনবাবু বলেন--ঠিকই, আজকের অনুষ্ঠানের সেণ্টিমেণ্ট ঠিক ধরতে পেরেছে বাণী। ঠিকই, বেচারা জলধরবাবুর দিনগুলি আর সোনার খাঁচায় রইল না।

অক্ষয়বাবু--কি বললেন?

হরেনবাবু--দিব্যি মাসে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা পাচ্ছিলেন জলধরবাবু। একা মানুষের পেট চলেও যাচ্ছিল বেশ। এইবার বুঝবেন, কাজ ছেড়ে চলে যাবার ভুল হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। কাশীতেও পয়সা খরচ করে ভাত পেতে হয় ; বাবা বিশ্বেশ্বর ঘরে ঘরে পরমান্ন পৌঁছে দেন না।

অক্ষয়বাবু--আমি অবিশ্যি একথা ভাবিনি।

হরেনবাবু--তবে কি-কথা ভাবলেন?

অক্ষয়বাবু--আমি ভাবছি মেয়েটারই অদৃষ্টের কথা। আমার মনে হয়, বাণী আজ ওর বাবা বামাচরণের কথা মনে ক'রে এই গানটা গাইছে।

হরেনবাবু--তার মানে?

অক্ষয়বাবু--জানেনই তো, বাণীকে বি-এ পাস করাবার জন্যে বামাচরণ কী কষ্টই না করতো। শীতের সময় একটা গরম চাদরও কিনতে পারেনি বামাচরণ, কারণ, মেয়ের আই-এ পরীক্ষার ফী দিতে গিয়ে টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটাও বি-এ পাশ করবে বলে কত আশা করেছিল। কিন্তু বৃথা ; আজ বামাচরণ নেই, বাণীও বি-এ পড়বার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

সত্যি, ভাবলে খুবই দুঃখ হয়। এতদিন কষ্টে ছিল, তবু একটা আশা নিয়ে মেয়েটার দিনগুলি সোনার খাঁচায়...।

হরেনবাবু জোরে একটা হাঁপ ছাড়েন।—তাই বলুন ; আমি অবিশ্যি এদিকটা ভাবিনি।

অভয় ফিসফিস করে বিমলের কানের কাছে বলে--দেখছিস, বাণীদির চোখ দুটো কেমন চিকচিক করছে।

বিমল--দেখেছি ; কিন্তু শৈলেশদা যে...।

অভয়--কি রে? কি রে?

বিমল—বাণীদির মুখের দিকে কেমন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন শৈলেশদা। অদ্ভুত।

অভয় বলে—সত্যি, কিন্তু কেন রে?

বিমল—বুঝতে পারছি না।

অভয়—বাণীদি দেখতে চমৎকার ; তাই বোধহয়।

বিমল—না, সেজন্যে নয়। বাণীদির গানটা এত চমৎকার বলেই...।

অভয়—একই কথা।

শেখর আর নীহার এসে বলে—সেক্রেটারী শৈলেশদা কি বলেছেন, শুনেছিস?

অভয়—না।

শেখর—বাণীদির গানের মত চমৎকার গান শৈলেশদা জীবনে কোথাও শোনেননি।

বিমল—শৈলেশদা কাকে বললেন একথা?

নীহার—বাণীদিকেই বললেন।

অভয়—বাণীদি কি বললেন?

শেখর—বাণীদি চমকে উঠলেন।

বিমল—কোন কথা বললেন না?

নীহার—না।

অভয়—যাক্‌গে।

বুড়ো জলধরবাবু তখন তাঁর গলার গন্ধরাজের মালাটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে খুব ভাল একটা আশার কথা বলতে শুরু করেছেন।—আমি আশা করি, আমার জায়গায় যিনি আসবেন তিনি আমার এইসব ছাত্রকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসবেন। তিনি যদি আমার মত বয়সের মানুষ হন, তবে তিনি যেন এইসব ছাত্রকে পুত্রবৎ মনে করে স্নেহ করেন। যদি, নবীন বয়সের কেউ আসেন, তবে, তিনি যেন এইসব ছাত্রকে ছোট ভাইয়ের দল বলে মনে করে ভালবাসেন।

অভয় হঠাৎ ব্যস্তস্বরে বলে ওঠে—ও ভদ্রলোক কে রে?

বিমল—কোন্ ভদ্রলোক?

অভয়—ঐ যে, দরজার ভিড়ের কাছে দাঁড়িয়ে।

বিমল—কোথায় রে?

অভয়—ঐ যে, হরেনবাবু আর অক্ষয়বাবুর চেয়ারের কাছে।

বিমল, শেখর আর নীহার, তিনজনেই বলে—এ ভদ্রলোক নতুন এসেছেন বলে মনে হচ্ছে!

অভয়—ভদ্রলোককে এখানে নেমন্তন্ন করা হয়নি বোধহয়।

বিমল—বোধহয় কেন, নিশ্চয় নেমন্তন্ন করা হয়নি। তা না হলে কি দরজার কাছে ওভাবে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে?

অভয়—কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে বলবো?

বিমল—বল।

অভয়--আমার মনে হয় বাণীদির গানটা এই ভদ্রলোকেরও খুব ভাল লেগে গিয়েছে।

বিমল--হতে পারে।

সেদিনের বিদায় সভা শেষ হলো। তার পরের দিন বুড়ো জলধরবাবুও কাশী চলে গেলেন। আর ঠিক তার তিনদিন পরেই নতুন সেকেণ্ড স্যার হিস্ট্রি পড়াবার জন্য ক্লাস এইটের ঘরে এসে ঢুকলেন।

অভয় চমকে উঠে বিমলের গায়ে ঠেলা দেয়।--কি আশ্চর্য সেই ভদ্রলোক!

সেদিনই ক্লাসের ছুটির পর বাড়ি যাবার সময় শুনতে পায় অভয় আর বিমল, অঙ্কের স্যার দয়ালবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন হেড স্যার।--সেক্রেটারী কোথা থেকে খুব সস্তায় একটি সেকেণ্ড মাষ্টার এরই মধ্যে যোগার করে ফেলেছেন। বিজ্ঞাপন দেবার দরকার আর হলো না।

দয়ালবাবু--মাইনে কত ঠিক হলো?

হেড স্যার হেসে ফেলেন--তিরিশ টাকা।

দয়ালবাবু--গ্র্যাজুয়েট নাকি?

হেড স্যার--হ্যাঁ।

দয়ালবাবু--কি আশ্চর্য!

হেড স্যার--আমিও তো বলছি, কি আশ্চর্য!

দয়ালবাবু--নামটা কি?

হেড স্যার--প্রকাশচন্দ্র বসু।

দয়ালবাবু--এতদিন কি করছিলেন, কোথায় ছিলেন?

হেড স্যার--শুনলাম, বর্মাতে একটা স্কুলে নাকি দু'বছর সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন।

দয়ালবাবু--ভাল।

তিন

খেলা শেষ হবার পর স্কুলের ছোট ময়দানের সবুজ ঘাসের উপর সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে বসে ওরা গল্প করে, বিমল, অভয়, শেখর আর নীহার ঃ শৈলেশদার মত সেক্রেটারী না থাকলে স্কুলটার এত তাড়াতাড়ি এত উন্নতি হতো না ঠিকই, কিন্তু...।

--কিন্তু আবার কি?

--কিন্তু ক্লাস এইটে কি এত ছাত্র হতো? কখ্খনো না।

--কেন হতো না?

--অর্ধেক ছেলে মিশন হাইস্কুলে চলে যেত। ভাগ্যিস প্রকাশদা সেকেণ্ড স্যার হয়ে এসেছিলেন।

--তা বটে।

--প্রকাশদার মত বিদ্বান মানুষ সেকেণ্ড স্যার হয়েছেন, আর এত চমৎকার পড়াচ্ছেন তাই না এত ছেলে এসে আমাদের স্কুলে ভিড় করেছে।

--প্রকাশদা কিন্তু এম-এ নন। শুধু বি-এ।

--তাতে কি আসে যায়? হেড স্যার রাখালবাবুর মত বি এ-কে শিখিয়ে দিতে পারেন প্রকাশদা।

--সত্যি হেড স্যার নিজেও একদিন প্রকাশদার কাছে কথাটা বলছিলেন।

--কি বলছিলেন?

--বলছিলেন, তুমি কাছে থাকলে আমার আর ডিক্সনারি দরকার হয় না হে প্রকাশ।

আগে হেড স্যার রাখালবাবু যেমন স্কুলের অফিস-ঘরে, তেমনি পড়াবার ক্লাসে কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকতেন। মুখের চেহারাটাও বেশ উদ্বিগ্ন দেখাতো। আর হাতের কাছে সব

সময় থাকতো একটা ইংরেজী ডিক্সনারি। স্কুল ইনস্পেক্টরের কোন চিঠি হোক, কিংবা ব্যাঙ্কের কোন চিঠি হোক, পড়তে গিয়ে তিনবার চশমা মুছতেন হেড স্যার। আর, বার বার ডিক্সনারি খুলতেন। কপালটাও যেন দুশ্চিন্তার ভারে কুঁচকে যেত।

ক্লাসে পড়াতে এসেও হেড স্যার ভুরু কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাতেন। ইংরেজী পোয়েট্রি হোক, আর ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি হোক, দুইই যেন হেড স্যারের কাছে সমান বিস্বাদের দুটো বস্তু, দুটো নিমতেতো ওষুধ। বই খুলে এক লাইন পাঠ করেই দু'বার ডিক্সনারি খুলতেন হেড স্যার। ভাবতেন, ঘাড়ের উপর হাত বোলাতেন। তারপরেই বেশ জোরে, যেন বেশ একটু ক্ষিপ্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠতেন--টেল মি নট ইন মোর্ণফুল নাম্বার্স। ভেরি ইমপর্টেণ্ট। আণ্ডারলাইন ইট। লাল পেন্সিল দিয়ে আণ্ডার লাইন কর।

এইভাবেই ইংরেজী পোয়েট্রি পড়াতেন হেড স্যার রাখালবাবু। ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রিও এইভাবে। লাল পেন্সিল দিয়ে আণ্ডারলাইন করে করে ছাত্রদের ইংরেজী পোয়েট্রির আর ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রির বই দুটো রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল।

প্রকাশ আসবার পর হেড স্যার রাখালবাবুর মুখে হাসি ফুটেছে। ক্লাসে পড়ানো প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন হেড স্যার রাখালবাবু। ক্লাস এইটের ইংরেজী আর হিস্ট্রি পড়াবার দায়িত্ব সেকেণ্ড স্যার প্রকাশই খুশি হয়ে নিয়েছে। বিমল আর অভয় মাঝে মাঝে হাঁপ ছেড়ে আলোচনা করে--যাক্ আণ্ডারলাইনের মার থেকে বইগুলো খুব বেঁচে গেল।

থার্ড স্যার, ফোর্থ স্যার আর পণ্ডিত মশাই আড়ালে আড়ালে হাসেন আর গল্প করেন।--হেড কিন্তু বুঝতে পারছেন না।

--কি?

--তাঁহাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

--তার মানে?

--হেডকে শিগগিরি বোধহয় বেহেড হতে হবে। আর প্রকাশই হেড হয়ে...!

--আরে না না ; প্রকাশ নিতান্ত টেম্পোরারী। প্রকাশের ফিউচার সুবিধের নয়।

--কিন্তু এটা কেমনতর হলো? সেক্রেটারী তো সবই দেখছেন আর বুঝছেন, তবু প্রকাশকে টেম্পোরারী করে রেখেছেন কেন?

--বুঝতে পারি না মশাই।

--সেই জন্যেই বোধহয় রাখালবাবু এত নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন।

--তাই তো মনে হয়।

--আর প্রকাশের মতিগতিও তো ঠিক বোঝা যায় না। হেড যে ওরই ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙ্গে এত সুখ করছেন, তবু প্রকাশের মনে যেন কোন জ্বালা নেই।

--না, তা নেই। বরং কেমন যেন একটা উপেক্ষা আছে।

--হ্যাঁ, আমিও এদিকে-ওদিকে খোঁজ করে জেনেছি, একদিনের জন্যেও সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে প্রকাশ একটা মুখের কথাও বলেনি যে, মাইনে বাড়িয়ে দিন কিংবা পার্মানেণ্ট করুন।

--কিন্তু সেক্রেটারীর নিজের থেকেই একটু সুবিচার করা উচিত ছিল। কে না জানে, প্রকাশের পড়াবার সুনামের জন্যেই স্কুলের ছাত্র বেড়ে চলেছে।

প্রকাশের মতিগতির রকমটাও তো বোঝা যায় না। যখন বুঝছে যে, উন্নতির বিশেষ কোন সুযোগ নেই, তখন এমন মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেই তো পারে।

--হ্যাঁ, আমাদের না হয় মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে, বয়সের গাছপাথর পেকে গেছে। কিন্তু প্রকাশ তো বলতে গেলে নিতান্ত কাঁচা বয়সের একটা ছেলে।

--কত বয়স হবে প্রকাশের, আন্দাজ?

--ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

--আমাদের সেক্রেটারী শৈলেশও তো...।

--সেক্রেটারীও প্রায়ই তাই। এই তো বছর পাঁচ হলো বি-এ বি-এল হয়েছেন।

--সেক্রেটারী কিন্তু প্রকাশকে বিদ্যের কেষ্টবিষ্টু বলে মনে করে না।

--কেমন ক'রে বুঝলেন?

--সেক্রেটারী শৈলেশ নিজেই কথাটা বলছিল ; বেশ গম্ভীর হয়ে আর চোখ পাকিয়ে, অথচ মুখ টিপে যেন একটা অবজ্ঞার হাসি চেপে রেখে...।

--শৈলেশ কি বললে, সেটা আগে বলুন।

--বললে, প্রকাশ মাষ্টার পড়ায় ভাল ; কিন্তু পেটে বিদ্যে-টিদ্যে কিছু নেই।

চার

বিখ্যাত থিয়সফিস্ট জিনরাজ দাস এসেছেন, আর ধর্মের কথা নিয়ে এই ছোট শহরের মুখে আর মনে যেন একটা তর্কের তুফান চলছে। শহরটা ছোট, কিন্তু এই তুফানটা ছোট নয়। বার লাইব্রেরীর ঘরেও তর্কের লড়াই প্রবল হয়ে ওঠে।

অগত্যা একদিন সম্মুখ সমরের মত একটা কাণ্ড বাধাবার ব্যবস্থা করলেন স্বয়ং জিনরাজ দাস। প্রসাদ মেমোরিয়াল হলে একটা জনসভা ডাকা হবে। জিনরাজ দাস থিয়সফির পক্ষে বলবেন। আর, যাঁর ইচ্ছে হবে তিনিই তাঁর ধর্মের পক্ষে বক্তৃতা করবেন।

প্রসাদ মেমোরিয়াল হল সেদিন মানুষের ভিড়ে ভরে গিয়েছিল। সবচেয়ে জোরালো বক্তৃতা দিলেন স্বয়ং জিনরাজ দাস। জেসুইট মিশনের ফাদারও কম যান না। দীননাথবাবুও চমৎকার বললেন। উকীল মণ্টুবাবু নাস্তিকতার পক্ষে বললেন। কিন্তু বক্তৃতাগুলি যেন তপ্ত ভাষার এক-একটা হল্‌কা। সভায় গোলমাল বাড়ে, কথা কাটাকাটি হয়, শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে হৈ-হৈ করে ওঠেন। বার দুই শেম-শেম ধ্বনিও বেজে ওঠে।

হঠাৎ প্রকাশ মাস্টারকে দেখতে পেয়ে দীননাথবাবু ডাক দিলেন, বক্তৃতা করতে বললেন।--যদি পার, তবে তুমি কিছু বল প্রকাশ। ছেলেরা তো বলে, তুমি নাকি খুব ভাল বলতে পার।

পুরো আধ-ঘণ্টা ধরে ইংরেজী ভাষাতেই বক্তৃতা দিল প্রকাশ মাস্টার।

প্রসাদ মেমোরিয়াল হলের এতক্ষণের এত উত্তেজিত শ্রোতার ভিড় শান্ত হয়ে প্রকাশ মাস্টারের বক্তৃতা শুনলো। আসল কথা হলো, প্রকাশ মাস্টারের বক্তৃতা শুনেই শ্রোতারা শান্ত হয়ে গেল। জেসুইট মিশনের সাহেব স্নিগ্ধভাবে হাসলেন। মণ্টু উকীল একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আর, জিনরাজ দাস জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

সভা ভাঙ্গবার পর স্কুল-সেক্রেটারী শৈলেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ মাস্টারের মুখটার দিকে অদ্ভুত ভাবে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে। আর, বিমল অভয় নীহার আর শেখর ওদের সেকেণ্ড স্যার প্রকাশের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে বলাবলি করে ঃ

--বাবার কাছে গল্প শুনেছি।

--কি?

--অনেকদিন আগে ঠিক এরকম একটা চমৎকার কীর্তি করেছিলেন...।

--কে?

--স্বামী বিবেকানন্দ।

--কোথায়?

--চিকাগোতে।

—কোথায়?

—আমেরিকাতে।

টিচারেরা আর পণ্ডিত মশাইয়েরা তাঁদের মেসবাড়ির বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে আর তামাকের ধোঁয়ায় সেই অন্ধকারকে আরও ঘন করে দিয়ে যে-সব কথা আলোচনা করেন, তাতেও বোঝা যায় যে, তাঁরাও একটা ঘটনার ধাঁধাঁর সমাধান করতে পারছেন না। সেকেণ্ড মাস্টার প্রকাশ এই বয়সেই এত অসাধারণ রকমের যোগ্যতার আর বিদ্যার মানুষ হয়েও ত্রিশ টাকার মাইনেতে এখানে পড়ে আছে। এ মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার কোন লক্ষণও প্রকাশের কথায় বা ব্যবহারে দেখা যায় না। সেক্রেটারী শৈলেশও প্রকাশকে এইবার ঠিক বুঝতে পেরেছে। প্রকাশের সেদিনের বক্তৃতা শৈলেশও শুনেছে ; অথচ প্রকাশের জন্য পাঁচ টাকা মাইনে বৃদ্ধির একটা অর্ডার লিখতেও সেক্রেটারীর কলমে কালি সরে না। যেন কঠোর রকমের একটা অনিচ্ছা আর আপত্তি আছে সেক্রেটারীর। মুখে না বললেও সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ব্যাপারটা বেশ জটিল একটা ধাঁধা বলেই তো মনে হয়।

পাঁচ

এই প্রকাশও যেন একটা ধাঁধা। এ শহরে কবে এসেছিল প্রকাশ, কতদিন ধরে এখানে ছিল, সেখবর কেউ জানে না। স্কুলের টিচারদের সবাই শুধু এই সত্যটুকু জানতে পেরেছেন যে, খবরটা হেড মাস্টার রাখালবাবু নিজেই জানিয়েছিলেন, যে-সন্ধ্যায় বুড়ো জলধরবাবুর বিদায় সভা সাঙ্গ হলো, সেই সন্ধ্যাতেই সোজা সেক্রেটারী শৈলেশের বাড়িতে গিয়ে আর শৈলেশের সঙ্গে দেখা করে, শৈলেশেরই হাতে একটা দরখাস্ত তুলে দিয়েছিল প্রকাশ। সেকেণ্ড মাস্টারের কাজটা পেতে চায় প্রকাশ ; মাইনে যা উচিত বলে মনে করবেন সেক্রেটারী, প্রকাশও সেই মাইনে খুশি হয়ে মেনে নেবে।

সেক্রেটারী শৈলেশও দরখাস্ত পড়ে খুশি হয়েছিল। একজন বি-এ পাস অভিজ্ঞ টিচার ; বর্মাতে যে চার বছর হাইস্কুলে পড়িয়েছে, তাকে এখানে এই স্কুলের জন্য পঞ্চাশ টাকাতে নিয়ে নিলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু মাইনের পরিমাণ নিয়ে প্রকাশবাবুর কোন দাবির জেদ নেই। শৈলেশ জিজ্ঞাসা করেছিল—ত্রিশ টাকাতে রাজি আছেন?

প্রকাশ—হ্যাঁ।

শৈলেশ—তবে কাল বাদে পরশু থেকেই পড়াতে শুরু করুন।

প্রকাশ—বেশ।

শৈলেশ—কাজটা টেম্পোরারি কিন্তু।

প্রকাশ—বেশ।

অল্প কথা বলে, কথা বলবার ভঙ্গীটাও নম্র, আর স্বভাবটাও খুবই শান্ত বলে মনে হয়, এই প্রকাশ যে সত্যিই এত ভাল শিক্ষিত একটি মানুষ, এটা অবশ্য হেড মাস্টার রাখালবাবু আর টিচারেরা কল্পনাও করতে পারেননি। সেদিন তাই এমন কিছু আশ্চর্য কেউ হয়নি, কিন্তু এখন ভাবতে সত্যিই বেশ আশ্চর্য বোধহয়। এ ধরণের ত্রিশ টাকা মাইনের একটা মাস্টারীর কাজ নিতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো কেন প্রকাশ?

স্কুলের মাঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে গল্প করতে গিয়ে নীহার আর শেখরও আশ্চর্য হয়।—সত্যি, প্রকাশদা যেন হাওয়ার ভেতর থেকে বের হয়ে এসে...।

বিমল—কি?

নীহার—সেকেণ্ড স্যার হয়ে গেলেন।

অভয় হাসে—বাণীদির গানের জন্য নয় তো?

বিমল—তার মানে!

অভয়--মানে আবার কি বলবো? এর মানে হয় না। যদি বুঝতে না পারিস, তবে বুঝিস না।

শেখর--তুই বলতে চাস, বাণীদির গান শুনে প্রকাশদা...।

অভয়--আমি কিছুই বলছি না।

বিমল--সাহস করে প্রকাশদাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়।

অভয়--আমার সাহস আছে।

নীহার--তবে চল, জিজ্ঞেস করি।

প্রকাশ মাস্টার, যে মানুষটি এত শান্ত, এত কম কথা বলে আর আড়ালে পড়ে থাকতে ও পাশ কাটিয়ে চলে যেতে এত ভালবাসে, সে মানুষ কিন্তু টাউনের একটা ভিড়ভরা সরু রাস্তার পাশে ছোট একটা ঘরের মধ্যে থাকে। কে জানে কোন্ হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে প্রকাশ মাস্টার? এই সরু সড়কের উপর হৈ-চৈ আর চিৎকার যেন অবিরাম ছুটোছুটি করছে। এরই মধ্যে প্রকাশ মাস্টারের ছোট্ট ঘরটা যেন একটা গোপন নীরবতা।

অভয় আর নীহার এগিয়ে যেয়ে ঘরের দরজায় ঠেলা দেয় ; ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে। কিন্তু প্রকাশ মাস্টার নেই। কে জানে এরকম সন্ধ্যার সময়ে কোথায় আর কোন্ দিকে ঘুরে বেড়ায় প্রকাশ মাস্টার?

বিমল বলে--প্রকাশদা বোধহয় টিউশনী ধরেছেন।

অভয়--না।

বিমল--কেমন করে বুঝলি?

অভয়--আমার তাই মনে হচ্ছে।

শেখর--কেন?

অভয়--প্রকাশদাকে বাবা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাকে পড়াতে পারবেন কি না?

নীহার--কি বললেন প্রকাশদা?

অভয়--একটা আশ্চর্য কথা বললেন।

শেখর--কি?

অভয়--বললেন, প্রাইভেট পড়াতে হলে তাঁর পক্ষে কলেজের পরীক্ষার কোন ছাত্র হলেই ভাল হয়।

বিমল--ছাত্র?

অভয়--হ্যাঁ।

নীহার--ছাত্রী বলেননি তো?

অভয়--মনে মনে কি বলছেন জানি না ; তবে মুখে তো শুধু ছাত্র বললেন।

শেখর--মুখ টিপে হাসছিস কেন?

অভয়--তুইও তো মুখ টিপে হাসছিস।

বিমল--তাহলে প্রকাশদা কি এখন...।

অভয়--চল তবে, একবার খোঁজ নিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসি, সত্যিই প্রকাশদা কোন ছাত্রীকে পড়াতে শুরু করেছেন কিনা।

প্রকাশ মাস্টারের ঘরের দরজা আবার ঠেলা দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে চারটে কৌতূহলের মূর্তি সরে যায়। সরু সড়কের ভিড় পার হয়ে, টাউনের চকের কাছে এসে ডান দিকে ঘুরে একটা নিরালা পথের আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে ওরা চলতে থাকে।

কৌতূহলের মূর্তি বটে, কিন্তু ওরা চারজন যেন চারটে নিদারুণ তদন্তের মূর্তি। তা না হলে, ওদের মনে এমন অদ্ভুত ধারণা কেন হবে যে, এই সন্ধ্যায় প্রকাশ মাস্টার হয়তো ওদের বাণীদির বাড়িতে একটি ঘরের মধ্যে বসে, আর বাণীদিরই সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে

কলেজের পরীক্ষার পড়া পড়িয়ে চলেছেন?

না, নিতান্ত ভুল ধারণা আর মিথ্যে সন্দেহ। বামাচরণবাবুর সেই সামান্য চেহারার বাড়িটার সামনে সেই টক পেয়ারার গাছটা শুধু অন্ধকারে দুলছে। বাড়িটা যেন এখনও বামাচরণবাবুর হঠাৎ মৃত্যুর ব্যথাটাকে গায়ে মেখে আর বিষণ্ণ হয়ে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়ির কোন ঘরের ভিতরে আলো আছে বলে মনে হয় না।

ঠিকই, সত্যিই তো বাণীদি চুপটি করে আর একলাটি হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সন্ধ্যার আকাশের তারাগুলিকে দেখছেন।

বামাচরণবাবুর এই বাড়িতে বাণী অবশ্য একেবারে একলাটি হয়ে যায়নি। বাণীর এক পিসি আছেন, বামাচরণবাবুর মৃত্যুর পর দুম্‌কা থেকে এসে এই পিসি আজও এখানেই আছেন। বিমলের মা'র কাছে এসে বলে গিয়েছেন পিসি--মেয়েটার একটা গতি হয়ে গেলেই তিনি আবার দুম্‌কা ফিরে যাবেন। আর, সত্যিই যদি এক বছরের মধ্যেও কোন গতি না হয়, বাণীর মণ্টু মাসী যদি কলকাতার পাত্রটিকে হাতছাড়া করেন, তবে বাণীকেও সঙ্গে নিয়ে তিনি দুম্‌কা চলে যাবেন।

অভয় আর বিমল বারান্দার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। বাণী বলে--কে?

অভয়--আমরা।

বাণী--অভয়?

অভয়--হ্যাঁ বাণীদি।

বাণী--কি ব্যাপার?

অভয়--এই...হঠাৎই এদিকে চলে এলাম।

বাণী হাসে--এখন তো টক পেয়ারার সীজ্‌ন্ নয়।

অভয়--ছিঃ, বাণীদি, আপনি আমাদের এত লোভী বলে সন্দেহ করেন?

বাণীও হাসে--সন্দেহ করি না, বিশ্বাস করি।

অভয়--তা হলে আমরাও আপনাকে সন্দেহ করতে পারি।

বাণী--কি সন্দেহ?

অভয়--এই যে, আপনি এই সন্ধ্যার সময় এরকম গম্ভীর হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখছেন, কেন?

বাণী--ঠিকই, কিছ্ছু ভাল লাগছে না ভাই।

বিমল--আপনি কি পড়া-টড়া ছেড়ে দিয়েছেন?

বাণী--হ্যাঁ।

শেখর--বি-এ পরীক্ষা দেবেন না?

বাণী--না।

নীহার--এটা কিন্তু ভাল করলেন না বাণীদি। আমরা যে আশা করেছি, আপনি হবেন আমাদের টাউনের ফার্স্ট মহিলা গ্র্যাজুয়েট।

বাণী--তোমাদের আশা মিথ্যে হয়ে গেল।

অভয়--আমার বিশ্বাস, আমাদের আশা সত্যি হবেই হবে।

বাণী হাসে--হোক্ তবে।

অভয়--আচ্ছা, আজ তবে আসি, বাণীদি।

বাণী--এস।

না, প্রকাশদা এখানে আসেনি। প্রকাশদাকে সন্দেহ করা খুবই ভুল হয়েছে। বাণীদির গান যদিও-বা প্রকাশদার ভাল লেগে থাকে, কিন্তু বাণীদিকে পড়াতেও প্রকাশদার ভাল লাগবে, এমন কোন কথা নেই। আজ এই সন্ধ্যায় প্রকাশদা হয় তো এই টাউনের অন্য কোন রাস্তায়

শুধু নিজের খামখেয়ালী ইচ্ছার টানে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু, কি আশ্চর্য ; এই সন্দেহটাও নিতান্ত ভুল একটা সন্দেহ। বামাচরণবাবুর সেই সামান্য চেহারার বাড়ির ফটক থেকে সরে এসে আর, মাত্র পাঁচ মিনিট হেঁটে এগিয়ে যেতেই অভয়ের চোখে একটা বিস্ময়ের দৃশ্য চমকে ওঠে।--ও কে রে? প্রকাশদা বলেই তো মনে হচ্ছে!

ফুলের টব দিয়ে সাজানো বারান্দা, আর বাঁশের জাফরিতে লতা ওঠানো, ঐ বাড়িটা হলো নন্দী সাহেবের বাড়ি। বুড়ো মানুষ নন্দী সাহেব পুরু কাচের চশমা চোখে দিয়ে সারাদিন তাঁর লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে বসে থাকেন। শুধু বই আর বই, নানা বিদ্যার অজস্র বই লাইব্রেরী ঘরের পনেরটা আলমারিতে সাজানো রয়েছে। কিন্তু কথাটা সকলেই জানে। নন্দী সাহেবের চোখে পুরু কাচের চশমার কোন অর্থ হয় না। তিনি চোখে দেখতেই পান না। এই তো, মাত্র এক মাস হলো এই শহরে এসেছেন নন্দী সাহেব। তিনি নাকি চল্লিশ বছর আফ্রিকার একটা দেশের কলেজে প্রফেসর ছিলেন। এই বাড়িটা আগে ছিল লুথারবাবুর বাড়ি। নন্দী সাহেবের কাছে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে লুথারবাবু তাঁর ছেলের কাছে কলম্বোতে চলে গিয়েছেন।

কিন্তু অন্ধ নন্দী সাহেবের বাড়িতে প্রকাশ মাস্টারেব কি কাজ থাকতে পারে?

নন্দী সাহেবের বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে প্রকাশ মাস্টার ফটকের দিকেই এগিয়ে আসছে। বোধহয় বাড়ি ফিরে যাচ্ছে প্রকাশ মাস্টার। অভয় আর নীহার, শেখর আর বিমল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রকাশ মাস্টার আরও এগিয়ে এসে সড়কের উপর পা দিতেই অভয় চেঁচিয়ে ওঠে।--আমরা আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম স্যার।

প্রকাশ--কেন?

বিমল--এমনিই...তার মানে...।

অভয়--জানতুম না, আপনি এখন এখানে নন্দী সাহেবের বাড়িতে আছেন।

প্রকাশ--আমি আজকাল রোজই সন্ধ্যায় এখানে আসি।

অভয়--কেন স্যার?

প্রকাশ--পড়তে আসি। এখানে অনেক বই আছে।

শেখর--আপনি তো যথেষ্ট বিদ্বান, তবু আরও বই পড়বার কি দরকার ছিল স্যার?

প্রকাশ হেসে ফেলে--দরকার ছিল।

অভয়--আপনি কি এম-এ পরীক্ষা দেবেন স্যার?

প্রকাশ--না।

বিমল--তবে কেন স্যার...।

প্রকাশ--ধর, যদি কোনদিন বি-এ ক্লাসের কাউকে পড়াতে হয়, তখন তো সামান্য বিদ্যাতে কুলিয়ে উঠতে পারবো না।

নীহার--কী বলছেন স্যার? আপনি তো বিবেকানন্দের মত ইংরেজী বক্তৃতা দিতে পারেন, বি-এ টি-এর বিদ্যে তো আপনার কাছে একেবারে জলের মত সহজ।

প্রকাশ--না, তা নয়। আমি হিস্ট্রি আর সাহিত্য ভাল জানি না।

শেখর--বললে বিশ্বাস করবো কেন স্যার। আপনি কী চমৎকার হিস্ট্রি আর পোয়েট্রি পড়ান, সেটা সকলেই জানে।

প্রকাশ--তোমাদের হিস্ট্রি আর পোয়েট্রি, আর বি-এর হিস্ট্রি আর পোয়েট্রি এক নয়।

অভয়--আপনি নিশ্চয় ধর্মের সাবজেক্ট খুব ভাল জানেন।

প্রকাশ--কে বললে?

অভয়--কেউ বলেনি। আমাদের তাই মনে হয়েছে। তা না হলে আপনি সেদিন ধর্মের বক্তৃতাতে সকলকে এত আশ্চর্য করে দিলেন কেমন করে?

প্রকাশ--হ্যাঁ, একটু সুবিধে ছিল। অনেকদিন আগে, বর্মাতে থাকতে...।

হঠাৎ চুপ হয়ে যায় প্রকাশ মাস্টার। যেন নিজের মনের একটা অসাবধান মুহূর্তে হঠাৎ একটু বেশি মুখরতা করে ফেলেছে প্রকাশ মাস্টার।

অভয়--বর্মাতে থাকতে কি হয়েছিল স্যার?

প্রকাশ বিড়বিড় করে--কিছুই না ; সেটা বলবার মত এমন কিছু ব্যাপার নয়।

নীহার--বলুন না স্যার।

প্রকাশ--বর্মাতে আমি এক পাদরী সাহেবের বাড়িতে কাজ করতাম। প্রায় আট বছর কাজ করেছি। সাহেবের বাড়িতে আলমারি ভর্তি অনেক বই ছিল। কাজ সারা হয়ে যাবার পর বই পড়তাম। সবই ধর্মের বই, তাই ধর্মের সাবজেক্টে...।

বলতে বলতে আবার কথার আবেগ হঠাৎ স্তব্ধ করে দিয়ে হেসে ওঠে প্রকাশ মাস্টার।--যাক্ গে, সে সব কথা শুনে তোমাদের কোন লাভ নেই।

অভয়--বর্মার স্কুলটা কেমন ছিল স্যার? খুব বড় স্কুল নিশ্চয়।

প্রকাশ--কিসের স্কুল?

অভয়--যে-স্কুলে আপনি অনেক বছর পড়িয়েছিলেন।

দূরের লাইট পোস্টটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে প্রকাশ মাস্টার।--হ্যাঁ মন্দ নয়...স্কুলটা ভালই ছিল...তোমরা বাড়ি যাও এবার।

ব্যস্তভাবে চলে যায় প্রকাশ মাস্টার।

ছয়

সেদিন যেমন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ির বারান্দার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আকাশের তারাগুলির দিকে তাকিয়ে ছিল বাণী, তার কদিন পরের একটি দিনে, আবার ঐরকমই একটি সন্ধ্যায় বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আকাশের তারাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু আজকের সন্ধ্যার তারাগুলি যেন একগাদা ঝিকিমিকি বিস্ময়। এ কী অদ্ভুত কথা বললেন নন্দীসাহেব।

লোক পাঠিয়ে বাণীকে ডেকেছিলেন অন্ধ নন্দী সাহেব। লোকের হাতে একটা চিঠিও দিয়েছিলেন--আমি তোমাকে একবার দেখতে চাই।

কি আশ্চর্য, অন্ধ মানুষ আবার কী দেখবেন? মনে হয় কোন কথা বলতে চান। যেতে অনিচ্ছা তবু গিয়েছিল বাণী।

নন্দী সাহেব বললেন--আমি শুনেছি, আমার চাকর রামদীনের কাছে সবই শুনেছি। তোমার বাবা বেঁচে নেই। দুঃখের কথা। কিন্তু আমারও যে মেয়েটি বেঁচে নেই।

ফুঁপিয়ে উঠলেন অন্ধ নন্দী সাহেব।

বাণী বলে--দুঃখ করবেন না।

হেসে ফেলেন নন্দী সাহেব--ঠিক কথা। দুঃখ করতে চাই না।...যাই হোক্, শুনেছি, তুমি নাকি বি-এ পড়তে চেয়েছিলে?

বাণী--হ্যাঁ, কিন্তু আপনি একথা কোথায় শুনলেন?

নন্দী সাহেব--একটি ছেলে বললে ; ছেলেটিকে খুবই ভাল ছেলে বলে মনে হলো।

বাণী ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে--নাম?

নন্দী সাহেব--নামটা তো জিজ্ঞাসা করা হয়নি। যাই হোক্, নামটা না হয় তুমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও। কথা হলো ছেলেটি তোমাকে পড়াতে রাজি আছে। পড়বার জন্যে টাকা-পয়সার কোন দাবি তার নেই। তার ইচ্ছে, তুমি বি-এ পাশ কর। তার বিশ্বাস, সে তোমাকে পড়ালে তুমি বি-এ পাশ করবেই।

বাণীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়--অদ্ভুত কথা!

নন্দী সাহেব--অদ্ভুত কেন? তোমারই কথাটা অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।

বাণী--মাপ করবেন, আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না।

নন্দী সাহেব--বেশ তো, কদিন পরেই বলো। কিন্তু কবে বলবে?

বাণী--পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি, তিনি কি বলেন।

নন্দী সাহেব--বেশ, তিনি যা বলেন সেটা তুমি এসে তাহলে আমাকে জানিয়ে যাবে?

বাণী--হ্যাঁ।

তাই আজকের সন্ধ্যার আকাশের তারা যেন দুরন্ত একটা জিজ্ঞাসার বিস্ময় নিয়ে জ্বলছে। বাণীর জীবনের উপর আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে কার মায়ার চোখ এমন ব্যাকুল হয়ে উঠলো? এ যে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না। বাণীর বাইশ বছর বয়সের জীবনের ছায়ার কাছেও এরকমের কোন রহস্যের ছায়া কোনদিন এগিয়ে আসেনি। একটা উপকারের ইচ্ছা বটে, কিন্তু উপকারটা যে ভয়ানক একটা ইচ্ছার দাবী বলে মনে হয়। বামাচরণবাবুর মেয়ে বি-এ পাশ করলে তার কিসের লাভ?

বাণীর চোখের উপর হঠাৎ একটা আলোর ঝলক লুটিয়ে পড়ে ধাঁধিয়ে যায় বাণীর চোখ; আর সন্ধ্যার আকাশের তারাগুলি যেন সেই মুহূর্তে মুছে যায়।

একটা মোটর গাড়ির হেড লাইটের আলো বাণীর চোখের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। আর ছুটন্ত গাড়িটাও হঠাৎ মন্থর হয়ে বাড়ির ফটকের কাছে থেমে যায়। কার গাড়ি? এই সামান্য চেহারার ছোট বাড়িতে সত্যিই কোন অসামান্য এসেছেন বলে মনে হয়।

চমকে ওঠে বাণীর চোখ, শৈলেশ এসেছে।

বাড়ির বারান্দায় উঠে বাণীকে দেখতে পেয়েই শৈলেশের চোখ দুটো অন্ধকারের মধ্যেই যেন আভাময় হয়ে হেসে ওঠে। শৈলেশের গলার স্বরেও একটা খুশির উল্লাস হেসে ওঠে।--কি করছো বাণী?

বাণী বলে--একটু দাঁড়ান, আলো নিয়ে আসি।

শৈলেশ--না, অন্ধকারই ভাল।

বাণী হঠাৎ যেন বোবা হয়ে যায়। কথা বলতে পারে না। বলবার মত কোন কথাও খুঁজে পায় না। অন্ধকার, তাই দেখতে পায় না শৈলেশ, বাণীর চোখের দৃষ্টিটাও যেন একটা বিস্ময়ের ভয়ে ভীরু হয়ে গিয়েছে।

শৈলেশ বলে--তোমার গান শুনে কী চমৎকারই যে লাগলো, কি বলবো?...কিন্তু...আমার একটা অভিযোগ আছে। সেদিন খুশি হয়ে তোমাকে আমি কত কথা বললাম, কিন্তু তুমি কোন কথা বললে না কেন?

বাণী--সেজন্যে কিছু মনে করবেন না।

শৈলেশ--মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার এখনও যেন লজ্জা করছে। কিংবা বোধহয় ভয় করছে।

বাণী এইবার সত্যিই লজ্জিত হয়--না না, ভয় করবার কি আছে?

শৈলেশ--তা হলে নির্ভয়ে একটা কথা বলি?

চমকে ওঠে বাণী--বলুন।

শৈলেশ--তোমাকে বি-এ পড়াবার আর পাশ করাবার ভার আমি নিতে চাই।

বাণী--না না, আপনি কেন এসব ঝঞ্ঝাট সহ্য করবেন?

শৈলেশ--তবে তুমি কি বি-এ পড়বার ইচ্ছে ছেড়ে দিয়েছ?

বাণী--ইচ্ছে ছাড়িনি। যদি ভাগ্যে থাকে আর সুযোগ পাই, তবে পড়বো।

--আমিই তো সুযোগ করে দিচ্ছি।

--না না, এটা ভাল দেখায় না। লোকেও ভাল বলবে না।

--আমি কি বলতে চাই, সেটা একটু ভাল করে শোন বাণী।

--বলুন।

--আমি চাই, এই শহরের প্রথম গ্রাজুয়েট মেয়ে হবে আমারই স্ত্রী।

মাথা হেঁটে করে যেন একটা ভীরু নিঃশ্বাসের শিহর সামলাতে চায় বাণী।--না।

শৈলেশ--আচ্ছা, যদি কথাটা অন্যভাবে বলি। যদি বলি, আমার স্ত্রী হবে এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। তবে?

বাণীর শরীরটা কাঁপতে থাকে--কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

শৈলেশ--বলছি, আগে আমাদের বিয়ে হয়ে যাক্, তারপর তুমি বি-এ পড়বে।

বাণী--না না, আপনি কেন আমাকে বিয়ে করবেন? কোন মানে হয় না।

শৈলেশ এইবার যেন একটা কঠিন প্রতিজ্ঞার ছায়ার মত দু'পা এগিয়ে যেয়ে বাণীর কাছে দাঁড়ায়।--মানে আছে। আমি তোমাকে ভালবাসি।

দু'হাত তুলে চোখ ঢাকে বাণী।

শৈলেশ বলে--আমারও একটা লোভের আশা আছে, আমিও একটা গর্ব পেতে চাই, আমি এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ের স্বামী হতে চাই।

বাণীর প্রাণের বিস্ময়টাই যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলে--আমি যাই, পিসিমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শৈলেশ--না। আজ নয়। পিসিমার সঙ্গে কথা বলবার সময় আর সুযোগ অনেক পাওয়া যাবে। আজ শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এসেছি।

বাণী--কথা তো বলেছেন।

শৈলেশ--কিন্তু তুমি তো সে কথাটা বললে না বাণী?

বাণী--কোন্ কথা?

শৈলেশ--আমাকে বিয়ে করতে কি তোমার ইচ্ছে নেই? কোন আপত্তি আছে?

বাণী--এসব কথা বলবেন না।

শৈলেশ হাসে--তবু তুমি স্পষ্ট করে এখনও বলতে পারলে না যে...।

বাণী--আপনি আমার মত মেয়ের আশার চেয়ে অনেক বেশী ; আমার আর কি-ই বা বলবার আছে?

শৈলেশ--আজ তবে চলি, বাণী।

চলে যায় শৈলেশ। শৈলেশের গাড়ির হর্ণের শব্দ সন্ধ্যার অন্ধকারের বাতাসে যেন একটা উতলা উল্লাসের মত ছড়িয়ে গড়িয়ে উধাও হয়ে যায়। আর, সন্ধ্যার আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে বাণীর চোখের তারা দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে জ্বলজ্বল করে।

পিসিমা ঘরের ভিতর থেকে ডাক দেন--বাণী।

--যাই।

--কে এসেছিল আর চলে গেল?

--শৈলেশবাবু।

--অ্যাঁ? মহিমবাবুর ছেলে শৈলেশ?

--হ্যাঁ।

--এর আগে কোনদিন এসেছিল নাকি?

--না।

--তবে আজ এল কেন?

পিসিমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাণীর মুখে যেন কোন ভাষা ফুটে উঠতে পারছে না।

ঘরের ভিতরে চলে যায় বাণী।

সেই মুহূর্তে পাঁচিলের গা-ঘেঁষা টক পেয়ারার গাছের মগডাল থেকে আস্তে আস্তে নেমে আসে অভয় আর বিমল।

পকেটভর্তি টক পেয়ারা হাত দিয়ে চেপে ধরে হাঁপ ছাড়ে বিমল--আঃ, বাঁচা গেল।

অভয়--কিন্তু...।

বিমল--কি?

অভয়--কি বলবো বুঝতে পারছি না।

বিমল--কিন্তু এটা তো বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বাণীদি আমাদের এই টাউনেই থেকে যাবেন।

অভয়--শৈলেশদার সঙ্গে বাণীদির বিয়ে হলে তা তো হবেই। কিন্তু...।

বিমল--আবার কিন্তু কিসের?

অভয়--কিন্তু তাতে বাণীদির শুধু বিয়েই হবে, বি-এ পাস করতে আর হবে না।

বিমল--কেন? শৈলেশদা তো বললেন যে...।

অভয়--এখন তো বলছেন, শুধু বিয়েটাকে তাড়াতাড়ি বাগিয়ে ফেলবার জন্যে। কিন্তু পরে আর একথা বলবেন না।

বিমল--কিন্তু বাণীদি...।

অভয়--বাণীদিও কিছু বলবেন না। ওরকম ভীতু মানুষ জোর করে কিছু বলতেই পারে না।

বিমল--তাহলে...।

অভয়--তাহলে আবার কি? বাণীদি এবার শৈলেশদার স্ত্রী হয়ে মোটরগাড়িতে রোজ জোড়া-পাহাড় বেড়াতে যাবেন, এই হবে।

বিমল--তাই হবে বোধহয়। পড়াশোনা করতে সময়ই পাবেন না বাণীদি।

অভয়--পড়াশোনা করতে ইচ্ছেই হবে না।

বিমল--ইচ্ছে হয় তো হবে, কিন্তু...।

অভয়--আরে না, ইচ্ছেই হবে না। ইচ্ছে হয় না।

বিমল--কে বললে?

অভয়--ছোটকাকিমা। আগে কথা ছিল বিয়ের পর ছোটকাকিমা বাপের বাড়ি সিউড়িতে চলে যাবেন আর ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত সিউড়িতে থেকে পড়াশোনা করবেন। তার পর আবার এখানে আসবেন। কিন্তু, দেখলি তো, ছোটকাকিমা কিছুতেই বাপের বাড়ি গেলেন না।

বিমল--কেন?

অভয়--ঐ যে বললাম, ইচ্ছে হয় না। ছোটকাকিমা স্পষ্ট করে ছোটকাকাকে বললেন, আর আমি এখন সিউড়ি যাব না, পড়াশোনা করতে একটু ভাল লাগবে না, ইচ্ছেই হয় না।

সাত

এই ছোট শহরের মন একটা নতুন বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে ছটফট করে উঠেছে। কথাটা এরই মধ্যে রটে গিয়েছে। কথাটা বেশ একটা আশ্চর্যের কথা বইকি।

অনেকেই শুনে খুশি হয়েছেন। যেমন--বিমলের মা, হরেনবাবু, দীননাথবাবু। শৈলেশের মত ছেলের সঙ্গে বাণীর বিয়ে হবে, এটা শুধু বাণীর জীবনের একটা সৌভাগ্য নয়, এটা এই শহরেরই জীবনের একটা চমৎকার শুভ ঘটনা। বিমলের মা বলেন--বাণীর বাপ বেঁচে থাকলে আজ কত খুশি হতেন।

মুহুরী বামাচরণবাবুর মেয়ে এই শহরের সবচেয়ে বড় বাড়িটার বউ হবে, সংবাদটা খুশির

সংবাদ হলেও অনেকের কাছে কেমন যেন একটা দুর্বোধ সংবাদ। কই, কোনদিন তো এমন কোন প্রমাণ দেখা যায়নি যে, মুহুরি বামাচরণবাবুর মেয়ে বাণীর জন্যে মহিমবাবুর ছেলে শৈলেশের মনে কোন ইচ্ছের ব্যাপার আছে। শৈলেশ কোনদিন বামাচরণবাবুর ঐ বাড়িটার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ। শৈলেশের বাড়িতে কোন উৎসবের দিনেও বাণী কোনদিন এসেছে বলে কেউ শোনেনি, কেই দেখেওনি। শৈলেশ বামাচরণবাবুকে ভাল করে চিনতো কিনা সন্দেহ।

অক্ষয়বাবু বলেন--এটা খুবই আকস্মিক একটা ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

হরেনবাবু--ঠিক বুঝলাম না।

অক্ষয়বাবু--হঠাৎ কিছু একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, তাই বামাচরণের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে শৈলেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

হরেনবাবু--একথা বললেন কেন?

অক্ষয়বাবু--আরে মশাই, এই তো মাস কয়েক আগে, বামাচরণ যেদিন মারা গেল, সেদিন শৈলেশই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বামাচরণবাবু কে?

হরেনবাবু আশ্চর্য হন--তাই নাকি?

অক্ষয়বাবু--আজ্ঞে হ্যাঁ। একজন সামান্য মুহুরি মানুষের খোঁজ-খবর রাখবে, শৈলেশ সে ছেলেই নয়। তার প্রমাণ সেদিনই পেয়েছিলাম।

হরেনবাবু--আপনি কি বললেন?

অক্ষয়বাবু--আমি বলেছিলাম, বামাচরণকে সকলেই যে চেনে শৈলেশ, মুহুরি মানুষ হলেও সে যেমন-তেমন একটা লোক নয়। তার মেয়ে বাণী এ শহরের সবচেয়ে শিক্ষিতা মেয়ে। এইবার বি-এ পড়বে মেয়েটি।

হরেনবাবু খুশি হয়ে হাসেন--বলে ভালই করেছিলেন।

অক্ষয়বাবু--আরও একটা স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ শৈলেশের কথার মধ্যে ঐ অহংকারের ভাবটা আমার ভাল লাগেনি।

হরেনবাবু--কি বলেছিলেন?

অক্ষয়বাবু--বললাম, বামাচরণ সামান্য মুহুরী বটে, কিন্তু তার মেয়ে আমাদের এ টাউনের গর্ব। বাণীই এই শহরের প্রথম মেয়ে যে একদিন গ্র্যাজুয়েট হবে ; বিদুষী কামিনী রায়ের আশা সফল হবে।

হরেনবাবু--তবে তো মনে হচ্ছে, আপনার কাছ থেকে ঐ স্পষ্ট কথার শিক্ষা পেয়েই শৈলেশ বাণীকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে।

অক্ষয়বাবু--হতে পারে।

শেখরের মা'ও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি।--শৈলেশের সঙ্গে বাণীর তো কোনদিন চেনা-শোনা ছিল না।

বিমলের মা হাসেন--ছিল না, কিন্তু হয়েছে।

--কে বললে?

--যারা দেখেছে তারাই বললে।

--কে?

--বিমল আর অভয়।

--ওরা আবার কি দেখলো? আর কি-ই বা বুঝলো?

--ওরাই ঠিক দেখতে পায়, আর সব চেয়ে ভাল বুঝতে পারে।

শেখরের মা খুশি হয়ে হাসেন--যাক্, খুব ভালই হলো বলতে হবে।

বিমলের মা—ভাল বইকি। বাণী না হয় গরীবের মেয়ে, কিন্তু আর কোন্ রূপটি বা গুণটি ওর নেই যা কোন রাজকুমারীর আছে?

শেখরের মা—জিতগড়ের রাজকুমারীকেও তো দেখেছি দিদি ; রূপ মন্দ নয়, কিন্তু ক লিখতে কলম ভাঙ্গে, এমনই মুখ্খু।

বিমলের মা—এখন যেন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে...।

শেখরের মা—কি?

—ছেলেরা সেদিন যে-কথাটা বলেছিল।

—কোন্ কথা?

—ঐ যে, বাণীদির গানটা শৈলেশদার খুব ভাল লেগে গিয়েছে।

—বাণীর গানটা ভাল লাগলো বলেই কি বাণীকে ভাল লাগলো?

—হতে পারে। আবার অন্যটাও হতে পারে।

—তার মানে?

—বাণীকে দেখে খুব ভাল লেগেছিল বলেই হয়তো গানটাকেও ভাল লেগেছিল।

—বাণীকে আগেও তো দেখেছে শৈলেশ। না দেখবার কথা নয়। কিন্তু কই, তখন কোন কাণ্ড বাধেনি। তখন কি বাণীর মুখটা সুন্দর ছিল না?

—আমিও ঠিক এই কথাই ভেবেছি। হঠাৎ কেন বাণীকে বিয়ে করবাব জন্যে শৈলেশ ব্যস্ত হয়ে উঠলো?

—তবে কি বাণী নিজেই ইচ্ছা করে...।

—না না, কখ্খনো না, বাণী সে মেয়েই নয়। অভয় বললে, শৈলেশদাকে বাণীদি প্রথমে গ্রাহ্যই করেনি।

—ওরা দেখেছে?

—হ্যাঁ গো, বাণী বার বার আপত্তি করেছিল।

—ওরা শুনেছে?

—হ্যাঁ গো। শৈলেশ অবিশ্যি বাণীকে একটা ভাল কথা বলেছে। বিয়ের পর বি-এ পড়বে বাণী।

—সেটা কি আর সম্ভব হবে? অভয়ের ছোটখুড়ির কাণ্ডটা তো দেখলেন।

—আমি তো অভয়ের ছোটকাকা চারুর কাণ্ডটাই দেখলাম।

—কি দেখলেন?

—দোষ চারুর। স্ত্রীর আপত্তি শুনেই একেবারে গলে গিয়ে গড়িয়ে পড়লো। জোরগলায় বৌকে একবার বলতেও পারলো না যে, ম্যাট্রিকটা পাশ করতেই হবে।

—শৈলেশও যদি বাণীর আপত্তি দেখে ওরকম গলে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে, তবে?

—বাণী আপত্তি করবে? অসম্ভব? বি-এ পাশ করা যে মেয়েটার স্বপ্ন।

শেখরের মা মাথা নেড়ে হাসতে থাকেন—কিন্তু ব্যাপারটা তো একই দাঁড়ালো। একা চারু বেচারা নয় ; সবাই, শৈলেশও, একালের সব মদ্দ মশাই স্ত্রীর ইচ্ছার কাছে গলে গিয়ে গড়িয়ে পড়েন।

বিমলের মা—শেখরের বাবা কি গড়িয়ে পড়েননি?

—কোনদিনও না, ভুলেও না।

—একটুও বিশ্বাস করি না।

—শুনলে বিশ্বাস করবেন?

—কি?

—আপনি তো জানেন, কাশীর জর্দা ছাড়া আমার মুখে পান রোচে না।

--জানি।

--এই সাতদিনের মধ্যে সাত বার ভদ্রলোককে মনে করিয়ে দিয়েছি, যেন রামনাথের দোকান থেকে এক ডিবে কাশীর জর্দা কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু এনেছে কি?

--জানি না।

--তবে জেনে রাখুন। আনেনি।

আট

প্রকাশ মাস্টারের ঘর।

অভয় আর বিমল, শেখর আর নীহার চারজনে একসঙ্গে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয়।

কি আশ্চর্য, একটা বই হাতে নিয়ে ঘরের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদা। চোখের পলক পড়ছে না। সে চোখে যেন একটা স্বপ্ন-দেখা আনন্দ থমথম করছে। হাসছে প্রকাশ মাস্টারের চোখ দুটো।

--আমি অভয়, আমরা এসেছি প্রকাশদা। হাঁক দেয় অভয়।

চমকে ওঠে প্রকাশ মাস্টার। --কে...হ্যাঁ...কেন...ভেতরে এস।

চারজনে ভেতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে।--আপনিই এখন আমাদের এই টাউনের গর্ব।

প্রকাশ--তার মানে? একথা তোমরা বলছো কেন?

বিমল--আমরা বলছি না প্রকাশদা। যিনি বলছেন, তিনি আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বড়।

--কে? কে বললেন একথা? প্রকাশ মাস্টারের উজ্জ্বল চোখে যেন তীব্র একটা প্রশ্নের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

অভয়--বলছিলেন দীননাথবাবু।

প্রকাশ মাস্টারের চোখের বিদ্যুৎ যেন হঠাৎ লজ্জিত হয়ে সরে যায়। যেন একটা গোপন কৌতূহলের চাপা উল্লাসও লজ্জিত হয়েছে। আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে প্রকাশ--তাই বল।

অভয়--আপনি আমাদের এই টাউনে আগে কখনো এসেছিলেন প্রকাশদা?

প্রকাশ--না।

শেখর--এই প্রথম এসেছেন?

প্রকাশ--হ্যাঁ।

নীহার--কিন্তু কবে এসেছিলেন স্যার?

প্রকাশ--এই তো...এই সেদিন, তার মানে--

অভয়--জলধর স্যার যেদিন চলে গেলেন, সেদিনই বোধ হয়?

প্রকাশের শান্ত চোখের তারা দুটো চমকে ওঠে।--হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে?

অভয়--আমরা যে সেদিনই প্রথম আপনাকে দেখলাম।

প্রকাশ--কোথায় দেখেছিলে?

অভয়--জলধর স্যারের বিদায় সভাতে।

প্রকাশ--ঠিক বলেছ।

নীহার--কিন্তু আপনি কেমন করে সভাতে এলেন স্যার? আপনি কি আগেই জানতেন যে...।

প্রকাশ হাসে--আমি কিছুই জানতাম না। সকাল বেলায় এই টাউনে এসে পৌঁছেছিলাম ; ধর্মশালায় ছিলাম। আর বিকেল হলে গয়া যাবার বাসের টিকিট কিনে রেখেছিলাম। আর

সন্ধ্যা হতেই বাস ধরবার জন্যে চকের দিকে চলে যাচ্ছিলাম।

শেখর--তাহলে চলে যাননি শেষ পর্যন্ত?

প্রকাশ--না ; দেখতেই তো পাচ্ছ, চলে যেতে পারিনি।

অভয়--কেন প্রকাশদা?

প্রকাশ--ঐ যে, হঠাৎ চোখে পড়লো একটা মিটিং হচ্ছে ; অনেক লোকজনের ভীড় হয়েছে। আমিও হঠাৎ সভার ঘরের ভেতরে চলে এলাম।

অভয়--বাণীদির গানও তো শুনেছিলেন?

প্রকাশ--অ্যাঁ?

অভয়--বাণীদিকে কিন্তু আপনি একটুও চেনেন না।

প্রকাশ--না, চিনি না ; তবে শুনেছি। তোমাদের টাউনের অক্ষয়বাবু আর হরেনবাবু সেদিন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন কিনা, তাই শুনতে পেলাম, তোমাদের বাণীদির নাকি বি-এ পাশ করবার খুব ইচ্ছে।

বিমল--একথা সকলেই জানে স্যার। আমরাও অনেকদিন আগেই জানতাম।

প্রকাশ--আমি সেদিন প্রথম শুনলাম। সেই জন্যেই তো...।

প্রকাশ মাস্টারের মুখের ভাষা যেন হঠাৎ-ভয়ে থমকে যায়।

অভয় যেন খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।--কি জন্যে স্যার? বলুন না প্রকাশদা।

প্রকাশ--কি বলছো?

নীহার--আপনি কি বলতে গিয়ে আর বললেন না স্যার?

প্রকাশ--বলছিলাম, আমারও হঠাৎ ইচ্ছে হলো, এই শহরে থেকে যাই।

অভয় আর বিমল, শেখর আর নীহার একেবারে শান্ত ও নীরব হয়ে, যেন দুরন্ত একটা সত্যের সংবাদ শোনবার প্রতীক্ষায় সেকেণ্ড স্যার প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রকাশ হেসে ওঠে।--তাই ইচ্ছে করে তোমাদের সেকেণ্ড স্যার হয়ে গেলাম।

বিমল--কিন্তু আপনি কোনদিন হঠাৎ আমাদের স্কুল ছেড়ে দেবেন না তো প্রকাশদা?

প্রকাশ--ইচ্ছে তো নেই ; তবে ভাগ্য যদি কোনোদিন বলে ছেড়ে দাও, তবে ছেড়ে দিতেই হবে।

শেখর--সেটা আপনার ভাগ্য হবে ঠিকই, কিন্তু আমাদের স্যার দুর্ভাগ্য হবে।

প্রকাশ--তার মানে?

নীহার --তার মানে, আপনি অন্য কোনো টাউনের স্কুলে অনায়াসে এর চেয়ে অনেক ভাল মাইনের সেকেণ্ড স্যার কিংবা হেড স্যার হয়ে যাবেন। কিন্তু আমরা আর আপনার মত সেকেণ্ড স্যার পাব না।

প্রকাশ--না, তা নয়। আমার চেয়ে কত ভাল-ভাল স্যার পৃথিবীতে আছে। যাক্, আজ তাহলে তোমরা এস ; আমি এখনই একবার বের হব।

অভয়--কোন্ দিকে যাবেন?

প্রকাশ--একবার নন্দী সাহেবের বাড়িতে যাব।

নীহার--বই আনতে?

প্রকাশ--না...হ্যাঁ...বই অবশ্য আনবো ; কিন্তু তাঁর কাছ থেকে খুব দরকারী একটা কথাও জানবার ছিল।

বিমল--কি কথা স্যার?

প্রকাশ--সব কথাই কি তোমাদের কাছে বলা যায়? ধরে নাও, একটা কাজের কথা।

অভয় বলে--আমাদের একটা অনুরোধ আছে প্রকাশদা।

প্রকাশ--বল।

অভয়--আপনার এই বিচ্ছিরি এলোমেলো ঘরটাকে একটু পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন করে দিতে চাই।

প্রকাশ--না না, ওসব কাজ তোমাদের করতে হবে না। উচিতও নয়।

অভয়--না প্রকাশদা, আপনি আপত্তি করবেন না। আমাদের কোন স্যারের ঘর আপনার এই ঘরের মত ছন্নছাড়া নয়।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে প্রকাশ--ছন্নছাড়া। তোমরাও দেখছি এরই মধ্যে সাংঘাতিক সব ভাল কথা শিখে ফেলেছো। যাই হোক্, যা ইচ্ছে হয় কর। আমি আসছি।

চলে যায় প্রকাশ মাস্টার। কিন্তু ঘরের জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে বিমল আশ্চর্য হয়--এ কি রে অভয়? প্রকাশদার বাক্সটা যে একেবারে হাল্‌কা, ঢনঢন করছে ; ভেতরে কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে?

অভয়--তালা চাবিও তো নেই। একবার খুলেই দেখ না, ভেতরে কি আছে?

প্রকাশ মাস্টারের বাক্সটার ডালা তুলে ধরে বিমল ; আর চার ছাত্রের চার জোড়া চোখ হতভম্ব হয়ে যেন একটা বিস্ময়কে দেখতে থাকে। বাক্সের ভিতরে একটা কাপড়ও নেই ; টাকা পয়সাও কিছুই নেই। শুধু মোটরবাসের একটা পুরনো টিকিট পড়ে আছে। গয়া যাবার টিকিট ; ঠিকই, টিকিটের তারিখটা হলো সেই তারিখ, যেদিন বুড়ো জলধর স্যারের বিদায়-সভা হয়েছিল।

এই পুরনো টিকিটটা যেন ভয়ানক জাগ্রত একটা সাক্ষী, একটা দিনের স্মৃতিকে যেন চিরকালের মত কাছে ধরে রাখবার জন্য ছোট্ট একটা বাক্সের বুকের নিরাপদ নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছে। কিংবা, প্রকাশ মাস্টারের ভাগ্যপত্রিকার একটা ছেঁড়া পাতা।

--এর মানে কি রে অভয়? বিড়বিড় করে বিমল।

অভয়--আমি যা ভেবেছিলাম, তাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে।

শেখর--কি ভেবেছিলি?

অভয়--আসল কথা হলো, বাণীদির সেই গানটা।

নীহার--তার মানে?

অভয়--বাণীদির গানটার জন্যেই প্রকাশদা এই টাউনে রয়ে গেলেন।

নীহার--কী যা-তা বলছিস।

অভয়--তর্ক রেখে দে, এখন কাজ কর।

চার ছাত্র একসঙ্গে হাত চালিয়ে রহস্যময় এক সেকেণ্ড স্যারের ছন্নছাড়া ঘরের চেহারা পরিচ্ছন্ন করতে গিয়েই যেন অলস হয়ে যায়। বইগুলিকে বিছানার একদিকে সরিয়ে আর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বালিসের নীচে মোট সাতটা টাকা ছিল। টাকাগুলোকে একটা কাগজে মুড়ে বালিসের নীচে রেখে দেওয়া হয়েছে। আলনাতে শুধু একটা জামা আর দুটো ধুতি ঝুলছে। ওগুলো সাজিয়ে রাখবার মত জিনিসই নয়। বাস্, সাজাবার আর গুছিয়ে রাখবার যে কিছুই নেই। চমৎকার একটা শূন্যতাকে সঙ্গে নিয়ে এই ছোট্ট ঘরের ভিতরে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে থাকতে পারে প্রকাশ মাস্টার।

চার ছাত্রের দুরন্ত চেহারাগুলি স্তব্ধ হয়ে ঘরের এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ অদ্ভুত অথচ ভয়ঙ্কর একটা ইচ্ছার কথা বলে সকলকে চমকে দেয় অভয়।--আমার ইচ্ছে ছিল...আমি ভেবেছিলাম, অন্তত একটা পুরনো চিঠি পাওয়া যাবে। কিন্তু কিচ্ছু না, প্রকাশদা একেবারে একটা সন্ন্যাসী।

নীহার ভয়ে-ভয়ে বলে--চিঠি পেলে কি হতো?

অভয়--বুঝতে পারা যেত।

শেখর--কি?

অভয়--তোর মাথা।

শেখর--তুমি যদি এরকম বিচ্ছিরি ডিটেকটিভি কর, তবে আমি তোমার সঙ্গে কোনদিন কোন কাজে 'শেয়ার নিতে পারবো না।

অভয় মুখ টিপে হাসে--কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করবি তো?

অভয়ের প্রশ্নের উত্তরে শেখর যা বলতো, সেটা আর শেখরের বলা হলো না। কারণ, ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রকাশ মাস্টার।

প্রকাশ মাস্টারের চোখে আর সেই উজ্জ্বলতা হাসছে না। দৃষ্টিটা বেশ বিষণ্ণ। যেন অনেক আশা নিয়ে প্রকাশ মাস্টারের জীবনের একটা রহস্যময় ব্যস্ততা কোথাও ছুটে গিয়েছিল, আর, কোন আশার সাক্ষাৎ না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছে। প্রকাশের কপালে ছোট ছোট ঘামের বিন্দু টলমল করছে। ঠিকই, প্রকাশ মাস্টারের চেহারাটাকে একটা ক্লান্তির চেহারা বলে মনে হচ্ছে।

আনমনার মত কথা বলে প্রকাশ মাস্টার--তোমরা এখনও এখানে আছ?

বিমল--হ্যাঁ, প্রকাশদা।

শেখর--আপনি না আসা পর্যন্ত চলে যাই কি করে?

নীহার--ঘরের দরজা খোলা রেখে চলে যাওয়া তো উচিত নয়।

প্রকাশ মাস্টার হাসতে চেষ্টা করে।--আমি যখন বাইরে যাই তখন ঘরের দরজা খোলাই পড়ে থাকে।

অভয়--কেন স্যার?

প্রকাশ--তালা চাবি নেই। যাই হোক্, তোমরা এখন তাহলে...।

অভয়--আপনার ঘরের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রেখেছি।

প্রকাশ--খুব ভাল করেছ।

অভয়--আপনি কোথায় গিয়েছিলেন প্রকাশদা?

প্রকাশ--গিয়েছিলাম...এক ভদ্রলোকের কাছে একটা কথা জানবার জন্যে। কিন্তু, জানা গেল না।

অভয়--ভদ্রলোকের দেখা পেলেন না?

প্রকাশ--ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছি, কিন্তু...।

নীহার--কি স্যার?

প্রকাশ--তার কাছে একজনের এসে একটা কথা বলে যাবার ছিল, সেটা সে বলেনি ; বলতে আসেও নি।

অভয়--তাহলে হয়তো অন্য একদিন এসে বলে যাবে।

প্রকাশ--আমারও তাই মনে হচ্ছে। তাই ভেবেছি, আর একদিন গিয়ে খোঁজ নেব।

ছোট গলির ভিতরে এই ছোট ঘরের ভিতরে প্রকাশ মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত চার ছাত্রের চার চেহারা হঠাৎ চমকে ওঠে ; কারণ, নিকটের বড় সড়কের উপর একটা ছুটন্ত মোটরগাড়ির হর্ণের শব্দ চমকে উঠেছে।

নীহার--শৈলেশদার গাড়ি।

শেখর--বোধহয় কোর্টে যাচ্ছেন শৈলেশদা।

বিমল--এটা শৈলেশদার গাড়ির নতুন হর্ণ। কিন্তু আগের হর্ণের শব্দটাই মিষ্টি ছিল।

অভয়--আপনিও নিশ্চয় শুনেছেন প্রকাশদা।

প্রকাশ--কি?

অভয়--শৈলেশদার বিয়ে?

প্রকাশ--আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী শৈলেশবাবুর বিয়ে?

অভয়--হ্যাঁ।

প্রকাশ--কবে?

অভয়--কবে হবে সেটা শুনিনি। তবে একদিন হবে।

প্রকাশ--সুসংবাদ।

নীহার--হ্যাঁ স্যার, সবাই বলছেন সুসংবাদ। বাণীদির সঙ্গে শৈলেশদার বিয়ে হবে।

প্রকাশ মাস্টারের চোখের দুই তারায় যেন একটা জলন্ত বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে ওঠে।--বাণীদি কে? কোন্ বাণীদি?

অভয়--দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়, চমৎকার গান চমৎকার গলায় গাইতে পারেন যে বাণীদি। আমাদের, এই টাউনে ঐ গান আর কেউ গাইতে পারে না।

প্রকাশ মাস্টারের চোখের তারা আবার হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। যেন দুটো পাথুরে চোখের তারা। বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকবার পরে প্রকাশ মাস্টার যেন একটা নিঃশ্বাসের শব্দ সামলে নিয়ে কথা বলে—আচ্ছা, এস তোমরা।

ঘরের বাইরে এসে অভয় হাসতে থাকে।—বুঝেছি।

নীহার—কি?

চেঁচিয়ে ওঠে অভয়--না, কোন কথা বলবার সময় নেই। এইবার বাড়ি যাব ; কার সাধ্য রোধে মোর গতি? ছোটকাকার হাতে কানমলা থেকে বাঁচতে হলে...না, সত্যিই রে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

ছুটে চলে যায় অভয়।

নয়

বামাচরণবাবুর মেয়ে বাণীর সঙ্গে শৈলেশের বিয়ে হবে, এ জনরব আর চুপি-চুপি বা কানাকানি আলোচনার মধ্যে আবদ্ধ নয়। এ জনরব এই টাউনের একটা মুখরিত হর্ষ।

জনরবের চুপি-চুপি গুঞ্জরণের পালা কিন্তু অনেকদিন ধরে চলেছে। পুরো তিনটে মাস। কে জানে এই মুখরিত হর্ষের পালা আর কতদিন চলবে? এটাও তো তিনটে মাস ধরে চলছে। অভয় আর বিমলদের ক্লাস এইটের ফাইন্যাল পরীক্ষাটাও পার হয়ে গিয়েছে। ওরা পাশ করেছে। ওরা এখন ক্লাস নাইন।

প্রকাশের সেকেণ্ড মাস্টারীর জীবনের হিসাব ধরলে বোঝা যায়, তারও জীবনের একটা বছর এই শহরে পার হয়ে যেতে চলেছে। আর মাত্র একটি মাস বাকি ; টেম্পোরারী প্রকাশের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। কারণ, সেক্রেটারী শৈলেশ মাত্র এক বছরের জন্য প্রকাশের এই সেকেণ্ড মাস্টারীর কাজটা মঞ্জুর করেছিল। প্রকাশকে একথাও বেশ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল শৈলেশ—মাত্র এক বছর। এর পর আমাদের ইচ্ছা। যদি আমরা ভাল বুঝি, তবে আপনার চাকরির মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেব। আপনি কিন্তু দাবি করতে পারবেন না যে...।

প্রকাশও বলেছিল—আজ্ঞে না, আমি কোন দাবি করবো না।

আজকাল আর শুধু সন্ধ্যের আলো-আঁধারের আবরণের ভেতর দিয়ে কুণ্ঠিত আগ্রহের মত নয় ; শৈলেশের গাড়ি নতুন হর্ণের শব্দ ছড়িয়ে সকালবেলাতেও বামাচরণবাবুর সামান্য চেহারার বাড়িটার ফটকের কাছে এসে থামে। বাণীরও চোখে আর সেই ভীরু বিস্ময়ের চিহ্ন নেই। অনেকেই দেখতে পেয়েছে, প্রকাশ যখন আসে তখন বাণীও যেন সুস্মিত অভ্যর্থনার মত বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ছোট শহরের মুখরিত হর্ষটার মনে যে সামান্য একটু সন্দেহ ছিল, সেটুকুও আর রইল না, যেদিন দেখা গেল যে, শৈলেশের বাড়িকে উৎসবের সাজ পরাবার জন্য কলকাতা থেকে

ডেকরেটার এসেছে। রঙীন বেলোয়ারির কত ঝাড়বাতি, কত চীনে লণ্ঠন, কত চাঁদমালা আর কত শোলার ফুলের বড়-বড় মালা।

কলকাতা থেকে শৈলেশের এক জেঠামশাই আর জেঠতুতো বোনেরা এসেছে। শৈলেশের মা বিনয় ভট্চাজকে বাড়িতে ডেকে শুভদিন আর শুভলগ্নের কথা আলোচনা করেছেন। কোন সন্দেহ নেই, আর কদিন পরেই এই ছোট শহরের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সব ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রজাপতির ছবি-আঁকা নিমন্ত্রণের চিঠি পৌঁছে যাবে।

শৈলেশের জেঠামশাই নৃপতিবাবু নিজেও বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করবেন ; একথা শৈলেশের মা একদিন বিমলের মা'র কাছে বলেছেন।

বাণীর চোখ দুটোও নিশ্চয়ই সন্ধ্যা আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে এই আসন্ন উৎসবের ঝিকিমিকি হাসিটাকে দেখতে পায়। কিন্তু, কী আশ্চর্য, বাণীর এই সৌভাগ্যময় উৎসবের সব আয়োজন আর ব্যস্ততার নেপথ্যে যেন একটা করুণ ছায়া দাঁড়িয়ে আছে, আর, কি-যেন বলতে চাইছে। ভাবতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে বাণী।

অন্ধ নন্দী সাহেবের কি মাথা খারাপ হয়েছে? তা না হলে এরকম উদ্বিগ্নের মত বারবার বাণীর কাছে চিঠি পাঠাবেন কেন? সব চিঠিতে সেই একই কথা--কই. তুমি তো আর এলে না? আমার চিঠির কোন উত্তরও দিলে না। কিন্তু আমি জানি, এটা তোমার পক্ষে মস্ত সুযোগ। ছেলেটি খুবই বিদ্বান ; তার কাছে পড়লে তুমি নিশ্চয় ভালভাবে বি-এ পাশ করবে।

অসম্ভব। অন্ধ নন্দী সাহেবের এই অনুরোধের যে আর কোন অর্থ হয় না। বি-এ পড়বার আর পাশ করবার সুযোগে যে একটা উৎসব হয়ে বাণীর জীবনের কাছে চলে এসেছে।

অন্ধ নন্দী সাহেবের শেষ চিঠিটার কথাগুলি যেন কারও দুঃসহ অভিমানের প্রতিধ্বনি।--মনে হচ্ছে, তুমি এই ছেলেটির কাছে পড়তে চাও না। হয়তো কোন বাধা আছে। যদি তাই হয়, তবে জানিয়ে দিও। কারণ, ছেলেটি তাহলে...।

নন্দী সাহেবের চিঠির শেষ কথাগুলি পড়তে গিয়ে বাণীর চোখ দুটো কেঁপে উঠেছিল।--ছেলেটি তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারবে।

কে এই ভয়ংকর গোপন উপকারের স্বপ্নধর? আজ পর্যন্ত তার নামটা স্পষ্ট করে লিখে জানাতে পারলেন না নন্দী সাহেব। সন্দেহ না হয়ে পারে না, এমন মানুষ বাণীর চেয়েও ভীরু-মনের একটা মানুষ। চোখের সামনে এসে দাঁড়াবার আর মুখ তুলে কথা বলবার সাহস নেই ; এ যেন একটা লোভী অপরাধের করুণ দাবী। এমন দাবীর উত্তর জানাতেও যে ভয় করে।

না, উত্তর দেওয়া উচিত নয়। নন্দী সাহেবের নিজেরই বুঝে নেওয়া উচিত যে, বাণীর পক্ষে এভাবে এক নিতান্ত অপরিচিত রহস্যের উপকার নেওয়া সম্ভব নয়। এই শেষ চিঠির উত্তর না দিলেই ভাল হবে। বুঝে নিতে পারবেন নন্দী সাহেব ; বাণী আর তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না বলেই চিঠির উত্তর দিল না।

না, চিঠির উত্তর না দেওয়া অন্ধ নন্দী সাহেবের একটা সদিচ্ছাকে অপমান করা। আর, বাণীর প্রাণটা তো ঠিক নন্দী সাহেবকে সন্দেহ করছে না। কাজেই, লিখে জানিয়ে দিতে দোষ কি?

ভাবতে গিয়ে বাণীর চোখে সেদিনের আকাশের সন্ধ্যাতারাও যেন একটু করুণ হয়ে যায়। কি বিশ্রী একটা দুর্বলতার মন যেন বাণীর চোখের হাসিকেও বিষণ্ণ করে দেয়।

কিন্তু আর ভেবে লাভ কি? নেপথ্যের এই ভয়ংকর আহ্বানকে নিশ্চিন্ত করে দেওয়াই ভাল। শ্রদ্ধাস্পদেষু--নন্দী সাহেবের কাছে চিঠি লেখে বাণী।--আমার এখন কারও কাছে পড়বার দরকার নেই। আপনি সুখী হবেন যে, আমার বি-এ পড়বার এখন আর কোন অসুবিধা নেই।

দশ

যে উৎসবটা সত্যিকারের একটা জাঁকাল উৎসব হয়ে দেখা দেবে, সেটা হলো বউ-ভাতের উৎসব ; অর্থাৎ রঙীন বেলোয়ারীর ঝাড়বাতি দিয়ে সাজানো শৈলেশের বাড়ির উৎসব। সেটা আর দু'দিন পরে দেখা দেবে। আজ শুধু পরলোকগত মুহুরী বামাচরণবাবুর এই সামান্য চেহারার বাড়িটার প্রাণে ধূপ দীপ আর উলুরবের সামান্য একটা উৎসব জেগেছে। বাণীর পিসি কিছু টাকা খরচ করেছেন। তাই কিছু নিমন্ত্রিতের ভিড়ও হয়েছে।

অভয় আর বিমল, নীহার আর শেখরকে বাণী নিজেই নেমন্তন্ন করেছিল। হেসে হেসে নেমন্তন্নের কথা বলতে গিয়ে বাণীর চোখ দুটো জলে ভিজে গিয়েছিল। অভয়ও আশ্চর্য হয়ে বলেছিল--এ কি বাণীদি? এমন চমৎকার একটা নেমন্তন্নের কথা বলতে গিয়ে আপনি কেঁদে ফেললেন কেন?

বাণী হাসতে চেষ্টা করে।--সত্যিই ভাই, কেন যেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

অভয়--ভাল লাগছে না?

বাণী--না, ভাল লাগছে বইকি, কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করছে।

অভয়--ওটা ভয় নয় বাণীদি, ওটা হলো লজ্জা! বিয়ের সময় সব মেয়েরই এরকম লজ্জা হয়।

বাণীও হাসে--হ্যাঁ, বেশ একটু লজ্জাই করছে।

টক-পেয়ারার গাছের গায়ে একটা বড় বাতি ঝুলছে। বারান্দার উপর সতরঞ্চ পাতা হয়েছে। অনেকেই এসেছেন। নিমন্ত্রিত হয়ে অভয়দের স্কুলের সব টীচার এসেছেন। বাণীর পিসিমা জানেন, বামাচরণবাবুর সঙ্গে স্কুলের টীচারদের খুব প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁদের নিমন্ত্রণ জানাতে ভুলে যাননি পিসিমা।

অভয় বলে--বাণীদির পিসিমা কিন্তু একটা ভুল করেছেন।

বিমল--কি?

অভয়--প্রকাশদাকেও নেমন্তন্ন করা উচিত ছিল।

নীহার--আমার বিশ্বাস, প্রকাশদাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

অভয়--তাহলে প্রকাশদা আসবেন না কেন?

শেখর--কে জানে কেন।

বিমল--অথচ একদিন কোন নেমন্তন্ন না পেয়েও জলধর স্যারের বিদায় সভাতে বেশ তো সশরীরে হাজির হতে পেরেছিলেন।

অভয়--বাণীদির সঙ্গে একবার দেখা করে জিজ্ঞাসা করলে হয় ; সত্যিই সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে কিনা।

নীহার--বাণীদিকে কেন জিজ্ঞেস করবো? বাণীদি কি নিজের থেকে ইচ্ছে করে আর নাম ধরে ধরে সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন? কখ্‌খনো না।

শেখর--তবে বাণীদির পিসিমাকে জিজ্ঞেস করি ; উনিই তো শ্যামবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আর বাড়ি-বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করেছেন।

বিমল--ঐ তো, বাণীদির পিসিমা সরোজকাকার সঙ্গে কথা বলছেন।

এগিয়ে যায় অভয়, আর, বাণীর পিসিমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে একেবারে সোজা ভাষায় জিজ্ঞেস করে ফেলে--আমাদের স্কুলের সব স্যারকে নেমন্তন্ন করে শুধু সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদাকে বয়কট করলেন কেন?

পিসিমা ভ্রূকুটি করে তাকান--কে তুমি?

অভয়--আমিও একজন গেস্ট, যদিও আপনি আমাকে চেনেন না। কথা হলো, আমরা খুব দুঃখিত ; সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদাকে বাদ দিয়ে আপনি খুব ভুল করেছেন।

পিসিমা--আমি তো জানি না, কে তোমাদের প্রকাশদা আর কে তোমাদের বিকাশদা। বাণী যাদের নাম বলেছে, যারা বাণীর বাবার চেনা-মানুষ ছিল, তাদেরই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু তুমি কেন হঠাৎ এসে ঐটুকু মুখে এত বড়-বড় বাজে কথা বলছো?

কি-যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় অভয়। সরোজবাবু বলেন--তুমি বড়দের সঙ্গে এভাবে কথা বল কেন অভয়? খুব অন্যায়।

পিসিমা বলেন--একটু বেশি বাচাল বলে মনে হচ্ছে।

এই সব ভর্ৎসনার কথা শুনেও অভয় কোন উত্তর দেয় না ; অভয়ের দুই চোখ যেন বিস্মিত হয়ে দেখছে একটা ঘরের ভিতরে আলোর কাছে বসে আছে ফুল্লহাসির ছবির মত একটি সুন্দর মূর্তি। কী চমৎকার সেজেছেন বাণীদি।

অভয়কে দেখতে পেয়েছে বাণী। তাই হাত তুলে ডাকছে।

এগিয়ে যায় অভয়।

বাণী বলে--কখন এলে অভয়?

অভয়--এই তো কিছুক্ষণ আগে।

বাণী--বিমল নীহার আর শেখর আসেনি?

অভয়--এসেছে।

বাণী--না এলে কিন্তু আমি খুব দুঃখিত হতাম।

অভয়--আমরা কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে দুঃখিত।

বাণী--কি ব্যাপার?

অভয়--আমাদের স্কুলের সব টীচারদের নেমন্তন্ন করা হলো ; আপনিই নাকি সবারই নাম বলে দিয়েছেন ; তবে প্রকাশদা বাদ গেলেন কেন?

বাণী--প্রকাশদা কে?

অভয়--আমাদের সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদা।

বাণী--আমি ভাই সত্যিই জানতুম না যে, প্রকাশদা নামে কোন টীচার আছেন।

অভয়--তাই বলুন! কিন্তু...।

বাণী--কি?

অভয়--প্রকাশদার নামটা আপনি এতদিনের মধ্যে, এই এক বছরের মধ্যেও শুনতে পাননি, এটা আশ্চর্য।

বাণী--আশ্চর্য কেন?

অভয়--প্রকাশদা যদিও নতুন টীচার ; কিন্তু আজ কে না প্রকাশদার নাম জানে? যাঁর লেকচার শুনে জিনরাজ দাস অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম আপনি জানেন না, বাস্তবিক আপনি আজকাল আমাদের টাউনের ভাল-মন্দ কোন খবরই রাখেন না দেখছি।

বাণীর চোখ দুটো অপলক হয়ে অভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অভয়ের আবোল-তাবোল অভিযোগের ভাষাটা যেন একটা নিদারুণ অর্থময় প্রলাপের ভাষা। আর, যেন অনেক দূরের কুয়াশার মধ্যে একটা মূর্তিকে এইবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই মূর্তিটাই কি সেই ভয়ানক গোপন অভিসন্ধির মূর্তি? বক্তৃতা দিয়ে জিনরাজ দাসকেও অবাক করে দেয়, এমন একজন মানুষ এই শহরে প্রায় এক বছর ধরে আছে ; অন্ধ নন্দী সাহেবের সেই অদ্ভুত অনুরোধের প্রথম চিঠিটাও সে প্রায় এক বছর আগে এসেছিল। সন্দেহ করতেও যে মনটা বিশ্রী অস্বস্তিতে ভরে যায় ; অভয়দের সেকেণ্ড স্যার, প্রকাশদা নামে এই ভদ্রলোকটি সেই ভয়ংকর অনুরোধের মানুষটা নয় তো? কিন্তু মানুষ কি কখনও এমন অনুরোধ করে? চেনা-শোনা নেই, পরিচয় জানা নেই, একজন মানুষ বাণীর জীবনের একটা সংকল্পের ব্রতকে সফল করে দেবার জন্য একটা বিনাসর্ত উপকারের প্রতিজ্ঞা হয়ে কাছে আসতে চায়, এ তো একটা

সাংঘাতিক ছলনার চেষ্টা আর ইচ্ছা।

অভয় বলে—প্রকাশদা কিন্তু ভয়ানক অহংকারী। তার মানে অদ্ভুত খেয়ালী। কাউকে প্রাইভেট পড়ান না। বাবা কুড়ি টাকা মাইনে সেধেছিলেন, তবু আমাকে পড়াতে রাজি হননি প্রকাশদা।

--তাই বল। হাঁপ ছাড়ে বাণী। কি যেন ভাবতে গিয়ে লজ্জা পেয়েছে বাণীর মনের মিথ্যে সন্দেহটা। বাণীর অপলক চোখের শিথিল দৃষ্টিটা চঞ্চল হয়ে হেসে ওঠে। বাণী বলে--তোমরা কিন্তু ও বাড়িতে মাঝে মাঝে যেও অভয়।

অভয়--কোন্ বাড়িতে?

বাণী হাসে—তোমাদের শৈলেশদার বাড়িতে।

—কিন্তু আপনি কি আর আমাদের সঙ্গে কথা বলবার চান্স পাবেন?

--খুব পাব।

--আর পেয়েই বা লাভ কি?

--কি বললে?

--বলছিলাম...কথাটা এই যে...আমাদের কাছে আর আপনার গল্প করবার কি-ই বা থাকবে? বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা শুধু বর ছাড়া আর কারও সঙ্গে গল্প করতে চায় না।

—বেশ তো, কিন্তু তোমরা তো বলতে পারবে।

—আমরাই বা আর কি বলতে পারি?

বাণী হাসে—ধর অন্তত টাউনের ভাল-মন্দ দুটো খবর তো দিতে পারবে।

অভয়—তা পারবো।

চলে যায় অভয়। আর বাণীর দুই চোখে যেন এক খুশির দীপালির হাসি ঝিকমিক করতে থাকে।

শৈলেশ এখনও আসেনি। দশ দিন হলো বোধহয়, সেই যে সন্ধ্যা দেখা দেবার আগেই হঠাৎ একবার এসেছিল শৈলেশ, তারপর আর আসেনি। শৈলেশ নিজেই বলেছিল--এই কদিন আর আসবো না।

বাণী--কেন?

শৈলেশ—তোমাকে নতুন করে পাবো বলে। মাঝের এই দশটা দিন বাদ দিয়ে একেবারে লগ্নের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছে যাব।

কথা বলতে গিয়ে হাসছিল শৈলেশ। বাণীরও মনে হয়েছিল, যেন রঙীন বিকেলের গোধূলিময় একটা ভালবাসার জগৎ হাসছে। বাণীর জীবনের সব সুখের অঙ্গীকার হাসছে। এই প্রথম জীবনে যাকে ভাল না বেসে থাকতে পারলো না বাণী, সেই মানুষটি হাসছে। মুহুরী বামাচরণবাবুর মেয়ের অসহায় জীবনটাকে করুণা করে নয়, অনুগ্রহ করে নয় ; একটা গর্ব বলে মনে করেই সেই মেয়েকে চিরকালের আপন করে নিতে চেয়েছে শৈলেশ। সত্যিই তো, শৈলেশের মনটাও যেন ভোরের আকাশের মত কাঁচা আলোর মায়াতে ভরে আছে আর হাসছে। ছেলেমানুষের মনের মত যত খোলা-মেলা সাধ শখ আর ইচ্ছের মন। এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ের স্বামী হবে শৈলেশ ; এরকম একটা সামান্য আশাকেও জীবনের একটা মস্ত গর্বের আশা করে নিয়েছে শৈলেশ।

অভয়ের কাকিমা আর বিমলের মা ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসেন—তুমি এবার ওঘরের ভিতরে গিয়ে বসো বাণী।

বাণী—কেন মাসিমা?

অভয়ের কাকিমা মুখ টিপে হাসেন—বর আসছে। ব্যাণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছো না?

বিমলের মা বলেন—এই বারান্দাতে বরযাত্রীরা বসবেন। কাজেই...।

সত্যিই ব্যাণ্ডের শব্দ। কোন সন্দেহ নেই, একটা মুখর উল্লাসের মিছিল এগিয়ে আসছে, সন্ধ্যার বাতাসে সেই উল্লাসের ব্যস্ততার স্বর যেন ঢেউ তুলে তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে বাণীর বুকের পাঁজরের কাছে এসে ঠেকেছে। কি আশ্চর্য, বাণীর বুকটা চমকে ওঠে, চোখ দুটো ভিজে যায়।

বিমলের মা বাণীর হাত ধরে আদরের স্বরে বলেন--চল।

ওঘরের ভিতরে একা-একা অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকবার পর বাণীর চোখে আবার খুশি দীপালির আলো জেগে ওঠে। এসেছে শৈলেশ। সারা বাড়িতে ছুটোছুটির সাড়া জেগেছে। ফটকের কাছে ব্যাণ্ডের শব্দ আরও মত্ত হয়ে উঠেছে। বিমলের মা আর অভয়ের কাকিমা মাঙ্গলিক আয়োজনের কাজে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

বাণীর জীবনের সৌভাগ্য আর ভালবাসা একসঙ্গে মিলে-মিশে উৎসব হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু বুকের ভিতরে একটা ভয় ছম ছম করে। আর, যেন কোন সাংঘাতিক মায়াহরিণের ডাক শুনতে না হয়। সেই কুৎসিত মতলবটা আর যেন একটা করুণ আহ্বান হয়ে বাণীর মনের শান্তি নষ্ট না করে। নন্দী সাহেব লিখেছেন, সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে চায়। এইবার তার চলে যাওয়াই তো উচিত। বাণী তো সেই আহ্বানকে ঘৃণা করে আর তুচ্ছ করে স্পষ্ট ভাষায় আপত্তির কথা জানিয়ে দিয়েছে। অভয়দের স্কুলের সেকেণ্ড স্যার, ওদের ঐ প্রকাশদার যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে, তবে...। ছি ছি, কী বিশ্রী সন্দেহ! কে বললে সেই বিশ্রী চেষ্টাটা অভয়দের স্কুলের সেকেণ্ড স্যার এই বেচারা প্রকাশেরই চেষ্টা? একটা নিরীহ মানুষকে এরকমের সন্দেহ করবার কোন মানে হয় না। জানলে শৈলেশও যে বাণীকে পাগল বলে সন্দেহ করবে।

বিমলের মা এসে বলেন--এবার তৈরী হও বাণী। পাত্রীর ডাক পড়েছে।

এগার

বিমল নীহার আর শেখর প্রথমে রাজী হয়নি, কিন্তু অভয়ের ইচ্ছের চাপে পড়ে শেষে রাজি হয়েছে। বিয়ে-বাড়ির নেমন্তন্নের লুচির গন্ধও ওদের আটকে রাখতে পারেনি। ওরা সোজা হেঁটে এসে সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদার ঘরে ঢুকেছে। অভয় বলে--আমরা না হয় লাষ্ট ব্যাচে খাব। তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু...।

বিমল--কি?

অভয়--কিন্তু প্রকাশদা এখন কি করছেন, সেটা দেখতেই পাব না, যদি দেরি করে ফেলি।

শেখর--এই তো, তুই আবার মিছিমিছি ডিটেকটিভি শুরু করলি।

অভয়--মিছিমিছি নয় ভাই।

প্রকাশ মাস্টার ঘরে নেই। ঘরের ভিতরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। প্রকাশের বিছানার উপরে পড়ে থাকা একটা বস্তুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই অভয় চেঁচিয়ে ওঠে।--এই তো, ঠিক বুঝেছি, ঠিক ধরে ফেলেছি!

বিমল--কি? কি? ওটা কিরে?

অভয়--দেখছিস না মোটরবাসের টিকিট। গয়া যাবার টিকিট।

শেখর--সেই পুরনো টিকিটটা?

অভয়--আরে না। দেখছিস না, কালকের তারিখ। ফার্স্ট সার্ভিসের টিকিট ; তার মানে কাল সকালেই গয়া চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন প্রকাশদা।

নীহার--এর মানে কি?

অভয়--মানে বুঝতে তোদের অনেক দেরি আছে। সে ব্রেন তোদের নেই।

বিমল--সত্যি, মা কালীর দিব্যি, কাউকে বলবো না, তুই বল অভয়।

অভয়--কি বলবো?

বিমল--এর মানে কি?

অভয়--বাণীদিব গান শুনলেন, বাস্, এই টাউনেই রয়ে গেলেন প্রকাশদা। আবার বাণীদির যেই বিয়ে হলো, অমনি এই টাউন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন প্রকাশদা। এর তো একটা মানে আছে ভাই।

নীহার--উঃ, তুই রবার্ট ব্লেকের চেয়েও সাংঘাতিক।

অভয়--কিন্তু প্রকাশদাকে তো চলে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

শেখর--আমরা কি করতে পারি বল্?

অভয়--আমরাই করতে পারি।

নীহার--কি করতে পারি?

অভয়--প্রকাশদাকে একটু ভুলিয়ে-ভালিয়ে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, ধরে রাখতেই হবে। বুঝছিস না, হেড স্যার যদি আবার পোয়েট্রি পড়াতে শুরু করেন। তবে আমাদের কী দশা হবে?

বিমল--বুঝলাম তো, কিন্তু...

অভয়--প্রকাশদা এখন কোথায় গেলেন, একটু খোঁজ করা দরকার।

বিমল--এখনই?

অভয়--হ্যাঁ।

কিন্তু কোথায় প্রকাশ মাস্টার? এই ছোট শহরের কোন্ দিকে কোন্ প্রান্তে, কোন্ নিরালায় এখন বসে আছেন এই রহস্যময় প্রকাশদা? কি দেখছেন, কি ভাবছেন, তাই বা কে জানে?

বিমল বলে--মনে হচ্ছে প্রকাশদা নন্দীসাহেবের বাড়িতে বই আনতে গিয়েছেন।

অভয়--অসম্ভব। দেখছিস না, একটাও বই আর এখানে নেই। নিশ্চই সব বই নন্দীসাহেবকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছেন প্রকাশদা। যে মানুষ কাল সকালেই গয়া চলে যাবে, সে আজ আবার বই আনতে যাবে কেন?

শেখর--ঠিক কথা কিন্তু...।

অভয়--ভাবলে কিছুই বুঝতে পারা যাবে না। সার্চ করে প্রকাশদাকে বের করতে হবে।

না, সার্চ করেও প্রকাশদাকে পাওয়া গেল না। যে হোটেলে খায় প্রকাশ মাস্টার সেই হোটেলেও পাওয়া গেল না। হরিপদবাবুর গ্রামোফোনের যে দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে রেকর্ডের গান শোনে প্রকাশ সে দোকানের সামনেও প্রকাশ নেই। নন্দী সাহেবের বারান্দাতে নন্দী সাহেব একা বসে আছেন, প্রকাশ নেই। চকের কাছে বাস-স্ট্যাণ্ডের আশে-পাশেও প্রকাশ নেই। ছোট শহরের বুকের সব বাতাসকে উতলা করে দিয়ে ব্যাণ্ডের যে শব্দ বাজছে, সেই শব্দটাই বোধহয় প্রকাশ মাস্টারকে এক একটা ফুৎকার দিয়ে ঠেলে ঠেলে এই শহরের সীমা ছাড়িয়ে দূরের কোন নিভৃতে সরিয়ে দিয়েছে।

ঠিকই, হতাশ হয়ে আবার বিয়েবাড়ির দিকে ফিরে যাবার জন্য চার সন্ধানীর চারটে ছোট-ছোট মূর্তি যখন ক্যাথলিক গির্জার বাগানের পাঁচিলটার গায়ে হেলান দিয়ে সামনের জ্যোৎস্নাভরা খোলা ডাঙ্গা আর গয়া রোডের দু'পাশের আমের গাছের ছায়ার ভিড়ের দিকে তাকায়, তখন দেখতে পাওয়া যায়, কে যেন সেই পথের উপর একটা আবছায়া হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আবছায়াটা পথ থেকে নেমে ডাঙ্গার উপর একটা পাথরের উপর বসলো, যেন দূরের পাহাড়ের চূড়াটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বিমল বলে--একটা আমচোর বোধ হয়।

সন্দেহটা অহেতুক নয়। গয়া রোডের দু'পাশের আমের গাছগুলি এখন কাঁচা আমের ভারে নুয়ে পড়েছে। আমের জমাদার রফিক মিয়াঁ লাঠি হাতে নিয়ে সকাল বিকেল আর

সারারাত পাহারা দিয়ে বেড়ায় ; তবু আম চুরি হয়।

শেখর বলে--লোকটা আমচোর, না কবি?

হেসে ফেলে সবাই। অভয় বলে--কিন্তু প্রকাশদা তো শুধু পোয়েট্রি পড়ান, পোয়েট্রি লেখেন কি?

নীহার--হয়তো লেখেন। কে জানে?

কিন্তু সাহস করে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেই তো হয়। কিংবা, প্রকাশদা বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাক দিলেই তো হয়।

এগিয়ে যায় চার ছাত্র। কিন্তু চেঁচিয়ে ডাক দিতে হয় না। বুঝতে অসুবিধে নেই, প্রকাশদার চোখের চশমাটাকে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই, প্রকাশদাই বসে আছেন।

কাছে এগিয়ে যেয়ে অভয় বলে--আমরা আপনাকে খুঁজছি প্রকাশদা।

চমকে উঠে, মুখ ফিরিয়ে অভয় আর তিন সঙ্গীর দিকে তাকায় প্রকাশ মাস্টার।--তোমরা? তোমরা এখানে কেন? কিসের জন্যে? আমাকে খুঁজছো কেন?

বিমল--আপনার ঘরে গিয়ে দেখলাম আপনি নেই। তাই...।

প্রকাশ মাস্টারের গলার স্বরে একটা বিরক্তভাব রূঢ় হয়ে বেজে ওঠে,--তাই বলে এখানে এসে আমাকে বিরক্ত করতে হবে?

অভয়--আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি প্রকাশদা।

প্রকাশ--তবে কেন এসেছো?

অভয়--একটা দুঃখের কথা বলতে এসেছি।

প্রকাশ--কিসের দুঃখের কথা?

অভয়--আপনি চলে যাচ্ছেন কেন প্রকাশদা?

প্রকাশ--অ্যাঁ? কে বললে আমি চলে যাচ্ছি?

অভয়--আপনি গয়া যাবার টিকিট কিনেছেন।

প্রকাশ--কে বললে?

অভয়--দেখলাম, আপনার ঘরের বিছানার ওপর...।

প্রকাশ--ও...হ্যাঁ...একটা টিকিট কিনেছি বটে।

অভয়--সেই জন্যেই বলছি, আপনি যদি চলে যান তবে আমাদের পড়ার খুব ক্ষতি হবে।

প্রকাশ মাস্টার হেসে ফেলে, আর বেশ নরম স্বরে জবাব দেয়।--তা কি-আর করবো বল ভাই, আমার চাকরিটাই যে এক-বছরের মেয়াদের চাকরি। হিসেব করে দেখেছি, সে মেয়াদ আজই শেষ হয়েছে। কাজেই, আমার আর এখানে থাকবার মানে হয় না।

অভয়--কিন্তু...।

প্রকাশ মাস্টারের গলার স্বর এইবার যেন করুণ হয়ে কেঁপে ওঠে।--কিন্তু তোমাদের দুঃখ করার দরকার নেই অভয়। টেম্পোরারি চাকরির এই তো নিয়ম। শুধু দুদিনের পালা।

অভয়--কিন্তু আপনি এভাবে একেবারে সায়লেণ্টলি চলে যাবেন কেন? আমরাই বা সায়লেণ্টলি আপনাকে চলে যেতে দেব কেন?

প্রকাশ--বুঝলাম না।

অভয়--জলধর স্যারের যেমন ফেয়ারওয়েল হয়েছিল, আপনারও তেমনি ফেয়ারওয়েল হবে।

প্রকাশ হাসে--এই তো ভাল ফেয়ারওয়েল হয়ে গেল।

নীহার--কি বললেন স্যার?

প্রকাশ--এই যে তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ।

অভয়--না প্রকাশদা। এতে হয় না। আপনাকে আমরা সভা করে ফেয়ারওয়েল দেব।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে প্রকাশ মাস্টার--সভা! ওরে বাবা! কোন দরকার নেই।

অভয়--দরকার আছে প্রকাশদা।

প্রকাশ--না, ও সভাতে কোন ভদ্রলোকের আসতে সাহস হবে না।

অভয়--কেউ না আসুক, অন্তত বাণীদি তো আসবেন।

প্রকাশ--কি বললে?

অভয়--অন্তত বাণীদিকে আমরা জোর করে আনতে পারবো ; আর, বাণীদিকে দিয়ে সেই গানটাও গাওয়াতে পারবো। দিনগুলি মোর...।

প্রকাশ মাস্টারের মূর্তিটা হঠাৎ যেন সব নিঃশ্বাসের চাঞ্চল্য হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। দূরের পাহাড়ের নিরেট আর ভরাট পাথুরে চূড়াটার দিকে তাকাতে গিয়ে আকাশের ছোট চাঁদটার দিকে তাকিয়ে ফেলেছে প্রকাশ মাস্টার। তাই চোখ দুটোও চিকচিক করছে।

শেখর বলে--আপনি তাহলে কালই চলে যাবেন না স্যার।

বিমল বলে--আপনি অন্তত আর সাতটা দিন থাকুন প্রকাশদা।

নীহার বলে--ফেয়ারওয়েলের জন্য চাঁদা তুলতে তো আমাদের চারটে দিন লাগবে স্যার।

প্রকাশ মাস্টার ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়।--আচ্ছা।

বার

কলকাতা থেকে এসেছিল যে ডেকরেটার, সে তার রঙীন বেলোয়ারীর বাতি আর চাঁদমালার স্তূপ সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছে। উৎসব শেষ হয়েছে। ছোট শহরটার উপরে এই কদিন ধরে যে একটা ব্যাকুল বসন্ত বাতাসের ঝড় বয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন সব শান্ত। বাণীর সৌভাগ্য নিয়ে মেয়ে মহলে আলোচনার ব্যাকুলতাও থিতিয়ে এসেছে। বাণীর পিসিমা দুমকা ফিরে গিয়েছেন। বামাচরণবাবুর সেই সামান্য চেহারার বাড়িটার সামনে পাঁচিলে গা ঘেঁষে টক-পেয়ারার গাছটা একেবারে একলা হয়ে রাতের বাতাসে গা দুলিয়ে মট্‌মট্‌ শব্দ করে। এ বাড়িতে আর বাতি জ্বলে না। বাড়ির সব জানালা আর দরজার কপাট বন্ধ। বারান্দাতে নিরেট অন্ধকার।

কিন্তু শৈলেশের দোতলা বাড়ির একটি ঘরের খোলা জানালা মাঝরাত পর্যন্ত নতুন আলোর খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে হাসে। বাঁশের জাফরি বেয়ে আইভি লতার দল জানালার গোড়া পর্যন্ত লতিয়ে উঠেছে আর ঝাঁকড়া হয়ে ঝুলে পড়েছে। সেই লতার উপর দিনের বেলায় শত শত রঙীন ফড়িং উড়ে বেড়ায় ; আর সন্ধ্যা হলেই ঘরের ভিতর থেকে নতুন একটা রঙীন বাতির লতার উপর আলো ছড়িয়ে পড়ে। বুঝতে অসুবিধে নেই, ঐ ঘরের ভিতরে একটা উৎসব চিরন্তন হয়ে গিয়েছে।

দুদিন সন্ধ্যাবেলা বাণীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য শৈলেশের এই বাড়ির ফটক পর্যন্ত এসেই ফিরে গিয়েছে অভয় আর বিমল, নীহার আর শেখর। দোতলার এই ঘরের জানালাটার দিকে তাকাতে গিয়ে ওরা বেশ আশ্চর্যও হয়েছে। ঐ ঘরের ভিতরে রঙীন আলোর একটা স্বপ্নপুরীর মধ্যে বাণীদি বসে আছেন। ইস্‌, মানুষের অবস্থার কী অদ্ভুত চেঞ্জ হয়ে যায় রে বিমল! ফিসফিস করে অভয়। বিমল বলে--বাণীদি আর আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন কিনা কে জানে?

ওরা এসেছিল বাণীদির কাছে এসে প্রকাশ মাস্টারের ফেয়ারওয়েলের কথাটা বলতে ; সেই ফেয়ারওয়েলে বাণীদিকে গান গাইতে রাজি করাতে। আর, বাণীদির কাছ থেকে কিছু চাঁদাও আদায় করতে।

প্রকাশ মাস্টারের বিদায় সম্বর্ধনার জন্য চার ছাত্রের মাথায় যে-সব প্ল্যান দেখা দিয়েছে,

তার কিছু খবর ওরা এরই মধ্যে প্রচার করে ফেলেছে। হেড স্যারও কিছু শুনেছেন। তিনি দুঃখ করেছেন, প্রকাশ মাস্টার কেন আর স্কুলে আসছে না ; একটা চিঠি দিয়েও কোন কথা জানাচ্ছে না! যদি চলেই যাবে প্রকাশ মাস্টার, তবে অন্তত ভদ্রতার খাতিরে একবার সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে সে-কথা জানিয়ে আসা উচিত ছিল। সে-সব না করে, কয়েকটা চ্যাংড়া ছাত্রকে দিয়ে বিদায়-সভা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে প্রকাশ, এটাই বা কেমনতর ব্যাপার? ছেলেগুলো সেক্রেটারীর বাড়িতে দু'বার গিয়েছিল। ওরা সেক্রেটারীকে কথাটা বলেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সেক্রেটারীই বা কি বললেন, এখনও জানতে পারেননি হেড স্যার। এটাও ঠিক, সেক্রেটারী যদি না বলেন, তবে প্রকাশ মাস্টারের বিদায়-সভার জন্যে চাঁদা দেওয়া উচিত হবে না। ছোঁড়ারা অবশ্য একটা আশ্চর্য কথা বলছে ; প্রকাশ মাস্টারের বিদায় সভাতে সেক্রেটারীর স্ত্রী বাণীই নাকি গান গাইবে। ব্যাপারটা যে সত্যিই একটা ধাঁধা।

প্রকাশ মাস্টার মাত্র সাতটা দিনের অপেক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ; এরই মধ্যে ফেয়ারওয়েল সেরে ফেলতে হবে ; কিন্তু পাঁচটা দিন যে পার হয়েই গেল। আর মাত্র দুটো দিন হাতে আছে। এর মধ্যে, সত্যিই তো, কী যে ব্যবস্থা করা হবে আর কেমন করে হবে, ভাবতে গিয়ে চার সুহৃদের দুশ্চিন্তাও ছটফট করে উঠতে থাকে। আর দেরি করলে চলবে না, বাণীদির সঙ্গে দেখা করতেই হবে, প্রকাশদার ফেয়ারওয়েলের কথাটা বলতে হবে, গান গাইতে রাজি করাতেই হবে আর চাঁদা নিতেই হবে। তারপর আর কোন সন্দেহ থাকবে না যে, সেক্রেটারী শৈলেশদাও রাজি হয়ে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে সব স্যারও চাঁদা দিতে রাজি হয়ে যাবেন। প্রকাশদার বিদায়-সভাতে বেশ ভিড় হবে। দীননাথবাবু নিশ্চয় চমৎকার একটা দুঃখের বক্তৃতা করবেন।

আবার সেক্রেটারী শৈলেশের বাড়ির ফটকের কাছে চার ছাত্রের জটলা ফিসফিস করে আলোচনা করে।—ঐ যে, জানালাতে বাণীদিকে দেখা যাচ্ছে।

—তবে চল।

—আগে হাত তুলে বাণীদিকে একটা ইসারা কর।

কিন্তু ইসারা করতে আর হলো না। পিছন থেকে যেন একটা সহাস্য প্রশ্নের কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে।—কি ব্যাপার? তোমাদের মতলব কি?

অভয়—আমরা একটা খুব দরকারী কাজে এসেছি শৈলেশদা।

শৈলেশ—বল।

অভয়—সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদাকে একটা ফেয়ারওয়েল দেবার জন্যে আমরা...।

—কে? কিসের ফেয়ারওয়েল? কার জন্যে ফেয়ারওয়েল?

শৈলেশের গলার স্বরে যেন একটা বিস্ময়ের রাগ চমকে ওঠে।

বিমল—প্রকাশদা চলে যাচ্ছেন, তাই...।

শৈলেশ—কে বললে?

নীহার—প্রকাশদা বললেন, একবছরের চাকরী শেষ হয়েছে, তাই উনি চলে যাবেন।

শৈলেশ—কিন্তু আমি তো এখনও প্রকাশ মাস্টারকে চলে যেতে বলিনি।

শেখর—প্রকাশদা কিন্তু...!

চেঁচিয়ে ওঠে শৈলেশ—না, কোন কিন্তু-টিন্তু নেই। এসব প্রকাশ মাস্টারের একটা চালাকি! এমন চালাকির কোন দরকার ছিল না।

অভয়—ফেয়ারওয়েল তাহলে...।

শৈলেশ—না।

বিমল—আমরা তবে...।

শৈলেশ—না, তোমাদের এসব বাজে কাজে মাথা ঘামাতে হবে না। বরং, এক্ষুনি প্রকাশ মাস্টারকে গিয়ে বল, যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

তের

দোতলার ঘরের জানালার কাছে আইভিলতার পাতার স্তবক খুশির বাতাসে কাঁপছে ; শৈলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বাণীর চোখের হাসিটাও যেন এই খুশির বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে কাঁপতে থাকে।

শৈলেশ বলে--এ কদিনের মধ্যে তুমি কত নতুন কথাই না বললে বাণী, কিন্তু মনে হচ্ছে, একটা পুরনো কথাকে একেবারে ভুলে গিয়েছ।

বাণী--পুরনো কথা?

শৈলেশ--হ্যাঁ।

বাণী--কি?

শৈলেশ--কই, একবারও তো বললে না যে, এইবার তোমার বি-এ পড়বার ব্যবস্থাটা করতে হয়।

বাণীর কালো চোখের তারাদুটো যেন আরও খুশি হয়ে হাসতে থাকে।--সেটা আর আমি বলতে যাব কেন? যে আমার ভার নিয়েছে, সে-ই বলবে।

শৈলেশ--কেন? তোমার কি বি-এ পড়বার আর কোন আগ্রহ নেই?

বাণী--আছে বইকি। কিন্তু তোমার আগ্রহ আর আছে কিনা, বুঝতে পারছি না।

বাণীর চোখের হাসিতে যেন ভালবাসারই একটা সুন্দর ধূর্ততা চিকচিক করছে।

শৈলেশ বলে--একথার মানে কি? আমি কি তাহ'লে তোমাকে একটা ধাপ্পা দিয়ে...তার মানে তোমাকে শুধু বিয়ে করবার জন্যেই একটা ধাপ্পা দিয়েছি।

বাণী হাসে--আমি কিন্তু বিশ্বাস করেছি...।

শৈলেশ--কি?

বাণী--আমি বিশ্বাস করেছি, তুমি ভালবেসেই আমাকে বিয়ে করেছ।

শৈলেশ হাসে--একই কথা হলো। এর মানে, তুমি বলতে চাও, এখন তুমি বি-এ না পড়লেও আমার কোন আপত্তি নেই।

বাণী--তাই তো মনে হয়।

শৈলেশ--না। বরং সন্দেহ হচ্ছে, তুমিই...।

শৈলেশের কাছে আরও সরে এসে, শৈলেশের কাঁধের কাছে মাথাটাকে হেলিয়ে দিয়ে বাণী বলে--ঠিক কথা। সন্দেহ করবার দরকার নেই। আমার আর বি-এ না পড়লেও চলবে।

--কেন?

--বি-এ পাস করে আমার আর কি-এমন গৌরবটা বাড়বে। তুমি আমার স্বামী, এই যথেষ্ট।

শৈলেশ--কিন্তু আমার তো তাতে পোষাবে না।

বাণী--কি বললে?

শৈলেশ--আমার স্ত্রী হবে এই শহরের প্রথম মেয়ে গ্র্যাজুয়েট ; এ না হলে আমার চলবে না। এ না হলে আমার গর্ব খুশি হবে না।

শৈলেশের কথার ব্যস্ততা হঠাৎ যেন থমকে যায়। বাণীর চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছে।--এ কি? আমার কথার মধ্যে কি কোন...।

বাণীও ব্যস্ত ভাবে বলে--না না। তুমি কিছু মনে করো না। হয়তো আমিই ভুল করে অন্য কথা ভেবেছি।

শৈলেশ বলে--লোকে যদি বলে, আমি বামাচরণবাবুর মেয়েকে বিয়ে করেছি, তবে সেটা কি আমার পক্ষে খুব একটা...।

বাণীর ঝাপ্‌সা চোখের দৃষ্টিটা এইবার যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে।--বুঝেছি, সেটা

তোমার পক্ষে কোন গৌরবের কথাই নয়। কিন্তু তুমি দয়া করে বামাচরণবাবুর মত মানুষের মেয়েকে ভালবেসেছ আর বিয়ে করেছ, এটা তো তোমার পক্ষে গৌরবের কথা।

শৈলেশ--হতে পারে। কিন্তু পাঁচজনের কাছে যেটা...।

বাণী--কি?

শৈলেশ--সুদাসবাবু আজই বার লাইব্রেরীর ঘরে বসে হাসাহাসি করে বেশ একটা গর্বের কথা সবাইকে বলছিলেন। কথাটা আমার পক্ষে একটু...।

বাণী--কি?

শৈলেশ--সুদাসবাবু বলছিলেন, বিদুষী কামিনী রায় যদি আর বছর তিন পরে এ শহরে আসেন, তবে দেখতে পাবেন যে, সুদাসবাবুর মেয়ে শুভেশ্বরীই হলো এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। কলেজে পড়বার জন্যে শুভেশ্বরীকে পাটনাতে পাঠিয়েছেন সুদাসবাবু।

বাণী বিব্রতভাবে বলে--কিন্তু এতে তোমার পক্ষে...।

শৈলেশ--এতে আমাকেই ঠাট্টা করেছেন সুদাসবাবু। ওঁর ধারণা, মনে হচ্ছে আরও অনেকেরই ধারণা এই যে, বামাচরণবাবুর মেয়ে বাণীর আর বি-এ পড়া হবে না। অর্থাৎ আমিই তোমাকে বিয়ে করে তোমার বি-এ পড়বার স্বপ্ন নষ্ট করে দিয়েছি।

বাণী--ওদের একটা মিথ্যে ধারণার জন্যে তুমি দুঃখিত হবে কেন?

শৈলেশ--দুঃখিত হইনি, কিন্তু ওদের ধারণাটাকে জব্দ করা দরকার।

বাণী--বেশ তো, আমি পড়বো, তুমি ব্যবস্থা কর।

শৈলেশ--কলকাতায় কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়বে?

বাণী হেসে ফেলে--না, তা হবে না।

শৈলেশ--তবে?

বাণী--আমি এখানেই, তোমার কাছে থেকে পড়বো।

শৈলেশ--আমার কাছে থাকলে কি পড়া হবে, না সব পড়া চুলোয় যাবে?

বাণী--কেন চুলোয় যাবে?

শৈলেশ--কেন চুলোয় যাবে না?

বাণী--তুমিই পড়াবে।

শৈলেশ--তা হলেই হয়েছে। তা হলে আর তোমার বি-এ পাস করতে হবে না।

--কেন?

--কি আশ্চর্য? তোমাকে বই পড়ানো কি আমার পক্ষে আর সম্ভব হতে পারে? তোমার এই মুখটি আমার চোখের কাছে থাকলে বইয়ের পাতার দিকে আমি তাকাবো কি করে, অসম্ভব। সব চেয়ে ভাল হয়, যদি...

বাণী--বল।

শৈলেশ--খুব ভাল পড়াতে পারে, এমন একজন মাস্টারের কাছে যদি পড়।

বাণী--কোন দরকার নেই।

শৈলেশ--দরকার আছে বাণী। সত্যিই এরকম একজন মাস্টার পাওয়াও যাচ্ছে।

বাণী--কে?

শৈলেশ--আমারই স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার প্রকাশ। লোকটা অবিশ্যি একটা...যাক্ সে সব কথা, আমাদের কাজ নিয়ে কাজ।

বাণীর নিঃশ্বাসের বাতাস যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

শৈলেশ--তুমি লোকটাকে কখনও দেখনি?

বাণী--কাকে?

--প্রকাশ মাস্টারকে?

--না?

--দেখেছো বোধ হয়, মনে পড়ছে না।

--দেখে থাকলেও চিনি না।

--বুড়ো জলধরবাবুর ফেয়ারওয়েলের সভাতে আমি লোকটাকে প্রথম দেখেছিলাম।

--সে সভাতে আমিই তো গান গেয়েছিলাম।

--হ্যাঁ, সেই জন্যেই মনে হচ্ছে, প্রকাশ মাস্টার তোমাকে চেনে।

--হতে পারে।

--যাই হোক, তুমি রাজি কিনা বল।

--তুমি রাজি হলেই আমি রাজি। কিন্তু...

--কি?

--প্রকাশবাবু কি রাজি হবেন?

--তোমার আবার এ সন্দেহ হলো কেন?

--মনে পড়ছে, একদিন বিমল কিংবা অভয় বলেছিল, প্রকাশ মাস্টার কোন ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াতে রাজি হননি। তিনি নিজেই নিজের পড়াশোনা নিয়ে সব সময় ব্যস্ত।

--বাজে কথা। এই মাসেই আমার কাছে আরজি করতে আসবে প্রকাশ মাস্টার।

--কিসের আরজি?

--চাকরির মেয়াদ বাড়াবার জন্যে। কিংবা পার্মানেণ্ট হবার জন্যে। নয়তো মাইনে বাড়াবার জন্যে। আমি তো ওকে মাত্র এক বছরের জন্যে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়েছিলাম।

--কিন্তু প্রাইভেট পড়াতে রাজি হবেন কিনা, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না।

--রাজি না হয়ে যাবে কোথায়? রাজি না হলে ওর চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে আমিও রাজি হব না।

--দেখ তা হলে। কিন্তু...

--আবার কিন্তু কিসের?

--খুশি হয়ে রাজি না হলে কাউকে চাপ দিয়ে কাজ করালে তাতে কোন লাভ হবে না। তা ছাড়া, এটা হলো পড়াবার কাজ ; অনিচ্ছায় আর যে কাজই চলুক না কেন, পড়ানোর কাজ চলে না।

--অনিচ্ছা করবে কেন প্রকাশ মাস্টার? বলা মাত্র খুশি হয়ে রাজি হবে। তাছাড়া এসব লোককে চাপ দিলেই বরং ভাল কাজ পাওয়া যায়।

চোদ্দ

শৈলেশের বাড়ির বাইরের ঘর। প্রকাশ মাস্টার এসেছে। শৈলেশ কোন প্রশ্ন করবার আগেই হাসিমুখে বলে ফেলেছে প্রকাশ--ঠিকই, চলে যাবার আগে আপনাকে একবার জানানো উচিত। আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ভালই করেছেন। আমি যাই, আমাকে বিদায় দিন।

প্রকাশ মাস্টার নিজেই এসে বলেছে, বিদায় দিন। শৈলেশের কল্পনার আনন্দটা যেন হঠাৎ জব্দ হয়ে গিয়েছে। চলেই যাচ্ছে যে, তাকে আর চাপ দেবার উপায় কোথায়? যার কোন দাবী নেই তাকে বিমুখ করবার ভয় দেখাবারও যে উপায় নেই।

শৈলেশ বলে--আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?

প্রকাশ--আমার তো চলে যাবারই কথা।

শৈলেশ--যদি আরও দু বছর এক্সটেনসন দিই ; তবে তো চলে যাবেন না?

প্রকাশ--কি দরকার? এই এক বছর তো বেশ কাটিয়ে গেলাম। আর কেন?

--নিশ্চয়ই অন্য কোথাও এখানকার চেয়ে বেশি মাইনের একটা কাজ জুটিয়েছেন?

--আজ্ঞে না।

--তবে?

--তবে জুটিয়ে নিতে পারবো বলে আশা করছি। এখানকার চেয়ে বেশি মাইনের না হোক, অন্তত কম মাইনের একটা কাজ পেয়েই যাব বোধ হয়।

কত শান্ত স্বরে আর কত মৃদু হাসি হেসে কথা বলছে প্রকাশ মাস্টার। কিন্তু বুঝতে পারছে না নিশ্চয়, সেক্রেটারীর মনের যত উদ্ধত যুক্তি-বুদ্ধি সবই কি-ভয়ানক একটা যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে নিঃশব্দে ছটফট করছে। একটু মহৎ হয়ে, একটু উদার হয়ে, আর একটু কৃপাপরবশ হয়ে কথা বলতে চাইছেন সেক্রেটারী। কিন্তু ত্রিশ টাকা মাইনের এক খামখেয়ালী টিচার যেন সাংঘাতিক একটা কৌতুকের তুক করে সেক্রেটারীর মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে।

শৈলেশ বলে--আমার ইচ্ছা আপনি অন্তত আরও দুটো বছর থাকুন।

প্রকাশ যেন মিনতি করে বলে--আজ্ঞে না, ছেড়ে দিন ; আপনি আর এমন ইচ্ছে করবেন না।

শৈলেশ--আপনারই একটা সুবিধে হবে।

প্রকাশ যেন আশ্চর্য হয়ে যায়।--আমার সুবিধে?

--হ্যাঁ।

--কি?

এইবার যেন নিঃশ্বাসের সব শক্তি নিয়ে আর জোর করে হেসে ফেলে শৈলেশ।--আপনার কিছু উপরি আয় হবে, এমন একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

--দরকার নেই।

--তবুও বলছেন দরকার নেই?

--না। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার এখন এখান থেকে চলে যেতেই ভাল লাগছে।

--কিন্তু আমার যে এখন আপনাকে ছেড়ে দিতে ভাল লাগছে না।

--কেন বলুন তো?

--একটা দরকার ছিল।

--আপনার দরকার?

--হ্যাঁ।

--তাহলে বলুন। যদি সম্ভব হয়, তবে আমি থেকে যাব।

--আমার স্ত্রী বি-এ পড়তে চান। তাঁরই জন্যে টিউটর দরকার। আমার মনে হয়েছে, আপনি পড়ালে ভাল হবে।

--মাপ করবেন। এসব কাজ আর আমার ভাল লাগবে না।

--ভাল টাকা পেলেও কি পড়াবেন না?

--ভাল টাকা মানে কত টাকা?

--ধরুন পঞ্চাশ টাকা।

--আপনার কথায় রাজি হতে পারলে আমি নিজেও খুশি হতাম। কিন্তু পারবো না। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

--কিন্তু আমি যে আমার স্ত্রীর কাছে একেবারে স্পষ্ট করে বলেছি যে, আপনি খুশি হয়ে পড়াতে রাজি হবেন, পড়াবেন। আর সে'ও আশা করে বসে আছে।

প্রকাশ মাস্টারের চোখ দুটো বিপন্ন মানুষের চোখের মত করুণ হয়ে যায়। আবার, যেন আতঙ্কিতের মত একবার চমকেও ওঠে। আবার, আনমনা মানুষের চোখের মত হঠাৎ উদাস

হয়ে যায়।

আর সেক্রেটারী শৈলেশের মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়েছে ; কি যেন ভাবছে শৈলেশ। যেন একটা আহত প্রেস্টিজের বিনত আক্রোশ, একটা গরজের বিনয় যেন জোর করে একটা হুংকার চেপে রেখে নম্রস্বরে কথা বলতে চেষ্টা করছে। ভাবতে একটা দুঃসহ শাস্তির মতই লাগছে। সহ্যও করতে হচ্ছে ; তা না হলে বাণীর কাছে এত জোর গলা ক'রে বলা সেইসব কথা, সেই মুখর প্রতিশ্রুতির সব সম্মান যে মিথ্যে হয়ে যাবে। বাণীও হয়তো ভুল বুঝবে, কিংবা কিছু না বুঝেও কিছু বলবে না। কিংবা শৈলেশকে বোধ হয় একটা অসার হামবড়াই বলে মনে করে আড়ালে হেসে ফেলবে। তাই, উপায় নেই বলেই, দুরন্ত ঘৃণার জ্বালাটাকে চাপা দিয়ে প্রকাশ মাস্টারকে বিনীত ভাষায় অনুরোধ করতে হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, এই প্রকাশ মাস্টার যদি বাণীকে পড়ায়, তবে বি-এ পাশ করতে বাণীর কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু কী ধূর্ত এই প্রকাশ মাস্টার ; আর কী সাংঘাতিক লোকটার বিদ্যাবত্তার অহংকার, যেন সেক্রেটারী শৈলেশের অপ্রস্তুত অবস্থার শাস্তিটাকে আরও দুঃসহ করে দেবার জন্য এখনও চুপ করে ভাবছে।

—বলুন, কি বলতে চান? রুক্ষ রূঢ় আর অপ্রসন্ন স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে শৈলেশ।

চমকে ওঠে প্রকাশ। কিন্তু সেই মুহূর্তেই যেন একেবারে শান্ত হয়ে গিয়ে প্রকাশ মাস্টারের চোখ দুটো হেসে ওঠে।—আমি রাজি, শুধু একটু ভেবে নিলাম। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

পনের

হেডমাস্টার রাখালবাবু এইবার যে বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছেন, সেটা এরই মধ্যে ধরে ফেলতে পেরেছেন টিচারেরা আর পণ্ডিত মশাইয়েরা। টিচারদের মেসবাড়ির বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে তামাকের ধোঁয়াও তাই বেশ প্রসন্ন হয়ে ফুরফুর করে। এবার তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে, প্রকাশ মাস্টারের উপর সেক্রেটারীর বিশেষ সুনজর আছে। প্রকাশ মাস্টার আরও দু'বছর এক্সটেনশন পেল, তা ছাড়া সেক্রেটারীর স্ত্রীকে পড়াবার মত একটা গুরুভার দায়িত্বও পেয়ে গেল ; এসব তো রাখালবাবুর ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল লক্ষণ নয়।

থার্ড টিচার অনন্তবাবুর কাছে একদিন উদ্বেগের কথাটা বলেই ফেলেছেন হেডমাস্টার রাখালবাবু।—মনে হচ্ছে, আমার মেয়াদও আর মাত্র দু'বছর।

—কেন এরকম মনে হচ্ছে আপনার?

—সেক্রেটারীর স্ত্রী বি-এ পাশ করতে যতদিন বাকি, ততদিন আমিও আছি। তারপর আর নয়।

—তার মানে?

রাখালবাবুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরও যেন একটা রাগ চাপতে গিয়ে ছটফট করে ওঠে।—মানে বুঝতে না পারলে ডিকসনারি দেখুন।

—আজ্ঞে...।

—মানে বুঝতে এত দেরি করেন কেন মশাই? মানে হলো, প্রকাশ মাস্টার এবার তার প্রসপেক্ট বুঝতে পেরেছে। সেক্রেটারীর স্ত্রী বি-এ পাশ করলেই যে পুরস্কারটা পাবে প্রকাশ, সেটা কি অনুমান করতে পারছেন না?

—ঠিক পারছি না।

—আমাকে কচু বনে গিয়ে বাস করতে হবে, আর আপনাদের হেড হবেন ঐ ছোকরা প্রকাশ। নিতান্ত একটা আধুনিক বি-এ, না হয় কয়েকটা আউট-বুক পড়েছে ; তাকে একটা মহামহোপাধ্যায় বলে মনে ক'রে এতটা লাই দেওয়া কি উচিত হচ্ছে?

—না না ; আপনি একটু বাড়িয়ে ভাবছেন। উদ্বিগ্ন আর সন্দিগ্ধ রাখালবাবুকে একটা সান্ত্বনার ভাষা শুনিয়ে দিতে গিয়েও থার্ড টিচারের মুখটা অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে।

সেই হাসি মেসবাড়ির এই বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় রোজই উচ্ছল হয়ে বাজে। মনে হয়, রাখালবাবু যত উদ্বিগ্ন হবেন, এই বারান্দায় সান্ধ্য হাসিটা তত উচ্ছল হয়ে উঠবে।

কিন্তু মেসবাড়ির এই সান্ধ্য প্রসন্নতাকে বেশ বিষণ্ণ করে দেবার মত আর-একটা চিন্তা আছে। এবং এই চিন্তাটাই এসে মেসবাড়ির তামাকের সান্ধ্য ধোঁয়াটাকে বেশ বিষণ্ণ করে দেয়, যেন একটু থিতিয়ে দেয়। সে ধোঁয়া আর ফুরফুর করে না।

ফোর্থ টিচার বিষ্ণুবাবু বলেন--রাখালবাবুর হেড কাটা যাবে, সেটা না হয় মেনে নেওয়াই হলো। তাই বলে প্রকাশ মাস্টারের হেড তুলে ধরতে হবে কেন? এটা ভাল করছেন না সেক্রেটারী। বিজ্ঞাপন দিলে অনেক ভাল আর অনেক যোগ্য হেডমাস্টার পাওয়া যায়।

অধর পণ্ডিত বলেন--আমার কিন্তু সব ব্যাপারটাই ধাঁধার মত মনে হচ্ছে।

--কেন?

--কেন নয় বলুন? কাউকে প্রাইভেট পড়াবে না বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল যে মানুষ, সে হঠাৎ এক মহিলার প্রাইভেট টিউটর হতে চট করে রাজি হয়ে যায় কেন?

—হুঁ, এটা ভাববার মত কথা বটে।

—তা ছাড়া আরও একটা কথা, মাপ করবেন আপনারা, প্রকাশ মাস্টার যে একটা অবিবাহিত যুবক, এটা তো সেক্রেটারীর অজানা নয়?

—খুব জানেন।

—তবে?

—আমার তো আরও একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

—কি?

--সেক্রেটারী না হয় একটু বেশি রকমের উদার মানুষ। কিন্তু মহিলা কি বলে রাজি হলেন? ওঁর তো আপত্তি করা উচিত ছিল।

—আশ্চর্য!

অভয়কেও একদিন বলতে হয়েছে—আশ্চর্য!

দিনটা রবিবার ; সেই জন্যেই ক্লাস এইটের বিমল অভয় নীহার আর শেখর সকালবেলাতে বেড়াতে বের হয়েছে। টাউনের ধুলো-ছড়ানো সড়ক যেখানে শেষ হয়েছে, আর ঝক্‌ঝকে সাদা কাঁকরের রাস্তা দু' পাশে আমের আর নিমের ছায়া নিয়ে সেখান থেকে শুরু হয়ে দূরের পাহাড় আর শালবনের দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে চমৎকার একটা লাল মাটির ডাঙ্গা আছে। ডাঙ্গাটা মিঠে খেজুরের জন্যে বিখ্যাত। তা ছাড়া ডাঙ্গাটা দেখতেও বড় সুন্দর। রাস্তার গা থেকে ডাঙ্গাটা একটানা ঢালু হয়ে ছোট একটা ঝর্ণানদীর কাছে এসে শেষ হয়েছে। সে ঝর্ণানদীর কিনারায় অনেকগুলো ছোট-ছোট সমাধি আর শ্বেতকরবী।

প্রকাশদা বোধহয় একটু কবি-মনের মানুষ। তা না হলে, মাঝে মাঝে এই ডাঙ্গাটার উপরে একা-একা ঘুরে বেড়াবেন কেন? নিশ্চয় মিঠে খেজুরের লোভে নয়, কোন সন্দেহ নেই, ডাঙ্গার এই চমৎকার লাল মাটি, কালো পাথর, সাদা কাঁকর আর সবুজ ঘাস দেখতে, আর, ঝর্ণানদীটার কলকল শব্দ আর শ্বেতকরবীর ঝোপের দুর্গা-টুনটুনির ডাক শুনতে আসেন প্রকাশদা।

ঢিল মেরে অনেক মিঠে খেজুর নামিয়ে আর খেয়ে, তারপর ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে যখন হাঁপ ছাড়ে বিমল, তখন অভয়ও হাঁপ ছাড়তে গিয়ে বলে ওঠে।—আশ্চর্য।

—কিসের আশ্চর্য?

—প্রকাশদা আমাকে পড়াতে রাজি হলেন না, কিন্তু বাণীদিকে পড়াতে রাজি হয়ে গেলেন।

--বোধহয় ভাল টাকা দিচ্ছেন শৈলেশদা।

--কে জানে! বাবাও তো প্রকাশদাকে ভাল টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তো রাজি হননি।

--কেন রাজি হননি?

--বলেছিলেন, প্রাইভেট পড়াতে ভাল লাগে না।

--কেন ভাল লাগে না?

--বলেছিলেন, একটু নিরিবিলি থাকতে ভালবাসেন।

--নিরিবিলি কেন?

--সেটা আমি কি করে বলবো? আমি তো কারও অন্তর্যামী নই।

চমকে ওঠে নীহার--চুপ।

--কেন?

--প্রকাশদা আসছেন।

হ্যাঁ, প্রকাশদাই আসছেন। কিন্তু একা নন। সঙ্গে রয়েছেন আর-একজন মানুষ, যাঁর বাড়িটাকে এখানে বসেই দেখতে পাওয়া যায়। ঐ যে, মেহেদি গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়িটা অনেকগুলো দেবদারুর ছায়ার কাছে ঝলমল করছে। বিখ্যাত বিদ্বান পি কে রায় ঐ বাড়িতে থাকেন। অভয়ের বাবা বলেছেন, ওরকম বিদ্বান মানুষ খুব কমই আছে। লজিকের অনেক বই লিখেছেন। এডিনবরার যত ছাত্র আর প্রফেসার একদিন এই পি কে রায়ের প্রতিভা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের স্কুল থেকে শুরু করে এডিনবরা, কোন পরীক্ষায় সেকেণ্ড হননি পি কে রায়। পি কে রায় হলেন চিরকালের ফার্স্ট।

প্যান্ট কোট আর টুপি, সাহেবী সাজে সেজে থাকেন, আর বেতের একটি স্টিক হাতে নিয়ে সকাল-বিকাল এদিকের রাস্তায় রোজই আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ান এই বিদ্বান বুড়ো-মানুষ পি কে রায়। বিমল অভয় নীহার আর শেখর একদিন বিকালে সাহস করে বলেই ফেলেছিল—গুড মর্নিং স্যার।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিলেন পি কে রায়। সাংঘাতিক গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন।—শোন।

—আজ্ঞে?

পি কে রায়—বল নমস্কার।

--নমস্কার। নমস্কার।

তারপরেই হেসে উঠেছিলেন পি কে রায়। নীহারের মাথায় হাত বোলালেন, অভয়কে গাল টিপে আদর করলেন। তারপরেই বললেন—তোমরা বিকেলবেলা খেলা কর না?

—করি।

—তবে এখন এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন?

—এমনি।

—না, এই অভ্যেস ভাল নয়। খেলবে দৌড়বে, গাছে চড়বে। মোট কথা শরীর মজবুত করা চাই, স্বাস্থ্যও ভাল করা চাই।

—যে আজ্ঞে।

—মনে রেখ, মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো।

সেদিন, সেই বিকালেই প্রকাশ মাস্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল অভয় আর বিমল, শেখর আর নীহার।—কথাটার মানে কি প্রকাশদা?

—কি কথা?

—বিদ্বান পি কে রায় বললেন, মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো।

—মানে হলো, সুস্থ দেহ সুস্থ মন। শরীর সুস্থ থাকলেই মন সুস্থ থাকে। তোমাদের ভালর

জন্যই খুব ভাল একটা উপদেশ দিয়েছেন পি কে রায়। উপদেশটা মনে রেখ।

--হ্যাঁ, প্রকাশদা।

বিদ্বান বুড়ো-মানুষ পি কে রায়কে দেখে আর তাঁর বিদ্যার গল্প শুনে আশ্চর্য হয়েছিল যারা, তারা সেদিন তাদের সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদাকেও যেন নতুন আশ্চর্য বলে মনে করেছিল।

সেই প্রকাশদা আসছেন ; সেই পি কে রায়ও সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। মনের ভেতরে 'মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো' উপদেশটাও যেন কথা বলছে। কিন্তু এখনই যে একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে যেতে হবে। ঘাসের উপর অলস হয়ে লুটিয়ে বসে থাকবার যে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে না।

দৌড় দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু বিমল বলে--লুকিয়ে পড়া যাক।

ফুট্‌কার ঘন ঝোপ। থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। গাদা গাদা ফড়িং উড়ছে। লুকিয়ে পড়বার একটা জায়গা আছে। লুকিয়ে পড়ে চারটে কৈফিয়ৎ-ভীরু প্রাণ।

পি কে রায় আর প্রকাশদা এই ফুট্‌কা ঝোপেরই ওপাশ দিয়ে গল্প করে করে চলে গেলেন। কি আশ্চর্য, পি কে রায় যে সত্যিই একটা অদ্ভুত কথা বলছেন।--তুমি কি অক্সফোর্ডে ছিলে?

প্রকাশদা হাসেন--আজ্ঞে না, আমি কখনও বিদেশে যাইনি।

--এখানে কি কর?

--আমি মহিম সেমিনারির সেকেণ্ড টিচার।

--অ্যাঁ? যেন চমকে উঠলেন পি কে রায়।

চলে গেলেন পি কে রায় আর প্রকাশদা।

ফুট্‌কা ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে চার বন্ধু যেন চার জোড়া মুগ্ধ কৌতূহলের চোখ তুলে দেখতে থাকে, বিদ্বান পি কে রায় প্রকাশদার কাঁধে হাত রেখে গল্প করতে করতে চলে যাচ্ছেন।

অভয় বলে--সত্যি বলছি বিমল, প্রকাশদার জন্যে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে।

বিমল--কেন বল তো?

অভয়--প্রকাশদার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল ছিল। ত্রিশ টাকা মাইনেতে প্রকাশদার মত মানুষের এখানে একটা সেকেণ্ড স্যার হয়ে পড়ে থাকা একটুও ভাল দেখায় না।

নীহার--চলে গেলেই তো পারতেন প্রকাশদা।

শেখর--আমিও তো তাই বলছি। আমাদের স্কুল অবিশ্যি কানা হয়ে যাবে, তবু প্রকাশদার তো ভাল হবে।

বিমল--আমাদের স্কুলটার জন্যে প্রকাশদার খুব বেশি মায়া পড়ে গেছে।

অভয় রাগ করে বলে--আমি তো দেখছি, একটা টিউশনির জন্য প্রকাশদার খুব বেশি মায়া পড়ে গেছে।

শেখর--যাঃ, বাজে কথা।

নীহার হাসে--আমি একটা কথা বলতাম, কিন্তু বলব না।

শেখর--বল্ না।

নীহার--আচ্ছা, শৈলেশদার সঙ্গে বাণীদির যদি বিয়ে না হতো, তবে কার সঙ্গে বিয়ে হলে বাণীদিকে মানাতো?

বিমল--প্রকাশদার সঙ্গে।

অভয়--আমি বলবো, প্রকাশদার সঙ্গে বাণীদিকে বেশী মানাতো।

শেখর--কিন্তু বাণীদি যে নিজেই শৈলেশদাকে পছন্দ করে...।

অভয়--প্রকাশদাকেও তো পছন্দ করতে পারতেন বাণীদি।

বিমল--চুপ! আর এসব কথা নয়। এখন একটা কাজ করা যাক।

--কি?

--'মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো' করা যাক।

--তার মানে?

--একসঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে পি কে রায় আর প্রকাশদার পাশ কাটিয়ে চলে যাই। দেখে খুশি হবেন পি কে রায়।

--ঠিক বলেছিস।

ষোল

প্রথম যেদিন পড়াতে এসেছিল প্রকাশ মাস্টার, সেদিন এই ঘরেই টেবিলের কাছে দুটি চেয়ারে বসে গল্প করছিল শৈলেশ আর বাণী।

প্রকাশ আসতেই খুশি হয়ে হেসেছিল শৈলেশ--আসুন।

আর, বাণী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুখে কোন অভ্যর্থনার ভাষা না থাকলেও বাণীর চোখ দুটোই হেসে হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। মাথার কাপড়টাও একটু বড় করে টেনে দিয়েছিল বাণী।

কিন্তু শৈলেশ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আর বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল--তুমি বসো।

শৈলেশের সেই গম্ভীর শাসনের কথাটা যেন একটা সতর্ক প্রেস্টিজের গম্ভীর কথা। প্রকাশ মাস্টার বোধহয় শুনতে পায়নি ; কারণ বেশ একটু মৃদুস্বরে আর চাপা গলায় কথাটা বলেছিল শৈলেশ।

প্রকাশ মাস্টার শুনেছে বলেও মনে হয় না। প্রকাশ মাস্টার যেন তার মুখভরা হাসির আবেশেই বধির হয়ে রয়েছে। ঘরের ভিতরে ঢুকেই টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা বইগুলির দিকে তাকায় প্রকাশ। তারপরেই বলে--আমি আজ শুধু বইগুলি একবার দেখবো। কাল থেকে পড়াবো আর বেশ শক্ত টাস্কও দিয়ে যাব।

শৈলেশ হাসে--মোটকথা, আপনার কাছ থেকে গ্যারাণ্টি পেতে চাই, বাণী যেন এক চান্সেই বেশ ভাল করে পাশ করতে পারে।

প্রকাশ হাসে--তাহলে উনিও আমাকে গ্যারাণ্টি দিন। টাস্ক যা দিয়ে যাব, সেটা ফেলে রাখবেন না। রোজ নিয়মমত খাটতে হবে।

বাণী হেসে ফেলে--ইচ্ছে করে ফাঁকি নিশ্চয়ই দেব না।

প্রকাশ--তাহলেই হলো।

বই দেখে প্রকাশ, আর মাঝে মাঝে শৈলেশের সঙ্গে কথাও বলে। বাণী হঠাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়। তারপরেই ট্রে'র উপর সাজিয়ে চায়ের পেয়ালা আর খাবারের ডিস নিয়ে ঘরের ভিতরে দেখা দেয়।

শৈলেশের চোখে আবার যে একটা ক্ষুব্ধ বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বাণী যেন একটা ভয়ানক শ্রদ্ধার নৈবেদ্য হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়েছে। বাণীর চেহারাটা যেন একটা নিদারুণ খুশির ব্যস্ততা।

চা আর খাবার খেয়ে চলে যায় প্রকাশ মাস্টার। আর শৈলেশের এতক্ষণের ক্ষুব্ধ বিস্ময়টা এইবার তার গলার স্বরেই জ্বলে ওঠে।--তুমি এসব আবার কি আরম্ভ করলে?

বাণী--কি হলো?

--চা আর খাবার তুমি নিয়ে এলে কেন?

--কি বললে?

—ও কাজটা রামদয়াল করবে। তুমি মিছিমিছি কেন...?

--আমাকে পড়াবেন যিনি, তাঁকে রামদয়াল কেন চা-খাবার এনে দেবে? এটা আবার কি-রকমের কথা বলছো তুমি?

--ঠিক বলছি! তুমি বোধহয় তোমার নিজেরই প্রেস্টিজের দিকটা ভেবে দেখতে ভুলে গিয়েছ।

--প্রেস্টিজ?

--হ্যাঁ। প্রকাশ মাস্টারকে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেব। এটাই যথেষ্ট। এর বেশি সম্মান করবার কোন দরকার হয় না।

--বুঝলাম না।

—কি বুঝলে না?

--আমি নিজে চা-খাবার এনে দিলে ভদ্রলোককে কী এমন বেশি সম্মান করা হয়?

--হয় বই কি।

--ছাত্রী তার টিউটরকে যদি একটু সম্মানই করে...।

--না। সম্মান করবার কোন প্রশ্নই এর মধ্যে আসে না।

--অসম্মান করাও তো উচিত নয়।

--আমি তো অসম্মান করতে বলছি না। রামদয়াল আমার মক্কেল সীতারাম আগরওয়ালাকেও চা এনে দেয়। তাতে কি সীতারামের অসম্মান হয়েছে?

--তুমি কার সঙ্গে কার তুলনা করছো?

--সীতারাম আগরওয়ালা লক্ষপতি মানুষ। প্রকাশ মাস্টার পঞ্চাশ টাকা মাইনের মানুষ। তুলনা চলে না ঠিকই।

শৈলেশের মুখের দিকে বোবা বিস্ময়ের দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে বাণী। ঠিকই, মুন্সুরী বামাচরণবাবুর মেয়ে, মানুষের প্রেস্টিজতত্ত্বের নিয়ম-কানুন জানে না, বুঝতেও পারে না। শৈলেশের ইচ্ছার কথাগুলিকে বুঝতে পারছে না বলেই ভাল লাগছে না। ঠিকই, মাটির চোখ দিয়ে আকাশের কোন দুঃখকে দেখতে পাওয়া যায় না। শৈলেশের মত মানুষের প্রেস্টিজের দুঃখটাকেও তাই চিনতে পারছে না বাণী।

বাণী বলে--আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

শৈলেশের চোখের দৃষ্টিটা হেসে ওঠে।—আমারও তাই মনে হয়েছে। তুমি ঠিক বুঝতে পারনি বাণী। তাই আমার সঙ্গে এত তর্ক...।

বাণীও হেসে ফেলে—না, আর তর্ক করবো না। বরং...।

--কি?

—আমার কোন ভুল দেখতে পেলে তুমি তখুনি বলে দিও।

না, আর কোন ভুল দেখতে পায় না শৈলেশ। বরং দেখতে পায়, বাণী নিজেই ওর প্রেস্টিজ সম্বন্ধে খুব সজাগ আর খুব সতর্ক হয়েছে। পড়ার কথা ছাড়া প্রকাশ মাস্টারের সঙ্গে অন্য কোন কথা ভুলেও আলোচনা করে না বাণী। আর প্রকাশ মাস্টারও যেন তার অবাধ সৌজন্যের হাসিটাকে অনেক সংযত করে ফেলেছে। দেখে খুশি হয়েছে শৈলেশ, প্রকাশ মাস্টার সত্যিই একটা কঠোর টাস্ক-মাস্টার। সারারাত জেগে আর অনেক ভেবে ভেবে ম্যাকবেথের বিবেক সম্বন্ধে দশপাতার যে প্রবন্ধ লিখেছে বাণী, সেটা পড়েই সেদিন ধমক দিয়ে উঠেছিল প্রকাশ মাস্টার--রাবিশ!

বাণী বলে--তাহলে বলে দিন...।

প্রকাশ--তাহ'লে মন দিয়ে শুনুন।

এক ঘণ্টা ধরে ম্যাকবেথের মন আর বিবেক ব্যাখ্যা করে চলে গেল প্রকাশ মাস্টার।

হ্যাঁ, দেখে খুশি হয়েছে শৈলেশ, প্রকাশ মাস্টার যখন আসে তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না বাণী। টেবিলের বইগুলির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকে। দেখেছে শৈলেশ, রামদয়াল চা-খাবার এনে দিয়েছে। বেশ খুশি হয়ে খেয়েছে প্রকাশ মাস্টার।

সতের

ছোট শহরের মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা বড়রকমের হতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটি একটু বেশি গরীব বলেই পথের পাশে বেশি আলো জ্বেলে দিতে পারে না। একটা কেরোসিনের বাতির পোস্ট এখানে, আর একটা হয়তো তিন শো গজ দূরে। শুক্লপক্ষের রাতে পথের পাশের এই টিমটিমে বাতিও জ্বলে না। আর সেটাই যেন একটা সৌভাগ্য। চাঁদনি সন্ধ্যার কিংবা রাতের এই ধুলো-জঞ্জালের ছোট শহরও একটা মায়াপুরীরর মত দেখায়।

যেখানে বাসস্ট্যাণ্ড, যেখানে দু'চারটে দোকানের আলো পথের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানেও স্ট্যাণ্ডের গাড়ি আর মানুষের ভিড়কে একগাদা জ্যোৎস্নাময় শরীরের ভিড় বলে মনে হয়। সবই অস্পষ্ট, তবু মুখগুলিকে যেন স্পষ্ট চিনে ফেলতে পারা যায়।

বিমল বলে--ও কে রে শেখর?

--কে?

--ঐ যে বাস-অফিসের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনছে?

--তাই তো। নিশ্চয় প্রকাশদা।

ঠিকই দেখতে পেয়েছে বিমল। অভয় আর একটু এগিয়ে যেয়ে দেখে আসে ; হ্যাঁ, প্রকাশদাই টিকিট কিনছেন। কিনে ফেলেছেন।

প্রকাশদার সঙ্গে তো কেউ নেই। তবে কার জন্যে টিকিট কিনলেন প্রকাশদা? প্রকাশদা নিজেই কোথাও যাবেন? না, অন্য কেউ যাবে?

নীহার বলে--প্রকাশদা সত্যিই যে গয়া যাবার বাসটার দিকে যাচ্ছেন।

অভয়--গয়াতে কি এখন পিতৃপক্ষ চলছে?

নীহার--এমাসে পিতৃপক্ষ হবে কেমন করে?

--তবে?

--কালকের দিনটাও তো ছুটির দিন নয়।

--তা ছাড়া, প্রকাশদা তো ছুটি নেননি।

--আজও তো কালকের পড়া বলে দিলেন প্রকাশদা।

--হেড স্যারও তো বললেন না যে, প্রকাশদা ছুটি নিয়েছেন।

--হ্যাঁ, না বলে কয়ে চলেই যাচ্ছেন প্রকাশদা!

--এর মানে কি?

ঠিকই, গয়ার বাসের ভিতরে উঠতে যাচ্ছিল প্রকাশ, তখনি পিছনের এক গাদা ব্যস্ত আহ্বানের শব্দ শুনে চমকে ওঠে ; কোথায় যাচ্ছেন স্যার? কেন যাচ্ছেন স্যার? গয়াতে কেন স্যার?

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে প্রকাশ। তারপর হেসে হেসে বলেই ফেলে--আমি সত্যিই চলে যাচ্ছি।

--কেন স্যার?

--আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

--কিন্তু কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ কেন চলে যাচ্ছেন?

প্রকাশ আবার হাসে।--কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ এসে পড়েছিলাম যে।

--আপনি চলে গেলে আমাদের কিন্তু খুব ক্ষতি হবে!

--কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। কোন ক্ষতি হবে না। চমৎকার একজন নতুন সেকেণ্ড স্যার আসবেন।

অভয় বলে--কিন্তু বাণীদিকে কে পড়াবে স্যার?

বাস-স্ট্যাণ্ডের ভিড়ের ছুটোছুটির ব্যস্ততায় ধুলো উড়ছে ; ধুলোতে জ্যোৎস্নাতে মাখামাখি হয়ে একটা অদ্ভুত ধাঁধা হয়ে উঠছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকে প্রকাশ মাস্টার।

বিমলের হাতে খুব জোরে একটা চিমটি কেটে অভয় এবার যেন একটা নির্ভয় উৎসাহের আবেগে চেঁচিয়ে কথা বলে--বাণীদির কিন্তু সত্যিই ক্ষতি হবে স্যার।

প্রকাশ মাস্টার পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে। তারপর সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে থাকে। তারপর থমকে দাঁড়ায়। তারপর বেশ ব্যস্তস্বরে কথা বলে--তোমরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? বাড়ি যাও।

অভয়--আপনি স্যার?

প্রকাশ--আমিও বাড়ি যাচ্ছি, এখনই যাব।

একটু দূরে চলে গিয়েই মুখ ফিরিয়ে তাকায় বিমল আর নীহার, শেখর আর অভয়। আর, চারজোড়া চোখ থেকে যেন চারজোড়া খুশির জ্যোৎস্না উপচে পড়ে! বাস-অফিসের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে টিকিট ফেরত দিচ্ছেন প্রকাশদা।

বাড়ি ফিরে যাবার জন্য সড়কের মোড় ঘুরে সোজা হাঁটতে থাকে ছোট শহরের ছোট ছোট বুদ্ধির চারটি দোসর ; বিমল আর অভয়, নীহার আর শেখর। কিন্তু হেঁটে যাবার দুরন্ত ভঙ্গীটা যেন একটা জগজ্জয়ী দুরন্ত উল্লাসের ভঙ্গী।

রাস্তার পাশে একটা বাড়ি। দেখলে পড়ো বাড়ি বলেই মনে হয়। কারণ, এ-বাড়িতে আজকাল আর কেউ থাকে না। পাঁচিলের কাছে একটা টক-পেয়ারার গাছের মাথায় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে।

বিমল বলে--মনে পড়ে অভয়?

অভয়--কি?

বিমল--এই গাছটাকে।

--পড়ে বইকি ; কিন্তু গাছটা বড় কাহিল হয়ে গেছে রে বিমল।

বিমল--আর ঐ জানালাটাকে মনে পড়ে?

এটা হলো সেই মুহুরী বামাচরণবাবুর বাড়ি ; যে-বাড়িতে আজকাল আর কেউ থাকে না। ঐ জানালাটা হলো সেই জানালা, যেখানে একদিন বাণীদির সেই সুন্দর মুখটা হাসছিল ; আর শৈলেশদা এসে...। বিমল আর নীহার তখন ঐ টক-পেয়ারা গাছের উপরের ডালে চুপ করে বসেছিল।

মহিম-ভবনের ফটক পার হয়ে চলে যাবার সময় অভয় হঠাৎ ছটফট করে ওঠে।--চল্ বিমল, বাণীদির সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

মহিম-ভবনের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের জানালার লেসের পর্দাগুলি কাঁপছে। আর টেবিলের উপর বই রেখে একমনে বই পড়ছে বিমল আর অভয়দের সেই বাণীদি। সেই সুন্দর মুখটা এখনও সেইরকমই সুন্দর দেখাচ্ছে।

হঠাৎ চমকে উঠে দরজার দিকে তাকায় বাণী ; যেন নিজেরই মনের ভিতরে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে। হাততালি দিয়ে একসঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢোকে বিমল আর অভয়, শেখর আর নীহার।--কেমন? ভয় পেয়েছেন কিনা?

বাণী--তোমরা হঠাৎ কোত্থেকে এলে?

অভয়--হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম, তাই হঠাৎ খবর দিতে চলে এলাম।

বাণী--কিসের অদ্ভুত ব্যাপার?

বিমল--আর একটু হলে প্রকাশদা চলেই যেতেন।

বাণী--কোথায়?

অভয়--কে জানে কোথায়? বোধহয় গয়াতে।

বাণী--কেন?

নীহার--এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না প্রকাশদার।

বাণী--ছুটি ছেল?

শেখর--কিচ্ছু না, কাউকে না বলে কয়ে হঠাৎ চলে যাচ্ছিলেন।

বাণী--শেষ পর্যন্ত যাননি তাহলে?

বিমল--না।

নীহার--ওঃ, কি-ভয়ানক সাধতে হয়েছে, তবে যাওয়া বন্ধ করলেন প্রকাশদা।

অভয়--কোন সাধাসাধিতে কিছু হয়নি। যেই বললাম, বাণীদিকে তবে পড়াবে কে, বাণীদির ক্ষতি হবে যে, অমনি চুপ করে গেলেন।

নীহার--কেনা টিকিট ফেরত দিলেন।

বাণী বলে--বেশ রাত হয়েছে অভয়, তোমরা এখন...।

--হ্যাঁ, যাচ্ছি বাণীদি। শুধু এই কথাটা জানাবার জন্যেই...।

হুড়মুড় করে একসঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল ক্লাস নাইনের চারটি মানুষ ; যেন চারটি কৃতার্থতার একটি দুরন্ত টীম।

আঠার

সেকেণ্ড স্যার প্রকাশ মাস্টারকে সত্যিই ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বিমল নীহার অভয় আর শেখর বেশ আশ্চর্যও হয়েছে। প্রকাশদা নিজেও যেন একটা ধাঁধা। যেন দুটো মানুষ। একটা মানুষ বাইরে-বাইরে থাকেন, আর-একটা মানুষ ঘরের ভিতরে চুপ করে পড়ে থাকেন।

স্কুলেতে প্রকাশদা খুব হাসি-খুশি মানুষ। কত ব্যস্ত মানুষ। কত জোরেজোরে চেঁচিয়ে কথা বলেন। বাণীদিকে যখন পড়াতে যান প্রকাশদা, তখনও দেখতে পায় শেখর আর নীহার, যেন বাণীদিকে পড়াবার জন্যে নয়, বাণীদির গলার সেই গানটা শোনবার জন্য প্রাণ-মন ব্যস্ত করে ছুটে চলেছেন।

কিন্তু বিমল আর অভয় দু'জনেই বাণীদির বাড়িতে গিয়ে অনেকবার উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে, প্রকাশদা শুধু চেঁচিয়ে পড়িয়ে চলেছেন। বাণীদির মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়েও দেখছেন না।

বাণীদি পড়তে বসেন যে ঘরে, বাড়ির বাইরের দিকের সেই প্রকাণ্ড ঘরের ভিতরে একটা হারমোনিয়মও আছে। কিন্তু বিমল আর অভয় সে-ঘরের বাইরে জানালার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও বুঝতে পেরেছে, গানের কোন কথাই আলোচনা করছেন না প্রকাশদা। এই এক বছরের মধ্যে বাণীদির হারমোনিয়ম টু শব্দও করেনি। সন্দেহ হয়, বাণীদি নিজেই কি রাগ করে গান ছেড়ে দিলেন?

শৈলেশদাই বা কি-রকমের সখের মানুষ? বাণীদির যে-গান শুনে শৈলেশদা...।

বিমল বলে--থাক সে কথা। বোঝা যাচ্ছে শৈলেশদার প্রাণেও আর গান নেই।

অভয় বলে--শৈলেশদার প্রাণে এখন অন্য একটা সখ চেপেছে।

--কিসের সখ?

--রায়সাহেব হবার সখ।

--কোথায় শুনলি?

--বাবা বলছিলেন।

সখ আছে সবারই, সখ নেই বোধহয় শুধু এই প্রকাশদার। এমন কি বাণীদিকে একদিন ভুলেও গান গাইতে বললেন না প্রকাশদা। অদ্ভুত!

যাই হোক, বাইরে একরকম আর ঘরের ভিতরে ওরকম কেন প্রকাশদা? বিমল অভয় শেখর আর নীহার, কতবার হঠাৎ গিয়ে দেখেছে, ঘরের ভিতরে একেবারে নীরব নিথর হয়ে বসে আছেন প্রকাশদা। খাটের উপর কয়েকটা বই ছড়ানো আছে ; টাকা-পয়সা ছোট্ট একটা টেবিলেরই উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। দু' চারটে জামা-কাপড় আলনাতে ঝুলছে। ঘরটাও খুব ছোট। তারই মধ্যে যেন একটা সমাধির ছায়া-মানুষের মত চুপ করে বসে আছেন প্রকাশদা। মুখে হাসি নেই, চোখে ঝকঝকে চাহনিও নেই।

টাউনের ভিতরে একটা ছোট শড়কের এক কিনারায় ছোট্ট এই ঘর, যে ঘরে থাকেন প্রকাশদা। জায়গাটা মোটেই নিরিবিলি নয়। লোকের হাঁকডাক চেঁচামিচি চারিদেকে হৈ-হৈ করছে। অথচ প্রকাশদা বলেন, তিনি একটু নিরিবিলি থাকতে ভালবাসেন।

হ্যাঁ এটাও একটা নিরিবিলি বটে। ধুলো ধোঁয়া আর বাজারে চিৎকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিদারুণ একটা নিরিবিলি। অথচ দেখতে পাওয়া যায়, এই প্রকাশদাই টাউনের বাইরের সেই খোলামেলা লালমাটির ডাঙ্গাটাকে কত ভালবাসেন। সেখানে যে মানুষ হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে বেড়ায়, সে মানুষ এখানে এই ঘরের ভিতরে এত নিথর হয়ে বসে থাকতে পারে কেমন করে?

শুধুই কি চুপ ক'রে বসে থাকেন? শেখর একদিন দেখেছে, বালিশটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে আর চোখ বন্ধ করে বিছানার উপর যেন একটা আহত মানুষের মত পড়ে আছেন প্রকাশদা, আর...সত্যি বলছি নীহার, স্বচক্ষে দেখলাম, প্রকাশদার চোখের পাতা ভিজে গিয়েছে।

নীহার কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে।—বাণীদির পরীক্ষাটা কবে?

শেখর—কে জানে কবে?

এত সস্তা হয়ে এখানে পড়ে আছেন প্রকাশদা। তাতে লাভ হচ্ছে সবারই। স্কুলের লাভ, বাণীদির লাভ। কিন্তু প্রকাশদার লাভ কোথায়?

বিমল বলে—বাণীদি তো কোনদিন নিজের হাতে এক কাপ চা পর্যন্ত প্রকাশদাকে খাওয়ালেন না।

অভয় বলে—বাণীদি তো আগে এরকম ছিলেন না। মনে আছে তো বিমল?

বিমল—খুব মনে আছে।

নীহার—কি?

অভয়—বাণীদির তখনো বিয়ে হয়নি। আমরা কতবার দেখেছি, নিজের হাতে ঘটি থেকে জল ঢেলে ভিখারীগুলোকে জল খাওয়াচ্ছেন বাণীদি।

নীহার—তাহলে কি প্রকাশদাকে একটা ভিখারীর চেয়েও বাজে লোক মনে করেন বাণীদি? কখখনো না।

অভয়—তাই তো বলছি ; প্রকাশদার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছেন কেন বাণীদি?

বিমল—সত্যি বাণীদিকে একটুও বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

উনিশ

এই ছোট শহরের জীবনে দুটি খবর হলো দুটি বড় রকমের চাঞ্চল্যের খবর। বাণী, এই শহরেরই মেয়ে বাণী বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে, এটা যেমন শহরের মহিলা আর মেয়েদের আশা আর আগ্রহের কাছে বড় খবর ; তেমনই এই ছোট শহরের ভদ্রলোকদের কাছে একটা বড় খবর এই যে, শৈলেশের সত্যিই রায়সাহেব হবার সম্ভাবনা আছে।

পাটনাতে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এসেছে বাণী। শৈলেশও সঙ্গে গিয়েছিল। পাটনাতে সে দশটা দিন শৈলেশও চুপ করে বসে থাকেনি। চেষ্টা করে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছে, আর গভর্নরের বন্যা রিলিফ ফাণ্ডের জন্য পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক গভর্নরের হাতে তুলে দিয়েছে। শোনা গেছে, রায়বাহাদুর কালিকাপ্রসাদ চেষ্টা করে গভর্নরের সঙ্গে মোলাকাতের এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

যাঁরা এই খবরটা জানেন, তাঁরা কিন্তু এখনও একটু সন্দিগ্ধ হয়ে আছেন। প্রশ্নটা হলো, এদিক থেকে জেলার ডেপুটি কমিশনার যদি শৈলেশের নামটাকে রায়সাহেব খেতাবের জন্য সুপারিশ না করে পাঠান, তবে কি কোন সুফল হবে? মনে তো হয় না।

ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব বড় কড়া মেজাজের মানুষ। এই তিন বছর ধরে তিনি এই জেলার একটি মানুষের নামও খেতাবের জন্যে সুপারিশ করেননি। এই শহরের কেউ আজ পর্যন্ত রায়সাহেব হতে পারেননি। সীতারাম আগরওয়ালা লিস্টার সাহেবের কাছে গিয়ে কতবার কত ছুতো করে ধর্না দিয়েছে ; হাসপাতালের নতুন বাড়ি তৈরী করবার জন্যে দশ হাজার টাকা দানের চেক লিস্টার সাহেবের হাতেই তুলে দিয়েছিল সীতারাম আগরওয়ালা। জয়পুরী কারিগর আনিয়ে লিস্টার সাহেবের একটা মার্বেল মূর্তি তৈরী করিয়ে উপহারও দিয়েছিল। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

এহেন ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব যেদিন মহিম সেমিনারির প্রাইজের অনুষ্ঠানে এলেন, সেদিন স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পড়লো সেক্রেটারী শৈলেশ রায়। আর সেদিনই বুঝতে পারা গেল, শৈলেশের ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। যে লিস্টার সাহেব কোন রাজাগোছের জমিদারের মুখের দিকেও তাকাতে চান না, সে লিস্টার সাহেব যেন বিস্মিত হয়ে, আর বেশ মুগ্ধ হয়ে সেক্রেটারী শৈলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট শুনলেন। ফুলস্কেপ কাগজের দশ পাতার একটা রিপোর্ট। রিপোর্ট তো নয়, যেন এডুকেশন সম্বন্ধে একটা থীসিস। এডুকেশনের নানা অসুবিধা আর সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে একটা চমৎকার আলোচনা।

প্রাইজের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর লিস্টার সাহেব শৈলেশকে ডাকলেন। হেসে হেসে অনেক কথা বললেন। তারপর রিপোর্টটাকেও চেয়ে নিলেন।

হেডমাস্টার রাখালবাবু বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন।--আমি তো এই চার বছরের মধ্যে কোন বছরেই সেক্রেটারীকে এমন জ্ঞানের আর এমন জমকালো ভাষার রিপোর্ট পড়তে দেখিনি। সত্যি একটি রিপোর্ট হয়েছে বটে, লিস্টার সাহেবের কড়া মেজাজও গলিয়ে দিয়েছে।

বাণীরও চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের খুশি সুস্মিত হয়ে ওঠে।--বিমলের মা একটা কথা বলে গেলেন ; কথাটা কি সত্যি?

শৈলেশ—কি কথা বলে গেলেন বিমলের মা?

--তোমার নাকি রায়সাহেব হবার কথা উঠেছে।

—এখনও ওঠেনি ; উঠবে বলে আশা হচ্ছে।

—কেন?

--লিস্টার সাহেব যখন আমার উপর খুশি হয়েছেন, তখন মনে হচ্ছে, আশা করা ভুল হবে না। আসল ফাঁড়া তো এখানেই ছিল। ডেপুটি কমিশনার সুপারিশ না করলে কিছুই হবার নয়। যাক্, সে ফাঁড়া কেটে গিয়েছে।

—কি করে কাটালে?

—এডুকেশন সম্বন্ধে একটা চমৎকার তাক-লাগানো রিপোর্ট পড়ে লিস্টার সাহেবকে শুনিয়েছি। স্কুলের প্রাইজে লিস্টার সাহেব এসেছিলেন।

—কবে রিপোর্ট লিখলে?

শৈলেশ হেসে ফেলে—আমি লিখিনি। একজনকে দিয়ে লিখিয়েছি।

—কি বললে?

—প্রকাশ মাস্টারকে দিয়ে রিপোর্টটা লিখিয়ে নিয়েছি। যাক্, এতদিনে লোকটাকে দিয়ে একটা ভাল কাজ করিয়ে নিতে পারা গেছে।

বাণী বলে—তুমি কি এখনই আবার বের হচ্ছো?

শৈলেশ—হ্যাঁ।

বাণী—কোথায়?

—স্কুলেই যাচ্ছি। প্রকাশ মাস্টারকে দিয়ে আরও একটা কাজ করাবার আছে। এটাও খুব দরকারের কাজ।

—কিসের কাজ?

—ঐ, আর-একটা রিপোর্ট লেখাতে হবে। এই জেলার একটা ইকনমিক রিপোর্ট। চেয়েছেন সেম্পারের বড় সাহেব মিস্টার লেসি, আই সি এস, যিনি গভর্নরের সেক্রেটারী ছিলেন।

বাণী যেন হাঁসফাঁস করে আস্তে আস্তে একটা বিস্ময়ের আতঙ্ক সামনে নিয়ে প্রশ্ন করে—এই সাহেবকে আবার কোথায় পেলে?

—এই তো একমাস হোলো এখানেই সার্কিট হাউসে আছেন মিষ্টার লেসি। আরও ভাল খবর হলো, মিস্টার লেসি আমাকে বলেই দিয়েছেন যে তিনি নিজে চিঠি লিখে গভর্নরকে আমার নামটা জানিয়ে দেবেন। এখন আর আমার কোন সন্দেহ নেই বাণী, এই বড়দিনেরই খেতাবের লিস্টে দেখতে পাবে...।

শৈলেশের কৃতার্থ উৎফুল্ল মূর্তিটা যেন একটা অদ্ভুত হাস্যময় ব্যস্ততার মূর্তি হয়ে চলে যায়।

যাই হোক্, আজ আর এই ঘরে বসে থাকবার কোন মানে হয় না। প্রকাশ মাস্টার আর পড়াতে আসবে না। তবুও চুপ করে বসে থাকে বাণী। টেবিলের উপর বইগুলিও যেন শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে চুপ করে পড়ে থাকে।

—কেমন আছেন বাণীদি? ছোট্ট একটা উল্লাসের প্রশ্নের শব্দ।

শুনে চমকে ওঠে, তার পরেই হেসে ফেলে বাণী—এতদিনে বাণীদিকে মনে পড়লো?

বিমল বলে—এতদিন আপনার কাছে ঘেঁষবারও কি কোন উপায় ছিল?

বাণী—কেন? একথার মানে কি?

নীহার—যা সাংঘাতিক পড়া শুরু করেছিলেন, যেন মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

বাণী—বাঃ, এই দু'বছরে নীহারের কথার বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি।

অভয়—আমরা যে এখন ক্লাস টেন, ভুলে যাচ্ছেন কেন বাণীদি?

বাণী—ওরে বাবা। সত্যিই, সব দিকেই উন্নতি।

শেখর—আপনারাই বা কোন্ দিকে উন্নতির বাকি রাখলেন বাণীদি?

বাণী—তার মানে?

বিমল—একজন হতে চলেছেন এ শহরের ফার্স্ট মেয়ে গ্র্যাজুয়েট, আর একজন এ-শহরের ফার্স্ট রায়সাহেব।

বাণী ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকে।—বুঝলাম, আজ দল বেঁধে আমাকে ঠাট্টা করতে আসা হয়েছে।

বিমল—না বাণীদি। বিশ্বাস করুন, আমরা ঠাট্টা করতে আসিনি, আমরা নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

বাণী—কিসের নেমন্তন্ন?

অভয়—ধীরেনদাদের ড্রামাটিক ক্লাব বিল্বমঙ্গল অভিনয় করবে। এই নিন কার্ড। অবশ্যই যাবেন কিন্তু।

নীহার—ধীরেনদা বার বার বলে দিয়েছেন, আপনার যাওয়া চাই-ই।

শেখর—শৈলেশদাকে আগেই কার্ড দিয়েছি।

কুড়ি

ছোট শহরের ছোট ড্রামাটিক ক্লাবের স্টেজও বেশ ছোট, কিন্তু তাই বলে থিয়েটারের আনন্দটা ছোট নয়। মস্ত বড় বাড়িতে আর অনেক লোকজনের মধ্যে একটি মাত্র ছোট ছেলে থাকলে তার কলরবের যেমন আদর হয়, এ-শহরে এই ছোট স্টেজের থিয়েটারেরও তেমনি আদর। বছরে মাত্র দু'দিন থিয়েটার করে ড্রামাটিক ক্লাব ; কিন্তু সেই দুটো দিন এই ছোট শহরের জীবনে যেন দুটো উৎসবের দিন। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা সকাল থেকেই ব্যস্ত হয়ে থাকে ; মহিলারা দুপুর থেকে, আর ভদ্রলোকেরা বিকেল থেকে। যে-সব বাড়িতে রান্নার ঠাকুর নেই, সে-সব বাড়িতে রাত্রির রান্না দিনের বেলাতেই সেরে রাখা হয়।

ড্রামাটিক ক্লাবের থিয়েটারের আয়োজন আর উৎসাহে শৈলেশ বরাবরই একটু বেশি সাহায্য করে থাকে। বেশি টাকা দেয় শৈলেশ, আর একটু বেশি খোঁজখবরও নেয়। ধীরেন স্বীকার করে, শৈলেশদার মত পেট্রন এখনও আছেন বলেই ড্রামাটিক ক্লাব এখনও হেসেখেলে চলছে।

পেট্রন শৈলেশ এবছরের এই বসন্তোৎসবের থিয়েটারকে একটা নতুন গৌরবের ব্যাপার করে তুলেছে। ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব আর সেন্সারের সুপার মিস্টার লেসিকে থিয়েটার দেখতে শৈলেশ নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। দুই সাহেব খুশি হয়ে কথা দিয়েছেন, থিয়েটার দেখতে আসবেন।

অন্য বছর সন্ধ্যা হবার পর ভিড় হয়, এ-বছরের এই বসন্তোৎসবের বিল্বমঙ্গলে সন্ধ্যার অনেক আগেই ভিড় জমে গিয়েছে। সামিয়ানার ভিতরে আর লোক ধরবে না বলে মনে হয়। সবচেয়ে বেশি ভিড় করেছেন বয়স্ক ভদ্রলোকেরাই।

সাতটায় আরম্ভ হবে বিল্বমঙ্গল। সাতটা বাজবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে উপস্থিত হলেন দুই সাহেব, লিস্টার আর লেসি। শৈলেশই এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে দুই সাহেবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। সামনের সারির ঠিক মাঝখানে, সিংহাসনের মত দেখতে দুটো প্রকাণ্ড চেয়ারে দুই সাহেব বসলেন। এই স্পেশাল চেয়ার দুটোকে শৈলেশই কুমারসাহেবের বাড়ি থেকে আনিয়ে রেখেছিল।

বিমল অভয় নীহার আর শেখর—ওরা হলো ভলান্টিয়ার। শৈলেশ যেমন সাহেব দু'জনকে আপ্যায়িত করবার কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে ; ওরা তেমনই ওদের বাণীদিকে আপ্যায়িত করবার কাজে ব্যস্ত। মেয়েদের জায়গাটা যে চিক দিয়ে আড়াল করা, সেই চিকের বাইরে একটা চেয়ারের উপর বসেছে বাণী। পেট্রন শৈলেশও আজ যেন হেড ভলান্টিয়ারের মত ঘুরে ফিরে দেখা-শোনা করছে, আর মাঝে মাঝে সাহেবদেরই কাছের একটা চেয়ারে বসছে।

ধীরেন হঠাৎ এসে শৈলেশের কানের কাছে যেন একটা চাপা আর্তনাদের স্বরে কথা বলে। শৈলেশের চোখে-মুখেও যেন একটা আতঙ্ক চমকে ওঠে।

কি-যেন ভাবে আর ভাবতে গিয়ে ছটফট করে শৈলেশ। তারপরেই উঠে এসে বিমলকে ডাক দেয়—এখনই যাও, এই মুহূর্তে প্রকাশ মাস্টারকে ডেকে নিয়ে এস। আমার নাম করে বলবে, আমি ডাকছি।

চলে যায় বিমল। শৈলেশ আর ধীরেনও ব্যস্তভাবে বাইরে চলে যায়।

সাতটা বাজতে আর আধ মিনিট বাকি। শৈলেশ আবার ব্যস্তভাবে ফিরে এসে সাহেবদের

পাশের চেয়ারে বসে। বিমল ছুটে বাণীর কাছে এসে হাঁপাতে থাকে। যেন খুশি হয়ে হাঁপাচ্ছে বিমলের চোখ দুটো। নীহার শেখর আর অভয় বলে—কি ব্যাপার? বাণী বলে—কি হয়েছে বিমল?

বিমল বলে—বিল্বমঙ্গল হবেন যিনি, সেই পরেশদা হঠাৎ পড়ে গিয়ে জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন। কাজেই, প্রকাশদা বিল্বমঙ্গল হবেন।

—সে কি! চেঁচিয়ে ওঠে নীহার আর শেখর।

অভয় বলে—পার্ট মুখস্থ নেই, তবে কেমন ক'রে...।

বিমল—হ্যাঁ, তবু রাজি হয়েছেন প্রকাশদা।

সাতটা বাজতেই ড্রপ সীন উঠলো। অভিনয় শুরু হলো। এক বর্ণও বাংলা বোঝেন না, তবু দুই সাহেবও যেন মুগ্ধ হয়ে দেখছেন আর শুনছেন। অভয়ের কানের কাছে ফিসফিস করে বিমল—প্রকাশদা যে সত্যিই মাত্ করে দিচ্ছেন।

প্রথম ড্রপ পড়ে যাবার পর দুই সাহেব চলে গেলেন। কিন্তু, বয়স্ক ভদ্রলোকদের ভিড়টা সেজন্য একটুও হালকা হয়ে গেল না, অথচ এই ভিড়টা হলো, ঐ দুই সাহেবের থিয়েটার-দেখা দেখবার ভিড়।

অভয় বলে—দেখছিস বিমল, মেজকাকাও কেমন চুপটি করে আর হাঁ করে বসে আছেন।

শেখর—প্রকাশদার বিল্বমঙ্গল দেখে একেবারে জমে গিয়েছেন মনে হচ্ছে।

নীহার বলে—কারও সাধ্যি নেই যে উঠে যায়।

আবার শুরু হয়েছে অভিনয়। বিল্বমঙ্গলের চোখে জল। বিল্বমঙ্গলের গলার স্বর কি-ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে ছটফট করছে—আমি অতি দীন, আমি অতি হীন। হে রাখাল, জান যদি বল, হৃদয়ের আলো, কোথা বনমালী কালো? দাও এনে দাও, প্রেমক্ষুধা তৃপ্ত কর মোর।

হাততালি দিল অভয় আর বিমল, শেখর আর নীহারও হাততালি দিয়ে ফেলতো কিন্তু ওদের হাততালি আর হাততালির উৎসাহ সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। ভ্রূকুটি করে ছুটে এসে ধমক দেয় শৈলেশ—স্টপ! স্টুপিড!

অভয় বলে—কি দোষ হলো শৈলেশদা?

—চুপ! রুষ্ট স্বরে আবার ধমক দেয় শৈলেশ।

মাথা হেঁট করে আর চুপ করে বাস থাকে অভয়। বিমল নীহার আর শেখরের মুখও যেন হঠাৎ চড়-খাওয়া মুখের মত লালচে হয়ে ওঠে।

চলে যেতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় শৈলেশ। চমকে উঠেছে শৈলেশের চোখ দুটোও। ওভাবে অমন করে স্টেজের দিকে তাকিয়ে আছে কেন বাণী? কি দেখছে বাণী? বাণীর চোখে পাতা পড়ে না কেন? কি শুনছে বাণী? বাণীর চোখ ছলছল করে কেন?

শৈলেশের চোখের ভ্রূকুটি একবার ছটফট করে শিউরে ওঠে। চলে যায় শৈলেশ। নিজের চেয়ারে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

থিয়েটার ভাঙ্গবার পর বাণীকে সঙ্গে নিয়ে আর গম্ভীর হয়ে যখন চলে যেতে থাকে শৈলেশ, তখন বিমল শেখর আর নীহার অভয়কে সামলাতে গিয়ে হয়রান হতে থাকে। আপত্তি আর অনুরোধ কিছুই শুনতে চাইছে না অভয়। অভয় যেন একটা বিদ্রোহ।—না না, আমি বলবোই।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো অভয়। —হাততালি একদিন শুনতেই হবে। এর চেয়ে আরও ভাল হাততালি।

মুখ ফিরিয়ে পিছনের দিকে একবার তাকায় শৈলেশ। চোখের ভ্রূকুটি আর একবার শিউরে ওঠে।

একুশ

মহিম-ভবন, তার মানে স্কুল সেক্রেটারী শৈলেশর বাড়ি আজ একটা উৎসবের বাড়ি। শৈলেশের বিয়ের দিনে যে-রকমের চাঞ্চল্য আর হর্ষ নিয়ে এই মহিম-ভবন মুখর হয়ে উঠেছিল, আজ আবার প্রায় সেই রকমেরই মুখর হয়ে উঠেছে। কত লোক আসছে হাসছে আর চলে যাচ্ছে। মহিলারা আসছেন, প্রবীণা নবীনা সকলেই। চায়ের পেয়ালার শব্দ সকাল থেকেই ঝনঝন করছে। ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টি আসছে আর ফুরিয়ে যাচ্ছে।

মহিম-ভবনের দুটি মানুষের জীবনের ঘটনা বটে, কিন্তু এই ছোট শহরের জীবনেরও দুটো গৌরবের ঘটনা। বি-এ পাশ করেছে বাণী। খবরটা এসেছিল কাল দুপুর বেলাতেই। আর পাটনা থেকে কালিকাপ্রসাদবাবুর টেলিগ্রামটা এসেছিল কাল রাত্রি দশটায়। রায়সাহেব খেতাব পেয়েছে শৈলেশ।

মহিম-ভবনের বাইরের ঘর, যে-ঘরটা দু'বছর ধরে বাণীর পড়ার ঘর ছিল, সে-ঘরের টেবিলে আর শেল্‌ফে আজও বইগুলি সাজানো আছে। ঘরটাকে অনেক ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে।

—কই গো, আমাদের শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে কি করছেন? দুপুর হতেই বিমলের মা এসে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে বাণীর গলা জড়িয়ে ধরেছেন।

বিকেল হবার পর বিমল শেখর নীহার আর অভয় আসে। অভয় বলে—আমরা কিন্তু রায়সাহেবকে সেলাম দিতে আসিনি বাণীদি।

বাণীদি হাসেন—তোমার রাগ এখনও পড়েনি দেখছি, অভয়।

—ও রাগ পড়বার নয় বাণীদি ; আপনি কিছু মনে করবেন না।

বিমল বলে—না অভয়, আজকের দিনে কোন রাগারাগির কথা নয়। ওসব কথা ভুলে যাও।

শেখর বলে—হ্যাঁ, আজ যে আমাদের একটা গর্বের দিন।

বাণী হাসে—কিসের এত গর্ব, শেখর?

শেখর—গর্ব হলেন আপনি। আপনি এই শহরের গর্ব।

নীহার—আপনি আমাদেরও গর্ব।

বিমল—আপনি শৈলেশদারও গর্ব।

অভয়—আপনি প্রকাশদারও গর্ব।

ঘরের একটা জানলার কাচের পাট বন্ধ ছিল। ব্যস্তভাবে উঠে গিয়ে জানলার কাচের পাট দুটো খুলে দেয় বাণী। শেষ বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে। টেবিলের উপর রাখা ফুলদানির ফুলের পাপড়ি শিউরে উঠতে থাকে।

বিমল বলে—প্রকাশদা এসেছিলেন নাকি, বাণীদি?

—না। তোমরা খাবার না খেয়ে চলে যেও না। একটু বসো। খাবার আনতে চলে যায় বাণী।

—বাণী ; একটা মজার খবর আছে শুনে যাও। ও-ঘরের ভিতর থেকে ডাকছে শৈলেশ। সত্যিই একটা হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকের ডাক, একটা ব্যাকুল খুশির ডাক।

বাইরে বের হবার জন্য তৈরী হয়েছে শৈলেশ। সাজ সারা হয়ে গিয়েছে। শৈলেশ হাসে—একটু কাছে এসে দাঁড়াও গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। কথাটা চেঁচিয়ে বলবার কথা নয়।

বাণী—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—যাচ্ছি সার্কিট হাউসে। আজ সন্ধ্যায় লিস্টার সাহেবকে একটা চা-পার্টি দেবার ব্যবস্থা করেছি। যাক্, কথাটা হলো, যে-কথাটা কোনদিন তোমাকে বলিনি। ইচ্ছে করেই চেপে রেখেছিলাম। কারণ, আমার দরকার ছিল কাজ হাসিল করা। তাই বাধ্য হয়ে চুপ করে ছিলাম,

আর ঐ জোচ্চোর প্রকাশকে সহ্য করেছিলাম।

চমকে ওঠে বাণী। চোখের তারা দুটোও দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

শৈলেশ—তুমি বোধহয় আগে বুঝতেই পারতে না, কেন আমি প্রকাশ মাস্টারের সম্পর্কে শক্ত কথা বলতাম। তুমি জানতে না বলেই বুঝতে পারতে না।

বাণী--আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

শৈলেশ বলে--আজ এখন আমি খুব ব্যস্ত ; এখন আর হবে না। সন্ধ্যে হলেই পার্টি থেকে ফিরে এসে প্রকাশকে পুলিশের হাতে তুলে দেব।

—কি ভয়ানক কথা বলছো?

--একটুও ভয়ানক কথা নয়।

—কেন?

—প্রকাশ বসু নামে ঐ মাস্টারটা প্রকাশও নয়, বসুও নয়, বি-এ'ও নয়।

—তার মানে?

—তার মানে একটা ঠগ। পৃথিবীতে প্রকাশ বসু নামে বি-এ পাশ এক ভদ্রলোক ঠিকই আছেন। তিনি রেঙ্গুনে মাস্টারী করেন।

—ইনি তবে কে?

--ইনি একটি ধাপ্পা ; একটি ভ্যাগাবণ্ড।

—কবে এসব খবর জানলে তুমি?

--জেনেছি দু'বছর আগেই।

--তবে তখনই ওকে পুলিসে দিলে না কেন?

—সেটা এখনও বুঝতে পারছো না কেন?

—কেন?

—আমাদের সুবিধের জন্য ওকে এখানে আরও দুটো বছর রাখবার দরকার ছিল। এখন তো আর কোন দরকার নেই। আমি রায়সাহেবী পেয়ে গিয়েছি, তুমিও বি-এ পাস করেছো।

—তোমার পায়ে পড়ি। চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলে বাণী।

--খুব ভুল করছো বাণী। একটা ঠগের জন্যে এসব সেন্টিমেন্টের কোন মানে হয় না।

--হলোই বা ঠগ, কিন্তু লোকটা তোমার আমার কত উপকার করেছে, ভেবে দেখ।

--সব ভেবে দেখেছি। আরও একটা কথা ভেবে দেখেছি, যেটা কোনদিন তোমাকে বলবো না।

কি সাংঘাতিক একটা প্রতিজ্ঞার আগুন শৈলেশের চোখ দুটোতে জ্বলতে শুরু করেছে। বোধ হয় বাণীর এই কান্নাভেজা মুখটাকে একটা অভিশাপের মুখ বলে সন্দেহ করেছে শৈলেশ। বোধহয় একটা ভয় পেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে শৈলেশের সেই ভালবাসার চোখ, যে-চোখে একদিন এই বাণীর মুখটাকে স্বপ্নলোকের এক মেয়ের মুখ বলে মনে হয়েছিল।

বাণী বলে—তুমি এমন কি কথা ভেবেছ, যা আমাকে কোনদিন বলতে পারবে না? এমন কি কথাই বা থাকতে পারে?

—জিজ্ঞাসা করো না।

—ছিঃ, এমন ভুল করো না। বিশ্বাস কর, তোমার ভাববার কিছুই নেই।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। দোহাই তোমার, লক্ষ্মীটি, তুমি প্রকাশ মাস্টারকে পুলিসের হাতে দিও না। ওকে চুপে চুপে তাড়িয়ে দাও।

—কি বললে?

—চুপে চুপে চোরের মত এসেছিল, চুপে চুপে চোরের মতই চলে যাক্ লোকটা। ওকে

পুলিসে দিয়ে আমাদের কি লাভ?

--লাভ আছে।

--কিচ্ছু লাভ নেই। বাণীর গলার স্বর যেন ধুলোয় লুটিয়ে পড়া একটা আহত প্রাণীর গলার স্বর।

--লাভ আছে ; আমি অনেক ভেবে দেখেছি। শৈলেশের গলার স্বরও যেন একটা পাথরের প্রতিজ্ঞার স্বর।

--না। কোন লাভ নেই। বরং...।

--কি?

--ক্ষতি হবে?

--কার ক্ষতি?

--তোমার ক্ষতি, আমার ক্ষতি।

--বাজে কথা!...আমি চলি।

শৈলেশের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বাণী--ভুল করো না।

চোখ দুটো উদাস করে, যেন একটা মৃত্যুভয় থেকে বাঁচবার জন্য আবেদন করছে বাণী। কি ভয়ানক করুণ হয়ে কাঁপছে বাণীর কথাগুলি ঃ ভুল করো না।

শৈলেশ বলে--তুমি এক কাপ চা খেয়ে আর সুস্থ হয়ে একটু ভাব, কোথায় বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে ; পুরীতে না সিমলাতে?

বাণীর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চলে যায় শৈলেশ।

দেখে আশ্চর্য হয় বিমল আর অভয়, শেখর আর নীহার। মিষ্টি খাবার আনতে গিয়ে নিজেই যেন একেবারে তেতো হয়ে ফিরে এলেন বাণীদি। হাতে খাবারের ডিস নেই, শূন্য হাতে যেন একটা শূন্যতাকে আঁকড়ে ধরে আর বেশ উতলা হয়ে ভিতরের ঘরের দিক থেকে ছুটে এলেন। এই তো এই মাত্র, বাইরে বেরিয়ে গেলেন শৈলেশদা। কিন্তু এরই মধ্যে ভিতরের ঘরের জীবনে এমন কি কাণ্ড হয়ে গেল, যে-জন্য এরকম একটা অদ্ভুত আর আলুথালু মূর্তি নিয়ে বের হয়ে এলেন বাণীদি?

পড়ার ঘরের খোলা জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আর শেষ বিকেলের রাঙা আলো ছড়ানো সামনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে ছটফট করে বাণী।--বিমল!

--বলুন।

--তোমাদের প্রকাশদা কোথায় কতদূরে থাকেন?

চেঁচিয়ে ওঠে অভয়--এই তো, এখান থেকে বড় জোর বিশ মিনিট ; টেম্পল্ রোড পার হয়েই...।

--এখন তোমাদের প্রকাশদা নিশ্চয়ই বাড়িতেই আছেন?

--থাকতে পারেন। না থাকলেই বা কি? খুঁজে বের করে নিতে পারবোই।

অভয় বলে--মনে হচ্ছে, প্রকাশদা এখন অন্ধ নন্দীসাহেবের বাড়িতে বই আনতে গিয়েছেন।

--কি বললে? চেঁচিয়ে ওঠে বাণী। বাণীর গলার স্বর হঠাৎ যেন আর্তনাদ হয়ে বেজে উঠেছে। বুকের ভিতরে একটা গোপন বিস্ময়, এতদিনে নিজেকে চিনতে পেরেছে, মায়াহরিণের ডাক রক্তমাখা বেদনায় ছটফট করে উঠেছে।--নন্দীসাহেবের সঙ্গে তোমাদের প্রকাশদার কিসের সম্পর্ক? কবে থেকে? কেন? কিসের জন্য?

অভয় বলে--অনেকদিন থেকে। প্রকাশদা যে নন্দীসাহেবেরই লাইব্রেরী থেকে গাদা গাদা বই আনেন আর পড়েন। নন্দীসাহেব প্রকাশদাকে খুব ভালবাসেন।

--অভয়। বাণীর গলার স্বর যেন একটা উতলা ঝড়ের আবেদন।

অভয়ও ব্যস্তভাবে উত্তর দেয়--বলুন বাণীদি।

--আমাকে এখনি একবার নিয়ে যেতে পারবে?

--কোথায়?

--তোমাদের প্রকাশদার বাড়িতে।

--নিশ্চয়।

জানালার গরাদটা আঁকড়ে ধরে বাণী।--না থাক্,...তবে একটা কাজ কর।

--বলুন।

--প্রকাশদাকে এখনি একবার ডেকে নিয়ে আসতে পারবে?

--খুব পারবো।

জানালার গরাদ ছেড়ে দিয়ে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, আর জোরে একটা হাঁপ ছেড়েই চেঁচিয়ে ওঠে বাণী--না থাক্।...তবে একটা কাজ কর।

--বলুন।

--তোমরাই যাও গিয়ে বল যে, এখুনি যেন এই শহর ছেড়ে চলে যান প্রকাশদা। এক মিনিটও যেন দেরি না করেন। বলবে, আমি বলেছি।

--কেন বাণীদি?

বাণী--না চলে গেলে ধরা পড়ে যাবেন তোমাদের প্রকাশদা। বিপদ হবে। পুলিস আসবে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে বাণী।

বিমল বলে--আমরা এখনি যাচ্ছি।

--হ্যাঁ, যাও লক্ষ্মী ভাই। কিন্তু শুধু প্রকাশদাকেই বলবে ; আর কাউকে এসব কথা বলবে না।

--কখ্খনো না।

ছুটে চলে যায় বিমল আর নীহার শেখর আর অভয়। টেম্পল রোড পার হয়ে যেতে দশ মিনিটও লাগে না।

ঘরের ভিতরেই বসে ছিল প্রকাশ মাস্টার।

বিমল আর অভয়ের উদ্বেগের বার্তা শুনে চমকে ওঠে, তারপরেই হাসতে থাকে।--এখুনি যাচ্ছি।

বিমল--কিন্তু আপনি চলে যাবেন কেন স্যার?

প্রকাশ--কেন? তোমাদের বাণীদি কিছু বলেননি?

নীহার--না।

প্রকাশ হাসে--আমি বি-এ পাস-টাস নই। মিথ্যে কথা বলে তোমাদের স্কুলের সেকেণ্ড স্যার হয়েছিলাম।

আলনা থেকে শুধু কামিজটাকে তুলে নিয়ে গায়ে দেয় প্রকাশ। ঘরের আর কোন জিনিসের দিকে তাকায় না। ঘরের ভিতরে আর কোন জিনিস আছে বলে যেন মনেই করতে পারছে না ; চোখেই দেখতে পাচ্ছে না।

ঘরের বাইরে এসে দরজার কপাটটাকে শুধু ভেজিয়ে দেয় প্রকাশ।

অভয় বলে--সত্যিই চলে যাচ্ছেন স্যার?

প্রকাশ--নিশ্চয়।

বিমল--তাহলে প্রণাম করি স্যার?

চোখ বড় করে হেসে ফেলে প্রকাশ--আমাকে প্রণাম করবে? কর তাহ'লে।

চার ছাত্র প্রণাম করে। ভুয়া বি-এ, নাম-ভাঁড়ানো এক কপট সেকেণ্ড স্যার একটুও বিহ্বল বা বিচলিত না হয়ে, বরং হেসে হেসে যেন বুকভরা একটা তৃপ্তির ভারে নম্র হয়ে আর

আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যেতে থাকে।

অভয় বলে--বাণীদিকে কিছু বলতে হবে স্যার?

প্রকাশ--না।

কোথায় কোন্ দিকে চলে গেলেন সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদা, কে জানে? রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে এসে, স্কুলের মাঠের কাছে পৌঁছতেই মনে হয়, প্রকাশদা যেন আবছায়াময় সন্ধ্যাটার বাতাসে চিরকালের মত মিশে গিয়েছেন।

মাঠের ঘাসের উপর ক্লান্তভাবে লুটিয়ে বসে পড়েই অভয় বলে--প্রকাশদাকে এতদিনে চিনতে পারা গেল। বাণীদির জন্যই...।

বিমল--তার মানে?

অভয়--বাণীদি চলে যেতে বললেন বলেই চলে গেলেন প্রকাশদা।

নীহার--কিন্তু বাণীদিকে তো জানিয়ে দেওয়া উচিত।

শেখর--কি?

নীহার--প্রকাশদা সত্যিই চলে গিয়েছেন।

অভয়--ঠিক কথা।

বাইশ

মহিম-ভবনের ফটকে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠে পিছন দিকে তাকায় আর এক পাশে সরে দাঁড়ায় বিমল আর অভয়, নীহার আর শেখর। সড়ক ধরে কি ভয়নাক স্পীড নিয়ে আর কি সাংঘাতিক হর্ন বাজিয়ে চিৎকার করে ছুটে আসছে শৈলেশদার গাড়িটা। যেন রেগে ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে শৈলেশদার গাড়ির হেডলাইট দুটো। ফটকের কাছে এসে গাড়িটা যেন পাগল মাতালের মত একটা প্রচণ্ড ভিরমি খেতে টার্ন নিল ; চার চাকার ঘষা খেয়ে কাঁকর ছিটকে পড়লো চারদিকে।

গাড়ি থেকে নামছেন শৈলেশদা, মহিম-ভবনের ফটকের কাছেই দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে পায়। শুনতে পাওয়া যায়, শৈলেশদার জুতোর শব্দ যেন বাইরের বারান্দার মেজেটাকে ঠুকে-ঠুকে অন্যদিকের ঘরের ভিতরে চলে গেল।

বাণীদির পড়বার ঘরে যে আলো জ্বলছে, তা'ও দেখা যায়। আর, একটু এগিয়ে যেয়েই ওরা দেখতে পায় ; হ্যাঁ, বাণীদি চুপ করে ঐ ঘরেই একটা চেয়ারে বসে আছেন। বাণীদির সুন্দর মুখটা এই একবেলার মধ্যেই যেন দুপুরের রোদে পোড়া ফুলের মত শুকিয়ে ঝিরঝির করছে।

কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে শৈলেশদার সেই আক্রোশের পদাঘাত আবার শব্দ ক'রে ক'রে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বাণীদির ঘরের দিকে চললো। বারান্দার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে শৈলেশদার চেহারাটা যেন একটা কালো পাথরের চেহারার মত শক্ত হয়ে সেই ঘরের ভিতরে ঢুকলো, যে-ঘরের ভিতরে একটি চেয়ারে বাণীদি চুপ করে বসে আছেন, আর টেবিলের উপরে একগাদা বই স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে।

অভয় ফিসফিস করে ডাকে--আয় বিমল। নীহার শেখর শিগ্‌গির আয়।

একেবারে নিথর হয়ে, বারান্দার অন্ধকারের সঙ্গে গা মিশিয়ে দিয়ে, এক ভূয়া সেকেণ্ড স্যারের চারটি দুরন্ত ছাত্র যেন ওদের এক দুঃসহ কৌতূহলের সমাপ্তি দেখবার লোভে চার-জোড়া চোখ সুস্থির করে আর উঁকি দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে শৈলেশ বলে--আমি থানা থেকে আসছি। পুলিস বললে. লোকটা পালিয়েছে।

বাণীদি--কখন পালালো?

শৈলেশ--সেটা পুলিস জানে না, কিন্তু তুমি জান।
বাণীর মাথাটা হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে!
শৈলেশ--কথা বল। উত্তর দাও।
মুখ তোলে বাণী--কি বলবো?
শৈলেশ--কখন্ পালালো লোকটা?
বাণী--তা জানি না।
শৈলেশ--কখন্ পালিয়ে যেতে বলেছিলে তুমি?
উত্তর দেয় না বাণী।
শৈলেশ--তুমি নিজে গিয়ে বলেছিলে?
বাণী--না।
শৈলেশ--লোকটা নিজেই এসেছিল?
--না।
--লোকটাকে তুমি ডেকে পাঠিয়েছিলে?
--না।
--তবে?
--বলে পাঠিয়েছিলাম।
--কা'কে পাঠিয়েছিলে?
--বিমল অভয় আর...।
--তোমার সেই চারটে বকাটে আর আদুরে এজেন্টকে?
কথা বলে না বাণী।
--উত্তর দাও।
--কি?
--তুমি কেন লোকটাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলে?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বাণী। বোধ হয় অন্য ঘরে চলে যেতে চায়। বাণীর দিকে দু'পা এগিয়ে যেয়ে আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায় শৈলেশ।

বারান্দার অন্ধকারে ফিসফিস করে বিমল--দেখছিস অভয় ; শৈলেশদার হাতে একটা বেত।

অভয় বলে--চুপ।

শৈলেশ বলে--ঐ লোকটাকে পুলিসে দিলে তোমার কি ক্ষতি হতো?

শৈলেশের মুখের দিকে শুধু অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে বাণী. কোন উত্তর দেয় না।

চেঁচিয়ে ওঠে শৈলেশ--কষ্ট হতো?
বাণী--হতো।
দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে শৈলেশ--কেন কষ্ট হতো? লোকটা তোমার কে?
বাণী--টিউটর।
শৈলেশ--তোমার শ্রদ্ধা?
বাণী--হ্যাঁ।
--তোমার কৃতজ্ঞতা?
--নিশ্চয়।
--তোমার মায়া?

--তাই।

শৈলেশের হাতের চকচকে বেতটা যেন একটা হিংস্র আক্রোশের বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে বাণীর মুখের উপর আছড়ে পড়ে।--বল, তোমার ভালবাসা?

বাণী বলে--হ্যাঁ।

বাইরের বারান্দার অন্ধকার যেন মুহূর্তে পাল্টা হিংসার আনন্দে, প্রতিশোধের উল্লাসের মত হাততালি দিয়ে ফেলে। অভয়ের হাত চেপে ধরে বিমল--চুপ চুপ চুপ।

শৈলেশের হাতের বেত কাঁপতে থাকে।--হাততালি দিল কে? অভয় বোধহয়?

বাণীর বাঁ মুখের একটা দিকে, কপাল থেকে বাঁ চোখের পাশ দিয়ে গাল পর্যন্ত লম্বা একটা লাল্‌চে দাগ যেন ধিকধিক করে জ্বলছে। কিন্তু বাণীর মাথাটা একটুও কাঁপে না, মাথাটা হেঁটও করে না বাণী। আর চোখ দুটো যেন নির্বিকার নির্ভয় আর শান্ত দুটো অপলক চোখ।

শৈলেশের হাতের বেতটা মরা সাপের মত ঝুপ করে মেজের উপর পড়ে যায়। শৈলেশের কঠোর চেহারাটাও হঠাৎ একেবারে অলস হয়ে চেয়ারের উপর বসে পড়ে।

দরজার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে বাণী।

শৈলেশ--মুখের উপর ঐ দাগ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? সবাই যে দেখে ফেলবে?

বাণী--সবাই দেখুক, তুমি একা দেখবে কেন?

দরজার কাছে এসেই হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায় বাণী। যেন হোঁচট খেয়েছে বাণী। মুখ ফিরিয়ে তাকায়। ঠিকই, ভয়ানক একটা শব্দ করে শৈলেশের একটা অদ্ভুত নিঃশ্বাস বেজে উঠেছে।

ফিরে এসে শৈলেশের চেয়ারের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাণী! শৈলেশের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ; তার পরেই ঘরের শেল্‌ফের দিকে তাকিয়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে বাণী।

বিমল বলে--দেখ দেখ অভয়, বাণীদি কি করছেন?

অভয়--কি আশ্চর্য, শৈলেশদাকে পাখার বাতাস দিচ্ছেন কেন বাণীদি?

বিমল--শৈলেশদার চোখ দুটো যে ছল-ছল করছে।

অভয়--হাততালি দেব আবার?

বিমল--থাক্, আর দরকার নেই।

অভয়--কিন্তু...।

বিমল--কি?

অভয়--বাণীদিকে কিন্তু চিনতেই পারা গেল না।

মুক্তিপ্রিয়া

কথাটা ঠিক ; অর্চনার পড়াশোনার মন আর মনোযোগের একটা ব্যাঘাত মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু সেই ব্যাঘাতটাকে যেভাবে বাধা দিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়, সেটা অর্চনার ভাল লাগে না।

আজ সন্ধ্যা থেকেই সামনের ঐ বাড়িতে বেহালাটা বাজতে শুরু করেছিল। বোধহয় শ্রীরাগ সাধছে বেহালাটা। সুর আর স্বরের ভাল-মন্দ একটু-আধটু অর্চনাও বোঝে ; আর, ভাল রাগের আলাপ শুনতে ভালও লাগে। কিন্তু পনরটা মিনিটও পার হলো না। রেডিওর চাবি টিপে দিলে কথা আর গানের শব্দ যেমন এক মুহূর্তে আচম্‌কা স্তব্ধ হয়ে যায় ; ঠিক তেমনই বেহালাটার শ্রীরাগ যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। মুখর ব্যাঘাতটাকে কেউ যেন হঠাৎ গলা টিপে বোবা করে দিল।

বিশ্রী একটা অস্বস্তি বোধ করে অর্চনা। হলোই বা ব্যাঘাত, কিন্তু সে ব্যাঘাতকে এভাবে হঠাৎ গিয়ে স্তব্ধ করে দিয়ে আসা একটু বেশি রকমের রূঢ়তা। খোঁজ না নিলেও অর্চনার বুঝতে কোন অসুবিধে নেই, কেন আর কিসের জন্য সামনের বাড়ির বেহালা নীরব হয়ে গেল। কে গিয়ে বাধা দিল, আর কার আদেশে বাধা দেওয়া হলো, সবই বুঝতে পারে অর্চনা। কারণ, সবই জানা আছে। এটা আজ একটা অভিনব কোন ঘটনা নয়।

বাবা বিরক্ত হয়েছেন আর বলেছেন, তাই চাকর মনবাহাদুর ছুটে গিয়ে সামনের বাড়ির বারান্দায় উঠেছে। দরজার কড়া নেড়েছে। আর, বিশুদ্ধ নেপালী ভঙ্গীতে অশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় আপত্তি জানিয়েছে—বন্দ্ বন্দ্, আবি বাজা বন্দ্ করো।

মনবাহাদুরের কথা বলার রকমটা তো এমনিতেই সাংঘাতিক ; হেসে কথা বললেও মনে হয় ধমক হাঁকছে। তার উপর যদি প্রভুর কোন নির্দেশ থাকে, আর নির্দেশটা যদি কোন রূঢ় কাজের নির্দেশ হয়, তবে তো কথাই নেই। মনবাহাদুরের মুখের ভাষা প্রায় একটা রাগী গর্জনের ভাষা হয়ে ওঠে।

সামনের বাড়িতে গিয়ে মুখর বেহালাটাকে স্তব্ধ করিয়ে দেবার কাজটা মনবাহাদুর কি-ভাবে আর কি ভাষায় সেরে আসে, সেটাও অনুমান করতে পারে অর্চনা। তা ছাড়া, কয়েকবার নিজের চোখে দেখেছে আর নিজের কানেও শুনেছে অর্চনা ; বাবার হুকুম শোনামাত্র কি-রকম হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল মনবাহাদুর, সামনের বাড়ির বারান্দায় উঠে কি-রকম দুরন্ত উৎপাতের মত দরজার কড়া দুটো নাড়লো আর হাত দিয়ে কপাটের উপর দুমদাম ধাক্কাও দিল। খুলে গেল কপাট। তারপর মনবাহাদুরের সেই ধমক-ধমক ভাষা—বন্দ্, আবি বন্দ্।

—কেন? ঘরের ভিতর থেকে মৃদুস্বরের একটা প্রশ্ন কথা বলে।

মনবাহাদুর বলে—দিদি কিতাব পড়তা। বাজা বন্দ্ করো।

দিদি বই পড়ছেন ; অতএব বেহালা বাজানো বন্ধ কর। এই নির্দেশ এ-বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে এবং প্রায়ই সামনের ঐ বাড়ির উপর চড়াও করে যে কাণ্ড করে আসে, সেটাও যে সে-বাড়ির মন আর মনোযোগের একটা ব্যাঘাত হতে পারে কিংবা হয়ে উঠেছে, এরকম কোন প্রশ্ন বোধহয় অর্চনার বাবা সামন্ত সাহেবের ধারণাতে নেই, ধারণার ধারে-কাছেও নেই। জানে অর্চনা, বাবা যদি এই সামান্য সত্যটুকু বুঝতে পারতেন, তবে এভাবে যখন-তখন সামনের ঐ নিরীহ বাড়িটার উপর এরকম হুকুম জারি করতে পারতেন না। শুধু ব্যাঘাত কেন, এটা যে একটা বিশ্রী আঘাতও বটে। বেহালা তো ইচ্ছে করে অর্চনার পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য শ্রীরাগ সাধে না ; নিজের খুশিতে বাজে। হয়তো সন্ধ্যার বাতাসে একটু সুরের

মায়া ছড়িয়ে দেবার জন্যই বাজে। কাজেই, বেহালাটাকে ওভাবে নীরব করে দিলে একটা আঘাত দেওয়া হয় বইকি। তাছাড়া, বাবা আরও একটা সামান্য সাধারণ সত্য ভুলে যাচ্ছেন, ওভাবে যখন-তখন বেহালাটাকে স্তব্ধ করে দেবার কোন অধিকার কি এ-বাড়ির আছে? এ বাড়িটা না হয় অনেক বড় আর অনেক সুশ্রী একটা বাড়ি। ত্রিশ হাজার টাকার ফার্নিচারে সাজানো! পাঁচ হাজার টাকার পার্শিয়ান কার্পেট আর কাশ্মীরী সিল্কের পর্দা দিয়ে জাঁকানো। না হয় বারান্দাতে দশটা কাচের টবে তিন হাজার টাকা দামের অর্কিডে ফুল ফোটে ; আর, সামনের বাড়ির দেওয়ালের পাশে শুধু কয়েকটা মেঠো কৃষ্ণকলি। তবু সামনের ঐ বাড়িটা তো এ-বাড়ির প্রজা নয়।

কোন দরকার নেই, তবু ইচ্ছে হয়েছে অর্চনার, এম-এ পরীক্ষাটা দেওয়াই যাক। এটাও জানা আছে অর্চনার, এম-এ পরীক্ষাটা যদি শেষ পর্যন্ত না দেওয়া হয়, তবু তাতে কিছু যাবে-আসবে না। পরীক্ষা দিয়ে যদি ফেল করে অর্চনা, তা হলে যা হবে, পাশ করলেও তাই হবে। রজত রায় কখনও একথা বলেনি যে, তোমাকে এম-এ পাশ করতেই হবে অর্চনা।

এমন বিনা কারণের আর বিনা দরকারের পড়াশোনাতে যদি কোন ব্যাঘাত দেখা দেয় তবেই বা কি আসে-যায়? তাছাড়া, এটা এমন একটা কর্তব্য নয় যে, সেজন্য ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে একটা রুটিন করে নিতে হবে। পড়তে বসে ঘুমিয়ে পড়লেও কোন ক্ষতি নেই। আর ঝিমিয়ে পড়লে বরং লাভই আছে। তন্দ্রাটাই রঙীন হয়ে ওঠে ; আর রজত রায়ের মুখটাকে যেন চোখের কাছে দেখতে পাওয়া যায়।

বাবা সত্যিই নিতান্ত ভুল বুঝে সামনের বাড়ির বেহালাটাকে ওভাবে হুকুম করে থামিয়ে দেন। বেহালাটা যদি বাজতে ভুল করত, সুরের ভুল হতো, তবে হয়তো বিরক্ত হবার একটা কারণ থাকত। কিন্তু শুনতে যে বেশ ভালই লাগে। এমনও হয়েছে, বেহালা বেজে উঠতেই বই বন্ধ করে দিয়েছে অর্চনা। এমনও হয়েছে, মনে মনে তৈরী হয়েছে অর্চনা ; বেহালাটার আশাবরী আগে শেষ হোক, তারপর হিস্ট্রি অব গ্রীস ধরা যাবে। কিন্তু হঠাৎ নীরব হয়ে গেল বেহালাটা। তার ছেঁড়েনি নিশ্চয়। তার ছিঁড়লেও একটা ছেঁড়া গুঞ্জনের মত আওয়াজ শোনা যেত। তা নয়। মনে হয়, কেউ যেন বাজিয়ে মানুষটার হাত থেকে ছড়টাকে হঠাৎ কেড়ে নিল।

ঠিকই, দোতলার ঘরে জানালার কাছে এগিয়ে এসে দেখতে পায় অর্চনা, সামনের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মনবাহাদুর হাত নাড়ছে।

আরও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। সামন্ত সাহেব মাঝে মাঝে যেন নিতান্ত অকারণেও সামনের বাড়ির বেহালাটাকে নীরব করিয়ে দেন। যখন পড়াশোনার কোন ব্যস্ততা নেই, অর্চনার চোখের কাছে কোন বই নেই, ড্রইংরুমের একটি কোচের উপর যখন নিতান্ত অলসভাবে শরীরটাকে লুটিয়ে দিয়ে বসে আছে অর্চনা, তখনও দেখা গিয়েছে, সামনের বাড়ির বেহালার সুরেলা রব শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন সামন্ত সাহেব, ভ্রূকুটি তুলে তাকিয়েছেন। তার পরেই ডাক দিয়েছেন—বাজনা বন্ধ করতে বলে দাও মনবাহাদুর।

—জী হুজুর! আদেশ শুনেই ছুটে যায় মনবাহাদুর।

বেহালা বন্ধ হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু শুনতেও পাওয়া যায়, সামনের বাড়ির সেই ঘরের ভিতর থেকে কেউ একজন দরজার বাইরে দাঁড়ানো মনবাহাদুরের সঙ্গে একটু বেশী কথা বলছে। মনে হয়, যেন একটা কথা-কাটাকাটি চলছে।

অস্বস্তিবোধ করে অর্চনা। মনবাহাদুরের মত একটা অকথ্য দৌরাত্ম্যের সঙ্গে এত কথা বলবার দরকারই বা কি? মনবাহাদুর যে কথা বলতেই জানে না। ভদ্রলোক ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝবেনই বা কি? প্রশ্ন করলে মনবাহাদুর যে কোন জবাবই দিতে পারবে না।

ঠিকই, জবাব দিতে পারে না, মনবাহাদুর। শুনতে পায় অর্চনা, সামন্ত সাহেবও বোধহয়

শুনতে পান, মনবাহাদুরের সেই রূঢ় গলার স্বর যেন গোঁয়ার্তুমি করে কথা বলছে--সাহেবকা খুশি, সাহেবকা মরজি ; আবি বাজা বন্দ্ করো।

ধারণা করতে অসুবিধে নেই, ভদ্রলোক বোধহয় এই সামান্য কথাটাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন বেহালাটা বন্ধ করতে হবে? কিসের জন্য?

মনবাহাদুরও জানে না কেন? সামন্ত সাহেবও বলে দেননি, কেন বেহালাটা বন্ধ করবার দরকার হয়েছে। অগত্যা, মনবাহাদুরের কাণ্ডজ্ঞান যা বলতে পারে তাই বলেছে মনবাহাদুর। সাহেবের খুশী, সাহেবের মরজি ; বাস্, আর কোন কারণ নেই। সুতরাং এখনই বাজনা বন্ধ কর।

ভাবতে গিয়ে একটু ভয়ও করে অর্চনার, বারবার আর মাঝে মাঝে এত অকারণে যদি সামনের বাড়ির বেহালার উপর গিয়ে উপদ্রব করতে থাকে মনবাহাদুর তবে একদিন একটা রাগারাগি ঝগড়ার ব্যাপারও দেখা দিয়ে একটা বিশ্রী অশান্তির ব্যাপার বাধিয়ে তুলবে। অনেকদিন ধরে ভদ্রলোক এরকমের বাধা সহ্য করে আসছেন ঠিকই, কিন্তু একদিন হয়তো ধৈর্য হারাবেন। তখন কি হবে? ভদ্রলোক কি গর্জন করে উঠবেন না? আর ঐ মনবাহাদুর, যার মতিগতি কোন যুক্তি মেনে চলে না, সে ক্ষেপাও কি ভোজালি হাতে নিয়ে লাফালাফি না করে ছাড়বে?

মনবাহাদুরকেই জিজ্ঞাসা করে অর্চনা--তুমি ওসব কথা কেন বলতে গেলে মনবাহাদুর? সাহেবকা খুশি? সাহেবকা মরজি?

মনবাহাদুর--তব্ কেয়া বোলেগা?

সামন্ত সাহেব বলেন--ঠিক কথাই বলেছে।

অর্চনা--ঠিক কথা?

সামন্ত সাহেব--হ্যাঁ। মিথ্যে কথা বলেনি। আমি ওসব পছন্দ করি না।

সামন্তসাহেবের কথা থেকে মাঝে মাঝে তাঁর ধারণার পরিচয়টাও পাওয়া যায়। ধারণাটা এই যে, সামনের ঐ বাড়িটার যেন বেহালা বাজাবার, চেঁচিয়ে হাসবার আর জোরে কথা বলবার অধিকার নেই।

গত মাসেই তো, সামনের ঐ বাড়িতে বোধহয় একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার ছিল। কে জানে কোন আহ্লাদের উৎসব! ও-বাড়িতে যে মেয়েটি থাকে, তার অনেক বান্ধবী এসেছিল। আর ও-বাড়ির ঐ ঘরে, যে ঘরে বেহালাটা বাজে, সে-ঘরের ভিতরে খুব হৈ-চৈ আর হাসির হর্‌রা মেতে উঠেছিল।

কিন্তু সামন্ত সাহেব বেশ বিরক্ত বোধ করলেন। মনবাহাদুরকে ডাক দিয়ে বললেন--ওদের হল্লা থামাতে বল।

ছুটে যায় মনবাহাদুর। তারপরেই, একেবারে নীরব হয়ে যায় ও-বাড়ির ঐ ঘরের সব উল্লাসের মুখরতা।

এবার একটা কারণ বলতে পেরেছে মনবাহাদুর। সামন্ত সাহেবই বলেছেন--বল গিয়ে দিদির শরীর ভাল নয়। ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে।

অর্চনা যেমন আশ্চর্য হয়, তেমনি লজ্জাও পায়। শরীরটা কি-এমন অসুস্থ হয়েছে, যে-জন্য এত কড়া রকমের নির্দেশ দিয়ে ও-বাড়ির হল্লা থামিয়ে দিলেন বাবা? ঘুমের ব্যাঘাতই বা হবে কেন? ঘুমই নেই তো ঘুমের ব্যাঘাত।

ও-বাড়িটার এত বাধ্যতাও একটু বিসদৃশ। কোন সম্পর্ক নেই, সামনের একটা মস্ত বড় বাড়ির এক মেয়ের চোখের ঘুমের আরাম যেন নষ্ট না হয়, সে-জন্যে হাসি-টাসি থামিয়ে দিয়ে একেবারে নীরব হয়ে গেল বাড়িটা। দেখেছে অর্চনা, ও-বাড়িটার মুখের সব কথা সেদিন সারা সন্ধ্যা আর সারা রাত শুধু ফিসফিস করেছে। অথচ, সামন্ত সাহেব নিজে যে-ভাবে

চেঁচিয়ে কথা বলেছেন, তাতে এ বাড়ির কোন মূর্ছার মানুষেরও মূর্ছা ভেঙে যাবার কথা।

অর্চনার কাছেই একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছেন সামন্ত সাহেব--সামনের এই বাড়িটা আমার বাড়ির সামনের ভিউ খারাপ করে দিয়েছে। কি চমৎকার দেখাত, যদি ওখানে এ বাড়িটা না থাকত, বেশ খোলা-মেলা একটা স্পেস পড়ে থাকতো। আগে যদি বুঝতে পারতাম যে, ওখানে ওরকম একটা বাজে চেহারার একটা বাড়ি তৈরী হবে, আর ঐ ক্লাসের মানুষ এসে থাকবে, তবে জমিটাকে আগেই কিনে রাখতাম।

শুনে ভাল লাগেনি অর্চনার। বাবা যেমন ঐ বাড়িটার অস্তিত্বই সহ্য করতে পারছেন না। এতটা শখের মেজাজ আর ইচ্ছার আধিপত্য যে আজকাল চলে না, বাবা যেন সে-সব কোন খবরই রাখেন না। বাবা যেমন এখনও ভুলে যেতে পারছেন না যে, তিনি এখন আর সেসন জজ নন। ভুলেই গেছেন যে, তিনি এখন পেনশন ভোগ করছেন। বুঝতেই পারছেন না যে, এ বাড়ির ড্রইংরুমটা আদালতের একটা এজলাস নয়। এখানে বসে তিনি যা হুকুম করবেন, তাই মেনে নিতে কেউ বাধ্য নয়।

অর্চনাকে একবার পুরো সাতটা দিন জ্বরে ভুগতে হয়েছিল। সে সাতটা দিন কি কাণ্ডই না করলেন সামন্তসাহেব। সাতটা দিন ধরে মনবাহাদুর রাস্তার কোন ফেরিওয়ালাকে ঐ সামনের বাড়ির কাছাকাছি আসতে দেয়নি। যদি বা কেউ এসে পড়েছে আর হাঁক দিয়েছে, মনবাহাদুর তখনি ক্ষেপা নেকড়ের মত ছুটে গিয়ে তাড়া দিয়েছে--বাগো বাগো, জলদি বাগো।

কিন্তু সামনের ঐ বাড়িটাও কি অর্চনার জ্বরের জন্য সাত দিন ধরে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকবে? সামন্ত সাহেবের মনে এরকম কোন প্রশ্ন নেই। তাঁর ইচ্ছা, যতদিন না অর্চনার জ্বর সারে, ততদিন সামনের ঐ বাড়িতে কোন হাঁক-ডাকের সাড়া-শব্দ বাজবে না।

সত্যিই, বাজেওনি। মনবাহাদুর একবার গিয়ে শুধু বলে দিয়ে চলে এসেছিল, দিদির জ্বর হয়েছে, অন্তত সাতটা দিন জ্বর থাকবে বলেছেন ডাক্তার ; সুতরাং এই সাতদিন যেন কোন হল্লা না হয়।

মনবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করেছিল অর্চনা--ও বাড়িতে গিয়ে কিছু বলে এসেছ নাকি?

--হাঁ দিদি।

--কি বলেছ?

--হল্লা মত্ করো।

--ওরা কি বললে?

--কুছ্ নেহি বোলা।

--তার মানে হল্লা করবে?

মনবাহাদুর চোখ কুঁচকে হাসতে থাকে--নেহি নেহি। বাড়িকা সবকা বোখার হুয়া।

--ও-বাড়ির সবারই জ্বর?

--জী হাঁ দিদি।

মনবাহাদুরের হাসিটাই আসল সত্যটা বলে দিয়েছে। হল্লা করবার শক্তিই যে নেই বাড়িটার। জ্বরের ঘোরে পড়ে বড় জোর একটু হাঁসফাঁস করতে পারে ঐ বাড়িটা। কিন্তু তার শব্দ এ বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে কারও ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না।

কিন্তু সবারই জ্বর মানে কার কার জ্বর? ভদ্রলোকের বোন, যার নাম বেণু, তাকে তো একবার দেখতেই পাওয়া গিয়েছে। চাদর গায়ে জড়িয়ে, উসকো-খুসকো মাথা আর শুকনো মুখ নিয়ে জানালার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। বেণুর জ্বর বোধহয় সামান্য জ্বর। বেণুর মা'কেও একবার দেখতে পাওয়া গিয়েছে, বাইরের বারান্দায় একটা আসন পেতে আর দু'হাতে মাথাটাকে টিপে ধরে অনেকক্ষণ বসেছিলেন ; তারপর উঠে চলে গেলেন। খুব কঠিন একটা জ্বর হলেও কি এতটা নড়া-চড়া করতেন বেণুর মা? না।

দেখতে পাওয়া যায় না শুধু ঐ ভদ্রলোককে ; এই সাত দিনের মধ্যে একদিনও দেখতে পাওয়া গেল না। ঘরের জানালাটা যদিও খোলা ; কিন্তু একটা পর্দা আছে। ভিতরে কেউ বসে আছে কি না, কিংবা ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে কি না, কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। ঘরের ভিতরে অনেক রাত পর্যন্ত...শুধু তাই নয়, প্রায় সারারাত ধরে আলো জ্বলে। মনে হয়, ঐ ভদ্রলোকই খুব বেশিরকম অসুখে পড়েছেন।

ও-বাড়িতে তো কোন চাকর নেই। একটা ঝি অবশ্য কাজ করে ; কিন্তু ঝিটা তো শুধু বাসন মাজে আর উঠোনে ঝাঁড় দেয়। তবে এই সাতদিন ধরে ও-বাড়িটার জ্বরো মানুষগুলোর দরকারের কাজ করে দিয়েছে কে? হয়তো উনুনই জ্বলে না। সত্যিই কি একেবারে উপোস করেই জ্বর সারাচ্ছে বাড়িটা?

বাবা তো রোজই জিজ্ঞাসা করছেন, ভাল ঘুম হয়েছিল নিশ্চয়? অর্চনা সত্যি কথাটাই বলে দেয়।--না, একটুও ঘুম হয়নি।

--কেন? আশ্চর্য হন সামন্ত সাহেব।

--ঘুম এলই না। অর্চনা হাসে।

--এল না কেন? না আসবার তো কথা নয়। ও বাড়িটা তো কোন হল্লা-টল্লা আর করে না।

বললে অদ্ভুত শোনাবে, আর বলতেও কখনও পারা যাবে না, তাই বলতে পারল না অর্চনা, ও-বাড়িটা একটু হল্লা-টল্লা করলেই বোধহয় ঘুমটা আসত। হল্লা না করুক, অন্তত বেহালাটা যদি বাজত, তবে বোধহয় এক মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়তে পারত অর্চনা ; সত্যিই যে বিছানায় পড়ে মনটা যখন অস্বস্তিতে শুধু উসখুস করেছে, জ্বরের শরীরটা এপাশ-ওপাশ করেও একটুও আরাম বোধ করতে পারেনি, তখন কানদুটো যে বেহালার একটা মিষ্টি সুরের মূর্ছনা শোনবার জন্যেই পিপাসিতের মত ছটফট করেছে।

ঐ ভদ্রলোকও নাকি এম-এ পড়ছে। চাকরি করছে, তবু এম-এ পড়বার একটা শখ আছে। কথাটা এ-বাড়ির কারও কাছ থেকে শোনেনি অর্চনা। ও-বাড়ির কারও সঙ্গে অর্চনাকে কথা বলতে দেখলে বাবা যে আতঙ্কিত হয়ে শিউরে উঠবেন।

কথাটা বলেছিল রজত। পাটনাতে রজত আর ঐ ভদ্রলোক একই কলেজে পড়ত। এখানেও এ-বাড়িতে নয়, টাউনের কোথায় যেন রজতের সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকের দেখা হয়েছিল, কিছু কথাও হয়েছিল। তাই রজত জানতে পেরেছে, সুচরিত একটা চাকরি করছে আর এম-এ পড়ছে। চাকরিটা হলো এক ক্যাথলিক মিশনের যত ধর্মের বই অনুবাদ করার কাজ। সুচরিত নাকি তিনটে ভাষায় অনুবাদ করতে পারে, বাংলা উর্দু আর হিন্দীতে।

মাইনে পায় কত? সেটা আর জিজ্ঞাসা করেনি অর্চনা, কিন্তু রজত নিজেই হেসে হেসে বলেছিল, সামান্য মাইনে পায়। শতখানেক হবে।

সুচরিত লোকটা যে বেশ গুণের মানুষ সেটা বুঝতেই পারা যায়। এমনও মনে হয়, অগুণ বলতে যদি কিছু থাকে তবে ঐ একটাই, গরীব মানুষ। আরও একটা গুণ আছে, সেটা আর খোঁজ করে জানতে হয় না, একেবারে চোখেই দেখতে পাওয়া যায়। যে রজত নিজের চেহারা নিয়ে একটু গর্ব করে কথা বলতে ভালবাসে, সে রজতও বলেছে, সুচরিতের চেহারাটা দেখেছ অর্চনা? সুন্দর একটি রক্তমাংসের গ্রীক স্ট্যাচু নয় কি? অদ্ভুত! কোন খুঁত নেই বলে মনে হয়।

অর্চনার গায়ে সেদিন জ্বরের ছায়াও আর নেই ; চিকেন জুস আর ভাত খেতে বলে দিয়ে গিয়েছেন ডাক্তার, সেদিন দোতলার বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ চমকে ওঠে অর্চনা। একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে ও-বাড়িটার দরজার সামনে। গাড়িটা হলো একটা মোটর-ভ্যান। গাড়ির ভেতর থেকে স্ট্রেচার নামাল দু'জন লোক। ঘরের ভিতরে চলে গেল।

তারপর, আবার স্ট্রেচার হাতে বেরিয়ে এল লোক দুটো। স্ট্রেচারের উপর শুয়ে আছে সুচরিত। নীল রঙের একটা আলোয়ান দিয়ে শরীরটা ঢাকা। সুচরিতের মুখটা যেন একটা লালচে আঁচ ছড়িয়ে জ্বলছে। রুক্ষ চুলের স্তবক ভেঙে গিয়ে মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। সুচরিতকে নিয়ে স্ট্রেচারটা গাড়িতে উঠল। আর উঠলো সুচরিতের বোন, হাতে একটা পাখা নিয়ে।

মনবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে অর্চনা--ঐ গাড়িটা কোথায় গেল?

--অসপাতাল গিয়া। মনবাহাদুর হাত চালিয়ে অর্কিডের টবের কাচ মুছতে থাকে।

দুই

টাউন এখান থেকে বেশ দূরে ; আর টাউন বলতে তো মস্ত বড় একটা বাজার ধরনের এলাকা। ঐ টাউনের কাছ থেকে এমন কিছু আশা করা যায় না, যে-জন্যে টাউনের গা ঘেঁষে বাড়ি করতে কারও ইচ্ছে হবে। সামন্ত সাহেবের মত মানুষের মন তো টাউনের উপর আরও বিরূপ। মানুষের ভিড়কেই একটা নোংরামি বলে তাঁর মনে হয়। কাজেই টাউন থেকে বেশ দূরে এই জায়গাটাকে তিনি বেছে নিয়েছেন। এখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে অনেক ভাল-ভাল আর সুন্দর চেহারার বাড়ি অবশ্যই চোখে পড়বে, নিকটে ও দূরে। সবচেয়ে সুন্দর হলো এই রাস্তাটা—সোজা চলে গিয়ে সীতাগড় পাহাড়ের পায়ের কাছের শালবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে যেতেই নিরিবিলি ধানক্ষেত চোখে পড়ে। খুব সরু একটা নুড়ি-ছড়ানো নদীর উপর একটা কালভার্ট আছে, সে কালভার্টের কাছে একটা পলাশও আছে। যখন লাল পলাশ ফোটে, এবং পলাশের মাথায় সাদা বক ভিড় করে বসে থাকে, তখন দূর থেকে দেখতে খুবই অদ্ভুত লাগে। বকগুলিকে মনে হয় সাদা পলাশ ; আর পলাশগুলিকে মনে হয় লাল বক।

রিটায়ার্ড সেসন জজ সামন্ত সাহেব যখন এই বাড়িটা এখানে তৈরী করালেন, তখন রাস্তার ওপারে সামনের ঐ জায়গাটা খালি পড়েছিল। ঐ বাড়িটা ছিল না। সামন্ত সাহেব তাঁর বুল ডগকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা সামনের ঐ খালি জায়গাটাতেই ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু একবছর যেতে না যেতেই ঐ জায়গাটাতে যেদিন একটা বাড়ি উঠতে শুরু করল, সেদিন সামন্ত সাহেব মনে করেছিলেন, মিস্টার হোসেন বোধহয় একটা আস্তাবল আগে তৈরী করে নিচ্ছেন, পরে বাড়িটা আরম্ভ করবেন। সামন্ত সাহেবের ধারণা ছিল, সামনের সমস্ত জায়গাটা, ঐ মাঠটাই মিস্টার হোসেনের সম্পত্তি ; এবং মিস্টার হোসেনের সঙ্গে দার্জিলিং-এ একবার দেখা হতেই মিস্টার হোসেন তাঁর বাড়ির প্ল্যানটাও সামন্ত সাহেবকে দেখিয়েছিলেন। দেখে খুশী হয়েছিলেন সামন্ত সাহেব, হ্যাঁ চমৎকার একটি প্যালেসের মত একটা বাড়ি উঠবে ওখানে।

কিন্তু জানা ছিল না যে, সামন্ত সাহেবের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি, রাস্তার ওপারের ওখানে আড়াই কাঠার মত এক টুকরো জমি পড়ে আছে, যেটা হল একটা স্ত্রী-সম্পত্তি। কোন্ এক লেট পুলিস অফিসারের বিধবা হলেন ঐ আড়াই কাঠার মালিকানী। ও-বাড়িটা যখন একটা আস্তাবলের মত চেহারা নিয়ে তৈরী হতে লাগল, তখনই শুধু জানতে পারলেন সামন্ত সাহেব, সেই বিধবা মহিলাই বাড়ি তৈরী করাচ্ছেন।

ও-বাড়িটার কয়লার উনুনের ধোঁয়া যেদিন বাতাসের তাড়নায় উড়ে উড়ে সামন্ত সাহেবের বাড়িটাকে ছেয়ে ফেলল, সেদিন প্রায় ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন সামন্ত সাহেব—এ কি? এ কি ভয়ানক নুইসেন্স!

অর্চনা চমকে উঠেছিল।—কি হলো বাবা?

সামন্ত সাহেব বলেন--আস্তাবলটা যে আমার বাড়ির সর্বনাশ করে ছাড়বে বলে মনে

হচ্ছে।

অর্চনা--কোথায় আস্তাবল?

সামন্ত সাহেব--ঐ যে, আস্তাবলের মত দেখতে ঐ বাড়িটা।

অর্চনা--কি করেছে বাড়িটা?

সামন্ত সাহেব--কি বিশ্রী ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

অর্চনা--বাতাসটা আজ দক্ষিণ থেকে উত্তরে বইতে শুরু করেছে বলেই বোধহয়...।

সামন্ত সাহেব--তাই যদি হয়, তবে ওরা এখন উনুন জ্বালানো বন্ধ রাখলেই তো পারে।

অর্চনা--সেটা কি বললেও ওরা শুনবে?

--শুনতে হবে।...মনবাহাদুর!

--ওদের গিয়ে বলে দাও, উনুন জ্বালানো এখন বন্ধ রাখুক।

--বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

সেই প্রথম দেখতে পেয়েছিল অর্চনা, মনবাহাদুরের হাঁক-ডাক শুনতে পেয়ে ওবাড়ির ভিতর থেকে তিনটি মানুষ বের হয়ে এসেছিল। সুচরিত, সুচরিতের বোন বেণু আর সুচরিতের মা।

সেদিন তিনজনেই আশ্চর্য হয়ে মনবাহাদুরের দাবির ভাষা শুনেছিল। কিংবা, শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। সুচরিতের মা আর বোন যেন বেশ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। একটি কথাও বলতে পারেনি।

কিন্তু ঐ ভদ্রলোক, অর্থাৎ সুচরিত, সেদিন হেসে হেসে আর বেশ জোরে চেঁচিয়ে যে-কথাটা বলেছিল, সে-কথা এ-বাড়ির এই ঘরের ভেতরে বসে থেকেও বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছিল অর্চনা। সুচরিতের গলার স্বরে যেন প্রচণ্ড একটা ঠাট্টার ঝাঁজ হেসে উঠেছে।--সাহেবকে বল, আমাদের তিনজনের খাবার যেন পাঠিয়ে দেন। ভাত ডাল তরকারি, চা রুটী আর একটু মাছের ঝোল, আর নিরামিষ ঘরের রান্না কিছু সুক্তো আর আতপ চালের ভাত। বাস্, এই হলেই হবে।

--কেয়া বোল্‌তা? চেঁচিয়ে ওঠে মনবাহাদুর।

সুচরিত বলে--ঠিক বোল্‌তা। সাহেবকে গিয়ে ঠিক এইসব কথা বলে দাও।

মনবাহাদুর--জরুর বোলেগা।

সুচরিত--হ্যাঁ, সাহেবকে আগে বল গিয়ে, তারপর এসে বল, সাহেব রাজী আছেন কিনা? যদি রাজী থাকেন তবে উনুন জ্বালা হবে না। নইলে উনুন জ্বালতেই হবে।

মনবাহাদুর অবশ্যই তার প্রভু সামন্ত সাহেবের কাছে এসে ঐ ঠাট্টাভরা প্রতিবাদের প্রতিটি কথা বলে যেত ; কিন্তু বলে যাবার সুযোগ পায়নি মনবাহাদুর। অর্চনা নিজেই সেদিন বাড়ির ফটকের কাছে এগিয়ে এসেছিল ; আর মনবাহাদুরকে বলেছিল, তুমি এখনই ডাকঘরে যাও মনবাহাদুর। চিঠি এসে থাকলে, নিয়ে চলে এস।

মনবাহাদুর--ও-লোগ চুলহা নেহি বন্দ্ করতা।

অর্চনা--না করুক। ওদের কথা ছেড়ে দাও।

মনবাহাদুর--সাহেবকো বোলেগা।

অর্চনা--না, কোন দরকার নেই। ওসব কথা ছেড়ে দাও। সাহেবকে যদি কিছু বলতে হয়, তবে আমি বলব।

সুচরিত কি শুনতে পাচ্ছে না, সামন্ত সাহেবের মেয়ে বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে এত স্পষ্ট করে যে-সব কথা বলছে? কোন সন্দেহ নেই, সবই শুনতে পাচ্ছে সুচরিত। বোধহয়, সামন্ত সাহেবের মেয়ের মুখটাকেও সেদিন বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে সুচরিত।

সুচরিতের মুখের দিকে তাকাবার কোন আগ্রহ নেই অর্চনার। ফটকের কাছে যতক্ষণ দাঁড়িয়েছে আর মনবাহাদুরের সঙ্গে কথা বলেছে অর্চনা, ততক্ষণ চোখের দৃষ্টিটাকে যেন বেশ সাবধানে চেষ্টা করে নিজের কাছেই রেখেছে, এদিকে ওদিকে ছুটে যেতে দেয়নি। এবং সেটাই সুচরিতের চোখের পক্ষে একটা বড় সুযোগ হয়ে উঠেছিল ; সামন্ত সাহেবের মেয়ের মুখটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেনি সুচরিত।

অর্চনা কিন্তু সেদিনই একটু আশ্চর্য হয়েছিল। এ কি ব্যাপার? যে ভদ্রলোক সামন্ত সাহেবের ইচ্ছার আদেশটাকে তুচ্ছ করে এত জোরে চেঁচালেন হাসলেন আর একটা ঠাট্টার গর্জনও মনবাহাদুরকে শুনিয়ে দিলেন, তিনি কি এরই মধ্যে ভয় পেয়ে গেলেন? তা না হলে সামনের বাড়ির উনুনের ধোঁয়া এই মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে গেল কেন? কই, কোন ধোঁয়া তো ও-বাড়ির উনুনের ভিতর থেকে কিলবিলিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে না, আর এ-বাড়ির গায়ের উপরেও এসে পড়ছে না? কিংবা হাওয়াটাই উত্তর থেকে দক্ষিণে বইতে শুরু করে দিল?

বাড়িটা কি ভয় পেয়ে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিল? কৌতূহলটাকে সামলে রাখতে পারেনি অর্চনা। মনবাহাদুরকেই বলেছিল অর্চনা, একবার ঐ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করো তো, উনুন ধরানো হয়েছিল কি না?

মনবাহাদুর জিজ্ঞাসা করেছিল। তারপর অর্চনাকে একটা অদ্ভুত খবরও দিয়েছিল। না, উনুন ধরানো হয়নি। স্টোভ ধরানো হয়েছিল, এবং তাতেই রান্না হয়েছিল।

অর্চনা—ভদ্রলোক আর কিছু বলেছেন?

—হ্যাঁ।

—কি?

—বাবু পুছা, কওন পুছতা হ্যায়!

—তুম কেয়া বোলা?

—হাম্ বোলা, দিদি পুছতা হ্যায়।

চমকে ওঠে অর্চনা। মূর্খটা যে এককথায় সামনের বাড়ির অদ্ভুত লোকটার কাছে অর্চনার মাথাটাকে হেঁট করিয়ে দিল। ভাবতে গিয়ে অর্চনার বুকের ভিতরের একটা অহংকারও যেন লজ্জা পেয়ে অস্বস্তি বোধ করেছিল। ভদ্রলোকও বোধহয় ভুল করে ভাবতে পারেন, সামন্ত সাহেবের মেয়ের মনের কৌতূহলও কত সস্তা ; তা না হলে অজানা একটা বাড়ির ভিতরের একটা ঘটনার ছবিকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে কেন অর্চনা?

কি আশ্চর্য, দুটো তিনটে মাস পার হতেই অর্চনার এই লজ্জাটাই যেন লজ্জা পেল। বুঝতে পারা যাচ্ছে, সামনের বাড়িটাই যেন মাথা হেঁট করে ফেলেছে। এ বাড়ি থেকে সামন্ত সাহেবের কাছ থেকে কত রকমের আপত্তির হুকুম নিয়ে ছুটে গেল মনবাহাদুর ; ও-বাড়ির দরজার কড়া ঝনঝনিয়ে দিয়ে কতবার চেঁচাল—বন্দ্ করো। আর ঐ বাড়িটা যেন নির্বিবাদে, নির্বিচারে, একেবারে বাধ্য প্রজাটির মত বিনীতভাবে সামন্ত সাহেবের সব ইচ্ছার আধিপত্য শিরোধার্য করে নিল।

বেহালা বন্ধ কর। হল্লা থামাও। গ্যাসের বাতি জ্বালবে না, দুর্গন্ধ আসছে। কৃষ্ণকলির ঝাড় তুলে ফেল, ওতে সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে। মেয়েটা যেন এত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বই না পড়ে, বলে দিয়ে এস মনবাহাদুর। কত রকমের আপত্তিই না ছুটে ছুটে গিয়েছে। একদিন একটা আদেশও দিয়েছিলেন সামন্ত সাহেব ; একবার খোঁজ নাও তো মনবাহাদুর ; ওরা বোধহয় কাঁঠাল খাচ্ছে, তা না হলে এখানে এত মাছি কোথা থেকে আসবে আর ভন্‌ভন্ করবে?

এক বছরের মধ্যে শুধু একদিন অর্চনার প্রাণটা হঠাৎ শঙ্কায় চমকে উঠেছিল, আর সামন্ত সাহেবের একটা হুকুমকে বাধা দিতে পেরেছিল।

রোজই বিকালে সামন্ত সাহেব আর তাঁর মেয়ে সীতাগড় রোড ধরে হেঁটে হেঁটে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে ; তারপর ধানক্ষেতে আলের ওপর কিংবা ছোট্ট নদীটার কিনারা ধরে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেড়িয়ে, তারপর বাড়ি ফিরে আসেন। একটা কাঁকর-ছড়ানো আর চোরকাঁটায় ছাওয়া ডাঙা আছে ; তার উপর এক জায়গায় সাত-আটটা বাবলার চেহারা ঘেঁষাঘেঁষি করে একটা কাঁটাকুঞ্জের মত রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারই কাছে মস্ত বড় একটা ঢিবির মত পাথর আছে। সেই পাথরের উপর এসে কিছুক্ষণ বসে থাকা, আর পশ্চিমের আকাশটার দিকে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখা যেন অর্চনা সামন্তেরও জীবনে একটা অভ্যাসের ব্রত হয়ে উঠেছে।

পাথরটার উপর যখন চুপ করে বসে থাকে অর্চনা, সামন্ত সাহেব তখন এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ান, আর হাতের স্টিক চালিয়ে চোরকাঁটার মাথা ভাঙেন, কখনও বা একটা কণ্টিকারীর ঝোপের ফলগুলিকে স্টিক দিয়ে চেপে চেপে থেঁতো করতে থাকেন।

সেদিন বেশ দূরে থেকেই পাথরটার দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠেছিল অর্চনা। চমকে উঠেছিল একটা সন্দেহ। কিছুদূর এগিয়ে এসেই বুঝতে পেরেছিল, না, সন্দেহ নয় ; একেবারে একটা খাঁটি সত্য। পাথরটার উপর বসে আছে সামনের বাড়ির ঐ ভদ্রলোক, যার নাম সুচরিত।

সামনের বাড়ির ভদ্রলোককে এদিকে কোনদিন বেড়াতে আসতে দেখেনি অর্চনা। ও ভদ্রলোকের মনে যে বিকালের আলোতে ঘুরে বেড়াবার, কিংবা সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকবার কোন তৃষ্ণা আছে ; এটাও তো কল্পনা করা কোনদিন সম্ভব হয়নি।

অর্চনা বলে--আর ওদিকে যাবার কোন দরকার নেই বাবা।

সামন্ত সাহেব--কেন?

প্রশ্ন করতে গিয়েই সামন্ত সাহেবের চোখ দুটোও সেই পাথরটার দিকে তাকায়।--কে? ওটা আবার কে ওখানে বসে আছে?

অর্চনা বলে--যেই হোক, চল, আমরা অন্য দিকে যাই?

--না। আমি লোকটাকে এখনই সরিয়ে দিচ্ছি।

--না না, তুমি যেও না। ভদ্রলোক হয়তো বিরক্ত হবেন।

--ভদ্রলোক? কি রকমের ভদ্রলোক? সামন্ত সাহেব একটু ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন, পাথরটার উপর বসে আছে যেটা, সেটা সত্যিই কোন ভদ্রলোকের মূর্তি কি না?

অর্চনা--চিনতে পারছ না? সামনের বাড়িতে থাকেন যে ভদ্রলোক, তিনিই বসে আছেন।

--কি আশ্চর্য? লোকটা এরকম উপদ্রব করে কেন?

--উপদ্রব কিছু নয়। বেড়াতে এসে জায়গাটাকে ভাল লেগেছে, বোধহয় তাই বসে পড়েছেন।

--জায়গাটাকেই বা ভাল লাগবে কেন? বলতে বলতে এগিয়ে যান সামন্ত সাহেব। ইচ্ছাটা এই যে, সুচরিতকে এখনই অন্য কোন দিকে চলে যেতে বলবেন।

অর্চনা বলে--যেও না বাবা ; ওসব মানুষের সঙ্গে কথা বলার কোন দরকার নেই।

--কিছু বলব না?

--না।

সামন্ত সাহেব কিছু না বলতেই অবশ্য রাজী হলেন ; কিন্তু তাঁর চোখমুখের অপ্রসন্ন চেহারাটা দেখে বুঝতে পারা যায়, তিনি খুশী হলেন না। সামনের বাড়ির সেই মানুষটা এখানে একা-একা বসে সূর্যাস্ত দেখছে, এটাও যেন মানুষটার নিতান্ত গর্হিত একটা অপরাধ ; মানুষটার আত্মাটার একটা অনধিকার চর্চা। রিটায়ার্ড সেসন জজের প্রাণটা যেন এক মুহূর্তেই বিচার করে নিয়ে এখনই রায় দিতে চলেছিলেন--বন্দ্ করো।

তিন

সামন্ত সাহেব না হয় অর্চনার আপত্তির বাধাটা মেনে নিলেন, এবং তাঁর চিন্তার সমস্যাটা সেখানে সেইক্ষণেই মিটে গেল। কিন্তু অর্চনার চিন্তার সমস্যাটা একটু জটিল হয়েই উঠতে চায়। সেদিন সেইক্ষণেই মিটে যায়নি সমস্যা ; বাড়ি ফিরে এসেও ভাবতে হয়েছিল ; আর পর পর অনেকদিন ধরেও মনের মধ্যে যেন এক টুকরো মেঘ ঘনিয়েছিল। খুবই অস্বস্তিকর একটা সন্দেহের মেঘ। সুচরিত কি ইচ্ছে করেই ওখানে গিয়ে আর পাথরটার উপর বসে সূর্যাস্ত দেখছিল? যদি এটা ইচ্ছার কোন ব্যাপার হয়ে থাকে, তবে তো সাবধান হতে হয়। খুবই অভদ্র আর নির্লজ্জ ইচ্ছা। তবে তো বুঝতে হয় যে, সুচরিত নামে ঐ নিরীহতা আর নীরবতা সতিই একটা সাংঘাতিক উদ্দেশ্য। সত্যিই আড়াল থেকে একটা ভয়ানক কৌতূহল অর্চনা সামন্তের মুখটাকে দেখবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু এই সন্দেহটা যে নিজের খেয়ালে ছটফট করছে ; কোন প্রমাণ তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, সন্দেহ করবার মত কোন কারণ আছে। সেদিনের পরেও পর পর সাত দিন বেড়াতে গিয়ে সীতাগড় রোড ধরে ঐ ডাঙ্গার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সামন্ত সাহেব ও তাঁর সুন্দরী মেয়ে। বাবলার ছায়ার কাছে পাথরটার দিকে তাকিয়েছে অর্চনা। কেউ বসে নেই পাথরটার উপর। বেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন একটা শূন্যতা শুধু বসে আছে। অতএব, এগিয়ে যেতে কোন বাধা নেই। এগিয়ে গিয়েছেন সামন্ত সাহেব ও তাঁর মেয়ে। চুপ করে বসে সূর্যাস্ত দেখেছে অর্চনা। সন্ধ্যার বাতাস মিষ্টি হয়ে ফুরফুর করছে। অর্চনার ফাঁপানো চুলের ভাঙা-ভাঙা গুচ্ছও ফুরফুর করছে। কালো চোখ দুটো আরও ছায়াময় হয়েছে। বাড়ি ফিরে এসেছে অর্চনা।

কই, আর কোনদিনও তো সুচরিতকে এখানে দেখা গেল না? ভয়ানক একটা উদ্দেশ্য বলে যাকে সন্দেহ করা হলো, সে তো, দেখাই যাচ্ছে, নিতান্ত একটা পলাতক ভীরুতা। ওদিকে যাবার মত সাহসই আর হলো না কোনদিন।

অর্চনার মনটা পড়ার ভাবনার মধ্যেই একদিন হঠাৎ একটা প্রশ্নের শব্দ শুনে আনমনা হয়ে যায়। ওদিকে বেড়াতে যায় না সুচরিত, কিন্তু কোন্ দিকে যায়? নিরালায় বসে আকাশের রঙের দিকে তাকানো যার অভ্যেস আছে, সে কি এত শিগগির অভ্যেস ছেড়ে দিল?

কে জানে কেন, অর্চনার মনটা সেদিন যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে এলোমেলো করে অনেক কথা ভেবে ফেলে। কোথা থেকে যেন একটা রাগ এসে অর্চনার সমস্ত ভাবনাগুলিকে এলোমেলো করে দিচ্ছে। সামনের বাড়ির একটা মানুষ, যার শুধু নামটা জানা আছে, যার জীবনের ইতিহাসের আর একটিও কোন কথা জানা নেই, তার একটা সখের অভ্যেসের কথা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনটা যেন একটা তুমুল ঝড়ের মধ্যে পড়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। সুচরিতের সঙ্গে জীবনে কি কোনদিন একটা কথাও বলা যাবে না? বলতে পারা যাবে না? বলবার সুযোগ হবে না?

ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণটাও যে হঠাৎ বড় বেশি নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব! ছি-ছি, কেউ শুনতে নাই বা পেল এমন ভয়ানক আক্ষেপের কথাটা, কিন্তু অর্চনা নিজে তো শুনতে পেয়েছে। কোন্ বঞ্চনার দুঃখের বিরুদ্ধে এত রাগ করে আর নির্লজ্জ হয়ে কথা বলছে মনটা? সুচরিত তো বলতে গেলে একেবারে অজানা অচেনা একটা মানুষ। তার কথা এত বেশি করে মনে পড়ে কেন?

প্রশ্ন করে করে আর চিন্তাটাকে হয়রান করেনি অর্চনা। শুধু কল্পনায় একটা ইচ্ছাকে যেন ছবি করে নিয়ে মনের কাছে রেখে আর অলস হয়ে শোফার উপর বসেছিল। সারা শরীরটা যেন অদ্ভুত একটা তৃপ্তির স্বাদে ভরে গিয়েছিল। আর মনে হয়েছিল, এখন যদি সুচরিতের ফটোটা কাছে থাকত, তবে...। আর বেশি ভাবতে পারেনি অর্চনা।

কিন্তু আজ এভাবে একটা স্ট্রেচারের উপর শুয়ে কোথায় চলে গেল সুচরিত? মনবাহাদুর বলেছে, ওটা হাসপাতালের গাড়ি। কিন্তু নীল আলোয়ানে ঢাকা একটা গ্রীক স্ট্যাচুর শরীর কত করুণ হয়ে. হাসপাতালে চলে গেল! অর্চনার সঙ্গে সামনের বাড়ির সুচরিতের কোন সম্পর্ক নেই। সুচরিতের ছায়াটাও কোনদিন অর্চনাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু অর্চনার মনটা যেন মাথা হেঁট করে বলছে, সম্পর্ক আছে। অর্চনার একটা কল্পনার আনন্দ এই সুচরিতের কাছে ঋণী ; অর্চনার এই শরীরের একটা ক্ষণতৃপ্তির তন্দ্রাটা সুচরিতের কাছে ঋণী।

অর্চনা সামন্তর শান্ত সংযত ও গম্ভীর ফ্যাশানের জীবনে এ এক অদ্ভুত দুর্ঘটনা। অর্চনার কোন বান্ধবী ; কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া বলতে পারবে না যে. কোনদিন তাঁরা অর্চনার চোখের কোন দৃষ্টি, মুখের কোন কথা. আর দেহের কোন ভঙ্গীতে কোন প্রগল্‌ভতা দেখতে পেয়েছেন। সুন্দর চেহারাটাকে অবশ্যই সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে ভালবাসে অর্চনা সামন্ত। কিন্তু সেই সাজের মধ্যে কোন চটুলতা নেই। যেমন সাজ. তেমনই মুখের ভাব ও ভাষা, সবই যেন একটা পরিপাটি রুচির শাসনে সংযত হয়ে আছে। ঠোঁটে কোনদিন রং মাখেনি অর্চনা ; চোখে কোনদিন কোন শখের কালিমা লেপে দিতে পারেনি।

যেমন সামন্ত সাহেব জানেন, তেমনই তাঁর মেয়েও জানে, এখন অর্চনাকে শুধু কয়েকটা মাস, হয়তো একটা বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এরপর যা হবে, অর্চনার সেই জীবনের ছবিটা আঁকা হয়েই আছে। ছবিটা যেন স্কেল দিয়ে মেপে মেপে আর হিসেব করে টানা কয়েকটা রেখা দিয়ে আঁকা একটা ছবি। অর্চনা এম-এ পরীক্ষাটা দিক বা না দিক, রজত দিল্লীতে গিয়ে ছ'মাস থাকবে ; ফিরে এসে এখানে একবার দেখা দিয়েই দার্জিলিং চলে যাবে। তারপর এখান থেকে দার্জিলিং-এ আগে চলে যাবে অর্চনা ; তিন দিন পরে সামন্ত সাহেব। দার্জিলিং-এই রজত আর অর্চনার বিয়েটা হয়ে যাবে। তারপর একটা মাস কলকাতায় থেকে রজত আর অর্চনা দুজনেই একসঙ্গে দিল্লী চলে যাবে। এক দেশী রাজ্যের ছোকরা রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে কাজ করবে রজত। কারোলবাগে একটি আধা-প্রাসাদের মত চেহারার বাড়িতে থাকবে রজত আর অর্চনা। এস্টেটের একটা গাড়িও সব সময় ব্যবহার করবার জন্য ঐ আধা-প্রাসাদের মত বাড়িটার গ্যারেজে থাকবে।

হ্যাঁ, সামন্ত সাহেবও প্রায় ছক কেটে তাঁর জীবনের একটা মানচিত্র এঁকে ফেলেছেন। অর্চনার বিয়ে হয়ে যাবার পর তিনি বছরের ছ'মাস এ-বাড়িতে থাকবেন, তিন মাস দার্জিলিং-এ, আর তিনমাস দিল্লীতে গিয়ে মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে। উইল করে রেখেছেন, তাঁর এই বাড়ি, দার্জিলিং-এর বাড়ি, মধুপুরের বাগান আর ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটের সত্তর হাজার টাকা, সবই তাঁর একমাত্র মেয়ে অর্চনা পাবে, তিনি গতায়ু হবার পর। তখন কিন্তু এ বাড়িকে ভাড়া দেওয়া চলবে না, ফাঁকা রাখাও চলবে না। অর্চনাকে এসে এই বাড়িতেই থাকতে হবে। আর, হলঘরের মাঝখানে নিজেরই যে মার্বেল-মূর্তিটা বসিয়ে রেখেছেন, ইতালির মিলান থেকে যেটাকে তৈরী করিয়ে আনা হয়েছে, সে মূর্তির সামনে রোজ সন্ধ্যায় একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে। উইলের মধ্যে তাঁর এ ধরনের ইচ্ছার কথার একটা উল্লেখও রেখেছেন, যদিও ওটা কোন শর্ত নয়।

জীবনের আর অদৃষ্টের মানচিত্রটা যেমন আঁকা আছে, তেমনই অর্চনার মনটাও যেন মাপজোক করে, বাঁধাছাদা হয়ে, আর তৈরী হয়েই আছে। জানা আছে, হিসেবের এদিক-ওদিক হবে না। হিসেবের এদিক-ওদিক করবার কোন দরকারও নেই। রজত রায়ের সঙ্গে জীবনে যে-কটা দিন দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, সে-কটা দিন এমন একটা ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গিয়েছে যে, বুঝতেই পারেনি অর্চনা, সাতটা দিন ফুরিয়ে গেল ; এবার চলে যাবে রজত।

অবশ্য কোনবারই এ-বাড়িতে এসে ওঠেনি রজত। এখান থেকে বেশ একটু দূরে সেই হ্যাম্পটন হোটেলে উঠেছে, যে হোটেলে দেশী রাজারাও এসে মাঝে মাঝে অতিথি হন আর

ভালুয়া জঙ্গলে শিকার খেলে চলে যান।

দেশী রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে কাজ করবে যে রজত, তার পৈতৃক ঐশ্বর্যও প্রায় রাজাগোছের এক ভাগ্যবানের ঐশ্বর্য। পাটনাতে তিনটি বিরাট বাড়ি, পূর্ণিয়াতে জমিদারি, গিরিডিতে দুটি অভ্রখনি আর সিমলাতে একটি বাংলো।

যাই হোক, সামনের বাড়িটা একেবারে নীরব হয়ে আছে। সুচরিতের শরীরটা বোধহয় এতক্ষণে হাসপাতালের কোন বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। কি হলো ভদ্রলোকের? কিসের অসুখ? সেরে উঠে ভালয় ভালয় ফিরে আসবে তো ভদ্রলোক?

যদি না আসে তবে অর্চনার জীবনের কোন্ আনন্দ ব্যথিত হবে? চোখের সামনে কিংবা মনের সামনে কোন শূন্যতা দেখা দেবে কি?

অর্চনার চিন্তাটা সাহস করে কিন্তু উত্তর দিতে পারে না। রজত প্রায় আসবে, বিয়ে হবে। ঠিকই ; তবু মনে হয়, কোথায় যেন একটা কাঁটা রয়ে গেল, একটা লজ্জার কাঁটা, সেটা যখন তখন বুকের ভিতরে বিঁধবে। সব চেয়ে বড় ভয়, রজত যখন হাত ধরবে, তখন বোধহয় কাঁটাটা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধবে।

কি আশ্চর্য, রজতের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে কতদিন হ্যাম্পটন হোটেলের লনের উপর বেড়িয়েছে অর্চনা ; কিন্তু অর্চনার হাতটা তো হঠাৎ অলস হয়ে যায়নি ; নিঃশ্বাসও এলোমেলো হয়ে যায়নি, আর শরীরটাও কোন তৃপ্তির স্বাদে ভরে ওঠেনি, সেদিন যেমন একটা তৃপ্তি শুধু একটা কল্পনার ছবি দেখতে পেয়ে...।

আর বেশি ভাবতে গেলে, এই শরীরটাকে সেই সঙ্গে মনটাকেও ঘেন্না করতে হবে। একটা বাতিকে পেয়ে বসবে। বার বার স্নান করতে ইচ্ছে করবে। ছিঃ, পথ চলতে যে এত সাবধান, তারই পায়ে কাঁটা ফুটল! তাও আবার এত কুৎসিত কাঁটা!

চার

ডাক্তার একটু আশ্চর্য হয়েছে। তাই একটু ভাল করে পরীক্ষা করার জন্য সুচরিতকে হাসপাতালে আনিয়েছে। দেখা গেল রোগীর ব্রেন সুস্থ, হার্ট সুস্থ ; লিভারে কোন দোষ নেই, রক্তের চাপও স্বাভাবিক ; এবং জ্বরটাও সামান্য একটা ঠাণ্ডা লাগা জ্বর বলেই মনে হয়। কিন্তু এ জ্বর যে কেন এতদিন ধরে সুচরিতকে ভোগাতে পারছে, বুঝতে অসুবিধে হয়। এই জ্বরে এত কাহিল হয়ে যাবারও তো কারণ নেই। কিন্তু সুচরিত যেন শুধু শরীরের দিক দিয়ে নয় ; মনে-প্রাণে কাহিল হয়ে গিয়েছে। সুচরিত কি সাংঘাতিক কোন রকমের মানসিক আঘাত পেয়েছে? কিংবা খুব কষ্টকর কোন দুশ্চিন্তা সহ্য করতে চেষ্টা করছে?

এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? সুচরিত নিজেই হেসে হেসে বলেছে, না, কোন ব্যাপার নেই। মা বলেছেন, না, সুচরিত তো মন ভার করে থাকবার ছেলে নয়। ছেলে তো বেশ হেসেখেলেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। বোন বেণুও বলেছে, দাদাকে কারও ওপর কোনদিন রাগ করতে দেখিনি।

ডাক্তার মিত্র অর্থাৎ সুচরিতেরই কলেজ-জীবনের বন্ধু সোমেশ বেণুকে বলেছে, এমন হতে পারে তোমার দাদা সত্যিই কোন রাগ দুঃখ অথবা অপমান চুপ করে সহ্য করেছে, মনের ভেতরে চেপে রাখতে চেষ্টা করেছে। তোমরা বাইরে সেটা দেখে কিছুই বুঝতে পারনি।

বেণু বলেছে—হতে পারে।

বেণুর যে সত্যিই মনে হয়েছে, হতে পারে। এ-বাড়িতে আসবার পর থেকে এই এক বছরের ইতিহাসে যতই হাসি খুশি খেলা গল্প আর বেহালার সুরের উল্লাস থাকুক না কেন, দাদার জীবনটা যেন ভয়ানক একটা সহ্যের পরীক্ষা সহ্য করে এসেছে। একবার বেণু নিজেই

রাগ করে বলে ফেলেছিল--তার চেয়ে ভাল, এ বাড়ি বিক্রি করে দাও দাদা। জঙ্গলের কাছে গিয়ে একটা বাড়ি তৈরী করে নাও ; যেখানে কোন বড়লোকের বাড়ির ফটক নেই।

সুচরিত হাসে--তোর দেখছি ও-বাড়িটার ওপর ভয়ানক রাগ হয়েছে।

--হয়েছে বইকি। তার চেয়ে বেশি রাগ হয়েছে তোমার কাণ্ড দেখে।

--আমার কাণ্ড আবার কি দেখলি?

--দেখছি, যখন-তখন ওরা গায়ে পড়ে অপমান করে যাচ্ছে ; আর তুমি একটি টুঁ শব্দও না করে সব সহ্য করছ।

--অপমান বলে ধরছিস কেন? ধরে নে না কেন, ওগুলো একরকমের তামাসা।

বেণু বলে--তোমার কথা শুনে ঈশপের সেই গল্পটা মনে পড়ছে। দুষ্টু ছেলের দল পুকুরের জলের ব্যাঙগুলোর গায়ে ঢিল ছুঁড়ছিল। বুড়ো ব্যাঙ বলল, এ কি করছ তোমরা? ছেলেরা বললে, খেলা করছি। বুড়ো ব্যাঙ বললে, কিন্তু তোমাদের কাছে যেটা মজার খেলা, আমাদের কাছে সেটা যে নিদারুণ মরণ।

সুচরিত বেণুকে বোঝাতে চেষ্টা করে।--তবে ধরে নে না, ওগুলো ওদের সতিই একটা দরকারের মত দাবি। সত্যিই ব্যাঘাত হয় বলেই ছুটে এসে দাবি করে ; তার মানে আমাদের কাছে একটু সাহায্য চায়।

হেসে ফেলে বেণু--ওদের পক্ষ নিয়ে তুমি ওকালতী করছ বটে, কিন্তু তোমার কথাগুলোর কোন মানে দাঁড়াচ্ছে না।

--কি বললি?

--ওদের সাহায্য করবার জন্যেই কি আমরা এখানে এসেছি? আমাদের কোন দরকার নেই? আমাদের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না? ওখানে কোন্ এক রাজকন্যের মাথা ধরেছে বলে আমরা এখানে একটু চেঁচিয়ে হাসতে পারব না, এরকমের হুকুমের কথা যে কেনা চাকরকেও কেউ বলে না। আর কেনা চাকরও এমন হুকুম শোনে না।

সুচরিত--তুই কি বলতে চাস, ওরা নিতান্ত মিছিমিছি এসব কাণ্ড করে? সামন্ত সাহেবের মেয়ের জ্বরই হয় না? কিংবা পড়াশোনাও করে না?

বেণু--মানছি, খুব জ্বর হয় ; আর খুব পড়াশোনা করতেও হয়। কিন্তু তাতে আমাদের কি আসে-যায়? সেজন্যে তুমি বেহালা বাজাতে পারবে না, আমি গান গাইব না ; বাঃ আবদারের আর সীমা নেই!

সুচরিতও হেসে ফেলে--ওরা একটু বাড়াবাড়ি করে ঠিকই।

বেণু--একটু বলছ কেন? বড় বেশি, খুব অভদ্র আর ভয়ংকর বাড়াবাড়ি।

সুচরিত বলে--আমার কি মনে হয় জানিস?

--কি?

--আমরা চুপ করে থাকলেও ওরা জব্দ হয়ে যাবে।

কিন্তু চুপ করে থেকে থেকে যে আমরাও জব্দ হয়ে যাচ্ছি।

--কেন?

--তোমার বেহালা তো ঠাণ্ডা হয়েই গেছে। আর আমার পড়াশোনাও চুলোয় যেতে বসেছে।

--তোর পড়াশোনার আবার কিসের ব্যাঘাত হলো?

--আমি মনে মনে কিংবা গুনগুনিয়ে পড়তে পারি না। চেঁচিয়ে না পড়লে আমার পড়া মুখস্থই হয় না।

--খুব হবে। অভ্যেস করলেই হয়ে যাবে।

বেণু রাগ করে--দেখতেই পাবে। পরীক্ষার ফল বের হোক, তখন কিন্তু আশ্চর্য হতে

পারবে না, আর জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না, কেন থার্ড ডিভিশন হলো।

সুচরিত তবুও দমে যায় না। অদ্ভুতভাবে হাসে, আর অদ্ভুত একটা কথা বলে।--তাই যদি হয়, তবে বুঝতে হবে, তুই ওদেরই ওপর রাগ করে পরীক্ষার ফল খারাপ করেছিস। ওদের তুই বড় বেশি গ্রাহ্য করছিস।

সুচরিতের কথাগুলো যেন একটা এলোমেলো হাওয়ার ভাষা। কখনও শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কখনও গাছের ডালপালা নুইয়ে দিচ্ছে, কখনও বা ফুলের পাপড়ি ঝরিয়ে দিচ্ছে। হাসছে, গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, চমকে উঠছে, আনমনা হয়ে যাচ্ছে। এই এলোমেলো ভাষার মধ্যে যেন কোন ইচ্ছার প্রাণ নেই। বোধহয় নিজেই বুঝতে পারছে না সুচরিতের মন।

আর বেণুকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই বা কি হবে? কেউ যদি এসব গল্প শোনে তবে সে কি সুচরিতের মাথার সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ না করে পারবে? চেহারাটা দেখতে তো বেশ তেজী, চোখের দৃষ্টিতে তো খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি ঝকমক করছে ; বয়সটাও কারও অকারণ ধমক-ধামক মাথা পেতে নেবার মত বয়স নয়। এমন মানুষ সামন্ত সাহেবের নেপালী চাকরের এক একটা কর্কশ ভাষার দাবিকে এত সহজে মেনে নেয় কি করে?

একদিন হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছিল সুচরিত।--আমার একটা কথা মনে হয় বেণু, সামন্ত সাহেব যে-রকমই মানুষ হোন না কেন, তাঁর মেয়ে বোধহয় অন্য রকমের মানুষ।

বেণু--কি রকমের?

--সামন্ত সাহেবের মেয়ে বোধহয় এসব পছন্দ করে না।

--কি?

--এই যে, যখন তখন এসে ওদের চাকরটা আমাদের উপর এক একটা হুকুমের কথা শুনিয়ে দিয়ে যায়।

--কি দেখে তোমার এমন ধারণা হলো?

--চাকরটার কথা থেকেই বোঝা যায় যে, বাড়ির সাহেবই এসব হুকুম দিয়ে থাকেন, বাড়ির দিদি কোনদিন এরকম করে হুকুম দেননি।

--ভারি দয়া করেছেন মহীয়সী দিদি! যদি ভদ্রতাবোধ থাকত, তবে মহীয়সী কি তাঁর বাবাকে বাধা দিতেন না?

--দেয় কি না দেয়, সেটা আমরা বুঝবই বা কি করে? আমার মনে হয়, সামন্ত সাহেবের মেয়ে আপত্তি করে ঠিকই, কিন্তু সামন্ত সাহেব তাঁর মেয়ের কথা গ্রাহ্যই করেন না।

--সামন্ত সাহেবের মেয়েকে তুমি যত গঙ্গাজল ভাবছ, ততটা গঙ্গাজল সে নয়। তার যথেষ্ট অহংকার আছে।

--কি রকম?

--তা না হলে এই এক বছরের মধ্যে অন্তত একটা দিনও আমাদের বাড়িতে আসত নিশ্চয়। তোমার সঙ্গে কথা-টথা না বলুক অন্তত আমার সঙ্গে কিংবা মা'র সঙ্গে বলত।

--সেটা বোধহয় সামন্ত সাহেবের আদেশ। তাঁর মেয়ে কারও সঙ্গে কথা-টথা বলুক, এটা হয়তো তিনি পছন্দ করেন না।

--কিন্তু তোমার সঙ্গে এক কলেজে পড়তেন যে ভদ্রলোক...কি যেন নামটা...

--রজত রায়।

--হ্যাঁ, রজত রায়ের সঙ্গে তো খুব গল্প করতে পারেন সামন্ত সাহেবের মেয়ে।

এইবার চেঁচিয়ে হেসে ফেলে সুচরিত--এটা আবার কি বললি বেণু। পাগলের মত একটা কথা!

--কেন?

--আরে, রজতের সঙ্গে গল্প-টল্প করবেন সামন্ত সাহেবের মেয়ে, এটাও যে সামন্ত সাহেবের একটা ইচ্ছের আদেশ।

হেসে ফেলে বেণু। হেসে ফেলে সুচরিত।

বেণুর মনেও কোনদিন ভুলেও এ সন্দেহ দেখা দেয়নি যে, দাদার এই হাসির আড়ালে কোন দুশ্চিন্তার কাঁটা মুখ লুকিয়ে বসে আছে। কে জানে, দাদা ও-বাড়ির হুকুমের উপদ্রবগুলিকে সত্যিই হয়তো এ রকমের একটা সহ্যশীল নীরব উপেক্ষা দিয়েই তুচ্ছ করতে চাইছে। দাদাকে যতটুকু চেনে বেণু, তাতে দাদার সম্বন্ধে আর যে-কোন ধারণাই হোক না কেন, কিন্তু এ ধারণা কোনদিনই সম্ভব হয়নি যে, সামন্ত সাহেব নামে একজন বড়লোককে দাদা ভয় করতে পারে। বরং, এই সত্যই জানে বেণু, বড়লোকের কাছে গিয়ে মাথা হেঁট করে দুটো তোষামোদের কথা বলতে পারেনি বলেই সুচরিতকে অনেক ভালভাল রোজগারের চাকরি হারাতে হয়েছে। গত বছরেই তো, কত ভাল একটা সরকারী চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে কি কাণ্ডই না করে চলে এলে সুচিরত। অফিসার ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন, বুদ্ধ আর অশোকের পরেই আর কার নাম আপনার মনে হয়, যার জন্যে ভারতবর্ষের এমন অবনতি হয়েছে?

সুচরিত বলেছিল--আপাতত আপনার নাম মনে হচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা অফিসার কটমট করে সুচরিতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলেন। তারপরেই বলেছিলেন--আপনি এখন যেতে পারেন।

হাসতে হাসতে চলে এসেছিল সুচরিত। বাড়ি ফিরে এসেই বলেছিল--আমার কপালে সরকারী চাকরি-টাকরি নেই বেণু।

--কেন?

ইন্টারভিউয়ের গল্পটা বলে দিয়ে বেণুকেও হাসিয়ে দিয়েছিল সুচরিত।

একবার কোন্ এক জমিদারের এক দুর্দান্ত পুত্র মাতাল হয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে পথের এক বুড়োকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল। ঘটনাটা সুচরিতের চোখের সামনেই হয়েছিল। দুর্দান্ত জমিদারপুত্র এসে সুচরিতকে শাসিয়ে দিল, যেন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে সাহস না করে সুচরিত। ভুলে যায়নি বেণু, সেই দুর্দান্ত জমিদারপুত্রকে দুটো চড় মেরে বাড়ির বারান্দা থেকে নামিয়ে দিয়েছিল সুচরিত।

সুতরাং সামন্ত সাহেবকে ভয় করবার মত কোন ভীরুতা সুচরিতকে চুপ করিয়ে রেখেছে, এটা অনেকেই বিশ্বাস করবে না। যারা সুচরিতকে সামান্য একটুও জানে, তারাও বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু এখন হাসপাতালের একটি কেবিনের বিছানার উপর শুয়ে পড়ে থেকে কি ভাবছে সুচরিত? এত ছটফটই বা করছে কেন? সোমেশ ডাক্তার বলেছে, এরকম ছটফট করবার তো কারণ দেখছি না। জ্বর বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু সন্দেহ হয়, ঘুমোতে বোধহয় পারছে না সুচরিত।

ঠিকই সন্দেহ করেছে ডাক্তার ; আর বেণুর কথা থেকেও বোঝা যায়, এই কদিন জ্বরের মধ্যে কোনদিন ঘুমোতে পারেনি সুচরিত। সুতরাং, ডাক্তারের মনে সেই সন্দেহটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে তো কোন মানসিক কারণ আছে বলে মনে হচ্ছে। এবং আপাতত ঘুমের ওষুধ দেওয়া ছাড়া, আর কোন চিকিৎসা নেই। আর, কয়েকটা দিন লক্ষ্য করাও উচিত। একটু অবজারভেশন দরকার। সোমেশ ডাক্তারের চিন্তাটাও বোধহয় একটু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। এবং স্পষ্ট করে কিছু ধরতে পারছে না বলেই এই ব্যবস্থাটা করেছে। অর্থাৎ সুচরিতকে হাসপাতালে রেখে কয়েকটা দিন শুধু অবজার্ভ করতে চায় সোমেশ। তা না হলে,

এ রোগী হাসপাতালে আটক করে রাখবার মত কোন রোগী নয়।

সোমেশও সোজাসুজি সুচরিতের মুখের দিকে তাকিয়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।—তোমার কি মনে হয় বল ; কেন ঘুম হয় না?

সোমেশ ডাক্তারের এই সামান্য সাধারণ প্রশ্নটা যেন একটা হঠাৎ চিৎকারের মত সুচরিতের কানের কাছে বেজেছে। চমকে উঠেছে সুচরিতের কান দুটো ; এবং সেই সঙ্গে বোধহয় বুকটাও। কেন ঘুম হয় না, কারণটাকে এতদিন যেন ইচ্ছে করে ভুলে থাকতে চেয়েছে সুচরিত। সোমেশ ডাক্তারের প্রশ্নটা সেই কপট বিস্মৃতির আবরণ ছিন্ন করে দিয়েছে। আর সুচরিতের চোখ দুটো এবার স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে একটা মুখের ছবিকে ; ছবিটা যেন সুচরিতের ভাবনার অদ্ভুত একটা লজ্জা দিয়ে আড়াল করে রাখা একটা প্রাপ্তি।

বুঝতেই পারেনি সুচরিত, কেন আর কবে থেকে আর কেমন করে সামন্ত সাহেবের মেয়ের মুখের ছবিটা সুচরিতের মনের ঘরের একটি নিভৃতে এসে ঠাঁই নিয়ে ফেলেছে। তর্ক করে বেণুকে বুঝিয়ে আর চুপ করিয়ে দিতে পারা যায়, কিন্তু মনটা তো এ-সত্য অস্বীকার করতে পারে না, অর্চনাকে ভাবতে ভাল লাগে। অস্বীকার করবার উপায় নেই, অর্চনাকে ভাল লাগে বলেই সামন্ত সাহেবের যত হুকুমের আঘাত আর অপমানগুলিকে চুপ করে সহ্য করে চলেছে সুচরিত। মাঝে মাঝে নিজেরই চিন্তার কাছে যেন কশাঘাত খেয়ে ছটফট করেছে সুচরিতের মন ; ছিঃ, এভাবে কেউই শুধু দূর হতে দেখা একটা মুখের জন্য মায়া করে নিজের মনুষ্যত্ব ক্ষয় করে না।

ঐ বাড়ি, ঐ সামন্ত সাহেব, আর, তাঁর ঐ মেয়ে ; সবই তো সুচরিতের জীবনের কাছে একটা অচেনা অজানা আর অনাগাল জগতের যত প্রতিচ্ছবি। ঐ বাড়ির ছায়াটাও সুচরিতকে একটা মানুষ বলে মনে করে না। সুতরাং ঐ বাড়ির মেয়ের পড়াশোনার আর ঘুমের সুখের জন্য বেহালা বন্ধ করা যে নিতান্ত একটা করুণ উৎকোচ ; অর্চনার মত মেয়ের কাছে যার কোন মূল্য নেই। যদি জানতেও পায় অর্চনা, সুচরিতের মত দুরন্ত স্বভাবের মানুষও কেন এমন নিরীহ হয়ে গেল, তবে একটা কৌতুকের লজ্জায় হেসে ফেলবে অর্চনা। সবই বুঝতে পারে সুচরিত, সবই অনুমান করতে পারে ; পৃথিবীটাকে রূপকথার জগৎ বলে কোনদিন ধারণাও করেনি সুচরিত ; তবু কি আশ্চর্য, সামন্ত সাহেবের মেয়ের কথা ভাবতে ভাল লাগে।

কেন ভাল লাগে? এ জিজ্ঞাসারও কোন উত্তর খুঁজে পায়নি সুচরিত। কিন্তু একটা কল্পনা যেন সুচরিতের এই অজ্ঞানতাকেও একটা নিরীহ কপটতা বলে প্রমাণ করে দিয়েছে। চমকে উঠেছে সুচরিত। প্রাণটাই লজ্জা পেয়েছে, নিজেকে চোর বলে মনে হয়েছে। নিতান্ত ভীরু একটা চোর। সামন্ত সাহেবের মেয়ের ছায়াকে নয়, নিছক কল্পনা করা একটা দেহচ্ছবিকে বুকে জড়িয়ে ধরে সুচরিতের নিঃশ্বাসের বাতাস সত্যিকারের বাষ্পে ভরে গিয়েছে। লজ্জা পেয়ে চমকে উঠেছে সুচরিত। নিজেরাই প্রাণটাকে একটা জন্তু-জন্তু ক্ষুধার প্রাণী বলে মনে করে ঘেন্না করেছে।

এই ঘেন্না সহ্য করতে গিয়ে যেন একটা আতঙ্কের মধ্যে সুচরিতের যুক্তিও হারিয়ে গিয়েছে।

মানুষের মনের এমন দুর্গতিও হয়! একটা মিথ্যার কাছে এভাবে জীবনের আগ্রহ উৎসর্গ করে দিতে যে পাগলেও লজ্জা বোধ করবে। এ লজ্জা যেন একটা কুৎসিত কাপুরুষতার লজ্জা। ঘৃণাটা ত্রিশ বছর বয়সের শরীরটার রক্তেরই একটা করুণ অনাচারের ঘৃণা। অপমানটা যেন মনুষ্যত্বের অহংকার হারিয়ে ফেলা একটা অপরাধের অভিশাপ। মাঝরাতের স্তব্ধতার এক-একটি মুহূর্তে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসেছে সুচরিত। আলো জ্বেলেছে, বই পড়েছে। লজ্জাকর আতঙ্কটা চোখের ঘুম নষ্ট করে দিয়েছে। একদিন দুদিন তিনদিন...লজ্জাকর আতঙ্কটা সত্যিই সুচরিতকে সারা রাত জাগিয়ে রেখেছে।

জ্বরটা তো আগে আসেনি। মাসের পর মাস এরকম একটা ঘুমছাড়া আর রাতজাগা অভ্যাসের বাতিক দেখা দিয়েছে, তারপর হঠাৎ একদিন জ্বর দেখা দিয়েছে।

সোমেশ ডাক্তারের প্রশ্নটাও যেন একটা কশাঘাত। সুচরিতের একটা করুণ কাঙালপনার প্রাণ ছটফটিয়ে উঠেছে। সন্দেহ হয়, এই ঘুমহারানো আতঙ্ক আর এই জ্বর, সবই যেন চেষ্টা করে তৈরী করা একটা অভিমান। যেন কারও পাথুরে অহংকারের মন গলিয়ে দিতে চাইছে সুচিরত। সুচরিতকে হাসতে গাইতে আর বেহালা বাজাতে দিতে পছন্দ করে না যে শাসন, তারই কাছে নিজেকে একেবারে অসহায় করে তুলে ধরবার চেষ্টা, যেন, সত্যিই, সুচরিতের অসুখের খবর পেয়ে ছুটে আসবে সামন্ত সাহেবের মেয়ে ; আর ব্যথিতভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেলবে--কেন অসুখ হলো?

ভাবতেও হাসি পায়। কল্পনাটা কত বড় একটা অসম্ভবকে আশা করতে চেষ্টা করেছে। পৃথিবীটাকে সত্যিই যেন একটা রূপকথার সংসার বলে ধারণা করে বসে আছে সুচরিতের পাগল মনে মোহ। সামন্ত সাহেবের ঐ বাড়ি, যে-বাড়িটার শুধু রূপ আছে কিন্তু হৃদয় বলে কোন পদার্থ নেই, তার কাছ থেকে এমন চমৎকার একটা হৃদয়বত্তা আশা করেছে সুচরিতের একটা অপদার্থ মন।

সোমেশ ডাক্তার তখনও কেবিনের ভিতরে একটি চেয়ারে বসে আছে। বোধহয় সুচরিতের কাছ থেকে কোন উত্তর আশা করছে। কিংবা আরও দু'চারটে প্রশ্ন করবে কি না ভাবছে।

সুচরিত বলে--আমারও একটা কথা মনে হচ্ছে সোমেশ। বোধহয় ঘুম না হবার জন্যই এরকম একটা গোলমেলে অসুখ হয়েছে।

সোমেশ ডাক্তার কে-জানে কি ভেবে হঠাৎ হেসে ফেলে--কিন্তু ঘুমটা হয় না কেন?

সুচরিতও হাসে--বোধহয় নানারকম আবোল-তাবোল চিন্তার জন্য।

সোমেশ--আবোল-তাবোল চিন্তাগুলি তাহলে ছাড় এবার।

সুচরিত--নিশ্চয় ছাড়তে হবে।

সোমেশ--তবে আজ অন্তত একটু ঘুমের ওষুধ খাও আর ঘুমোও। কাল আমিও তোমাকে ছেড়ে দেব।

সুচরিত--ভাল কথা।

সোমেশ ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েও চলে যায় না। কারণ, কেবিনের দরজার পর্দা সরিয়ে একটা বিচিত্র কৌতূহলের মুখ উঁকি দিয়েছে।

দেখে চমকে ওঠে বেণু। কিন্তু সোমেশ ডাক্তার চমকে ওঠে না, কারণ মুখটা সোমেশের কোন চেনা মুখ নয়।

আগন্তুক কৌতূহলের মুখটা তেমনই দরজার পর্দার পাশে থেকেই কথা বলে--আপ আচ্ছা হ্যায়?

চমকে ওঠে সুচরিতেরও চোখ। মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকায়। ঠিকই, চেনা-মুখই বটে। সামন্ত সাহেবের চাকর মনবাহাদুর কথা বলছে।

মনবাহাদুরের গলার স্বরেরও এ কি দারুণ দশা হয়ে গিয়েছে! মনবাহাদুরও যে ব্যথিতের মত উদ্বিগ্ন মন হয়ে আর শান্ত স্বরে কথা বলতে পারে। তাছাড়া, মনবাহাদুরের মুখে এটা যে একটা নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষজাতির ভাষা। আপ আচ্ছা হ্যায়? মনবাহাদুর যে আজ খোঁজ নিয়ে একটা বার্তা নিয়ে যেতে চায় ; কোন হুকুমের হুংকার ছাড়তে আসেনি। হাসপাতালের কেবিন-ঘরের দরজার উপর যেন একটা নিদারুণ বিস্ময়ের প্রশ্ন এসে করাঘাত করেছে।

সুচরিত বলে--কি বলছ?

মনবাহাদুরের চোখ দুটো যেন একটা নম্র জিজ্ঞাসার ভারে কুঁচকে যায়।--দিদি পুছতা হ্যায়, আপ আচ্ছা হ্যায়?

দিদি জিজ্ঞেস করছেন আপনি ভাল আছেন? বেণুর চোখ দুটো যেন এক জোড়া হতভম্ব বিস্ময়। এরকম একটা নতুন কথা দু'কান দিয়ে শুনতে পেয়েও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না বেণু।

সোমেশ--লোকটা কে?

সুচরিত--আমাদের সামনের বাড়ির চাকর।

সোমেশ--সামন্ত সাহেবের চাকর?

সুচরিত--হ্যাঁ।

সোমেশ শুধু একমুহূর্ত কি-যেন চিন্তা করে। তারপরেই মনবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ; আর চেঁচিয়ে ওঠার ভঙ্গীটা যেন একটা রহস্যময় উল্লাসের ভঙ্গী--হ্যাঁ, বাবু বহুৎ আচ্ছা হ্যায়। দিদিকো বোল দে না।

মনবাহাদুর--আপ কওন হ্যায়?

সোমেশ হাসে--হাম ডাক্তার হ্যায়।

--বহুৎ আচ্ছা। একটা সেলাম ঠুকে দিয়েই সরে যায় মনবাহাদুর। মনে হলো, মনবাহাদুরও যেন একটা হন্তদন্ত উল্লাস হয়ে দৌড় দিয়ে চলে গেল।

সোমেশ বলে--আমি চলি ; আর হাসপাতালের গাড়িটাকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সুচরিত--কেন?

বেণুর দিকে তাকিয়ে কথা বলে সোমেশ--তোমার দাদা ভদ্রলোককে এখানে আর রাখার দরকার বোধ করছি না।

বেণু--তাহলে আমরা এখন বাড়ি চলে যাব?

সোমেশ--নিশ্চয়।

বেণু--ওষুধ?

সোমেশ--কিছুই দরকার নেই। মনে হচ্ছে, আজ থেকেই বেশ ভাল ঘুম হবে।

পাঁচ

বেণু কি বুঝল কে জানে? সামনের বাড়ির অহংকারের হুকুমটা হঠাৎ কেন এভাবে বদলে গিয়ে একটা মায়ার জিজ্ঞাসা হয়ে গেল, ভাবতে চেষ্টা করলেও কিছুই যেন ভেবে ওঠা যায় না। সোমেশ ডাক্তারের কথাগুলির মধ্যেও যতই মুখচাপা সাবধানতা থাকুক না কেন, বুঝতে অসুবিধে হয়নি বেণুর, কি-যেন একটা অদ্ভুত কথা বলতে চেয়েছিল সোমেশ ডাক্তার, কিন্তু, বেণু সামনে ছিল বলেই হয়তো মুখ খুলে বলে দিতে পারল না।

কে জানে কি বলতে চেয়েছিল সোমেশ ডাক্তার ; কিন্তু এই সত্যটা তো বুঝতে অসুবিধে নেই, সামন্ত সাহেবের বাড়ির সবই অহংকার নয়। অন্তত অর্চনাদির মনটা যে নিরেট অহংকারের মন নয়, সেটা তো বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু একটা রহস্য বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে, আজ এতদিন পরে এত হঠাৎ কেন এমন একটা ভদ্রভাষায় খোঁজ নিয়ে ফেললেন অর্চনাদি? এতদিনের ভুলটাকে কি হঠাৎ বুঝে ফেলেছেন? এ-বাড়ির মানুষগুলিকে যে বড় বেশি অপমান করা হয়েছে, সে সত্য বুঝতে পেরেই কি লজ্জা পেয়েছেন অর্চনাদি? কিংবা একটা অনুতাপ? সত্যিই কি ও-বাড়িটা আর এ-বাড়ির বেহালার মুখ বন্ধ করে দিতে চায় না? এ-বাড়ির হাসি-খুশির সাড়া-শব্দ শুনতে চায়।

কিন্তু সুচরিতের মনের বিস্ময় যেন নিদারুণ একটা মাথা হেঁট করা লজ্জার বিস্ময়। মনে হয়, এইবার সত্যিই ও-বাড়ির কাছে ছোট হয়ে গেছে এ-বাড়ির মাথাটা। সামন্ত সাহেবের

মেয়ের কথা ভাবতে গিয়ে এতদিন ধরে যা ভেবে এসেছে সুচরিত, সেটা যে নিছক একটা স্বার্থপর রক্তমাংসের ভাবনা। কল্পনাতেও কোন দিন অর্চনাকে একটা সুন্দর চেহারা বলে মনে করেছে। সেই চেহারাটাকেই শুধু মনে মনে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। খুশি হয়েছে সুচরিতের ত্রিশ বছর বয়সের একটা লোভ। আদালতের কুৎসিত মামলার ঘটনাগুলিতে যাদের দেখা যায়, সুচরিতের মনটাও যে তাদেরই মত একটা নীচ চরিত্রের প্রাণী হয়ে অর্চনাকে একটা ক্ষুধার্ত নিঃশ্বাসের বাষ্প দিয়ে ব্যথিত করে অপমান করেছে। মানুষকে ভালবাসতে শেখেনি সুচরিতের মন। অর্চনার মনের জন্যও কোন মায়া নেই, অর্চনার মনটাকে কল্পনায় বুঝতে চেষ্টাও করেনি সুচরিত। সুচরিতের কল্পনা এতদিন যেন শুধু কাদা ছড়িয়ে অর্চনাকে অপমান করেছে।

সুচরিতের বুকের ভিতরের সব অহংকারও যেন ভয় পেয়েছে। যেন একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে মনটা। এমন কোন চেষ্টাই কি সম্ভব নয়, যাতে শুধু অর্চনার ভালর জন্যই অর্চনাকে ভালবাসতে পারা যায়!

সত্যিই তো অর্চনা এসে সুচরিতের প্রাণের কাছে কোন কৈফিয়ত দাবি করছে না। কিন্তু মনেরই ভেতরে কেউ যেন কৈফিয়ত দাবি করছে ; কেন এরকম অন্যায় করলে? নিজেকে এত ছোট করে ফেললে? যে মেয়ের সঙ্গে কোন পরিচয় নেই, কোন সম্পর্ক নেই ; যার সঙ্গে কোনদিন কোন সম্পর্ক হবেও না, তার সম্পর্কে একটু শ্রদ্ধা নিয়ে কিছুই ভাবতে পারলে না?

দিনগুলি বেশ পার হয়ে যাচ্ছে। সীতাগড় পাহাড়ের পূবে যেমন রোজই সূর্য ওঠে আর ওদিকে ক্ষীরগাঁওয়ের পশ্চিমের শালজঙ্গলের গায়ে হেলে পড়ে ডুবে যায় ; সুচরিতের ঘুমভাঙা আর জেগে-ওঠা জীবনটারও রকম ঠিক তেমনই নিয়মিত। সকালবেলা চাকরির কাজে চলে যাওয়া আর সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে আসা। এর মধ্যে একটা দিনও বেহালাটাকে হাতে তুলে নেয়নি সুচরিত। মনে হয়, সন্ধ্যায় ঠিক বেহালার আলাপ শোনবার জন্য পিপাসু হয়ে ওঠে না। কিন্তু কিসের জন্য, কি দেখবার বা কি শোনবার জন্য সন্ধ্যার মনটা ছটফট করে, তাও ঠিক বোঝা যায় না।

মাঝে মাঝে এক-আধবার অবশ্য দেখা যায়, বই হাতে নিয়ে দোতলার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অর্চনা ; কিংবা নীচেই লনের উপরে একটি বেতের চেয়ারের উপর বসে আছে ; চুপ করে যেন নিজেরই মনের কোন ধ্যানের ছবি দেখছে। সামন্ত সাহেবের মেয়ের জীবনে নতুন কোন আকুলতা বা ব্যস্ততার ছোঁয়া লেগেছে, তার বিন্দুমাত্র চিহ্নও অর্চনার এই শান্ত চেহারার মধ্যে ফুটে ওঠেনি।

সত্যিই, বিশ্বাস করতেই পারে না সুচরিত, এই মেয়ে একদিন মনবাহাদুরকে পাঠিয়ে সুচরিতের অসুখের খবর নিয়েছে। সে খবর জেনে কি লাভ হলো সামন্ত সাহেবের মেয়ের। আর, এখন যে একেবারে নীরব হয়ে আর একেবারে নির্বিকার একটা প্রাণ হয়ে দিন আর রাতের মুহূর্ত পার করে দিতে পারছে ; এ-বাড়িটার অস্তিত্বটাই যেন চোখে পড়ছে না, এমনই একটা শান্ত তুচ্ছতার চোখ তুলে তাকাতে পারছে ; তাতেই বা অর্চনার জীবনের কোন্ লাভ?

একটা মাসও পার হয়ে যায়। বুঝতে আর অসুবিধে নেই সুচরিতের, কি ভয়ানক জব্দ হয়ে গিয়েছে সুচরিতের আত্মাটা। বেণুর কাছে অনেক গর্ব করে যে কথাটা বলেছিল সুচরিত, সেই কথাটারই অহংকার যেন একটা ঠাট্টার আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সামন্ত সাহেবের হুকুমের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে সামন্ত সাহেবের বিরাট বাড়িটার বিরাট অহংকারকে যেন একটা তুচ্ছতা দিয়ে জব্দ করে দিতে পেরেছে সুচরিত : সেই ধারণাটাকে একটি সামান্য মায়ার জিজ্ঞাসা দিয়ে একেবারে ধুলো করে দিয়েছে অর্চনা। সে জিজ্ঞাসা একেবারে নীরব হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার আর কোন কথা বলল না ; কি ভয়ানক তুচ্ছতা! সুচরিতের প্রাণের কাঙালপনা বড়লোকের মেয়ের একটি মিষ্টি কথার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়েছিল। বোধহয়

আরও শুনতে পাবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু কত বড় ভুলের আশা!

মাঝে সোমেশ ডাক্তার একদিন এসেছিল। এসেই হেসে ফেলেছিল।--তুমি একবার ওঘরে যাও তো বেণু ; আমি তোমার দাদা ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু মন খুলে কথা বলি।

বেণু চলে যায়। সোমেশ বলে--সামন্ত সাহেবের মেয়ে তোমার জন্য এত উদ্বিগ্ন হয় কেন?

সুচরিত--সামন্ত সাহেবের মেয়ে জানে।

--তুমি কি জান, সেটা স্পষ্ট করে বল।

--আমি তো জানি, ওটা উদ্বেগ নয় ; উদ্বিগ্ন হবার একটা ফ্যাশন।

--সত্যিই কি তোমার তাই ধারণা?

--হ্যাঁ।

--আমারও তাই মনে হয়। মহিলা তোমাকে পছন্দ করেন ঠিকই কিন্তু বিয়ে-টিয়ে করবেন না।

--বড় ভুল ডায়গনোসিস হলো সোমেশ।

--অ্যাঁ? তবে সত্যিই তোমাকে বিয়ে করবেন মহিলা?

সুচরিত হাসে--মহিলা যাকে বিয়ে করবে তাকে তো তুমিও চেন?

--না। আমি তো তুমি ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করতে পারছি না।

আমাকে সন্দেহ করবার দরকার নেই। পাগলেও এমন সন্দেহ করবে না।

--তবে কাকে সন্দেহ করব?

--সন্দেহ করবার ব্যাপার নয়। রজত রায়ের সঙ্গে সামন্ত সাহেবের মেয়ের বিয়ে অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়ে আছে।

--রজত রায়? আমাদের সেই পাটনা কলেজের রজত?

--হ্যাঁ।

--সে তো মাঝে মাঝে এখানে আসে আর হ্যাম্পটন হোটেলে ওঠে।

--হ্যাঁ। সামন্ত সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

--কিন্তু তোমাকে বিয়ে করলেই তো ভাল করত সামন্ত সাহেবের মেয়ে।

--সামন্ত সাহেবের মেয়ে তার ভাল নিজেই ভাল বোঝে, অন্তত তোমার চেয়ে বেশি ভাল বোঝে।

--রজত লোকটা মন্দ নয়। ভাল চাকরি-টাকরি করে বোধহয় কিন্তু তোমার তুলনায় রজত তো একটা...।

সোমেশ ডাক্তার শুধু নিজের মতটা চেঁচিয়ে বলে দিতে পারে ; কিন্তু সেটা বুঝিয়ে দেবার মত যুক্তি বোধহয় খুঁজে পায় না।

সুচরিত বলে--সামন্ত সাহেবের মেয়ে রজতকে ভালবাসে বলে মনে হয়।

সোমেশ--তা বাসুক না কেন ; তাতে কি আসে-যায়? তোমাকেও বাসতে পারে।

সুচরিত--কেন? কোন্ দুঃখে?

সোমেশ--ইচ্ছে। আমার ধারণা, সামন্ত সাহেবের মেয়ের ইচ্ছেটা এই যে...।

--কি?

--রজতকে বিয়ে করতে চায় ; কিন্তু তোমাকে ছাড়তে চায় না।

--ছিঃ, যার বিষয় কিছুই জান না, তার সম্পর্কে ওরকম একটা বাজে কথা বলে ফেলা উচিত নয় সোমেশ।

--মহিলার সম্পর্কে তোমারই বা হঠাৎ এত শ্রদ্ধার ভাব উথলে উঠল কেন? তুমিও তো মহিলার বিষয় কিছুই জান না। শুধু চোখে দেখেছ এইমাত্র।

--চোখে দেখে যা বুঝেছি, তাই বলছি।

--কি বুঝেছ?

--তুমি যা বলছ, ঠিক তার উল্টোটিই বুঝেছি।

--অর্থাৎ তোমাকে গ্রাহ্যই করে না?

--আমাকে গ্রাহ্য করবার কোন দরকারই হয় না।

--তোমার চেহারাটাকেও কি গ্রাহ্য করে না মহিলা?

সুচরিতের গলার স্বরে এবার প্রতিবাদের ভাষাটা যেন একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে চায়।--তুমি মিছিমিছি মহিলার সম্পর্কে এত খারাপ একটা ধারণার কথা বলছ কেন? খুব খারাপ কথা বলেছ সোমেশ।

--বুঝলাম, তোমার মানস আকাশের কোথায় যেন একটা মেঘ দেখা দিয়েছে ভাই। এক্সকিউজ মি।

--ভুল।

--কথাটা বলতে গিয়েও চমকে উঠলে কেন?

--বলছি, আমার মানস আকাশে যদি সত্যিই মেঘ দেখা দিয়ে থাকে, তবে তার চেয়ে হাসির ব্যাপার আর কিছু হবে না।

--দেখ তাহলে, সে-মেঘ হেসে উড়িয়ে দিতে পার কিনা। মোট কথা...।

--কি?

--আমি আমার সোজা সন্দেহ সোজা করে বলে দিলাম। যদি পার তবে সাবধান হয়ে যাও, ওদিকে ঘেঁষতে যেও না।

--কিসের জন্য সাবধান হব?

--ও মেয়ে তোমাকে না ভালবেসে ছাড়বে না। অথচ...না, তোমার মনের শ্রদ্ধা আবার ব্যথিত হবে। আমি চলি।

ও ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় সোমেশ--আমি আজ চা খাব না বেণু আমি যাচ্ছি।

ছয়

সামন্ত সাহেব কোথায় যেন গিয়েছেন। হোসেন সাহেব বললেন, বোধহয় কলকাতা হয়ে দার্জিলিং গিয়েছেন।

সুচরিতের মুখে উর্দু আর ফার্শী কবিতার আবৃত্তি শোনবার জন্যে মাঝে মাঝে সুচরিতকে শরবত খেতে নিমন্ত্রণ করেন হুসেন সাহেব।

হোসেন সাহেব মানুষটাকেও সুচরিতের বেশ ভাল লাগে। সারা জীবন কারবার করে অজস্র টাকা উপার্জন করেছেন। প্রাসাদের মত দেখতে এত বড় একটা বাড়ি তৈরী করেছেন। বাড়ির চেহারাতে যেন শাজাহানী অভিরুচির ছাপ আছে। বারান্দার রেলিং-এ মার্বেলের জালি। সামনের লনের চারিদিকে দামাস্কা গোলাপের ভিড়। লনের মাঝখানে একটা ফোয়ারা। ঝরা গোলাপের পাপড়িও লনের চারদিকে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে পড়ে থাকে। বাতাস একটু উতলা হলেই হুসেন সাহেবের গোলাপ ফুলের গন্ধও উতলা হয়ে এই পাড়ার চারদিকে ছুটোছুটি করে উড়ে বেড়ায়।

সুচরিত যখন কবিতা আবৃত্তি করে, তখন হোসেন সাহেবের মুখটাও যেন মুগ্ধ হয়ে লাল গোলাপের মত টুকটুক করে। দু'চোখ বন্ধ করে সুচরিতের মুখের কবিতার আবৃত্তি শুনতে থাকেন হুসেন সাহেব।

এই হুসেন সাহেবও শুনে আশ্চর্য হন।--আজব কথা, সামন্ত সাহেব তোমাকে চেনেন না?

--জী না।

--সামন্ত সাহেব তোমার সঙ্গে কোনদিন কথাও বলেন নি?

--না।

--আমার তো ধারণা, সামন্ত সাহেব তোমার কাছ থেকে রোজই বাংলা কিংবা ইংলিশ কবিতার আবৃত্তি শুনছেন।

সুচরিত হাসে--না।

হুসেন সাহেব--এ কেমন প্রতিবেশী?

সুচরিত উত্তর দেয় না। হুসেন সাহেব আবার বেশ বিস্মিত হয়ে বলেন--সামন্ত সাহেব তো আমার এখানে প্রায়ই আসেন। অথচ আমি একটা ইংলিশ কথাও জানি না, বলতে পারি না। আমাকে তো খুব পছন্দ করেন সামন্ত সাহেব।

--আচ্ছা, আমি আজ চলি।

--আবার কবে আসবে?

--সময় পেলেই আবার আসব।

--এস তবে। কিছু গোলাপ নিয়ে যাও সুচরিত।

হোসেন সাহেব নিজেই লনের চারদিকে ঘুরে-ফিরে আর বেছে বেছে বড় বড় গোলাপ তুলে নিয়ে আর তোড়া বেঁধে সুচরিতের হাতে তুলে দেন। খুশি হয়ে হেসে ওঠেন বুড়ো হোসেন সাহেব--তুমি দিলে কবিতা, আমি দিলাম ফুল।

সুচরিতও হাসে--দুইই এক জিনিস।

হোসেন সাহেব--বেশক্! খোদার কাছে আমার আরজি কবরে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেন এই দুটি জিনিস আমার কাছে থাকে।

হোসেন সাহেবের বাড়ির ফটক থেকে যে রাস্তাটা ঝাউয়ের ছায়া নিয়ে আর এঁকেবেঁকে সীতাগড় রোডের সঙ্গে মিশেছে, সে রাস্তাটা বেশ নিরিবিলি বলেই সুচরিতের ভাল লাগে। বাড়ি ফিরতে হলে এই রাস্তা ধরে ঘুরে যাবার কোন দরকার হয় না। কিন্তু নিরিবিলি, নীরবতা, ঝাউয়ের ছায়া আর হোসেন সাহেবের গোলাপবাগের গন্ধভরা বাতাস যে রাস্তাটাকে মুগ্ধ করে রেখেছে, সে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেও যেন একটা মুগ্ধতার আবেশ পাওয়া যায়। আনমনা হয়ে চলতেও কোন অসুবিধে নেই ; পিছনে এসে আচমকা কোন ঘণ্টির শব্দ ক্রিং ক্রিং করে ওঠে না ; কোন গাড়ির হর্নও বাজে না। বরং, গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা একলা পাখির ডাক শুনে আরও আনমনা হতে পারা যায়।

কিন্তু সুচরিতের আনমনা আবেশের প্রাণটাই যেন চমকে উঠল। মনে হলো, যেন একটা ঝাউয়ের ছায়া হঠাৎ কথা বলে ফেলেছে।

কথা বলেছে অর্চনা সামন্ত ; একটা ঝাউয়ের ছায়ার কাছে একা দাঁড়িয়ে আছে একটা সুস্মিত মূর্তি।

অর্চনা বলে--এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

সুচিরত--হোসেন সাহেবের বাড়িতে।

অর্চনা--আপনি কি হুসেন সাহেবের চাকরি করেন?

--না।

--তবে?

--আলাপ-পরিচয় আছে, তাই মাঝে মাঝে যাই।

--কার সঙ্গে আলাপ পরিচয়?

--হোসেন সাহেবের সঙ্গে।

--কিন্তু এতদিনের মধ্যে আমার বাবার সঙ্গে তো আলাপ-পরিচয় করলেন না?

--সুযোগ পেলাম না।

—ইচ্ছে থাকলে সুযোগ পেতেন।

—তার মানে?

—তার মানে, বাবার ব্যবহারে যদি রাগ না করে, না হয় একটু যেচেই আলাপ করতেন যদি, তবে বোধহয়...

—রাগ করেছি, এর প্রমাণ পেলেন কোথায়?

—প্রমাণ এই যে, একেবারে চুপ করে আছেন।

—চুপ করে থাকাই কি ভাল নয়।

—না। তাহলে আমিও চুপ করে থাকতে পারতাম। আপনার সঙ্গে যেচে কথা বলতাম না।

—কি বলব বুঝতে পারছি না। আপনাকে অবশ্য বলবার কিছু নেই।

—কেন? আমি কি এমন পুণ্যির কাজ করলাম?

সুচরিত হাসতে চেষ্টা করে।—একটা আশ্চর্যের কাজ তো করেছেন।

—কি?

—ধরুন, প্রতিবেশীর অসুখের খোঁজ নিয়েছেন। আজ আবার নিজেই ইচ্ছে করে তার সঙ্গে কথা বলছেন।

—আপনি খুশি হয়েছেন?

—হয়েছি বইকি।

—আপনি কি কোনদিন ধারণা করেছিলেন যে, সামন্ত সাহেবের মেয়ে এসব কাণ্ড করতে পারে?

—না, কোনদিনও ধারণা করিনি।

—আগে কি ধারণা করেছিলেন? সামন্ত সাহেবের মেয়ে খুব অহংকারী?

—খুব শান্ত।

—একই কথা হলো। যাই হোক...।

কথা বলতে গিয়ে থেমে যায় অর্চনা। সুচরিতের চোখ দুটোও যেন একটা নূতন বিস্ময়ের রূপ দেখে চমকে ওঠে। সামন্ত সাহেবের মেয়ের এতক্ষণের এত চটুল মুখরতার মুখটা কি অদ্ভুত করুণ হয়ে গিয়েছে! চোখের পাতাগুলিও যেন নেতিয়ে পড়েছে।

অর্চনা বলে—আমি ইচ্ছে করেই এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি।

সুচরিত—কেন?

—আপনার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে।

—বলে ভালই করলেন ; আমার মনে যেটুকু ভুল ধারণা ছিল, তার সবই মুছে গেল।

—এখন বিশ্বাস করতে পারবেন তো?

—কি?

—অন্তত আপনার কাছে আমার কোন অহংকার নেই।

—বিশ্বাস করতে পারছি।

—তবে দিন।

—কি?

—ফুলের তোড়াটা!

—নিন। অর্চনার হাতের কাছে ফুলের তোড়াটা এগিয়ে দেয় সুচরিত।

অর্চনা হাসে—তবু তো নিজের থেকে দিতে পারলেন না। চেয়ে নিতে হলো।

—আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু...।

অর্চনার করুণ চোখ দুটোও যেন হাসতে চেষ্টা করে—তবু সাহস হয়নি, কেমন?

সুচরিত--ঠিক কথা।

অর্চনা--খুব ভুল বুঝেছেন সুচরিতবাবু।

--কাকে?

--আমাকে। আর, এখনও বোধহয় ভুল বুঝছেন আমার এসব বেহায়া কথা শুনে।

--ভুল বুঝতে আর চাই না। আমার শুধু ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, সত্যিই কি এটা সম্ভব?

--কি?

--তুমি আমাকে...।

--স্পষ্ট করে বল ; বলতে ভয় পাচ্ছ কেন?

--তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবেসে এসব কথা বলছ?

--মিথ্যে বলে সন্দেহ হচ্ছে?

--না ; কিন্তু এত হঠাৎ...।

--তোমার কাছে হঠাৎ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে নয়।

--কি বললে?

--আমার মন যে তোমাকে অনেকদিন থেকেই খুঁজছে। শুধু জোর করে মনটাকে ধমক দিয়ে এতদিন চুপ করিয়ে রেখেছিলাম।

--তুমি যে আমারই মনের কথাটা বলে দিলে অর্চনা।

--কি? তুমিও মনে মনে আমাকে খুঁজেছ?

--হ্যাঁ।

--কিসের জন্য?

চমকে ওঠে সুচরিত। সুচরিতের বুকের ভিতরে যেন একটা পুরনো লজ্জার ক্ষত ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে। সামন্ত সাহেবের মেয়ের এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে হলে সুচরিত নামে নিতান্ত একটা লুব্ধ আকুলতার পরিচয় জানিয়ে দিতে হয়, যে আকুলতা শুধু একটা বাষ্পসিক্ত নিশ্বাসের ইচ্ছাকে তৃপ্ত করতে চায়। সামন্ত সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করে জীবনের ঘর সাজাবে সুচিরত, এমন কোন ইচ্ছা আর আশা যে সত্যিই কোন মুহূর্তে সুচরিতের মনের কাছে কথা বলেনি।

সুচরিত বলে--আমাকে মাপ কর অর্চনা। আমি কিছু বলতে পারব না।

অর্চনা--কিন্তু আমি জানি, আমার মন কেন তোমাকে খুঁজেছে।

সুচরিত--কেন?

অর্চনা--মাপ কর। বলতে পারব না।

কি আশ্চর্য, অর্চনা সামন্তর চোখ দুটো যেন ধক্ করে জ্বলে।--আচ্ছা চলি।

চলে যায় অর্চনা সামন্ত।

কি যেন বোঝাতে চেয়েছিল অর্চনা সামন্ত। আর বোঝাতে না পেরে একটা দুরন্ত অভিমান হয়ে চলে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সুচরিত, ঝাউয়ের ছায়ার সারির ভিতর দিয়ে যেন তরতর করে ভেসে চলে যাচ্ছে একটা স্বপ্নাতুর আক্ষেপের ছবি।

সাত

আরও কতবার তো হেসেন সাহেবের বাড়িতে যাওয়া হলো ; আসবার সময় গোলাপের তোড়াও নিয়ে আসতে ভুল হলো না। কিন্তু সে গোলাপের তোড়া কারও হাতে তুলে দিতে পারা গেল না। যদিও সেই ঝাউয়ের ছায়া আছে, সেই নিরিবিলি রাস্তাটি আছে, একলা পাখির ডাক আছে ; কিন্তু সে-ই নেই। অর্চনা সামন্ত এ রাস্তার কোন ঝাউয়ের ছায়ার কাছে এসে আর দাঁড়িয়ে থাকেনি।

সুচরিতের বুকের ভিতরে যদিও একটা ব্যথিত বিস্ময়ের গুঞ্জরণ সব সময় গুন্‌গুন্ করে, তবু বুঝতে পারে সুচরিত, অর্চনা সামন্ত যেন বুকের ভিতরে একটা সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে। আর কত স্পষ্ট করে কি-ই বা বলতে পারে কোন মেয়ে? অর্চনা সামন্তর মত মেয়ে, যার মুখে শুধু অহংকারের কথাই ভাল সাজে, তার মুখেও ভালবাসার অভিমান বেজে উঠেছে। অর্চনা সামন্ত আরও একবার প্রমাণ করে দিয়ে চলে গেল, সে শুধু একটা বড়লোকের মেয়ে নয় ; একটা বড় প্রাণের মেয়ে। তা না হলে সুচরিতের মত মানুষকে ভালবাসতে পারবে কেন?

ভাবতেও যে একটা কল্পলোকের বিস্ময়ের মত মনে হয়। অর্চনা সামন্তর মত মেয়ে, যার জীবন পূর্ণিমা চাঁদের মত শুধু আকাশে থেকে হাসবে বলেই লোকের ধারণা হবে, সে মেয়ে একটা মাটির মানুষের হাত থেকে গোলাপের তোড়া নেবার জন্য ঝাউয়ের ছায়ার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু সমস্যাটাও যে বেশ ভয়াল বলে মনে হয়। অর্চনা সামন্ত যে-দিন আরও স্পষ্ট করে মুখ খুলবে, সেদিন কি জবাব দেবে সুচরিত? অর্চনা সামন্তর ভালবাসার দুঃসাহস যে আর বেশি দিন চুপ করে থাকবে, তাও যে মনে হয় না। কিন্তু সেদিন কি করবে সুচরিত, যেদিন অর্চনা স্পষ্ট করে বলে দেবে, আমাকে তোমার কাছে চিরকালের জন্য নিয়ে যাও সুচরিত, আমি তোমার ছোট ঘরেই শান্তিতে থাকতে পারব? সামন্ত সাহেবও কি তাঁর মেয়ের সেই দুঃসাহসের উৎসব সহ্য করতে পারবেন? টাউনের মানুষও যে সেই অবিশ্বাস্য উৎসবের কথা শুনতে পেয়ে আশ্চর্য হবে আর এখানে এসে ভিড় করবে। রূপকথার মত একটা গল্পও রটে যাবে, সামন্ত সাহেবের মেয়ে শেষে সুচরিতকেই বিয়ে করল।

একটা মাস ধরে বেণুকে দেখা যাচ্ছে, বেশ খুশি হয়ে পড়াশোনা নিয়ে মেতে আছে। আর, মাঝে মাঝে জানালার কাছে এসেও দাঁড়িয়ে থাকছে। বোধহয় বুঝতে চাইছে, ও-বাড়ির দোতলার জানালার কাছে অর্চনাদি দাঁড়িয়ে আছে কি না। এ-বাড়ির সন্ধ্যাটাও আর নিতান্ত নীরব হয়ে থাকে না। সুচরিতের বেহালা আবার শ্রীরাগ সেধে সন্ধ্যার বাতাস মিষ্টি করে তোলে।

কিন্তু অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন, সেদিনটা রবিবার ; সময়টা বিকেল ; ঘরের ভিতরে বসেই লিখছিল সুচরিত ; মার্টিন লুথারের একটা জীবনকে তিন ভাষায় অনুবাদ করতে হচ্ছে। হঠাৎ দরজার উপর একটা আপত্তির করাঘাতের শব্দ বেজে উঠল।—বাহার আও, জলদি বাহার আও। মনবাহাদুরের কর্কশ গলার স্বরের সঙ্গে কর্কশ একটা হুকুমের দাবির ভাষাও শুনতে পাওয়া যায়।

দরজা খোলে সুচরিত। আর, একটা নতুন বিস্ময়ও দেখতে পায়। একা মনবাহাদুর নয়, সামন্ত সাহেবও এসেছেন।

সামন্ত সাহেব বললেন—আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

সুচরিত—বলুন।

—আগে শুনতে চাই, তোমাদের এই বাড়িটার দাম কত?

—কেন বলুন তো?

—দরকার আছে।

—বাড়িটা তৈরি করতে খরচ পড়েছে আট হাজার টাকা।

—জমিটার দাম?

—দেড় হাজার টাকা।

—তাহলে মোট দাঁড়াল সাড়ে নয় হাজার টাকা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

--আমি তোমাকে পনর হাজার টাকা দিচ্ছি ; বাড়িটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও।

--এ-বাড়িটা কেনবার কি আপনার কোন দরকার হয়েছে?

--সে কথা থাক্ ; মোটকথা, তোমাদের তো টাকার দরকার আছে।

--আছে বইকি।

--সুতরাং, বিক্রি করে দাও। সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা লাভও হবে। তোমাদের পক্ষে এটা তো কম লাভের কথা নয়।

--বাড়ি বিক্রি করতে পারব না।

--তোমার এরকম একটা জেদের অর্থ কি?

--কোন অর্থ নেই।

--কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় যে, তোমরা এখানে থাক।

--কেন বলুন তো?

--আমার খুবই অস্বস্তি হয়, খুবই অসুবিধে হয়।

--কেন হয়?

--তর্ক করো না। তোমাদের কোন ক্ষতি তো আমি করছি না। বাড়িটা বিক্রি করে দিলে তোমাদের ভাল হবে, আর আমারও সুবিধে হবে ; তোমার রাজি না হবার তো কোন মানে হয় না।

সুচরিত বলে--আচ্ছা, ভেবে দেখি।

--সামন্ত সাহেব--ভেবে দেখবার তো কিছু নেই।

--আছে।

--তবে বেশ তাড়াতাড়ি ভেবে দেখ।

--আচ্ছা।

চলে যান সামন্ত সাহেব।

কে জানে কি শুনেছেন, কি দেখেছেন, আর কি ভেবেছেন সামন্ত সাহেব, যে-জন্যে আজ একেবারে সশরীরে এসে এ-বাড়ির ক্ষুদ্র বারান্দাটার ওপর চড়াও হয়ে অদ্ভুত একটা ইচ্ছার হুকুম শুনিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। সামন্ত সাহেবের অসুবিধে আর অস্বস্তিটা তো নতুন কিছু নয় ; এ-বাড়ির বেহালা থেকে শুরু করে ধোঁয়া পর্যন্ত সবই সামন্ত সাহেবের অসুবিধে আর অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে। এ-বাড়ির অস্বস্তিটাকেই একটা ব্যাঘাত বলে মনে করেন সামন্ত সাহেব। কিন্তু আজ যেন ধৈর্য হারিয়েছেন সামন্ত সাহেব। সব অসুবিধে আর অস্বস্তির শিকড়টাকেই উপড়ে সরিয়ে দিতে চান।

সামন্ত সাহেবের কথা শুনে সুচরিতের মন বিরক্ত হয়ে উঠলেও কেন যেন রুষ্ট হতে পারেনি। সামন্ত সাহেবের এই অদ্ভুত রূঢ়তার ভাষার সঙ্গে যেন একটা করুণ আবেদনও মুখ লুকিয়ে রয়েছে। দেখে মনে হয়, সামন্ত সাহেবের অহংকার যেন একটু উদ্বেগ হয়েছে। কিন্তু সেই উদ্বিগ্ন সুচরিতের কাছে এসে কথা বলে কেন? সেই উদ্বেগ সামন্ত সাহেবের মেয়ের কাছেই গিয়ে তো কথা বলতে পারে, বুঝিয়ে দিতে পারে, সুচরিতের মত ছেলেকে তোমার ঘেন্না করাই সাজে অর্চনা, ভালবাসা একটুও সাজে না।

মেয়ের কাছেই কি সত্যিই কোন উদ্বেগের আর আপত্তির কথা বলেছেন সামন্ত সাহেব? আর, অর্চনা সে আপত্তির কথায় কান দেয়নি? তাই কি হতাশ হয়ে সামন্ত সাহেবের উদ্বিগ্ন অহংকারের প্রাণটা সুচরিতের কাছে এসে সাহায্য চাইছে।

চমকে ওঠে সুচরিতের চোখ ; আর, মনের ভিতরে যত সাধের প্রশ্নের সব মুখরতা সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়।

দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, সামন্ত সাহেবের উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। তবে কেন

মাছমাছ সুচরিতের অস্তিত্বটাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবার একটা পরিকল্পনা নিয়ে এখানে এসে কত কথা বলে গেলেন সামন্ত সাহেব?

সামন্ত সাহেবের বাড়ির লনের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্চনা আর রজত রায়। কখন এল রজত রায়? বোধহয় এখনই এসেছে। কারণ, এই কিছুক্ষণ আগেও দেখা গিয়েছিল, ফটকের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অর্চনা। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে, রজতেরই শুভাগমন বরণ কববার জন্য সুন্দর হয়ে সেজে ফটকের কাছে একটা প্রতীক্ষার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঠিকই, রজত আর অর্চনা ; যদিও হাত ধরাধরি করে হাঁটছে না ; কিন্তু হাসছে আর গল্প করছে। দু'জনের মাঝখানের ব্যবধানটুকু সত্যিই যে অনেক হাসি আর গল্পের মায়া দিয়ে তৈরী একটা মুগ্ধতা ; দু'জনকে দুটো ভিন্ন সত্তা বলে মনে হয় না।

সুচরিতের চোখ দুটো যে অপমানে আহত দুটো জ্বালার চোখ : সেদিন ঝাউয়ের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলল যে মুখ, সে মুখ কি সত্যিই ঐ মুখ, যে-মুখ এখন হেসে হেসে রঙীন হয়ে রজত রায়ের সঙ্গে কথা বলছে?

ঘরের ভিতর ঢুকে চেঁচিয়ে ডাক দেয় সুচরিত--মা কি করছেন রে বেণু?

সুচরিতের মা উত্তর দেন--এই যে আমি এখানে। কেন?

সুচরিত এসে বলে--বাড়িটা বিক্রি করে দাও মা।

--কেন?

--এখানে থাকতে খুবই অস্বস্তি বোধ করছি।

--কেন রে?

--সামনের ঐ বড়-বাড়ির অভ্যেসটা দিন দিন একটু বেশি ভয়ানক হয়ে উঠছে।

--আবার কি করেছে?

--কিছু করেনি ; তবে মনে হচ্ছে, আমাদের ওপর উপদ্রব করা, যখন-তখন হুকুম ফলানো আর অপমান করা ওদের একটা আনন্দের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

--আমিও তো এতদিন ধরে তাই দেখছি। তুই কিছুই বলিস না বলে আমিও কিছু বলিনি।

--ঠিকই বলেছ ; ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতেও আমার ঘেন্না হয়। কাজেই...।

--কি?

--ঝগড়া-টগড়া যখন করতে পারব না, তখন মানে মানে চুপচাপ সরে যাওয়াই ভাল।

--ভাল।

বেণু এসে চেঁচিয়ে ওঠে--খুব ভাল। এখানে আমার আর একটি দিনও থাকতে ইচ্ছে হয় না।

সুচরিত--আমাদের বাড়িটাকে ওরাই কিনতে চায়।

বেণু--কিনে নিক তাহলে।

সুচরিতের মা বলেন--হ্যাঁ, আমার আপত্তি নেই।...কিন্তু কোথায় যাবি? একটা বাসা আগে ঠিক করে নিয়ে তারপর...।

সুচরিত--একটা বাসা আছে। এখান থেকে বেশ একটু দূরেই বাসাটা, অথচ আমার মিশন-অফিসের কাছে।

বেণু--কতদূর?

সুচরিত--মনোহরবাবু বলছিলেন, সীতাগড় রোডের একেবারে শেষে ওঁদের যে বাংলোটা আছে, সেটা প্রায় খালি পড়ে থাকে, ভাড়া হয় না। বাংলোটাকে পঁচিশ টাকায় ভাড়া দিতে রাজি আছেন মনোহরবাবু।

বেণু--নিয়ে ফেল দাদা। আমি বাংলোটা দেখেছি। বাংলোটার গা ঘেঁষে তিন-চারটে কমলালেবুর গাছ আছে ; তাই না?

সুচরিত—হ্যাঁ।...আর একটা কথা।

সুচরিতের মা—কি?

সুচরিত—আজই এই রাতের মধ্যেই উঠে যাওয়া কি সম্ভব নয়? তোমার কোন অসুবিধে হবে না?

সুচরিতের মা—আমার আবার কিসের অসুবিধা? সন্ধ্যের জপ সেরে ফেলতে পারলেই হলো। তারপর চল্ না, কোথায় যাবি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সামন্ত সাহেবের বাড়ি চিলে-কোঠার জানালার কাচের উপর পশ্চিম আকাশের লালচে আভা থমথম করছে।

সামনের বাড়ির ফটকের কাছ থেকে একটা মোটরগাড়ি ছুটে চলে গেল। চলে গেল রজত রায়।

ও-বাড়ির লনের উপর কোন হাসির মূর্তি এখন আর ঘুরে বেড়াচ্ছে না।

সামন্ত সাহেবের মেয়ে বোধহয় এখন কোন ঘরের নিভৃতে বসে স্বপ্ন দেখছেন আর হাসছেন।

বারান্দার উপর শুধু একা বসে আছেন সামন্ত সাহেব। হাতে চুরুট ; আর চোখে-মুখে একটা কঠোর সংকল্পের ছাপ শান্ত হয়ে ফুটে রয়েছে।

সামন্ত সাহেব বলেছেন, একটু তাড়াতাড়ি ভেবে দেখতে, কিন্তু ভাববার আর কিছুই নেই।

বড় বাড়ির ফটক পার হয়ে সামন্ত সাহেবের কাছে এসে দাঁড়ায় সুচরিত—বাড়িটা বিক্রি করতে চাই।

সামন্ত সাহেব—বিক্রি কর তাহলে।

সুচরিত—হ্যাঁ, এখনই বিক্রি করতে চাই। আপনি টাকা দিন ; যাঁর বাড়ি তিনি একটা রসিদও এখনই দিয়ে দেবেন। তারপর একদিন বিক্রির দলিল রেজিস্টারী করে নিলেই চলবে।

সুচরিত—হ্যাঁ, আজকেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাই।

সামন্ত সাহেব—খুব ভাল কথা। তোমাদের সুবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। সত্যিই একবার সন্দেহ হয়েছিল, বোধহয় গোঁয়ার্তুমি করে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার লাভ তুচ্ছ করে বসবে।

—কি বললেন?

—আমি তো তোমাদের বাড়িটার প্রকৃত দামের প্রায় দেড়গুণ দাম দিচ্ছি, কাজেই...।

আপনি প্রকৃত দামটাই দিন।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ, সাড়ে নয় হাজার হলেই হবে।

—কেন? আমি তো পনের হাজার দিতে চেয়েছি।

—দরকার নেই।

—দরকার নেই? এরকম মেজাজ করে কথা বলছ কেন?

—আজ্ঞে না, দরকার নেই। লাভ রাখবার জন্যে বাড়ি বিক্রি করছি না।

—তবে কিসের জন্য?

—চলে যাবার জন্য।

সামন্ত সাহেবের চোখ আর মুখের কঠোর দৃষ্টি হঠাৎ যেন একটু চমকে ওঠে। সুচরিতের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। এজলাসে বসে কঠিন আসামীর মুখের দিকে এর চেয়েও বেশিক্ষণ তাকিয়েছেন প্রাক্তন দায়রা জজ সামন্ত সাহেব। কিন্তু ঠিক এরকম একটা কঠিন আর দুর্বোধ্য মুখ কখনও দেখতে পাননি। তাই বোধহয় বুঝতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। তাই একটু অদ্ভুতভাবে তাকাতে হচ্ছে।

তারপরেই ব্যস্তভাবে চেক লেখেন সামন্ত সাহেব। এবং চেক লিখেই বলেন—রসিদটা? বাড়িটা তো তোমার মায়ের নামে আছে। তোমার মায়ের সই করা একটি রসিদ যে চাই।

পকেট থেকে রসিদ বার করে সুচরিত—রসিদ সঙ্গে নিয়েই এসেছি।

চেক হাতে নিয়ে আর রসিদ দিয়ে চলে যায় সুচরিত।

তারপর কয়েকটা ঘণ্টা পার হয়েছে। রাতের বাতাস নীরব হয়ে গিয়েছে। সামন্ত সাহেবের মেয়ের ঘরেও আলো নিবেছে। কিন্তু সামন্ত সাহেব রাত বারোটার সেই স্তব্ধতার সঙ্গে শরীরটাকে যেন মিশিয়ে দিয়ে আর বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে একটা বিচিত্র অন্তর্ধানের দৃশ্য দেখতে থাকেন।

একটা মোটর ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে। সুচরিতদের ক্ষুদ্র বাড়িটার ক্ষুদ্র সংসারের যত ক্ষুদ্র উপকরণ ট্রাকের উপর তোলা হচ্ছে। কোন শব্দ ধুপধাপ করে না। কোন আক্ষেপ আক্রোশ বা প্রতিবাদ ফিসফিস করে না। যেন-একটা ভয়াল বানের জলের শব্দ শুনতে পেয়ে কয়েকটা আতঙ্কিত মানুষ বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

মোটর ট্রাকের ইঞ্জিনটা শুধু একবার শব্দ করে উঠল ; তারপরেই চলে গেল।

সামন্ত সাহেব আস্তে আস্তে ডাকেন—মনবাহাদুর!

ঘুমন্ত মনবাহাদুর জেগে উঠেই চেঁচিয়ে ওঠে—হুজুর।

সামন্ত সাহেবে বলেন—সামনের ঐ বাড়িটার দরজায় তালা লাগিয়ে এস।

—বহুৎ আচ্ছা হুজুর। তালা আর চাবি হাতে নিয়ে ছুটে চলে যায় মনবাহাদুর।

আট

দোতলার জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অর্চনা। সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ। চা খাওয়া হয়েছে। সাজ বদলও হয়েছে। আর দু'চোখে দুটো উজ্জ্বল পিপাসার হাসি নিয়ে দূরের সীতাগড় পাহাড়ের মাথাটারও দিকে একবার তাকিয়েছে অর্চনা। তারপরেই চোখে পড়ে, সামনের ঐ বাড়িটার ঐ ঘরের জানালাতে কোন পর্দা নেই। ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু কিছুই যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরের ভিতরে নিরেট একটা শূন্যতা ছাড়া যে আর কিছুই নেই। দরজার কড়ায় একটা বন্ধ তালা ঝুলছে। কেষ্টকলির আশেপাশে যত কাগজের কুচি আর টুকরো ছড়িয়ে পড়ে আছে। বাড়িটাকে দেখলে যে ভয়ংকর একটা কবর বলে মনে হয়।

কি হলো? সুচরিত কি পাগল হয়ে গেল? সেই সঙ্গে সুচরিতের মা আর বোনটাও পাগল হয়ে কোথাও চলে গিয়েছে!

মনবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে অর্চনা। মনবাহাদুর বলে—হাম রাতমে উস দরজামে তালা লাগায়া।

—কে বলেছিল তালা লাগাতে?

—সাহেব বোলা।

মনবাহাদরের প্রভু সামন্ত সাহেবও কি পাগল হয়ে গিয়েছেন? তা না হলে এরকম একটা কাণ্ড করলেন কেমন করে? অর্চনার চোখের হাসি যেন হঠাৎ আগুনের আঁচ লেগে ঝলসে গিয়েছে। দপ্‌দপ্ করে চোখের তারা দুটোর দুঃসহ জ্বালা। মনে হয়, হঠাৎ কোথা থেকে নিষ্ঠুর একটা চক্রান্ত এসে ও-বাড়িটার মানুষগুলোকে যেন খুন করেছে আর লাস সরিয়ে দিয়েছে।

কতক্ষণ জানালার কাছে এভাবে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অর্চনা তাও বুঝতে বোঝহয় ভুলেই গিয়েছে। বুঝতে পারে তখন, যখন দেখতে পায়, সামন্ত সাহেব টাউন থেকে

ফিরলেন। এক হাতে চুরুট, এক হাতে খবরের কাগজ, সামন্ত সাহেব মালীর সঙ্গে কথা বলছেন আর বাগানের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

অর্চনার চোখ দুটোও একটু শান্ত হয়ে এতক্ষণ পরে কি-যেন বুঝতে চেষ্টা করছে। বোধহয়, বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছে অর্চনা। শান্ত স্বভাবের মেয়ে বলে যার এত সুনাম আছে, সে-মেয়ের মনের ভিতরে এমন রাগের আগুন কেমন করে এতদিন লুকিয়েছিল? অর্চনার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে একটা জ্বালা যেন রুষ্ট সাপের মত ফণা তুলেছে। অর্চনার চোখের কাছ থেকে সুচরিতকে সরিয়ে দিল কে? অর্চনার নিঃশ্বাসের তৃষ্ণা যাকে খুঁজছে, কল্পনাতে যার মাথাটাকে বুকের উপর পড়ে থাকতে দেখতে পায় অর্চনা, তার মূর্তিটাকে আড়ালে টেনে নিয়ে গেল কোন্ অভিশাপ?

অর্চনার আক্রোশের আত্মাটা যেন আস্তে আস্তে ক্লান্ত হয়ে আসতে থাকে। কল্পনাতে যেন একটা সন্দেহের ছায়াকে দেখতে পেয়েছে অর্চনা। হতে পারে, সুচরিত নিজেই চলে গিয়েছে। নিজেরই সুখের একটা সুবিধার জন্য। একটা চক্ষুলজ্জার গ্লানি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। সুচরিতের প্রাণের কাছে আপন হয়ে হেসে কথা বলবার মত একটি মানুষ এসে গিয়েছে। বোধহয় আগে থেকেই ছিল। সেই ভালবাসার হাত ধরবার জন্য একটি নিরাপদ জগৎ খুঁজে নিয়েছে সুচরিত ; আর সেখানেই চলে গিয়েছে।

তার মুখটা একবার দেখতে ইচ্ছে করে। সামন্ত সাহেবের মেয়ের চেয়ে সে কত বেশি সুন্দর, তাও একবার জানতে ইচ্ছে করে কিন্তু...।

অর্চনার বুকটা যেন ভয় পেয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। সে মেয়ে যদি সত্যিই অর্চনাকে পাল্টা জিজ্ঞেসা করে বসে, আপনি তো সুচরিতের চেয়েও অনেক চালাক ভালবাসার খেলায়। আপনি আরও সাংঘাতিক একটা অহংকারের ফ্যাশন। সুচরিত তবু তো একটা চক্ষুলজ্জার আবরণ রেখে আর লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে ডেকেছে। কিন্তু আপনি কি করলেন? সুচরিতের চোখ দুটোকে যে একেবারে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন, রজত রায় আপনার কত প্রিয়। লজ্জা করেনি আপনার, যার হাত থেকে গোলাপের তোড়া নিলেন, তারই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রজত রায়ের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করলেন?

অর্চনার প্রাণটা এবার যেন বোবা হয়ে গিয়েছে। অভিযোগটার উত্তর দেবার মত ভাষা নেই, কিছুই বলবার সাহসও নেই। রজত রায়ের সঙ্গে বিয়ে হবে যার, বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে যার জীবন, সে কেন সুচরিতের ভালবাসা আশা করে? কোন্ সাহসে আর কোন্ লজ্জায়?

ছিঃ, সামন্ত সাহেবের মেয়ের প্রাণে এত বড় আবদার কেমন করে দেখা দিল? রজত রায়ের সঙ্গে বিয়ে হোক ; কিন্তু সুচরিতের প্রাণটা যেন পৃথিবীর মধ্যে একেবারে একলা হয়ে, কারও ভালবাসার ছায়ার কাছেও না গিয়ে শুধু অর্চনাকেই ভালবেসে জীবন কাটিয়ে দেবে ; অদৃষ্টের কাছে যেন এই রকমের একটা প্রতিশ্রুতি আশা করে বসে আছে অর্চনা।

দোতলা থেকে নীচে নেমে আসে অর্চনা। কোনদিন যে-কথা বলবার দরকার হয়নি, আজ যেন সে-কথা না বলতে পারলে শান্ত হতে পারবে না অর্চনা সামন্তর মনের এই এলোমেলো যত জঞ্জালের ঝড়। শুধু জানতে হবে, সুচরিত নিজেই ইচ্ছে করে চলে গিয়েছে। বাস্, তারপর অর্চনা সামন্তর জীবনে আর কোন জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্ব থাকবে না। বুঝতে পারা যাবে, সুচরিত একটা চমৎকার প্রতিশোধ মাত্র। অর্চনা সামন্তকে শুধু বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে তুমি যা করছ অর্চনা, সেটা আমি করলে তোমার প্রাণে কি-ভয়ানক অপমানের জ্বালা লাগে, সেটা একটু বুঝে দেখ।

—বাবা!

—কি?

--ও-বাড়ির লোকগুলো কোথাও চলে গেল নাকি?

--হ্যাঁ।

--কোথায়?

--তা জানি না। ও-বাড়িটা আমি কিনে নিয়েছি।

--ওরা বিক্রি করে দিল?

--হ্যাঁ।

--ইচ্ছে করে?

--না, ঠিক তা নয়। আমিই কিনতে চেয়েছিলাম।

চমকে ওঠে অর্চনার ক্লান্ত চোখের দৃষ্টিটা।--তুমি চেয়েছিলে বলেই ওরা রাজি হয়ে গেল?

--হ্যাঁ।

--ভাল দাম দিয়েছ বোধহয়?

--না। বাড়ি তৈরী করতে যত টাকা লেগেছে, ঠিক তত টাকাই দিয়েছি।

--ওরা কিছু বেশি চেয়েছিল নিশ্চয়?

--না। আমি অবশ্য কিছু বেশি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নিতে রাজি হলো না।

--রাজি হলো না? কম টাকাতেই বিক্রি করল?

সামন্ত সাহেব চুরুটটাকে শক্ত করে কামড়ে ধরে হাসতে চেষ্টা করেন--হ্যাঁ।

নয়

--ম্যায় হুঁ মুশতাকে জফা, মুঝ পে জফা অওর সহি ; তুম হো বেদাদ সে খুশ, ইস্‌সে সিওয়া অওর সহি। গয়ের কে...।

সুচরিতের মুখে গালিবী কবিতার আবৃত্তি শুনে চমকে ওঠেন হোসেন সাহেব। সুচরিতের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। মুশতাকে-জফা! আঘাতের অত্যাচার বরণ করে নেবার জন্য উৎসুক হয়েছে একটা প্রাণ। কার প্রাণ? সন্দেহ হয় ; কবিতার আড়ালে থেকে সুচরিতেরই প্রাণের কোন আক্ষেপ কথা বলতে চাইছে। এভাবে, এমন অদ্ভুতস্বরে আর এত গম্ভীর হয়ে তো কবিতা আবৃত্তি করে না সুচরিত।

হোসেন সাহেব বলেন--ক'দিন আগে সামন্ত সাহেব এসেছিলেন। তাঁর কাছে একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। কথাটা কি সত্যি?

--কি কথা?

--তুমি সামন্ত সাহেবের কাছে বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছ।

--হ্যাঁ।

--সামন্ত সাহেব কিছু বেশি দাম দিতে চেয়েছিলেন, তুমি তা নাওনি?

--জী হাঁ।

--সামন্ত সাহেব বোধহয় একটু আশ্চর্য হয়েছেন।

--তা জানি না ; তবে বেশ খুশি হয়েছেন।

--খুশি কেন হবেন?

--তিনি চেয়েছিলেন, আমরা যেন ওখানে না থাকি।

চোখ বড় করে তাকান হোসেন সাহেব ; আর সেই বড় করে তাকানো চোখ দিয়ে যেন একটা রহস্যকে দেখতে চেষ্টা করেন। গলার স্বরে একটা বিস্ময়ের শব্দও বেজে ওঠে।--ইয়ে বাত?

হোসেন সাহেবের গোলাপ বাগিচার উপর রঙীন ফড়িং উড়ে বেড়ায়। ঘাসের উপর ঝরে

পড়া পাপড়িগুলি দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। সুচরিতের গলার স্বরও যেন হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে ওঠে।--কোই উম্‌মিদ বর নহিঁ আতি, কোই সূরত নজর নহিঁ আতি ; মওত কা এক দিন মুআয়য়ন হ্যায় ; নিঁদ কেওঁ রাত নহিঁ আতি। আগে...।

হোসেন সাহেব আবার চমকে ওঠেন।--কি ব্যাপার সুচরিত? তোমাকে যেন একটু বেচয়েন মনে হচ্ছে।

সুচরিত হাসে--জী নেহি ; ভাল করে বলতে গিয়ে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

হোসেন সাহেব হাসেন--লেকিন কেওঁ? কেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সুচরিত?

সুচরিত হাসে--দিল কে খুশ রখনে কো গালিব, ই'য়ে খেয়াল আচ্ছা হ্যায়। যাই হোক, অনেক দিন হলো গালিব ছেড়ে দিয়েছি ; পড়বার সুযোগই হয়নি। চর্চা না থাকলে যা হয়।

হোসেন সাহেব--সেটা একটা কথা বটে।...হ্যাঁ একটা কথা, সামন্ত সাহেবের মেয়ের বিয়ে কবে?

--তা জানি না।

--যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তাকে নিশ্চয় দেখেছ?

--হ্যাঁ।

--কেমন ছেলে?

--আমি তো জানি, বেশ ভাল ছেলে।

--খুব দৌলতমন্ত ছেলে?

--দৌলত আছে বলে শুনেছি।

--ইয়েভি এক বাত হ্যায়।

--কি বললেন?

--কুছ নেহি। একটা কথার কথা। যাই হোক, তুমি তো যথেষ্ট আকিলমন্ত ছেলে। কাজেই আপসোস করবার কিছু নেই।

হোসেন সাহেবের ভাষাও যেন একটা কবিতার হেঁয়ালি। কি যেন বলতে চাইছেন, কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে চাইছেন না।

কিন্তু সুচরিতের মনের ভিতরে যেন একটা অনুমানের চেষ্টা ছটফট করে, সত্যই কি স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইছেন হোসেন সাহেব? ঐ গোলাপবাগের দিকে তাকিয়ে সর্বক্ষণ এখানেই বসে আছেন, আলখাল্লার উপর শাল জড়িয়ে, চুপ করে আর চোখ বন্ধ করে বসে আছেন যে বুড়ো মানুষটা, ফুল আর কবিতা ছড়ানো একটা স্বপ্নের জগতের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছেন যিনি, তিনি কেমন করে ভয়ানক বাস্তব একটা জগতের এমন একটা বঞ্চনার ঘটনাকে কেমন করে দেখতে পাবেন? সামন্ত সাহেবের মেয়ে যে সুচরিতের জীবনটাকে একটা পলাতক পরিহাস করে ছেড়ে দিয়েছে, সে-খবর হোসেন সাহেবের জানবার কথা নয়।

হোসেন সাহেব বলেন--তোমার চেহারা বেশ খারাপ হয়েছে সুচরিত। একদিনেই চেহারাটা যেন এক বছরের রোগে ভুগেছে বলে মনে হচ্ছে।

উত্তর দেয় না সুচরিত। বোধহয় হোসেন সাহেবের কোন ধারণার কথাকে এর চেয়ে আর বেশী স্পষ্ট করে শুনতে চায় না। বোধহয় আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সরে পড়তে চাইছে সুচরিত।

হোসেন সাহেব বলেন--কি বলব বুঝতে পারছি না। এরকম হয়েই থাকে। রুমি বলছেন, হাফিজও বলেছেন...আর আমীর খুশরুও বলেছেন...

উঠে দাঁড়ায় সুচিরত। হোসেন সাহেব একটু বিষণ্ণ স্বরে বলেন--এখনই যাবে?

--জী হাঁ।

--একটু শরবত খাবে না?

--না।

--আচ্ছা, এস তবে,...হ্যাঁ, কথাটা মনে পড়েছে।

--কি?

--জুদাই কা, এক রোজ কেয়া, এক বরষ কেয়া!

ব্যস্তভাবে চলে যায় সুচরিত। কিছুই না জেনে শুনেও কি ভয়ানক একটা সত্য বলে ফেলেছেন হোসেন সাহেব। বিচ্ছেদের একদিনের বেদনা যা, এক বছরের বেদনাও তাই, সমান দুঃসহ। কিন্তু কথাটা কি ভয়ানক একটা ঠাট্টার কথা! ভালবাসা থাকলে তবে তো বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু সামন্ত সাহেবের মেয়ে যে একটা নিদারুণ বিদ্রূপ ; সুচরিতের অদৃষ্টটা সেই বিদ্রূপের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। এই বিচ্ছেদ যে একটা মুক্তি। সে জন্য সুচরিতের চেহারা শুকিয়ে যাবে কেন?

সে জন্য নয় ; রাতজাগা খাটুনি পড়েছে। অনেক লিখতে হচ্ছে। সে খবর জানেন না হোসেন সাহেব। তাই ভাবতেও হাসি পায়, হোসেন সাহেব সুচরিতের দিকে তাকিয়ে মনে করেছেন, একটা মজনুর চেহারা বুঝি লায়লীর কথা ভেবে শুকিয়ে গিয়েছে।

দশ

কিন্তু, এ কোন্ আবির্ভাব? জানালাটার পাশের কমলালেবুর গাছের ফুল তোলবার জন্য বেণুর কাঁধে এক হাতে ভর দিয়ে, আর একটা হাত একেবারে টান করে উঠিয়ে দিয়ে গাছের মাথা হাতড়াচ্ছে কে?

চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অগত্যা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এসেছে সামন্ত সাহেবের মেয়ে। সীতাগড় রোডের ঐ প্রান্তে যার বাড়ি, সে-মেয়ে এই দেড় মাইল দূরের এ-প্রান্তে আসতে পারল কেমন করে? আর পঁচিশ টাকা ভাড়ার একটা বাংলো বাড়ির কমলালেবুর গাছের কাছে এসে দাঁড়াতে পারলই বা কেমন করে?

সুচরিতকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে অর্চনা--অনেকক্ষণ এসেছি। বেণুর সঙ্গে অনেক গল্প করেছি। চা-ও খেয়েছি। তবু চলে যাইনি।

বেণু বলে--আমি যেতে দিইনি।

অর্চনা--একই কথা হলো। যাই হোক ; আপনি এবার আপনার কর্তব্য করুন।

সুচরিত--তার মানে?

অর্চনা--সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আমি এতটা পথ একা ফিরে যেতে পারব না।

সুচরিত--সঙ্গে যেতে হবে?

অর্চনা--ভেবে দেখুন।

বেণু বলে--ভেবে দেখবার কি আছে? অর্চনাদিকে পৌঁছে দিতেই হবে।

সুচরিত বলে--বেশ।

বেণুর দিকে তাকিয়ে অর্চনা বলে--আজ তবে চলি বেণু, কেমন?

বেণু--আবার কবে আসবেন?

অর্চনা হাসে--সেটা বলা কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। কিছু মনে করো না।

আর বেশি দেরি নেই ; সন্ধ্যাটা আর একটু পরেই একটা আবছায়ার কুহকের মত সীতাগড় পাহাড়ের মাথাটাকে ঢেকে ফেলবে। আর, রোডের প্রথম কালভার্টের কাছে পৌঁছবার আগেই পথের কোন মানুষ পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও ঠিক চিনতে পারবে না, এরা কারা দু'জন এভাবে চুপ করে, নিরালা জগতের দুটি সাথী বন্ধুর মত একসঙ্গে হেঁটে চলে যাচ্ছে। কারণ সন্ধ্যাটা তখন আরও ঘনিয়ে একেবারে কালো হয়ে যাবে।

ঠিকই, অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি অর্চনা। কালভার্টের কাছে পৌঁছবার পর, প্রথম

ল্যাম্পপোস্টের আলোর কাছে এসে যেন পরিশ্রান্তের মত একটা হাঁপ ছাড়ে অর্চনা। আর সুচরিত দেখে আশ্চর্য হয়, সামন্ত সাহেবের মেয়ের চোখেও যেন দুঃসহ একটা শ্রান্তির ব্যথা গলে গিয়ে ছলছল করছে।

অর্চনা হাসতে চেষ্টা করে--কিছুই বলবার ছিল না, তবু কেন যে এত ব্যস্ত হয়ে চলে এলাম, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

সুচরিত--আমিও তো এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম।

--কি?

--আমার কাছে তোমার আর কি-ই বা বলবার মত কথা থাকতে পারে?

--একটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল।

--বল।

--তুমি বাড়িটা বিক্রি করে দিলে কেন?

--তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো।

--জিজ্ঞাসা করেছি।

--তবে আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন?

--বাবার কথা থেকে তো সব কথা জানতে পারা গেল না।

--আমার কথা থেকেও নতুন কিছু জানতে পারবে না।

--তুমি বললেই জানতে পারব।

--আমি বলব কেন?

--বল সুচরিত। তোমার মুখ থেকে শুনতে না পেলে যে আমি কিছুই বুঝতে পারব না।

--তোমার আর আমার সঙ্গে দেখা করা উচিত হয়নি অর্চনা।

--কেন?

--কেন আবার কি? রজতের সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হবে না?

--হবে।

--তবে?

--তবে তোমার সঙ্গে সামান্য একটু দেখা করলেও কি...?

--হ্যাঁ, তাতে খুব অন্যায় করা হয়। তাতে রজতকে অপমান করা হয় ; তোমার নিজেকেও অপমান করা হয়। আর আমাকেও অপমান করা হয়।

সুচরিতের মুখের দিকে তাকিয়ে অর্চনার চোখ দুটো যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে। যেন একটা অর্থহীন বিস্ময়ের ভাষা শুনছে অর্চনা। কিসের অন্যায়? কি অন্যায়।

সুচরিতের চোখের বিস্ময়েও যেন একটা সমবেদনার ছায়া ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অর্চনা সামন্ত, এই মেয়ে যেন জগৎ ছাড়া একটা স্বপ্নের দোতলার ঘরে বাস করে পৃথিবীর রীতি-নীতির কোন অর্থ বুঝতে পারে না। যেন জীবনটাকে দুটো অদৃষ্ট দিয়ে ইচ্ছেমত দু'ভাগে ভাগ করে নিতে চাইছে অর্চনা সামন্ত। একটা অদৃষ্টের নাম বিয়ে, আর একটা অদৃষ্টের নাম ভালবাসা। একটা অদৃষ্ট অর্চনা সামন্তকে হাসিয়ে হাসিয়ে বিকেলের আলোতে লনের উপর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে আর রজতের সঙ্গে কথা বলাবে ; আর একটা অদৃষ্ট সীতাগড় রোডের কালভার্টের কাছে এক নিরালায় দাঁড় করিয়ে রেখে সুচরিতের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলাবে। ত্রিশ বছর বয়সের একটা লেখাপড়া জানা মেয়ের প্রাণে এমন ভুলও থাকে।

অর্চনা বলে--তোমাকে অপমান করছি, এটা কি রকমের কথা হলো?

চমকে ওঠে সুচরিত। অবাস্তব কল্পলোকের মেয়ের মুখে ভয়ানক কঠিন একটা প্রশ্ন চমকে উঠেছে। আজ মনে মনে নিজেরই বুক ছুঁয়ে এমন একটা মিথ্যা কি বলতে পারবে সুচরিত, অর্চনা সামন্তর এই মুখটাকে এত কাছে দেখতে পেয়ে সুচরিতের প্রাণটা অপমান বোধ

করছে? এখনও রজতের সঙ্গে অর্চনার বিয়ে হয়ে যায়নি ; কিন্তু যেদিন বিয়ে হয়ে যাবে, তার পরেও কোনদিন অর্চনা যদি ঠিক এমনই একটি সন্ধ্যায় এখানে এভাবে সুচরিতের চোখের কাছে এসে দেখা দিয়ে কথা বলে, তবেও কি অপমান বোধ করবে সুচরিতের প্রাণটা? কখ্খনো না। জোর গলায় একটা মিথ্যে অহংকারের চিৎকার দিয়ে সামন্ত সাহেবের মেয়ের ভাবনার যে-ভুল ধরিয়ে দিতে চেয়েছে সুচরিত, সে-ভুল যে সুচরিতের বুকের ভিতরেও মুখ লুকিয়ে বসে আছে।

সুচরিত বলে--না, তাতে আমার কোন অপমান হবে না ঠিকই ; কিন্তু তোমার ক্ষতি হবে।

অর্চনা হাসে--ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে ; আর মিছে ভয় দেখিও না।

--কিন্তু আমি তোমার কোন ক্ষতি করিনি।

--যে-ই করুক, ক্ষতি হয়েছে। তা না হলে রজত রায়কে বিয়ে করবে যে-মেয়ে, সে আজ তোমার কাছে এসে মনের জ্বালা মেটাতে চাইবে কেন?

সুচরিত বলে--আমার আর কিছু বলবার নেই অর্চনা।

অর্চনা--বেশ। তবে তুমি শুধু একটি কথা দাও।

সুচরিত--কি?

অর্চনা--আমাকে ভালবাসবে।

সুচরিত--কথা দিলে তোমার তাতে কি লাভ হবে?

অর্চনা--আমি তোমার সঙ্গে তাহলে চিরকাল দেখা করতে পারব।

সুচরিত--তাতেই বা তোমার লাভ কি?

অর্চনার চোখ দপ্ করে জ্বলে ওঠে।--আমার লাভ আছে।

সুচরিত--কিসের লাভ?

অর্চনা--বুঝে দেখ।

সুচরিত--বুঝতে পারছি না।

অর্চনা--আমার সব ইচ্ছা তোমার কাছে ছেড়ে দেব।

চমকে ওঠে সুচরিত--কি বললে অর্চনা?

--মিথ্যে কথা বলতে চাই না, পারিও না ; তাই ওকথা বলে দিলাম।

--কোন্ সাহসে এমন কথা বলছ?

--তোমাকে ভালবাসি, এই সাহসে।

--রজত রায়কে...

--না।

--কি বললে?

--আগে মনে হতো, রজত রায়কে ভালবাসি নিশ্চয়। কিন্তু এখন বুঝেছি, সেটা ভুল।

--কিন্তু রজতকেই তো বিয়ে করবে?

--হ্যাঁ, কিন্তু তার হাত ধরতে পারব না বোধহয়।

--কিন্তু রজত কি তোমার হাত ধরবে না?

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে অর্চনা--এই ভয়ই যে আমার মনের সব শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে সুচরিত। রজত যে আমাকে সত্যিই ভালবাসে।

সুচরিতের হৃৎপিণ্ডটাই যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে, তারপরেই একটা অবসাদের ভারে যেন অলস হয়ে যায়। সামন্ত সাহেবের মেয়ের অদৃষ্টের এই অভিশাপের গ্রন্থি মোচন করবার কি উপায় হতে পারে, সুচরিতের জানা নেই। পৃথিবীতে কারও জানা আছে কি না সন্দেহ।

সামন্ত সাহেবের মেয়ের মুখের দিকে এত শ্রদ্ধা নিয়ে সুচরিত কোনদিন তাকাতে পেরেছে

কিনা সন্দেহ। সামন্ত সাহেবের মেয়ে তার ঐশ্বর্যের ঠাঁই থেকে নেমে আসবে আর সুচরিত নামে একটা নিতান্ত সাধারণ মনুষ্যত্বের ঘরণী হবে, এমন কল্পনাকে কোনদিন মনে ঠাঁই দেয়নি সুচরিত। সুচরিতের মনে কোন অভিযোগও নেই যে, কেন এমন অসম্ভব সম্ভব হবে না। সে-জন্য সামন্ত সাহেবের মেয়েকে একটা ছোট প্রাণ বলে অশ্রদ্ধাও করেনি সুচরিত। রজত রায়ের মত মানুষের সঙ্গে অর্চনা সামন্তর বিয়ে হওয়াই যে একটা বাস্তবিক জাগতিক রীতি। কোন স্বপ্নের কান্নাও এই রীতিতে ভাঙতে পারে না। ভাঙলেও সেটা দুদিনের খামখেয়ালের একটা নাটক হবে মাত্র। জীবনের সত্য হয়ে উঠবে না। সামন্ত সাহেবের মেয়ের ভালবাসা আবার ভয় পেয়ে আর ঘেন্না করে কোন ঐশ্বর্যের দোতলার ঘরে গিয়ে শান্তি পেতে চাইবে!

কিন্তু অর্চনা সামন্তর অদৃষ্টের সমস্যা যে আরও কঠিন। রজত রায় অর্চনাকে ভালবাসে। একটা নিরীহ নির্দোষ আর প্রসন্ন ভালবাসাকে বঞ্চিত করতে পারছে না অর্চনা। বঞ্চিত করা যে উচিতও নয়। কিন্তু রজতকে স্বীকার করতেও আনন্দ নেই। অর্চনা সামন্তর অদৃষ্টের এই আনন্দকে মিথ্যা করে দিয়েছে সুচরিত নামে একটা অভিশাপ।

সুচরিত বলে--তোমাকে আমি শুধু একটি কথা বলতে পারি ; একটা অনুরোধের কথা।

--বল।

--আগে বল, আমার অনুরোধ তুচ্ছ করবে না।

--তুচ্ছ করব না।

--তুমি আর আমার সঙ্গে দেখা করো না অর্চনা। জীবনে কোনদিনও দেখা করো না।

--কেন?

--দেখা করা উচিত নয়। একটুও উচিত নয়।

--আমি দেখা করলে তুমি ছোট হয়ে যাবে?

--তুমি ছোট হয়ে যাবে।

--ঘেন্না করবে?

--বোধহয়।

--কি বললে?

--হ্যাঁ সেই ভয়েই বলছি অর্চনা ; তুমি আর এসো না।

অর্চনা সামন্তর চোখের তারা দুটো একবার শুধু কেঁপে ওঠে।--আচ্ছা চলে যায় অর্চনা।

এগার

সামন্ত সাহেব বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে এই গম্ভীরতার ভার সহ্য করতে বোধহয় একটু অস্বস্তিও বোধ করেন। তাই এক-একদিন আনমনার মত বেড়াতে বেড়াতে বুড়ো হোসেন সাহেবের বাড়িতে আসেন। হোসেন সাহেবের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে যান।

হতে পারে, রিটায়ার্ড সেসন জজের মনে একটা নতুন সন্দেহের অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। আগে এ সন্দেহ ছিল না। আগে শুধু সামনের ঐ বাড়িটাকে সন্দেহ করতে হতো। যেন একটা কাঙাল লোভের বাড়ি, সামন্ত সাহেবের বারান্দার কাচের টবের অর্কিডের দিকে লুব্ধ হয়ে তাকাবার এক চেষ্টা যেন ও-বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে। সামন্ত সাহেবের মেয়ের মনের কাছে যেন আবেদন করে সাংঘাতিক একটা ইচ্ছার কথা বলতে চাইছে একটা বেহালার গৎ। তাই দুঃসহ মনে হতো ; সুচরিত নামে ঐ ছেলেটাকে একটা চতুর আশার ওস্তাদ বলে সন্দেহ হতো। মনে মনে তাই ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেননি সামন্ত সাহেব, এ-বাড়ির প্রেস্টিজ আর এ-বাড়ির মেয়ের জীবনের প্রেস্টিজ নিরাপদ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়েছে, সাবধান হতে হয়েছে। আর ও-বাড়ির প্রাণটাকে যথেষ্ট ধমক দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়াও হয়েছে যে, সামন্ত

সাহেবের মেয়ের জীবনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করবার সাহস যেন ওরা না করে।

কিন্তু এখন যেন নিজেরই চোখ দুটোকে আর বুদ্ধিটাকে বেশ বোকা বলে মনে করতে হচ্ছে। যেন বিচার না করেই রায় দিয়ে ফেলেছে একটা রাগী জজিয়তী অহংকার।

মনবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে যেটুকু জানতে পারা গেছে, তাতে আর বুঝতেই বা কি অসুবিধা আছে যে, না, এখন অর্চনার জীবনের সমস্যা হলো অর্চনা নিজেই। মেয়ে যে এরই মধ্যে ভুল করে বসে আছে। এ ভুল বোধহয় দিন দিন আরও ভয়ানক হয়ে উঠতেই থাকবে।

কারণ নেই, তবু আড়ালে আড়ালে কেমন চমৎকার জটিল একটা ঘটনা গড়ে উঠছে। মনবাহাদুরকে সোজা হাসপাতালে পাঠিয়ে খবর নিয়েছে অর্চনা, কেমন আছে সুচরিত। দার্জিলিং-এ গিয়ে মাত্র সাতটা দিন ছিলেন সামন্ত সাহেব, কিন্তু এদিকে এই সাতটা দিনেরই মধ্যে একটি দিনকে একেবারে খোলামেলা একটা উৎসবের দিনের মত কাজে লাগিয়ে নিয়েছে অর্চনার ভুলের মন। যেটা একেবারেই অসম্ভব ছিল, সেটা যেন এক নিমেষের সুযোগ পেয়ে সম্ভব হয়ে গেল। মনবাহাদুর বলেছে, সেই বাবুর সঙ্গে দিদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করেছে। সুচরিতের হাত থেকে গোলাপের তোড়া হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে সামন্ত সাহেবের মেয়ে। সত্যিই যে, পর্বতটাই মহম্মদের কাছে ছুটে চলে গেল।

রজতের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করেছে অর্চনা ; দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন সামন্ত সাহেব। বুঝেছিলেন, যাক, খুব বেশি দুশ্চিন্তা করবার কোন মানে হয় না। অর্চনার মন রজতকে অস্বীকার করতে চায় না, করতে পারে না, পারবেও না। সুচরিতের হাত থেকে গোলাপের তোড়া নেওয়া একটা খেয়ালী ভুলের খেলা ; হয়তো বয়সের একটা দুরন্ততার সামান্য খুশির একটা খেলা। অর্চনার জীবনের আসল ইচ্ছাটা নিশ্চয় সুচরিতের হাত থেকে গোলাপের তোড়া তুলে নেয়নি। তবু, এটুকুও না হলেই ভাল হতো। অর্চনার মনের সতর্কতা এলোমেলো হয়ে যায়নি বলেই মনে হয় ; কিন্তু এমন হতে পারে, অর্চনার খেয়ালের সাহসটাকে ভুল বুঝেছে সুচরিত। একশো টাকা মাইনের একটা চাকরি করে, বেচারা হয়তো মনে করে ফেলতে পারে যে, সামন্ত সাহেবের মেয়ে নিজেই এসে একটা প্রতিশ্রুতির আভাস জানিয়ে দিয়ে চলে গেল। মনে করলে ভুল হবে কেন সুচরিতের? এরকম কাণ্ড দেখলে কোন্ ছেলেরই বা মনে এমন ধারণা না হয়ে থাকতে পারে?

তবে এটাও অবশ্য বুঝতে পারা গিয়েছে, একশো টাকা মাইনের একটা মানুষ হয়েও সুচরিতের গর্বটা বেশ একটা কঠিন গর্ব। সে গর্ব কোন উৎকোচে নরম হতে চায় না। সে গর্ব নিজেও যে বেশ সাবধান। তা না হলে ওভাবে এক-কথায় বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে আর কোন লাভ-টাভের পরোয়া না করে অত দূরের একটা নিরালায় গিয়ে ঠাঁই নেবে কেন সুচরিত? সুচরিত যে চমৎকার একটি তুচ্ছতা দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে, সামন্ত সাহেবের এত বড় বাড়িটার দিকে তাকাবার জন্য ছিটেফোঁটা লোভও নেই সুচরিতের মনে। সুচরিতের একরোখা জেদের কাণ্ড দেখে বরং এই কথাই মনে হয়েছে, সামন্ত সাহেবের বাড়িটাকেই সে তার জীবনের একটা সাংঘাতিক ব্যাঘাত বলে মনে করেছে।

ভালই করেছে সুচরিত। কিন্তু একটুও ভাল করল না, করতে পারছেও না যে, সে হলো তাঁরই মেয়ে অর্চনা। আজ আবার এ কি করল অর্চনা? অর্চনা যে চক্ষুলজ্জাও ছেড়ে দিয়েছে ; সামন্ত সাহেব যে বাড়িতে আছেন, এই বাস্তব সত্যটাকেও যে ভয় করতে ভুলে গিয়েছে সামন্ত সাহেবের মেয়ে। এই তো কিছুক্ষণ আগে মনবাহাদুর এসে বলে গেল, দিদি আজ বেড়াতে বেড়াতে পাহাড়তলীর কাছে সেই বাবুর বাড়িতে গিয়েছে।—ও বাড়িকা ছোটা দিদিকা সাথ বহুৎ হাসি কিয়া দিদি।

—সেই বাবুর সঙ্গে দিদির মোলাকাত হয়েছে?

—জী হাঁ হুজুর। বহুৎ মোলাকাত হুয়া।

--কোথায়?

--ও বাড়িমে, রাস্তানে, নদীকা পুলকা পাস।

—তুম দেখা?

--হাম আবি দেখ কর আতা।

শুনে সামন্ত সাহেবের হৃৎপিণ্ডটাই গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। আর, সমস্যাটাকে বুঝতে গিয়ে ভাবনাটাও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। কিছুই ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। এখন শুধু যদি একটা পরম দৈব এসে সমস্যাটার সমাধান করে দেয়, তবেই সমাধান হতে পারে।

পরম দৈবটাই বা কি-করে সমস্যার সমাধান করবে? এমন যদি হয়, রজত রায় আর অর্চনাকে বিয়ে করতে চায় না, পছন্দও করে না ; আর, অর্চনাও রজতকে পছন্দ করে না, বিয়েও করতে চায় না ; আর, সুচরিত নামে ঐ ছেলেটা অন্তত পাঁচশো টাকা মাইনের একটা সার্ভিস, দুটো বাড়ি, একটা গাড়ি আর অন্তত হাজার পঞ্চাশ টাকার একটা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স তৈরী করে ফেলেছে, তবে সমস্যাটা সহজেই মিটে যেতে পারে। তখন সুরচিতের সঙ্গে অর্চনার বিয়ে হলে খুশিই হবেন সামন্ত সাহেব।

কিন্তু ভাবতে গিয়ে সামন্ত সাহেবের হৃৎপিণ্ডটা যেন নিজেরই একটা ঠাট্টার শব্দ শুনে হেসে ফেলেছে। কল্পনাটা যে তিনটে অলৌকিক কাণ্ড আশা করতে চাইছে, তার কোনটার একটাও কি সম্ভব?

দুটো কাণ্ড অবশ্য নিতান্ত সম্ভব নয়। জজিয়তী জীবনে কত রকমের কত বিচিত্র প্রেমের খুনোখুনির মামলার বিচার করেছে যে মানুষ, সে মানুষ জানে, কবিরা যে ব্যাপারটাকে একেবারে একটা অক্ষয় সত্য বলে বাখান করে গান করেছেন, সেটা কত ঠুন্‌কো একটা সত্য। যতক্ষণ বাতাসে কোন ঝড় থাকে না, ততক্ষণ পাতার শিশিরকে কত বড়, কত চমৎকার আর কত শান্ত একটা রূপের সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু বাতাসের সামান্য একটা ঝাপটা লাগলেই সে শিশির টুপ করে ঝরে পড়ে যায়। ভালবাসার মন যে পাতার শিশিরের চেয়ে খুব বেশি কঠিন কোন বস্তু, এমন প্রমাণ তো পাওয়া যায় না।

হতে পারে, একটুও অসম্ভব নয় ; রজত হয়তো অর্চনাকে ভুলে যেতেই চাইবে। অর্চনাও রজতকে ভুলে যাবে ; কিন্তু তারপর? সমস্যার এই দুটি গ্রন্থি না হয় খুলে গেল ; কিন্তু কোন্ দৈব এসে সুচরিতকে হঠাৎ একটা ঐশ্বর্যের মানুষ করে দিয়ে চলে যাবে? সে যে নিতান্ত অসম্ভব। আর, একশ টাকা মাইনের সুচরিতকে বিয়ে করা যে অর্চনার পক্ষে আত্মহত্যা। অর্চনা যদি সম্ভব মনে করে, তবুও অসম্ভব। ভালবেসে বিয়ে করলেও সে বিয়ের পর ভালবাসাই টিকে থাকবে কি না সন্দেহ। ভুল ভাবছে অর্চনা ; মনে করেছে, ভালবাসার কাছে সবই ফুল হয়ে যায়। জানে না, কল্পনাও করতে পারে না অর্চনা, এমন কাঁটা আছে যার কাছে ভালবাসাটাই সবার আগে জখম হয়। সে কাঁটা হলো বাড়ি-গাড়ি আর টাকা দিয়ে তৈরী একটা সৌভাগ্যের কাঁটা। সুচরিতকে বিয়ে করলে একদিন দেখতে পাবে অর্চনা, সুচরিত ওর ভালবাসার মানুষ নয়. ভালবাসার দয়ার আশ্রিত একটা মানুষ। সেদিন সুচরিতকে একটা অনুগ্রহের গলগ্রহ বলে মনে হবে। সম্পর্কের মধ্যে সে শ্রদ্ধা আর থাকবে না, সে শ্রদ্ধা ভালবাসার মধ্যে না থাকলে যে-কোন মেয়েরই মনের কাছে তার স্বামীও শুধু একটা পুরুষ হয়ে যায়।

কিন্তু অর্চনা কি এই খাঁটি বাস্তব সত্যটাকে বুঝবে? বুঝতে চাইবে? বুঝতে পারবে? বিশ্বাস হয় না। ওকে যে একটা স্বপ্নে পেয়েছে ; আর স্বপ্নের ঘোরে যে-কোন অসম্ভবই যে একেবারে সম্ভব হয়ে চোখের কাছে দেখা দেয়।

সামন্ত সাহেবের এত বড় আশার ছবিটার সব রঙ মুছে দিয়েছে একটা দৈবেরই হাত। তা না হলে এমন অসহায় বোধ করতে হবে কেন? বাধা দেবার কোন উপায়ই যে আর চোখের

কাছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সুচরিতকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেবার সেই অবাধ সাহসটাই যে আর মাথা তুলতে পারছে না। সে মাথাকে হেঁট করিয়ে দিয়েছে অর্চনা। সুচরিতের অহংকার আজ সকল প্রতিশোধের খুশিতে মনে মনে হাসছে। একশ টাকা মাইনের একটা ছেলের কাছে কি-ভয়ানক জব্দ হয়ে গেল সামন্ত সাহেবের প্রেস্টিজ!

দৈব নয়, ইচ্ছে করলে একমাত্র সুচরিতই এই সমস্যার গিঁট ভেঙে দিতে পারে। সামন্ত সাহেবের মেয়ের ভুল স্বপ্নটাকে ভুল মায়ার গ্রাস থেকে মুক্তি দিতে পারে সুচরিত, যদি ইচ্ছে করে।

কিন্তু অসম্ভব। আজ আর সুচরিতের ইচ্ছেটা কোন ভয়ের শাসন মানবে না। ইচ্ছেটা যে সাংঘাতিক ধূর্ত একটা ভালমানুষী উদারতা আর অহংকারের ইচ্ছা। যতদিন আশা করবার সাহস ছিল না, ততদিন সৌজন্যের ভঙ্গী দেখিয়ে আর বিনীত হয়ে একটা আত্মগৌরবের ছলনা সৃষ্টি করেছে। ইচ্ছাটাকে আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। এখন সামন্ত সাহেবের মেয়ে যখন অন্ধ পাখির মত সেই ধূর্ত ভালমানুষীপনার জালে ধরা পড়েছে তখন আর ইচ্ছাটাকে লুকিয়ে রাখবে কেন সুচরিত? একশো টাকা মাইনের সুচরিতের চালাক চক্রান্ত আজ ব্যাধের ইচ্ছার মত লোভী হয়ে হেসে উঠেছে। সুচরিতের ইচ্ছার হাত থেকে সামন্ত সাহেবের মেয়ের পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। পরিত্রাণ পেতে দেবে না সুচরিত।

কোন দৈব এসে আজ যদি ঐ ভয়ানক সুচরিতের সুশ্রী মুখটাকে কুষ্ঠক্ষতে ক্লেদাক্ত করে দেয়, যদি ওর সব মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়ে ওকে একটা চোর কিংবা জুয়াচোর করে ছেড়ে দেয়, যদি পাগল হয়ে যায়, অন্ধ হয়ে যায় সুচরিত, তবু অর্চনাকে মুক্তি দেবে না ঐ সাংঘাতিক চক্রান্তের প্রাণীটা, যার নাম সুচরিত।

সামন্ত সাহেবের ভাবনার ভাষাটাকেই যেন রক্তাক্ত করে দিয়ে একটা অসহায় আক্রোশের দংশন হাসতে থাকে। দংশনের মুখটাকেও যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ; সুচরিত নামে একশো টাকা মাইনের একটা প্রাণীর মুখ। ওকে কোনদিন কোন মুহূর্তে, মরে যাবার শেষ মুহূর্তেও ক্ষমা করতে পারবেন না সামন্ত সাহেব।

চমকে ওঠে সামন্ত সাহেবের স্তব্ধ-কঠোর চোখ দুটো। অর্চনা এসেছে। সামন্ত সাহেবের চোখের সামনেই একটা কোচের গায়ে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়েছে।

—তুমি কোথায় গিয়েছিলে? সামন্ত সাহেবের গলার স্বরে যেন একটা স্নেহহীন শুষ্কতার ধিক্কার বেশ একটু স্পষ্ট হয়ে বেজে ওঠে।

অর্চনা বলে—পাহাড়তলীর দিকে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—সুচরিতবাবুদের বাড়িতে।

—কেন?

—দেখা করে এলাম।

—কিসের জন্যে?

—এমনি।

—সুচরিতের সঙ্গে দেখা হয়নি?

—হয়েছে।

—কি বললে সুচরিত?

—তোমার কথা কিছু বলেনি।

—আমার কথা না বলুক, তোমার কথা কিছু বলেছে?

—বলেছে।

—কি?

--যা কখনও ভাবতে পারিনি, তাই বলেছে।

--কি কথা?

--সুচরিত চায় না যে, আমি ওদের বাড়িতে যাই কিংবা ওর সঙ্গে দেখা করি।

--কি বললে? সামন্ত সাহেবের গম্ভীরতার হৃৎপিণ্ডটা যেন একটা নিদারুণ বিস্ময়ের দংশন সহ্য করতে গিয়ে ছটফটিয়ে ওঠে।

অর্চনার মুখ, অর্চনার চোখ আর গলার স্বর কিন্তু একটা শান্ত স্তব্ধতা। সামন্ত সাহেবের বিস্ময়ের প্রশ্নটা এত জোরে বেজে উঠলেও অর্চনার প্রাণের উপর কোন সাড়া কেঁপে ওঠে না। অর্চনা যেন অপমানে আহত আর ক্লান্ত একটা আত্মা। সাপের ছোবল খেয়ে ফিরে আসা একটা আশার শাস্তি।

সামন্ত সাহেব--সুচরিত কি বললে শুনি?

অর্চনা--শুনলেই তো। বলেছে, এখানে আর এসো না।

সামন্ত সাহেব চেঁচিয়ে ওঠেন।--অভদ্র! ইতর! তুমি বোধহয় এতদিনে লোকটাকে ঠিক চিনতে পারলে?

অর্চনা--হ্যাঁ।

সামন্ত সাহেব--তোমারই খুব ভুল হয়েছে ; ঐ ক্লাসের মানুষের সঙ্গে তোমার কথা বলতে যাওয়াই অন্যায় হয়েছে।

অর্চনা--হ্যাঁ।

সামন্ত সাহেব একটা হাঁপ ছাড়েন।--যাক্, এসব কথা আর আলোচনা না কারই ভাল।...হ্যাঁ, রজতের চিঠি পেলাম। রজত খুব সম্ভব এ সপ্তাহেই এখানে আসছে।

--চলে যায় অর্চনা।

সামন্ত সাহেবের ভাবনার সব ভারও যেন হাঁপ ছেড়ে হাল্কা হয়ে যায়। কোচের উপর গা এলিয়ে দিয়ে আর দু' চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে চুরুট টানতে থাকেন সামন্ত সাহেব। সত্যিই যে একটা দৈব এসে জোর করে অর্চনার অদৃষ্টটাকে এক সাংঘাতিক অভিশাপের মায়ার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। সত্যিই কে যেন নিশির ডাকে ঘরছাড়া ঐ সুখের মেয়ের পায়ে হঠাৎ কাঁটা ফুটিয়ে তার ভুলের প্রাণটাকে চম্‌কে দিয়েছে। তাই হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে পালিয়ে এসেছে সেই মেয়ে।

কিন্তু...সামন্ত সাহেবের হাতের জ্বলন্ত চুরুট যেন হঠাৎ চমকে ওঠে, কাঁপতে থাকে, তারপরেই হাত ফস্‌কে পড়ে যায়। সামন্ত সাহেবের ভাবনাহীন আর নির্ভার আর অগম্ভীর হৃৎপিণ্ডের এক কোণে ছোট্ট একটা যন্ত্রণা যেন আর্তনাদ করে উঠতে চেয়েছে। দৈব, ঠিকই একটা দৈব এসে অর্চনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দৈবের মুখটা যে সুচরিতেরই মুখটা ; একটা রক্তাক্ত আত্মহত্যার মুখ।

বার

ভালবাসার দুঃসাহসটা ভাল শিক্ষা পেয়ে গেল। অর্চনা সামন্তর বুকের ভিতরে লুকানো ক্ষতের জ্বালাটা যেন নিজেই ভুল বুঝতে পেরে এইবার শান্ত হয়ে আসছে। অর্চনা যে-ভুল করেছে, কোন মেয়ের ভালবাসা পাগল হয়ে গেলেও সে-ভুল করে কি না সন্দেহ। কাদার মূর্তির গলায় মালা পরাতে গেলে যা হয়, তাই হয়েছে। মালাটাই কাদা লেগে নোংরা হয়ে গিয়েছে।

ভালবাসা নিতে জানে না, ভালবাসার দাবিকে একটুও সম্মান দিতে জানে না, এমন একটা সন্ন্যেসীপনার কাছে অর্চনা সামন্ত তার আসার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার জন্য ছুটে গিয়েছিল শুধু অর্চনার ভালবাসাকে নয় ; অর্চনার সেই নিঃশ্বাসের সাধটাকেও যেন টিটকারি দিয়ে

খেদিয়ে দিল একটা ভীরুতার অহংকার। কি আশ্চর্য, লোকটার মনে যেন একটা ব্যাধির রাগ পোষা রয়েছে। ভালবাসাকে অপমান করতে পারলেই লোকটার অন্তরাত্মা যেন ধন্য হয়ে যায়। যে মেয়ে সব ভয়-ভাবনা আর লজ্জা ছেড়ে দিয়ে স্পষ্ট বলে দিল, তোমার কাছে চিরকাল আসব, সেই মেয়েকে কত স্পষ্ট করে বলে দিল একটা নির্বোধ পাথর, তুমি আর কোনদিন এসো না।

ভালই হয়েছে ; হোঁচট খেয়েছে সামন্ত সাহেবের মেয়ের ভুল। অদৃষ্টটা আরও ভয়ানক শাস্তির আঘাত থেকে বেঁচে গেল।

না আর এই দোতলা ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর কোন মুখের দিকে তাকাবার দরকার হবে না। ভালবাসা নামে কথাটাকে কানে শুনলে কিংবা মনে করলেও বুকটা ঘেন্নায় ভরে যাবে।

বাবা বলেছেন, রজত আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আসবে। সপ্তাহের পাঁচটা দিন তো পার হয়েই গেছে। হয়তো সত্যিই আসবে রজত। কিন্তু অসম্ভব। রজত তো দূরের কথা, কোন সোনাকেও আর নয়। অর্চনা সামন্তর প্রাণ আর ভিখারী হতে পারবে না। রজত যদি আসে, তবে এবার ভাল করেই জেনে চলে যাবে রজত ; অর্চনা সামন্ত রজতের ছায়ার কাছেও এসে দাঁড়াতে আর রাজি নয়।

নিজের প্রাণটাকেও আর ভীরু করে রাখতে পারবে না অর্চনা। রজতের ভালবাসাকে দয়া করবারও কোন মানে হয় না। স্পষ্ট করে বলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে অর্চনা সামন্তর প্রাণটা, তুমি এখানে আর এসো না ; আমার কাছ থেকে ভালবাসা আশা করো না।

অর্চনার কানের কাছে যেন একটা অশরীরী সন্দেহের মুখ খুব স্পষ্ট করে খুব বাস্তব একটা ভয়ের কথা বলছে, কে বললে আর কেমন করে বুঝলে যে, রজত রায় তোমাকে ভালবাসে? অর্চনাকে নয় ; রজত রায় ভালবাসে সামন্ত সাহেবের মেয়েকে ; বড়লোক বাপের অনেক সম্পত্তি পাবে যে মেয়ে, সেই মেয়েকে। তার মানে একটা সম্পত্তিকে ভালবাসে রজত রায়। সামন্ত সাহেবের যদি এত সম্পত্তি না থাকত, তবে অর্চনাকে একটা মানুষ বলেও মনে করত না রজত।

তা ছাড়া, কোন্ সাহসে রজত রায়কে বিয়ে করবে অর্চনা? যার হাত ধরেও অর্চনা সামন্তর নিঃশ্বাসে কোন তৃপ্তির স্বাদ চমকে ওঠেনি ; কল্পনাতে যার মুখটা দেখতে পেলেও সে মুখের কাছে নিজের মুখটাকে কল্পনাতেও এগিয়ে দিতে পারেনি, ইচ্ছেও হয়নি ; তাকে বিয়ে করা যে জীবনের অপমান। একটা শাস্তি।

তার চেয়ে ভাল, এখনও সাবধান হবার সময় আছে, বাবার কাছে গিয়ে স্পষ্ট করে বলে দেওয়াই উচিত ; রজত যেন আর এখানে না আসে। আমাকে শুধু একলা হয়েই বেঁচে থাকতে দাও।

দোতলার ঘর থেকে নেমে নীচের তলার হলঘরে এসেই দেখতে পায়, আতঙ্কিতের মত চমকে ওঠে অর্চনা ; বসে আছে রজত। আর কেউ নেই।

রজত হাসে—তোমার চেহারাটা কেমন যেন দেখাচ্ছে। আবার জ্বরটর হয়েছিল বোধহয়?

অর্চনা—না। বাবা কোথায় গেলেন?

রজত—উনি বললেন, হোসেন সাহেবের বাড়িতে যাবার একবার দরকার হয়েছে। বোধহয় সেখানেই গেছেন।

অর্চনা—তুমিও বাবার সঙ্গে গেলে ভাল হতো।

রজত—তা ভালই হতো। শুনেছি হোসেন সাহেব মানুষটা খুবই ভাল।

অর্চনা—হ্যাঁ, খুব বড় লোক।

রজত—না না, সে জন্যে বলছি না। হোসেন সাহেব মানুষটাই ভাল। শুনেছি ; শুধু কবিতা

ফুল গান আর শরবত নিয়েই বুড়ো বয়সের জীবনটাকে বেশ মিষ্টি করে রেখেছেন।

অর্চনা—শুনেছি।...যাই হোক, বাবা যতক্ষণ ফিরে না আসেন ততক্ষণ তোমাকে কিন্তু একাই বসে থাকতে হবে।

—কেন? তুমিও কি কোথাও যাচ্ছ?

—আমি ওপরে যাচ্ছি।

—কোন কাজ আছে?

—আছে।

—বেশ তো তুমি যাও। আমি এখানে আছি।

—তুমি তো এখন তোমার হোটেলে চলে গেলেও পার।

—এখনই হোটেলে ফিরে যাব কেন? যখন এসেছি তখন বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে তারপর যাব।

রজতের মুখের দিকে তীব্র চোখের একটা দৃষ্টি হেনে দিয়ে কি যেন বুঝতে আর ভাবতে চেষ্টা করে অর্চনা। বুঝতে অসুবিধে নেই, রজত রায়ের আত্মাটা যেন এখানেই ভয়ানক শক্ত হয়ে বসে থাকবার একটা জেদ। ভালবাসার মুখোস পরা একটা সম্ভ্রান্ত মতলব। এখনই, সামান্য একটা মিথ্যা কথার টোকা দিয়ে রজত রায়ের এই মুখোশ নামিয়ে দিতে পারা যায়। এখানে শক্ত হয়ে বসে থাকবার প্রতিজ্ঞাটা এই মুহূর্তে একটা আতঙ্ক হয়ে পালিয়ে যাবার জন্য ছটফট করে উঠবে। বিয়ে করবার ইচ্ছার আড়ালে যে ইচ্ছাটা লুকিয়ে রয়েছে, একটা মেয়ে-বড়লোকের স্বামী হবার সম্ভ্রান্ত লোভটা, সেটা যে এখনই অর্চনা সামন্তর কাছে ধরা পড়ে যাবে, আর সরে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

তাই ভাল। তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় অর্চনা সামন্তর অদৃষ্ট। সরে যাক এই রজত রায়, এই মুখোশ-পরা ইচ্ছার মূর্তিটা।

অর্চনা বলে—বাবা বোধহয় শিগ্‌গিরই অদ্ভুত একটা কাণ্ড করবেন।

রজত—কাণ্ড?

অর্চনা—হ্যাঁ। তাঁর সব সম্পত্তি, এই বাড়ি, দার্জিলিং-এর বাড়ি আর ব্যাঙ্কে জমানো সব টাকা দান করে দেবেন।

—কাকে দান করবেন?

—বোধহয় গভর্নমেণ্টকে।

—কেন?

—একটা হাসপাতাল কিংবা কয়েকটা স্কুল...কিংবা এ ধরনেরই লোকের উপকারের কোন কাজের জন্য।

রজত যেন উৎফুল্ল হয়ে, একটা উৎফুল্ল শ্রদ্ধারই আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে।—বাঃ, তোমার বাবা তা হলে একটা কাজের মত কাজ করবেন।

অর্চনার চোখে ছোট একটা ভ্রূকুটি সিরসির করে—কি বললে?

—এর চেয়ে ভাল কাজ আর কি হতে পারে? সারা জীবনের সঞ্চয় একটা ভাল কাজে উৎসর্গ করে দেওয়া, এমন সৎসাহস ক'জনেরই বা থাকে?

—মেয়ের জন্য কিন্তু দশ আনার পয়সাও রেখে যাবেন না।

রজত হাসে—রেখে যাবার দরকারই বা কি? তাঁর মেয়েকে তো গাছতলায় দাঁড়াতে হচ্ছে না।

অর্চনার চোখের ছোট ভ্রূকুটিটা এবার যেন একটু ভয় পেয়ে চমকে ওঠে।—যদি হয়!

রজত—আমি তোমার কথার কোন মানে বুঝতে পারছি না অর্চনা। তোমার বাবা তাঁর নিজের রোজগারের সম্পত্তি নিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করবেন, নিজের মনের মত কাজে দান করে

আনন্দ পাবেন, তাতে তোমার আর আমার তো কিছু বলবার নেই। বরং খুশি হওয়াই উচিত।

--তুমি খুশি?

--নিশ্চয়। কিন্তু তুমি কি খুশি নও?

চুপ করে রজত রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অর্চনা। সত্যিই যে মুখোশ নয় ; সত্যিই যে একটা মুখ দেখতে পাচ্ছে অর্চনা। সামন্ত সাহেবের সব সম্পত্তি ধুলো হয়ে গেল কি ছাই হয়ে গেল, এ প্রশ্ন যে রজত রায়ের কাছে কোন প্রশ্নই নয়। দান-খয়রাতের কাজে সামন্ত সাহেবের সব সম্পত্তি বিলীন হয়ে যাবে, কথাটাকে যেন একটা শুভ ঘটনার বার্তা বলে মনে করে খুশি হয়েছে রজত রায় ; স্নিগ্ধ হয়ে হাসছে রজত রায়ের চোখ দুটো।

জব্দ হয়ে গেছে অর্চনা সামন্তের এত যত্ন করে তৈরী করা মিথ্যার ফাঁদটা। সামন্ত সাহেবের বাড়ির এই হলঘরের কোচের উপর শক্ত হয়ে বসব'র আর অর্চনার মুখের দিকে তাকাবার একটা কঠিন অধিকার পেয়ে গিয়েছে রজত রায়। নড়তে চাইবে কেন, সরেই বা যাবে কেন রজত রায়? এই বাড়ি, এই হলঘর আর এই ভেলভেটের গদি-লাগানো কোচ যদি মিথ্যে হয়ে যায়, আর অর্চনা সামন্ত যদি একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে, তবু বোধহয় ঠিক এইভাবে শক্ত হয়ে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে রজত ঠিক এই ভাবে অবিচল ইচ্ছার দুটো চোখ নিয়ে অর্চনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

কিন্তু না, বড় মানুষ রজতের এই হৃদয়বত্তার ভঙ্গীটাকে বিশ্বাস করেও অর্চনা সামন্ত বিশ্বাস করতে পারবে না যে, রজত রায় একটা মুখোশ-পরা আত্মা নয়! এখনই এমন একটি নিদারুণ সত্যের খবর শুনিয়ে দিতে পারে অর্চনা, যা শোনবার পর রজত রায়ের ভালবাসার সাধ নিজেই আছাড় খেয়ে চূর্ণ হয়ে যাবে। এখনি ছুটে পালিয়ে যাবে রজত রায়। সামন্ত সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করবার সব দুঃসাহস একটা ভয়ানক আতঙ্ক হয়ে, আর বোধহয় একটা ধিক্কার দিয়ে চলে যাবে।

অর্চনা বলে--তুমি তো সুচরিতকে চেন।

রজত--চিনি বইকি।

অর্চনা--লোকটা বোধহয়...

রজত--ওভাবে কথা বলো না অর্চনা।

চমকে ওঠে অর্চনা--কি বললে?

রজত--সুচরিতকে লোকটা বলা উচিত নয়। সুচরিতের শুধু টাকা-পয়সা নেই ; এ ছাড়া ওর সব কিছুই আছে। আমাদের মত অনেকের চেয়ে অনেক বেশি করে আছে।

অর্চনার চোখ দুটো জোর করে হাসতে গিয়েও যেন একটা লজ্জাহীন হিংস্রতার যন্ত্রণা নিয়ে ছটফট করে ওঠে।--কিন্তু সামন্ত সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করবার অধিকার নেই নিশ্চয়।

রজত হাসে--অধিকার আছে নিশ্চয় ; কিন্তু সাহেবের মেয়েই যে ওকে বিয়ে করতে সাহস করবে না।

অর্চনা--এমন সাহস করা কি ভাল হতো?

রজত--খারাপই বা কি হতো?

অর্চনা--ভালই বা কি হতো?

রজত আবার হেসে ফেলে--ভালবাসা থাকলেই সব ভাল হতো। ভালবাসা না থাকলে অবশ্য...।

অর্চনা--সামন্ত সাহেবের মেয়ে কখনো সুচরিতের মত মানুষকে ভালবাসতে পারে, এটা বিশ্বাস করা যায়?

রজত--খুব বিশ্বাস করা যায়।

অর্চনা--সুচরিতের মত মানুষ কখনো সামন্ত সাহেবের মেয়েকে ভালবাসতে সাহস করবে,

এটাও কি...।

রজত--খুব বিশ্বাস করা যায়। এটাই বা কি এমন অসম্ভব? এতে দোষই বা কোথায়?

অর্চনা--তর্ক করবার জন্য এসব কথা বলছ? না, সত্যিই বিশ্বাস কর বলে বলছ?

রজত--মিছে কথা নিয়ে আমি তর্ক করি না অর্চনা। যা ভাল বুঝি আর বিশ্বাস করি, তা স্পষ্ট করে বলে দিতে আমার একটুও বাধে না।

অর্চনা--সুচরিত হঠাৎ বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে এখান থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে, সে খবর শুনেছ নিশ্চয়।

রজত--আমার মনে হয়, এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাবার জন্যেই সুচরিত বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে।

অর্চনার সারা মুখ জুড়ে যেন একটা করুণ আতঙ্কের ছায়া ছমছম করতে থাকে।--হঠাৎ দূরে চলে যাবার ইচ্ছাই বা হবে কেন সুচরিতের?

--আমার মনে হয়, তোমারই জন্য।

--কি বললে?

--আমার মনে হয়, মনে মনে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে বলেই নিজের উপর রাগ করে সরে গিয়েছে বেচারা।

যেন একটা আর্তনাদ চাপতে চেষ্টা করে অর্চনা।--তুমি কিন্তু আর একটা খবর জান না। আমি নিজেই সুচরিতের কাছে গিয়েছিলাম।

--কেন?

--কথাটা জিজ্ঞেস করবার জন্য ; কেন দূরে চলে গেল সুচরিত?

--কি বললে সুচরিত?

--যা বলেছে, তা কোন ভদ্রলোক বলে না।

--কি?

--সুচরিত বললে, আমি যেন আর কখনও তার সঙ্গে দেখা না করি, কথা না বলি।

রজত রায়ের উৎফুল্ল হাসির মুখটা যেন একটু ব্যথিত হয়ে কেঁপে ওঠে।--সুচরিত বেচারা সত্যিই তোমাকে ভালবাসে অর্চনা। ওকে কেন মিছিমিছি অভদ্র বলে গাল দিচ্ছ!

অর্চনা সামন্তর মুখটা এবার যেন একটা কান্না চাপতে গিয়ে ছটফট করে ওঠে। গলার স্বরও যেন ফুঁপিয়ে উঠতে চায়।--কিন্তু তুমি কেন সামন্ত সাহেবের মেয়েকে অভদ্র বলে গাল দিতে পারছ না?

রজত--কেন? সামন্ত সাহেবের মেয়ে কি দোষটা করল?

অর্চনা--রজত রায়ের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে, সে মেয়ে সুচরিতের কাছে গিয়ে কথা বলবে, এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড রজত রায় মানুষটাই বা সহ্য করবেন কেন?

রজত যেন হঠাৎ আনমনা হয়ে অর্কিডের টবগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা শান্ত গম্ভীরতার মুখ কি-যেন ভাবছে।

--কি ভাবছ? অর্চনার প্রশ্নটা যেন দম বন্ধ করা একটা নিদারুণ কৌতূহলের প্রশ্ন।

রজত বলে--বিশ্রী কাণ্ড হলে সত্যই সহ্য করতাম না।

অর্চনা--তার মানে?

রজত--তার মানে, একটুও বিশ্রী কাণ্ড নয়। সুচরিতের কাছে গিয়ে তুমি যদি কথাটা না জিজ্ঞেস করতে, তবে সেটা তোমারই একটা ভয়ানক অভদ্রতা হতো।

হঠাৎ চমকে ওঠে রজত। বোধহয় একটু বেশি আনমনা হয়ে গিয়েছিল বলেই চোখে পড়েনি, অর্চনা সামন্তর চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছে। ব্যথিত অপ্রস্তুতের মত বেশ একটু করুণ স্বরে যেন চেঁচিয়ে ওঠে রজত--এ কি? তুমি আবার কোন্ দুঃখের কথা ভেবে বসলে

অর্চনা?

অর্চনা মাথা হেঁট করে।—তুমি সত্যিই আমাকে বিয়ে করবে?

রজত চেঁচিয়ে ওঠে—এ কি অদ্ভুত কথা! মিথ্যে বিয়ে করব কেমন করে? সেটা আবার কেমন ব্যাপার?

অর্চনা—আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে?

রজত—কিসের বিশ্বাস?

অর্চনা—আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি কিনা?

রজত হাসে—কেন ভালবাসবে না? আমি কোন্ অপরাধ করলাম?

অর্চনা—ছিঃ, ওকথা বলো না। তুমি কেন অপরাধ করবে?

সামন্ত সাহেব ফিরেছেন। ফটকের কাছে তাঁর চুরুটের ধোঁয়া উড়ছে।

অর্চনা বলে—একটু সরে বসো রজত।

হলঘরের দরজার কাছে এসে পড়েছেন সামন্ত সাহেব। কোচের উপর থেকে যেন একটা উৎফুল্ল ব্যস্ততার আবেশে উঠে দাঁড়ায় রজত রায়।—শুনে খুব ভাল লাগল। আপনার সব প্রপার্টি আপনি...।

আতঙ্কিতের মত ব্যস্তভাবে আর চোখের ইশারায় রজত রায়ের মুখ বন্ধ করে দেয় অর্চনা—চুপ।

সামন্ত সাহেব হাসতে চেষ্টা করেন—কি হলো? চুপ করলে কেন রজত? কি বলতে চাইছে রজত?

অর্চনা হাসে—কিছুই নয়। আমার একটা ঠাট্টার গল্প শুনে...।

সামন্ত সাহেবও ব্যস্তভাবে বলেন—আচ্ছা, তোমরা এখানেই বসো। আমি ওদিকের ফুলগুলোকে একটু দেখে আসি।

তের

সুচরিতকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন হোসেন সাহেব,—এতদিন পরে বুড়োকে মনে পড়ল? অ্যাঁ? কোথায় ছিলে তুমি?

—এখানেই ছিলাম।

—এই ছ'মাস এখানেই ছিলে?

—জী হাঁ।

—তবে? আমার সরবতের পেয়ালা কি দোষ করল যে, এ ছ'মাসের মধ্যে একদিনও এলে না।

সুচরিত হাসে—আপনার শরবতের পেয়ালার দোষ নয়, সাহেব। আমারই...।

হোসেন সাহেব—কি?

সুচরিত—আমারই মনের ময়লা।

চমকে ওঠেন হোসেন সাহেব—কভি নেহি। তোমার মনে কোন ময়লা থাকতে পারে না।

সুচরিত হাসে—কবিতা প্রায় ভুলেই গিয়েছি সাহেব।

হোসেন সাহেব হাসেন—অসম্ভব। ইয়াদ করো সুচরিত। অনেকদিন তোমার মুখের কবিতা শুনিনি।

গোলাপবাগের হাওয়া ফুরফুরিয়ে উড়তে থাকে। হোসেন সাহেব দু'চোখ বন্ধ করে যেন পিপাসিতের মত আবেদন করেন।—ইয়াদ করো সুচরিত।

সুচরিতের চোখের দৃষ্টিটাও সেই মুহূর্তে যেন গোলাপবাগের হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাবার জন্যে ফুরফুর করতে থাকে,—উও জো হঁ ম্যায়, তুম মেঁ করার থা, তুমহেঁ ইয়াদ হো কি না

ইয়াদ হো। ওহি ইয়ানি ওয়াদা নিবাহ্ কা, তুমহেঁ ইয়াদ হো কি না ইয়াদ হো।

হোসেন সাহেবের প্রাণটা যেন এক নিমেষেই এক স্বপ্নজগতের গোলাপবাগের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। তেমনি নিথর হয়ে আর চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন হোসেন সাহেব।

সুচরিতের গলার স্বরেও যেন সেই অপার্থিব গোলাপবাগের এক বুলবুলের পিপাসার অভিযোগ কবিতা হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।--উয়ো জো লুৎফ মুঝে পে থে, পেশতার উও করম কিয়া থা মেরি হাল পর ; মুঝে সব হ্যায় ইয়াদ জরা জরা, তুমহেঁ ইয়াদ হো কি না ইয়াদ হো।

কি আশ্চর্য, বুড়ো হোসেন সাহেবের চোখের পাতা ভিজে গিয়েছে। চমকে ওঠে সুচরিতের চোখের দৃষ্টি। কি ভাবলেন, কি বুঝলেন হোসেন সাহেব?

হোসেন সাহেব মৃদুস্বরে কথা বলেন--আওর বোলো সুচরিত। থেমো না।

সুচরিত--গিন্‌তে থে তুম জিসে আশ্‌না, কহতে থে তুম জিসে বেবফা ; ম্যায়ঁ হুঁ মোমিন মুবতল্‌লা, তুমহেঁ ইয়াদ হো কি না ইয়াদ হো।

--সুচরিত। যেন একটা আদরের স্বর লুকোতে গিয়ে ধরা-গলায় ডাক দিয়ে ফেলেন হোসেন সাহেব।

সুচরিত--বলুন।

হোসেন সাহেব--সামন্ত সাহেবের বাড়ির সব খবর খুব ভাল। শুনেছ নিশ্চয়?

সুচরিত--শুনিনি কিছু ; কিন্তু বুঝতে পারছি।

--হ্যাঁ। সামন্ত সাহেবের মেয়ে আর জামাই এখন দিল্লীতে আছে। সামন্ত সাহেবও দিল্লীতে গিয়েছিলেন। দেখে খুব খুশি হয়েছেন যে, মেয়ে-জামাই খুব সুখী হয়েছে।

--খুশি হবারই কথা।

--তোমারও খুশি হওয়া উচিত।

--নিশ্চয়। আমি খুশি হয়েই আছি সাহেব।

--বাস্ বাস্। আর কিছু শুনতে চাই না। তুমিই তো বাহাদুর!...আচ্ছা, ইকবাল সাহেবের লেখা কিছু ইয়াদ করতে পার?

--জী হাঁ।

--তবে বল।

--মিস্‌লে বু কয়দ হ্যায়, গুঞ্চেমেঁ পরেশোঁ হো জা। রখ্‌ত বরদোশ হাওয়া এ চমনস্তাঁ হো জা। হায় তঙ্গমায়া, তু জর্‌রেসে বিয়াবাঁ হো জা।·নগ্ মা-এ মৌজেমে হাঙ্গামা-এ তুফাঁ হো জা।

--বহুৎ খুব! ঠিক হ্যায়! বাস্ বাস্! এই তো চাই। বুড়ো হোসেন সাহেবের লালচে মুখটাকে আরও রঙিন করে দিয়ে যেন একটা খুশির উচ্ছ্বাস চঞ্চল হয়ে ওঠে। বোধহয় একটা সান্ত্বনা পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে গেছেন হোসেন সাহেব। কোন সন্দেহ নেই, কোন ছোট আক্ষেপ আর ছোট অভিমান নিয়ে নিজেকে ছোট করে রাখেনি, রাখতে চায় না সুচরিত।

সুচরিত বলে--এবার আমাকে উঠতে আজ্ঞা করুন।

হোসেন--এস।

চোদ্দ

এটা সেই রাস্তাটা ; আর ঐ তো, সেই ঝাউটা, যার ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে অর্চনা সামন্ত একদিন নিজেই ইচ্ছে করে যেচে আর হাত বাড়িয়ে সুচরিতের হাত থেকে গোলাপের তোড়া তুলে নিয়েছিল। অনেকদিন পর, পুরো ছটা মাসের পর এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে সুচরিত।

হোসেন সাহেব বলেছেন, সামন্ত সাহেবের মেয়ে আর জামাই এখন চমৎকার দুটি সুখী জীবন হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। এমন যে হবে, এ সত্য তো আগেই বুঝতে পেরেছিল সুচরিত ; কিন্তু অর্চনা সামন্ত বুঝতে পারেনি। তাই সুচরিতের সে-সন্ধ্যার শক্ত কথাটাকে একটা হৃদয়হীন অভদ্রতা আর অপমানের কথা বলে মনে করেছিল। একটা জ্বলন্ত ধিক্কারের জ্বালা নিয়ে অর্চনার চোখ দুটো সুচরিতের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অভিশাপ হেনেছিল। ভালই করেছিল। তা না হলে রজত রায়ের কাছে গিয়ে একটা সুখী ভাগ্য নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবার পথটাই খুঁজে পেত না অর্চনা।

সুচরিতের মনের এক কোণে বেশ কঠিন একটা গর্ব যেন প্রসন্ন হয়ে রয়েছে। অর্চনা সামন্ত বুঝতে পারেনি, কোনদিন বুঝতেও পারবে না যে, অর্চনাকে ঐ সহজ আর সুন্দর পথটা সুচরিতই পাইয়ে দিয়েছে।

হোসেন সাহেব কিন্তু বুঝতে পেরেছেন ; তাই সুচরিতকে তারিফ করেছেন। সামন্ত সাহেবের মেয়েকে বুকের কাছে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে সুচরিত ; মস্ত দৌলতের এক মেয়েকে কাছে পেয়েও আটকে রাখতে চায়নি এক মুফলিস। সুচরিতও বড় গলা করে যে-সব কথা বলেছে ; তাতেও হোসেন সাহেব আরও বিশ্বাস করলেন, আর ; আরও খুশি হলেন যে, সামন্ত সাহেবের মেয়ের সঙ্গে এক বড়লোকের বিয়ে হওয়ায় সুচরিতও সুখী হয়েছে। অর্চনাকে সুখী করবার জন্য নিজেকে যে দুঃখ দিল সুচরিত, সেটা যে সুচরিতের জীবনের মস্ত বড় একটা গৌরব।

বুড়ো হোসেন সাহেবও বোধহয় বোঝাতে চেয়েছেন. শহীদ হওয়াই যেন ভালবাসার সব চেয়ে বড় গৌরব। তুমি ভালবাসবে, সে কিন্তু শুধু একটা ফাঁকি রেখে দিয়ে চলে যাবে ; আর তুমি তাতেই সুখী হবে।

বাঃ, সুচরিতের প্রাণটা যেন দুঃসহ একটা জ্বালা সহ্য করতে গিয়ে ছটফট করে ওঠে। এ গৌরবকে এক মুহূর্তের জন্যেও সহ্য করতে ইচ্ছে করে না। রজত রায়কে বিয়ে করেছে আর সুখী হয়েছে অর্চনা ; সুখী হয়েছে সুচরিতের একটা গর্ব। কিন্তু বুঝতে পারেননি হোসেন সাহেব, সুচরিত নামে রক্তমাংসের মানুষটা একটুও সুখী হয়নি।

সুখী হতে পারলে, এই রাস্তাটাকে আজ এত ঘৃণ্য বলে মনে হতো না। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে নিজেকে একটা বিদ্রূপের জীব বলে মনে হতো না। এক বড়লোকের মেয়ের খামখেয়ালের কাছে নিজের আত্মাটাকে বিলিয়ে দিয়েছিল সুচরিত। একমাত্র এই অপরাধে কত সহজে কত বড় শাস্তি দিয়ে সুচরিতের জীবনের আনন্দটাকে বিষিয়ে দিয়ে গেল সেই মেয়ে।

পৃথিবীর যেখানে যা ছিল সেখানে সবই ঠিক আছে। ও-বাড়িতে অর্কিডের ফুল ঠিকই ফোটে। দিল্লীতেও একটি বাড়ির সাজানো ঘরে ভালোবাসার আলো জ্বলে। সীতাগড় পাহাড়ের আড়ালে আকাশে সূর্য ওঠে ; ছোট নদীর কালভার্টের কাছে সড়কের বাতিও প্রতি সন্ধ্যায় ঠিকই জ্বলে ওঠে ; সবই ঠিক আছে। এর মধ্যে শুধু সুচরিত নামে একটা মানুষের জীবনটার সব হিসাব ভুল হয়ে গেল ; ভাগ্যটারই ঠিকানা হারিয়ে গেল। হঠাৎ কোথা থেকে বড়মানুষের খেয়ালের এক মেয়ে এসে সুচরিতের নিরিবিলি জীবনটার গায়ে পড়ে আর মায়ার কুহক ছড়িয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

কবিতার কথা দিয়ে কাকে ভোলাতে চাইছে সুচরিত? সুচরিত নামে একটা ভাগ্যকে ভুলিয়ে দিতে পারা যাবে ঠিকই। কিন্তু সুচরিতের প্রাণটা কখনও ভুলতে পারবে না যে, অর্চনা সামন্ত সুচরিতের জীবনের একটা দুঃসহ ক্ষতি। সুচরিত কখনও অর্চনা সামন্তকে ক্ষমা করতে পারবে না।

অর্চনা সামন্ত সুচরিতের জীবনের একটা লজ্জা, একটা বঞ্চনা, একটা পরাভবের জ্বালা। কি আশ্চর্য, যে-মেয়ে সুচরিতকে এত ছোট করে ভাবল, সে-মেয়েরই জন্যে সুচরিতের

ভালবাসা সীমাহারা হয়ে গেল। মনটা একটু সন্দেহ করতেও ভুলে গেল যে অর্চনা সামন্তর মত মেয়ে সুচরিতের মত মানুষকে ভালবাসার ধমক দিতেই ভালবাসে, ভালবাসা দিতে পারে না।

কিন্তু এখন তো আর বুঝতে কিছু অসুবিধে নেই। একটা রঙীন ঠাট্টা এসে একটা খাঁটি ফাঁকি রেখে দিয়ে সরে পড়েছে।

অর্চনা সামন্তর কাছে একটা কৈফিয়ত দাবি করবার সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে না? এই পথের কোন ঝাউয়ের ছায়ার কাছে সে মূর্তিকে কি আর কোনদিন দেখতে পাওয়া যাবে না? ছোট নদীর কিনারায় চোরকাঁটায় ভরা ডাঙাটার সেই বাবলার কাছে পাথরের টিলার উপর বসে সন্ধ্যার রাঙা আকাশের শোভা দেখবার জন্যে সে-মেয়ে কি আর কোনদিন উতলা হবে না? তখন তো সে-মেয়ের একেবারে চোখের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করা যাবে, এক ফোঁটা ভালবাসা ছিল না, এমন একটা মন নিয়ে কেন ছুটে এসেছিলে, আর সুচরিত নামে একটা নীরব ভালবাসার মানুষকে কেন মিছিমিছি এত বড় গলা করে জানিয়ে দিল যে, তুমিও ভালবাস? আমি যে চুপ করেই ছিলাম, তুমি মুখর হয়ে উঠেছিলে কেন?

শাস্তিটাও কি ভয়ানক একটা গিঁটপাকানো শাস্তি! সব বুঝেও অর্চনা সামন্তকে আজও ঘেন্না করতে পারছে না সুচরিত ; ভুলে যেতে পারছে না, ক্ষমাও করতে পারছে না। আর, একটু আনমনা হলেই অদ্ভুত একটা আক্ষেপ যেন সুচরিতের মনের উপরের গর্বটাও করুণ করে দিয়ে কথা বলে—আমি তো তোমাকে সবই দিলাম, আর তুমি যে আমাকে ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই দিলে না। কিন্তু আমি তো সত্যিই একটা সন্ন্যেসী নই।

হোসেন সাহেবের গোলাপবাগের সৌরভের হাওয়ার কাছে বসে মনটা কত সহজে কবিতার ভাষায় গর্ব করে কথা বলে—প্রতিদান চাই না, কোন স্বার্থের দাবি নেই, শুধু তুমি সুখী হও। কিন্তু এই নিরিবিলি রাস্তাটার শূন্যতার মধ্যে একা একা হেঁটে যেতে সেই মনটাই আবার কত সহজে একটা দুরন্ত পিপাসার অভিযোগ নিয়ে কথা বলে—অর্চনা সামন্ত কত বড় একটা অবুঝ নির্মমতা, কত বড় একটা চালাক ফাঁকি।

পনর

বেণু চেঁচিয়ে ওঠে।—আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে দাদা।

সুচরিত—অদ্ভুত?

—হ্যাঁ। সামন্ত সাহেব এসেছিলেন।

—সে কি? চমকে ওঠে সুচরিত।

—হ্যাঁ। তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর চলে গেলেন।

—কেন এসেছিলেন?

—এমনই।

হ্যাঁ, বেণু একটা রিপোর্টের মত ভাষায় যে-কথা বলে, তাতে বুঝতে হয়, এমনই এসেছিলেন সামন্ত সাহেব। কাউকে ডাকেননি সামন্ত সাহেব। কতক্ষণ হলো এসেছেন, তাও জানতে পারেনি বেণু। হঠাৎ ঘরের বাইরে এই বারান্দার কাছে আসতেই দেখতে পেয়েছে বেণু ; সামন্ত সাহেব বারান্দার সিঁড়ির ওপর চুপ করে বসে আছেন। বেণু আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—এ কি? আপনি কখন এসেছেন জ্যাঠামশাই? আপনি সিঁড়িটার উপর কেন বসেছেন? বেণু ব্যস্ত হয়ে একটা মোড়া নিয়ে এসে সামন্ত সাহেবের কাছে রেখে দিয়ে অনুরোধ করেছে, বসুন জ্যাঠামশাই।

সামন্ত সাহেব হেসেছেন—এই তো বেশ বসে আছি। মোড়া-টোড়ার দরকার নেই...হ্যাঁ, তোমার নাম তো বেণু?

--হ্যাঁ।

--বাঃ, খুব ভাল নাম। তোমার দাদার নামটিও বেশ।

--দাদা এখন বাড়িতে নেই।

--ও, বেশ তো, আমি না হয় আর কিছুক্ষণ বসি।

--দাদার কাছে আপনার কিছু...

--না না, কোন কাজ নেই। কিছু বলবারও নেই। এমনিই এলাম।

এক গেলাস জল খেয়েছেন সামন্ত সাহেব, আর বেণুর কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে নিয়ে চুরুট ধরিয়েছেন। চুরুট শেষ হবার পর উঠেছেন।--আমি এখন তবে চলি, বেণু।

আর কোন কথা না বলে, এই সীতাগড় রোড ধরে হেঁটে হেঁটে ফিরে গিয়েছেন সামন্ত সাহেব।

বেণু বলে--আমার কিন্তু দেখতে বড় কষ্ট হয়েছিল দাদা।

সুচরিত--কি বললি? কষ্ট?

বেণু--হ্যাঁ। এত বড়লোক মানুষ, এই ধূলোভরা সিঁড়িটার ওপর একেবারে শান্ত ছেলেমানুষের মত বসে আছেন, দেখতে যে সত্যিই ভয়ানক অদ্ভুত লাগে।

সুচরিত--আমিও তো এই রাস্তা ধরেই ওদিক থেকে এলাম ; সামন্ত সাহেবকে যেতে তো দেখলাম না।

বেণু--তুমি দেখবে কি করে? সামন্ত সাহেব সকালবেলা এসেছিলেন, তুমি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই।

সুচরিত--তাই বল্।

বেণু--কিন্তু কেন এলেন সামন্ত সাহেব?

সুচরিত হাসে--আমি কি করে বলব? সামন্ত সাহেবের কথাটাই ধরে নিতে হচ্ছে, এমনই এসেছিলেন।

ফাল্গুনের বিকেল ; সীতাগড় পাহাড়ের শালবনের বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। পাখির ডাকের মাতামাতি একটু বেড়েছে। দূরের ডাঙার এদিকে ওদিকে পলাশের মাথার ফুল লাল আগুনের স্তবক হয়ে জ্বলছে। সুচরিতের আক্ষেপের প্রাণটাকে কে যেন এরই মধ্যে শালবনের ঠাণ্ডা বাতাস, পাখির ডাক আর লাল পলাশের আভা দিয়ে ভরে দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে যেন দুরন্ত একটা লজ্জাও এসে ভাবনার নিঃশ্বাসগুলিকে এলোমেলো করে দিয়েছে। সামন্ত সাহেব এসে সুচরিতের এই বাড়ির এই সিঁড়ির ধুলোর উপর বসে পড়ে সুচরিতের এই ছ'মাসের উদ্ধত গর্বটাকে যেন নুইয়ে দিয়ে চলে গেছেন। ছি-ছি, এতটা না করলেই ভাল করতেন সামন্ত সাহেব। যেন একটা ঋণী মানুষ ঋণ শোধের সামর্থ্য নেই বলে মহাজনের বাড়ির দরজার কাছে এসে আর চুপ করে বসে থেকে তার অক্ষমতার দুঃখ জানিয়ে দিয়ে চলে গেছে। সামন্ত সাহেবের কাণ্ড দেখে যে এই রকমের একটা ধারণা করতে হচ্ছে। সত্যিই কি তাই? ভাবতে যে সত্যিই কষ্ট হয়। মিথ্যে বলেনি বেণু। কি দরকার ছিল সামন্ত সাহেবের, আজ আবার এরকম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করবার?

বেণুর গলার স্বর যেন হঠাৎ বিস্ময়ে ছটফটিয়ে উঠে ডাক দেয়--ওদিকে তাকিয়ে কি দেখছ দাদা? এদিকে দেখ। অর্চনাদি আসছেন।

ওদিকে সীতাগড়ের শালবনের সবুজ ; কিন্তু এদিকে সত্যিই যে অর্চনা। রাস্তা ধরে এদিকেই আসছে। এ-বাড়িরই দিকে তাকিয়েছে। এসে পড়েছে। চেঁচিয়ে হেসে উঠেছে অর্চনা --বেণু আজও কিন্তু কমলালেবুর ফুল চাই, অনেক ফুল চাই।

বারান্দার উপরে উঠেই একেবারে খুশির ঝরণার মত কল কল হাসির শব্দ ছড়িয়ে কথা বলতে থাকে অর্চনা।--আমি আজই হয়তো আসতাম না। কিন্তু বাবা যে কি-ভয়ানক তাড়া

দিলেন, কি বলব? বললেন, যা আজ এখনই গিয়ে বেণুদের সঙ্গে দেখা করে আয়।

বেণু--আপনি কি এখানে ছিলেন না?

অর্চনা--না আজই এসেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য, তুমি কি জান না যে, আমি আজকাল এখানে থাকি না?

বেণু—না।

অর্চনা--আমার যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে ; তাও জান না?

বেণু—সেটা জানি।

অর্চনা হাসে--কেমন করে জানলে? নিশ্চয় কেউ বলেছে।

বেণু--কেউ একজন তো বলবেই, তা না হলে জানব কি করে? নেমন্তন্ন তো করেননি।

অর্চনা--বড়লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন না হওয়াই ভালো, বেণু।

বেণু হাসে--তা ছাড়া নেমন্তন্ন পেলেই বা কি হতো? বিয়ে দেখবার জন্যে দার্জিলিং পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারতাম না নিশ্চয়।

সুচরিতের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে অর্চনা।—আপনি তাহলে বেণুকে অনেক গল্প শুনিয়ে রেখেছেন?

সুচরিত--আমি বেণুকে কোন গল্পই শোনাইনি।

অর্চনা আশ্চর্য হয়—তবে?

বেণু বলে--দাদা কিছুই বলেনি, একটি কথাও না।

--তবে কোথা থেকে শুনলে? কে বললে?

—বলেছেন সোমেশদা।

--ডাক্তার সোমেশ মিত্তির?

--হ্যাঁ।

--তাই বল। ঠিকই, সোমেশবাবুকে নিমন্ত্রণের চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু...

বেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে অর্চনার চোখে যেন দুর্বার একটা কৌতূহলের জিজ্ঞাসা হাসতে থাকে।—কিন্তু এদিকের খবর কি বেণু? সব ফাঁকা নাকি?

বেণু—কি বললেন?

যেমন ফাঁকা দেখে গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনি ফাঁকা? না ঘরে নতুন কেউ এসে গেছে?

বেণু—কেউ আসেনি।

--এটা কিন্তু একটুও ভাল খবর নয়, বেণু। তোমার দাদা ভদ্রলোক না হয় দুনিয়ার ওপর রাগ করে করে বিয়ের কথা ভাববার সময়ই পাচ্ছেন না ; কিন্তু তোমরা পাঁচজনে মিলে তো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পার।

বেণু—আপনিও তো পারেন।

--নিশ্চয় পারি। বলুন তোমার দাদা ; তারপর দেখুন তোমার দাদা, এক মাসের মধ্যে কেমন ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

বেণু হাসে—বলে দাও দাদা।

সুচরিত হাসে—একটু ভেবে নিয়ে বলতে হবে। এত তাড়াতাড়ি বলা যায় না।

অর্চনা--খুব ভাল কথা। তুমিও সাক্ষী রইলে বেণু। তোমার দাদা একটু ভেবে নিয়ে বলবেন। কি বলেন, সেটা আমাকে চিঠিতে জানিয়ে দেবে।

বেণু—চিঠিতে জানাব কেন? আপনি নিজেই এসে শুনে যাবেন।

অর্চনা—আমি তো এখানে থাকব না ভাই। কালই চলে যাব।

বেণু—কোথায়?

অর্চনা—দিল্লী। ঠিকানা হলো, কেয়ার অব আর কে রয়, প্রতাপপুর হাউস,

কারোলবাগ।...আচ্ছা, এবার আমাকে চলে যেতে বল বেণু।

বেণু--এখনই যাবেন কেন?

অর্চনা--এখনই চলে যাওয়া ভাল। নইলে হয়তো খেতে-টেতে চেয়ে ফেলব, তখন তোমরা বিপদে পড়বে ; বুঝতেই পারবে না, বড়লোকের মেয়েকে কি খাওয়ানো উচিত।...হ্যাঁ, আর একটা কথা।

সুচরিতের মুখের দিকে তাকায় অর্চনা।--আমি একা একা যেতে পারব না। আমাকে পৌঁছে দিতে হবে।

চমকে ওঠে সুচরিত।—কে পৌঁছে দেবে?

অর্চনা--আপনি। আবার কে? সেদিন যেমন পৌঁছে দিয়েছিলেন, আজও তেমনই পৌঁছে দেবেন। আপত্তি করলে শুনব কেন?

বেণুও যেন একটু বিব্রত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়, যেন সরে যেতে চাইছে বেণু। আর সুচরিত যেন দুঃসহ একটা অস্বস্তির ভারে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

কি অদ্ভুত সাজ করেছে সামন্ত সাহেবের মেয়ে। বেণু তো অনেকক্ষণ আগেই দেখেছে আর আশ্চর্য হয়েছে। এবার আশ্চর্য হয় সুচরিত। কারণ, এতক্ষণে বোধহয় অর্চনার সাজের রূপ আর রকমটা সুচরিতের চোখে পড়েছে। খোঁপাতে কোন স্টাইল নেই ; খোঁপাটাকে ভাল করে বাঁধেওনি অর্চনা। যেমন-তেমন করে যেন একগাদা চুলের একটা বোঁচকা করে ঘাড়ের উপর ফেলে রেখেছে। শাড়িটা একটা মোটা আদ্দির ছাপা শাড়ি। পায়ে এক জোড়া রবারের চটি, তাও আবার কালো রঙের। এক আঙুলে একটা আংটি মাত্র আছে ; সারা গায়ে আর কোন অলঙ্কারের চিহ্নও নেই। না কানে, না হাতে, না গলায়। সিঁথিতে সিঁদুরের একটা সরু টান অবশ্য আছে। হাসছে একটা লালচে লাজুক সৌভাগ্যের রেখা।

--আর দেরি করবেন না। ব্যস্তভাবে, একটা অস্থির অনুরোধের মত স্বরে কথা বলে অর্চনা।

বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে যায় সুচরিত। অর্চনাও এগিয়ে এসে, বেণুর দিকে একবার তাকিয়ে আর রুমাল দুলিয়ে হেসে নিয়েই সুচরিতের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

ষোল

কি আশ্চর্য, সামন্ত সাহেবের মেয়েও যে ছোটনদীর কালভার্টের ধূলোভরা রেলিং-এর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রেলিংটা যদি না থাকত, তবে বোধহয় ল্যাম্পপোস্টের কাছে ধূলোভরা ঘাসেরই উপর বসে পড়ত অর্চনা।

অর্চনা বলে—বাস্, আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমি বাকি এইটুকু রাস্তা একাই চলে যেতে পারব।

সুচরিত—কিন্তু ঐটুকু রাস্তাও তো একাই হেঁটে আসতে পারতে।

অর্চনা—না।

--কেন?

--এমনই।

সামন্ত সাহেবের মেয়েও যে ঠিকই সামন্ত সাহেবের মত হেঁয়ালীর ভাষায় কথা বলছে। এতক্ষণ ধরে এতটা রাস্তা হেঁটে আসতে আসতে যে-সব কথা বলেছে অর্চনা ; তার মধ্যে অবশ্য কোন হেঁয়ালী ছিল না। কারোলবাগের বাড়িটা দেখতে চমৎকার। সে বাড়ির বাগানের গাছে গাছে পোষা ময়ূর উড়ে বেড়ায়। রজতের সঙ্গে রোজই একবার বেড়াতে বের হতে হয়। কোনদিন কুতব, কোনদিন হুমায়ুনের কবর, কোনদিন বেশ একটু দূরে—ইন্দ্রপ্রস্থে।

রজত মানুষটাও সোজা মনের মানুষ। যেটা বলতে চায়, সেটা একেবারে স্পষ্ট করেই

বলেই দেয়। খানসামার হাতের রান্না একটুও পছন্দ করে না রজত। কাজেই, জীবনে যা কোনদিন করতে হয়নি, দিল্লীর জীবনে গিয়ে অর্চনাকে তাই করতে হয়েছে। রজতের পছন্দের খাবার অর্চনাকে নিজের হাতে রান্না করে দিতে হয়। রান্না করতে বেশ ভালই লাগে।

—অথচ, বিয়ের আগে মিছিমিছি আবোল-তাবোল কত কথাই না ভেবেছিলাম, আর কত ভয় পেয়েছিলাম!

কথাটা অর্চনার মুখ থেকে যেন একটা খুশির ঝংকার হয়ে উথলে পড়েছে। কথা বলেছে একটা সুখের জীবনের কলরব। শুনে চমকে উঠেছিল সুচরিত ; আর অর্চনার মুখের দিকে একবার তাকিয়েও ছিল।

কিন্তু অর্চনার সে কলরব তো অনেকক্ষণ হলো বন্ধ হয়েছে। অনেকক্ষণ তো বেশ নীরব হয়ে সুচরিতের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে, রাস্তার দু'পাশের ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়েছে। অনেক দূরে ক্ষীরগাঁওয়ের শালবনের মাথার উপর পশ্চিমের আকাশটা যেখানে শেষ বিকালের আলো লেগে লালচে হয়ে উঠেছে, সেদিকেও তাকিয়েছে। আর তো কিছু বলবারও নেই। তবে আবার কালভার্টের কাছে এসে থমকে দাঁড়াবার দরকারই বা কি?

কোন দরকার নেই, এমনিই থমকে দাঁড়িয়েছে অর্চনা। অর্চনার বোধহয় আর কিছু বলবার নেই। সুচরিত নামে এই মানুষটার কাছে আর কিছু জানাবারও নেই। আর কিছু জানতে চাইবারও দরকার নেই। চমৎকার একটি শূন্যতা দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর একটা খামখেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। অতি চতুর একটি ফাঁকি দাঁড়িয়ে আছে। সুচরিতের জীবনের বিনাদোষের একটা নিদারুণ শাস্তি দাঁড়িয়ে আছে।

দুঃসহ। সুচরিতের নিঃশ্বাসটা যেন জ্বলতে থাকে।

অর্চনা হঠাৎ বলে ওঠে—আচ্ছা, আমি এবার যাই।

নিঃশ্বাসের জ্বালা সামলাতে গিয়ে সুচরিতের গলার স্বরটাই জ্বলে ওঠে।—যাও!

কিন্তু এ কি? অর্চনা সামন্তর চোখের পাতা যে জলে ভিজে ভারী হয়ে গিয়েছে। সুচরিতের চোখ দুটোও যেন এই নতুন বিস্ময়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চিকচিক করে কাঁপতে থাকে।—এটা আবার কি রকম কাণ্ড হলো, অর্চনা?

অর্চনা হাসে—কিছুই না।

সুচরিত—কিন্তু কেন?

অর্চনা—এমনই।

সুচরিত হাসে—এস তবে। আমারও তবে আর কিছু বলবার নেই।

সামন্ত সাহেব আর সামন্ত সাহেবের মেয়ে ; সত্যিই দু'জনের কেউ কারও চেয়ে কম নয়। আজ যে সত্যিই দু'জনে একেবারে কাছে এসে আর হাত তুলে সুচরিতের মুখ বন্ধ করে দিল। ধমকের হাত নয়, দুটো সান্ত্বনার হাত।

অর্চনা—তুমি হাসছ কেন?

সুচরিতের সারা মুখটাই যেন এক পরম বিস্ময়ের উপহারে প্রসন্ন হয়ে হাসছে। না, একটুও ফাঁকি নয়। ফাঁকি নেই। ফাঁকি ছিল না।

সুচরিত—আমি যে এমনিতেই সব চেয়ে বেশি পেয়ে গেলাম।

অর্চনা—তার মানে?

সুচরিত—তার মানে কারও কিছু ক্ষতি হলো না ; মাঝখান থেকে আমার একটা চিরকালের লাভ হয়ে গেল। আচ্ছা, আমি চলি।

অর্চনা—কোথায় যাবে?

সুচরিত—যাই...একবার হোসেন সাহেবের গোলাপবাগের হাওয়া খেয়ে ; আর বুড়োকে একটা কবিতাও শুনিয়ে আসি।

অর্চনা--কেন?

সুচরিত--বুড়ো আমাকে মিথ্যে একটা ভয় দেখিয়েছিল ; তারই জবাব দেব।

অর্চনা হাসে--জবাবটা কি?

সুচরিতের চোখ দুটো যেন দুটো স্নিগ্ধ আলোর চোখ। যেন জগৎ ছাড়া একটা গোলাপবাগের দিকে তাকিয়ে কথা বলে সুচরিত--ইশ্‌কা কা, এক রোজ কেয়া, এক বরষ কেয়া?

অর্চনা--তার মানে?

সুচরিত--ভালবাসার একটি দিনও যা, একটি বছরও তা।

অর্চনা--বিশ্বাস করলে তো?

সুচরিত--নিশ্চয়।

সুজাতা

শালবনে ঘেরা এই ছোট শহরের কিনারায় ঐ শান্ত বাংলো বাড়িটার নীরব বাতাস আজকাল যখন তখন গুনগুন ক'রে ওঠে। গুনগুন করে একটা দোলনা-দোলানো আর ঘুম-পাড়ানো গান। কখনো আয়া, আর কখনো বা স্বয়ং চারুই গান করে।

প্রায় এক বছর হলো, একটি দোলনা দুলছে এই বাড়ির ভিতরে। চারুর মনের এতদিনের একটা স্বপ্নই যেন সত্য হয়েছে।

বিয়ের পর প্রায় দশটা বছর ধরে শুধু বই পড়ে পড়ে, কাঁটাকুরুশ নেড়েচেড়ে, সিল্কের আর উলের ফুল তুলে তুলে, আর বাংলোর লনে মরশুমি ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে যেন হাঁপিয়ে পড়েছিল জীবন। তার পরেই এক নূতন বেদনায় চারুর চোখ দুটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেদিন একটা নূতন প্রাণের কান্না বেজে উঠলো চারুর বুকের কাছে, সেদিন যেন নূতন ক'রে হেসে উঠলো চারুর ঐ হাঁপিয়ে-পড়া।

যে চারু যখন-তখন এই বাংলো বাড়ির নিভৃতে যে-কোন একটা সোফায় ঘুমিয়ে পড়তো, ঘুমোতে এত ভালবাসতো যে চারু, সেই চারুই এখন যেন সারাটা রাত জেগে থাকতে ভালবাসে। কারণে অকারণে আর যখন-তখন ছোট্ট একটি এক বছর বয়সের মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালই লাগে চারুর। ব্যাপার দেখে হেসে ফেলে উপেন। ঘুম ভাঙালে এত রাগ করতো যে ঘুম-কাতুরে চারু, সে আজ কেমন জব্দ হয়েছে।

চারুও বলতে ছাড়ে না।—মশাই বা কি কম জব্দ হয়েছেন।

উপেন বলে—আমার জব্দের কি দেখলে?

চারু—অফিস থেকে আর ক্যাম্প থেকে এখন সন্ধ্যের আগেই ঘরে ফিরতে হচ্ছে কি না?

উপেন আর প্রতিবাদ করে না। করতে ইচ্ছাও করে না। চারুই আবার একটা পুরনো অভিমানের জের টেনে হেসে হেসে কথা শোনায়।—যাক্, তবু যে মেয়ের টানে তাড়াতাড়ি করে ফিরছো, এটাও কি আমার কম ভাগ্যির কথা।

উপেন—শুধু কি মেয়ের টানে?

চারু—রাখুন মশাই, আর কথা বাড়াবেন না। সে-সব কথা কিছুই ভুলি নি। রাত ন'টা পর্যন্ত অফিসের ফাইল না ঘাঁটলে ঘুম আসতো না যার চোখে, ঘরে যে একটা মানুষ আছে সে কথা ভুলেও একবার ভাবতে পারতো না যে মানুষ....।

উপেন—কিন্তু ন'টা বছর ধরে অফিস যেতে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন আমাকে লেট হতে হয়েছে কেন, কিসের টানে?

চারুর একটা হাত টেনে ধরতেই উপেনের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে চারু, কিন্তু পারে না। হেসে ফেলে চারু। আজ-কাল এই বাংলো বাড়ির ভিতরে প্রতি সন্ধ্যাতেই এই রকমই হাসির ঝঙ্কার বেজে ওঠে। দোলনার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে দুজনেই তাকিয়ে থাকে।

এখনো এক বছর বয়স হয় নি, কিন্তু উপেন ও চারুর ভালবাসার জীবনের যে স্বপ্ন আজ স্নিগ্ধ সুন্দর ও কোমল একটি ফুলের মতো রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে আর দোলনায় দুলছে, তার একটা নামও দিয়ে ফেলেছে চারু। ওর নাম রমা।

উপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যের কথা বলতে গিয়ে ঝক্ ক'রে হেসে উঠে চারুর চোখ।—স্বপ্নের মধ্যেই হঠাৎ ঐ নাম ধরে মেয়েটাকে ডেকে ফেলেছিলাম, তাই।

যখন-তখন দোলনার কাছে এসে ঘুমন্ত রমাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে বসে থাকে চারু। রমার গালে গাল ঠেকিয়ে দুর্নিবার এক আদরের আবেশে যেন মুগ্ধ হয়েই ডাকতে

থাকে চারু—রমা রমু রমু। রমা, এই ডাকটা যেন চারুর বুকের ভিতর থেকেই মধুরতার বিহ্বল শোণিতের শিহর হয়ে আপনা থেকেই ভাষা হয়ে ফুটে উঠেছে।

আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখতে থাকে উপেন। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে হিংসুকের মতো একটা আগ্রহ নিয়ে।

--দাও, দাও ; ওকে আমার কাছে দাও। তুমি ঐ সোফায় বসে এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

চারুর হাত থেকে রমাকে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতর পায়চারি ক'রে বেড়ায় উপেন।

বৃথাই একটা আয়াকে রাখা হয়েছে। নানা কথার মাঝখানে উপেন হঠাৎ আক্ষেপ করে--তুমিই যদি দিনরাত এটাকে ঘাঁটা-ঘাঁটি করবে, তবে পয়সা খরচ ক'রে আয়া রাখবার দরকার কি?

চারু বলে--ওসব স্টাইল আমার সহ্য হবে না। আয়া রাখবার দরকার নেই। আয়া-ফায়ার হাতে মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারবো না।

ঠিক কথা। এক বছরের মধ্যে শুধু মাঝে মাঝে দোলনা দোলানো ছাড়া আয়াকে আর কোন কাজ করতে দেয় নি চারু। আয়ার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে চারুর অন্তরাত্মা।

উপেন অনুযোগ করলে চারু প্রতিবাদ করে--না, না, এ কাজ পরকে দিয়ে হয় না।

--কেন?

--কেন আবার কি? নিজের মনের আনন্দকে যেমন পরকে দিয়ে হাসিয়ে নেওয়া যায় না। তোমার পয়সা বাঁচাবার ইচ্ছে থাকলে আয়াকে বিদায় ক'রে দিতে পার।

এই ভাবেই রমা নামে মাত্র এক বছর বয়সের শিশু ঐ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে এই বাংলো বাড়ির হাসি গান অভিযোগ আর ঝগড়া সবই যেন মিষ্টি সুরে বাজে। ঐ রমারই জন্মদিন দেখা দিল একদিন। শালবনে ঘেরা ছোট শহরের কিনারায় রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনের বাংলো বাড়ির লনের উপর উৎসবের আয়োজন রঙীন হয়ে উঠলো।

মাইল পাঁচেক দূরে এক পাহাড়ী নদীর স্রোতের উপর রেলওয়ের জন্য ব্রিজ নির্মাণের পর্ব চলছে এখন। বিকাল হবার আগেই ঘরে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো উপেন। ক্যাম্পের অফিসের খাতাপত্র সই করে বাইরে এসে দাঁড়ায় উপেন। ওভারশিয়ার এসে সম্মুখে দাঁড়ায়।

ওভারশিয়ার খুশি মনে জানায়—সংবাদ আছে স্যার।

সুসংবাদ এই যে, কাজ ছেড়ে দিয়ে আর কোন কুলি পালিয়ে যায় নি। কারণ কলেরার ভয় কমে গিয়েছে, ডাক্তার এসে পড়েছে। ওষুধ-পত্র দেওয়া হয়েছে। জল ফিলটার করার ব্যবস্থা হয়েছে। মাত্র দুটো মৃত্যু হয়েছে কাল রাত্রে। আর নতুন করে কোন কেসও হয় নি, মৃত্যুও হয় নি।

খুশি মনে ট্রলির উপর উঠে বসে উপেন। পা চালায় ট্রলিম্যান। ছাতার ছায়ায় বসে উপেন দু'পাশের ফোটা-পলাশের শোভা দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পরেই নিজের হাতের ফাইলের ভিতর থেকে ছোট একটি ফটো বের ক'রে মুগ্ধ চোখের সামনে তুলে ধরে এক বছর বয়সের একটি মেয়ের মুখের ছবি। হেসে ওঠে উপেনের সারা মুখ।

বাংলোর বারান্দায় যখন উপেনের পায়ের শব্দ বেজে উঠলো তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। লনের উপর টেবিল সাজাতে আরম্ভ করেছে বয় আর বেয়ারা। আর, ঘরের ভিতর আয়ার সঙ্গে চারুর তর্ক চলছে।

আয়া বলে—বেবিকে আমার কাছে এখন দাও মেমসাব। তুমি তোমার কাজ কর।

চারু বলে—আমার আবার কাজ কি এখন?

আয়া বাইরের বারান্দার দিকে চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে--শুনতে পাচ্ছ না, সাহেব এসে পড়েছেন।

হ্যাঁ, শুনতে পায় চারু, বারান্দার দিক থেকে উপেনের পায়ের শব্দ ধীরে এই ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। রমাকে নিয়ে আয়া চলে যেতেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করে উপেন।

গলার টাই-কলার খুলতে খুলতে উপেন একটা ধূর্ত দৃষ্টি তুলে চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে--আজ তাহলে তোমার মেয়ের জন্মদিন।

চারু--আজ তোমার মেয়ের জন্মদিন।

উপেন--তার পর?

চারু--তার পর মানে?

উপেন--তার মানে আর এক বছর পর?

চারু--আবার জন্মদিন হবে রমার।

উপেন--আমি জানতে চাই, প্রত্যেক বছর কি শুধু রমারই জন্মদিন হবে?

চারু ভ্রূকুটি করে--সাবধান।

উপেন--কি?

চারু--আর নয়। একটিকে নিয়েই মায়ার জ্বালায় মরছি, চোখের ঘুম পর্যন্ত ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে. এই একটিই ভাল। রক্ষে করুন ভগবান, আর চাই না।

গায়ের শার্ট খুলে হুকের সঙ্গে দুলিয়ে দিয়ে চারুর মুখের দিকে তাকাতেই চারুর চোখে পড়ে একটি জিনিস। উপেনের কনুইয়ের কাছে সুতো দিয়ে একটি মাদুলি।

চমকে ওঠে চারুর চোখ--সর্বনাশ! ওটা তুমি এখনো পরে রয়েছো?

ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে এবং মাদুলিটাকে খুলে ফেলবার জন্য হাত বাড়ায় চারু, কিন্তু উপেন সরে যায়।--থাক না, তাতে কি হয়েছে?

চারু--না আর নয়।

উপেন--কি যে বল? পিসিমার দেওয়া এমন একটা পয়া জিনিস, গুরুজনের ইচ্ছের অমান্যি করতে নেই। একদিন তুমিই না রাগ করেছিলে, এই মাদুলি পরতে চাইনি বলে?

চারু--আর রাগ করবো না।

উপেন--কেন?

চারু--মাদুলির কাজ তো হয়েই গিয়েছে।

উপেন সরে যায়, কিন্তু চারু ছাড়ে না। স্বামী-স্ত্রীতে একটা ধস্তাধস্তির মত ব্যাপার বেধে ওঠে এই বাংলো বাড়ির এক কক্ষের নিভৃতে।

--না, আর নয়, রক্ষে করুন ভগবান। বলতে বলতে সজোরে উপেনের হাতটা চেপে ধরে মাদুলিটা এক টান দিয়ে খুলে ফেলে চারু, আর ব্লাউজের গলার ফাঁক দিয়ে টুপ ক'রে ফেলে দেয়। সরে যায় চারু।--বেঁচে থাক আমার ঐ একটিই, আর চাই না।

যেন পাল্টা একটা মিষ্টি প্রতিশোধ নেবার জন্য চারুর কাছে এগিয়ে আসতে থাকে উপেন। অকস্মাৎ বাইরের বারান্দায় ধ্বনিত হয় একটা কণ্ঠস্বর। হুজুর!

বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ায় উপেন। উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

আবার ডাক শোনা যায়।--হুজুর!

জানলার কাছে এগিয়ে এসে কৌতূহলের চক্ষু নিয়ে বাইরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে উপেন, চারু প্রশ্ন করে--কি?

উপেন--একটা মেয়ে।

চারু বিস্মিত হয়--মেয়ে?

উপেন--হ্যাঁ, রমার মতনই।

চারু--তার মানে?

উপেন--এই এক বছর বয়স, সামান্য কিছু বেশিও হতে পারে, এইটুকু একটা মেয়ে।

বারান্দার প্রান্তে এক কোণে একজন চৌকিদার আর দুজন দীন দরিদ্র চেহারার কুলি শ্রেণীর মানুষ দাঁড়িয়েছিল। আর, বারান্দায় মেজের ওপর শোয়ানো ছিল এক টুকরো ছেঁড়া কম্বলে জড়ানো দেড় বছর বয়সের একটা ঘুমন্ত মেয়ে।

ধমকের মত কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করে উপেন।--কি চাও!

চৌকিদার--এই মেয়েটার কি হবে হুজুর?

উপেন--তা আমি কি জানি। ওটা কার মেয়ে?

একজন কুলি--আপনার ট্রলি-কুলি বুধনের মেয়ে।

উপেন--বুধন? সেই ভল্লুকে আঁচড়ানো মুখ, রোগা লোকটা?

কুলি--হুজুর।

উপেন--লোকটা কি পালিয়েছে?

চৌকিদার--মরেছে।

উপেন--অ্যাঁ?

চৌকিদার--লোকটা মরেছে, লোকটার বউটাও মরেছে।

উপেন--কেমন ক'রে?

চৌকিদার--কলেরাতে।

উপেন--কিন্তু, আমার অপরাধটা কি হলো? এখানে ওদের মেয়েকে নিয়ে এসেছ কেন?

চৌকিদার--কোথায়, কার কাছে থাকবে মেয়েটা?

ধমক দেয় উপেন--আমি কি জানি।..যাও যাও। সরে পড়।

মোটর গাড়ির হর্ন শোনা যায়। রমার জন্মদিনের উৎসবে নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসতে আরম্ভ করেছে। উপেন আরও ব্যস্ত হয়ে হাঁক দেয়--যাও যাও, চলে যাও। এখানে এসে গোলমাল করো না।

ব্যস্তভাবে একটা শার্ট গায়ে চড়িয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় উপেন, উৎসবের আসরে অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করার জন্য। চৌকিদার আর কুলি দুজনে কম্বলে জড়ানো শিশুকে নিয়ে লনের আর এক প্রান্তের শেষ কোণে এক গাছের তলায় গিয়ে বসে থাকে।

এতক্ষণ ধরে অপলক চোখ নিয়ে আগন্তুক মেয়েটার দিকে দেখছিল চারু। মাঝে মাঝে ছটফট করছিল চোখ দুটো। উপেন চলে যেতেই, কেন যেন ব্যস্তভাবে একবার ডাক দিল চারু--আয়া, আয়া।

আয়া আসতেই আবার বারান্দায় এসে দেখতে পায় চারু, চলে গিয়েছে লোকগুলি।

আয়া প্রশ্ন করে--কি?

চারু--কিছু না।

আয়ার হাত থেকে রমাকে কোলে নিয়ে লনের উপর সাজানো আসরের দিকে এগিয়ে যায় চারু।

চায়ের আসর। অভ্যাগতরা রমাকে আদর করলেন। একটা টেবিলের উপর নানা উপহারের এক স্তূপ তৈরি হয়ে গেল। বয় চা পরিবেশন করে। অভ্যাগতেরা আলাপ করেন।

মাত্র দশ বার জন অভ্যাগত। কতিপয় মহিলাও আছেন। সকলেই সম্পন্ন সমাজের মানুষ। কেউ অফিসার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ জমিদার। একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, বেশির ভাগ অভ্যাগতেরই সঙ্গে একটি ক'রে কুকুর। কারও কোলের উপর সুন্দর একটি তিব্বতী পুড্‌ল। কেউ শিকল ধরে কাছে টেনে রেখেছেন তাঁর হাউণ্ড আর টেরিয়ারকে।

কারও স্প্যানিয়েল সামনের দু'পা দিয়ে প্রভুরই গলা জড়িয়ে অনবরত কান দোলায়।

নিজের নিজের কুকুরের প্রতি কার কত মায়া তাই নিয়ে একটা আলোচনার কলরব জাগে আসরে। কার কুকুর কি খেতে ভালবাসে আর কত বুদ্ধিমান, ব্যাখ্যা ক'রে বলতে থাকেন অভ্যাগতেরা। সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রীতির কাহিনী বর্ণনা করে এস-ডি-ও চক্রবর্তী। কুকুরের মুখের কাছে একটি বিস্কুট এগিয়ে দেন চক্রবর্তী। কুকুরটা কামড় দিয়ে বিস্কুট ভাঙে। সেই ভাঙা বিস্কুট নিজের মুখেই ফেলে দিয়ে চক্রবর্তী বলেন--আমার টম সারা রাত আমার বুকের উপরেই শুয়ে থাকে। এ যে কি মায়া, সেটা আর বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আশ্চর্য, কোথা থেকে এরকম মায়া আসে মানুষের মনে!

আসরের চায়ের টেবিলের কাছে কখনো বসে, আর কখনো ঘুরে বেড়াতে থাকে উপেন আর চারু। এরই মধ্যে হঠাৎ মাঝে মাঝে দুজনেরই চোখের দৃষ্টি ছুটে যায় লনের প্রান্তে একটা গাছতলার দিকে, যেখানে তখনো চুপ ক'রে বসে আছে চৌকিদার, সেই দুজন কুলি, আর ঘাসের উপর শোয়ানো ও কম্বলে জড়ানো সেই শিশু।

মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যায় উপেন আর চারু। একটা অস্বস্তির ভাব হঠাৎ বিচলিত করে চোখের দৃষ্টি। তারপর আবার প্রসন্ন হাস্যে অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ করে।

বেয়ারাকে কাছে ডেকে উপেন দূরের গাছতলার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেয়--ওদের চলে যেতে বল।

চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন--কে ওরা?

উপেন--কোথা থেকে একটা বাচ্চাকে নিয়ে এসে বলছে...।

সাগ্রহে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান চক্রবর্তী--লেপার্ডের বাচ্চা?

উপেন--না।

চক্রবর্তী--হরিণের? আমি জীবজন্তুর বাচ্চা বড় ভালবাসি মিস্টার রায়।

উপেন হাসে--না, না, হরিণের বাচ্চা-টাচ্চা নয়।

গাছতলার দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ব্যস্তভাবে চক্রবর্তী বলেন--ভালুকের বাচ্চা বোধ হয়?

উপেন বাধা দিয়ে বলেন--মানুষের বাচ্চা।

--মানুষের বাচ্চা! হতাশ হয়ে আর যেন ক্ষুদ্র একটি তুচ্ছতার ধিক্কার ধ্বনিত ক'রে বসে পড়েন চক্রবর্তী!

উৎসবের আসর ভাঙতেই লনের প্রান্তে গাছতলায় বেয়ারার গর্জন শুনে এগিয়ে যায় উপেন আর চারু। উপেন বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করে চৌকিদারকে বলে--এই নাও, আর এই মুহূর্তে ঐ বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যাও!

চৌকিদার বলে যাব কোথায় হুজুর? এই মেয়েকে এই তল্লাটের কেউ ঘরে রাখতে রাজী হবে না।

--কেন?

--খুব ছোট জাতের মেয়ে। কাছাকাছি দশ গাঁয়েও ঐ জাতের কোন লোক নেই।

--অন্য গাঁয়ে খোঁজ কর।

--করবো হুজুর, কিন্তু সেই কটা দিন কোথায় থাকবে মেয়েটা?

একজন কুলি বলে--মেয়েটাকে তো শিয়ালে নিয়েই যাচ্ছিল, ভাগ্যিস আমরা হঠাৎ পৌঁছে গেলাম।

চারুর চোখ আতঙ্কে ও বেদনায় শিউরে ওঠে। উপেনও যেন অস্বস্তি আর অপ্রস্তুত অবস্থায় বার বার চারুর মুখের দিকে তাকাতে থাকে।

উপেন আমতা আমতা ক'রে চারুকে উদ্দেশ্য ক'রেই বলে, যেন একটা পরামর্শ খুঁজে :—তাহলে...যাক্‌গে...এসব ঝঞ্ঝাট...কি বল...নিয়েই যাক।

চারু—কিন্তু...কি বলছো তুমি? শেয়ালে নিয়ে যাবে মেয়েটাকে?

উপেন—না, তা বলছি না! কিন্তু...।

চারু ডাক দেয়—আয়া।

উপেন যেন এতক্ষণে সাহস পেয়ে আরও জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—আয়া। আয়া আসতেই চারু বলে—মেয়েটাকে কটা দিন পুষতে পারবে?

আয়া—পারবো না কেন, আমার কাজই তো তাই।

চারু—তাহলে নিয়ে চল মেয়েটাকে...গরম জল দিয়ে চান করিয়ে একটা গরম জামা কাপড় পরিয়ে দাও এখনই।

চৌকিদার ও কুলিরা খুশি হয়ে আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম জানায়—সেলাম সাব, সেলাম মেমসাব।

উপেন আর চারু দুজনেই যদি নিজেই নিজের মনটাকে চিনতে পারতো, তবে বোধ হয় দুজনে আজই সাবধান হয়ে যেত, এবং অরণ্য শ্বাপদের শাবকের মত অতি ছোট জাতের একটা মেয়েকে এই বাংলো বাড়ির এক নিভৃতে প্রাণ-বাঁচানোর একটা আশ্রয় দিত না। উপেন জানে চারুও বিশ্বাস করে, এই ঝঞ্ঝাট মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য। তারপর, নিকটে বা দূরের গাঁয়ের ঐ জাতের কোন লোক খুঁজে বের ক'রে মেয়েটাকে তার হাতে গছিয়ে দিতে হবে। তার জন্য হয়তো কিছু টাকা চাইবে লোকটা। নিক না, একশো বা দুশো টাকা নিয়ে কোন জাতের লোক যদি মেয়েটাকে পুষতে নিয়ে যায়, তবে ভালই তো। চৌকিদার বলে গিয়েছে, জাতের লোক খুঁজে আনবে। উপেন বলে দিয়েছে—যত শিগগির পার নিয়ে এসো।

এই বাংলো বাড়ির সীমার মধ্যে একটা মানুষের মেয়ের আবির্ভাবকেও অতি সাধারণ একটা ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে চারু আর উপেন। বাড়ির দেওয়ালের খোপের মধ্যে যেমন ক'দিনের জন্য নতুন শালিক এসে ঠাঁই নেয়, আবার ক'দিন পরেই উধাও হয়ে যায়, তেমনি একটা ঘটনা মাত্র। মেয়েটা আছে, ক'দিন পরে কেউ এসে নিয়ে যাবে, ব্যস্‌, এর চেয়ে বেশি কিছু চিন্তা করার ব্যাপার এর মধ্যে নেই।

ক্লাবের ঘড়িতে যখন রাত নটার ইঙ্গিত ঢং ক'রে বেজে ওঠে, তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার লাঠি মাথায় উপেন, আর ঘরে ফিরে যাবার কথা মনে পড়ে।

বাংলো বাড়ির দুই কক্ষে তখন দুটি শিশু-জীবনের ঘুমন্ত রূপ নিঃশব্দে ফুটে রয়েছে। একটি ঘরে চারুর বুকের কাছে ঘুমন্ত রমা, পীযূষভারে কোমল একটি উত্তাপের মধ্যে নীড়ের সুখসুপ্ত হয়ে রয়েছে একটি শিশু মেয়ে। আর, অন্য একটি ঘরে আর একটি শিশু মেয়ে, নতুন বিছানায় একা একা ঘুমোয়, তার তৃষ্ণার্ত অধরের কাছে দুধের বোতল শিথিলভাবে পড়ে রয়েছে। একটি শিশু হলো এই বাড়ির এক দম্পতির শোণিতস্নেহের সৃষ্টি। আর একটি শিশু—দেখে মনে হয়, এই পৃথিবীতে যেন একা একা হঠাৎ চলে এসেছে, এখনো মানুষের কোল পায়নি। বাংলো বাড়ির দেয়ালঘড়িতে একতারার সুরের টোকার মত রিম-রিম ক'রে সময়ের সঙ্কেত বাজে। চমকে ওঠে চারু, তন্দ্রা ভেঙে যায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গী করে, আর আপন মনেই আক্ষেপ করে—ইস, ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান আর কোন দিন হবে না। ন'টা বাজলো, এখনো ঘরে ফেরার নাম নেই।

কি যেন মনে পড়ে যায় চারুর। ধীরে ধীরে ওঠে। পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। এই বারান্দা আর ও-বারান্দা পার হয়ে ছোট একটি ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় ঠেলা দেয়। দেখতে পায়, মেজের উপর পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে আয়া। তারপরেই ঘরের আর এক

প্রান্তে দৃষ্টি ছুটে যায়। দেখতে পায়, সদ্য ফোটা ফুলের কুঁড়ির মত একটা ঘুমন্ত মেয়ের মুখ, তার ঠোঁটের কাছ থেকে সরে গিয়েছে দুধের বোতল। একটা স্নেহশীল শীতল ও কঠিন জড় পদার্থ ঐ বোতলটা।

যেন মনের ভুলেই হঠাৎ দুধের বোতলটাকে মেয়েটার মুখের কাছে এগিয়ে দেবার জন্য হাত তুলে এগিয়ে যায় চারু। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়ায়। থাক, এতটা বাড়াবাড়ির দরকার নেই। তাছাড়া একটা ছোট জাতের বাচ্চাকে ছোঁয়াছুঁয়ি করারও দরকার মনে পড়ে না। আয়াকেই ডাক দেয় চারু। ঘুম থেকে উঠে আয়াই নিজের হাতে দুধের বোতলটাকে মেয়েটার মুখে ছুঁইয়ে দেয়।

পায়ের শব্দ বাজে বাইরের বারান্দায়। ফিরে এসেছে উপেন। সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে হাঁক দেয় উপেন--সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি এরই মধ্যে!

চারু এসে বলে--কি বললে?

উপেন--মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

চারু--রমাও ইঞ্জিনিয়ারিং করে নাকি, যে রাত ন'টা পর্যন্ত জেগে থাকবে।

উপেন--আমি তোমার মেয়েটার কথা জিজ্ঞাসা করছি না। ঐ যে, নতুন একটি অম্বালিকা এসেছে...সেই মেয়েটা।

চমকে ওঠে চারু--বেশ তো, মুখে মুখে সুন্দর একটা নামও দিয়ে ফেললে দেখছি।

উপেন--হ্যাঁ, নামটা হঠাৎ মুখে এসে গেল, কি করবো বল? রমার নামটাও তো তুমি হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে বলে ফেলেছিলে, না?

গম্ভীর হয় চারু--হ্যাঁ।

উপেন--কি করছে অম্বালিকা?

চারু--আয়ার ঘরে ঘুমোচ্ছে।

যে পিসিমার দেওয়া মাদুলি নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হাসাহাসির ব্যাপার হয়ে গেল, তিনি হলেন উপেনের দূর সম্পর্কের পিসিমা। শ্যামবাজারে এখনো সেকেলে ঢঙের চক-মিলান যে-সব দালান বাড়ি দেখা যায়, এবং তারই মধ্যে যে-বাড়িটা আজও পুরনো সৌষ্ঠব নিয়ে অটুট রয়েছে, সেই বাড়িটা হলো পিসিমার বাড়ি। পিসিমারই সম্পত্তি। সংসারে একটি মাত্র স্নেহের দায় আছে পিসিমার, তার নাম অধীর। পিসিমার নাতি। পিসিমার একমাত্র মেয়ের একমাত্র ছেলে। মেয়ে মারা যাবার পর এই নাতিকে কোলে নিয়ে শোক ভুলেছিলেন পিসিমা।

অসুস্থ শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য, অর্থাৎ চিকিৎসকের নির্দেশে হাওয়া বদল করতে মাঝে মাঝে ছোটনাগপুরের শালবনের কোলে ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁষা, সুবর্ণরেখার এক স্রোতের ধারে এই ছোট রেল টাউনে এসে আত্মীয় উপেনেরই এই বাংলো বাড়িতে থেকে যেতেন পিসিমা। পিসিমা এখানে এসেও নাতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে মাঝে মাঝে সংসারের মায়ার তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতেন। চারুর ছেলে-পিলে হয় না, চারুর সংসারটাকেই তাই বড় মায়াহীন আর শূন্য বলে মনে হয়েছিল পিসিমার। কিন্তু এইবার খুশি হয়েছেন, এতদিনে এই বাড়ির বুকে এক শিশুর কান্নায় সংসারের মায়া জেগে উঠেছে। সার্থক হয়েছে তাঁর মাদুলি।

সেই কবে, মাত্র দু'মাস বয়সের রমাকে আদর করে একদিন চলে গেলেন পিসিমা। যাবার আগে অনেক কথাই বলে গেলেন পিসিমা। কলকাতায় কবে বাড়ি করবে উপেন, কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন। সমাজের কথা বলেন, এইটুকু শিশু রমারও ভবিষ্যতের অর্থাৎ বিয়ের কথা বলেন। নিজের বংশগর্বের উল্লেখ ক'রে উপেনকে স্মরণ করিয়ে দেন, রমাকে বড় বংশের ঘরে দিতে হবে। বংশে বড়, বিষয়ে বড়, শিক্ষায় বড়, এমনই একটি ঘরে। পিসিমার কথার

মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যেন একটা উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং মনে হয়, বড় বলতে তিনি তাঁরই ঘরের কথা বলছেন। উপেনের টাকাকড়ি বেশ আছে, পিসিমা ভুলতে পারেন না সেই সত্যও।

কলকাতা থেকে এক বিখ্যাত কথকঠাকুরকে নিয়ে এসে এইখানেই এক বছর বয়েসে রমার জন্মমাসের সারা মাসটাই বেশ ঘটা ক'রে চণ্ডীপাঠ করাবেন, এই আনন্দের একটা ইচ্ছা জানিয়ে চলে গিয়েছেন পিসিমা। কিন্তু আজও আসতে পারেন নি। মাসটা যে শেষ হতে চললো? কেন এলেন না পিসিমা? তিনি কি আবার বাতের ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছেন? চিঠি দেওয়া হয়েছে পিসিমাকে, কিন্তু সেই সে চিঠির উত্তর আজও এল না কেন?

উপেন আর চারুর চিন্তার প্রশ্নগুলিকে নিশ্চিত ক'রে দিয়ে সেদিনই কলকাতা থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে উপস্থিত হলেন সেই বিখ্যাত কথকঠাকুর। গঙ্গাজল ভরা প্রকাণ্ড একটা তামার কলসী নিজের হাতেই বহন করে স্টেশন থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন পিসিমার চিঠি। নাতি অধীরের পরীক্ষা, তাই আসতে পারলেন না পিসিমা।

কথকঠাকুর বললেন—কথকতা আমার পেশা নয়। আমি সত্যিই কথক নই। বলতে পারেন, ধর্মপ্রবক্তা। আমি ইংরাজীর অধ্যাপক। চণ্ডীপাঠ করি নিজের মনের তৃপ্তির জন্য, এবং যারা ধর্মের তত্ত্ব একটু করে বুঝতে চায়, তাদের জন্য। শুনে একটু যেন ঘাবড়েই যায় উপেন, এবং সত্যিই বোকা ছাত্রের মত একটু ভয় পেয়ে বলে ফেলে—নিশ্চয় কষ্ট করে বুঝতে চাই স্যার। থাকুন আপনি, আর যতদিন ইচ্ছে চণ্ডীপাঠ করুন।

অধ্যাপক বলেন—শুনেছি জায়গাটার হাওয়া বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ, অন্তত পনরটা দিন থেকে দেখি শরীরটা একটু...অর্থাৎ চণ্ডীর অন্তত দুটো অধ্যায় সমাপ্ত করার পর...

কিন্তু কি আশ্চর্য, মাত্র আর একটা ঘণ্টা পরেই দেখতে পায় উপেন ও চারু, ইংরাজীর অধ্যাপক গঙ্গাজলের সেই প্রকাণ্ড কলসীটা হাতে নিয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। উপেন ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—সে কি? আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

অধ্যাপক তাঁর কপালে টোকা দিয়ে বলেন—যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যেতে হলো। আপনার আয়ার কাছে শুনলাম এবং স্বচক্ষেও দেখলাম। আপনি একটা অন্ত্যজের মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসে লালন করছেন।

উপেন—আশ্চর্য!

অধ্যাপক—আশ্চর্য হতে নেই উপেনবাবু। ধর্মবিধিতে বলে, অন্ত্যজের স্পর্শই শুধু দোষাবহ নয়, তার সান্নিধ্যও দোষাবহ। শুধু ছোঁয়াছুঁয়ি নয়, ওসব বস্তু নিকটে রাখাও চলে না। আপনি শিক্ষিত বিদ্বান্ মানুষ, নিশ্চয় জানেন যে, সায়েন্সেও ভয়ের কথা লেখা আছে।

উপেন—কি কথা?

অধ্যাপক—অন্ত্যজ মানুষের শরীর থেকে একরকমের গ্যাস বহির্গত হয়, সে গ্যাস সদ্বংশীয়ের দেহ মন ও আত্মার ক্ষতি সাধন করে।

উপেন—এরকম গ্যাস কি কখনও দেখতে পাওয়া গেছে?

অধ্যাপক—না। আপনি কি কখনো ভাইটামিন দেখেছেন? ভাইটামিন চক্ষে দেখতে পাওয়া যায় কি?

উপেন—না।

অধ্যাপক হাসেন—তাহলে ভাইটামিন কি মিথ্যা?...আচ্ছা, আসি, বিদায় নিতে আজ্ঞা দিন তাহলে।

চলে গেলেন ধর্ম্মপ্রবক্তা অধ্যাপক। চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করতে গিয়েই হেসে ফেলেন উপেন। কিন্তু চারু হাসতে পারে না। চারু বলে—আমার সত্যিই কেমন ভয় করছে।

উপেন—কিসের ভয়? অম্বির শরীর থেকে যে ভয়ানক গ্যাস বের হয়ে আমাদের দেহ মন ও আত্মার একেবারে!...

চারু—ঠাট্টা ছেড়ে দাও। ভদ্রলোক একটি বেলাও না থেকে, মুখে একটু জলও না দিয়ে চলে গেলেন, এটা কি ভাল হলো?

উপেন—আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলবো, খুব ভাল হলো। এই সব গোবর মাখানো সায়েন্সকে যারা বিশ্বাস করে তাদেরই অকল্যাণ হয়। ঐরকম লোকের কাছ থেকে চণ্ডীর ব্যাখ্যা শুনেও কোন কল্যাণ হয় না।

হ্যাঁ, একটা কথা ভাবতে খারাপ লাগছে উপেনের। পিসিমা দুঃখিত হবেন। পিসিমা খুব বেশি রাগ করেও ফেলতে পারেন। যাই হোক, পিসিমার পক্ষে বেশি দিন রাগ ক'রে থাকা সম্ভব হবে না। কারণ, যাকে নিয়ে এই সমস্যা, সে আর এখানে কতদিন?

স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা। একটা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা। এই আলোচনা শুনলে মনে হয় দুটি মানুষ যেন নিজের মনটাকে সন্দেহ করতে পারছে।

উপেন বলে—সমস্যাটা কি জান? কুকুর বেড়ালও দশটা দিন কাছে থাকলে মায়া পড়ে যায়। আর এটা তো হলো মানুষের মেয়ে। ছোট জাতের হোক, আর যারই হোক, একটা মানুষের বাচ্চা তো বটে। বেশিদিন কাছে রাখা উচিত নয়।

চারু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে—ঠিক বলেছো। আমি আয়াকে বলে দিয়েছি। মেয়েটাকে দূরে দূরে রাখবেন।

উপেন—হ্যাঁ, ওসব জিনিসের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি ছোঁয়াছুঁয়ি না হওয়াই ভাল।

চারু—জাতটাও তো ভাল নয়।

উপেন—আসল কথা হলো, ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই একটা মায়া পড়ে যেতে পারে।

এই আলোচনা শুনলে মনে হয়, নিজের নিজের মনকে চিনতে পেরেছে দুজনেই, তাই আগে থেকেই সাবধান হবার জন্য যেন প্রতিজ্ঞা করছে দুজনে।

আবার স্মরণ করিয়ে দেয় চারু—চৌকিদারকে তাড়া দাও, যেন তাড়াতাড়ি জাতের লোক নিয়ে আসে আর মেয়েটাকে নিয়ে যায়।

ক'দিন পরের ঘটনাতেই কিন্তু প্রমাণিত হয়ে যায়, নিজের নিজের মনকে চিনতে ভুল করেছে দুজনেই। একটা পরের মেয়ে তাকে ছোঁয়াও উচিত নয়, কারণ ছোঁয়াছুঁয়ি হলে মায়া পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এই মায়া এড়াবার শক্তি দুজনের কার কতখানি আছে, সেটা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারে নি দুজনের একজনও। এত যুক্তি বুদ্ধি খাটিয়ে যে প্রতিজ্ঞা করলো দুজনে, সেই প্রতিজ্ঞাটাই ঠুনকো কাচের মত ছোট একটি ঘটনায় ভেঙে গেল, আর তার ফল এই হলো যে, দুজনেই দুজনের উপর রাগ ক'রে আর অভিযোগ ক'রে আর একটা সমস্যা সৃষ্টি ক'রে বসলো।

সাতদিনের জন্য দূরের একটা লাইন দেখার জন্য সফরে বের হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার উপেন। ফিরে এসে যখন বাংলো বাড়ির ফটকে প্রবেশ করে উপেন, তখন দেখতে পায়, আয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আয়ার কোলে একটা বাচ্চা মেয়ে।

চেঁচিয়ে ডাক দেয় উপেন—রমা, রমু, রমু। আয়া কাছে আসছে না দেখে হাত তুলে ইঙ্গিতে কাছে আসতে বলে। আয়া কাছে আসতেই উপেনের দুই চক্ষু যেন একটা স্পর্শে হেসে ওঠে...অ্যাঁ, এটা কে রে? এটা সেই অম্বালিকাটা না?

আয়া হাসে। উপেন বলে—ভয়ানক দুষ্টু হবে এই মেয়েটা, দেখছো না কি-রকমের চোখ?

বলতে বলতে মেয়েটার গাল টিপে আদর ক'রে ফেলে উপেন—অম্বি...টাট্ টাট্।

জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখে ভ্রূকুটি করে চারু। উপেন ঘরে প্রবেশ করতেই চারু প্রায় একটা ঝগড়ার মত ব্যাপার বাধিয়ে তোলে—তুমি ছুঁলে কেন মেয়েটাকে?

—তাতে কি হয়েছে? আমার জাত গিয়েছে?

—জাত যাবে কেন, কিন্তু নিজের কথাই তো রাখতে পারলে না। আদর করার জন্য তোমার নিজের মেয়ে ঘরে নেই?

সেই সন্ধ্যাতেই প্রতিশোধ নিল উপেন। হঠাৎ চারুর কাছে ব্যস্তভাবে ছুটে এসে প্রশ্ন করে, থার্মোমিটার আছে?

—আছে। কেন!

—মেয়েটার জ্বর এসেছে বোধ হয়।

—কোন্ মেয়েটার?

—অম্বির। নিশ্চয় সাংঘাতিক জ্বর, বোধ হয় গা পুড়ে যাচ্ছে।

চমকে ওঠে, বিচলিত হয় চারু।—জ্বর কেন হলো? কি আশ্চর্য, ইস, পুড়ে যাবে কেন? কি যে বলছো, মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

উপেন বলে—মেয়েটার মুখটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

আয়ার ঘরের ভিতর এসে ঢোকে চারু। সঙ্গে সঙ্গে উপেনও আসে। কিন্তু হঠাৎ ভুল করলো চারু। অম্বির কপালে হাত দিয়ে বার বার যেন একটা শিশুর অসহায় জীবনে কোমল স্পর্শ অনুভব করে চারু। আশ্চর্য হয়ে বলে—কই, জ্বর বলে তো মনে হচ্ছে না!

সেই মুহূর্তে দেখতে পায় চারু, মুখ টিপে হাসি লুকিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে উপেন।

উপেন বলে—নিজের কথাই তো রাখতে পারলে না, মেয়েটাকে ছুঁয়ে ফেললে কেন?

রাগ ক'রে উত্তর দিতে গিয়ে হেসে ফেলে চারু। তারপর আবার শান্ত চিত্তে আর শান্ত স্বরে দুজনের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে।—আসল কথা কি জান, কাছে রাখলে একরকম ছোঁয়াছুঁয়ি হবেই, আর...।

উপেন—আর মায়া-টায়া পড়বেই।

চারু—কাজেই।

উপেন—কাজেই তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া ভাল। নিজের মেয়ে নিয়েই উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার তাল সামলাতে পারে না মানুষ, তার ওপর যদি একটা পরের মেয়েকে নিয়ে...নাঃ, আর দেরি করা উচিত না আর দু'একমাসের মধ্যে মধুপুরে বদলি হতে হবে। তার আগেই মেয়েটাকে ওর একটা জাতের লোকের কাছে...।

পিসিমার চিঠি এসেছে।—সকল ব্যাপার শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তুমি জান তুমি কত উচ্চ সদ্বংশের সন্তান। তোমাদের সাতপুরুষে কেহ কুলীন ব্যতীত অন্য কোন নীচ ঘরের সহিত কুটুম্বিতা পর্যন্ত করে নাই। ভাবিয়া পাই না, তুমি কি করিয়া তোমার জাতের উচ্চতা ও শুচিতা ভুলিয়া একটি অন্ত্যজের মেয়েকে ঘরে স্থান দিতে পার। আশা করি, পত্রপাঠ উহাকে বিদায় করিয়া দিবে।

পিসিমার চিঠি পড়ে ক্ষুব্ধ হয় উপেন, কিন্তু পিসিমার উপর ক্ষুব্ধ হতে পারে না। পিসিমা ঐ জাতের বড়াই নিয়েই তাঁর সারা জীবন ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। কলকাতায় যখন কলেজে পড়তো উপেন, তখন প্রতি রবিবার এই পিসিমারই বাড়িতে এসে খেয়ে যেতে হতো। পোলাও থেকে পায়েস, বিশ রকমের খাবার নিজের হাতে রান্না করে উপেনকে খাওয়াতেন এবং খাইয়ে খুশি হতেন পিসিমা।—আমার সব কুটুম্বের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বড় বংশের ছেলে উপেন। তাই তো তোমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করি। পিসিমার স্নেহের কারণটা যাই হোক, স্নেহটা তো আর মিথ্যে নয়। পিসিমার সম্পর্কে বিশেষ একটা শ্রদ্ধার টান অনুভব করে উপেন। এমন পিসিমা দুঃখিত না হলেই ভাল।

অম্বির কথাটা বার বার ভাবতে হচ্ছে। পিসিমা যাই বলুন, উপেন আর চারু ঠিক জাত

বাঁচাবার সমস্যা নিয়ে মনটাকে দুশ্চিন্তায় বিব্রত করছে না। অম্বি নামে ঐ মেয়েটারও যে একটা ভবিষ্যৎ আছে।

মেয়েটার ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে গিয়েই সমস্যাটা অনুমান করতে পারে উপেন আর চারু। এই মেয়েকে তো চিরকাল কাছে রাখা যাবে না। ভিন জাতের আর ছোট জাতের একটা মেয়েকে বড় ক'রে তুললেই আপনজন হয়ে যাবে না মেয়েটা। সমাজ আছে, সমাজের নিয়ম আছে। মেয়েটাকেও ভবিষ্যতে একটা সমস্যায় পড়তে হবে।

কিছুদিন মাত্র কাছে রাখতে হবে, কিন্তু এই কিছুদিনের মধ্যে মেয়েটার উপর যেন মায়া পড়ে না যায়। মাত্র এইটুকু হলো উপেন আর চারুর মনের দাবি।

বদলি হবার দিন যতই এগিয়ে আসে, ততই চৌকিদারকে তাড়া দেয় উপেন। শেষে একদিন, বদলি হবার দুদিন আগে সমস্যা থেকে একেবারে মুক্ত হবার সুযোগ পেয়ে গেল উপেন আর চারু।

বাংলোর বারান্দায় বসে বই পড়ছিল উপেন। দূরে লনের বেড়ায় গা ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আয়া, কোলে অম্বি। হঠাৎ ফটকের কাছে আগন্তুক কয়েকটা মূর্তিকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে উপেন। আসছে চৌকিদার, সঙ্গে আরও তিনজন লোক।

চৌকিদারকে দেখতে পেয়েই বিচলিত হয়, আর ছুটফট ক'রে বারান্দায় এসে ডাকতে থাকে উপেন।—আয়া আয়া! শিগগির এদিকে চলে এসো।

আয়া নিকটে আসে। চৌকিদার এগিয়ে আসছে। উপেন রাগ ক'রে ধমক দেয় আয়াকে—ওখানে ঘুরঘুর করছো কেন? শিগগির ঘরের ভেতর চলে যাও।

আয়া ঘরের ভিতর চলে যাবার পর-মুহূর্তে উপেন যেন সন্ত্রস্তের মত একলাফে বারান্দা থেকে সরে গিয়ে অন্য ঘরের ভিতর লুকিয়ে পড়ে। বারান্দায় চিৎকারের মত কর্কশ কতগুলি আহ্বানের স্বর বাজতে থাকে—হুজুর, হুজুর।

যেন এই আহ্বানের শব্দগুলি সহ্য করতে গিয়ে আরও বিচলিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে উপেন। আস্তে আস্তে পা টিপে-টিপে জানালার কাছে এসে একবার বাইরে উঁকি দেয়, তারপর জানালা বন্ধ ক'রে দেয়।

চারু বিস্মিত হয়—এ কি হচ্ছে?

উপেন—ওরা এসে গেছে।

চারু—কারা?

উপেন—ঐ ওরা, অম্বির জাতের লোক।

থরথর ক'রে হঠাৎ কেঁপে ওঠে চারুর দুই চোখের দৃষ্টি।...কই দেখি।

স্বামী আর স্ত্রী একসঙ্গে দৃষ্টি তুলে আবার খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বারান্দার দিকে তাকায়।

চৌকিদার বলে—পঞ্চাশ টাকা আর কিছু কাপড়চোপড়...আর এক আধটা কম্বল...এই পেলেই ওরা মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে পুষতে রাজী আছে হুজুর।

উপেন হতভম্বের মত চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে...খুব কম টাকাই তো দাবি করেছে, কিন্তু লোকগুলি ভাল কি মন্দ বুঝতে পারছি না।

চারু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে...ঝাঁটা মার...দূর দূর দূর!

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে মারমূর্তি হয়ে বের হয়ে আসে উপেন...ভাগো ভাগো ভাগো। আগে নিজেরা মানুষ হও, তারপর পরের মেয়েকে মানুষ করতে এসো। যত সব ইডিয়ট হামবাগ্!

চৌকিদার ভীতভাবে বলতে থাকে...সেলাম হুজুর, যাচ্ছি, হুজুর, ঠিকই বলেছেন হুজুর।

অমানুষগুলিকে তো বিদায় ক'রে দেওয়া হলো, আর হাঁপও ছাড়লো উপেন আর চারু। কিন্তু সমস্যার কথাটা দুজনেই চিন্তা না করে পারে না। এইভাবে যদি মেয়েটাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা আর চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়, তবে কি হবে উপায়?

তাহলে মেয়েটা এই বাড়িরই মেয়ের মত হয়ে উঠবে যে! তখন? তখন যে মেয়েটাই এই বাড়িকে নিজের বাড়ি বলে মনে ক'রে বসবে।

কী জটিল সমস্যা। মেয়েটাকে তখন এই বাড়ি থেকে বিদায় দিলে।

মেয়েটাই বা সহ্য করবে কেমন ক'রে সেই বিদায়? এখনো কথা বলতে শেখে নি, বোঝেও না কিছু, মাত্র আয়ার কোলই চিনতে পেরেছে। কিন্তু আর একটু যখন বড় হবে, তখন উপেন আর চারুকেও যে আপন জন বলে মনে ক'রে ফেলবে! এইটুকু একটা শিশুর সেই মনের টানকে ছিঁড়ে দিতে পারা যাবে তো?

অনেক আলোচনা আর গবেষণা ক'রে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে আর একবার একটা প্রতিজ্ঞা করেন। না, আর বেশি দেরি করলে চলবে না। মধুপুরে গিয়েই, খোঁজ খবর ক'রে কোন সাধারণ...এই ধর কোন চাপরাশি বা বেয়ারার ঘরে মেযেটাকে যদি সঁপে দেওয়া যায়, তবে মন্দ হয় না। ছোট জাতের মেয়েদের তো এই বয়সেই বিয়ে হল। কিছু টাকা দিলে পাত্র পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

নিশ্চয়, আর কোন সন্দেহ থাকে না উপেন আর চারুর মনে। কিন্তু—এইবার থেকে আর একটা বিষয়ে সাবধান হতে হবে। চারু বলে—মেয়েটা যেন কখনই ভাবতে না শেখে যে আমরা ওর আপন জন। আমাদের জন্য যেন কোন মায়া না জেগে বসে মেয়েটার মনে। তাহলেই কিন্তু সমস্যা জটিল হবে।

অর্থাৎ, এইবার থেকে একটু নির্মম হতে হবে, এই ধরনেরই একটা সিদ্ধান্ত করে উপেন আর চারু।

কাঁদছে অম্বি। অম্বির একটানা একঘেয়ে কান্নার স্বর শোনা যায়। বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় চারু। বারান্দার আর এক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে আয়াকে ধমক দেয় চারু —মেয়েটা এরকম বিশ্রীভাবে কাঁদছে কেন আয়া? দোলনা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

আয়াও চেঁচিয়ে উত্তর দেয়।—দোলনা অনেক দুলিয়েছি।

চারু—তবে কাঁদছে কেন মেয়েটা?

আয়া আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে থাকে—তুমি তো এক মেয়ের মা হয়েছ, তুমি কি জানো না, বাচ্চা মেয়ে কিসকে লিয়ে এমন করে কাঁদে।

যেন এক ছলক করুণ রক্তের আভা হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে চারুর মুখের উপর। চুপ ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে চারু। মনে হয়, যেন অনেক কষ্টে আর ইচ্ছা ক'রে শরীরটাকে কাঠ ক'রে রাখতে চাইছে। উপেন গম্ভীরভাবে বলে—শক্ত হতে চেষ্টা করছো বুঝি?

চারু খেঁকিয়ে ওঠে—তুমি অসভ্যতা করো না।

হাসি লুকোতে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় উপেন।

মধুপুরের তিন বছরের জীবন দেখতে দেখতে কেটে গেল। আবার নতুন জায়গায় বদলি হবার সময় এগিয়ে এল ঃ দুজনের মনে হঠাৎ সমস্যাটা আবার দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তোলে।

এতদিন যেন মনের ভুলে ভুলেই গিয়েছিল দুজনে ; একটা পরের মেয়ে এই ঘরেরই বাতাসে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। কিন্তু এত দেরি করা উচিত ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। দুজনেই দুজনের উপর দোষারোপ করে। কথা কাটাকাটির

পর আবার দুজনেই শান্তভাবে আলোচনা করে।—মেয়েটারই ওপর অন্যায় করা হচ্ছে। আর দেরি করলে বাড়ির মেয়েব মত হয়ে উঠবে যে, তখন কি হবে উপায়? বিয়ের বয়স যখন হবে, তখন বিয়েই বা হবে কার সঙ্গে? মেয়েটার মন এই বাড়ির মেয়ের মত হয়ে উঠবে, অথচ বিয়ে দিতে হবে একটা ছোট ঘরে। কেমন ক'রে সেই ঘরকে সহ্য করবে মেয়েটা? তার চেয়ে, এখান থেকে যাবার আগে একটা পাত্র-টাত্র খুঁজে বের করে মেয়েটার গতি ক'রে দেওয়া যায় তো ভাল।

ঘরের জানালায় একটা ছোট্ট মেয়ের হাসি হাসি মুখ ভেসে ওঠে। রমার মুখ বাইরের ফুলের টবের উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দেয় আর ডাক দেয় রমা—বাবা!

তার পরেই ডাক দেয়—মা।

চারু বলে—দুষ্টুমি করো না রমা, যাও পুতুল নিয়ে খেলা কর।

ঘরের অন্য একটা জানালায় আর একটা ছোট মেয়ের হাসি হাসি মুখ হঠাৎ ভেসে ওঠে। বাইরের ফুলের টবের উপর দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়েছে অম্বি। উঁকি দিয়েই উপেনের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—আপ্পি!

তারপর চারুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়—আম্মি! দৌড়ে চলে গেল অম্বি।

উপেন আর চারু আলাপ করে—এই ডাকগুলি কি অম্বি আপনা আপনি শিখলো?

চারু—না আয়া শিখিয়েছে।

উপেন—যাক্, তবু ভাল, রমার মত বাবা-মা আরম্ভ করলেই হয়েছিল আর কি?

কি আশ্চর্য, এই ধরনেরই এক একটা প্রাচীর তুলে নিজের মেয়ের কাছ থেকে পরের মেয়েকে দূরে সরিয়ে রেখেছে উপেন আর চারু। অম্বির কাছে তারা হলো আপ্পি আর আম্মি, বাবা আর মা নয়।

কিন্তু যখন রমা আর অম্বির ঝগড়ার ভাষা শুনতে পায়, তখন দুজনেই আবার আশ্চর্য হয়, আর, মনের এলোমেলো চিন্তার মধ্যে বুঝতে পারে, এই ব্যবধান যে ব্যবধানই নয়। পৃথিবীতে এক আপ্পি আর এক আম্মিকে পেয়েই ধন্য হয়ে গিয়েছে অম্বি।

রমা অম্বিকে তুচ্ছ ক'রে মুখ বেঁকিয়ে বলে—তোর তো মা নেই।

অম্বি—তোর তো আম্মি নেই।

রমা—তোর তো বাবা নেই।

অম্বি—তোর তো আপ্পি নেই।

উপেন আর চারু দুজনেই একসঙ্গে ধমক দেয়—কি হচ্ছে!

ধমক দিয়েই যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ে দুজনেই। এত সতর্কতা তবু কোথা থেকে যেন একটা কঠিন বিদ্রূপ চক্রান্ত ক'রে বার বার ভেঙে দিচ্ছে, আর ভুয়ো করে দিচ্ছে তাঁদের এই সতর্কতার প্রাচীরকে। অম্বি নামে ঐ পাঁচ বছর বয়সের একটা ভিন্ন রক্তের মেয়ে যেন নিজ মনের অহংকারেই রমার সঙ্গে সমান তাল রেখে এই বাড়ির স্নেহের আঙিনায় ছুটোছুটি করার শক্তি পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাধা দিতে হবে। বাধা দিচ্ছেও উপেন আর চারুবালা। বেশ ভেবে চিন্তে আর ইচ্ছে করে নির্মম হবার চেষ্টা করছে। রমা আর অম্বির মধ্যে আরও শক্ত পাথরের প্রাচীর তৈরি করতে হবে। যেন বুঝতে পারে অম্বি, আপ্পি আর আম্মির গা ঘেঁষে থাকবার অধিকার অম্বির নেই। রমা যা অম্বি তা নয়। এখন থেকেই ঐটুকু মেয়েকে ওর জীবনের এই কঠোর সত্য বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে সমস্যা বাড়বে।

এর মধ্যে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অপিসের দারোয়ানের সাহায্যে এক পাত্রের সন্ধান পেল উপেন। রেলের কুলি সর্দারের এক ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারা যায় অম্বির। পাত্রের বাপের কিছু ক্ষেত-খামার আছে। ছোট জাত। পাত্রের খুড়ো সেই কুলি সর্দারই এসে একদিন উপেনের বাড়ির বারান্দায় উঠলো।

কিন্তু সেইরকম ঘটনা ঘটে গেল আবার। চারুবালা ব্যাপার দেখে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠল চারু—দূর কর, যত সব আপদ!

হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে উপেন। বেচারা কুলি সর্দারকেই ধমক দেয়—যাও যাও, যাও।

মুখ ভার ক'রে চুপ করে বসে রইল চারুবালা। যেন দুর্বোধ্য একটা বেদনা বুকের ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে, এবং নিজেরই অদৃষ্টের বিড়ম্বনার দিকে তাকিয়ে ছলছল ক'রে উঠছে তার চোখ। সান্ত্বনার ভঙ্গীতে চারুবালার হাত ধরে উপেন—অকারণে আমার ওপর রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

জানলার কাছে ভেসে ওঠে এক জোড়া কৌতূহলী হাসি-হাসি শিশু মুখ। রমা আর অম্বি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কি-যেন শোনে আর কি-যেন ভাবে। তার পরেই জানলা থেকে নেমে চলে যায়।

উপেন বলে—এখন বুঝতে পারছি, এভাবে কিছুই হবে না।

চারু—কি?

উপেন—বাজে লোকের হাতে মেয়েটাকে দিতে পারা যাবে না। আমিও পারবো না, তুমিও পারবে না।

চেঁচিয়ে ওঠে চারু—তাহলে মেয়েটা কি বাড়ির মেয়ের মতোই হয়ে উঠবে না কি?

—না, তা বলছি না। বলছি, যদি ভাল একটা অনাথ আশ্রমে ওকে দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে...।

—তাহলে কি?

—তাহলে আমাদেরও মনে দুঃখ থাকবে না যে মেয়েটার ওপর অন্যায় করা হলো। কারণ, ভাল অনাথ আশ্রমে থাকলে মেয়েটা লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে একটা ভাল মানুষের সংসার পেয়েই যাবে।

—আছে এরকম আশ্রম?

—আছে নিশ্চয়, খোঁজ নিতে হবে।

—আশ্রম খুঁজতে আবার কতদিন লাগবে কে জানে?

—না আর দেরি করলে চলবে না। মেয়েটা এরই মধ্যে অনেক ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে।

—কি করেছে?

—আয়াই বলে, দিনরাত রমার সঙ্গে হিংসোহিংসি করছে, রমাকে মারধরও করে অম্বি।

—রমাও তো অম্বিকে মারে।

—কিন্তু রমা তো কোন সমস্যা নয়। রমার ওপর আমাদের যতই মায়া বাড়ুক আর আমাদের ওপর রমার যতই মায়া বাড়ুক না কেন, তাতে তো কোন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে না। কিন্তু অম্বি যদি আমাদের দুজনকে আপনজন ভেবে বসে...।

ভেবে বসেছে, তোমারই জন্য এসব কাণ্ড হচ্ছে।

রাগ করে উপেন—আমাকে দোষ দিও না, তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত মন আমার। আমি আজ পর্যন্ত একটা পুতুলও অম্বির জন্য কিনে আনি নি। তুমিই স্টাইল ক'রে ওর জামার ছাঁট ছেঁটেছ আর সেলাই করেছ।

হেসে ফেলে চারুবালা—তুমি যত পুতুল রমাকে এনে দিয়েছ, অম্বি সবই কেড়ে নিয়েছে।

—অ্যাঁ, কোন সাহসে কাড়ে?

—ভগবান জানেন।

দূরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় উপেন আর চারুবালা, আয়া একটা নতুন ডল রমার

হাতে তুলে দিচ্ছে। অম্বি বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে আয়ার উপর উপদ্রব করছে।

উপেন রাগ ক'রে অম্বির হাত থেকে ডল কাড়বার জন্য যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায়। চারুও সঙ্গে সঙ্গে উপেনের পিছনে হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে আসতে থাকে। চারু বার বার বাধা দেয়--এটা আবার কিরকম পাগলামি করছো তুমি!

--না আমার কাছে ওসব আবদার নেই, আমি শক্ত মানুষ। তুমিই লাই দিয়ে দিয়ে সমস্যা বাড়িয়েছ।

চারুবালা মুখ টিপে হাসে--ইস্।

থামতে হয় উপেনকে। চারুই উপেনের হাত ধরে উপেনকে থামতে বাধ্য করে। ছেলেমানুষে এরকম ঝগড়া ঝগড়া খেলা খেলেই থাকে. কিন্তু তুমি তার জন্য সত্যিই মাথা খারাপ করছো কেন?

উপেনের রাগটা হঠাৎ অপ্রস্তুত হয় এবং চারুর দিকে ভ্রূকুটি ক'রে বলে--না, মোটেই খেলা নয়। অম্বির মনে মতলব আছে।

চারু হাসে--বেশ তো ঐটুকু একটা মেয়ে না হয় একটু মতলবের খেলাই খেললো।

উপেন বলে--ঐ দেখ, আবার কেমন ঝগড়া শুরু করেছে অম্বি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে চারু আর উপেন, সত্যিই আবার চেঁচাতে শুরু করেছে অম্বি--আমার ডল কই আয়া? আমার ডল?

অম্বি বলে--আমার ডল কই?

আয়া--তোমার ডল নেই।

অম্বি--ইস্? সঙ্গে সঙ্গে রমার হাত থেকে ডল কেড়ে নেয় অম্বি। রমা কাড়বার চেষ্টা করতেই রমাকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। মুখ ভার করে বসে থাকে রমা। আড়ি করে--তোমার সঙ্গে খেলব না।

অম্বি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রমার একটা হাত ধরে অনুরোধ করে--আমার ওপর অকারণে রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

চারুবালার বিদ্রূপই সত্য হয়ে উঠলো। অম্বির মুখের মান-ভাঙানো কথাগুলি শুনতে পেয়ে ওঠে উপেন, তারপর অপ্রস্তুতভাবে হাসতে হাসতে চলে যায়।

কিন্তু এই ধরনের ক্ষণিক মধুরতার দৃশ্য দেখে খুশি হয়েও পরমুহূর্তে উদ্বিগ্নভাবে ভাবতে থাকে উপেন আর চারুবালা। অম্বি যেন ধীরে ধীরে একটা ছলনা বিস্তার করছে। সাবধান হতে হবে। অম্বিরই কল্যাণের জন্য, আর নিজেদের জীবনকে একটা ভুল মায়ার জাল থেকে বাঁচাবার জন্য।

রমার জন্য মাস্টার ঠিক করা হয়েছিল। পড়াতে এলো মাস্টার। রমার দেখাদেখি অম্বিও একটা বই নিয়ে মাস্টারের কাছে এসে বসে। আয়া এসে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই বিদ্রোহ করে অম্বি, চেঁচিয়ে আয়াকে খিমচে একটা অস্বস্তিকর দৃশ্য সৃষ্টি করে। মাস্টার অবাক হয়। উপেন এসে বলে--থাকুক, থাকুক।

চারুবালা অনুযোগ করে--থাকুক তো বললে, কিন্তু আর কতদিন?

--যতদিন অনাথ আশ্রমে না যায়, ততদিন এসব সহ্য করতেই হবে।

সহ্য করতে হলো আরও একটা দুঃসহ ঘটনা। প্রতিদিনের মত খাবার ঘরের টেবিলে কাছে বসে আদরের সুরে ডাক দিলো উপেন--রমা! রমা!

সেই মুহূর্তে ছুটে আসে রমা। একটা পুডিং ভেঙে চামচে দিয়ে রমাকে খাইয়ে দেন উপেন। চারুবালা সামনে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে সে দৃশ্য দেখে। রমার নানা রকমের দুষ্টুমির কথা আলোচনা করে স্বামী আর স্ত্রী। উপেন হাসতে হাসতে বলে--এরই মধ্যে এটার মুখটা

একেবারে তোমার মুখের মত হয়ে উঠেছে। দেখা মাত্র যে কেউ বলে দেবে তোমার মেয়ে।

--কিন্তু মিসেস চক্রবর্তী যে বললেন, তোমার মুখের আদল পেয়েছে।

--আমি তো ও রকম কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

চারু রাগ করে--এ আবার কেমন কথা!

--আরে, আমার নিজের মুখটা তো দেখতে পাচ্ছি না যে মিলিয়ে দেখবো।

অকস্মাৎ দু'জনেই চমকে ওঠে, নিকটেই যেন একটা শিশুকণ্ঠের কান্নাভরা চিৎকার ছটফট করছে। হ্যাঁ, অম্বিরই চিৎকার।

খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়, অম্বিকে শক্ত করে ধরে রয়েছে আয়া। অম্বি দেখতে পেয়েছে, উপেন, চামচ দিয়ে পুডিং খাইয়ে দিচ্ছে রমাকে। ছটফট করছে অম্বি, পাঁচ বৎসরের একটা পরের মেয়ে উপেনের হাত থেকে আদুরে পুডিং খাবার জন্য লুব্ধ হয়ে ছটফট করছে। আয়াকে চড় ঘুঁষি মেরে ব্যতিব্যস্ত করছে অম্বি। আয়া শেষে হার মেনে আর রাগ করে অম্বির হাত ছেড়েই দেয়--যাঃ! আর সহ্য করতে পারে না।

এক দৌড়ে ছুটে এসে অম্বি উপেনের খাবার টেবিলের কাছে দাঁড়ায়। পুডিং-এর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটি লুব্ধ মুখের ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

উপেনের হাত থরথর করে কাঁপতে থাকে। ছোট্ট একটা মেয়ে সামান্য একটা লুব্ধ দৃষ্টির দাবি, কিন্তু কী প্রচণ্ড এই দাবির শক্তি। চারুর মুখের দিকে বার বার ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায় উপেন। চারু মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

অম্বি বলে--আমার পুডিং আপ্পি?

বিষণ্ণ ও করুণ হয়ে উঠে উপেনের মুখ। ধীরে ধীরে চামচ তোলে, পুডিং ভাঙে উপেন, দ্বিধাগ্রস্ত হাতটা কাঁপতে থাকে। একবার চামচ নামিয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মোছে উপেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অম্বি ডাকে--আমার পুডিং আপ্পি।

চামচ তুলে অম্বির মুখে পুডিং তুলে দেয় উপেন।

চমকে ওঠে চারুবালা।

চলে যায় অম্বি, চলে যায় রমা। সেই চামচ দিয়েই নিজের খাবার খেতে যাচ্ছিল উপেন, চারু উত্তপ্তস্বরে বাধা দেয়--ও চামচ রেখে দাও।

উপেন শক্ত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করে--কেন?

জবাব দেয় না চারু। উপেন চেঁচিয়ে ওঠে--বল, তুমি আপত্তি করছো কেন?

চারু নিরুত্তর।

উপেন--ছোট জাতের মেয়ে চামচ মুখ দিয়েছে বলে চামচ অশুদ্ধ হয়েছে, এই তো। খানিকটা গোবর খেয়ে ফেললেই শুদ্ধ হতে পারা যাবে তো, তবে এত ভয় কিসের?

উত্তর দেয় না চারু।

উপেন--বল, কিসের ভয়? জাতের ভয় না মায়ার ভয়?

চারু ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল--মায়ার ভয়।

--কেন?

--ভুল করছো তুমি। দুদিনের জন্য একটা পরের মেয়ে ঘরে রয়েছে, এই মাত্র, তাকে নিয়ে এত আদরের বাড়াবাড়ি কেন?

--তুমি করছো না?

--না, আমি তোমার চেয়ে ঢের শক্ত, ঢের সাবধান।

--ও।

চামচটাকে সশব্দে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অন্য একটা চামচ হাতে তুলে নেয় উপেন। তাড়াতাড়ি

খেতে থাকে। কিন্তু খাওয়া সমাপ্ত করে না। হঠাৎ খাবার ছেড়ে হাত ধুয়ে উঠে যায়।

সেদিন ছিল রমার জন্মদিন।

অম্বি বায়না ধরলো, আমিও ঠিক রমার মত ফুলের মালা গলায় দিয়ে, চন্দনের টিপ পরে, আম্মির কোলে বসে পায়েস খাব।

চারুবালা বলে—না।

চারুবালার আঁচল ধরে ঘুরঘুর করতে থাকে অম্বি। নাকি কান্নার সুরে সেই একই আবদার—আমার জন্মদিন চাই।

চারুবালা চেঁচিয়ে আয়াকে ডাক দিয়ে বলে—ওকে নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে।

অম্বিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য একটা ঘরে বন্ধ করে রাখে আয়া। চিৎকার শোনা যায়, ঘরের দরজায় লাথি মেরে সেই প্রচণ্ড আবদার একটানা এক সুরে ধ্বনিত হয়ে চলেছে—আমার জন্মদিন, আমার জন্মদিন। আম্মি, আমার জন্মদিন।

ঘরের ভিতর ছটফট ক'রে আর রাগ ক'রে ঘুরতে থাকে উপেন। যেন একটা ধিক্কার দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে—হুঃ, জন্মদিন, সেদিন কোন্ সর্বনেশে তারা ছিল আকাশে।

অন্য ঘরে চুপ করে বসে শুনতে থাকে চারুবালা, অম্বির চিৎকার। তারপর চোখ মোছে, তারপরেই ক্ষুব্ধভাবে উপেনের কাছে এসে বলে—আমি জব্দ হলে খুশি হবে তো? এসো, দেখে খুশি হয়ে যাও।

এগিয়ে গিয়ে ঘরের বন্ধ কপাট খুলে অম্বিকে হিড়হিড় করে টেনে আনে চারুবালা। মালা পরিয়ে দেয়, চন্দনও পরিয়ে দেয়। গম্ভীর মুখে যেন বিনা আগ্রহের একটা কলের মত কাজ করে যায়। কোলের উপর অম্বিকে বসিয়ে পায়েস খাইয়ে দেয়। হেসে ওঠে অম্বির জল-ভেজা চোখ।

শেষ হয় অম্বির জন্মদিনের অনুষ্ঠান। অম্বিকে কোল থেকে নামিয়ে, সেই রকমই গম্ভীর মুখে কলের মত ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকে বিছানার উপর লুকিয়ে শুয়ে পড়ে চারুবালা।

শ্যামবাজারের পিসিমার চিঠি মাঝে মাঝে আসে।

পিসিমার চিঠিতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। একটি হলো বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে, কি রকম জমালে উপেন, আর কবে বাড়ি করছে উপেন? আর একটি হলো, রমার বিয়ের সম্বন্ধে ভবিষ্যতের একটা আগ্রহের কথা। আর, একটা বিক্ষোভের কথা—সেই অজাত মেয়েটা বাড়িতে আছে কেন?

সমাজের ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন পিসিমা। ভুল করলে, রমার বিয়ে নিয়েই ভবিষ্যতে মুশকিলে পড়তে হবে।—বুঝিলাম, তোমরা সেই অন্ত্যজা মেয়েটাকে ঘরে পুষিয়া রাখিয়াছ। এখন না হয় পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু একদিন দেশের দিকে ফিরিয়া আসিয়া সমাজের মধ্যে থাকিতে হইবে। বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ না যে, অজাত-কুজাতের ঐ মেয়ে ঘরে থাকিলে সমাজে তোমাদের যে নিন্দা রটিবে, তাহার ফলে রমার জন্য সদ্বংশীয় পাত্র সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইবে।

পিসিমার উপদেশগুলি যেন নিষ্ঠুর সত্যের মত চিন্তিত ক'রে তোলে চারুবালাকে। চারুবালার কাছে এসে দাঁড়ায় উপেন। সান্ত্বনার সুরে আর শান্তভাবে বলতে থাকে।—ভুল যদি বলো, তবে আমার ভুল, তোমার ভুল, আর অম্বি নামে ঐ অতটুকু একটা মেয়েরও ভুল। আমরা সবাই না জেনে ভুল করছি। পিসিমা ঠিকই বলেছেন।

চারু—কিন্তু কিসের ভুল?

উপেন—আমার তো মনে হয়, আমরা কেউ ভুল করছি না। করি নি, তুমিও ভুল করছো না, অম্বিও ভুল করছে না। শত হোক, একটা মানুষের মেয়ে তো! কাছে থাকলেই এরকম ভুল সবারই হবে।

—কাছে রাখাই যে ভুল হচ্ছে।

—হ্যাঁ, এটাই হলো কথা। কিন্তু এবার বোধ হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কি?

—দার্জিলিং-এ একটা অরফ্যানেজ আছে। বেশ ভাল ব্যবস্থা। অতি সুন্দর ব্যবস্থা। হাজার পাঁচেক টাকা দিতে হবে। ব্যস্, আর কোন দায় নেই!

—তবে, ওখানেই একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেল।

—ক'রে ফেলতেই হবে, এখান থেকে চলে যাবার দিনও তো আর বেশি বাকি নেই। এবার অনেক দূরে, একেবারে, সেই দেরাদুনের কাছে।

—চিরকালটা কি ঘুরে ঘুরেই কাটবে?

—অন্তত আর পনরটা বছর তো বটেই।

—তারপর?

—তারপর কলকাতা।

পনর বছর পরের কথা ছেড়ে দাও, এখনকার কথাই ভাব। আয়াটাও জেদ ধরেছে, এইবার দেশে চলে যাবে। বুড়ো বয়সে আর বিদেশে থাকতে চায় না। চাকরিও করতে চায় না।

—কেন?

—রমা আর অম্বি ওকে বড় মারধোর করে।

দরজার কাছেই আয়ার ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যায়।—হামি আর থাকতে পারবে না সাব।

উপেন—কেন?

আয়া—এ নোকরি আচ্ছা নেহি সাব, মায়াভি হোবে, আর মারভি খাইবে।

উপেন বলে—না, আর বেশি দিন নয়। শিগগিরই তোমাকে ছেড়ে দেব।

আয়া চলে গেলে যেন একটু আতঙ্কিতের মতোই বিষণ্ন স্বরে উপেন বলে—দেখলে তো, আয়া কেমন সাবধান হয়ে গিয়েছে। মায়াভি হোবে, মারভি খাইবে, আমাদেরও এই দশা হবে, যদি সাবধান না হই।

শেষ কথায় চারুবালাকে একটু উৎসাহিত করে চলে যায় উপেন—দার্জিলিং-এর অরফ্যানেজে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি, মনে হচ্ছে দু'এক দিনের মধ্যেই উত্তর এসে পড়বে।

ভুল হয় নি উপেনের অনুমানে। উত্তর এল দুদিন পরেই।

ব্যস্, এখন শুধু পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক, আর সেই সঙ্গে অম্বিকে নিয়ে একদিন মাস্টারকে দার্জিলিং রওনা করিয়ে দিতে হবে, আর কোন সমস্যা নেই।

এক গাদা রঙীন খেলনা জামা-কাপড়, ছবি, টফি, চকোলেট আর লজেন্স কিনে এনে টেবিলের উপর ঢেলে দিলো উপেন। অম্বিকে ডাক দিয়ে বলে—অম্বি, এই সব তোমার।

—আমার?

—হ্যাঁ, কিন্তু মাস্টারমশাই-এর কথা শুনতে হবে, তবে এসব পাবে।

মাস্টারের কানের কাছে ফিস ফিস ক'রে বলে যায় উপেন—ব্যস্, আমাকে দিয়ে আর কোন কাজ করবার চেষ্টা করবেন না। এইবার সব দায় আপনার। ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে রওনা হয়ে যান, আমাকে কিন্তু আর কোন পরামর্শ করতে ডাকবেন না। চললাম।

মুখ কালো ক'রে, দুপ-দাপ ক'রে হাঁটতে-হাঁটতে, যেন নিজেরই মনের ভিতরের একটা আর্তনাদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করতে চলে যায় উপেন। চারুবালার কাছে গিয়ে বলে, আমি

আজ টুরে চললাম, কাল ফিরবো।

চারুবালার কোন আপত্তি গ্রাহ্য না করে বের হয়ে গেল উপেন।

মাস্টার মশাই চারুবালাকে আশ্বস্ত করেন--কোন চিন্তা করবেন না, এ আর কি এমন কঠিন কাজ?

অম্বির শিশু-মনকে প্রলুব্ধ করার জন্য গল্পের ফাঁদ পাতেন মাস্টার।--নতুন দেশের কথা। বরফের দেশ, ঝরনার দেশ, চাঁদের দেশ, সোনার সূর্য ভাসে সেই দেশের আকাশে।--যাবে অম্বি? প্রশ্ন করেন মাস্টার। মুগ্ধ শিশুচক্ষের বিস্ময় নিয়ে উত্তর দেয় অম্বি--যাব।

সমস্ত বাড়িটাই যেন ভয়ে অভিভূত হয়ে রইল। রওনা হবার জন্য তোড়জোড় করছেন মাস্টার মশাই। রমাকে নিয়ে আয়া চলে গেল। অম্বির পাঁচ বছর বয়সের একটা মেয়ের চোখের দৃষ্টি আর মুখের ভাষার শব্দকে ভয় পেয়ে এই বাড়ির আত্মা যেন মুখ লুকিয়ে ফেলছে। চারুবালাও একটা ঘরের ভিতর নিজেকে বন্ধ ক'রে রাখলো, যেন এই দৃশ্য দেখতে না হয়।

মাস্টারের কাছে কতবার জিজ্ঞাসা করেছে চারু।--আশ্রমে কোন কষ্ট দেয় না তো। মাস্টার বলেছেন--আপনি বিশ্বাস করুন, যে অরফ্যানেজে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানকার খাওয়া-পরা-থাকা সাজপোশাক আপনার এই এখানকার তুলনায় অনেক ভাল। খুব সুখে থাকবে মেয়েটা। লেখাপড়া, গান সব শিখবে। বড় হয়ে ডাক্তারী পড়তে পারবে। আপনি বৃথা ভাবছেন।

হ্যাঁ, বিশ্বাস করেছে চারুবালা। সুখেই থাকবে মেয়েটা, এই বাড়ির সুখের চেয়ে সেখানে অনেক বেশি সুখ। কিন্তু তবু কেন স্বস্তি পায় না মন? মনে হয় ছোট্ট একটা অবুঝ মেয়েকে লোভ দেখিয়ে বনবাসে পাঠানো হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি রাগ হয় নিজেরই উপর! এতদিন ধরে যাকে ছেড়ে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিল মন, আজ ছেড়ে দেবার এত ভাল সুযোগ পেয়েও এরকম দুঃসহ অস্বস্তি বোধ হয় কেন?

বন্ধ ঘরের নিভৃতে বসে শুনতে পায় চারুবালা, মাস্টারের পায়ের শব্দের পিছু পিছু দুটি ছোট ছোট পায়ের জুতোর শব্দ নিকটে এগিয়ে আসছে। রওনা হয়েছেন মাস্টার। চলে যাচ্ছে অম্বি।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অম্বি। প্রশ্ন করে মাস্টারকে--রমা যাবে না?

--না।

--আপ্পি?

--না।

--আম্মি?

--না।

--তবে আমিও যাব না।

এইবার মাস্টার বাধ্য হয়েই কৌশলের সাহায্য নেন। হেসে হেসে প্রচণ্ড একটা মিথ্যা কথা বলেন--আপ্পি, আম্মি, রমা সবাই সেখানে আগেই চলে গিয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে অম্বি--অ্যাঁ, আমিও যাব!

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্সিতে জিনিসপত্র চাপানো আছে। মাস্টার আগে আগে চলে যাচ্ছেন। পিছনে অম্বি। ট্যাক্সির কাছে পৌঁছতেই মাস্টার হঠাৎ একটা আর্তনাদের প্রতিধ্বনি শুনে পিছন ফিরে তাকান। দেখতে পান, বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে চারুবালা।

সেই মুহূর্তে, চারুবালাকে লক্ষ্য ক'রে পিছনে ছুটতে থাকে অম্বি--ঐ যে আম্মি, আম্মি আম্মি।

মাস্টার তারস্বরে চেঁচিয়ে নানা প্রলোভনের কথা ঘোষণা করতে থাকেন--এই যে, এখানে

কত লজেন্স, পুতুল, আর ছবি আছে অম্বি, কত গণেশ আর সিংহ। চল যাই সেখানে, চাঁদের দেশ, বরফের পাহাড়, ঝর্ণার গান, বনের পরী।

কিন্তু বৃথা, আম্মি নামে একটি মায়াভরা মূর্তির কাছে চাঁদের আহ্বানও মিথ্যে হয়ে যায়।--না, আমি যাব না। কখ্খনো যাব না। বলতে বলতে চারুবালার দিকে ছুটে চলেছে অম্বি।

অম্বি এসে চারুবালার স্তব্ধ মূর্তিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু চারুবালার হাত দুটো, আর সঙ্গে বুকের ভিতরটাও যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। অম্বিকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য হাত দুটো একবার ছট্‌ফট করে ওঠে। তবু যেন অনেক কষ্টে হাত দুটোকে শক্ত ক'রে রাখে চারুবালা। অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হাসতে থাকে। অম্বি বলে--মাস্টার বড় দুষ্টু, মিথ্যুক।

চারু প্রশ্ন করে—কেন? কি করেছেন মাস্টার মশাই?

অম্বি বলে—তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিল।

চোখ ছলছল করে, গম্ভীর হয় চারুবালা। অম্বিই সান্ত্বনা দেয়--আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব না আম্মি, তুমি কেঁদো না।

দু'দিন পরে বিষণ্ণ পরিশ্রান্ত বেদনাহত মূর্তি নিয়ে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে চারদিকে উঁকি দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো উপেন। টুর থেকে ফিরে এসেছে উপেন। জানে উপেন, অম্বি চলে গিয়েছে। এক একটা শূন্য ঘর আর বারান্দার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে রুমাল বের করে মুখ মোছে উপেন। হঠাৎ চমকে ওঠে, কি যেন দেখতে পায় উপেন। এক জায়গায়, মেঝের উপর অম্বিরই একটা ডল পড়ে আছে। ফোলা ফোলা গাল, হাসি হাসি মুখ একটা ডল। ডলটা তুলে নিয়ে, ডলের মুখে হাত বুলিয়ে, আর জলভরা চোখ নিয়ে আর দাঁত চিবিয়ে, কে জানে কার উপর রাগ করে বলতে থাকে উপেন—ডল, পুতুল মাত্র, কাঠখড়ের পুতুলও ঘরের ভালবাসা পায়...কিন্তু মানুষের মেয়ে আবর্জনা...ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

অকস্মাৎ আড়াল থেকে হাসিতে আর আহ্লাদে উপচে পড়া মিষ্টি একটা ডাক যেন বাঁশির সুরের মত বেজে ওঠে—আপ্পি।

বিস্ময়ে চমকে ওঠে আর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে উপেনের।—সে কি রে অম্বি, তুই?

অম্বি ছুটে এসে উপেনের হাত ধরতে যায়। আলগোছে হাত সরিয়ে নেয় উপেন। অম্বি বলে—মাস্টার বড় দুষ্টু।

—বুঝেছি। আর দুষ্টুমি করবে না মাস্টার।

অম্বির অভিযোগের মর্ম বুঝতে কোন অসুবিধা নেই। বুঝেছে উপেন, বুঝেছে চারুবালা। অম্বি যেন বলতে চায় আমি যাব না। দুনিয়ার যে-সব মাস্টারীর শাসন আমাকে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চায়, সেই সব মাস্টারী বড় দুষ্টু, বড় নিষ্ঠুর।

না, এ রকম নিষ্ঠুরতা করা উচিত হবে না। মেয়েটার মনটা এই বাড়িকেই আপন ক'রে নিয়েছে। সুতরাং থাকুক না, বাড়ির মেয়ের মত হয়েই। বড় হোক, বেঁচে থাকুক তারপর ভগবান একটা উপায় করে দেবেনই। সাধারণ গেরস্থ ঘরের যে কোন জাতেরই হোক না কেন, খেয়ে পরে একরকম সুখে আছে, এরকম একটা পাত্র কি পাওয়া যাবে না? ভাল বরপণ দিলে পাওয়া যাবেই।

স্বামী-স্ত্রীর আলোচনায় এই নতুন সিদ্ধান্ত জন্মগ্রহণ করে। বাড়ির মেয়ের মতই থাকুক অম্বি। কিন্তু,...কিন্তু ও যেন বুঝতে পারে যে, ও হলো এই বাড়ির মেয়ের মত। আর বেশি কিছু নয়। নইলে...নইলে আবার সমস্যা দেখা দেবে।

কদিন পরেই সমস্যাটা আবার দেখা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অত্যন্ত কঠিন হয়ে আর

অতি সাবধানতায় অবিচল থেকে, সেই সমস্যাকে অঙ্কুরেই ছিন্ন করে দিল চারুবালা আর উপেন।

রমার সঙ্গে হিংসুটেপনায় আর একটু দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল অম্বি। কিন্তু অম্বিকে বুঝিয়ে দিলো চারুবালা ও উপেন, রমার অধিকারে আর অম্বির অধিকারে অনেক পার্থক্য আছে।

ঘটনাটা এই। এক সন্ধ্যায় চারুবালার শোবার ঘরে ঢুকেই দেখতে পায় অম্বি, খাটের উপর চারুবালার বিছানার পাশেই, যেন চারুবালার বুক ঘেঁষে আর একটি ছোট্ট বিছানা রয়েছে, ছোট্ট একটি বালিশও। অ্যাঁ, এখানে রমা শোয়, বুঝেছি। চেঁচিয়ে ওঠে অম্বি।

বায়না ধরে অম্বি—আমিও আম্মির কাছে শোব!

আয়া বলে কভি নেহি। আয়াকে খিমচে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের ছোট্ট বালিশটা আয়ার ঘর থেকে নিয়ে ছুটে আসে অম্বি। চারুবালার বিছানার এক পাশে রাখে, গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে।

প্রমাদ গোনে চারুবালা। ঘর থেকে সরে গেল চারুবালা। আয়া এসে অম্বিকে বোঝায়—এখানে তোমায় শুতে নেই!

—কেন? রমা শোয় কেন?

আয়া বলে—রমা হলো আম্মির মেয়ে।

—আমি তাহলে কি?

—তুমি আম্মির মেয়ে নও।

অন্য ঘরে গম্ভীর হয়ে বসেছিল উপেন আর চারুবালা।—'আম্মি, আম্মি!' চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসি অম্বি।

চারুবালা—কি?

অম্বি—আম্মি, রমা বুঝি একলা তোমার মেয়ে?

চারু—হ্যাঁ।

অম্বি—আমি আম্মি?

চারুবালা করুণভাবে হাসে—তুমি আমাদের মেয়ের মত।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাঁচ বছর বয়সের একটা মূর্তি। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় মায়াময় কৌতূহল যেন আজ সবচেয়ে কঠিন একটা উত্তরের আঘাত পেয়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। দুষ্টু অম্বিকে মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে ধীর স্থির ও শান্ত করে দিয়েছে, ঐ একটি উত্তর।

উপেন বলে—খেয়েছ অম্বি?

অম্বি—না।

উপেন—খেতে যাও আয়া খাইয়ে দেবে।

শান্তভাবেই, বাধ্যভাবে, ধীরে ধীরে চলে যায় অম্বি।

ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ঢোকে। চারুবালার বিছানার এক পাশে ছোট বালিশে ঘুমিয়ে আছে রমা। রমার মুখের দিকে একবার তাকায়। তারপর নিজের ছোট বালিশটাকে হাতে তুলে নিয়ে যায় অম্বি।

জাতের ভয়ে নয়, মায়ার ভয়ে যে সাবধানতার প্রাচীর তুলে দিল উপেন আর চারুবালা, সেই প্রাচীর অটুট হয়েই রইল এই পরিবারের আরও পনেরটি বছরের জীবনে। বেরিলি, গোরখপুর আর শিলিগুড়ি, একে একে সার্ভিসের এক একটি অধ্যায় শেষ করে অবসর জীবনের আশ্রয় কলকাতার বাড়িতে এসে যখন ঠাঁই নিলেন উপেন, তখনও দেখতে পাওয়া

গেল যে, এই পরিবারের বাপমায়ের স্নেহের কক্ষটি সেইরকমই দুভাগে ভাগ করা আছে। সেই প্রাচীর আজও আছে।

একটি ঘরে চারুবালার খাটের পাশেই আর এক খাটে শোয় আপন মেয়ে রমা, আর পাশের ঘরে একটি খাটে শোয় অম্বি? দুই ঘরের মাঝখানে একটি দরজা, এবং এই দরজা যদিও বন্ধ থাকে না, তবু একটি পরদা ঝুলতে থাকে। আপন মেয়ে আর পরের মেয়েকে এইভাবেই পৃথক ক'রে রেখেছেন চারুবালা। আপন মেয়ে রমা হলো নিকটে, আর পরের মেয়ে অম্বি একটু দূরে।

বিগত পনের বছর ধরে এই সাবধানতার প্রাচীরকে একটু একটু করে আরও কঠিন করে তুলতেও ভুলে যান নি উপেন আর চারুবালা। রমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য মাস্টার এসেছে। এসেছে ইংরেজীর মাস্টার আর গানেরও শেলাই-এর মাস্টারনী। অম্বি শুধু একটু দূর থেকে আর আড়াল থেকে দেখেছে। কাছে যায় নি। নিষেধ করে দিয়েছেন আপ্পি আর আম্মি।

এই ব্যবধান স্বীকার করে নিয়েছিল অম্বি। মেয়ে নয়, মেয়ের মত হয়ে থাকবার যে অধিকার পেয়েছে অম্বি সেই অধিকারের চেয়ে বেশি কোন অধিকার তার নেই।

অম্বি হয়তো বুঝতে না পেরে প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়েছিল, কি ক্ষতি হবে লেখাপড়া শিখলে? কেন তাকে গান শিখতে দিতেও এত আপত্তি করেন আপ্পি আর আম্মি?

উপেন আর চারুবালার চিন্তার যুক্তিগুলি কোনদিন দেখতে পায় নি, তাই বুঝতেও পারে নি অম্বি।

সাবধান হয়েছিল উপেন, সমাজের দিকে তাকিয়ে। আর অম্বির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। লেখাপড়া শিখে অম্বি যদি একটা ভদ্রলোকের মেয়ের মনের মত মন পেয়ে বসে, তবে সমস্যা যে আরও জটিল হয়ে উঠবে।

বহু দূর অতীতে সে-সব চেষ্টার কাহিনী এখন অতীতের একটা স্মৃতি মাত্র। আজ দেখা যাচ্ছে, উপেন আর চারুবালার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ ক'রে দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে অম্বি। যে মেয়েকে ভদ্রলোকের মেয়ের মত হতে দিতেও চায় নি, বাড়ির মেয়ের মতও মনে করতে চায় নি, সেই মেয়ে আজ তাঁদের নিজের মেয়ের মত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ঐ মেয়ের মত পর্যন্ত, ব্যস্, আর নয়, আর বেশি নয়। অম্বিকে মানুষ করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গিয়েছে উপেন আর চারুবালা। কারণ, সমস্যাটা এসেই পড়েছে। রমার বিয়ে দিতে হবে, অম্বির বিয়ে দিতে হবে। ভয় হয়, অম্বি যদি রমার মতই শখ আর মন পেয়ে বসে? রমার জন্য যে রকম পাত্র পাওয়া যাবে, অম্বির জন্য সে-রকম পাত্র তো আর পাওয়া যাবে না। জাত-পাত-জন্মের ইতিহাস নিয়ে অম্বির একটা পরিচয় আছে, আর সেই পরিচয়টা তো সুবিধের নয়। সুতরাং, কে বিয়ে করবে অম্বিকে, জাত-পাত শিক্ষা-দীক্ষা ও অবস্থার দিক দিয়ে একটু নীচু গোছের মানুষ ছাড়া? তাই একটু কঠিনভাবেই সতর্ক হয়েছেন উপেন ও চারুবালা।

একজন মেয়ে, আর একজন মেয়ের মত। এই নিয়মে নিজেদের মনকে বেঁধে রেখেছেন উপেন ও চারুবালা। কিন্তু বাইরের আগন্তুকের চোখে ঠিক উল্টোটাই বোধ হয়। মনে হয়, রমাই যেন একটু দূরের একটা প্রাণ, আর অম্বি একেবারে নিকটের। রমা যেন এবাড়ির স্নেহ আর আদরের মাথায় চড়ে বসে আছে, আর অম্বি রয়েছে কোল ঘেঁষে আর বুক ঘেঁষে।

ভোরে ঘুম ভেঙে চোখ মেলে ঘড়ির দিকে তাকাতেই ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে অম্বি। মনে পড়ে যায়, ঘরের নানান কাজের কথা। মনে পড়ে আপ্পি এতক্ষণে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। কিন্তু ঠাকুরটা কি চা এনে দিয়েছে এতক্ষণে? নিশ্চয়ই দেরি করছে ঠাকুর। প্রথমেই ঠাকুরকে চায়ের তাগিদ দেয় অম্বি। পরে নিজেই ব্যস্তভাবে চা তৈরি

ক'রে নিয়ে এসে উপেনের হাতের কাছে এনে দেয়। সস্নেহ স্বরে কথা বলেন উপেন, তুই এত ব্যস্ত হয়ে উঠিস কেন অম্বি? দু মিনিট দেরি হলোই বা।

উপেন বেড়াতে যাবেন, কিন্তু অম্বি একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উপেনকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয় না।--এ আলোয়ানটা ছেঁড়া এটা কেন গায়ে দিয়েছ? ঘরের ভিতর থেকে অন্য একটা আলোয়ান নিয়ে এসে উপেনের গায়ে জড়িয়ে দেয় অম্বি।

রাঁধুনী-দিদির সঙ্গে আলাপ করে অম্বি, ঘরে কি আছে আর কি নেই, এবং কি আনতে হবে। নিজের ঘরে ঢুকে মশলার শিশি থেকে তরকারির ডালা পর্যন্ত অন্বেষণ করে। তারপর লিখতে বসে বাজারের ফর্দ। উপেন ভোরের হাওয়া খেয়ে ফিরে এসেই আবার বাজারে যান একবার। অম্বি তার আগেই বাজারের ফর্দ আর হিসাব তৈরি ক'রে রাখে।

এঘর আর ওঘর ঘুরে কাজ করে অম্বি। ঠাকুর চাকর ও মালীকে নির্দেশ দেয়। বাগানের গাছে জল দেওয়া থেকে শুরু ক'রে বারান্দার ফুলের টবের সেবার কাজ পর্যন্ত, সবই একবার নিজের চোখে না দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না অম্বি। এই বাড়ির প্রাণটাকেই যেন দুহাতে আগলে রাখতে চায় অম্বি, তারই জন্য ক্ষান্তিহীন কাজের দায় গ্রহণ করেছে। কোন্ কাপড় ধোপাকে দিতে হবে, আর কোন্ কাপড় বাড়িতেই কাচতে হবে, তারও লিস্ট ক'রে ফেলে অম্বি। তাগিদ দেয় ঠাকুরকে, আম্মির স্নানের জন্য গরম জল হলো কি না?

এই ভাবেই চলে অম্বির কাজের জীবনের পালা। রমার জীবনের পালা অন্য রকমের। সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যস্ত হয়ে ওঠে রমাও! সে ব্যস্ততার রূপ ভিন্ন। পড়ার তাগিদ, লেখার তাড়া। কলেজের উৎসবে আবৃত্তি করতে হবে, তার জন্য শেকস্‌পীয়র আর মাইকেল থেকে কবিতা মুখস্থ করার সাধনা। স্পোর্টসও আসছে, স্কিপিং-এর দড়ি নিয়ে ছাদে চলে যায় রমা। টিউটর আসেন। রমার পড়ার ঘরে যখন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পাঠ মুখর হয়ে ওঠে, তখন অন্য ঘরে আলনার উপর আপ্পির ধুতি আর চাদর গুছিয়ে রাখতে থাকে অম্বি। তারপর কলেজের বাস আসে. ব্যস্তভাবে হেঁটে বাসের ভিতরে গিয়ে বসে রমা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অম্বি। মুখে হাসি লেগে থাকে অম্বির কিন্তু সে হাসি যেন একটু ক্লান্ত। শরীরটাকেও এতক্ষণে যেন একটু ক্লান্ত বলে মনে হয় অম্বির। আস্তে আস্তে বাগানে নেমে এক গাছের ছায়ায় বসে লেস বুনতে থাকে অম্বি।

এই লেস বোনাও যেন অম্বির জীবনের এক বে-আইনী সাধনা, তাই সন্তর্পণে আর চারদিকে চোখ রেখে লেস বোনে অম্বি। আম্মি যেন না দেখতে পান। গানও শুধু গুনগুন করে অম্বির মুখে, একটা তৃষ্ণাকে যেন বুকের ভিতর গোপন করে রাখছে অম্বি। যেন শুনতে না পান আম্মি। কারণ, এই সবই তার জীবনের নিষেধ।

ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়ির আর এক নিভৃতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চিন্তাকুল আলোচনা চলতে থাকে।

চারুবালা বলে--সেই তো, সেই সমস্যাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো। পরের মেয়ে নিজের মেয়ের মত হয়ে উঠলো, অথচ...!

উপেন--কি হলো?

চারু--কে এখন বিয়ে করবে এই নিরেট মুখখু মেয়েকে?

উপেন--সমস্যাই বটে। তবে, ধর, বাঙালী সমাজেরই মধ্যে যদি এমন কোন ছেলে পাওয়া যায়, জাতে যাই হোক, লেখাপড়া সামান্য কিছু শিখেছে, আর ছোটখাট চাকরি বা দোকানদারি-টারি করছে, খেয়ে পরে বাঁচবার মত রোজগার করছে...।

চারু--পাওয়া আর যাবে না কেন। খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

উপেন--তা ছাড়া, যদি ভাল বরপণ দিই তবে...।

চারু—তাহলে তো হয়েই গেল। অম্বির মত মেয়েকে খুশি হয়ে বিয়ে করতে রাজী হ য়।

হঠাৎ রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন—কিন্তু অম্বি রাজী হবে কি?

স্বামী-স্ত্রীতে আবার বচসা বাধে। সেই পুরনো আক্ষেপ আর অভিযোগ। অম্বি যদি রাজী না হয় তবে তার জন্য দায়ী কে? কে ভুল করেছে? অম্বিকে লেখাপড়া না শেখাতে বলেছিল কে?

স্বামী-স্ত্রীতে আর একটা প্রশ্ন নিয়ে অভিযোগের হানাহানি চলতে থাকে। কে আদর দিয়ে দিয়ে অম্বির মনটাকে শৌখিন ক'রে তুলেছে? উপেনের মতে আদর দিয়েছেন চারুবালা। চারুবালার মতে, আদর দিয়েছেন উপেন।

স্বামী-স্ত্রীর এই বাড়ির বাপ ও মার এই রুক্ষ রুষ্ট কথার হানাহানির মধ্যে যেন একটা করুণতা আছে। বুঝতে পেরেছে দুজনেই, অম্বির মন তাঁদেরই মেয়ের মত একটা মন হয়ে উঠেছে। যার তার হাতে অম্বিকে গছিয়ে দিলেই কি সুখী হতে পারবে অম্বি?

স্বামী-স্ত্রীর আলোচনার স্বর আবার শান্ত হয়ে আসে। সমস্যার সমাধানের জন্য এইবার একটু শক্ত মন নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। সিদ্ধান্ত করেন দু'জনেই প্রথম, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক।

সুশ্রী সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী, সাধারণ লেখাপড়া জানা সাধারণ উপার্জনক্ষম পাত্র হলেই চলবে। ভাল যৌতুক দেওয়া হবে।

আর, দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো, অম্বি যেন বুঝতে পারে যে, আপত্তি করা বা রাজী না হওয়া ওর পক্ষে সাজে না। রমার পক্ষে যা সাজে, ওর পক্ষে তা সাজে না। রমা এ-বাড়ির মেয়ে এবং অম্বি এ-বাড়ির মেয়ে নয়। সুতরাং নিজে ভাগ্যকে চিনতে শিখে আর মেনে নিয়ে অম্বিও যেন বিদায় নেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রাখে।

চারুবালা বলে—যাতে রাজী হয়, তাই করতে হবে।

রমাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। রমার জন্য উপযুক্ত পাত্র খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। সমস্যা হলো অম্বিকে নিয়ে। তাই অম্বির একটা গতি করে ফেলতেই হয়। আগে অম্বির বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর রমার।

মাত্র দুটি মাস হলো ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে উপেন পরিবার। এই বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার জলে সূর্যাস্তের রক্তিম ছবি আর গান্ধী-মঠের সাদা চূড়া দেখা যায়। বাড়ির নির্মাণ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। পশ্চিমের বারান্দার সিঁড়িটা, দোতালার দক্ষিণের ব্যালকনি এখনো অসম্পূর্ণ। প্রতিবেশীদের সকলের সঙ্গে এখনো ভালো করে পরিচিতও হয়নি উপেন।

পাশের বাড়ির জানালায় মহিলাদের কৌতূহলী চক্ষু মাঝে মাঝে এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। নিকটের বাড়ির দুই ফ্ল্যাটের দুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিবেশিনী দুই মহিলার মধ্যে আলোচনা এবং গবেষণাও মাঝে মাঝে ধ্বনিত হতে শোনা যায়। বিশেষ করে রমা আর অম্বির সম্পর্কেই আলোচনা হয় বেশি।

একজন বলেন—পিঠাপিঠি আপন বোন বলেই তো মনে হয়। কিন্তু বয়স যেন সমান সমান।

আর একজন বলেন—নিশ্চয় যমজ বোন!

—মেয়ে দুটো ভালই।

—একটি একটু বেশি শান্ত।

—একটি একটু বেশি চঞ্চল।

—একজন বাপের মুখের আদল পেয়েছে, আর একজন মায়ের মুখের আদল পেয়েছে।

তৃতীয় আর এক মহিলা আর এক ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আলোচনায় যোগ

দেন এবং সকলকে চমকে দিয়ে বলেন--দু বোন নয়।

--তবে!

--একজন হলো উপেনবাবুর মেয়ে।

--কোন্‌টি?

--ঐ, যেটি কলেজে পড়ে।

--আর একটি কে?

--আর একটি হলো মেয়ের মত।

--সে আবার কি?

--কি জানি, মেয়ের মার সঙ্গে আলাপ হলো, উনি তো তাই বলেন।

সেই ক্ষণে উপেনের বাড়ির জানালায় দুটি হাসি-হাসি মুখ এক সঙ্গে দেখা দেয়।

একজন প্রতিবেশিনী বলেন--তোমাদের কথাই হচ্ছিল।

রমা--কি কথা?

প্রতিবেশিনী--ও তোমার কে হয়?

রমা--বোন।

প্রতিবেশিনী--এ কি রকম হলো? তোমার মা বললেন, ওটি হলো তাঁর মেয়ের মত।

রমা--তাতে কি হলো?

প্রতিবেশিনী--তাহলে তো আর বোন হলো না।

রমা--তাহলে বোনের মত?

বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কথাটা বলেই জানালা থেকে সরে আসে রমা। আর ঘরের নিভৃতে এসে অম্বিকে যেন ঠাট্টা ক'রে রাগাতে থাকে--বোনের মত! বোনের মত!

মেয়ের মত, এই কথাটাকেই যেন সহ্য করতে পারে না অম্বি। কিন্তু সহ্য করতে হয়। আম্মি বা আপ্পি, যখনি অম্বির পরিচয় দেবার সময় এই কথাটা উচ্চারণ করেন, তখনই অম্বির বুকের ভিতর যেন একটা কাঁটার খোঁচা লাগে। মলিন হয়ে ওঠে মুখটা। কখনো আভাস দিয়ে, ছলছল করে চোখ। এটা যে একটা পরিচয়ই নয়। কথাটা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয় অম্বিকে, এই পৃথিবীতে যেন বিনা অধিকারে আর ভুল ক'রে জন্ম লাভ করেছে ওর জীবন।

অম্বির বিষণ্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে রমা যেন আজ একটু বেশি বিচলিত হয়। অম্বির হাত ধরে টান দেয় রমা।--আয় তো একবার আমার সঙ্গে।

আপত্তি করে অম্বি, কিন্তু অম্বিকে জোর ক'রে হিড়-হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যায় রমা! একেবারে এসে থামে এই ঘরের দরজার কাছে, যে-ঘরের নিভৃতে বসে আলাপ করছিলেন উপেন আর চারুবালা।

উপেন আর চারুবালাকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করে রমা।--তোমরা অম্বিকে শুধু 'মেয়ের মত' 'মেয়ের মত' কর কেন?

ভয়ার্তের মত বিব্রতভাবে তাকিয়ে থাকেন উপেন আর চারুবালা। রমা বলে--আজ পর্যন্ত আমাকে বললেই না, ও আমার কে?--আমার বোন নয়?

চারুবালা বলেন--বোন বৈকি?

--তবে তোমার মেয়ের মত বল কি ক'রে?

--তুই ওসব বুঝবি না।

--বুঝিয়ে দিতে হবে।

--ওকে আমরা পেলেছি।

--আমাকে পালনি বুঝি?

—ওকে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছি।

—আর আমাকে?

--তুই যা, ওঠ এখান থেকে। তুমি অনেক জ্বালা জ্বালিয়ে হাড়মাস ভুগিয়ে তবে এসেছ।

রমা বলে--বুঝলাম অম্বি তোমাদের জ্বালায় নি বলেই ও হলো মেয়ের মত।

উপেন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে যেন তাঁর নিশ্বাসের বেদনা দমন করবার চেষ্টা করেন।

রমা বলে--আম্মি কথাটার মানে কি মা? মায়ের মত?

চারুবালা রাগ করেন--মায়েব মত কেন হবে? ওটা একটা কথা, কথাটার মানে হলো, মা।

রমা--শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াচ্ছে, ও হলো আমার বোন, তুমি হলে ওর মা, কিন্তু ও হলো তোমার মেয়ের মত। অদ্ভুত!

চলে গেল রমা। অম্বিকেও হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল।

অম্বি বলে—তুই কি আবোল-তাবোল বকছিস, আম্মি কি ভাবলেন বল তো?

কিন্তু ঘরের নিভৃতে নীরব হয়ে বসে রইলেন উপেন আর চারুবালা। রমা মেয়েটার মুখরতাগুলি কি ভয়ানক! মুহূর্তের মধ্যে মনের কতগুলি গর্ব বিশ্বাস ও ধারণাকে যেন এলোমেলো ক'রে দিয়ে গেল রমার প্রশ্ন আর মন্তব্যগুলি।

কথাপ্রসঙ্গে উপেন আর চারুবালার মধ্যে আলোচনা আবার একটু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উপেন বলেন--অম্বি যদি আজ আমাকে বাপের মত মনে করে, আর তোমাকে মায়ের মত মনে করে...।

চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা--কেন মনে করবে?

উপেন--কি আশ্চর্য, কথাগুলি গায়ে বিঁধছে কেন তোমার? তুমি তো এই চাইছ! অম্বি যেন আমাদের আপন বাপ মা বলে না মনে করে, এতদিন ধরে অম্বিকে তাই মনে করাতে চেয়ে এসেছ, চেষ্টাও করে আসছো। তবে আজ কেন...!

চারুবালা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে শেষে অভিযোগ করেন--আমাকে তর্কে হারিয়ে তুমি কি সুখ পাচ্ছ বুঝি না। কিন্তু আমি ভালর জন্যই চেয়েছি, অম্বি যেন নিজেকে রমার সমান মনে না ক'রে বসে।

অগত্যা উপেনও তাঁর মনের অভিমান আর উষ্মাকে একটু শান্ত ক'রে আনেন এবং চারুবালার মতেই সায় দিয়ে স্বীকার করেন--হ্যাঁ, সমস্যা হলো সেইখানে। জাত বুঝে একটু নীচু ঘরে, নীচু অবস্থার ঘরেই ওকে বিয়ে দিতে হবে, কিন্তু ও এই ভুলই বুঝবে যে, আমরা ওর ওপর নিষ্ঠুরতা করলাম।

চারুবালা বলেন--উচিত হচ্ছে এবার একটু ভাল করে শক্ত হওয়া, যেন অম্বি ভুল না বোঝে।

বাইরের বারান্দায় আগন্তুক এক ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরের সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন উপেন। চারুবালা বলেন--বোধ হয়, মেজমামা এসেছেন।

চারুবালার মেজমামা অর্থাৎ উপেনের মামাশ্বশুর এসেছেন। উপেন আর চারুবালা বাইরে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। হলঘরে বসে মেজমামাও নানা কুশল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন, কই তোমার মেয়েরা কই?

চারু--মেয়েরা তো নয়, একটি মেয়ে।

মেজমামা--আর সেই পালিতা মেয়েটা?

চারু--হ্যাঁ, সেও আছে।

মেজমামা--তাকে একবার দেখে যাই ওদের।

রমা আর অম্বি এসে প্রণাম করে চারুবালার মেজমামাকে। মেজমামা সস্নেহে রমার একটা হাত ধরে বলেন—এটা বুঝি তোমার সেই পালিতা মেয়েটা। আর ওটি হলো তোমার আপন...?

মুহূর্তের মধ্যে অম্বির মুখের উপর গিয়ে যেন এক দুর্লভ হর্ষের দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে চলে যায়। ভুল ক'রে যে-কথাটা বলে ফেলেছেন আম্মির মেজমামা, সেই কথাটাই যে অম্বির স্বপ্ন।

কিন্তু দেখা যায়, মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা পরাভবের আঘাতে অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে চারুবালার মুখ। চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—না, ঐ তো রমা, আমার আপন মেয়ে। আর ঐ হলো অম্বি...এখন আমার মেয়েরই মত।

অম্বির দুচোখের হর্ষ আবার নিষ্প্রভ হয়ে যায়। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি, তারপর চলে যায়।

চারুবালা কথা প্রসঙ্গে নিজের মেয়ে রমার নানা গুণের কথা বলতে থাকেন। লেখাপড়ায় ভাল, থার্ড ইয়ার, ইংরেজীতে অনার্স নিয়েছে। স্পোর্টসে প্রাইজ পায়, ডিবেটে আবৃত্তিতে প্রাইজ পায়। ভাল গাইতে পারে, ক্রাফটস্ শিখেছে নানা রকম।

রমা আপত্তি করে এবং মায়ের মুখে তার এই প্রশংসার কীর্তন শুনে লজ্জাও পায়। কিন্তু চারুবালা বলেন—রমার জন্য একটি ভাল পাত্র আপনি খোঁজ করুন মেজমামা।

পরমুহূর্তে অন্য ঘরে গিয়ে একটি আলমারি থেকে কতকগুলি এমব্রয়ডারি আর লেসের কাজ তুলে নিয়ে এসে মেজমামার চোখের সামনে তুলে ধরেন চারুবালা—আপনি দেখুন মেজমামা। নিজের মেয়ে বলে বাড়িয়ে বলছি না। রমার হাতের কাজ কত সুন্দর দেখুন।

চেঁচিয়ে ওঠে রমা—এগুলি আমার তৈরি নয় মা।

—তোর নয়? তবে কার?

—অম্বি করেছে!

—অম্বি? অম্বিকে কে শেখালে? তুই?

—না, নিজে শিখেছে।

—নিজে শিখেছে? তোর দেখাদেখি?

—আমি কিন্তু কোনদিন দেখিয়ে দিই নি।

অপ্রসন্নভাবে চুপ করে এবং মনের ভিতর পরাভবের ক্ষোভ কোনমতে সংযত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন চারুবালা। মেজমামা আশ্বাস দিয়ে গেলেন, উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করবেন।

তার পরেই অন্য ঘরে অম্বির কাছে গিয়ে যেন একটা চাপা আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য উপস্থিত হলেন চারুবালা।—এসব তুই শিখলি কবে?

—অনেকদিন আগেই।

—তবে লুকিয়ে রেখেছিস কেন? আমাকে বলিস নি কেন?

উত্তর দেয় না অম্বি। চারুবালা মন্তব্য করেন—বুঝেছি।

অম্বি ছলছল চোখে বল্‌লে—কি বুঝলে আম্মি? আমি কিন্তু...

কিন্তু ক্ষুব্ধভাবেই অম্বির আদুরে ভঙ্গির প্রশ্ন আর কাতর স্বর উপেক্ষা করে উপেনের কাছে এসে তর্ক বাধিয়ে বসেন চারুবালা।—সমস্যা খুবই খারাপ দিকে গড়াচ্ছে।

—কি?

—রমাকে হিংসে করতে আরম্ভ করেছে অম্বি।

মেজমামার মন্তব্য শুনেই চারুবালার সংস্কারের গর্ব আহত হয়েছিল। তাঁর নিজের মেয়েকে পালিতা মেয়ে বলে বোধ হয়েছে মেজমামার, আর অম্বিকে আপন মেয়ে! অম্বির মুখের হাসিটাও লক্ষ্য করেছেন চারুবালা! অভিযোগ করেন চারুবালা—দেখলে তো ওর মনে

বিষ ঢুকেছে।

উপেন বলেন--অম্বিকে দোষ দিচ্ছ কেন? বল, মেজমামার চোখে বিষ আছে।

--কেন?

--আমরা ওকে মেয়ের মত বলছি, কিন্তু পৃথিবী যে সেটা বুঝতে চাইছে না।

চারু--তুমি বলতে চাও, ভুল করছে পৃথিবীর মানুষ, অম্বি নয়?

হতাশভাবে উপেন বলেন--কে জানে?

উপেন আর চারুবালার আলোচনায় আবার নানারকম সতর্কতার সিদ্ধান্ত একে-একে দেখা দিতে থাকে। লোকে যেন ভুল না বোঝে, যেন পৃথিবীর চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিতে পারে, রমা হল আপন মেয়ে, আর অম্বি মেয়ের মত। এইবার পৃথিবীর চোখের সামনেই অম্বিকে নিজের কাছ থেকে, এই পরিবারের অন্তরের বৃত্ত থেকে একটু ভিন্ন ক'রে না রাখলে ভুল করবে সবাই, আর অম্বির মনও মিথ্যার গর্বে ও বিশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাবে।

অম্বিকে স্পষ্ট করেই বলে দিলেন চারুবালা--ওসব কাজ তোমার সাজে না, দরকারও নেই। রমা যা করবে, তোমাকে তাই করতে হবে, এর কোন মানে নেই। মেজমামার কাছে আমাকে যেরকম নাকাল করলে, এরকম যেন আর কখনো করো না।

লেসের বোঝা একটা আবর্জনা পিণ্ডের মত পাকিয়ে নিয়ে চুপ করে ঘরের একান্তে বসে থাকে অম্বি। ছট্‌ফট্ করে। তারপর আলমারির মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেই লেসের স্তূপ, বিছানার উপর শুয়ে পড়ে অলসভাবে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে অম্বি।

অম্বি আর ভুল করতে চায় না। বুঝেছে অম্বি, আপ্পি আর আম্মির মনের দুঃখটা কোথায়? রমার পক্ষে যে কাজ সাজে, অম্বির পক্ষে সে কাজ সাজে না। রমার সঙ্গে যেন কোন কাজের তুলনার মধ্যে পড়তে না হয়। রমা যে-সব কাজ করে না, এইবার থেকে মাত্র সেই সব কাজের মধ্যে হাত দুটোকে উৎসর্গ ক'রে দিতে হবে। আর, আম্মি ও আপ্পি যেন কখনো বুঝতে না পারেন, কোন দুঃখ আছে অম্বির মনে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসে অম্বি। ঘর থেকে বের হয়। তারপর এঘর ওঘর ঘুরে কাজ করতে থাকে। মনে পড়ে, চোখে দেখতে পায়, আপ্পির জুতোগুলিতে পালিশ নেই। বিকেল হয়েছে, বেড়াতে বের হবেন আপ্পি। অম্বি ব্যস্তভাবে আপ্পির জুতোতে পালিশ লাগাতে থাকে।

রমা সাজ-সজ্জা সেরে ব্যস্তভাবে এসে অম্বিকে দেখে বিরক্ত হয়ে চীৎকার করে--এ কি, তুই এখনো এসব করছিস কি? বেড়াতে যাবি না?

--আমি বেড়াতে যাব না।

--তার মানে?

--তার মানে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না।

--বাইরের ঘরে গিয়ে উপেনের পায়ের কাছে জুতো জোড়া এগিয়ে দিয়ে অম্বি বলে--ও জুতো রাখ। এটা পরো।

চারুবালা আসেন--রমা চীৎকার করে--অম্বি এরকম বদমাইশি করছে কেন?

--কি?

--বলছে, বেড়াতে যাবে না।

--নাই বা গেল, তুই একা যা।

রমা আপত্তি করে--আমি একা যাব না।

অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে রমা বলে--তুই না বলেছিলি, গঙ্গার ঘাটে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে?

অম্বি--হ্যাঁ বলেছিলাম, তাতে হয়েছে কি?

—তবে এখন যাবি না বলছিস কেন?

চারুবালা বলেন—যাবে না ওর ইচ্ছে, তুই জবরদস্তি করছিস কেন?

রমা—তাহলে আমারও যেয়ে কাজ নেই।

চুপ করে থাকেন চারুবালা আর উপেন। তারপর যেন অনিচ্ছার সুরে চারুবালা অম্বিকে বলেন—তবে তুইও যা।

ঘরের ভিতর গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে অম্বি। অম্বির সাজ দেখে চমকে ওঠেন উপেন আর চারুবালা। একটা সাধারণ মিলের শাড়ি, আঁচলটা আবার ছেঁড়া, যেন ইচ্ছে করেই রুক্ষসুক্ষ একটা মূর্তি ধারণ ক'রে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অম্বি।

রমা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে অম্বিকে ধমক দিতে থাকে। অম্বির ভাঙা বেণীটাকে নাড়া দিয়ে, আভরণহীন কানটাকে টিপে আর ছেঁড়া আঁচলটাকে দোলা দিয়ে রমা বলে—আমি যাব না, তোর সঙ্গে যেতে আমার ঘেন্না করছে।

মা ও বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অভিযোগ করে রমা—তোমরা ওকে এত লাই দিচ্ছ কেন? কিছু বলছ না যে?

নিরুত্তর হয়ে এদিক-ওদিক মুখ ক'রে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা ও উপেন।

অম্বি হেসে ফেলে, আর রমাকে পাল্টা ধমক দিয়ে বলে—তুই বেশি বাজে বকিস না। চল আপ্পি।

যাবার সময় চারুবালাকে বলে যায় অম্বি—দুধ জ্বাল দেওয়া হয় নি এখনো, রাঁধুনী দিদিকে মনে করিয়ে দিও আম্মি।

অম্বির ভালর জন্যই এই রকম কঠোরতা করতে হয়েছে। এই ধারণা আছে বলেই কঠোরতা করতে পারলেন চারুবালা। কিন্তু তবু উদাস দৃষ্টি মেলে পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। উপেনের পাশে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে দুটি মেয়ে, একটি নিজের মেয়ে আর একটি পরের মেয়ে। চারুবালার চোখের দৃষ্টি কাঁপতে থাকে, যেন নিজের এই কঠোরতাকেই সহ্য করবার শক্তি খুঁজছেন তিনি।

চাকর এসে প্রশ্ন করে—আপনি যে এখন বের হবেন বলেছিলেন মা, ট্যাক্সি ডাকবো?

মনে পড়ে চারুবালার, শ্যামবাজারে পিসিমার বাড়িতে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন।

ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখতে পান চারুবালা, ড্রেসিং আলমারির পাশে টুলের উপর রাখা আছে একটা নতুন তাঁতের শাড়ি আর ব্লাউজ, মেজের উপর ভেলভেটের একজোড়া চটি।

আম্মির জন্যই রেখে দিয়ে গেছে অম্বি, কিন্তু দেখতে পেয়ে চারুবালার দুই চোখে যেন জ্বালা লাগে। কি ভয়ঙ্কর একটা বিদ্রূপকে সাজিয়ে রেখে গিয়েছে মেয়েটা। অম্বির নাম করে নিন্দা বর্ষণ করেন—মেয়েটা যেন আমাকে জব্দ করার জন্যই জন্মেছে।

শেষ পর্যন্ত নতুন তাঁতের শাড়ি ঠেলে সরিয়ে রাখলেন চারুবালা। চাকরকে বললেন—আমি যাব না।

ফটকে গাড়ি এসে থামে। গাড়ি থেকে নেমে আসেন শ্যামবাজারের পিসিমা, সঙ্গে এক যুবক।

শ্যামবাজারের পিসিমা এর আগেও কয়েকবার এসেছেন ব্যারাকপুরের এই বাড়িতে। পিসিমার সংসার খুবই ছোট, একমাত্র নাতি ঐ অধীরই হলো পিসিমার যত স্নেহ উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার দায়। একবার কেদার-বদরী ঘুরে আসবেন, কিন্তু তার আগে নাতির বিয়ে দিয়ে সংসার থেকে দায়মুক্ত হতে চান পিসিমা। তাই কেদার-বদরীর আহ্বান বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কারণ অধীর কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। শুধু বই-পত্র লেখা-পড়া নিয়ে যেন একটা খামখেয়ালের জগতে বাস করছে অধীর। পিসিমার মনে এটা একটা দুঃখ। অনেক

কোম্পানির কাগজ আছে পিসিমার। মাঝে মাঝে রাগ ক'রে বলেন পিসিমা—যদি বিয়ে না করিস, আমি আর মাত্র একটি বছর দেখবো, তার পর হাসপাতালে সব সম্পত্তি করে দেব। পিসিমার হুমকি এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেয়। অধীরই পাল্টা বিদ্রূপ করে, আমি বিয়েও করবো না আর তোমার সব কোম্পানির কাগজও খাব।

পিসিমা বলেন--ওটি হবে না।

পিসিমার সকল কথার মধ্যে কয়েকটি আগ্রহ সবচেয়ে বেশি প্রবল, এবং নিত্যদিন তাই নিয়ে আলোচনা করেন, বাড়ির ঝির সঙ্গে কিংবা সরকার মশাই-এর সঙ্গে। এক হলো বংশের গর্ব, দুই কেদার-বদরী যাবার আকাঙক্ষা, তিন অধীরের বিয়ের জন্য চিন্তা। একটি বড় ঘর চাই, বড় ঘরের সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা একটি মেয়ে চাই। তাই পিসিমার একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রতিদিন খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পাঠ করেন। কিন্তু কোন পাত্রীই পছন্দ হয় না। প্রতিদিন অধীরকে একবার রাজী করাতে চেষ্টা করেন—বিয়ে করবি কি না বলিস?

অধীর বলে—না।

—কেন?

—ইচ্ছে হয় না।

—ইচ্ছে হলে করবি তো?

—ইচ্ছে হবে না কোনদিন।

পিসিমা বস্তুত একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। অধীরের বন্ধু যারা আসে মাঝে মাঝে, তাদেরও অনুরোধ করেন, বন্ধুকে বিয়ে করতে রাজী করাও।

অধীরের বন্ধু বলতে মাত্র দু-তিন জন যারা আসে, তারাও অধীরের মতই লেখাপড়ার জগতে বাস করে। সকলেই রিসার্চ-স্কলার। ওদের মন পড়ে থাকে দূর বেলভেডিয়ারের ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে। কেউ ইতিহাস, কেউ ভাষা, এবং কেউ বা সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে। পিসিমার অনুরোধ শুনে অনেকেই বিচলিত হয়, এবং অধীরকে অনুরোধও করে—তুমি বিয়ে করে ফেল অধীর।

অধীরের উত্তরে সেই এক কথা—যেদিন ইচ্ছে হবে।

—কবে ইচ্ছে হবে?

—তা বলতে পারি না। মোটকথা মেয়েদের সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল নয়।

বন্ধুরা হাসে। এই ধরণের আলোচনার জের মাঝে মাঝে লাইব্রেরির কক্ষে এবং বারান্দার উপরে স্কলার বন্ধুদের এক ছোট সমাবেশের মধ্যেও দেখা এবং গ্রন্থ-রাজ্যের শুষ্কতার মধ্যে সরসতার ছোঁয়াও লাগে।

বেশি নয়, সংখ্যায় ছয় জন মাত্র। ন্যাশনাল লাইব্রেরির গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সমাবেশ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে প্রৌঢ় সৌম্যমূর্তি ডক্টর ব্যানার্জিও আছে। আর সবাই যুবক। এক একটি কক্ষে নোটবই ও পেন ও বিপুল গ্রন্থের স্তূপ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই সকলে অধ্যয়ন ক'রে চলে যান। কুশল প্রশ্ন, পারিবারিক সংবাদ এবং বিশেষ ক'রে নিজের নিজের গবেষণার বিষয় নিয়ে সকলের মধ্যে বেশ একটি অন্তরঙ্গ আলোচনা চলে। পড়া শেষ হলে কখনো অধীরের কক্ষে, কখনো ডাঃ ব্যানার্জির কক্ষে, এবং কখনো বা বারান্দায় অথবা লনের উপর একটি আলাপমুখর আড্ডা দেখা দেয়। অধীরের গবেষণার বিষয় হল—এভ্রিম্যান ইজ বর্ন ইকোয়্যাল।

রুশো বলেছেন, এভ্রিম্যান ইজ বর্ন ফ্রি। কিন্তু অধীর প্রমাণ করতে চায়, শুধু ফ্রি নয়, ইকোয়্যাল জন্মগত কোন সংস্কার বলেও কিছু নেই। হেরিডেটি একটা ভুয়া থিওরি! কাস্ট একটা অতি মিথ্যা, ব্লাড কোন সংস্কারেরই ধারক নয়। এমন কি আপন পর সম্পর্ক,

আত্মীয়তাবোধ, এগুলিও হলো অবস্থার সৃষ্টি। রক্তের বন্ধন, নাড়ির টান--এসবই ভুয়ো।

গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে অধীর। পিসিমাই গর্ব ক'রে বলে থাকেন যে, সাত পুরুষ ধরে কুলীন ছাড়া অন্য কোন নীচু ঘরে এই পরিবারের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি।

অধীরের মনে যেন একটা ভয় আছে, বংশগত আভিজাত্যের ঐ সংস্কারকে কোনদিন বিশ্বাস না ক'রে বসে অধীর? তাই বন্ধুদের বলে, আমার এই রিসার্চ ডক্টরেট পাবার জন্য নয়, আমি আমার মনকেই বোঝাচ্ছি।

--এখনো কি বুঝতে পার না?

--একটু বাকি আছে।

হ্যাঁ, একটু বাকি আছে, আজও একেবারে সন্দেহহীন হতে পারে নি অধীর। পাণ্ডিত্যের দ্বারা যে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে, সেই সত্যকে আজও যেন অনুভব করতে পারছে না অধীর। একটা খটকা যেন অলক্ষ্যে মনের ভিতর রয়ে গিয়েছে। স্কলার বন্ধুদের কাছে সেই কথাও বলে অধীর।--আর একটি প্রমাণ চাই, তবেই আমার গবেষণার শেষ হবে। এমন একটি প্রমাণ, এমন একটি তথ্য, যে তথ্য অধীরের মনের খটকার অবশেষটুকু চূর্ণ ক'রে দিয়ে বিস্ময় আর বিশ্বাসে ভরে দেবে মন।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এক নিগ্রো দার্শনিকের সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই ঘটনার বিবরণ পাঠ ক'রে আশ্বস্ত হয় অধীরের মন। এই নিগ্রো দার্শনিকও চিকাগো ধর্মসভায় ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানগভীর সুন্দর এক ভাষণ দিয়েছিলেন। আফ্রিকার উপকূলে এক অরণ্যময় প্রান্তে এই নিগ্রো দার্শনিকের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। শত্রুপক্ষের আক্রমণে পরাজিত হয়ে গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলের সঙ্গে বালকও রজ্জুবদ্ধ হয়ে জঙ্গলের প্রান্তে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়েছিল। অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল পাশে। শত্রুপক্ষ দামামা বাজিয়ে উল্লাসে নৃত্য করছিল। আর কিছুক্ষণ পরেই সকল বন্দীর সঙ্গে বালককেও পুড়িয়ে মারবে জয়ী শত্রুর দল ; জয়ী ও পরাজিত, দুই গোষ্ঠীই নাকি উগ্র নরখাদক সমাজের মানুষ। দৈব অনুগ্রহে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেল বালক। হাত-পায়ের বাঁধন যেন হঠাৎ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। শত্রুর অগোচরে পালিয়ে এসে উপকূলের নিকটে শ্বেতাঙ্গ দাস-ব্যবসায়ীদের একটি জাহাজ দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিল বালক। ক্রীতদাস হয়ে আমেরিকায় চালান হলো। সেই নরখাদক অরণ্যচারী মানুষের বংশজ নিগ্রো বালকই হলো সেই দার্শনিক।

কিন্তু তবু সন্দেহ থাকে। হেরিডিটি, বংশজ গুণ ও শোণিতের সংস্কার কি সত্যই মিথ্যা? ইউনেস্কোর রিপোর্ট পাঠ ক'রে আর একদিন আর একবার বিস্মিত ও সেই সঙ্গে আশ্বস্ত হয় অধীর। ইউনেস্কোর তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে, রেসিয়্যাস ট্যালেন্ট বলে কিছু নেই। প্রতিভা জাতিগত নয়। রক্তের মধ্যে উত্তম ও অধম কোন জাতিভেদ নেই। তবু যেন মনে একটা সংস্কারের ছায়া ছটফট করে—সাতপুরুষের বংশগর্বে লালিত গোঁড়া হিন্দুর মন একটা প্রত্যয় খুঁজে পেতে চায়, সে এই গ্রন্থরাজ্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। নানা অরফ্যানেজ ঘুরে বংশগত সংস্কারের সভ্যতা বা মিথ্যার বিচার করছে অধীর কিন্তু তাতেও নিঃসংশয় হতে পারে না।

খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন পাঠ করতে করতে সেদিন চমকে উঠলেন পিসিমা—এ কি, উপেনই যে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। কই আমাকে তো একদিনও বলে নি।

উপেনের মেয়ে রমার কথা মনে পড়ে পিসিমার। এই তো উপযুক্ত মেয়ে অনেকদিনের আগের মনের আশাটাকেও নতুন ক'রে মনে পড়ে পিসিমার। অনেক দিন থেকে মনে মনে এই কথাটাই বুঝে এসেছেন পিসিমা, রমা যেমন উপযুক্ত মেয়ে তেমনই উপযুক্ত ঘর—পালটি ঘর। পিসিমা জানেন, উপেনরাও সাতপুরুষ কুলীন ছাড়া অন্য কোন নীচু ঘরে কাজ করে নি!

উপেনের মেয়ে রমার সঙ্গে যদি অধীরের বিয়ে দেওয়া যায়, তবে সব দিক দিয়েই ভাল

হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই পিসিমার। চেনা ঘর, দূর সম্পর্কে কুটুমও বটে। কিন্তু রাজী হবে কি খামখেয়ালী নাতিটা?

বাড়ির ঝি-র সঙ্গে আলাপ করে পিসিমা তাঁর নিজের মনের ধারণাই প্রকাশ করেন, যদি একবার উপেনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ছোঁড়াটাকে ফেলতে পারি, তবে বুঝলে বটার মা, আজকালকার ছেলেদের তো চিনি। মেয়ের মুখের একটি কবিতা শুনলেই হয়ে যাবে।

কিন্তু যে একরোখা ছেলে, নিয়ে যাওয়া যায় কি ক'রে?

অনেক চেষ্টা ক'রে, আর অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত অধীরকে রাজী করালেন পিসিমা। ওরে, উপেন হলো তোর বাবার বন্ধু, তোর একটা ভদ্রতা থাকাও তো উচিত। আমি এর মধ্যে সাত দিন ঘুরে এলাম, তুই একদিনও গেলি না। ওরা কি ভাবলে বল দেখি?

অধীর--উপেনবাবুর বাড়িতে মেয়ে-টেয়ে আছে নাকি?

পিসিমা--থাক না, তাতে তোর কি?

অধীর--তাতে তোমার কথার মানেটা বুঝতে পারতাম, এই আর কি!

পিসিমা রাগ করেন--তোকে সাধছে কে? আমি কেদার-বদরী চলে যাচ্ছি, আর কোম্পানির কাগজ হাসপাতালে দান করে দেব।

অধীর হাসে--চল।

চারুবালাকে প্রণাম করে অধীর। পিসিমা চারুবালার সঙ্গে যে আলোচনা করতে চান, সে আলোচনা অধীরের সম্মুখে চলে না। পিসিমা অধীরকে বলেন তুই ওঘরে বসে ততক্ষণ বই-টই দেখ দাদু। আমরা একটু সংসারের কথা বলি।

রমার পড়ার ঘরে প্রবেশ করে অধীর এবং সত্যিই বই ঘাঁটতে থাকে। বই-এর পৃষ্ঠায় নাম লেখা--রমা রায়।

এদিকে পিসিমা ও চারুবালার আলোচনা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। পিসিমা বলেন--খবরের কাগজে দেখলুম, মেয়ের বিয়ে দিতে চাও। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, রমা পাশ না করার আগে রমার বিয়ে দেবে না। তাই আমি কিছু বলি নি, নইলে আমারও অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল কথাটা পাড়ি।

চারুবালা--খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি অম্বির জন্য।

পিসিমা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে যান--অম্বির জন্য? তাই বল, তবে বৃথাই এলুম।

চারুবালার আগ্রহে পিসিমা সবিস্তার বর্ণনা করেন, অধীরের কথা। বিবরণ শুনে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন চারুবালা--আপনি এতদিন কেন বলেন নি পিসিমা? আপনার নাতি, তায় আবার এত গুণের ছেলে, এরকম পাত্র পেলে এখুনি রমাকে পার ক'রে দিই! পাশ করবে না হয় পরে।

পিসিমা--তাহলে বল? উপেন রাজী হবে তো?

চারু--খুব রাজী হবে। ভাগ্যি ভাল বলতে হবে, যদি এই বিয়ে হয়।

পিসিমা--কিন্তু একটা সমস্যা আছে। ছেলেকে রাজী করানো। তবে আমার বিশ্বাস কি জানো? রমাকে একবার দেখলে মন ফিরে যাবে। তাই ওকে সঙ্গে নিয়েই এসেছি। আর তোমাদেরও বলি অধীরকে তোমরাও মাঝে মাঝে ডেকো।

--নিশ্চয়ই ডাকবো।

--কিন্তু রমা কোথায়?

--এই এল বলে, আর একটু অপেক্ষা করুন।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বারান্দায় কতগুলি পদধ্বনির সাড়া শোনা যায়। উপেন এসে ঘরে ঢোকেন।

কিন্তু রমা আর অম্বি দুজনেই যেন নিজেদের মনের উল্লাসে কলরব জাগিয়ে আর হন্তদন্ত

হয়ে প্রবেশ করে রমার পড়ার ঘরে।

পিসিমা এবং চারুবালা যে-রকমের ঘটনা তৈরি করতে চাইছিলেন, তাই হলো। রমার পড়ার ঘরে এক অপরিচিত যুবক বসে আছে, কল্পনা করতে পারে নি রমা অম্বি। দুজনেই ঘরের ভিতর ঢুকে অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

রমা প্রশ্ন করে—আপনি কাকে চান?

অধীর -কাউকেই না। আমার দিদিমা এসেছেন এই বাড়িতে।

অন্য ঘরে উপেনকে দেখেই পিসিমা প্রশ্ন করেন—রমা কোথায়?

—রমা আর অম্বি ঐ ঘরে।

চমকে ওঠেন পিসিমা। অপ্রসন্নভাবে ভ্রূকুটি ক'রে বলেন—অম্বি আবার ওঘরে গেল কেন?

চারুবালা একটু বিচলিত হন। তিন অভিভাবক একসঙ্গেই ব্যস্তভাবে উঠে রমার পড়ার ঘরে প্রবেশ করেন। পিসিমার নির্দেশে উঠে এসে উপেনকে প্রণাম করে অধীর। তারপর আলাপ আর প্রশ্নের পালা চলতে থাকে। উপেনের প্রশ্নে অধীর বলে—একটা চাকরিও করছি আর রিসার্চও করছি।

চারুবালা বলেন—রমার জন্মদিন আসছে। সেদিন তোমাকে আসতেই হবে।

উপেন—শুধু জন্মদিনে কেন, রোজ আসবে, তুমি অবনীর ছেলে বলতে গেলে আমাদের আপন জন।

অধীর- রমা কে?

চারুবালা রমাকে দেখিয়ে দিয়ে পরিচয় শোনান—ঐ আমার মেয়ে রমা, থার্ড-ইয়ার চলছে, ইংলিশে অনার্স নিয়েছে। ডিবেটে প্রাইজ পেয়েছে, স্পোর্টসে প্রাইজ পেয়েছে।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে অম্বির দিকে তাকিয়ে একবার আমতা আমতা ক'রে কি যেন বলতে চেষ্টা করেন চারুবালা, তার পরেই বলে ফেলেন—ঐ হলো অম্বি, আমাদের মেয়ের মতই।

অম্বির মুখের উপর যেন অদৃশ্য এক চাবুকের আঘাতের জ্বালা এসে লেগেছে। মুখ ঘুরিয়ে নেয় অম্বি। পিসিমা উপেক্ষাভরে অম্বির দিকে একবার তাকান। তাঁর ইচ্ছে অম্বি এখানে না থাকলেই ভাল।

অম্বিরও বোধহয় হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ভুল হচ্ছে অম্বির। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা অম্বির পক্ষে সাজে না। এই মেলামেশার আসরে অম্বির কোন কাজ নেই। যে কাজ অম্বিকে এখন করতে হবে, সেই কাজ মনে পড়ে যায় অম্বির। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে যায় অম্বি, এবং ঠাকুরকে চা তৈরি করতে নির্দেশ দেয়।

চায়ের কাপ নিজের হাতে নিয়ে পড়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয় অম্বি—আম্মি!

চারুবালা বের হয়ে আসেন। অম্বির মুখের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে থাকেন। অম্বির হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চলে যান।—কি হলো আম্মি? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে অম্বি। কিন্তু কোন উত্তর দেন না চারুবালা। এবং ঠাকুরের কাছ থেকে অন্য এক কাপ চা নিজের হাতে নিয়ে চারুবালা ফিরে আসেন, এবং অধীরের হাতে তুলে দেন। অম্বি পুতুলের মত বারান্দার এক প্রান্তে [illegible] দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে—আবার কোথায় ভুল হলো?

পিসিমা আর অধীর [illegible] হলেন—তুমি তো আমাদের একেবারে ঘর[illegible] অধীর। এসো মাঝে মাঝে। [illegible] আমাদের আর কেউই না আছে।

সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। মনটা খুশিই ছিল চারুবালার। অধীর ছেলেটিকে

খুবই পছন্দ হয়েছে। উপেনও বার বার চারুবালার সঙ্গে আলোচনা করেন, এবং কথাপ্রসঙ্গে আশাও প্রকাশ করেন—খুবই ভাল হয়, যদি অধীরের সঙ্গে রমার বিয়ে হয়।

চারুবালা আরও উৎফুল্লভাবে আশা প্রকাশ করেন--হবে না কেন? রমাকে দেখে অপছন্দ হবার তো কোন কারণই নেই।

উপেন আবার আবৃত্তি করেন সেই কথা—রমাকে নিয়ে তো কোন সমস্যা নেই, সমস্যা হলো অম্বিকে নিয়ে।

চারুবালা বলেন--রমার বিয়ের আগেই যদি অম্বির একটা গতি হয়ে যেতো, তবে বেশ হতো। বয়সে অম্বিই তো বড়, অন্তত মাস ছয়েক তো বটেই।

উপেন--আমার মনে হয়, অম্বিও এখন সমস্যাটা বুঝতে পারছে, এখন তো আর সেই পাঁচ বছর বয়সের সেই মধুপুরের বাসার একটা বাচ্চা নয়। বড় হয়েছে, বুঝতেও পারছে। শুধু ভয় হয়, আমাদের যেন ভুল না বোঝে।

চারুবালা—কি ভুল করেছি যে আমাদের ভুল বুঝবে?

উপেন উত্তপ্ত স্বরে বলেন--এই যে আজ কাণ্ডটা হলো। মেয়েটাকে একটা ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে সারা রাজ্যি ঘুরিয়ে আনা হলো।

চারুবালার মেজাজও উত্তপ্ত হয়—তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ মনে হচ্ছে!

উপেন—খোঁটা দিচ্ছি আমার অদৃষ্টকে। ছিঃ।

চারুবালা বিরক্তভাবে ঘর ছেড়ে চলে যান। যেতে যেতে মন্তব্য করেন—আমি লাই দিতে পারবো না, পরের মেয়েকে মাথায় নিয়ে থাকতে পারবো না।

চারুবালার মনের একটা ভয় এইবার চারুবালাকে সত্যই মাত্রাছাড়া ভাবে কঠোর করে তুলেছে। পিসিমা সবই জানেন, কোন্ এক জঙ্গলের কোন্ এক অন্ত্যজ কুলি পিতা-মাতার সন্তান হলো অম্বি! পিসিমা এই বাড়ির ধুলো মাড়ান, এই তাঁর যথেষ্ট কৃপা। অম্বি আছে বলেই পিসিমা এই বাড়ির জল খান না। তবু সব সহ্য ক'রে আর ক্ষমা ক'রে, এই বাড়ির মঙ্গলের জন্যই রমাকে ঘরের বউ ক'রে নিয়ে যেতে চান পিসিমা। অধীরের সঙ্গে রমার বিয়ের প্রস্তাব এই মুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি অধীর জানতে পারে যে, জাতপাতের সংস্কার তুচ্ছ করে এই বাড়ির মানুষগুলি এক অন্ত্যজ মেয়েকে নিয়ে স্নেহের আর আদরের মাখামাখি করছে। বড় বংশের ছেলে অধীরের মনে বড় সংস্কার থাকবে, এ তো খুব স্বাভাবিক। কিন্তু পিসিমা সহায় আছেন তাই ও সমস্যা দেখা দেবে না। অম্বির জাতের কথা জানতেও পারবে না অধীর।

বারান্দা দিয়ে নিজের মনের উষ্মায় মন্তব্য করতে করতে চলে যাচ্ছিলেন চারুবালা, হঠাৎ সেই মন্তব্যের আঘাতে বারান্দার এক প্রান্তে একটি ছায়া নড়ে ওঠে। পরের মেয়ে—কথাটা শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছে অম্বি।

আম্মি? তীব্রস্বর আর্তনাদের মত আহ্বান শুনে থমকে দাঁড়ান চারুবালা। ডাক দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অম্বি। অম্বির চোখে মুখে অদ্ভুত একটা শাণিত কৌতূহল ছটফট করছে। এরকম অশান্ত হতে অম্বিকে কখনো দেখেন নি চারুবালা।

—আমি কে আম্মি?

এত কঠোর আর এত স্পষ্ট একটা প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না চারুবালা। প্রশ্ন শুনে হঠাৎ চমকে এক-পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ান চারুবালা। অম্বি বলে—কোনদিন বল নি, আজ বলতেই হবে। আমি না শুনে ছাড়বো না।

—তোর তো বড় সাহস বেড়েছে অম্বি।

—বল, আমি না শুনে ছাড়বো না।

—কি শুনতে চাস?

—আমার ছোঁয়া চা কি বিষ?

চারুবালা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে—বুঝেছি, বেশ বুদ্ধি রেখে ঝগড়া করতে শিখেছিস তো?

চিৎকার করে অম্বি—বল, আমি কে, আমার ছোঁয়া চা মানুষ খাবে না কেন?

মেজাজ হারিয়ে উত্তপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন চারুবালা—তুই ছোট জাত। যে জাতের ছোঁয়া ভদ্রলোক খায় না, সে জাতের দরজা মাড়ায় না ভদ্র জাতের মানুষ।

—আমার জাত ছোট কেন হলো?

—ছোট জাতের বাপ মা'র ঘরে জন্মেছিস তাই।

—কোথায় সেই ছোট জাতের বাপ-মা।

—নেই, পৃথিবীতে নেই। থাকলে তুই আমার বোঝা হয়ে...।

চারুবালার হাত ধরেছিল অম্বি, শক্ত ক'রে। হাত ছাড়িয়ে চলে যান চারুবালা। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, উগ্র চোখের দৃষ্টি হঠাৎ জ্বালায় ছলছল ক'রে ওঠে। ছটফট ক'রে চলে যান চারুবালা। অম্বি একটা ভাঙা মূর্তির মত মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে।

নিজের ঘরে বিছানার উপর শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন চারুবালা। উপেন এসে বলেন—তুমি ওসব কথা ওকে কেন বলতে গেলে? কি লাভ হলো?

কোন উত্তর দেন না চারুবালা। ঠাকুর এসে বলে—অম্বিদি বললেন, খাবেন না।

উপেন—অম্বি খায়নি এখনো?

ঠাকুর—না।

চারুবালা উঠে বসে—তোমরা খেয়েছ?

উপেন—হ্যাঁ, আমি খেয়েছি।

ঠাকুর—রমাদিও খেয়েছেন।

চারুবালা ঠাকুরকে বলেন—আমি খাব না।

ঠাকুর কুণ্ঠিতভাবে চলে যায়।

উপেন—নাঃ, আমার আর এসব ভাল লাগে না। উদ্‌ভ্রান্তের মত আর আক্ষেপের সুরে বলতে বলতে চলে যায় উপেন।

কিছুক্ষণ পরেই চারুবালা ওঠেন। রান্নাঘরে ঠাকুরকে থালাতে খাবার সাজাতে বলেন। নির্দেশ দেন—নিয়ে এস।

অম্বির ঘরে ঢুকে ডাক দেন চারুবালা—অম্বি।

অম্বি ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে। চোখে হাসি দেখা দেয়। লজ্জা পায় অম্বি। একেবারে শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে যায় অম্বির চেহারা। উল্টো অনুযোগ ক'রে চারুবালাকে অম্বি প্রতিবাদ জানায়—ছিঃ, আম্মি, তুমি এসব কি করছো? আমি একটুও রাগ করি নি আম্মি।

—তাহলে খা।

খেতে বসে অম্বি। চারুবালা বলেন—আমরা তো আর তোর পর নই, তোর ছোঁয়ায় আমাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু বাইরের লোক, সমাজের আর পাঁচজন তো তোকে আর মায়ার চোখে দেখে না। তারা জাত বুঝে চলে।

উপেনের ছায়ামূর্তি দেখা যায়, দরজার বাইরে নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখে শান্ত হয় উপেনের উদ্বিগ্ন চোখ, নিজের হাতে দুধের বাটি তুলে অম্বিকে খাইয়ে দিচ্ছেন চারুবালা!

অম্বির কাছে, একটা পরের মেয়ের কাছে এইভাবে হার মানতে মানতে চলেছে এই বাড়ির সব উষ্মা অভিযোগ সতর্কতা আর কঠোরতা। কিন্তু এখনো বোঝহয় বুঝতে পারেন ন

উপেন আর চারুবালা, তাঁরা হার মানছেন, হার মানতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের নিজেদেরই অন্তরের গোপনে নিহিত একটা স্নেহান্ধতার কাছে।

তবে এইবার কিছুটা আশ্বস্তও হয়েছেন উপেন আর চারুবালা। অম্বি তার জন্ম-পরিচয় জেনেছে। এইবার বুঝেছে অম্বি। বুঝেছে আরও ভাল ক'রে নিজের অদৃষ্টকে। রমাতে আর অম্বিতে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যটুকু স্বীকার ক'রে নিয়ে অম্বি নিশ্চয়ই এইবার তার ভাগ্যকে স্বীকার করে নেবে শান্তভাবেই। আপ্পি আর আম্মির স্নেহকে সন্দেহ করবে না অম্বি।

সুতরাং, অম্বির বিয়ের জন্যও একটু ভাল করে চেষ্টা করতে হয়। জাতের সংস্কারে বাঁধা এই সমাজে কোথাও কোন্ উদার মানুষ আছে, যে মানুষ জাত মানে না, শুধু মানুষের মেয়ে বলে সম্মান ক'রে অম্বিকে ঘরে নিয়ে যাবে? হয়তো আছে। কিন্তু কেমন ক'রে খোঁজ পাওয়া যায়?

অনুসন্ধান করেন উপেন। আশ্রমে পালিতা মেয়েদের বিয়ে হয় কোথায়, কেমন ক'রে? খোঁজ নিয়ে আরও হতাশ হয়ে পড়েন, এবং কল্পনা করতেও ভীত হয়ে ওঠেন উপেন। চারুবালাকে আরও চিন্তিত ক'রে উপেন বলেন—যেখানে খোঁজ করছি, দেখছি পাত্র আছে ঠিকই। কিন্তু একেবারে ভিন্ন ধর্মের পাত্র, যারা জাতপাত মানে না। তা-ছাড়া, আর যে-সব ব্যাপার শুনলাম, সে আরও ভয়ানক। যত নারী আশ্রম জুড়ে যত সব পাপীর দল বসে আছে। সেখানে বিয়েটা একটা কৌশল মাত্র, মেয়েগুলিকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যায়।

আতঙ্কিতভাবে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা। তোমাকে আর ওভাবে খোঁজ করতে হবে না। ঐ বিজ্ঞাপনই ভাল। লোক বুঝে খোঁজ খবর নিয়ে তবে সম্বন্ধ করা যাবে।

বিজ্ঞাপনেরই সূত্রে এক প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক এসে দেখা দিলেন একদিন পাত্রের পিতা। উপেন স্মরণ করতে পারেন না, কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোক বলেন—আমি ও আপনি এক কলেজেরই ছাত্র ছিলাম। নামটা এখনো স্মরণে আছে, বিজ্ঞাপন দেখেই বুঝেছি! যাক, ওসব যৌতুক-কৌতুকের আগ্রহে নয়, আপনার মত মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে, মাত্র এই আগ্রহে। তাছাড়া আপনার মামাশ্বশুরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আপনার পরিচয় জেনে আরও আগ্রহ হলো।

হ্যাঁ, ভদ্রলোক মেজমামার কাছ থেকে উপেনের সম্পত্তির কথা শুনতে পেয়েই উৎসাহিত হয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন, তিনি এসব বিষয়ে অতি উদার ; যৌতুক সম্বন্ধে তাঁর কোন দাবি নেই, ওটা স্বেচ্ছার ব্যাপার। দাবি করা বর্বরতা। তিনি শুধু মানুষ বোঝেন। মানুষ ভাল হলেই সব ভাল।

ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে সমাজের নিন্দা করেন। এখনো কতরকম জাতপাতের সংস্কারে বাঁধা রয়েছে সমাজ! বংশ বড় কথা নয়, ভদ্রতা হলো বড় কথা। টাকা আসল নয়, রুচি ও শিক্ষা দীক্ষা হলো আসল কথা। আক্ষেপ করেন—কবে যে সমাজের মনে উদারতা জাগবে?

আশা জাগে উপেনের মনে। সকৃতজ্ঞ ও সপ্রশংসভাবে আগন্তুক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে পাত্রের পরিচয় জানতে থাকেন উপেন। পাত্র সুশ্রী। পাত্র দোকান দিয়েছে, কাপড়ের দোকান, তবে একটু ক্যাপিটেলের দরকার হয়ে পড়েছে।

—তার জন্য কোন চিন্তা নেই।

—আমি আপনার কাছ থেকে এই রকমই আশা করেছিলাম উপেনবাবু। আপনার মেয়েকে ঘরের লক্ষ্মী ক'রে নিয়ে...।

উপেন এইবার আসল সমস্যার কথা উত্থাপন করেন।—কিন্তু একটি কথা আপনাকে জানাই। পাত্রী আমার মেয়ে নয়। যার বিয়ের কথা বলছি, সে আমার মেয়ের মত।

--আজ্ঞে?...হ্যাঁ, তাতেই বা কি এসে যায়?

--আমার পালিতা মেয়ে। মেয়েটি জাতে ছোট।

--কি রকম? কুলীন ঘরের নয়।

--ছোট জাতের...বেশ একটু, যাকে বলে জল অচল জাত।

ভদ্রলোক অপ্রসন্নভাবে এবং একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ান। এরকম কথা আপনার কাছে শুনবো বলে আশা করি নি।

--সে কি? আপনার মত সন্দেহমুক্ত, উদার চিত্ত...।

--রাখুন মশাই। তার চেয়ে যদি বলতেন, মেয়ের দুটো পা নেই...।

বলতে বলতে চলে গেলেন ভদ্রলোক।...এরকম লোক ঠকানো বিজ্ঞাপন আর দেবেন না মশাই।

অসহায় অপমানিতের মত, আহত রোগীর মত অবসন্নভাবে বসে থাকেন উপেন। চারুবালা এগিয়ে আসেন।

উপেন বলেন--শুনলে তো?

--শুনেছি। এইরকম ব্যাপার যে দাঁড়াবে, সেটা বিশ বছর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

--কি করা যায়?

--ওসব ভদ্রঘরের আশা ছেড়ে দাও। আর কী সব ভদ্রঘর দেখছো তো?

আশ্চর্য করলো অধীর। পিসিমার যে প্রশ্নকে প্রতিদিনই সোজা উত্তর দিয়ে শুধু না ক'রে এসেছে অধীর, আজ সেই প্রশ্নের সম্মুখেই যেন হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল অধীরের এতদিনের সংকল্পের শক্ত গ্রন্থিটা। আমতা আমতা ক'রে যে ভাষায় উত্তর দেয় অধীর, তার মোটামুটি অর্থ এই দাঁড়ায় যে বিয়ে হলে আপত্তি নেই।

তবে তো ওষুধে ধরেছে। পিসিমার গম্ভীর মুখে হাসির ছায়া কাঁপে, এবং সাফল্যের আনন্দ ঝি বটার মা'র কাছে জানিয়ে এবং অধীরকে সঙ্গে নিয়েই সোজা উপেনের বাড়িতে চলে এসেছেন পিসিমা।

--লক্ষণ ভাল, লক্ষণ ভাল। পিসিমা উৎফুল্ল স্বরে বলতে থাকেন। আমি যা ভেবেছিলাম, তাই হলো।

চারুবালা--কি ভেবেছিলেন?

--ভেবেছিলাম, ছোঁড়াকে যদি একবার কোনমতে টেনেটুনে নিয়ে এসে রমার সামনে ফেলতে পরি, তবে ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যাবে।

পিসিমার কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে চারুবালার দুই চক্ষু। উপেনও শুনে খুশি হন।

চারুবালা প্রশ্ন করেন--কিন্তু অধীর কোথায়?

পিসিমা--অধীরও এসেছে।

সুবিজ্ঞা পিসিমা অধীরকে আর একবার রমার পড়ার ঘরে বসিয়ে, অর্থাৎ রমার চোখের সামনে বসিয়ে রেখেই ভিতরে এসেছেন।

অধীর বাইরের বারান্দায় বসতে চেয়েছিল, আর রমাকে আপনি বলে সম্বোধনও করেছিল! পিসিমাই অধীরের ভুল শুধরে দিয়েছেন--রমাকে তুই আপনি করে বলছিস কেন রে? আপনি নয়, তুমি তুমি। তোর চেয়ে বয়সে রমা কত ছোট।

রমাও ভদ্রতা ক'রে বলেছে--বারান্দায় বসবেন কেন?

অধীর--তোমার পড়ার ব্যাঘাত হবে।

রমা--একটুও না। আমার পড়া হয়ে গিয়েছে।

পড়ার কথা উঠতেই অধীরের পড়ুয়া জীবনের সব আগ্রহ রুচি আর ইচ্ছা যেন একটা

স্বচ্ছন্দ সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। পড়ার কথা থেকে বই-এর কথা, সাহিত্যের ক⋯, কাব্যের কথা, শেকসপীয়র ও শেলি পর্যন্ত আলোচনা গড়াতে থাকে।

কলেজ ম্যাগাজিনে রমার লেখা একটি কবিতার খুব প্রশংসা করে অধীর। কবিতার নাম 'চন্দ্রমল্লিকা'।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয় অধীর। চন্দ্রমল্লিকা এই কথাটাই যেন কয়েকদিন আগের একটি মিষ্টি গম্ভীর ও শান্ত মুখচ্ছবি চকিতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে অধীরের, তার হাতে একটা চন্দ্রমল্লিকা ছিল...এই ঘরে এইখানে দাঁড়িয়েছিল সে। হঠাৎ চলে গেল। রমার মা যাকে বললেন তাঁর মেয়ের মত, কোথায় গেল সেই মেয়ে? সে কি এই বাড়ির মেয়ে? এখানেই থাকে?

রমাকে প্রশ্ন করে অধীর--আচ্ছা, সেদিন যে আর একজনকে দেখলাম, তোমার মা যাকে বললেন মেয়ের মত...।

--অম্বির কথা বলছেন?

--হ্যাঁ।

--আসুন।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে রমা ; বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়--অম্বি!

কোন সাড়া না পেয়ে, বারান্দা থেকে নেমে বাগানের এক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয়--অম্বি! দেখতে পায় রমা, অম্বি দাঁড়িয়ে আছে জলের ঝারি হাতে, চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে।

--আসুন। অধীরকে ডাক দিয়ে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অম্বির কর্মব্যস্ত মূর্তির সম্মুখে দাঁড়ায় রমা। বিব্রত লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে অম্বি। রমাই চীৎকার ক'রে অম্বির গুণের পরিচয় ব্যাখ্যা করে, এবং সেই ব্যাখ্যায় অম্বির পরিচয় যেন এক নতুন রহস্যের ফুলের মত ফুটে ওঠে।

রমা বলে--আমি কবিতায় চন্দ্রমল্লিকা লিখি, আর অম্বি সত্যি চন্দ্রমল্লিকা ফোটায়।

বিস্মিত অধীরকে আর একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেয় রমা।--এই যত সব ফুল দেখছেন, সবই ওর হাতের যত্নে তৈরি। ওর হাতে যাদু আছে।

কথাপ্রসঙ্গে অধীর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে--অম্বির লেখা কবিতা কোথায়? দেখতে চাই কার রচনা ভাল।

রমা বিব্রতভাবে বলে--অম্বি ওসব...।

অধীর নিজের কথার ঝোঁকেই নানা প্রশ্ন করতে থাকে।--অম্বিও কি ইংলিশে অনার্স নিয়েছে? অম্বির এখন কোন্ ইয়ার? কোন্ কবিকে ভাল লাগে অম্বির! শেকসপীয়রের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ভাল না মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স। ভাল?

রমাই অপ্রস্তুত হয়ে, আর একটু বিচলিত হয়ে বাধা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে অধীরকে--অম্বিকে যেন মিছিমিছি ওসব কথা ব'লে...।

হঠাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন উপেন, চারুবালা আর পিসিমা। উপেন আর চারুবালা পিসিমাকে নতুন বাড়ির অন্দর ও বাহিরের মূর্তিটাকে দেখিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন। কোথায় এখনো কাজ বাকি আছে কোথায় নতুন দুটো ঘর আরও হবে। একটা অসম্পূর্ণ সিঁড়ির কাছে এসে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন পিসিমা। আতঙ্কিত পিসিমা বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলেন--এ যে আত্মহত্যার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছ উপেন।

তারপর আবার নারকেলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পারিবারিক নানা সমস্যা ও কথা আলোচিত হয়। অম্বির জন্য যে দুশ্চিন্তা রয়েছে মনে, সেকথাও প্রকাশ করেন চারুবালা। অম্বির সম্বন্ধে মন্তব্য করেন--মেয়েটা অবুঝ নয়, এবং ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ, যে-কোন

জাতের ঘর, একটু গরিব হলেই বা ক্ষতি কি, মোটামুটি মানুষ ভাল, এই রকম ঘরে যদি মেয়েটাকে নিতে কেউ রাজী হতো তবে...।

পিসিমা আশ্বাস দেন--বল তো আমি চেষ্টা করি...

চেষ্টা করুন পিসিমা।

পিসিমার মনের ইচ্ছা, অম্বির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা আগে ভাগেই করে রাখা ভাল। কারণ পিসিমার মনে একটা শঙ্কা আছে যে, উপেনের এই সম্পত্তির অধিকারে যেন অম্বি নামে ঐ পরের মেয়েটা কোন ভাগ দাবি করার সুযোগ না পায়। যেন ঐ ঝঞ্ঝাটই না দেখা দেয়, তারই জন্য পিসিমার মনে চিন্তা আছে। একমাত্র মেয়ে রমাই পাবে সম্পত্তি, এবং রমার পাওয়া অর্থ তাঁর নাতি অধীরের পাওয়া। অম্বির যদি বিয়ে না হয়, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। কারণ মায়ার বশে উপেন তার ঐ পালিতা মেয়ের জন্য সম্পত্তির কিছু রেখে যাবেই। সমস্যার এই দিকটা কদিন থেকেই পিসিমার মনের ভিতরে একটা দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তুলেছে।

অম্বির সম্বন্ধে উপেন আর চারুবালার মায়ার ব্যাপার দেখে মনে মনে আরও সাবধান হয়েছেন পিসিমা। হ্যাঁ, খোঁজ করতে হবে, উপেনের এই পালিতা মেয়েটার জন্য এমন একটি পাত্র খুঁজতে হবে, যাকে মাত্র দু-তিনটে হাজার টাকা হাতে ধরিয়ে দিলেই সে খুশি হয়ে উপেনকে দায়মুক্ত করে দেবে। তারপর, উপেনের যা রইল, সবই মেয়ে রমার জন্য, অর্থাৎ জামাই-এর জন্য ; অর্থাৎ তাঁরই স্নেহের নাতি অধীরের জন্য রইল। এই ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে পারলেই খুশি মনে কেদার-বদরী যেতে পারবেন পিসিমা।

পিসিমা তাঁর যুক্তিগুলি মনের ভিতর চেপে রেখে শুধু ইচ্ছাটাকেই ব্যক্ত করলেন। আশ্বাস দিলেন--কোন চিন্তা নেই, অম্বির একটা গতি ক'রে দিচ্ছি।

হঠাৎ চোখে পড়ে সকলেরই, চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছে অধীর আর রমা, আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনছে অম্বি। দৃশ্যটাকে দেখতে ভাল লাগে না কারও। তাই সবাই ব্যস্তভাবে ঘটনাকে যেন একটু ভাল ক'রে বুঝবার জন্য এগিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়েছেন।

অধীর রমার কলেজ ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে--রমার কবিতা চমৎকার। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, অম্বি কেমন লেখে?

চারুবালা মৃদু হেসে বলেন--তুমি ভুল বুঝেছ অধীর। অম্বির ওসব গুণ নেই। অম্বি এইসব ফুল ফোটানো আর বাগান সাজানো কাজই করতে পারে, আর এইসব কাজ নিয়েই আছে।

অধীর হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। পিসিমাই বাধা দিয়ে বলেন--চল্ দাদু।

অম্বি একা দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে। আর উপেন চারুবালা পিসিমা রমা ও অধীর ফটক পর্যন্ত এগিয়ে যায়! বিদায় নেয় পিসিমা ও অধীর।

এত বড় পৃথিবীর সংসারভরা এই আলোছায়ার মধ্যে যেন বিশেষ ক'রে তিনটি স্থানের ঘটনার রূপগুলিই একে একে বদলে যেতে থাকে। ব্যারাকপুরের এই নতুন বাড়ি, শ্যামবাজারের ঐ বনেদি বাড়ি, আর বেলভেডিয়ার বাগানের ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাঠকক্ষ। এই তিন ভিন্ন স্থানের মানুষগুলির মনের আগ্রহও এক একটি কারণে ও ঘটনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পিসিমা ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, দুটি চেষ্টায়। অধীরকে বিয়ে করতে রাজী করবার চেষ্টায়। পিসিমার বিশ্বাস আছে, অধীরের বিয়ে করতে রাজী হওয়ার অর্থ রমাকে বিয়ে করা। উপেনের সম্পত্তির বংশের ও স্বভাবের গুণগান করেন পিসিমা। রমার প্রশংসায় সর্বদা মুখর

হয়ে থাকেন পিসিমা। অধীর শোনে, বেশ আগ্রহ নিয়েই শোনে। কিন্তু স্পষ্ট ক'রে কোনো মন্তব্য করে না।

আর একটি দুরূহ ব্রতে ব্রতিনী হয়েছেন পিসিমা। অম্বির জন্য একটা পাত্রের সন্ধান। বটার মাকে বলেন, ড্রাইভারকে বলেন, বলতে বলতে মনের কথাও প্রকাশ ক'রে ফেলেন পিসিমা--তোমরা চেষ্টা ক'রে একটা খোঁজ খবর কর, যেমন তেমন একটা মানুষ হলেই হোলো। দোজবরে হোক, আর তেজবরে হোক। যে কোন জাত হোক। হাভাতে হোক, আর যাই হোক, কুড়িয়ে পাওয়া একটা মেয়েকে পার করতে হবে, তার জন্য তো আর রাজপুত্তুর পাওয়া যাবে না।

ড্রাইভার আশ্বাসে দেয়, বটার মাও বলে--দেখছি খুঁজে, নিশ্চয় পাওয়া যাবে এমন পাত্তর।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাঠকক্ষে একা বসে যখন বই-এর স্তূপ ঘাঁটাঘাঁটি করে অধীর, তখন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকে। হঠাৎ নিজেই লজ্জা পায়।

পরদা সরিয়ে প্রৌঢ় স্কলার ডক্টর ব্যানার্জি যখন উঁকি দেন, তখন আনমনা ও উদাস অধীরকে দেখে বেশ একটু বিস্মিত হন। হেসে হেসে প্রশ্ন করেন--হ্যালো ইয়ং স্কলার, আনমনা কেন?

লজ্জিত অধীর ডক্টর ব্যানার্জিকে কাছে ডেকে আবার তার থিসিস নিয়ে আলোচনা করে। ডক্টর ব্যানার্জি আশ্চর্য হয়ে বলেন--সে কি, আর কিছুই তো এগোয়নি দেখছি, সেই হেরিডিটির চ্যাপ্টার নিয়েই পড়ে আছ।

স্কলার বন্ধুরা মাঝে মাঝে লাইব্রেরির বারান্দার আড্ডায় আলোচনা করতে বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে সন্দেহই করে ফেলে--অধীরের হলো কি? আজকাল প্রায়ই অ্যাবসেন্ট হচ্ছে দেখছি। যায় কোথায়?

বন্ধুরা জানেন না, অধীর তখন ব্যারাকপুরের এক নতুন বাড়ির বাতাসে যেন তাঁর জীবনের প্রথম অনুভূত এক সৌরভের রহস্যকে সন্ধান ক'রে ফিরছে। প্রায়ই আসে অধীর। এবং অধীরের এই আসা-যাওয়ার ঘটনার ভিতর দিয়েই এই বাড়ির যে পরিণাম তৈরি হয়ে চলেছে, সেটা এই বাড়ির বাপ ও মা অনুমান করতে পারেন।

অধীর বুঝতে পেরেছে, কেন সে আসে? কোন গুণ নেই, কবিতা লিখতে পারে না, সামান্য লিখতে পড়তে মাত্র শিখেছে, অম্বি নামে সেই মেয়েই যে মূর্তিমতী কবিতার মত ফুটে রয়েছে। এই বাড়ির বাগানের চন্দ্রমল্লিকাও যেন অম্বির মতই গম্ভীর অথচ স্নিগ্ধ। শুধু চোখের তৃষ্ণা নয় বুঝতে পেরেছে অধীর, তার মনের এক দুর্বার তৃষ্ণা তাকে একেবারে বেহায়া করে দিয়ে এই বাড়ির দিকে টেনে আনে, প্রায় প্রতিদিন। অম্বিকে দেখতে ভাল লাগে, অম্বিকে দেখতে আশ্চর্য লাগে।

আর, উপেন ও চারুবালা বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের সুন্দরী শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না মেয়ে রমার রূপের আর গুণের আকর্ষণেই অধীর নামে ঐ শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন আর উচ্চবংশীয় ছেলেটি এখানে আসে। দেখতে পায়, দেখে নিঃসংশয় হন উপেন আর চারুবালা। রমার প্রতিভা, রমার লেখাপড়ার কৃতিত্ব, রমার নানা গুণের প্রশংসা করে অধীর। অম্বির সঙ্গেও মাঝে মাঝে কথা বলে অধীর, কিন্তু সেটা নিতান্তই কথা বলা মাত্র! দেখে খুশী হয়েছেন চারুবালা, অম্বিও অধীরের কাছ থেকে দূরে থাকতে ভালবাসে। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে অম্বিকে, ভাল করেই জানে অম্বি, অম্বির ছোঁয়া জল খেলে জাত যাবে অধীরের। সুতরাং অন্য কোন ভয়কে মনে স্থান দেন না চারুবালা ও উপেন।

এর মধ্যে চিন্তার দিক থেকে শুধু নির্বিকার মনে হয় রমাকে। রমা এখনো যেন রহস্যের বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারে নি। আড়ালে আলাপ ক'রে হাসাহাসি করেন উপেন ও চারুবালা।--রমা মেয়েটার মনটা একেবারে সাদা। এখনো কল্পনাও করতে পারে নি যে, অধীর ওকে বিয়ে

করতে চায়, ওরই জন্য অধীর আসে, বিয়ে হবে অধীরেরই সঙ্গে। যদি বুঝতো, তবে রমা সেদিন অমন করে অধীরকে একা ঘরে বসিয়ে রেখে গটগট ক'রে কলেজের স্পোর্টসে চলে যেতে পারতো না। এখনো স্পোর্টসই ওর কাছে জীবনের সবচেয়ে বেশী প্রিয়।

চারুবালা মাঝে মাঝে উপদেশ দেন রমাকে--অধীর এলে ওরকম হেলাফেলা ভাব দেখাস নি। কত ভাল ছেলে, কত শিক্ষিত, কত বড় বংশের ছেলে। আপন জন মনে করে বলেই তো আসে।

কিন্তু এই উপদেশ প্রায়ই ভুলে যায় রমা।

বারান্দার থামের পাশে সোফায় বসে আপ্পির চাদরের ছেঁড়া রিপু করে অম্বি। হঠাৎ ফটকের দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠে। অধীর আসছে, থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে অম্বি। কিন্তু অধীর এসেই হাসিমুখে অম্বির কাছে দাঁড়ায়। অম্বি অপ্রস্তুত ভাবে আর একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলে--আসুন, রমা আছে ওখানে।

অধীরও একটু বিব্রতভাবে চলে যায় রমার ঘরের দিকে। রমাও অধীরকে দেখতে পেয়েই ব্যস্তভাবে বলে—আসুন। পরমুহূর্তে বলে--ঐ যে ওখানে অম্বি বসে রয়েছে।

অধীর বলে—হ্যাঁ, অম্বির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

দুচারটে মোটা মোটা বই আর ম্যাগাজিন অধীরের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে রমা বলে —পড়ুন আমি আসছি।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে অম্বিকে দেখে একবার থমকে দাঁড়ায় রমা তারপর বলে— গীতার মা ডেকেছে, আমি চললাম অম্বি।

অম্বি—কেন?

রমা—চণ্ডালিকার রিহার্সাল আছে।

তারপর একটু ভ্রূভঙ্গি ক'রে আর বাইরের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে আস্তে আস্তে বলে— আর পারি না, ভদ্রলোক সব সময় বই নিয়ে যত ঘ্যানর ঘ্যানর—ধেৎ।

অম্বি শাসনের ভঙ্গিতে বলে--ছিঃ, কি আবোলতাবোল বলছিস।

চলে যায় রমা।

চারুবালা এসে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন অম্বিকে—রমা কোথায় গেল?

অম্বি উত্তর দেয়—গীতাদের বাড়ি।

চারুবালা মেয়ের উদ্দেশে ধমক দিতে গিয়ে সামলে নিলেন। তারপর ঘরের ভিতরে অধীরের কাছে এসে রমারই প্রশংসা ক'রে বলেন—রমা খুব সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে কি না, তাই ওরই ওপর অভিনয় দেখাবার ভার পড়েছে। গুণ আছে, লোকে ছাড়বে কেন? যাক —তুমি চা না খেয়ে যেও না অধীর।

চারুবালা চলে যেতেই এই বাড়ির এইখানেই যে একটি নিভৃত এক মধুর সুযোগ নিয়ে আপনি ধরা দেয়, সেই নিভৃতের মধুরতা তুচ্ছ করে থাকতে পারে না অধীর। পড়ার ঘর থেকে নিজেই উঠে আসে বই হাতে নিয়ে। অম্বির কাছে এসে দাঁড়ায়। অম্বি অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। অধীর বলে—তোমার সবচেয়ে বড় গুণ কি জান অম্বি?

অম্বি আশ্চর্য হয়—আমার?

অধীর—হ্যাঁ তোমার সবচেয়ে বড় গুণ হলো, তোমার কোন গুণ নেই।

অধীরের কথার মধ্যে যেন মোহ আছে। কিন্তু শুধু শুনতে পেয়ে নয়, অধীরের চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে সন্ত্রস্ত হয় অম্বির চোখের দৃষ্টি। অধীরের ঐ চোখেও যে কেমন একটা মুগ্ধতা ফুটে রয়েছে।

অম্বি প্রশ্ন করে—দিদিমা কেমন আছেন?

হেসে হেসে অনুযোগ করে অধীর—এই কি আমার কথার উত্তর হলো?

অম্বি হাসে—আমি কি বলবো বলুন।

অধীর—কেন? জিজ্ঞাসা করলেই তো পার, আমার সবচেয়ে বড় দোষ কি?

অম্বি—আপনার দোষ?

অধীর—হ্যাঁ।

অম্বি হাসে—আপনার দোষ থাকলেও আমি তো কিছু জানি না, বুঝতেও পারি না।

অধীর—সত্যিই বুঝতে পার না।

অম্বি—না।

অধীর—আমার সবচেয়ে বড় দোষ, তোমাকেই দেখবার জন্য এখানে আসি।

চমকে উঠে, ভীতভাবে মুখ লুকোবার চেষ্টা করে অম্বি। ঘরের ভিতর থেকে ডাক শোনা যায় চারুবালার—তোমার চা দেওয়া হয়েছে অধীর।

একেই বোধহয় বলে পরশমণির ছোঁয়া। অম্বির মনের সব ভাবনা ও স্বপ্নের রং বদলে দিয়ে গেল অধীরের ঐ কয়েকটি কথা আর অধীরের চোখের ঐ দৃষ্টি।

কাজ করতে করতে আনমনা হয় অম্বি। জীবনে এই প্রথম হঠাৎ ভুল ক'রে কাজের মাঝখানেই বারান্দার উপর এসে দাঁড়ায়। দৃষ্টি ছুটে যায় ফটকের দিকে। আগন্তুক একটা পদধ্বনির জন্য অম্বির মনের কল্পনাই যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কখনো বা এসে রমার পড়ার ঘরের ভিতরে দরজার বাইরে থেকে উঁকি দেয়। দেখতে পায়, শুধু একা রমা পড়ার বই কোলে নিয়ে কৌচে বসে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ চোখ মেলে তাকায় রমা। প্রশ্ন করে—কি রে? চোরের মত তাকাচ্ছিস কেন রে?

ঘরে প্রবেশ করে অম্বি—তুই ডাকাতের মত ঘুমোচ্ছিস কেন রে? পরীক্ষা এগিয়ে আসছে মনে নেই।

—তুইও আমাকে শাসন করবি? রমা তেড়ে আসে। অম্বি ছুটে গিয়ে হলঘর পার হয়ে একেবারে ভিতরের বারান্দায় গিয়ে আপ্পির পিছনে ভাল মানুষের মত দাঁড়ায়। রমা ব্যর্থ হয়ে ভালমানুষের মত বই হাতে চারুবালার চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

কৌতূহলী হয়ে রমাকে প্রশ্ন করেন উপেন—কি, কিছু বুঝতে হবে নাকি? হিস্ট্রি?

রমা বই-এর আড়ালে মুখ টিপে হাসে—না।

উপেন বাইরে বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চারুবালা বলেন—ব্যাঙ্কের কাজ সেরে, জিনিসপত্রগুলি একেবারে কিনে নিয়েই চলে এস।

কতগুলি পায়ের শব্দের সাড়া এগিয়ে আসে। প্রবেশ করেন পিসিমা আর অধীর।

উপেন বলেন—আসুন পিসিমা, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেবেন, এখনি একবার কাজে বের হতে হচ্ছে।

অম্বি বলে—এই রোদের মধ্যে এখন আবার কোথায় চললে আপ্পি?

উপেন—রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে পাহাড়ে জঙ্গলে কাজ করেছি ত্রিশটি বছর। রোদের ভয় আমাকে দেখাস না অম্বি!

কিন্তু উপেনকে সহজে রেহাই দেয় না অম্বি। দেখতে পায় অম্বি, আপ্পির কামিজের একটা বোতাম নেই। ছুঁচ সুতো আর বোতাম নিয়ে আসে অম্বি। জামাতে বোতাম বসিয়ে ছুঁচ চালাতে থাকে তার পরও থামে না। উপেনকে চেয়ারে বসিয়ে, জুতোর ফিতে আবার ঠিক করে বেঁধে দেয়। ব্রাশ নিয়ে আসে, উপেনের মাথার চুল অম্বি নিজের হাতেই ব্রাশ ক'রে দেয় ভাল ক'রে।

উপেন স্নেহার্দ্র স্বরে বলেন—অম্বির অত্যাচার এইভাবেই সহ্য করছি পিসিমা। এই মেয়েটা আমাকে একটা খোকা ক'রে রেখেছে।

পিসিমা শুকনো স্বরে বলেন--তুমি বেরুচ্ছ উপেন কিন্তু আমার যে একটা দরকারী সংসারী কথা ছিল...।

হ্যাঁ বলুন। ইঙ্গিতে পিসিমাকে অন্য ঘরে আসতে আহ্বান জানিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন উপেন আর চারুবালা। চারুবালা বলে যান--অধীরকে চা দিতে ভুলিস না রমা।

কিন্তু ভুল হয় রমার। হঠাৎ রমাও পাশের বাড়ির এক জানালার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে--দরকারী কথা?

সত্যিই পাশের বাড়ির জানালায় এক মহিলার মূর্তি হাত তুলে ইঙ্গিতে রমাকে ডাকছিলেন। অম্বির দিকে তাকিয়ে রমা বলে--হাসিবৌদি ডাকছেন, কি যেন বলতে চাইছেন।

চলে যায় রমা। ভিতরের বারান্দায় আবার এক নিভৃত অধীর ও অম্বির সান্নিধ্যকে যেন নিবিড় ক'রে দেবার জন্য আপনি রচিত হয়।

অম্বি চোখ তুলে তাকাতে পারে না তারই মুখের দিকে, যাকে দেখবার জন্য ওর সারাক্ষণের আগ্রহ উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

অধীর বলে--রমা ঠিকই বলেছিল অম্বি। তোমার হাতে যাদু আছে।

অম্বি লজ্জিত হয়--ওরকম ক'রে বলবেন না।

অধীর--স্বচক্ষেই তো দেখলাম, তোমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে উপেনবাবু কেমন শিশুর মত হয়ে গেলেন।

ওদিকের পাশের বাড়ির জানালায় হাসিবৌদি আর রমার মধ্যে আলোচনা চলে। হাসিবৌদির কথাগুলির আড়ালে কেমন একটা ঠাট্টা যেন লুকিয়ে। প্রশ্ন করেন হাসিবৌদি--কে উনি?

রমা বলে--আত্মীয়।

হাসিবৌদি--কেমন আত্মীয়?

রমা--বাবার মাসতুতো ভাই-এর পিসিমার নাতি, শ্যামবাজারে থাকেন।

হাসিবৌদি নাক কুঁচকে হাসেন--অ্যাঁ, তাই বলো, অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

রমা--হ্যাঁ।

হাসিবৌদি--তাহলে নিকট সম্পর্ক হয়ে যেতে কোন অসুবিধা নেই?

রমা--আজ্ঞে? কি বললেন?

হাসিবৌদি হাসতে হাসতে জানালা থেকে সরে যান--আচ্ছা আসি।

রমার হঠাৎ মনে পড়ে চায়ের কথা। নিজের মনেই আক্ষেপ করে--দূর ছাই, ভুলেই গিয়েছি। চা, চা তৈরি কর ঠাকুর। বলতে বলতে অন্যদিকে চলে যায় রমা।

অন্য ঘরে পিসিমা সেই দরকারী সংসারী কথাটা ব্যক্ত করেন--অম্বির জন্য পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। তলাপাত্র, বেশ ভাল পাত্র! তোমরা আর মনে কোন বাধা না রেখে রাজী হয়ে যাও উপেন।

পাত্রের পরিচয়ও জানিয়েছেন পিসিমা--পাত্রের একটু বয়স হয়েছে, এই যা। আর জাতের দিক দিয়ে একটু নীচু, এই মাত্র। কিন্তু টাকা পয়সা বেশ আছে। আর সংসারে একেবারে একা মানুষ, আপন বলতে কেউ নেই। সামান্য রকমের যৌতুক দিলেই--।

চারুবালার মুখটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়, চোখও হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন--পাত্রের বয়স কি খুবই বেশি?

পিসিমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন--হ্যাঁ গো, বেশি বৈকি, এই আমাদের অধীরের বয়সেরই মত একটু বেশি বয়স।

চারুবালা হাঁপ ছাড়েন--তাহলে আর কি এমন বয়স? বেশ কাঁচা বয়স, অম্বির সঙ্গে মানাবে ভাল।

পিসিমা বলেন--সহজে কি রাজী হয়? শুধু আমার উপদেশে রাজী হয়েছে, আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে কিনা।

উপেন বলেন--আপনি যখন বলছেন ভাল, তখন আমাদের মনে আর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না পিসিমা।

পিসিমা আবার সেই সামাজিক ভয়ের কথা তুলে সূক্ষ্ম কৌশলে যেন আর একবার উপেনকে একটু ভয় পাইয়ে দেন। পিসিমা বলেন--অম্বিকে বিদায় না করার আগে আমিই বা কোন্ প্রাণে রমাকে বিয়ে করবার জন্য অধীরকে বলতে পারি। তোমরা জাতের নিয়ম না মেনে যে বংশের সম্মান একটু গোলমাল ক'রে রেখেছো।

চুপ ক'রে শুনতে থাকেন উপেন ও চারুবালা।

পিসিমা বলেন--তবু তুমি কি যেন ভাবছো উপেন।

উপেন--মেয়েটার কথাই ভাবছি পিসিমা। নিজের মেয়ে নয়, কিন্তু তবু ঐ মেয়েটাই চলে গেলে আমার কি দশা হবে বুঝতেই পারছেন, স্বচক্ষেই তো দেখলেন। আমি কিসে পয়সা খরচ করলাম, আমি মনে করতে পারি না। মনে করিয়ে দেয় অম্বি। আমার হাতের লাঠিটা হাতের কাছে অম্বি এগিয়ে না দিলে, লাঠি নিতেই ভুলে যাই।

চারুবালা বলেন--কথাটা সত্যিই, অম্বি চলে গেলে সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়তে হবে ওকেই।

পিসিমা মনের বিরক্তি চেপে রেখে বলেন--তা তো হবেই। কাজের ঝি চাকর চলে গেলে কষ্টে পড়তে হয়। ওরকম কষ্ট সবাইকে সহ্য করতে হয়। আমার কাছেও তো ছিল সাবিত্রী, এগারটি বছর। হঠাৎ চলে গেল, আমাকেও কষ্টে পড়তে হয়েছিল বৈকি।

চমকে ওঠেন উপেন আর চারুবালা। কাজের ঝি-চাকর চলে গেলে যতটুকু কষ্ট হয়, মাত্র ততটুকু কষ্ট হবে অম্বি চলে গেলে? তাই কি? এই ভয়ংকর মিথ্যাটাই কি সত্য? উপেনের শান্ত চোখ দুটো হঠাৎ বড় বেশি ছটফট করতে থাকে! চারুবালা কেঁপে কেঁপে নিঃশ্বাস ছাড়েন।

উপেন কুণ্ঠিতভাবে বলেন--না, কথাটা ঠিক তা নয়। যাক গিয়ে--পাত্র যদি ভাল হয়।

পিসিমা--যদি বলছো কেন, সব দিক দিয়ে ভাল পাত্র।

চারু--বেশ তো, কথা রইল, আমরাও একবার পাত্রকে দেখি...তারপর।

পিসিমা--নিশ্চয়, দেখবে বৈকি।

ভিতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অধীর তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে অম্বিকে কি-যেন বলবার জন্য চেষ্টা করছিল ; আর অম্বির চোখ দুটোও যেন ভয় পেয়ে অধীরের মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে ছিল।

অধীর বলে--তোমার সঙ্গে আমারও যে একটা দরকারী সংসারী কথা আছে অম্বি।

অম্বি বলে--বলুন।

ডাক শোনা যায়--অধীর কোথায় রে!

পিসিমা ডাকছেন। এই দিকেই আসছেন পিসিমা, উপেন আর চারুবালা। আর কথা বলা হলো না। চলে গেল অধীর।

অন্য ঘরের নিভৃতে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে অম্বি সেই ঘরের মূর্তিটাকে, যে-মানুষ আজ না বলা কথার বেদনা দিয়ে চলে গেল।

রমার জন্মদিনের উৎসবটাই একটা ঘটনা সৃষ্টি ক'রে অধীর ও অম্বির মনকে আরও নিবিড় সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে মধুর পরিণামের চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিল।

সে ঘটনায় বেদনার অশ্রু ছিল, কিন্তু সেই অশ্রুর মধ্যেও ক্ষণিকের এক হর্ষময় মধুরতা হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

রমার জন্মদিন। প্রতি বছর রমার জন্মদিন হয়ে আসছে। আর শুধু আপ্পি আর আম্মির কাছে গল্প শুনেছে অম্বি, ছোট্ট অম্বি একদিন রমাকে হিংসে ক'রে আর জোর ক'রে জন্মদিন করিয়ে নিয়েছিল। সেই কাহিনীটুকুই জানে অম্বি, সেই ঘটনার ছবি একটুও মনে পড়ে না। অম্বি জানে, তার জন্মদিনটাই হারিয়ে গিয়েছে এই পৃথিবীর বাতাসে চিরকালের মত।

রমার জন্মদিন। পরিপাটি সাজে সেজেছে রমা। অম্বির ঘরের ভিতর হঠাৎ এসে ধমক দেয় রমা—কি, আজও তুই পেত্নী সেজেই থাকবি না কি? তা হবে না।

অম্বিকে প্রায় জোর করেই সাজাতে থাকে রমা। সাজ শেষ হলে হাত ধরে বাইরের ঘরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে, সেখানে অভ্যাগতদের জন্য আসর সাজানো হয়েছে।

অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে, এবং তারপরেই স্নেহাক্ত ও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন চারুবালা ও উপেন। রমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমের দিকে চলে যাচ্ছে অম্বি। উপেন আর চারুবালা চাপাস্বরে, যেন একটা বেদনা চাপা দিয়ে আলাপ করেন—অম্বিটার মুখটা কি সুন্দর দেখলে তো। কপালে শুধু একটা চন্দনের টিপেই সারা মুখটা মিষ্টি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের দোষ...।

উপেন—আমাদের ভাগ্যের দোষ বল।

চারুবালা—তা তো বটেই।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সবচেয়ে আগে এলেন পিসিমা, সঙ্গে অধীর। এসেই রমার গলায় পরিয়ে দিলেন একটি হার—জন্মদিনের উপহার।

উপেন আর চারুবালা একসঙ্গে বলেন—এ আবার কি কাণ্ড করলেন পিসিমা। আপনার আশীর্বাদই যথেষ্ট।

পিসিমা—এতদিন তোমরা দূরদেশে ছিলে, চোখেও দেখতে পাই নি মেয়েটাকে, আর মনের সাধও পূর্ণ করতে পারি নি। আজ সুযোগ পেয়েছি, ছাড়বো কেন?

ড্রইংরুমে সোফার উপর একা বসে ছিল অম্বি। হাতে একটি ছবির এলবাম। রমার জীবনের উনিশটি জন্মদিনের তোলা ফোটা। শেষ দিক থেকে এলবামের পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থামে অম্বি। ফটোতে চারুবালা ও উপেন পাশাপাশি বসে আছেন, তাদের মাঝখানে তিন বছর বয়সের রমা। কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার পাতা উলটে একেবারে প্রথম পাতায় এসে থামে অম্বি। চারুবালার বুকের উপর রয়েছে এক বছর বয়সের রমা। এক শিশুর প্রাণ তার মায়ের স্নেহের তপ্ত, নীড়ের মধ্যে শুয়ে আছে। সে-ছবি দেখতে দেখতে ছলছল করে অম্বির চোখ। পিছন থেকে এগিয়ে এসে অম্বির কাছে দাঁড়ায় অধীর। কে জানে কখন এসে এবং কতক্ষণ ধরে চুপটি ক'রে অম্বির সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল অধীর।

অম্বি চমকে ওঠে—আপনি কখন এলেন?

অধীর—অনেকক্ষণ। কি দেখছিলে তুমি?

—রমার জন্মদিনের ছবি।

—কোন ছবিটা সবচেয়ে ভাল?

—সবগুলিই ভাল।

—না, আমি বলবো?

—বলুন।

অধীর দেখায় দুটি ছবি...এটা আর এটা, কেমন? সত্যি নয়?

—হ্যাঁ, সত্যি। এলবামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হলো ঐ দুটি ছবি, একটি আম্মির কোলে এক বছর বয়সের রমা, আর একটি আপ্পি ও আম্মির মাঝখানে তিন বছর বয়সের রমা।

অম্বি তখনো ধারণা করতে পারে নি, কদিনের পরিচিত এই সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ভিন-

জগতের একটি মানুষ অম্বির মনের গভীর গোপন করা জীবনের সবচেয়ে বড় অভাবের বেদনাময় রূপটি ধরে ফেলতে পেরেছে। কিন্তু বুঝতে হলো আর কিছুক্ষণ পরে।

রমা এসে অধীর আর অম্বিকে ডেকে নিয়ে গেল। আক্ষেপ করে রমা--যা সবচেয়ে খারাপ লাগে আমার, তাই এখন করতে হবে।

অধীর--কি?

রমা--গান।

আসরে গিয়ে চারুবালা ও উপেনের কাছে দাঁড়ায় দুজনে, অম্বি ও রমা পাশাপাশি দুটি শান্ত স্নিগ্ধ ও সুন্দর মেয়ে। সেই ভুল করলো অভ্যাগতেরা, এবং সেই ভুল করলেন চারুবালা ও উপেন, অম্বিও।

আগন্তুক মহিলা ও ভদ্রলোকেরা, সবাই নিকট বা দূর সম্পর্কের আত্মীয় অথবা পরিবারের বন্ধুস্থানীয়, প্রত্যেকেই অম্বিকে দেখিয়েই প্রথমে প্রশ্ন করেন, এইটি বুঝি আপনার আপন মেয়ে আর ঐটি পালিতা। বেঁচে থাক, সুখে থাক।

চারুবালা বলেন--না, এটি আমার মেয়ে রমা, ঐটি হচ্ছে এখন আমার মেয়ের মত।

অম্বির স্নিগ্ধ মুখে বেদনার ছায়া পড়ে। চারুবালাও তারপর যেন আক্রোশের সঙ্গে প্রত্যেকেরই ঐ অদ্ভুত ভুল ধারণার উপর রাগ করে আরও জোরে বলতে থাকেন--এটি হলো আমার মেয়ে। ওটি হলো মেয়ের মত।

মেয়ের মত! মেয়ের মত! শুনতে শুনতে আর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না অম্বি। চারুবালারও অভিমান ও অহংকারের কোথায় যেন ঘা পড়েছে। অম্বির সুন্দর সাজ আর মুখের ছলনায় তাঁর নিজের মেয়েরই পরিচয় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। অম্বির দিকে অপ্রসন্নভাবে তাকান চারুবালা, যেন অম্বি এখানে না থাকলেই ভাল ছিল।

চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল অম্বি। আসরের এক প্রান্তে সোফার উপর বসে অধীর দেখতে পায় সেই দৃশ্য। চমকে ওঠে অধীরের চোখের কৌতূহল।

রমার কলেজ বান্ধবীরা একটা গান রচনা ক'রে উপহার দিয়েছে রমাকে। রমাকে এখনি গাইতে হবে সেই গান। পীড়াপীড়ি করেন গুরুজনেরা। বান্ধবীরাও সমর্থন করে। শেষে গাইতে হয়। সুন্দর গলায় সুন্দর সুরে গান গায় রমা। বান্ধবীরাও সুরে সুর মিলিয়ে গানের মধুরতা আরও মধুর ক'রে তোলে।

কিন্তু এই গানের জগৎ থেকে নীরবে সরে পড়েছে অধীর। এখানে একজনের জন্মদিনের মাঙ্গল্য কলরব ও আনন্দ সুরময় হয়ে উঠেছে, কিন্তু আর একজন কোথায় গেল, যার জন্মদিনের পরিচয় অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে?

চন্দ্রমল্লিকার সারির কাছে একটি ছায়া ঘুরে বেড়ায় দেখতে পায় অধীর। অম্বির কাছে এসে দাঁড়াতেই নীরব ও আনমনা অম্বি চমকে ওঠে—কে?

—আমি।

--আপনি কেন উঠে এলেন?

—তুমি কেন উঠে এলে?

—আপনি বুঝবেন না।

—আমি বুঝেছি।

—পৃথিবীতে কারও বোঝবার সাধ্যি নেই।

—আমার সাধ্যি আছে।

—বলুন তো কেন?

অধীর সমবেদনার সুরে সান্ত্বনা দিয়ে বলে--ওটা তো একটা কথার কথা মাত্র, তার জন্য

এত দুঃখ পাও কেন?

চোখ বড় ক'রে বিস্মিত হয়ে অম্বি প্রশ্ন করে--কি কথা?

অধীর--আম্মি আর আপ্পির মুখের ঐ কথা, মেয়ের মত।

দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে অম্বি। জীবনে এই প্রথম একজনের চক্ষু ধরে ফেলেছে তার জীবনের সবচেয়ে গোপন রহস্যকে।

অধীর বলে--তুমি তো উপেনবাবুর মেয়ে, কার সাধ্যি আছে পৃথিবীতে অস্বীকার করবে এই সত্য?

--আপনি স্বীকার করেন?

--নিশ্চয়ই।

অম্বি--বলুন আর একবার বলুন, আমারই তা'হলে ভুল হয়েছে। বলুন, ওটা একটা কথার কথা মাত্র।

অধীর--বলেছি, তোমার অভিমানের ভুল। ওটা তোমার আপ্পি আর আম্মির কথার ভুল। পৃথিবীর চোখের কাছে তুমি যে উপেনবাবুরই মেয়ে।

আসর থেকে জন্মদিনের মহিমার সঙ্গীত রেশ ছাড়ায়, এই রেশ ভেসে আসে।

অধীর প্রশ্ন করে--তোমার জন্মদিন কবে অম্বি?

অম্বি--হারিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারে।

অধীর--বুঝলাম না।

অম্বি--এত বুঝতে পারছেন, এটা বুঝতে পারছেন না কেন?

আমার জন্মদিনের খবর কেউ জানে না।

অধীর--আমি যদি বলি, কেউ একজন জানে।

--কে?

--ঐ আকাশ। এই রকমই সেদিন আকাশে তারা ছড়িয়ে ছিল।

অম্বি হাসে--সত্যি কথা?

অধীর--তুমি বিশ্বাস করবে কি, যদি বলি, আজ তোমার জন্মদিনকেই ভালবেসে উপহার দিতে ইচ্ছে করছে আমার।

অম্বি--বিশ্বাস করবো।

অম্বির একটা হাত ধরতে চেষ্টা করতেই হঠাৎ আতঙ্কিতের মত পিছিয়ে সরে যায় অম্বি।

অধীর বলে--বল, নেবে আমার উপহার?

চমকে ওঠে অম্বি।

অধীর--বল অম্বি।

অম্বি মুখ তোলে--পেয়ে গেছি উপহার।

--পেয়েছ?

--হ্যাঁ।

--কি?

--জন্মদিনই যার অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, তাকে আপনি মানুষ বলে ভেবেছেন। তার দুঃখটাকে চিনেছেন। এর চেয়ে বেশি আর কোন উপহার আশা করি...কিন্তু বড় ভয় করে...সহ্য করতে পারবো না...আপনি ভুল করবেন না অধীরবাবু।

বলতে বলতে হঠাৎ ছটফট ক'রে ওঠে অম্বি, যেন তার মনের খুশীর ভিতর থেকে একটা ভুলের ভয় হঠাৎ তপ্ত হয়ে কণ্ঠস্বরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। যার ছায়ার কাছে যাবার অধিকার নেই, তারই ছোঁয়া মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করেছে অম্বি। ভুল হয়েছে, উঁচু জাতের মানুষের মনের একটা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অপরাধ ক'রে ফেলছে অম্বি।

কারণ, অম্বি বিশ্বাস করে, সে ছোট রক্তেরই মানুষ। মিথ্যা বলবেন কেন আম্মি? কিন্তু জেনে শুনেও চোরের মত এ কি কাণ্ড সে করে বসলো? যেন একটা ভয়ংকর অপরাধের ভয় থেকে পালিয়ে যাবার জন্য ছুটে চলে যায় অম্বি।

সত্যিই অধীর ধারণা করতে পারে না, কি ভুল হলো। নিজের মনকে ঠকাতে চায় না অধীর। স্পষ্টই বুঝতে পারে, উপেনবাবুর বাড়িতে, উপেন ও চারুবালার স্নেহে পালিতা ঐ অম্বিকেই, টবের চন্দ্রমল্লিকারই মত যার জীবন, সেই অম্বির সুন্দর মুখটাকেই ভালবেসে ফেলেছে তার মন। গুণ নেই অম্বির, মনে করতেও হাসি পায় অধীরের। পূর্ণ চাঁদের মায়ার মত মায়া নিয়ে, মমতার মত দুটি সেবার হাত নিয়ে একটি বাড়ির প্রাণের সব প্রয়োজনকে স্নিগ্ধ ক'রে রাখছে যে, তাকে একটা বিস্ময়ের মূর্তির মতই যে মনে হয়।

ঠাট্টা ক'রে একদিন যে কথাটা অম্বিকে বলেছিল অধীর, প্রতিক্ষণেই বুঝতে পারে অধীর, মোটেই ঠাট্টা নয় সেই কথাটা।--ইচ্ছে করে আমার, কটা দিন জ্বর হয়ে পড়ে থাকি।

হেসেছিল অম্বি--এ আবার কেমন অদ্ভুত ইচ্ছে।

অধীর—তাহলে তুমি একটা ভুল করে ফেলবে, আর সেই ভুলেই তোমার ভুল ভেঙে যাবে।

অধীরের কথার তাৎপর্য সূক্ষ্ম হলেও বুঝতে পেরেছিল অম্বি। যে মেয়ের দুহাতে সেবা আর মমতা ব্যাকুল হয়ে আছে, সেই মেয়ে কি হঠাৎ আগ্রহে ছুঁয়ে ফেলবে না অধীরের জ্বরে বিব্রত কপালের তপ্ততা।

আজ একটু আশ্চর্য হয়, সত্যিই বুঝতে পারে না অধীর, কেন সেদিন অমন ক'রে আতঙ্কিতের মত হাত সরিয়ে নিল অম্বি। অধীরের স্পর্শকে সত্যিই কি ভয় করছে অম্বি?

লাইব্রেরির কক্ষে বসে অকারণে বিচলিত হয় অধীর। নিজের মনেই বিড়বিড় করে। লিখতে গিয়ে হাতটা যেন অকারণে ছটফট করছে।

—ভুল, কিসের ভুল? নিজের মনে বলতে বলতে উঠে পড়ে অধীর।

অম্বিকেই সোজা ও সুস্পষ্ট প্রশ্ন ক'রে তা'হলে জেনে নেওয়া উচিত, কিসের ভুল? অমন হেঁয়ালী ক'রে সরে গেলে চলবে না।

অম্বি জানে, হ্যাঁ ভয় করছে অম্বিরই মন। জেনেশুনে অন্যায় করতে পারবে না অম্বি। ভালবাসার ঐ দুটো চক্ষু শুধু তাকিয়েই তৃপ্ত হোক, ঐ মানুষকে স্পর্শ করার অধিকার নেই অম্বির। অম্বি নিজেকে অন্ত্যজা অস্পৃশ্যা বলেই বিশ্বাস করে।

কিন্তু নিয়তিই যেন করুণাপরবশ হয়ে অম্বির এই ভুল ভাঙাবার জন্য পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সমাজ সংসারের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কোনদিন জাগে নি অম্বির মনে, সেই অম্বিই বুঝতে পারে যে, সমাজ আর সংসারও ভুল করে। বিধাতার কাছে ঘৃণা অস্পৃশ্যা ও অন্ত্যজা নয় অম্বি। ধীরে ধীরে এই বিশ্বাসের জাগরণ অম্বির জীবনের বিষণ্ণতাকে আবার সুস্মিত ক'রে তুলতে থাকে। মনে হয়, এবং বিশ্বাসও করে অম্বি, অধীর নামে এই ভালবাসার মূর্তিকে স্পর্শ করার অধিকার তারও আছে। কিন্তু স্পর্শ না করাই ভাল।

গঙ্গার ঘাটে, বেড়াতে গিয়ে অদৃশ্য এক ভক্তকণ্ঠের উৎসারিত গানের ভাষা অম্বির নিঃশ্বাসগুলিকেই যেন একদিন নতুন ভাবনায় চঞ্চল ক'রে তোলে। গাইছেন ভক্ত—জাত-পাতের বড়াই কর কেন সংসারের মানুষ? প্রেমেই আপন হয় মানুষ? সেই পরম আপনের কাছে কেউ ছোট নয়, আর কেউ বড় নয়। গান শুনে অম্বির মন যেন এক আশার দীক্ষা লাভ করে।

এই গানের ভাষা আর সুর শুনে চমকে ওঠেন ভ৳ ান।

বিমর্ষ হয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকেন। অম্বি প্রশ্ন করে—কি ভাবছো আম্মি?

উপেন—এখানে আর আমি বেড়াতে আসবো না।

অম্বি—কেন আপ্পি?

উপেন—ঐ সব আজে-বাজে গানের জন্য।

অম্বি—গানের জন্য?

উপেন—হ্যাঁ, ওটা একটা গালাগালি।

চণ্ডালিকার অভিনয় দেখতে গিয়েছিল অম্বি। অম্বির দুই চক্ষুর বিস্ময় যেন এক আলোকের জগতে পথ খুঁজে বেড়াতে থাকে, অস্পৃশ্যার হাতের উপহার ঐ স্নিগ্ধ বারি পান করলেন ভিক্ষু। ঐ চণ্ডালিকা মেয়ের বেদনার রূপটিকে যেন দেখতে পেয়েছে অম্বি, তার নিজের অন্তরের গভীরে। অভিনয় দেখতে দেখতে চমকে ওঠে অম্বির মনের কল্পনা। তৃষ্ণার্ত এক জীবনপথিককে বারিদান করছে অম্বি এবং সেই পথিকের মুখটি যে অধীরেরই মুখের মত।

যে ভুলের ভয় কঠিন ক'রে রেখেছিল অম্বির মনের আবরণ, যার জন্য সেদিন অম্বিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি অধীর, সেই ভুলের মিথ্যাকে বুঝতে পারে অম্বি ; সে মিথ্যাকে তুচ্ছ করবার সাহসও মনের ভেতর হঠাৎ জেগে উঠে আসতে থাকে।

ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একা-একা ওপারের সন্ধ্যাকাশের রং দেখছিল অম্বি। নিজেই জানে না, কেন সে আজকাল একা একা এইভাবে কিসের জন্য এখানে আসে? গঙ্গার ঢেউ-এর শব্দের মধ্যে কি কোন সান্ত্বনা আছে?

বিকাল হয়ে এসেছে। হঠাৎ চারুবালার কাছে গিয়ে অম্বি বলে—আমি একবার গঙ্গার ঘাটে বেড়িয়ে আসি আম্মি।

চারু—একা যাবি?

অম্বি—হ্যাঁ।

চারু—তা'হলে যা।

অম্বি চলে যেতেই উপেন রাগ ক'রে চারুবালাকে বলেন—খুবই খারাপ লক্ষণ চারু।

চারু আতঙ্কিত হন।—তার মানে?

উপেন—অম্বির মনে বড় বেশি সাহস জেগেছে। এসব ভাল নয়।

চারু আশ্চর্য হয়ে বলেন—তুমি কি মেয়েটাকে কোন সন্দেহ করছো?

চেঁচিয়ে ওঠেন উপেন—হ্যাঁ, ও আজকাল আমাদের অপমান দেখতে ভালবাসে। যে গান শুনে আমার মনের সব গর্ব জব্দ হয়ে গেল, সেই গান শুনতে গেল অম্বি। শত হোক, পরের মেয়ে।

চারু—কিছুই বুঝতে পারছি না।

উপেন—একটা সন্ন্যাসী গঙ্গার ঘাটে গান গাইছিল, জাতের বড়াই কর কেন মানুষ, ভগবানের কাছে কেউ ছোট আর কেউ বড় নয়। শুনে তোমার ঐ অম্বির চোখে মুখে কি আনন্দ! যেন আমাকে ঠাট্টা করার জন্যই—।

চারু—একথা সত্যি। পরের মেয়ে কখনো আপন মেয়ের মত হতে পারে না। কিন্তু তার জন্য দুঃখ ক'রেও কোন লাভ নেই। বড় হয়েছে বয়স হয়েছে, এখন নিজের স্বার্থ বুঝে নিয়ে যদি পর হয়ে যায় ভালই। ওকেও দোষ দেই না।

সেদিন আর একটি রহস্য কল্পনাও করতে পারে নি অম্বি। কখনও অম্বিকে পথে দেখতে পেয়ে আর অনুসরণ ক'রে অধীরও নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

চমকে ওঠে অম্বি—আপনি কেমন ক'রে এখানে এলেন?

অধীর হাসে—মনে মনে টের পেয়ে।

অম্বি হাসে—কখ্খনো না!

অধীর—তাহ'লে রমার কাছ থেকে খবর পেয়ে এসেছি!

অম্বি—তাই বলুন।

কত গল্প করে অধীর। মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে অম্বি, গান্ধী নামে এক মহাপুরুষের সারা-জীবনের এক সত্য আগ্রহের কথা বলছে অধীর। এক অন্ত্যজা অস্পৃশ্যাকে ঘরের লক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মী নাম দিয়েই আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন যে মহামানব, তার নাম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই ঘাট।

গান্ধীঘাটের কাছে বোধিবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আর অধীরের কাছে গল্প শুনে ধন্য হয়ে যায় অম্বির প্রাণের সব কৌতূহল। বুদ্ধ, যে মহাপুরুষের নামের পুণ্য ধারণ ক'রে রেখেছে এই বটের ছায়া, সেই মহাপুরুষ ছোটবড় ভেদ অস্বীকার ক'রে গিয়েছেন। কত অস্পৃশ্যা ও অন্ত্যজাকে তিন মহীয়সীর সম্মান দিয়ে গিয়েছেন। শুনতে শুনতে এই বোধিবটের ছায়ার স্নিগ্ধতাকেও পুণ্যময় বলে মনে হয় অম্বির। ভুল ভেঙে যায়, পূর্ণ হয় বিশ্বাসের দীক্ষা। না, তারও অধিকার আছে, শুধু এই পৃথিবীর তরুলতা ও ফুলকে ভালবাসার নয়, ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায়, কিন্তু নিজের অন্তরের আনন্দের মধ্যেই বুঝতে পারে, অধীরকেও ভালবাসার অধিকার তার আছে। আর অধিকার যখন আছে, তখন সেই ভালবাসার মানুষের হাতে হাত রেখে আর কানে কানে একটা বিস্ময়ের উপহার দিতে পারবে না কেন অম্বি? এমন কুণ্ঠার কোন স্পর্শ হয় না।

কিন্তু এখানে এত মানুষের চোখের সামনে কেমন ক'রে তার হাতে হাত রাখা যায়? একটি নিভৃত কি পাওয়া যায় না?

—এত আনমনা হয়ে কি ভাবছো অম্বি? অধীরের প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে অম্বি। ব্যস্তভাবে বলে—চলুন এবার বাড়ি ফিরে যাই।

অধীর—এতক্ষণ আমিও আনমনা হয়ে একটা কথা ভাবছিলুম।

অম্বি—কি কথা?

অধীর—তোমাকে এত ভাল লাগলো কেন?

অম্বি—চলুন, অনেক দেরি হয়ে গেল।

অধীর হাসে—এর কোন কারণই যে বুঝে উঠতে পারছি না।

অম্বি—আজ এখানে কিসের জন্য এত বেশি ভিড়, কিছু বুঝতে পারছি না।

—যদি জানতাম যে, আমাকেও তোমার এই রকমই ভাল লাগে তবে—।

সামনের পিছনের ও আশে পাশের এত জীবন্ত চক্ষুওয়ালা ভিড়টাকেই যেন হঠাৎ তুচ্ছ ক'রে অম্বির হাত ধরে ফেলে অধীর।

—ছিঃ, এ কি করছেন? যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছে অম্বি। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আরও ব্যস্তভাবে বলে—চলুন আম্মি হয়তো এতক্ষণে খুব ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

কি অদ্ভুত আর কিরকম নিষ্ঠুর যেন অম্বির এই কুণ্ঠা। গঙ্গার ঘাটে লোকের মেলার মধ্যে অম্বির সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে অম্বিকে যে সব কথা বলে অধীর তার কিছুই কি বিশ্বাস করতে পারে নি অম্বি? তবে কেন অমন ক'রে হাত সরিয়ে নিল? অনেক কিছুই কল্পনা করে অধীর, কিন্তু কোনটিকেই অম্বির ঐ অদ্ভুত ভীরুতার কারণ বলে মনে হয় না।

তবে ওটা কি অম্বির মনের একটা লজ্জার বাধা? কিন্তু এ মেয়ের মনকে তো এমন কিছু লাজুক বলে মনে হয় না। চোখ দুটোও ভীরু নয়। অধীরের মুখের বেপরোয়া কথাগুলি শোনবার সময় বেশ তো অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেই দুটি চোখ। ভালবাসার কথা শুনতে যার কোন সঙ্কোচ নেই, সে কেন হাত সরিয়ে নেয়? কেন বারবার সেই একই কথা বলে, আপনি না বুঝে বড় ভুল করেছেন অধীরবাবু!

গঙ্গার ঘাটে অম্বির পাশে দাঁড়িয়ে অমন সুন্দর সূর্যাস্ত দেখবার আনন্দের মধ্যেও যেন একটা ফাঁকি ছিল ; কাঁটার মত মনের ভিতর বিঁধছে সেই ফাঁকি। অম্বির চোখের চাহনি আর মুখের চেহারাটি তো বেশ স্বচ্ছ আর সরল ; কিন্তু অম্বি নিজে যেন ঠিক তার বিপরীত। একটা রহস্য, একটা খামকা ভয়ের খেয়াল। ভালবাসার কথা শুনতে ভালবাসে কিন্তু ভালবাসার কথা বলতে পারে না। কাছে এগিয়ে আসে, পাশে দাঁড়ায়, কিন্তু হাত ধরতে গেলেই যেন চমকে ওঠে আর সরে যায়।

ভাবতে গিয়ে নিজেরই উপর রাগ ক'রে যেন নিঝুম হয়ে যায় অধীরের মন। অম্বি নামে ঐ মেয়েকে ভালবাসার অধিকার তার আছে ; কিন্তু ভালবাসলেই কি ভালবাসা পাওয়ার অধিকার এসে যায়? সন্দেহ হয়, অধীরের জীবনে হঠাৎ বোধহয় বড় কঠিন একটা ভুল হয়ে গেল। কোন নারীকে না ভালবেসেও জীবন বেশ সহজে, আনন্দে ও হেসে হেসে দিন কাটিয়ে দিতে পারে। অধীরের এই ধারণার অহংকার শাস্তি পাবে আর জব্দ হবে বলেই বোধহয় অম্বির সঙ্গে অধীরের দেখা হয়েছিল। ভুলতে পারা যায় না এবং চেষ্টা ক'রেও বোধহয় ভুলতে পারা যাবে না, অম্বি নামে ঐ মেয়ের চোখ-মুখ চলা-বলা আর হাসি হর্ষ ও গম্ভীরতা দিয়ে তৈরি করা অদ্ভুত এক মধুরতার ছবিকে। সন্ধ্যাকাশের আভা যখন ওর মুখের উপর লুটিয়ে পড়ে তখন মনে হয় ঐ মেয়ে যেন রঙীন আকাশেরই একটুকরো শোভা। মৃদু বাতাসের ছোঁয়া লেগে ওর কপালের কাছে কালো চুলের গুচ্ছ যখন আধভাঙা হয়ে ফুরফুর করে, তখন মনে হয় এই মেয়ে যেন একটি মালতী লতা। অধীরের মুখের কথাগুলি শুনতে শুনতে ওর চোখ দুটো অপলক হয়ে যায়, তখন মনে হয় যেন একটা ভরা নদীর প্রাণ শান্তভাবে জোয়ারের শব্দ শুনছে। নিজেকেই প্রশ্ন করে অধীর, তার লজিক-পড়া আর সায়েন্স-জানা মনের সব যুক্তি-বুদ্ধি কি তবে সত্যিই একটা মোহের মধ্যে পড়ে বোকা হয়ে গেল?

কেন ভাল লাগে অম্বিকে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায় না অধীর। এবং ভাবতে গিয়ে মনের ভিতরে যেন যত উদ্ধত তর্ক আর যুক্তিগুলি নিজের দুর্বলতার লজ্জায় ছোট হয়ে যায়। অম্বির চেয়ে কত বেশি সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আছে। রমাই তো অম্বির চেয়ে দেখতে বেশি সুন্দর। অম্বির চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানা শত-শত মেয়ে এই শ্যামবাজারে আর ব্যারাকপুরেও আছে। এই জীবনে কত মেয়ের সঙ্গে অধীরের আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে। কিন্তু কোনদিন তো কেন পরিচিতার সুন্দর মুখ স্মরণ করে অধীরের মনে ভাবনার কোন উত্তাপ কোন লজ্জা আর কোন আগ্রহের চঞ্চলতা জেগে ওঠে নি। তবে অম্বি কেমন ক'রে আর কিসের জোরে অধীরের প্রতিক্ষণের নিঃশ্বাসে এই দুর্বার পিপাসা ভরে দিল?

উপেনবাবুর পালিতা মেয়ে অম্বি। বোধহয় উপেনবাবুর কোন আত্মীয়কুটুম্ব অথবা বন্ধুর মেয়ে। এর চেয়ে বেশি গভীরের কোন রহস্য কল্পনা করে নি অধীর। অনুমানে যেটুকু ধারণা হয়েছে, তাই শুধু জেনে রেখেছে অধীর। অম্বির জন্মের-পরিচয় জানবার জন্য কোনদিন বিশেষ কোন কৌতূহলও অনুভব করে নি। উপেনবাবু এবং চারুবালা এবং দিদিমাও অধীরের কাছে অম্বির জন্ম-পরিচয় জানাবার কোন দরকার অনুভব করে নি! অম্বিকেও কোনদিন এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে নি অধীর। দরকার কি? অম্বি তো এখন সত্যিই উপেনবাবুর মেয়ে। অম্বির বাপ-মায়ের পরিচয় জানবার জন্য প্রশ্ন করারও কোন অর্থ হয় না। শুধু অম্বির মনে ব্যথা দেওয়া হয়।

কিন্তু অম্বিকে যেন আজও ঠিক চিনতে পারা গেল না। অম্বি যেন তার জীবনের অনেক কিছু অধীরের কাছে ধরা পড়িয়ে দিয়েও জীবনের কোন নিবিড় একটা রহস্যকে দুর্লভ রত্নের মত গোপন ক'রে রাখতে চায়। চৈত্র সন্ধ্যার দমকা বাতাসের মত হঠাৎ এসে সৌরভ ছড়িয়ে দেয় ঠিকই কিন্তু তার পরেই যখন দূরে পালিয়ে যায়, খুঁজতে গেলে আর পাওয়া যায় না।

রাগ হয় অম্বির উপর, কিন্তু কি আশ্চর্য অম্বিকে ভুলে যেতে ইচ্ছে করে না কেন? অম্বির হাতের সামান্য একটা স্পর্শের জন্য এই ব্যাকুলতা কেন? এই ভালবাসা আর ভাললাগা মোহগুলি কি কোন নিয়মের ধার ধারে না? অধীরকে আনমনার মত লাইব্রেরী ঘরের নিভৃতে চুপ ক'রে বসে থাকতে দেখে অনেকবার ঠাট্টা করে ছিলেন ডক্টর ব্যানার্জী--কি হ'ল ফ্রেণ্ড? কাকে ভাবছো?

অধীর হাসে--নিজেকে।

ডক্টর ব্যানার্জী--অর্থাৎ অন্য একজনকে ভাবতে কেন ছাই এত ভাল লাগছে, তাই না?

অধীর--আমি নিজের মনের সমস্যাই ভাবছি ডক্টর ব্যানার্জী।

ডক্টর ব্যানার্জী--আমিও যে তাই বিশ্বাস করছি। তাহ'লে এতদিনে সমস্যায় পড়েছ! উইশ ইউ গ্র্যাণ্ড সাকসেস!

বলতে বলতে চলে যান ডক্টর ব্যানার্জী। কিন্তু অধীরের মন থেকে সেই প্রশ্নটা যে চলে যাবার নামও করে না। কেন ভাল লাগে অম্বিকেও মনে হয় অধীরের, এর চেয়ে বেশি কঠিন প্রশ্ন বোধ হয় এই সংসারেই নেই। এবং এই প্রশ্নের উত্তর নেই।

যদি ভুল হয়ে থাকে হোক্। এই ভুলের শেষ না দেখা পর্যন্ত বোধহয় ভুল ভাঙবে না। তবে আর দেরি ক'রেই বা লাভ কি? তাড়াতাড়ি একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলাই উচিত। অম্বির কাছে গিয়ে অম্বিকে একটু নিভৃতে ডেকে নিয়ে এসে সোজা স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞেস করতে পারা যায় ; আমার ভালবাসাকে তুমি ভুল মনে করছো কেন? কেন হাত সরিয়ে নাও? কিসের আপত্তি?

তার হাতে হাত রাখবার জন্যে কেন এই ব্যাকুলতা? ভাবতে গিয়ে নিজের মনকে শত ধমক দিয়েও কেন বোঝাতে পারে না অম্বি, এবং বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারে না, তার এতদিন ভীতু জীবনটাকে এ কোন ভয়ানক লোভে পেয়ে বসলো? ইচ্ছে করে, এবং কল্পনা করতেও ভাল লাগে অম্বির, হঠাৎ একটা জ্বর এসে এই শরীরটাকে একেবারে অসহায় ক'রে বিছানার উপর শুইয়ে রাখুক, অন্তত পাঁচটা দিন। আসুক অধীর, অম্বির মুখের করুণ ও উদাস হাসির দিকে তাকিয়ে ছলছল করুক ওর ওই দুই চক্ষু ; তারপর হঠাৎ অম্বির একটা হাত টেনে নিয়ে বসে থাকুক অধীর। যদি তাই হয়, যদি সেই সুযোগ পাওয়া যায়, এবং কেউ যদি দেখে না ফেলে, তবে অধীরের হাতের সেই ছোঁয়া মনে মনে বরণ ক'রে নিয়ে অম্বির বোধহয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে যেতেও ভাল লাগবে।

শুধু ঘরের নিভৃতে বসে জাগা-মনের ভাবনাগুলির সঙ্গে নয়, মাঝরাতের আর ভোরের ঘুমের স্বপ্নের সঙ্গেও যেন অম্বির মনটা লড়াই ক'রে হাঁপিয়ে ওঠে আর লজ্জা পায়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, বিছানার উপর বসেই শাড়ির আঁচল দিয়ে ঠোঁট মোছে। শিউরে ওঠে শরীরটা ; আঃ, স্বপ্নও এত স্পষ্ট হয়।

নিজেরই মনের নতুন দুঃসাহসগুলি রূপ দেখে আশ্চর্য হয় অম্বি। বুকের ভিতরে সব নিঃশ্বাসের আনাচে-কানাচে, কিংবা বোধহয় এই রক্তধারার মধ্যেই এই দুঃসাহস অনেক অভিমানে লুকিয়ে পড়ে ছিল. আম্মি বলেছেন--তার দেহের ছোঁয়াকেই ভয় করে উঁচু-জাতের পৃথিবীর যত প্রাণ। কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর হয়? গাছের পাতা ও ফুলের ছোঁয়াকে কুড়িয়ে নিয়ে বুকে আর মাথায় তুলে নিতে পৃথিবীর কোন মহাপবিত্রের মনেও কোন আপত্তি নেই। অম্বির দেহটা কি ঐ পাতা আর ফুলের চেয়ে কম জীবন্ত? তবে কিসের এই ভয়? অধীরের মনেও কি সেই ভয় আছে?

অধীরের মনে ওরকম কোন ভয় আছে কিনা বোঝা যায় না। বুদ্ধ আর গান্ধীর কথাগুলিকে কি অধীরও সত্যিই বিশ্বাস করে। কিংবা অধীরের কাছে ওসব শুধু কতগুলি গল্পের কথা? ভুলেও তো একবার অধীর একথা নিজের মনের জোর নিয়ে বলতে পারলো

না যে ঠিকই বলেছিলেন বুদ্ধ আর গান্ধী--জন্ম জাতের জন্য মানুষ বড় হয় না, ছোটও হয় না। সত্যিই অম্বির মনের চিন্তাগুলি যেন মাঝে মাঝে একটা দুঃসহ অভিমান সহ্য করতে চেষ্টা করে। মানুষ না হয়ে বাগানের একটা চন্দ্রমল্লিকা হ'য়ে জন্ম নিলেই তো ভাল ছিল। তাহ'লে সারা পৃথিবীর চোখের সামনে অধীরের বুকের উপর লুটিয়ে পড়তে অম্বির জীবনে কোন বাধা থাকতো না, কোন অন্যায়ও হতো না।

এ কি হ'লো মনের দশা? সকালবেলার খবরের কাগজের ছবি আর লেখাগুলির উপর চোখে আর মনের আগ্রহ ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রেও ধরে রাখতে পারে না অম্বি। মনটা যেন একজনের পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে ছটফট করছে। কখন আসবে অধীর? আসুক একবার। আজও কি একটি নিভৃতে দাঁড়িয়ে অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ পাওয়া যাবে না?

অম্বির এই শান্ত দেহটাই যেন বিদ্রোহ ক'রে উঠতে চায়। অধীরকে স্পর্শ করবার তার অধিকার নেই, এই মিথ্যা অভিশাপকে চূর্ণ করে দিতে ইচ্ছা করে। আর আপত্তি করবে না, হাত সরিয়ে নেবে না অম্বি।

ভিতরের ঘরে তখন পিসিমা উল্লাসের সঙ্গে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করছিলেন যে, নাতি তাঁর বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। একেবারে স্পষ্ট করে মুখ খুলেই এবার বলেছে।

পিসিমা বলেন—আমি জিজ্ঞেস করলুম, তাহলে বল পাত্রী দেখি। নিজের মুখই বললে, পাত্রী দেখাই আছে। বলতে বলতে আহ্লাদে গলার স্বর কেঁপে ওঠে পিসিমার।

পিসিমা--রমাকে খুবই মনে ধরেছে বুঝতে পারছি। এইবার তোমরা একটা দিনক্ষণ ঠিক কর।

উপেন--আর অম্বির জন্যে যে পাত্রের সন্ধান পেয়েছিলে?

পিসিমা--সে তো ঠিকই আছে। আজ বল আজ, কাল বল কাল। পাত্র দেখ, দিন ঠিক কর।

আলোচনা করতে করতে সকলে বাইরে আসেন। অম্বিকে লক্ষ্য করে চারুবালা বলেন-- অধীর যদি আসে, তবে এক মুহূর্তও যেন এখানে আর দেরি না করে।

একটি কার্ড অম্বির হাতে দিয়ে উপেন বলেন--অধীরের নেমন্তন্ন পত্র। রমাদের কলেজের স্পোর্টস দেখার নেমন্তন্ন। আমরা চললাম। অধীরকে বলবি, অবশ্যই যেন যায়।

চারুবালা বলেন--বলবি, না গেলে রমাও দুঃখ করবে।

দেখে চমকে ওঠে অম্বি। অধীর আসছে। কিন্তু না, অসম্ভব। উঁচু জাতের ঐ মানুষের মনের একটা ভুল ধারণার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানো উচিত নয়। তার হাতে হাত রাখা দূরে থাকুক, তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করাও উচিত নয়। যদি কোন দাবি করে অধীর, তবে অম্বি আজ স্পষ্ট করেই বলে দেবে, তোমার দাবি সত্যি কিন্তু আমিই যে মিথ্যা। ক্ষমা কর, এত কাছে এস না, একটু দূরেই থাক।

বারান্দার এই দিকে, এই থামের পাশে যেখানে একা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়তে চেষ্টা করছে অম্বি, সেটা যে সত্যিই একটা নিবিড় নিরালা। যদি সোজা এসে এখানেই অম্বির কাছে দাঁড়ায় অধীর? ভয় পায় অম্বি। আজ অম্বি তার নিজেরই স্পর্শলোলুপ হাতটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কে জানে অধীরকেই হতভম্ব ক'রে দিয়ে কোন ভুল ক'রে ফেলবে অম্বি? চেয়ার থেকে উঠে ভিতরের ঘরের দিকে ছুটে চলে যায় অম্বি!

যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে অধীর। আজ স্পষ্ট ক'রে অম্বির কাছে তার জীবনের আকাঙক্ষার কথা ঘোষণা ক'রে দিয়ে যাবে। অম্বিই তার জীবনের স্বপ্ন। অম্বিই তার জীবনের প্রয়োজন। এর মধ্যে কোন ভুল নেই।

ঘরে কেউ নেই, এমনই একটি অবাধ নিভৃত তৈরি হয়ে আছে। এবং অধীরও এসেছে তার জীবনের আকাঙক্ষা স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা ক'রে দেবার জন্য নইলে শান্তি পাচ্ছে না অধীর।

অধীর সোজা অম্বির কাছে এসে দাঁড়ায়।--আমি একটুও ভুল করছি না অম্বি। ডাক তোমার আপ্পিকে, ডাক তোমার আম্মিকে, সবার সামনেই জানিয়ে দিয়ে যাই, আমি একটুও ভুল করছি না।

--কেউ নেই বাড়িতে।

--তুমিও কি নেই?

--আমি তো আছিই। যাব কোথায়?

--আমার কাছে।

চমকে ওঠে, চুপ ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি।

--বল অম্বি, তোমার আপত্তি নেই। যদি একটুও আপত্তি থাকে, তবে এখনই বলে দাও।

--একটুও না অধীরবাবু। একথা আমাকে দিয়ে বলিয়ে কি সুখ পাচ্ছেন আপনি? আজ যদি না বুঝে থাকেন তবে কোন দিনই বুঝবেন না।

অধীরের মনের সব বিমর্ষতা মুছে যায়। প্রণাম করে অম্বি। বাধা দেয় অধীর, কিন্তু অম্বি শোনে না।--সেদিনের ভুল ক্ষমা কর, আজ তোমাকে ছোঁয়ার অধিকার পেয়েছি।

--কে দিল অধিকার?

--দিয়েছে আমার মন।

অধীর বলে--আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি অম্বি। তোমার খোঁপায় একটি চন্দ্রমল্লিকা, কপালে খয়েরের টিপ তারার মত আঁকা চাঁপা রঙের ঢাকাই তাঁতের শাড়ি তার মধ্যে হাস্নু-হানার সুগন্ধ। এই সুন্দর মূর্তি নিয়ে তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছ। বলতে পার আমায়, এই স্বপ্নের মানে কি?

--মানে হলো, তুমি সুন্দর।

--কথা এড়িয়ে যেও না। বল, কবে ঐ স্বপ্নের মতো ক'রে তোমাকে কাছে পাব।

--তোমার যেদিন ইচ্ছা।

--এই মাসেরই এই আষাঢ়ের কোন শুভদিনে!

--বেশ।

--তাহলে দিদিমাকে বলি।

--বলো।

চলে যাচ্ছিল অধীর। অম্বি হঠাৎ বলে ইস্, কী সাংঘাতিক ভুল।

রমাদের কলেজের স্পোর্টসে যাবার জন্য নিমন্ত্রণের কার্ডটা অধীরের হাতে তুলে দিয়ে অম্বি বলে--আপ্পি বার বার বলেছেন, এখনি যাও, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

অধীর কি-যেন ভাবে! অম্বি বলে--যাও নইলে রমাও দুঃখ করবে।

স্পোর্টস-এর মাঠের একপাশে এক জায়গায় পাশাপাশি চেয়ারে বসে চারুবালা ও উপেন অধীরের প্রতীক্ষা করছিলেন।--অধীর কি ভুলেই গেল?

কিন্তু পরমুহূর্তেই চারুবালা ও উপেন খুশি হয়ে দেখতে পেলেন, অধীর এসেছে। রমার তখন হার্ডল্ রেস শুরু হয়েছে! ফার্স্ট হলো রমা।

চারুবালা অধীরের দিকে তাকিয়ে বলেন--আমি জানতাম, রমা ফার্স্ট হবে।

রমা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রশ্ন করে--অম্বি আসে নি?

তারপর অধীরকে দেখেই ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে হঠাৎ বলে ফেলে--আপনি এলেন কেন?

উঃ কি ভীষণ লজ্জা করছে আমার। এইবার আপনি চলে যান।

অধীর হেসে ফেলে—তা'হলে আমি চলি।

চারুবালা ভ্রূভঙ্গি ক'রে মেয়েকে ধমক দেন—কথা বলার কি ছিরি?...ওর কথা তুমি গ্রাহ্য করো না অধীর।

চোখ বেঁধে হাঁড়ি ভাঙবার খেলা! রমা লাঠি হাতে হাঁড়ি ফাটাবার জন্য ভুল ক'রে মাঠের কিনারায় এসে পড়ে। চারুবালা ভ্রূকুটি ক'রে হাসতে থাকেন রমা যেন একটা পাগল অন্ধের মত আই চাই করতে করতে বাঁধা চোখ নিয়ে আর লাঠি ঘুরিয়ে এই দিকেই আসছে অথচ হাঁড়িটা মাঠের মাঝখানে পোস্টের গায়ে নির্বিকার দুলছে।

কি বিশ্রী ভুল করছে রমা। ভুল আন্দাজ করছে। যেন আকাশে বাড়ি মারবার জন্য তুলেছে।

ও কি? ওখানে যে অধীর দাঁড়িয়ে আছে। আসর সুদ্ধ দর্শক হাসতে থাকে। প্রায় অধীরেরই মাথা লক্ষ্য ক'রে লাঠি তোলে রমা! এক লাফ দিয়ে সরে গিয়ে অধীর হাসতে থাকে।

ঘটনা দেখে হেসে ফেলেও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান চারুবালা। উপেনের কানে কানে বলেন—রমাটা কি ইচ্ছে ক'রে অধীরকে অপ্রস্তুত ক'রে সরিয়ে দিতে চাইছে? ওর মতলব কি?

উপেন বলেন—তুমি কেন মিছিমিছি ছেলেমানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বুঝবার চেষ্টা করছো? বাইরে থেকে দেখে ওসব কিছু বোঝা যায় না।

চারুবালা—আমার যেন কেমন ঠেকছে। মেয়ের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর আমার বিশ্বাস নেই।

উপেন—না, না, তুমি খামকা ওসব কথা ভাবছো।

তখন একা ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে গান গাইছিল অম্বি, গলা খুলে। আজ তার জীবনের পরিণাম একেবারে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। আর যে ভাগ্যের দোষ দেখে আপ্পি আর আম্মি কত চিন্তা করেছেন, কত আক্ষেপ করেছেন, সেই ভাগ্যের শুভ স্বরূপের সংবাদ শুনতে পেয়ে কত খুশি হয়ে উঠবেন দুজন, আপ্পি ও আম্মির মুখ হেসে উঠবে। সেই কল্পনার আনন্দ যেন অম্বির এতদিনের সাবধানতায় বাঁধা মনকে মাতিয়ে দিয়েছে।

রেডিও হতে উৎসারিত সঙ্গীতের একটি স্তবক শুনে নেয় অম্বি তার পরেই রেডিও বন্ধ ক'রে সেই গান গাইতে থাকে। তারপর আর এক স্তবক।

বাড়ির বারান্দায় উঠে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ান চারুবালা ও উপেন।—কে গাইছে গান? অম্বিও গাইতে পারে না কি?

চারুবালা—অম্বি নয়। রেডিওর গান।

সন্দেহ মেটাবার জন্য পরদার ফাঁকে উঁকি দেন চারুবালা। ফিরে এসে বলেন—হ্যাঁ, অম্বিই গাইছে।

উপেন গায়ের চাদর নামিয়ে অপ্রস্তুতের মত স্বরে বলেন—অম্বি কি কখনো গানের মাস্টারের কাছে গান শিখেছিল?

—না। কোনদিন তো দেখিনি। অম্বিকে কখনো গান শেখানো হয়নি।

—তবে, এ কিরকম হলো? শেখানো হলো না, তবুও শিখলো। তা ছাড়া রমার চেয়েও ভাল গলা পেল?

এটাও যেন চারুবালা ও উপেনের জীবনের একটা সংকল্পের পরাভব। অম্বির গলার সুন্দর গান শুনে আনন্দিত হতে পারছেন না। নিজেদের বুকের ভিতরেই যেন একটা কাঁটার খোঁচা বিঁধছে। হঠাৎ গান বন্ধ হয়। বোধহয় বুঝতে পেরেছে অম্বি, আপ্পি ও আম্মি ঘরে ফিরে এসেছেন। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে ভিতরের বারান্দার দিকে আসতে থাকে অম্বি,

এবং শুনতে পায়, ঠিক, আপ্পি আর আম্মিই কথা বলছেন। থমকে দাঁড়ায় অম্বি।

তারপরেই শিউরে ওঠে অম্বির সারা শরীর। যেন এক জ্বালাময় শিহরণ। দুঃসহ বেদনায় আবিল হয়ে যায় চোখের দৃষ্টি। আপ্পি আর আম্মির আলোচনার ভাষা থেকে একটি যে নিদারুণ তথ্য অম্বির কানে এসে বেজেছে, সেই তথ্যের জ্বালা নিষ্ঠুর কৌতুকে পুড়িয়ে দিচ্ছে অম্বির বুকের পাঁজর।

উপেন--আমার ইচ্ছা, রমা পরীক্ষাটা দিয়ে নিক, তারপর একটা ভাল দিন বুঝে...।

চারু--কিন্তু পিসিমার ইচ্ছে, শুভস্য শীঘ্রং, যত শিগ্‌গির হয় তত ভাল। বিয়ের পরেও পরীক্ষা দিতে পারে রমা। আর অধীরের মত বিদ্বান ছেলের বউ যে হবে, তার পড়াশুনার কোন অসুবিধেও হবে না।

উপেন--এটা আমাদের ভাগ্যি বলেই মানতে হবে, রমার জন্য অধীরের মত পাত্র পাওয়া গিয়েছে।

সবই শুনতে পায় অম্বি। ছুটে চলে যায়, যেন মরিয়া হয়ে ছুটে উপরতলার ঘরে এসে দুহাত দিয়ে মাথাটা নিষ্ঠুরের মত টিপে ধরে। তারপরেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে নম্বর ডাকে। অধীরকে আহ্বান করে।

--শুনুন, আপনি কি সত্যিই আমার সব কথা, বিশ্বাস করেছেন।...

চোখ দিয়ে জল গড়ায়, কিন্তু নিজেকে কঠোর ক'রে, যেন আত্মহত্যার প্রয়াসের মতই অম্বি জানিয়ে দেয় অধীরকে, আমাকে যদি বাঁচতে দিতে চান, তবে এখন কাউকে বলবেন না। না কাউকে না। দিদিমাকে নয়, আপ্পি আম্মিকেও নয়। পায়ে পড়ি আপনার, আপনি শুধু চুপ ক'রে থাকুন...কতদিন? জানি না, ভগবান জানেন। হ্যাঁ, আসবেন বৈকি...একশোবার আসবেন।

জীবনে এই প্রথম নিজেকে অপরাধিনী মনে করেছে অম্বি। কি ভয়ংকর ভুলে আপ্পি আর আম্মির মনের একটা বড় সাধকে যেন হত্যা করতে চলেছিল অম্বি। কিন্তু সময় থাকতেই ধরা পড়ে গিয়েছে অম্বির সেই ভুল। রমাকে অধীরের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তৈরি হয়েছেন, এমনই অনেক আশা নিয়ে দিনক্ষণের অপেক্ষা করছেন আম্মি আর আপ্পি। এই সত্য যদি প্রথমেই আকস্মিক কোন ঘটনায় বুঝতে পারতো অম্বি, তবে অম্বি অধীরের মুখের দিকেও তাকাতে না তাকাতে যতই ইচ্ছে হোক, আর মনের ভিতর সে স্বপ্ন যতই কান্না কাঁদুক না কেন। নিজের উপর কঠোর হবার শক্তি আছে অম্বির। এতদিন সেই শক্তি নিয়েই অম্বির জীবন চলছে।

নতুন ক'রে একবার ভয়ানক কঠোর হতে পারবে না কেন অম্বি? নিশ্চয়ই পারবে। আপ্পি আর আম্মির মনের আশাকে এখন নিজের প্রাণের রক্ত দিয়েই সফল ক'রে তুলতে হবে। রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ে হবে, এই আকাঙ্ক্ষিত একটা ঘটনাকেই এখন প্রতিমুহূর্তের চিন্তা আর চেষ্টা দিয়ে সত্য ক'রে তুলতে হবে। এই হবে অম্বির জীবনের এক নতুন ব্রত। দুঃসহ, কিন্তু হাসিমুখেই এই ব্রত পালন করবে অম্বি।

হ্যাঁ, হাসিমুখেই এই বাড়ির জীবনের পরিণামকে যেন জোর ক'রে পথ ঘুরিয়ে দেবার জন্য অম্বির প্রতিদিনের চেষ্টা চলতে থাকে। রমার কাছে অধীরের প্রশংসা, আর অধীরের কাছে রমার প্রশংসা। যেন যাদুকরীর মত রমার মনে সেই মোহ সঞ্চারিত করতে চায় অম্বি, যে মোহ ভালবাসা হয়ে ফুটে উঠতে পারে। অধীরের মনের উপরেও যেন সেই সূক্ষ্ম ও জটিল মায়া রচনায় পরীক্ষা চালায় অম্বি। অধীরের কাছে রমাকে মোহনীয় ও লোভনীয় ক'রে তোলবার জন্য নানা কথা ও কাহিনী ও ঘটনার পরিবেশন করে অম্বি।

পড়ার ঘরে রমার কাছে গিয়ে অনেক চিন্তা আর উদ্বেগের ভঙ্গিতে অম্বি বলতে থাকে--

অধীরবাবু তোর এত প্রশংসা করে কেন?

--প্রশংসার যোগ্য বলে, এর মধ্যে কেন আবার কি?

--না, অধীরবাবু কেন করেন?

--হরির মা'ও তো আমার প্রশংসা করে।

--ঠাট্টা না করে তোমার একটু বোঝা উচিত রমা।

--তুই কি বোঝাতে চাস আমাকে?

--অধীরবাবুর মত ভাল মানুষ হয় না।

--তা কে না জানে? বিদ্যা অনেকেরই থাকে কিন্তু অমন ভাল মন খুব কম দেখা যায়।

--আমার ভয় হয়, এরকম একটা ভাল মনও শেষপর্যন্ত যদি কোন দুঃখ পায়।

--তার মানে?

সহসা উত্তর দিতে পারে না অম্বির অনুরোধগুলির মধ্যে যেন চাপা কান্নার সুর কান্নার সুর লুকিয়ে রয়েছে, অথচ অম্বি যেন এক নতুন হর্ষের সুর দিয়ে ঢাকতে চাইছে সেই করুণতা।

রমার কত প্রশংসা করে অধীর, রমার কাছে সে-কথা বর্ণনা করতে গিয়ে অম্বি হঠাৎ আরও স্পষ্ট ক'রে দেয় তার চেষ্টার ইঙ্গিত।--অধীরবাবুর কাছে তুই যদি রোজ পড়া শিখে নিতে পারিস, তবে কলেজের সব মেয়ের মধ্যে তুই নিশ্চয়ই ফার্স্ট হবি।

রমা বলে--হ্যাঁ, কিন্তু তুই যদি অধীরবাবুর কাছ থেকে পড়া শিখিস তবে কি হবে বুঝতে পারিস?

--কি?

--তবে তুই এই পৃথিবীর সব মেয়ের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে যাবি।

বিব্রত হয় অম্বি। কিন্তু উপায় খোঁজে, আশা ছাড়ে না।

অধীর যেদিন এল, সেদিন আবার নতুন ক'রে অম্বি তার পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য তেমনি সূক্ষ্ম প্রয়াসের কুহক সৃষ্টি করে। রমার মত ভাল মেয়ে হয় না। রমাকে যে-মানুষ আপন ক'রে নেবে, সে-মানুষ জীবনে সুখী হবেই হবে। রমা যে-সব প্রশংসা করেছে অধীরের নামে, সে-সব প্রশংসার কথাই অধীরকে বিচিত্র এক উৎসাহ নিয়ে শোনাতে থাকে অম্বি।

রমার পড়ার ঘরে অধীর এসে ঢুকতেই রমা বলে--অম্বিকে ডেকে দিচ্ছি।

অধীর হাসে--তুমি কোথায় যাচ্ছ?

রমা--আমার কথা ছেড়ে দিন। হয় তো ডলিদের বাড়ি চলে যাব। আবার চণ্ডালিকার রিহার্সাল আরম্ভ হয়েছে।

রমা চলে যায়, এবং একটি মিনিট পরেই উদাসভাবে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ায় অম্বি। অম্বি বলে--আপনি কিছু মনে করবেন না অধীরবাবু। একটু অপেক্ষা করুন, এখনই আপ্পি আপনার সঙ্গে গল্প করবার জন্য আসবেন।

অধীর হাসে--তার মানে, আপনি এখন এখানে আমার কাছে বসে দু'টো কথাও বলতে পারবেন না, এই তো?

--সত্যিই আমার কাজ আছে অধীরবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন।

--আপনার কথা আমি একটুও বিশ্বাস করলাম না, বিশ্বাস করুন।

--রমাকেও বিশ্বাস করা আপনার উচিত হয় নি।

--তার মানে?

--ও যে একটা ছুতো ক'রে চলে গেল, বুঝতে পারেন নি?

--বুঝতে পারলেও আমার কি করার আছে?

—রমাকে আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনার সঙ্গে দু'টো কথা বলবার জন্য কত আশা ক'রে বসে থাকে রমা ; আপনি শুধু ওর আজেবাজে কথাগুলিকেই দেখতে পান, ওর মনটাকে দেখতে পান না।

গম্ভীর হয় অধীর।

মনে হয় অম্বির, তার এই ব্রত সফল হয়, যদি আর একটু চেষ্টা করা যায়। যদি একটু কঠোর হওয়া যায়, যদি তার মনের কান্নাকে আরও ভাল ক'রে চেপে অধীরের মনে রমার নামে এক নতুন মোহ সৃষ্টি করতে পারা যায়।

এক এক সময় অধীরের কথা ও মন্তব্য থেকে যেন আশার আভাস পায় অম্বি। মনে হয়, অধীরের মনে রমার সম্বন্ধে একটা আকর্ষণের মায়াবোধ জাগছে। এই সত্য কল্পনা করতে একদিকে যেমন নিশ্চিন্ত হয় অম্বি, তেমন আর একদিকে মনে হয়, কি দুঃসহ এই সত্য!

রোজই আসছে অধীর, অধীরের একমাত্র কৌতূহল হলো, কেন অম্বি তার বিয়ের প্রস্তাবকে বাধা দিল? বিষণ্ণ হয়ে আছে অধীরের মন। সংযোগ খোঁজে, সোজা প্রশ্ন ক'রে অম্বির কাছ থেকে এই রহস্যের অর্থ জেনে নিতে চায়, কিন্তু ঠিক সুযোগ পায় না। যতবার নিভৃতে দেখা পেয়ে কথাপ্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে চেয়েছে অধীর, ততবারই কোন না কোন ঘটনায় প্রশ্ন অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। হয় চা খেতে ডাক দেন চারুবালা, নয় অম্বি সরে যায় কোন কাজের অজুহাতে।

ব্যারাকপুরের গঙ্গার কলস্বর যখন অনেক রাতের নীরবতার মধ্যে হঠাৎ এক একবার বেজে ওঠে, তখন ঘুম ভেঙে যায় অম্বির এবং আর ঘুম আসে না। গঙ্গার ঘাটে একা একা বেড়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে অম্বি। গঙ্গার ঘাটেও এখন আর সূর্যাস্ত দেখবার সুযোগ পাওয়া যায় না। আষাঢ়ে মেঘের ঘটায় কালো হয়ে আছে আকাশ। কিন্তু গঙ্গার ঢেউ তো আছে, আর জলের শব্দে অদ্ভুত সান্ত্বনার ভাষা আছে। কাছে গিয়ে দেখতে আর শুনতেও ইচ্ছা করে ; কিন্তু না, আর না। ভয় হয়, পিছন থেকে হয়তো ব্যস্তভাবে ছুটে আসবে একটি সুন্দর মানুষের ছায়া। একেবারে পাশে এসেই আবার সেই একই কথা জিজ্ঞাসা করবে—তুমি এমন ক'রে লুকিয়ে থাকছো কেন?

কিন্তু সে এখন কোথায়? কলকাতাতেই আছে কি? অনেক দিন হলো, এই বাড়িতে আর আসে নি অধীর। আপ্পি আর আম্মির কথাবার্তা থেকেও কোন সংবাদ ধরতে পারে না অম্বি। আশ্চর্য লাগে, এই বাড়ির কারও মন একটুও বিচলিত হয় না কেন?

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারে অম্বি, এই বাড়ির মন সত্যি বিচলিত হয়ে উঠেছে। শ্যামবাজার থেকে পিসিমার চাকর একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। অধীরের অসুখ জ্বর আর মাথাধরা।

বাড়িসুদ্ধ সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, আপ্পি আর আম্মি তৈরি হয়েছেন এখুনি শ্যামবাজারে গিয়ে অধীরকে একবার দেখে আসবেন।

দেখে খুশি হয় অম্বি। কিন্তু এই খুশির ভিতরেই যেন একটা কাঁটা লুকিয়ে রয়েছে। অধীরকে দেখতে যাবার অধিকার এই পৃথিবীর সবারই আছে, শুধু নেই অম্বির।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আবার বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছা করে। নিজের এই হাত দু'টোকেই যেন আবর্জনা বলে মনে হয় অম্বির। সে মানুষ যে নিজেই শখ ক'রে চেয়েছিল এই জ্বর, শুধু অম্বির হাতের একটা ভুল দেখবার লোভে। অধীরের কপালে অম্বির হাতের ছোঁয়া লুটিয়ে লুটিয়ে জ্বরের সব জ্বালা আর তাপ স্নিগ্ধ ক'রে দেবে, সেই মানুষের এমন একটি স্বপ্নকেই আজ তুচ্ছ ক'রে দূরে সরে থাকবে অম্বি।

কিন্তু বুঝতে ভুল হয় নি অম্বির। এই অসুখের খবর যে অম্বিকেই কাছে পাওয়ার

আশায়, কার জন্য, এই খবর এসেছে, কল্পনা করতে অসুবিধা নেই। তবু যেতে পারবে না অম্বি, এবং সেই মানুষও অম্বির এই হৃদয়হীনতা দেখে হতভম্ব হয়ে অম্বিকে চিরকালের মত অবিশ্বাস করুক।

হঠাৎ রমা হেসে বলে--আমি যাচ্ছি অম্বি।

--কোথায়?

--অধীরবাবুর অসুখ, একবার দেখে আসি।

অম্বি অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে। রমার চোখের ঐ চঞ্চলতা কি সত্যিই একটা ব্যাকুলতা? রমার মনে তবে কি সত্যিই...।

রমা বলে--তুই যাবি না?

অম্বি--না।

রমা--কেন?

অম্বি--কেন আবার কি? যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

রমা গম্ভীরভাবে বলে--ইচ্ছে যদি না করে তবে না যাওয়াই ভাল।

চলে গেল রমা। আপ্পি আর আম্মির সঙ্গে একই গাড়িতে বসে রমা চলে যাচ্ছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এই রহস্যটাকে বুঝতে চেষ্টা করে অম্বি, এবং বুঝতে পারে, হ্যাঁ, রমার মন আজ অধীরের কাছে গিয়ে বসবার জন্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অধীরের জন্য রমার মনে এতদিনে একটা মায়াভরা কৌতূহল দেখা দিয়েছে।

অম্বির চেষ্টা আর ইচ্ছাই সফল হয়েছে। জানালার কাছে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল অম্বি সে নিজেই জানে না। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটা অন্ধ ভিখারী চেঁচিয়ে গান গাইছে আর বৃষ্টি পড়ছে। ভিখারীকে চাল দিয়ে বিদায় করার পর, আর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে ভিজবার পর অম্বির চোখ থেকে যেন বেদনার ঘোর কেটে যায়। ভালই হলো। যেন একটা মানত সফল হলো এতদিনে।

তবু একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর পেলেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাবে অম্বির সব উদ্বেগ। অধীরও কি তবে রমারই আশায় তার জ্বরের শরীর নিয়ে দরজার দিকে তৃষার্তের মত উৎসুক হয়ে তাকিয়ে বিছানার উপর চুপ ক'রে পড়ে আছে? কে জানে, এতক্ষণে বোধহয় রমাকে পেয়েই শান্ত হয়ে গিয়েছে অধীরের চোখের প্রতীক্ষা।

তাই যেন হয়। ফটক থেকে ফিরে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকতেই ঝি চেঁচিয়ে ওঠে...এ কি গো অম্বিদি? মিছিমিছি ভিজছো কেন?

অম্বি হাসে—ভয় নেই, আমার জ্বর হবে না।

পিসিমার পরিকল্পনাও প্রায় সফল হয়ে এসেছে। অম্বির জন্য যে পাত্র সংগ্রহ করেছেন পিসিমা, সেই পাত্রের পক্ষ হতে পাতিপত্র রচনা করার প্রস্তাবও এসে গেল। নইলে অন্য জায়গায় পাত্রী খুঁজবেন তাঁরা। পিসিমাও ব্যস্তভাবে উপেন আর চারুবালাকে নানা তাগিদে বিচলিত ক'রে তুললেন! পিসিমার কথার জালে তাঁদের প্রশ্নগুলিও যেন বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। ভুল হয়ে যাচ্ছে যুক্তি। পিসিমার কথার উপর বেশি বিশ্বাস। পিসিমাকে বড়ই উপকারী জন বলে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন দুজনে। পাত্রপক্ষের লোক আর উপেনবাবু একদিন পাতিপত্রে সিঁদুরের ছাপ দিয়ে বিয়ের প্রস্তাবও পাকা ক'রে ফেললেন।

আর একটা প্রস্তাব, পিসিমা তাঁর সংকল্পের আর এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এইবার, অধীরকে স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করবেন এবং বলবেন। রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ের তারিখটা ঠিক ক'রে ফেলতে হবে, শুধু অধীরকে একটু জিজ্ঞাসা করা। শুধু দুজনের মন একটু বুঝে নেওয়া। রমার কি ইচ্ছে, পরীক্ষার আগেই রাজী কি না? অধীরও কি তাই চায়?

এইজন্যই এইবার রমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন পিসিমা। দুটিতে এক সঙ্গে বসে গল্প করলে বলেই ফেলবে মনের কথা, আর পিসিমা আড়াল থেকে শুনেই ফেলবেন। পিসিমা বলেন--ওগো আমি তো দিদিমা হই, নাতির সঙ্গে একটু রগড় আমি করবো না তো কে করবে?

কদিন পরে পিসিমা নিজেই এলেন দুটি চিঠি হাতে নিয়ে, দুটি নিমন্ত্রণ পত্র। রমা আর অম্বির কাছে লেখা অধীরের দুটি চিঠি। জন্মদিনের নিমন্ত্রণ। পিসিমা উপেনের বাড়ির ফটকে ঢুকবার আগেই একটি চিঠিকে কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেন। অম্বির নামে লেখা নিমন্ত্রণের আহ্বানলিপি ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে থাকে। পিসিমা এসে শুধু রমার হাতে তুলে দেন নিমন্ত্রণ-পত্র।

দেখে খুশি হয় অম্বি। শুধু রমার কাছেই অধীরের নিমন্ত্রণের চিঠি এসেছে। তার মনে সন্দেহ থাকে না। অধীরের মনে রমার জন্য যে আহ্বান জেগে উঠেছে, তার প্রমাণ ঐ নিমন্ত্রণের চিঠি। শুধু রমারই কাছে, আর কারো কাছে নয়। চোখের জলে আর বিস্ময়ে এই প্রমাণকে সত্য বলে স্বীকার করতে চেষ্টা করে অম্বি।

আর কোন প্রশ্ন নেই। অম্বির আর একটি মানতও সফল হয়েছে. অধীরের মন আজ রমাকেই খুঁজছে।

ভাল হলো, আপ্পি আর আম্মির জীবনের একটা সাধের আশাকে ব্যথিত করবার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেল অম্বির জীবন। আরও ভাল, অম্বিকে একটা ছলনা, একটা মিথ্যা ভালবাসার খেয়াল, একটা ফাঁকির কুহকিনী বলে বুঝে ফেলতে পেরেছে অধীর। সুখী হোক অধীর। অম্বিকে মনে প্রাণে যদি ঘৃণা করতে পারে অধীর, তবেই একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে অম্বি।

চোখের কোণ দুটো ছলছল করে, নিঃশ্বাসের মধ্যে যেন কাঁটা খচখচ করে! করুক। কেউ দেখতে পাবে না, বেশ ভাল করে এই বেদনা লুকিয়ে ফেলতে পারবে অম্বি। রমার বিয়ের দিন অম্বির মুখের হাসি দেখে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্দেহবাদীও ধরতে পারবে না যে, অম্বির বুকের ভিতর তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্নটা নিজেই নিজের গলায় ছুরি দিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আপ্পি আম্মি আর রমা সুখীই হবে। সবচেয়ে বেশি সুখের কথা, অধীর সুখী হবে। তবে আর দুঃখ করবার কি আছে। অম্বি জানে, সেই পাঁচ বছর বয়স থেকেই জানে, কেমন করে সংসারের এক একটা সুন্দর ও মধুর মায়া আর ভালবাসার লোভ থেকে নিজেকে টেনে নিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে হয়। সেই যে কবে, আজও স্মৃতির কুয়াশার ভিতর যেন জ্বলজ্বল করে সেই দৃশ্যটা। আম্মির বিছানা থেকে অম্বি তার ছোট বালিশটা তুলে নিয়ে আয়ার ঘরে চলে গেল। আম্মির বুক ঘেঁষে শোবার অধিকার ছিল না, সেই পাঁচ বছর বয়সের অম্বির। আজও ঠিক তেমনিই সরে যেতে হোলো। সহ্য করা এমন কি কঠিন কাজ? এখন তো অনেক বড় হয়েছে অম্বি। অনেক বয়স হয়েছে, বুকের হাড়গুলি কেমন যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

রমাকে সাজিয়ে দিল অম্বি। সেই সাজে, যে-সাজে অধীরের স্বপ্ন অম্বিকেই সাজাতে চেয়েছিল একদিন। সেই চন্দ্রমল্লিকা, হাস্নুহানার সৌরভ, খয়েরের টিপ, আর চাঁপারঙের শাড়ি। রমা আশ্চর্য হয়, কেন অম্বি যাবে না? চারুবালাই রমার আপত্তি খণ্ডন করেন, রমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এসে বলে দেন--বনেদী বংশের উঁচু জাতের বাড়িতে অম্বি যেতে পারে না, যাওয়া উচিত নয়।

পিসিমার বাড়িতে এই ঘটনার মীমাংসা হয়ে গেল বড় স্পষ্ট ভাবেই। রমা এল। অধীরের সঙ্গে নিভৃতে বসে রমার অনেক গল্প আর আলোচনাও হলো। পিসিমা বার বার দরজার

আড়ালে এসে দাঁড়ান, উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। তারপরেই অপ্রসন্ন মুখে গজগজ করতে করতে অন্যত্র চলে যান। আবার ফিরে এসে শুনবার চেষ্টা করে, কি বলছে অধীর রমাকে?

শুনে হতাশ হয়ে পড়েন পিসিমা। অম্বি, অম্বি, অম্বি। শুধু অম্বির কথাই আলোচনা করছে দুজনে। রমাই বলে দেয়, অম্বি নিজের হাতে এভাবে সাজিয়ে দিয়েছ রমাকে। শুনে মনে মনে হাসে অধীর। অম্বির নানা গুণের কথা প্রাণ খুলে বলতে থাকে রমা। আর অধীরও অম্বির নামে সব গল্প আর সব ঘটনার বর্ণনাকে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনতে থাকে।

অধীর বলে—অম্বি বোধহয় নিজেকে খুব চালাক মনে করে।

রমা—বোধহয় কেন, সত্যিই অম্বির ধারণা যে, ওর চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ভূ-ভারতে নেই। সর্বদা আমাকে উপদেশ দিচ্ছে অথচ নিজে...

অধীর—নিজে কারও সামান্য একটা অনুরোধের সম্মান রাখতেও রাজী নয়।

বলতে বলতে গম্ভীর হয় অধীরের মুখ। তারপর রমার মুখের দিকেই যেন একটা বেদনাহত দৃষ্টি তুলে বলতে থাকে—তোমাকে বলা উচিত নয়, তবু না বলে থাকতে পারছি না, আমি আশা করেছিলাম, আজ অন্তত অম্বি আসবেই।

রমা বলে—আমিও আশ্চর্য হয়েছি। তা ছাড়া আমারও মনটা এত রেগে গেল যে আমিও ওকে আসবার জন্য বললাম না।

অধীর—তোমার তবু একটা সুবিধা আছে রমা, অম্বির ওপর রাগ করতে পার। কিন্তু আমি যে অম্বির ওপর রাগ করতে পারছি না।

খিলখিল করে হেসে ওঠে রমা।

অধীর বলে—তুমি বোধহয় আমাকে ঠাট্টা করছো রমা।

রমা বলে—হ্যাঁ, আপনাকে ঠাট্টা করাই উচিত। একথাটা আমাকে না বলে অম্বির কাছে বলে ফেলতেই তো পারেন।

আড়াল থেকে শুনে চমকে ওঠেন পিসিমা। হ্যাঁ, অম্বি নামে ঐ অজাত একটা মেয়ে বড় বেশি ছলনা বিস্তার করেছে। ঐ মেয়েটাই পথের কাঁটা। ওকে পথ থেকে তাড়াতাড়ি সরাতে না পারলে পিসিমার সংকল্প ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। নিজেকে আরও কঠোর ক'রে নিয়ে প্রস্তুত হন পিসিমা। অধীরের মন থেকেই অম্বির নামের মোহ চূর্ণ করে দিতে হবে।

রমার মুখের নানা গল্প শুনে নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছে অধীর। রমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে অধীরের চোখের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অম্বি তার মনের গোপন একটা চেষ্টাকেই ধরা পড়িয়ে দিয়েছে। অম্বির ইচ্ছা রমার বিয়ে হোক, এই রহস্যের আভাস এক দুঃসহ বিস্ময়ের আঘাতের মত অনুভব করেছে অধীর। কিন্তু কেন? ভালাবাসা কি শুধু এই রকম একটা লুকোচুরি খেলার আবেগ? খামখেয়ালের উল্লাস? অধীরের জীবনের আশা আর আনন্দগুলি কি অম্বির ইচ্ছার হুকুম মেনে উঠবে বসবে আর ছুটে বেড়াবে? এই বিস্ময়ের চরম হিসাব নিকাশ করবার জন্যই উপেনের বাড়িতে দেখা দিল অধীর।

অধীরকে দেখতে পেয়েই ভয় পায় অম্বি। অধীরের চোখে যেন দুর্জ্ঞেয় একটা প্রশ্ন জ্বলজ্বল করছে। এবং সেই প্রশ্ন ধ্বনিত হওয়া মাত্রই বুঝতে পারে অম্বি, তার শেষ প্রয়াস সফল হয় নি। রমাও একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছে অম্বিকে।

অধীর বলে—আমি তো আর দেরী করতে পারি না।

অম্বি বলে—ভুল করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।

—কেন?

অম্বি বলে—আপনার ক্ষতি হবে।

অধীর—কিসে আমার ক্ষতি হয় বা না হয়, সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে।

বাগানের কাছে বাঁশের খুঁটি বেয়ে নতুন মাধবীলতা অনেক উপরে উঠে গিয়েছে আর নতুন বর্ষার জলে বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে দুলছে। এ হেন একটা ভয়ানক নিরালার এক কোণে অম্বি আজ অধীরের চোখের সামনে আটক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চলে যাবার সুযোগ পায় নি। বাড়ির ভিতর থেকেও কোন ডাক আসে না, কেউ ডাকলেও এখান থেকে শুনতে পাওয়া যাবে না। ছুতো করে যাবার উপায় নেই অম্বির। অধীরের মুখের ঐ স্পষ্ট দাবি যেন পরোয়ানার মত অম্বির কানের কাছে এসে অম্বিকে এই মুহূর্ত তৈরি হয়ে নিতে বলছে।

অম্বি বলে--আপনাকে আমার চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করতে পারবে, এমন মেয়ে কি এই পৃথিবীতে নেই?

অধীর--থাকতে পারে!

অম্বি--আমার উপর মায়া করতে আপনাকে যতটুকু ভাল লাগছে, তার চেয়ে অনেক বেশী ভাল লাগবে, এমন মেয়েও তো কত আছে।

অধীর চেঁচিয়ে ওঠে--না, নেই। আমি তোমার চেয়ে বেশী বোকা নই অম্বি।

উপায় নেই। কোন যুক্তি, কোন অনুরোধ, কোন অজুহাত আর কোন ছলনার জোরে অম্বির প্রাণ অধীরের ঐ প্রতিজ্ঞার দাবিকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে আর মিথ্যা বুঝিয়ে পালিয়ে যাবার পথ পাচ্ছে না।

কিন্তু, আর এই সব তুচ্ছ বাজে যুক্তি আর তর্কের দরকার কি? একটি সত্য কথা বলে দিয়েই তো এই মুহূর্তে অধীরের মনের এই প্রতিজ্ঞার জোর চূর্ণ করে দেওয়া যায়। উঁচু জাতের এতবড় বংশগর্বের মানুষ যে এখনও অম্বির এই শরীরটার রক্তমাংসের ইতিহাসের কোন খবরই রাখে না।

হঠাৎ অম্বির চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে! অধীরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে, যেন বুকের ভিতর মত্ত একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হতে চেষ্টা করছে অম্বি। অম্বি বলে--আপনি তো জানেন কত বড় বংশের কত উঁচু জাতের মানুষ আপনি?

অধীর--জানি বৈকী।

অম্বি--আপনি তো জানেন যে, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে অনেক নীচ জাতের মানুষ আছে।

অধীর--জানি।

অম্বি--নীচ জাতের মানুষের মনও নীচ হয়ে থাকে। বিশ্বাস করেন নিশ্চয়ই?

অধীর--বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অবিশ্বাস করবার জন্যই প্রমাণ খুঁজছি।

কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ নীরব হয় অম্বি। থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে অম্বির দুই কালো চোখের তারা। আর, চোখের কঠোর দৃষ্টি যেন হঠাৎ বেদনায় ছলছল করে ওঠে।

আশ্চর্য হয় অধীর--তুমি আজ আমাকে এসব প্রশ্ন করছো কেন অম্বি?

উত্তর দেয় না অম্বি।

অধীর বলে--রমা বোধহয় তোমাকে বলেছে যে, আমি জাতপাতের মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য রিসার্চ করছি।

তবু উত্তর দেয় না অম্বি। মাধবীলতার ভেজা পাতা থেকে টুপটাপ ক'রে জলের ফোঁটা অম্বির খোঁপার উপর ঝরে পড়তে থাকে। অধীরের মুগ্ধ চোখ দুটো এক নতুন সন্দেহে যেন তীব্র হয়ে চমকে ওঠে।--তুমি, তুমি কি তোমার নিজের জাতের কথা ভাবছো অম্বি?

অম্বি--হ্যাঁ।

অধীর--তুমি কি উপেনবাবুর মত...মানে আমাদের মত জাতের মেয়ে নও?

অম্বি--না।

অধীরের এতক্ষণের সব আগ্রহ যেন স্তব্ধ হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে অতি শান্ত স্বরে, যেন ছোট একটি বিস্মিত আর্তনাদের মত শব্দ করে অধীর প্রশ্ন করে--তবে?

অপলক চোখে অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে অম্বির প্রাণটাও যেন নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে শিউরে ওঠে। ভয় পেয়েছে অধীর। উঁচু জাতের মানুষের ভালবাসা হঠাৎ নীচ জাতের ছায়া দেখে আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। ভালই হয়েছে। এই মুহূর্তে অধীরকে সব ভুল মোহ থেকে মুক্ত করে দিতে পারবে অম্বি।

অধীরের মনকে হঠাৎ আঘাতে যেন চরম ক'রে চূর্ণ করার জন্যই নিজের পরিচয় প্রকাশ করে দেয় অম্বি।--আমি ভয়ানক ছোট জাত। আমি অন্ত্যজা, অস্পৃশ্য। আমার রক্তে দোষ আছে, আপনাদের পবিত্র পৃথিবীতে আমি একটা আবর্জনা।

অধীর নিঃশব্দে স্থির হয়ে শুনতে থাকে। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় অম্বি, একি? অধীরের দুই চোখ যেন মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। যেন এই জগতের এক বিস্ময়কে, এবং অধীরের জীবনের এক অন্বেষণের সত্যকে এতদিন চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে অধীর।

অধীর হাসে--তুমি ভয় দেখাচ্ছ অম্বি, কিন্তু ভুল করছো, তুমি আমার জীবনের সব অন্বেষণের জয়গান গাইছ। সত্য বলে বুঝতে চেয়েছিলাম যে কথাকে, তুমি তারই রূপ, তারই প্রমাণ। তুমিই আমার বিশ্বাস, আমার থিওরীর শেষ অধ্যায় আজ আমি লিখবো। আমার জিজ্ঞাসার তৃপ্তি তুমি। সবচেয়ে বড় শান্তি তুমি। তুমি ভুলভাঙানো এক সুন্দর সত্যের মূর্তি। জাত মিথ্যা, রক্ত মিথ্যা--তোমার মধ্যেই তার প্রমাণ পেলাম।

আরও লুব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে উঠেছে অধীরের অন্তরাত্মা। কিন্তু একেবারে অসহায়ের মত নীরব হয়ে যায় অম্বি। অধীরের এই প্রেমিকতা যেন স্বর্গের সুধার চেয়ে বেশি মধুর। কিন্তু এই প্রেম অম্বিকে আহ্বান করছে, আপ্পি আর আম্মির মনে দুঃখের আঘাত হানবার এক চক্রান্তে। মরতে পারে অম্বি কিন্তু আপ্পি আর আম্মির কাছে হীন হতে পারে না। এই বাড়ির মায়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না অম্বি। এই সহজ সত্যটুকু বুঝতে পারছে না অধীর।

অম্বি বলে--না। তবু আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।

অধীর--তবুও না?

কি আশ্চর্য! অম্বির এই পাথুরে হৃদয়ের পরিচয় কোনদিন পায়নি অধীর। এ যে পাথরের ফুল। কিন্তু কিসের আশায়, কোন মোহে, অধীরের এই আহ্বানকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেবার শক্তি পাচ্ছে অম্বি? এ কোন্ রহস্য?

অধীর প্রশ্ন করে--কোথায় কার কাছে কোন্ আকর্ষণের লোভে আমার ডাক এমন ক'রে তুচ্ছ করতে পারছো অম্বি? এর কি কোন গোপন কারণ আছে।

অম্বি বলে--আছে, তোমার প্রতি আমি নিষ্ঠুরতা করতে পারি, এমন কারণও আছে, আকর্ষণও আছে, লোভও আছে।

উত্তপ্ত স্বরে অধীর প্রশ্ন করে--শুনি, কি সেই আকর্ষণ?

অম্বি--শুনতে চাইবেন না, পায়ে পড়ি আপনার। আপনি শুধু বিশ্বাস করুন, আপনার স্বপ্নের চন্দ্রমল্লিকা মরে গিয়েছে।

ক্ষীণ সন্দেহ নিয়ে ফিরে যায় অধীর।

অধীরের মনের এই অবস্থারই সুযোগ নিলেন পিসিমা। কথাপ্রসঙ্গে আভাসে জানিয়ে দিলেন,--একটা ভাল খবর শুনেছিস অধীর? বেশ ভাল ঘরে অম্বির বিয়ে হচ্ছে। পাত্র বেশ পয়সাওয়ালা মানুষ।

চমকে ওঠে অধীর, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু দিদিমাকেও অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা

হয় না। বিচলিত অধীরের যুক্তি বুদ্ধিও যেন এই দুঃসহ সংবাদে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। মনটাই সন্দেহের বশে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। অম্বির সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে অধীরের মন। টেলিফোনের রিসিভার তুলে ধরে অধীর।

অধীরের ভাষাও যেন হঠাৎ তিক্ততায় উন্মত্ত হয়ে গরলে পরিণত হয়েছে। অম্বিকে স্পষ্ট করেই নিষ্ঠুর অভিযোগে আক্রমণ করতে কুণ্ঠিত হয় না অধীর--এমন তামাসার, এমন হীনতার কোন প্রয়োজন ছিল না। টাকা আমার আছে, চাইলেই পাবে। এখনও পেতে পার। কিন্তু টাকার কাছে বিকিয়ে যায় কারা? তুমি কনকধুতুরা, বিষ আছে তোমার ঐ সুন্দর হাসিতে আর নিঃশ্বাসে ; তুমি আমার সারা জীবনের বিশ্বাসের সাধনাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলে। আজ আমাকে নতুন ক'রে লিখতে হবে, শুরু করতে হবে আমার--বলতে হবে পৃথিবীকে, জাত আছে, ছোট-জাত। তাদের রক্তে ছোটতা আছে। তার প্রমাণ তুমি।

অম্বির ক্ষীণ প্রতিবাদের ভাষা অধীর শুনতে পায় না। কল্পনাও করতে পারে না অধীর, তার কথার আঘাতে এখন দূর ব্যারাকপুরের একটি কক্ষের নিভৃতে অম্বি নামে এক মেয়ের দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

অধীর বলে--কিসের আকর্ষণ? সে আকর্ষণ কি এতই সুন্দর যে তার জন্য তোমার কাছে আমার জীবনের সব অনুরোধ মিথ্যে হয়ে গেল?

অম্বি--তবে শোন।

কিন্তু অম্বির আবেদন শুনতে পায় না অধীর। টেলিফোন রেখে দিয়েছে অধীর। বার বার প্রশ্ন করেও উত্তর পায় না অম্বি।

চিঠি লেখে অম্বি।--তোমাকে সুখী করবার শক্তি আমার নেই, কারণ আমি চিরকাল আমার আপ্পি আর আম্মির গা ঘেঁষে পড়ে থাকতে চাই। এই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লোভ। কিন্তু তুমি আমাকে সুখী করতে পার। আমাকে যদি সুখী করতে চাও, তবে রমাকে বিয়ে কর।

রমাকে বিয়ে কর! অম্বির চিঠির এই প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হয় না অধীর। বিশ্বাসঘাতিকারা এই রকম আত্মত্যাগের ছলনা দেখায়। কিন্তু বুঝতে পারে না অম্বির যুক্তিগুলি। চিরকাল আপ্পি আর আম্মির গা ঘেঁসে পড়ে থাকবার আনন্দটুকু হারাতে চাই না। এ কথার অর্থ কি? তবে অম্বি কি বিয়ে করতে চায় না? তবে দিদিমা এ কোন্ কথা বললেন?

নিজেকে শান্ত করে নিয়ে টেলিফোনেই আবার অম্বিকে ডাকে অধীর। এবং পরমুহূর্তে সেই দুঃসহ সন্দেহের চরম মীমাংসা হয়ে যায়।

--আমার বিয়ে। অম্বি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে।

--হ্যাঁ!

--কোথায়, কবে, কার সঙ্গে?

--বেশ এক টাকাওয়ালার সঙ্গে।

--কোথায় শুনলে?

--ভাল মুখ থেকেই শুনেছি।

--তবে শোন, কিন্তু একটি কথা দাও।

--কি?

--এমন বিয়ের লগ্নের আগে তুমি একবার আসবে আমার চোখের কাছে।

--কেন?

--এই পৃথিবীকেই একটা ঘটনা দেখিয়ে দেব।

--কি?

--তোমার পায়ের ধুলোর দাগ এই সিঁথিতে বরণ ক'রে নিয়ে তোমার চোখের সামনেই

মাটিতে লুটিয়ে পড়বে এই ছোটজাতের মেয়ে, আর উঠবে না।

--অম্বি। অম্বি!

কোন উত্তর পায় না অধীর। কিন্তু অধীরের বুকে যেন তীক্ষ্ণ একটা আক্ষেপের খোঁচা লেগেছে। কি কুৎসিত সন্দেহ! কি ভয়ানক মূঢ়তা! নিজের ভুলের বেদনা সহ্য করতে না পেরে ছটফট ক'রে বেড়ায় অধীর। বার বার অম্বির চিঠির সেই লাইনটাই পড়ে, 'আমাকে যদি সুখী করতে চাও তবে রমাকে বিয়ে কর।'

বার বার এই লাইনটিই পড়ে অধীর। হেসে ওঠে অধীরের চোখ। চিৎকার ক'রে ডাক দেয় অধীর--দিদিমা!

বটার মা'র সঙ্গে কথা বলছিলেন পিসিমা। রমার সঙ্গে অধীরের আসন্ন বিয়ের শুভ ঘটনার সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেছিলেন। একটু আগেই দেখেছেন পিসিমা, উপেনের বাড়ির চাকর রাদু এসে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছে অধীরকে ; আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন পিসিমা। ধারণা করেছেন, রমার চিঠি এসেছে। পিসিমাই যে ক'দিন আগে রমাকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে শিখিয়ে দিয়ে এসেছেন, তুমি বাছা মাঝে মাঝে অধীরকে চিঠি দিয়ে দুটো ভাল কথা লিখে নেমন্তন্ন করো। জানই তো, আজকালকার শিক্ষিত ছেলে, ওসব বড়ই ভালবাসে।

আশার আলো দেখতে পেয়েছেন পিসিমা। বটার মাকে বলেন--ঠিক, আমি যা ভাবছি তাই হয়েছে বটার মা। ভগবান বুঝি এতদিনে কৃপা করলেন।

পিসিমা অধীরের কাছে এসে খুশিভরা কণ্ঠে বলেন--কি রে ভাই?

অধীর--তুমি কি চাও যে, আমি বিয়ে করি?

--নিশ্চয়ই।

--তবে শোন।

পিসিমা এইবার যেদিন আসবেন সেদিন একেবারে শুভসংবাদ সঙ্গে নিয়ে আসবেন। উপেন আর চারুকে এই আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন পিসিমা। আর দেরি করা উচিত নয়। কিন্তু অধীরের সম্মতির কথা নিয়ে কবে আসবেন পিসিমা, এই কথাই উৎসাহিতভাবে আলোচনা করেন উপেন আর চারুবালা। এবং হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখতে পান, সত্যিই পিসিমা আসছেন। অধীরও সঙ্গে আছে।

রমার পড়ার ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে থাকে, অধীর, পিসিমা ধীরে ধীরে গম্ভীর মূর্তি নিয়ে উপেনের কাছে এগিয়ে আসেন।

উপেন বলেন--পিসিমাকে স্মরণ করা মাত্র যখন পিসিমা উপস্থিত হয়েছেন, তখন বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয়ই শুভসংবাদ আছে।

তিক্ত ও কঠিন মুখ নিয়ে পিসিমা বলেন--হ্যাঁ শুভসংবাদ। আমাকে যখন ঠাকুর ঘরে ঢুকে বলতে হয়েছে...।

কি?

--বলিয়ে ছেড়েছে গো। অধীরের বিয়ের কথা ঠাকুরকে নিবেদন করতে হয়েছে। ঠাকুরের কৃপা চাইতে হয়েছে। চাইয়ে ছেড়েছে গো।

উপেন আর চারুবালা উৎসাহিত হয়ে হাসতে থাকেন। কিন্তু পিসিমার চোখ হতাশ উদাস ও বিষণ্ণ। পিসিমা হাঁপ ছেড়ে বলেন--অধীর বিয়ে করবে বলেছে।

চারু--দিনক্ষণের কথা?

পিসিমা--তা জানি না, একটা দিন হলেই হলো।

চারু--পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ভাল ছিল।

পিসিমা--কিসের পরীক্ষা?

চারু—রমার!

পিসিমা—রমার পরীক্ষা রমা দিক না কেন। অম্বির তো পরীক্ষা টরীক্ষা নেই।

চারু চেঁচিয়ে উঠেন—তার মানে অম্বি? অম্বি মানে কি?

পিসিমা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন—অম্বিকেই তো বিয়ে করতে চায় অধীর।

পিসিমার কথা শোনামাত্র নিস্তব্ধ হয়ে আর শূন্য দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন উপেন আর চারুবালা। পিসিমাকে এক অদ্ভুত বিশ্বাসঘাতিকার মত মনে হয়। কিন্তু দেখা যায়, ভীতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন পিসিমা।

চারুবালা বলেন--কিন্তু অধীর যদি জানে যে অম্বির জাতটা কি, তাহলে নিশ্চয়ই...।

পিসিমা বলেন--সে কি আর জানতে কিছু বাকি আছে। সবই জানে। যার জানাবার সেই জানিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত! অধীর কি বলে শুনবে? বলে অম্বি তো এখন উপেনবাবুরই মেয়ে।

উপেন—তবে আপনার আর কি জানবার আছে?

পিসিমা—আমার কিছুই জানবার নেই। নাতি শুধু জানতে চায়, অম্বি রাজী আছে কি না।

চারুবালা—ধিক্কারের সুরে চেঁচিয়ে ওঠেন--ওর রাজী হতে কি আর বাকি আছে না কি? জেনে শুনে ইচ্ছে করেই এই কাণ্ড করেছে। রাজী হয়েই আছে।

পিসিমা—তবু একবার অম্বিকে জিজ্ঞেস করে অধীরকে তোমরাই জানিয়ে দিও। আমি আর এর মধ্যে নেই...। আর এই নাও...।

অম্বির বিয়ের সেই পাতি-পত্র উপেনের হাতের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে পিসিমা চলে গেলেন, পৃথিবীকে ধিক্কার দিতে দিতে, সংসারের অদ্ভুত অনিয়মগুলিকে অভিশাপ দিতে দিতে।

বাইরের বারান্দায় গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন পিসিমা। চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর কাঁদলেন। পিসিমার মনের রাজ্যেও যেন একটা ওলট-পালট হয়ে গেল হঠাৎ।

শ্যামবাজারের বাড়িতে আর ফিরলেন না পিসিমা। তাঁর নিজের মনের হীনতাকেও আজ যেন দেখতে পেয়েছেন পিসিমা তাই নিজেকেই অশুচি বোধ করছেন।

মনে পড়ে পিসিমার, অধীরের সেই কথাগুলি, তোমার কোম্পানির কাগজগুলি কাড়তে চাই না, কিন্তু তোমার আশীর্বাদ কাড়তে চাই।

আবার ফিরে আসেন পিসিমা। নিস্তব্ধ উপেন আর চারুবালার কাছে এসে একটি কাগজের প্যাকেট সঁপে দিয়ে বলেন—এগুলি তোমার কাছেই রাখ।

উপেন আতঙ্কিতের মত তাকান—কেন? পঞ্চাশ-হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ, এসব কার জন্য?

পিসিমা—অম্বিকে দিয়ে গেলাম। যখন হার মেনেছি, তখন ভাল করেই হেরে যেতে চাই। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমি এখন কাশী যাব, তারপর কোথায় যাব জানি না।

চলে গেলেন পিসিমা।

এবাড়ির অন্তরে যেন এক ভয়ংকর পরাভবের অপমান রেখে দিয়ে পিসিমা সরে পড়লেন। বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে শুধু সহ্য করবার চেষ্টা করেন উপেন ও চারুবালা। এ কি কাণ্ড? কোন্ নিয়ম? রমাকে পছন্দ না ক'রে, এ কোন্ প্রেমের চক্ষু? শিক্ষিত উচ্চবংশীয় অধীর শিক্ষা দেখলো না, বংশও দেখলো না? রূপও দেখলো না? তবে দেখলো কি?

প্রথমে অধীরের কথা আলোচনা করেন। অধীরের উপর শুধু অভিমানের মত একটা অভিযোগ ব্যথা দেয় চারুবালাকে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেন, অধীরের দোষ নয়। দোষ যার, অলক্ষ্যে দংশন দান ক'রে এই বাড়ির এতদিনের স্নেহের শোধ দিল যে সাপিনী, সে-ই মনের উল্লাস লুকিয়ে ঐ ঘরে বসে রয়েছে। পরের মেয়ে, একটা অজাতির মেয়ে এইভাবে এতদিনে কৃতজ্ঞতার শোধ দিল। আড়াল থেকে ছলনার জোরে একটা ভাল ছেলের মনকে

উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। রমা পারবে কেন ঐ সাপিনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়? বড় জাত আর ছোট জাতের পার্থক্য এই।

কি আশ্চর্য! বলতে বলতে উপেন ছটফট করেন। যেন এই সর্বনাশটুকু করবার জন্যই ধীর স্থির শান্ত অথচ হীন একটা হিংসা একটা বাচ্চা মেয়ের মূর্তি ধরে এই পরিবারের বুকের কাছে দেখা দিয়েছিল। বাইশ বছর ধরে বড় হয়ে, এতদিনে তৃপ্ত হয়েছে এই হিংসা। তাদের নিজের মেয়েকে পৃথিবীর কাছে ছোট ক'রে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সেই হিংসাটা।

--মেয়ের মত নয়। সাপের মত। চিৎকার করে ওঠেন চারুবালা।

--ভুল হয়েছে। চেঁচিয়ে ওঠেন উপেন। তারপরেই নিজেকে সংযত করে বলেন--যাক, আর দেরী করা উচিত নয়। অম্বিকে জানিয়ে দাও, জিজ্ঞাসা ক'রে নাও, তারপর নিঃশব্দে বিদায় ক'রে দাও। আমাদের আর চিৎকার ক'রে লাভ কি?

কিন্তু চিৎকার ক'রে ওঠেন চারুবালা। কিন্তু আমাকে বাদ দাও। মেয়েকে চেলির জোড়ে সাজিয়ে দিয়ে আমি উৎসব করতে পারবো না। আমার হাতে মঙ্গল-ঘট সাজানো চলবে না। আমি উলু দিতে পারবো না, আমি আশীর্বাদ করতে পারব না। আমি ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, তুমি এই সাপের মত মেয়েকে বিদায় ক'রে দিয়েছো।

ঘর থেকে ছুটে বের হলেন চারুবালা। কিন্তু অম্বি শুনতে পেয়েছে আম্মির আক্ষেপের কঠোর ভাষাগুলি। শুনে চমকে উঠেছে।

ছুটে আসে অম্বি। এবং চারুবালাকে ছুটে যেতে দেখেই বাধা দিয়ে ডাকে অম্বি--আম্মি।

চুপ! চুপ! আমি কারও আম্মি নই। সাপের মত তুই, রক্তে বিষ আছে তোর।

ছুটে যান চারুবালা। অম্বি আর্তনাদ ক'রে পিছু পিছু ছুটে যায়--আম্মি। আম্মি।

কিন্তু সর্বনেশে এক আঘাতের বেদনায় তীক্ষ্ণ স্বরে অম্বির গলা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে যায়। ভাঙা সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গিয়েছেন চারুবালা। ছুটে আসে রমা আর উপেন আর অধীর।

অচেতন ও দুর্বল অসাড় দেহ নিয়ে বিছানার উপর পড়ে ছিলেন চারুবালা।

অধীরের টেলিফোনের ডাক শুনে ছুটে এসেছেন অধীরের ডাক্তার বন্ধু। মাথার আঘাত পেয়েছেন চারুবালা। ডাক্তার বলেন--রক্ত চাই। 'বি' টাইপ রক্ত।

কিন্তু চাইলেই, এবং টাকা খরচ করতে তৈরি হলেও রক্ত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হলো। ডাক্তারের টেলিফোনের জিজ্ঞাসার উত্তরে রক্তব্যাঙ্ক সংক্ষেপে দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানিয়ে দেয় স্টক-এ এখন সব টাইপের রক্ত নেই। 'এ' আছে 'এ-বি' আছে, আর 'ও' আছে। 'বি' একেবারেই নেই। চিন্তায় পড়লেন ডাক্তার। চলে গেলেন, এবং ফিরে এলেন রক্ত আহরণ ও সঞ্চার করবার যন্ত্রসম্ভার সঙ্গে নিয়ে।

আর দেরী করলে চলবে না। এই মুহূর্তে রক্ত সঞ্চার করতে হবে চারুবালার দেহে। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রক্ত দেবার জন্য উপেন এগিয়ে আসেন। ডাক্তার আপত্তির ভঙ্গীতে বলেন, আপনি বুড়োমানুষ, আর কেউ নেই?

কিন্তু উপেনের অনুরোধে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করেই বলে--চলবে না।

রমা এগিয়ে আসে। রমার রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে দেখে মন্তব্য করেন--চলবে না। আর কেউ নেই? দেরি করলে চলবে না। কুইক।

অম্বি এগিয়ে আসতেই উপেন চমকে উঠে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অম্বি বাধা মানে না। অম্বির দুই চক্ষুর কঠোর দৃষ্টি দেখে উপেন হঠাৎ কুণ্ঠিতভাবে চোখ ঘুরিয়ে নেন।

অম্বির দেহের উপরেই ডাক্তারের শোণিতগ্রাহী যন্ত্র পিপাসিতের মত মুখ এগিয়ে দেয়। রক্তের নমুনা পরীক্ষা ক'রে খুশী হয়ে ওঠে ডাক্তারের চক্ষু। মিল, মিল পাওয়া গিয়েছে। এই তো, সুন্দর 'বি' টাইপ রক্ত। অম্বির রক্তের কণিকা চারুবালারই রক্তের কণিকার একই মায়ার উত্তাপ দিয়ে গড়া।

অম্বির মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বলেন--সুন্দর মিলে গেছে। চলবে। কিন্তু আপনার শরীরও যে দুর্বল মনে হচ্ছে। অনেকখানি রক্ত টানতে হবে ভয় করছে না তো?

অম্বি বলে--আপনি আর একটুও দেরি করবেন না ডাক্তারবাবু!

কি আশ্চর্য, অম্বির সারা মুখে কি-যেন এক পরম তৃপ্তির আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

অম্বির দেহ থেকে রক্তধারা আহরণ করে ডাক্তার। তারপর অন্য ঘরে গিয়ে সংজ্ঞাহীন চারুবালার দেহে রক্ত সঞ্চার করেন! সমাপ্ত হয় ডাক্তারের কাজ।

যাবার সময় খুশী হয়ে বলে যান ডাক্তার। আর আশঙ্কা করবার কিছু নেই।

ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করেন চারুবালা। উপেন বলেন--এ কি রকম ব্যাপার হলো? এ কেমন রক্তের মিল?

অধীর--আপনি কি আশ্চর্য হয়েছেন?

উপেন--হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মিললো না, রমার সঙ্গে মিললো না, মিললো গিয়ে...।

অধীর মৃদু হাসি হাসে।--আপনি কি মনে করেন, রক্তের মধ্যেও জাত আছে।

চারুবালা হঠাৎ চোখ মেলে তাকান--কি বলছো তোমরা?

অধীর বলে--আচ্ছা, আমি এবার আসি।

আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায় অধীর।

চারুবালা--কি কথা বলছিল অধীর?

উপেন বলেন--অধীর নয়, আমিই বলছিলাম। আবার একটা অপমান সইতে হলো চারু।

--কি? কে অপমান করলো?

--অম্বি। অম্বির রক্তের মধ্যে ডাক্তার তোমার রক্তের মিল খুঁজে পেয়েছে।

--কি? অম্বি রক্ত দিয়েছে? উত্তেজিত হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করেন চারুবালা।

উপেন--হ্যাঁ।

চারু--কেন?

উপেন--কেন জানি না। জানে অম্বি, জানেন তোমার ভগবান, জানে এই সংসারের যত অদ্ভুত অনাসৃষ্টির নিয়মকানুন। শুধু তুমি জান না, আর আমি জানি না।

অবসন্নের মত আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়েন চারুবালা। চারুবালার চোখ ছলছল করে।

উপেন বলেন--হার হলো, সব দিক দিয়ে হার হলো চারু। অম্বি দেনা শোধ ক'রে দিল, আর ওকে বলবার কিছু নেই, ওর কথা ভুলে যাও।

চারুবালা বলেন--হ্যাঁ, ভুলেই যেতে চাই।

যেন নরম হয়ে আসছে চারুবালার মনের কঠোর বিক্ষোভগুলি। চারুবালা ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলতে থাকেন--দোষ মেয়েটার নয়, দোষ আমাদের ভাগ্যের। এমনই হয়ে থাকে। দয়া ক'রে আমাকে বাঁচিয়েছে অম্বি, ওর ওপর রাগ করবার অধিকারও রইল না।

হঠাৎ প্রশ্ন করেন চারুবালা--অম্বি কোথায়?

--ঐ ঘরে। ডাকবো?

--না। তুমি জিজ্ঞাসা করে এস।

--কি?

--আর কি চায় অম্বি? আমাদের জন্য করবার আর কোন শখ যদি থাকে মনে বলে ফেলুক এখনি।

উপেন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন।--দেখ, আর কোন কথা বলাই উচিত নয়। শুধু যেটুকু কর্তব্য আছে, তাই কর।

চারু--জিজ্ঞাসা করে এস, কবে বিদায় নিতে চায়। তারপর অধীরকে জানিয়ে দাও।

যাবার আগে অম্বির বিছানার কাছেই এসে একবার দাঁড়ায় অধীর। অবসন্নভাবে যেন একটা তন্দ্রা চোখে নিয়ে শুয়ে আছে অম্বি। অম্বিকে প্রশ্ন করে অধীর--কি ব্যাপার?

অম্বি--আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে অধীরবাবু, আমি বিশ্বাস করি। আর আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ কি জানেন, আমি এখনও বেঁচে আছি।

অধীর--কথার অর্থ?

অম্বি--আমিই আম্মির এই কষ্টের কারণ, আপনি পিসিমাকে বৃথাই পাঠিয়েছেন, আমি বিয়ে করবো না।

অধীর--তাহলে আমাকে তোমার আর বলবার কিছু নেই?

অম্বি--আছে।

অধীর--বল।

অম্বি--আমাকে ঘেন্না ক'রে চলে যান, আর আপনি সুখী হোন।

অধীর--চলে যাচ্ছি, কিন্তু দুঃখ এই যে, তোমাকে ঘেন্না করে যেতে পারলাম না। আমি তোমাকে ভালবেসে ভুল করিনি, কিন্তু তুমি আমাকে ভালবেসে ভুল করেছো।

অম্বি--হ্যাঁ, ভুল ক'রে ভালবেসেছি অধীরবাবু, বুঝতে পারিনি।

অধীর--হাসে।--তুমি নিশ্চিন্ত হও অম্বি, দুঃখ করো না, তোমার সেই ভুলের কথা ভেবেই আমি সুখী হতে পারব। এ ছাড়া সুখী হবার আর কোন পথ নেই।

অম্বি দুহাতে চোখ ঢাকা দিয়ে বলে--ভুলে যাও।

উত্তর না পেয়ে আরও ব্যাকুল হয়ে অম্বি বলতে থাকে।--তুমি সুখী হবে, রমাকে বিয়ে কর। আমার কথা রাখ।

অম্বির চিঠিকে দুমড়ে মুচড়ে অম্বির বিছানার উপর ফেলে দেয় অধীর।--এই অনুরোধ ক'রে বৃথা আমাকে অপমান করো না অম্বি। রমা বেচারাকে ঠকাবার পরামর্শ আমাকে দিও না। তার চেয়ে ভাল, আমিই জীবনে ঠকে যাই।

চলে যায় অধীর। কিন্তু অম্বি বুঝতে পারে না যে অধীর চলে গিয়েছে। অম্বি বলে--কিন্তু আমাকে ক্ষমা করে যাও। আপ্পি আর আম্মির মুখের হাসি নষ্ট করতে পারবো না আমার এই দুর্বলতা ক্ষমা কর।

দরজা পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়ান এবং শুনে চমকে ওঠেন উপেন। এ কি? কার সাথে কথা বলছে অম্বি।

শুনতে থাকেন উপেন, অধীরের পায়ের শব্দ হনহন ক'রে বাইরে বারান্দার উপর দিয়ে যেন ছুটে চলে যাচ্ছে।

বাইরের অন্ধকার থেকে একটা দমকা বাতাস ঘরে এসে ঢোকে। ফরফর করে দুমড়ানো একটা চিঠি ঘরের ভিতর থেকে উড়ে এসে উপেনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে।

চমকে ওঠেন উপেন। চিঠি পড়েন উপেন। চিঠির ভাষা বলেছে--তুমি ভুল করো না, রমাকে বিয়ে কর, তাহলেই আমি সুখী হবো।

পড়েই বিস্ময়ের অপলক চক্ষু নিয়ে তাকিয়ে থাকেন এবং পরমুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে উপেন চেঁচিয়ে ওঠেন--হেরেছি চারু, সত্যিই হেরে গিয়েছি। অম্বির কাছে আমাদের জীবনের সব ভুলের অহংকার হার মেনেছে।

চিঠি পড়েন, উঠে বসেন এবং চোখ বন্ধ করেন চারুবালা।

উপেন বিচলিত হয়ে বলে--বল চারু, একি মেয়ের মত একটা প্রাণের কথা, না মেয়ের চেয়েও...।

চারুবালা--দেখ এখন, স্বীকার কর, যাকে মেয়ে বলে মানতে ভয় করেছিলে, সে-ই

তোমার মেয়ের চেয়েও...।

উপেন ব্যাকুলভাবে বলতে থাকেন--হার মেনেছি চারু। মানতেও বড় আনন্দ হচ্ছে, অ্িঃ. আমাদের ফাঁকি ধরিয়ে দিয়েছে। অম্বি! অম্বি!

উপেন ছটফট করতে করতে অম্বির ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ান, তারপর ডাক দেন--আয়। একবার কোনোমতে কষ্ট ক'রে তোর আম্মির কাছে আয় অম্বি।

অপরাধিনীর মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চারুবালার বিছানার কাছে দাঁড়ায় অম্বি! চারুবালার চোখ দুটো ঝকঝক করেছে। অপলক চোখে অম্বির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তার পরেই হঠাৎ, জলে ভেজা রোদের মত এক ঝলক স্নিগ্ধ হাসির আভা ফুটে উঠে চারুবালার চোখ-মুখ জুড়ে যেন থমথম করতে থাকে। চারু বলেন--অধীর তোকে বিয়ে করতে চায়? তুই রাজী আছিস তো?

অম্বি বলে--না।

--কেন?

--আমি বিয়ে করতে চাই না।

--কেন?

--রমার বিয়ে হোক্।

--কিন্তু তোরও তো বিয়ে হওয়া চাই।

--না চাই না। আমি যে তোমাদের...।

--বল, চুপ করে রইলি কেন? বল, তুই আমাদের কে?

কেঁদে ফেলে অম্বি--আমি তোমাদের মেয়ের মত, চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকতে চাই। আমি চলে গেলে তোমাদের দেখবে কে বল?

বেদনাভরা লজ্জার আঘাতে আহত হয়ে চমকে ওঠেন চারুবালা ও উপেন।

উপেন বলেন--আমাদের অনেক ভুল হয়েছে অম্বি, কিন্তু তুইও এখন ভুল করছিস। বিয়ে তোকে করতেই হবে, এবং অধীরের সঙ্গেই হবে।

--কেন আপ্পি?

উপেন--কেন আবার কি? আমরা হাসতে চাই, আবার কাঁদতেও চাই! তোকে সুখী করতে চাই, আবার তোকে ছেড়ে দেবার দুঃখে কষ্ট পেতেও চাই। তুই তো বুঝবি না, এ কেমন দুঃখ। তুই যে আমাদেরই...।

আপ্পি! চেঁচিয়ে ওঠে অম্বি। উপেনের মুখের দিকে জলভরা দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিয়ে যেন বিদ্রোহিনীর ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। যেন শেষ বোঝাপড়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে অম্বির সমস্ত অন্তর। উপেনের মুখের ঐ ভাষাকে সহ্য হয় না। হাত দিয়ে উপেনের মুখ চেপে ধরে অম্বি--বলো না আপ্পি, আর ওকথা বলো না। সহ্য করতে পারবো না।

চারুবালা--শোন অম্বি।

উপেন--আরে, তুই যে আমাদেরই মেয়ে।

শুনে শিউরে ওঠে, তারপরেই যেন স্তব্ধ হয়ে উপেনের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে অম্বি। তারপরেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে চারুবালার পিঠের উপর মুখ লুকোয় অম্বি, গুনগুন ক'রে কাঁদতে থাকে। সারা জীবন উৎকর্ণ হয়ে ছিল অম্বির প্রাণ যে সত্যের ঘোষণা শোনবার জন্য, এতদিনে এই অদ্ভুত এক লগ্নে সেই সত্যের ধ্বনি শুনতে পেল অম্বি। মেয়ের মত নয়, আমাদেরই মেয়ে। আঃ সাবা জীবনের একটা অভিমানের জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

চারুবালা অনুযোগ করেন--ছিঃ, এ কি করছিস অম্বি? সব মেয়েরই বিয়ে হয়, বাপ-মাকে ছেড়ে থাকতেও হয়।

অকস্মাৎ রমা বিস্মিত চক্ষু নিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে—একি? অম্বি কাঁদছে কেন?

চারুবালা হাসেন--বিয়ের কথা শুনে কাঁদছে।

রমা আশ্চর্য হয়--বিয়ে? কার বিয়ে?

চারু—অম্বির।

রমা—কার সঙ্গে?

চারু—অধীরের সঙ্গে।

ঝক্ ক'রে হেসে ওঠে রমার কৌতুকদীপ্ত দুই চক্ষু। রমা বলল—তোমরা বিশ্বাস করছো বুঝি, অম্বি কাঁদছে?

চারুবালা বলেন--চুপ কর তুই।

রমা--আমি বলছি হাসছে, নিশ্চয়ই হাসছে।

এগিয়ে এসে জোর করে অম্বির মুখ তুলে ধরে রমা। হ্যাঁ অম্বির চোখ সত্যিই জলভরা ; কিন্তু তারই মধ্যে দেখা যায়, অম্বির দুই ঠোঁটে যেন এক কৃতার্থ জীবনের হাসি সলজ্জ আভাষ দিয়ে ফুটে উঠেছে। যেন একটা শিশুর কচি মুখের হাসি ; যেন বহুদূর হতে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বাপ-মার কোলের কাছে লুটিয়ে পড়েছে, আর সেই আনন্দ সইতে না পেরে হেসে উঠেছে।

অম্বির মুখের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রমা হাসে—আমি আগেই জানতাম।

ভিলা মাধবী

বাড়িটার নাম ভিলা মাধবী। ছোট্ট একটি পাহাড়ী টিলার উপর বাংলো ধাঁচের এই বাড়িটার চওড়া বারান্দার সামনেই আড়াআড়ি একটি সারিতে অনেকগুলি ইউকালিপটাস। গাছের সাদা-সাদা ধড় যেমন নিরেট, তেমনই নিখুঁত ও সোজা তাদের খাড়াই চেহারা। কোনদিন কোন ঝড়ের আঘাতে যদি গাছগুলির মাথা ভেঙে পড়ে যায়, তবে মনে হবে, সাদা-সাদা নিরেট থামের ধড় দাঁড়িয়ে আছে। আর ভিলা মাধবীর এই বাংলো ধাঁচের চেহারাকেও বোধহয় ছোট একটা পার্থেননের ধ্বংস বলে মনে হবে।

ভিলা মাধবীর ফটকের কাছে সড়কের পাশে একটি সাইনপোস্টের লেখা জানিয়ে দেয়—হাজারিবাগ টাউন, টু মাইলস্। কিন্তু টাউনের প্রায় সকলেই জানে যে, এই ভিলা মাধবী হলো সেনসাহেবের বাড়ি।

সেনসাহেবের নাম যে সুজীবন সেন, এটা অবশ্য টাউনের সকলেই জানে না। কিন্তু আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু যাঁরা দু'জন একদিন এলাহাবাদের ছাত্র ছিলেন, তাঁরা জানেন, এলাহাবাদের বিখ্যাত ডাক্তার পি সেনের ছেলে সেই সুজীবন সেন অনেক শখ করে আর পয়সা খরচ করে প্রায় পাঁচ বছর হলো এই বাড়িটা তৈরি করিয়েছে আর নাম দিয়েছে ঃ ভিলা মাধবী।

ভিলা মাধবীর ফটকের আর্চের জাফরিগুলিকে জড়িয়ে ধরে যে লতার ভার সবুজ হয়ে দুলছে, সেটা আইভিলতা ; মাধবীলতা নয়। ভিলা মাধবীর এত বড় লন আর হাতার কোথাও কোন মাধবীলতা নেই। তবু নামটা ভিলা মাধবী হলো কেন?

এটা অবশ্য টাউনের কেউই জানে না। জানেন শুধু মিসেস চৌধুরী, যিনি এক বুড়ী মেমসাহেবের কারবারের পার্টনার হয়ে টাউনের বাইরের এই চমৎকার হোটেলটিকে দশ বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন ; হোটেল সিংহানি। জায়গাটার গেঁয়ো নাম সিংহানি। ভিলা মাধবীর ফটক থেকে সড়ক ধরে মাত্র দশ মিনিট হেঁটে এগিয়ে গেলেই হোটেল সিংহানিকে দেখতে পাওয়া যায়, জানালার আর দরজার যত ময়ূরকণ্ঠি রঙের পর্দা ফুরফুর করে উড়ছে।

হোটেল সিংহানির ওই মিসেস চৌধুরী জানেন, সুজীবন সেন তার স্ত্রী মাধবীর নামটিকেই ভালবেসে আর পছন্দ করে বাড়িরও নাম রেখেছে মাধবী। মাধবী যে মিসেস চৌধুরীর জেঠতুতো দিদির মেয়ে। আর, সুজীবন সেনের স্ত্রী মাধবীর কাছে এই মিসেস চৌধুরী আজও শুধু রেবা মাসিমা। বিধবা রেবা মাসিমার দুই ছেলে, গণেশদা আর কার্তিকদা, দু'জনেই এখন লণ্ডনে থাকে। আর, চিরকাল সেখানেই থাকবে বলে মনে হয়।

টাউনের লোক জানে, সেনসাহেব হলেন একজন কৃতী জিওলজিস্ট। আগে জিওলজির সার্ভেতে কাজ করতেন। তারপর কিছুদিন উড়িষ্যার এক দেশী স্টেটের খনিজ সন্ধানের ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু কোথাও বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি সেনসাহেব। কিন্তু তাঁর কাজের সুনাম আছে। তাই এখনও মাঝে-মাঝে ডাক আসে। ঝরিয়ার মাইন্স্ বোর্ড পরামর্শ নেবার জন্যে ডাকাডাকি করে। কোডারমা'র অভ্রখনির মালিকেরা প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন। তাই সেনসাহেব এখনও মাঝে-মাঝে ঘোরাফেরা করেন। কোথাও গিয়ে একটু সার্ভে করে দিয়ে ফিরে আসেন ; কোথাও বা কিছুদিনের জন্য খনির কাজ তদারক করেন। পরামর্শ তো প্রায়ই দিয়ে থাকেন। এর জন্য যে-পরিমাণের ফী পান সেনসাহেব, সেটাও যেমন-তেমন নয়। এক হাজার টাকার কমে কোন কথাই বলতে রাজী হবেন না সেনসাহেব। এই সেনসাহেবই জানকীলাল যমুনাদাসকে অ্যাসবেস্টস আর সোপস্টোনের খোঁজ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এটাও টাউনের অনেকের জানা আছে, বিশেষ করে আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু

জানেন, সেনসাহেবের জীবনের এটুকু আর্থিক রোজগার না থাকলেও বিশেষ কোন অসুবিধা হতো না। ডাক্তার পি সেন অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। শুধু এলাহাবাদের নয় ; কলকাতাতে আর পুরীর সমুদ্রের ধারে, সব মিলিয়ে তেরটি বাড়ির ভাড়া থেকে যে আয় হয়, তার উপর নির্ভর করে সেনসাহেব অনায়াসে সারাজীবন শুধু শিকার করে আর হুইস্কি খেয়ে পার করে দিতে পারবেন ; টাকার কোন অভাব হবে না।

এই খবরটা কিন্তু টাউনের প্রায় সকলেই জানে, সেনসাহেব একটু বেশি ড্রিঙ্ক করেন আর শিকারের শখে বড় বেশি পয়সা খরচা করেন। এত গুণী ও কৃতী জিওলজিস্ট হয়েও কোথাও যে একজন স্থায়ী অফিসার হয়ে টিকে থাকতে পারলেন না, তার আসল কারণ বোধহয় সেনসাহেবের ওই দুটি অভ্যাসের বাড়াবাড়ি। জ্বর হয়েছে ; টেম্পারেচার একশো একেরও বেশি ; ডাক্তার বলেছেন এক পা-ও নড়বেন না, ঘরের ভিতরে চুপটি করে শুয়ে পড়ে থাকুন ; কিন্তু ডাক্তারের উপদেশে কোন ফল হয়নি। বিকেল হতেই গ্যারেজ থেকে নিজেই গাড়ি বের করে, একগাদা বুলেট আর কার্তুজ আর চারশো বোরের কর্ডাইট রাইফেলটি সঙ্গে নিয়ে শিকারে বের হয়ে গিয়েছেন। এ-খবরও টাউনের অনেকেই জানে।

বছর চল্লিশ বয়স হবে, সেনসাহেব মানুষটিকে টাউনের অনেকেই বেশ পছন্দ করে। সাজে পোশাকে একেবারে খাঁটি সাহেবী স্টাইলের মানুষ ; হাতে সব সময়ই একটি পাইপ ধরে আছেন, আর চোখে ও মুখে সব সময়েই বেশ মিষ্টি একটি হাসি লেগে আছে। লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারও খুব ভাল। হাটের দিনে সড়কে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের বুড়োর কাছ থেকে কুমড়ো কিনে নিয়েই বুড়োকে হাসিমুখে ধন্যবাদ জানান--থ্যাঙ্ক ইউ। টাউন ক্লাবের ছেলেরা স্পোর্টসের জন্য চাঁদা চাইতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন। আর বেশ হাসিমুখেই ছেলেদের হাতের কাছে সিগারেটের ডিবে এগিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা অবশ্য লজ্জিতভাবে হেসেছে--সিগারেট খাই না। সেনসাহেব বলেছেন--তা হলে চা খেয়ে যাও।

টাউনের কারও সঙ্গে সেনসাহেবের মেলামেশা নেই ; কিন্তু সেজন্য সেনসাহেবের নামে কোন নিন্দের কথা কারও মুখে শোনা যায় না। সেনসাহেব একটু অদ্ভুত মানুষ, কিন্তু বেশ ভাল মানুষ।

সেনসাহেবের এই পরিচয় ছাড়া টাউনের মানুষ আর শুধু এইটুকু জানে যে, সেনসাহেবের স্ত্রী আছেন আর একটি মেয়ে আছে। সেনসাহেবের স্ত্রী একজন সত্যিকারের সুন্দরী ; আর ছোট্ট মেয়েটিরও কী চমৎকার ফুটফুটে চেহারা।

ভিলা মাধবীর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ধানক্ষেতের আর রোগা-রোগা খেজুর গাছের ভিড়ের ওপারে সেন্ট কলাম্বাস কলেজের রেনেসাঁ স্টাইলের বাড়িটাকে দেখা যায়। কলেজের সায়েন্সের ছাত্রেরা মাঝে-মাঝে অদ্ভুত একটা কৌতূহল নিয়ে ভিলা মাধবীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা সেনসাহেবের মিউজিয়াম দেখতে চায়। আসল কথা হলো, ওরা এই অদ্ভুত মানুষটিকেই একটু কাছে থেকে দেখতে চায়। সেই সঙ্গে দেখে যায়, হাজার রকমের পাথর নুড়ি আর খনিজের নমুনা হাজার রকমের চেহারা নিয়ে একটি ঘরের কাঠের গ্যালারিতে, কাঁচের আলমারিতে আর মেহগনির টেবিলে সাজানো রয়েছে।

অনেকদিন পরে আজ আবার একদল ছাত্র সেনসাহেবের মিউজিয়াম দেখতে এসেছে। সেনসাহেব নিজেই বেশ খুশি হয়ে আর হেসে-হেসে ছেলেদের হাতে আতসী কাঁচ ধরিয়ে দিয়েছেন--দেখ, বেশ ভাল করে দেখে নাও। এসব খুবই অদ্ভুত জিনিস। ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং, চার্মিং অ্যাণ্ড রোমান্টিক।

কত রকমের সিলিকা, স্লেট আর কেওলিন। ঝকঝকে অভ্র আর কালচে ম্যাঙ্গানিজ পাথর। সেনসাহেব নিজেও বলে দেন, এদিকের এগুলি হলো যত ফেরাস আর অ্যালুমিনাস

ল্যাটারাইট। পাথরের আকার-প্রকার দেখে ছাত্র ছেলেরা কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, কিন্তু সেনসাহেবকে বেশ বুঝতে পারে। সত্যিই বেশ ইন্টারেস্টিং আর চার্মিং মানুষটি। আর রোমান্টিক তো নিশ্চয়ই। তা না হলে এমন চমৎকার এক রূপসী নারীর এত বড় একটা ছবিকে এই মিউজিয়াম ঘরের মাঝদেয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন কেন?

ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ সাহস করে একটা প্রশ্ন করেই ফেলে--আপনি এই লাইনে কেমন করে এলেন স্যার।

হেসে ফেলেন সেনসাহেব, সুজীবন সেন।—শখ করে। ছেলেবেলা থেকেই শখ ছিল জিওলজি শিখবো, আর পাথরের রোমান্স দেখবো।

--কেন শখ হলো স্যার?....

সুজীবন সেন দাঁত দিয়ে পাইপ চেপে ধরে আবার হাসেন,--বিখ্যাত জিওলজিস্ট রায় বাহাদুর পি এন দত্ত ছিলেন আমার ঠাকুরদার বন্ধু। তাঁর নাম নিশ্চয় শুনেছ?

--না।

--তিনি বরাকর নদীর কিনারাতে কাঁকরের স্তর থেকে জুরাসিক কালের জানোয়ারের ফসিল বের করেছিলেন। দত্তদাদুর কাছে সেই যে পাথরের গল্প শুনলাম, সেই গল্পই মনে শখ ধরিয়ে দিল। হ্যাঁ...বুঝতে পারছো, চিনতে পারছো, এগুলি কী?

--না।

--এগুলি খুব দামী পাথরের ছোট ছোট ক্রিস্টাল ; বাংলা ভাষায় বলে রত্নপাথর। দেখতে খুব সুন্দর, নয় কি?

--হ্যাঁ স্যার।

--কিন্তু কেন সুন্দর বলতে পার?

--না স্যার।

--ওর মধ্যে ইমপিওরিটি আছে ; তার মানে ময়লা আছে ; ভেজাল আছে ; তার মানে অন্য একটা ধাতু ঢুকে পড়েছে। এই ইমপিওরিটি আছে বলেই সামান্য পাথর এত সুন্দর রঙিন রত্নপাথর হয়ে গিয়েছে। কেমন? ব্যাপারটা বেশ রোমান্টিক কি না?

--খুব রোমান্টিক। আপনি জিওলজিতে নিশ্চয় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন স্যার?

--হ্যাঁ।

--মার্কের রেকর্ড ব্রেক করেছিলেন?

--হ্যাঁ। আর চাকরি ছাড়বার রেকর্ডও ব্রেক করেছি। আট বছরে এগারটা চাকরি নিয়েছি আর ছেড়েছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ! আমি এখনই বের হব। শুনলাম, চাতরার জঙ্গলে একদল নীলগাই দেখা দিয়েছে।

ড্রাইভার মতিরাম গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে ফটকের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখে। শিকারে যাবার এই ব্যস্ততার মধ্যেও সুজীবন সেন কিন্তু একটা কথা বলে যেতে ভুলে যান না।--আমি যাচ্ছি মাধু। এক একদিন অবশ্য এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, ঘরের ভিতরে এসে কথাটা বলতে পারেন না। বাইরে লনের কাছে দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে কথাটা বলে দিয়েই গাড়িতে উঠে পড়েন।

সুজীবন সেনের স্ত্রী মাধবীলতা সেন একেবারে একটি স্তব্ধ মূর্তির মত ভিতরের একটি ঘরের কোচের উপর বসে খোলা দরজার পাশে কাঁচের টবের মেরি গোলাপের সদ্যফোটা স্তবকটার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকেন। গাড়ির শব্দ যখন আর শোনা যায় না, তখন ঘরের বাইরে এসে ডাক দেন মাধবীলতা--স্টিফান।

--জী হুজুর। সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে খানসামা স্টিফান।

--সাহেব আজ কি কি চীজ সঙ্গে নিয়ে গেল?

—একটা শেরি আর একটা হুইস্কি।

—ঠিক আছে ; যাও।

সুজীবন সেনের স্ত্রী, সেনসাহেবের দশ বছরের ঘরোয়া জীবনের সঙ্গিনী মাধবীলতা সেন আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে কোচের উপর চুপ করে বসে থাকেন।

সন্ধ্যা হয় যখন, ভিলা মাধবীর ঘরে-ঘরে আর বারান্দায় আলো ঝলমল করে, তখন আয়ার হাত ধরে বাইরে থেকে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসে আট বছর বয়েসের রঞ্জু, সুজীবন সেনের মেয়ে রঞ্জিতা সেন ; মুখটা সদ্যফোটা মেরি গোলাপেরই মত একটা সুন্দর ফুল্লতা।

রাতের খাবার খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে রঞ্জু। মাধবীলতা সেন পিয়ানোতে হাত দিয়ে ঘুমপাড়ানী সুর বাজিয়ে একটা ঘন্টা সময়ও পার করে দেন। কিন্তু তার পরেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতা তখন টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে আর, কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসেন।—তোমাদের আশার কোন মানে হয় না, মা। শোধরাবার কোন লক্ষণ দেখছি না। আগে কোনদিনও একথা মনে হয়নি যে, জিওলজিস্ট মানে পাথরের মানুষ। এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি এখান থেকে সরে গিয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে কিছুদিন থাকতে পারলে অন্তত একটু হাঁপ ছাড়তে পারতাম।

চাতরার জঙ্গলে নীলগাইয়ের সন্ধান পাননি সুজীবন সেন। জঙ্গলের গাঁয়ের কাছে মাচান করে পুরো দুটি রাত জেগে ফিরে এসেছেন। হ্যাঁ, একেবারে খালি হাতে ফেরেননি। একটা জংলী ময়ূর আর একগাদা তিতির নিয়ে এসেছেন। বোধহয় গাঁয়ের সাঁওতালদের কাছ থেকে কিনেছেন। আর, একটা পাহাড়ী নালার কিনারা থেকে পাথরের একটা চাক্‌লা তুলে নিয়ে এসেছেন। পাথরের ভাঁজের মধ্যে সিঁদুরের মত রঙিন একটা পুরু রেখার দাগ ; সুজীবন সেন বলেন,—বুঝতে পারলে তো মাধু, পাথরটার মধ্যে কী সুন্দর মার্কারির স্ট্রেন লালচে হয়ে রয়েছে?

কিন্তু মাধবীলতার চোখে কোন বিহ্বলতার স্ট্রেন সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে না। বরং, কেমন যেন শুকনো ঝরঝরে একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। ভদ্রলোকের কাছে জীবন্ত ময়ূর আর তিতির যেন মিথ্যে পদার্থের একটা স্তূপ ; আর এই পাথরের চাক্‌লাটাই জীবন্ত প্রাণী। গাড়ির কেরিয়ারের সঙ্গে বাঁধা পাখিগুলির পালক ধুলোয় ভরে গিয়েছে। কিন্তু পাথরের চাক্‌লাটাকে কত যত্ন করে গাড়ির ভিতরে সীটের গদির উপরে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত মানুষই বটে। এমন মানুষ কেমন করে মনে রাখবে যে, এই এক বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও তিনি তাঁর স্ত্রীকে আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে একটু বেড়িয়ে আসেননি।

বাড়িতে থাকলেই বা কি? কতদিন নিজের চোখেই তো বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছেন সুজীবন সেন, বিকেলবেলা লনের চারদিকে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছে এক নারী, তাঁরই স্ত্রী, যার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, যার জীবনে অনেক আশা এখনও রঙিন হয়েই আছে, যাকে দেখতে পেলে পথের মানুষ এখনও চোখ অপলক করে একটা রূপের বিস্ময় দেখতে থাকে ; তবু তার পাশে পাশে বেড়িয়ে একটা ঘণ্টাও গল্প করবার জন্য ইচ্ছে এই মানুষকে ব্যস্ত করে তোলেনি। শুধু মাধু মাধু বলে হঠাৎ এক-একবার খামকা ডাক দিয়েছেন। বড় জোর কাছে এসে পাঁচ-দশ মিনিটের মত দাঁড়িয়েছেন। তারপরেই উসখুস করেছেন। তখুনি ঘরের ভিতরে গিয়ে আলমারি খুলে শেরির বোতল আর গেলাস বের করেছেন।

চাতরার জঙ্গল থেকে শিকার করে ফেরা আর দু'রাত জাগা সুজীবন সেনের মূর্তিটাকে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন মাধবীলতা। সুজীবনের বাঁ চোখের ভুরুর কাছে একটা ক্ষত লালচে হয়ে রয়েছে. হাত-ঘড়িটার কাঁচের অর্ধেকটা নেই।

সরে যান মাধবীলতা। ড্রাইভার মতিরামকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন—কি হয়েছিল?

মতিরাম--সাহেব মাচান থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।

--কেন?

--একটু বেশি খেয়েছিলেন।

--ঠিক আছে, যাও।

মাঝ রাতে যখন একটা সোফার উপরে সুজীবন সেনের নেশার শরীরটা অলস জড়তার মত এলিয়ে পড়ে থাকে, তখন মাধবীলতা বিছানা থেকে উঠে এসে সুজীবন সেনের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন।

চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছেন সুজীবন সেন। কে জানে এখন কিসের স্বপ্ন দেখছেন। জগতের কোন্ বনের গোপনলোকে রাত্রির অন্ধকারে বেচারা নীলগাই ক্ষিদের জ্বালায় কচি শালের পাতা খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারই বুকে গুলি মারবার জন্য এই অদ্ভুত ভদ্রলোকের আত্মাটা এখনও বোধহয় এই ঘুমের মধ্যেও ছটফট করছে।

জঙ্গলের নীলগাইয়ের নাগাল পাননি ভদ্রলোক ; কিন্তু এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতার প্রাণের নাগাল তো পেয়েছেন। কাজেই, তার প্রাণটাকে একরকম মেরেই রেখেছেন।

সুজীবন সেনের ঘুমন্ত চোখ দেখতে পায় না, তার মাধবীলতার চোখ দুটো এখন কেমন অদ্ভুত জ্বলছে। মাধবীলতা বোধহয় তার অদৃষ্টের একটা ভয়ানক ঠাট্টার দিকে তাকিয়ে আছেন।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না মাধবীলতা। আত্মহত্যার মানুষ যেমন উতলা হয়ে চলন্ত ট্রেনের চাকার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ছুটে যায়, মাধবীলতাও যেন তেমনই একটা প্রতিজ্ঞার আক্রোশের মত উতলা হয়ে ছুটে গিয়ে পাশের ঘরের টেবিলের দেরাজ ধরে টান দেন। রঙিন নক্সাকরা চামড়ার একটি ব্যাগ বের করেন। ব্যাগটাকে উপুড় করে নাড়া দিতেই ঝুরঝুর করে একগাদা চিঠি ঝরে পড়ে।

মাধবীলতার হাতদুটো ছটফট করতে থাকে। তবে কি, চিঠিগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে, একেবারে বাজে কাগজের কুচি করে দিয়ে, বাগানের পাঁচিলের ওপারে কালো অন্ধকার আর ঝড়ো বাতাসের মধ্যে এখনই উড়িয়ে দিতে চান মাধবীলতা?

টেবিলের এই দেরাজটি হলো সুজীবন সেনের জীবনের পাঁচটি বছরের যত অভাবিত প্রাপ্তির মিউজিয়াম। চাইতে হয়নি, চেষ্টা করতে হয়নি, এক তরুণী নারীর ভালবাসার চিঠি বার বার এসে সেদিনের সুজীবন সেনের মনটাকে বিস্ময়ে ভরে দিয়েছিল। অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতা রায়েরই চিঠি। বিয়ের আগে তিন বছর আর বিয়ের পরে দু' বছর, সুজীবন সেনের কাছে লেখা মাধবীলতার চিঠির ভাষা যেন সুখী ভালবাসার গানের ভাষা। বিয়ের আগের একটি তারিখের মাধবীলতার একটি চিঠি বলছে, "জানি না তোমার মন কি বলে? কিন্তু আমি জানি, আমি তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসতে পার আর না-ই বা পার, বিয়ে করতে রাজি হও বা না হও, আমাকে মিথ্যেবাদী বলে মনে করো না।" বিয়ের পরের একটি তারিখের চিঠি বলছেঃ আমি তো আমার আশার বেশি কিছু পেয়ে গিয়েছি।

একটিও চিঠি হারিয়ে যায়নি ; হারিয়ে যেতে দেননি সুজীবন সেন। মোট একান্নটা চিঠি। দেখলে মনে হবে, চিঠিগুলিকে রত্নপাথরের একান্নটা ক্রিস্টাল মনে করে এই টেবিলের দেরাজের ভিতরে একটি গোপন যাদুঘরের মধ্যে পুষে রাখতে চেয়েছেন জিওলজিস্ট সুজীবন সেন।

কিন্তু ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতে সোনার মেডেল বিজয়িনী, ইতিহাসের ছাত্রী মাধবীলতা আজ বোধহয় এই চিঠিগুলিকে একটা মিথ্যে স্বর্ণযুগের যত প্রশস্তির প্রলাপ বলে মনে করছে। টেবিলের দেরাজের ভিতরে সুজীবন সেনের গোপন যাদুঘরের ভিতরে যেন একগাদা মিথ্যে

শিলালিপি লুকিয়ে রয়েছে।

চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকেন মাধবীলতা। তারপর, চিঠিগুলিকে আবার ব্যাগের ভিতরে ভরে দিয়ে দেরাজের সেই গোপন নিভৃতেই রেখে দিলেন।

আলো নিবিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে যাবার আগে অন্য একটি ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিলেন মাধবীলতা, বিছানাতে শুয়ে আছেন সুজীবন সেন। না, এই পাঁচ বছরের মধ্যে কোনদিনও ওই বিছানার কাছে এগিয়ে যেতে ইচ্ছেই করেনি।

ঘুমন্ত পাথর অবশ্য নিজেই এক-একদিন চমকে জেগে উঠেছে, মাধবীলতার কাছে এসেছে আর হাত ধরেছে। কিন্তু একটুও ভাল লাগেনি মাধবীলতার ; শুধু সহ্য করেছেন এইমাত্র। আজ কিন্তু ভাবতে গা ঘিন-ঘিন করে। যেন আর সহ্য করতে না হয়।

সকালবেলা চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মাধবীলতা বেশ গম্ভীর হয়ে কথা বলেন--আমি এলাহাবাদ যাব।

সুজীবন হাসেন--যেও। কিন্তু কথাটাকে এরকম একটা ভয় দেখানো স্বরে বলছো কেন?

মাধবী--কথা হলো, আমি এখন এলাহাবাদেই বেশ কিছুদিন থাকবো।

--থেক।

--কিন্তু তুমি আবার সপ্তাহে একটা করে টেলিগ্রাম করে উপদ্রব করবে না।

--সেটা আমার অভ্যেস। না করে থাকতে পারবো বলে মনে হয় না।

--না, চলে আসবার জন্যে ওরকম তাড়া দেবে না। আমার বিশ্রী লাগে। বাড়ির মানুষও হাসাহাসি করে।

--তা করুক। আমার যা ভাল লাগে আমি তা করবোই।

সুজীবন সেন অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন ; আর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মাধবীলতা কাছে এসে দাঁড়িয়ে আরও একটা অদ্ভুত কথা বলেন--এখন এলাহাবাদ গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকতে তোমার কি-আর এমন ভাল লাগবে? তার চেয়ে চল না কেন, মাস তিন-চারের মত অনেক দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

মাধবী--কোথায়?

সুজীবন--ইওরোপে।

মাধবী--এ-কথা তো পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি। একটা মিথ্যে কথা।

সুজীবন--আঃ, এমন সুন্দর মুখে এত শক্ত কথা শোভা পায় না। সত্যি, বিশ্বাস কর মাধু, সব ব্যবস্থা প্রায় ঠিক হয়েই গিয়েছে।

মাধবীলতার মুখের গম্ভীরতা হঠাৎ চমকে ওঠে।--কথাটা আমাকে আগে বলতে কি বাধা ছিল? আমি কি আপত্তি করতাম?

--না ; হঠাৎ বলে দিয়ে তোমাকে একটু আশ্চর্য করে দেবার ইচ্ছে ছিল তাই বলিনি।

আশ্চর্য হবারই কথা। যে-মানুষ তার অদ্ভুত এক সাধের জীবনের সীমানা পার হয়ে এই পাঁচ-বছরের মধ্যে একবার সিমলা দার্জিলিংও যেতে পারেনি, সে মানুষই বিদেশে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। জঙ্গলের জন্তু আর পাখি শিকার করবে, পাথর কুড়োবে, ভিলা মাধবীর একটি ঘরের সোফার উপর বসে যখন-তখন গেলাসভর্তি হুইস্কি চুমুক দিয়ে দিয়ে খাবে, আর স্ত্রী মাধবীলতা শুধু একটি রঙিন রূপের মূর্তি হয়ে চোখের সামনে ঘুর-ঘুর করবে ; কী অদ্ভুত একটা জীবন তৈরি করে ফেলেছে এই ভদ্রলোক! হ্যাঁ, রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই একবার মেয়েটাকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবে আর গালে একটা চুমো খাবে। বাস্, তার পরেই, কে যে স্ত্রী আর কে যে মেয়ে, সেটুকু বোঝবার দেখবার আর জানবার যেন কোন আর দরকার বোধ করেন না এই সুজীবন সেন। সে মানুষেরই মনে স্ত্রীকে আর মেয়েকে নিয়ে ইওরোপ বেড়াবার সাধ হয়েছে।

মাধবীলতা নিশ্চয় একটু বেশি আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু একটুও খুশি হতে পেরেছেন কি? পারেননি বোধহয় ; তাঁর চোখের দৃষ্টিতে কোন প্রসন্নতার চিহ্ন সুস্মিত হয়ে ফুটে ওঠে না। এ যেন ট্রেন ছেড়ে যাবার পর টিকিট কেনবার ব্যস্ততা। আলো নিবে যাবার পর মুখ দেখবার চেষ্টা। মাধবীলতার মুখের হাসি তো সাত বছর আগেই শুকিয়ে গিয়েছে। আজ হঠাৎ সুজীবন সেনের একটা খেয়ালী কথার ধ্বনি শুনেই সে রিক্ততা সব আক্ষেপ ভুলে গিয়ে হেসে উঠতে পারবে কেন? এক বছর বয়সের রঞ্জুর জন্মদিনের উৎসবে সুজীবন সেনের সঙ্গে সেই যে হেসে কথা বলেছিলেন মাধবীলতা, তারপর আর কোনদিন কখনও হেসে কথা বলতে কিংবা কোন কথা বলে হেসে ফেলতে পেরেছেন বলে মনে পড়ে না।

মাধবীলতা বলেন--এতদিন পরে হঠাৎ বাইরে বেড়াতে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো কেন?

সুজীবন--ভেবে দেখেছি, আমার একটু পরিবর্তন দরকার।

সুজীবন সেনের মুখে খুবই নতুন একটা কথা বটে ; কিন্তু মাধবীলতার মনে নতুন করে কোন আশার চমক জাগিয়ে তুলতে পারবে এমন কোন কথা নয়। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের বাড়ি থেকে সুজীবন সেনের কাছে কম করেও ত্রিশটি চিঠি এসে অনুরোধ আর আবেদন করছে, তোমার এখন একটু পরিবর্তন দরকার, সুজীবন। সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমা নিজেও কতবার এসেছেন ; সুজীবনের সঙ্গে কত মিষ্টি করে কথা বলে অনুরোধ জানিয়েছেন, তোমার একটু পরিবর্তন দরকার সুজীবন। কিন্তু কোন আবেদন আর অনুরোধ সুজীবন সেনের জীবনে পরিবর্তনের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা কিংবা ইচ্ছা জাগিয়ে তুলতে পারেনি। সেই মানুষ আজ হঠাৎ বলছে, একটা পরিবর্তন দরকার। ভাল কথা ; কিন্তু নিতান্ত একটা কথা। ওটা কোন অনুতপ্ত জীবনের নতুন ও কঠিন একটা অঙ্গীকারের কথা নয়।

মাধবীলতা শুধু বলেন--এটুকু ভেবে দেখেত এত দেরি না করলেই ভাল ছিল।

সুজীবন হেসে ওঠেন।--ঠিক কথা।

সুজীবন সেনের পরিবর্তন? হ্যাঁ, জাহাজের দুটো-তিনটে দিন সত্যিই স্ত্রীকে আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ডেকের উপর ঘুরে-ফিরে অনেক গল্প করেছেন। কিন্তু তারপরেই হাঁপিয়ে উঠেছেন।--নাঃ, এসব কি আমার পোষায়?

মাধবীলতা--কি হলো?

--সমুদ্র দেখতে যে এত বিশ্রী লাগবে, সেটা আগে ধারণা করতে পারিনি।

একদিন বিকেলে হঠাৎ একটা আক্ষেপ করে সেই যে জাহাজের সেলুনবারের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন সুজীবন সেন, বের হয়ে এলেন রাত দশটায়। টলতে টলতে কেবিনে ফিরে এসে দেখলেন, মাধবীলতা আর রঞ্জু দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রথমে নেপল্‌স্, জাহাজ থেকে নেমেই যেন একটা স্বস্তির আনন্দ পেলেন সুজীবন সেন। যেন সমুদ্র-দেখা যন্ত্রণার গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়ে খুশি হয়ে গেল কঠিন পাথুরে জগতের একটি স্থলচর প্রাণ।

নেপল্‌স্ থেকে ট্রেনের যাত্রী হয়ে আর রোমে এসে একটা হোটেলে উঠে, একটা ঘণ্টাও পার না হতেই খুশি হয়ে হেসে ফেললেন সুজীবন সেন।--সত্যিই, বেশ জায়গা মাধু। জিনিস-টিনিস যেমন ভাল তেমনই সস্তা।

মাধবীলতারও বুঝতে দেরি হয়নি, এরই মধ্যে কোন্ বিস্ময়ের স্বাদ পেয়েই এত খুশি হয়ে গিয়েছেন সুজীবন সেন। হোটেলে এসেই একবার বাইরে বের হয়ে গিয়েছিলেন, আর বেশ একটি লালচে তৃপ্তির উচ্ছলতা দিয়ে চোখ-মুখ রঙিন করে নিয়ে আবার হোটেলের ঘরে ফিরে এসেছেন।

সুজীবন সেনের মুখে হাসি আছে, কিন্তু মাধবীলতার মুখে হাসির কোন একটা চিহ্ন নেই। রোম হলে কি হবে? মাধবীলতার প্রাণটা এখানেও এসে যেন হাজারিবাগের জঙ্গলের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে। সে ছায়াতেও কাঁটা আছে।

সুজীবন সেন অবশ্য একটা পরিবর্তনের কাণ্ড দেখাবার জন্যে মাঝে মাঝে বেশ চেষ্টা করেন ; কিন্তু হাঁপিয়েও পড়েন বোধহয়। পর পর পাঁচটা দিন সুন্দরী রোমনগরীর অনেক পিয়াৎসার অনেক ফোয়ারার কাছে ঘুরে বেড়িয়েছেন সুজীবন সেন। একটা মিউজিয়ামও দেখেছেন। কলোসিয়ামের একটি নিরালাতে দাঁড়িয়ে মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করেছেন, দেখে হেসেও ফেলেছেন, রঞ্জুর তাড়া খেয়ে একটা সাদা বিড়াল ছুটে পালিয়ে গিয়ে একেবারে এরিনার ঠিক মাঝখানে লাফিয়ে পড়েছে আর রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে মিউ-মিউ করছে।

সুজীবন সেন হাসেন--তোমার হিস্ট্রির কী দশা হয়েছে দেখ।

মাধবীলতা--কি হয়েছে?

সুজীবন--দেখে নাও, সেই খুনে গ্ল্যাডিয়েটর আজ কেমন একটি বিল্লী হয়ে এরিনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিউ-মিউ করছে।

হাসবার মত একটা কথা বটে ; কিন্তু মাধবীলতার মুখে কোন হাসির ঝলক উথলে ওঠে না।

কাপিটলের মিউজিয়ামের কয়েকটা মূর্তির দিকে তাকাতে গিয়ে সুজীবন সেন বেশ একটু শিউরে উঠে হেসে ফেলেন--ভাল ভাল জাতের পাথরকে কেটে-ছেঁটে নির্লজ্জ করবার কী অদ্ভুত চেষ্টা! চল, হোটেলে ফিরে যাই।

যেখানেই যান না কেন, ক্ষণে ক্ষণে শুধু একটি কথা বার বার বলে মাধবীলতার গম্ভীর মুখটাকে আরও গম্ভীর করে দিয়েছেন সুজীবন--চল, হোটেলে ফিরে যাই। সন্ধ্যে হলে হোটেল থেকে মাঝে মাঝে বের হলেও দূরে যেতে চান না সুজীবন।

এইতো হোটেলের সামনেই বেশ সুন্দর এই রাস্তাটি, ভিয়া নাশিওনাল। এই রাস্তা ধরে সামান্য একটু এগিয়ে গেলেই পিয়াৎসা এসেদ্রা। ফোয়ারার গায়ে রঙিন আলোর ঝিলমিলি খেলছে। মাধবীলতা আর রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে এসেদ্রার চারদিকে ঘুরে, তারপর ফুটপাতের চাতালের উপর খোলা আকাশের নিচে কফিবারের একটা চেয়ারে বসে কফি খেতেও মন্দ লাগে না। মাধবীলতা শুধু চুপ করে পাশের চেয়ারে বসে থাকেন। আর রঞ্জু শুধু চকোলেট খায়।

পথের ভিড়ের মেয়েরা দেখতে পেয়েই যেন বেশ আশ্চর্য হয়ে চমকে ওঠে, এক রূপসী ভারতীয়া কফিবারের চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। মাধবীলতার শাড়ি-জড়ানো শরীরের শোভা আর ভঙ্গি আরও ভাল করে দেখবার জন্যে মেয়েদের ভীড় আরও কাছে এসে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে। কোথা থেকে কোন্ এক কাগজের ফটোগ্রাফার ব্যস্তভাবে এসে আর খুটখাট করে ক্যামেরা ঘুরিয়ে মাধবীলতার ফটো তুলে নিয়ে চলে যায়।

উঠে দাঁড়ান সুজীবন।--চল ; এবার হোটেলে ফিরে যাই।

স্ত্রীকে আর মেয়েকে নিয়ে পৃথিবীর কোন কোলাহলের আর চঞ্চলতার মধ্যে বসে থাকতে বা ছুটোছুটি করতে সুজীবন সেনের বোধহয় একটুও ভাল লাগে না। তাই বাইরে বেড়াতে বের হয়েও হোটেলে ফিরে যাবার জন্য তাঁর প্রাণটা এরকম চল-চল করতে থাকে। একান্তভাবে নিজেরই একটি ছোট্ট নিরালা ঠাঁই, যেখানে তিনি তাঁর শেরির বোতল ও গেলাস নিয়ে বসে থাকবেন ; আর, মাধবীলতা ও রঞ্জু তাঁর চোখের কাছাকাছি কোন বারান্দা বা করিডর, কোন বন বা লতাপাতার ঝোপঝাড়ের কাছে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে ; বাস্, এর চেয়ে ভাল ঘরোয়া সুখ আর কিই-বা হতে পারে?

কিন্তু এই কি ইউরোপ বেড়াবার রকম? এভাবে হাজারিবাগের সিংহানি হোটেলের একটা

ঘরে পড়ে থাকলেই তো যদি ইউরোপ বেড়ানো হয়ে যেত, তবে এত দূরে আসবার কোন দরকার ছিল না। মাধবীলতার মনের ভিতরে চাপা বিক্ষোভের জ্বালাটা এই পাঁচটা দিন নীরব হয়ে থাকলেও আজ আর মুখর না হয়ে থাকতে পারে না।--এবার দেশে ফিরে গেলেই তো হয়।

সুজীবন সেনও বলে ওঠেন।--ঠিক বলেছো, আমারও ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।

হোটেলে ফিরে এসে রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে তখনই লিফ্‌ট ধরে উপরতলায় চলে যান মাধবীলতা। ঘরে ঢুকেও সমস্যায় পড়েন মাধবীলতা, সময় কাটবে কি করে?

কিন্তু সুজীবন সেনের কোন সমস্যা নেই। হোটেলের বারে তিনটি ঘন্টা সময় পার করে দিয়ে উপরতলায় আসেন ; আর ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠেন--যাই বল, ভিলা মাধবীর মত আরামের জায়গা এই রোমনগরীতে কোথাও নেই। একেবারেই নেই। যত সব হট্টগোলের হোটেল।

পাইপ ধরিয়ে আর মুখ ভরে ধোঁয়া টেনে নিয়ে সুজীবন সেন মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে নিলেন ; তারপর বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলে ওঠেন--হ্যাঁ, এবার ফিরে যাবার জন্যেই তৈরি হতে হবে। কিন্তু তোমার যদি আরও কিছু দেখবার ইচ্ছে থাকে তবে দু'চারটে দিন ঘুরে ফিরে দেখে নাও। হোটেলওয়ালা বলছেন, ইংরেজী-জানা ভাল গাইড দিতে পারবেন।

মাধবীলতা--কোন দরকার নেই।

সুজীবন সেন হোটেল ছেড়ে বের হতে চান না। কিন্তু মেয়েটা বাইরে বেড়াবার জন্যে ছটফট করে বলেই মাধবীলতা বিকেল হলে একবার বের না হয়ে পারেন না। কোথায় আর যাবেন? হোটেলের কাছাকাছি ওই এসেদ্রা।

একদিন সন্ধ্যায় ফোয়ারার গায়ে রঙিন আলোর ঝিলিমিলির দিকে তাকিয়ে মাধবীলতার চোখদুটো যখন ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই চমকে উঠলেন মাধবীলতা। চোখের কাছে এসে যিনি দাঁড়িয়েছেন তাকে চেনা-চেনা বলে মনে হয়।

ভদ্রলোক বলেন--আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

মাধবীলতা--হতে পারে।

--আপনি কি গণেশদার কেউ হন?

আশ্চর্য হয়ে আরও চমকে ওঠেন মাধবীলতা।--হ্যাঁ, রেবা মাসিমার ছেলে গণেশদা।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে হাসেন--তা হলে তো আপনাকে ঠিকই চিনেছি। আপনার রেবা মাসিমা আমারই কাকিমা। আমি পরিতোষ রায়। আমি অনেকদিন আগে আপনাদের এলাহাবাদের বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম।

মাধবীলতা--হ্যাঁ, এইবার মনে পড়ছে। আপনি তো লখনউ-এর আর্ট স্কুলে ছিলেন।

পরিতোষ--হ্যাঁ। আমি এখানেও প্রায় পাঁচ বছর হলো ব্রঞ্জের আর মোজেয়িকের কাজ শিখছি।

রঞ্জুকে গাল টিপে আদর করেন পরিতোষ রায়। রঞ্জুরই একটা হাত ধরে আর মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ উৎফুল্ল স্বরে বলে ওঠেন।--চলুন, আপনাদের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি ; আর মিস্টার...।

মাধবীলতা--মিস্টার সেন।

পরিতোষ- মিস্টার সেনের সঙ্গে একবার দেখাও করে আসি।

টেবিলের উপর হুইস্কির গেলাস রেখে হোটেলের লাউঞ্জের এক কোণে বসে ছিলেন সুজীবন সেন। দুই চোখ টান করে তাকিয়ে থাকেন সুজীবন ; রঞ্জুর হাত ধরে এক অচেনা ভদ্রলোক, আর সেই ভদ্রলোকেরই পাশে মাধবীলতা। যেন নতুন এক র‍্যাফায়েল অদ্ভুত

একটা আশ্চর্যের রঙিন ছবি এঁকে সুজীবন সেনের চোখের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। যে মাধবীলতার মুখে আজ সাত বছরের মধ্যে কোনদিনও হাসি দেখতে পাননি সুজীবন সেন, সেই মাধবীলতার মুখটাও হাসছে।

তার মানে, মাধবীলতার মুখের হাসি দেখতে পেয়েই সুজীবন সেনের মনে পড়েছে, এই সাত বছরের মধ্যে কোনদিনও মাধবীলতার মুখে হাসি দেখতে পাওয়া যায়নি। মাধবীলতার মনের আকাশের এক কোণে হঠাৎ যেন একটা সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠেছে, তারই ঝিকিমিকি হাসিটা মাধবীলতার ঠোঁটের ফাঁকে কাঁপছে।

পরিতোষ রায়কে চিনতে পেরে খুবই খুশি হলেন সুজীবন সেন।--বিদেশে এসে হঠাৎ এভাবে একজন কুটুম্ব মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

পরিতোষ--এখানে আর কতদিন থাকবেন?

সুজীবন--আমার তো আর একটি দিনও থাকতে ইচ্ছে করে না। তবে হ্যাঁ, বেচারী হিস্ট্রির ছাত্রীর মনে বোধহয় রোমের কীর্তি আর একটু ভাল করে দেখবার ইচ্ছে আছে।

পরিতোষ--আপনার ইচ্ছে করে না কেন?

সুজীবন--আমি তো আন-ন্যাচারাল হিস্ট্রির নই। আমি ন্যাচারাল হিস্ট্রি।

পরিতোষ--মিসেস সেন যদি বলেন, তবে আমি গাইড হয়ে ওঁকে সাতদিনের মধ্যে রোমের আর্ট আর হিস্ট্রির অনেক ওয়াণ্ডার দেখিয়ে দিতে পারি।

মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে সুজীবন সেন হাসেন--কি বলেন মিসেস সেন?

মাধবীলতা--আমার তো ইচ্ছে করেই।

সুজীবন--তা হলে দেখে নাও। না হয়, সাতটা দিন পরেই ভাবা যাবে, রোমে আর থাকা হবে কি হবে না।

সাতটা দিন পার হয়ে যাবার পরেও কিন্তু বুঝতে পারা গেল না, ঠিক কবে রোম ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব হবে। কারণ, মাধবীলতা নিজেই হেসে-হেসে বলে ফেললেন--সাতদিনে কি রোম দেখা শেষ হতে পারে? অসম্ভব? বলতে গেলে, এখনও কিছুই দেখা হয়নি।

সুজীবন--এই যে শুনলাম, কত কী! দেখে এলে? কত ব্যাসিলিকা, কত চ্যাপেল, কত গ্যালারি।

মাধবীলতা--কিন্তু আরও যে কত কী রয়ে গেল। এখনও সীজারের ফোরাম দেখতে যাওয়া হয়নি। পরিতোষবাবু বললেন, ভাটিকান গ্যালারির র‍্যাফায়েল রুমের ছবি ঠিক-ঠিক বুঝে দেখতে হলে একমাস সময় লাগবে।

সুজীবন--না, এত দেরি করলে চলবে না।

মাধবীলতা--কেন? আর একটা মাস এখানে থাকতে অসুবিধের কি আছে?

সুজীবন--ভাটিকানের র‍্যাফায়েল রুম দেখতে এত সময় নিলে ওদিকে যে ভিলা মাধবীর সুজীবন রুম চামচিকেয় ভরে যাবে।

মাধবীলতা--এরকম বাজে কথার সঙ্গে তর্ক চলে না।

সুজীবন--না মাধু ; ভিলা মাধবীর জন্যে সত্যিই আমার প্রাণ আই-ঢাই করছে। যাই হোক ; একমাস নয়, আর দিন সাতেকের মধ্যে যা পার দেখে নাও। তারপর চল, সরে পরি।

সুজীবন সেনের মনটা বোধহয় সত্যিই একটা পরিবর্তন চেয়েছিল ; কিন্তু সুজীবন সেনের আত্মাটাই বাধা দিয়েছে। রোমের এই হোটেলের লাউঞ্জে হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে বসে থাকলেও প্রাণটা ভিলা মাধবীর সেই ঘরটির জন্যেই আই-ঢাই করছে। আর, নেশার আবেশ যখন বেশ নিবিড় হয়ে ওঠে, তখনও বোধহয় সুজীবন সেনের তন্দ্রার চোখদুটো পিপাসিত হয়ে দেখতে থাকে চাতরার জংলী গাঁয়ের অড়হর ক্ষেতের উপর রাতের জ্যোৎস্নায় নীলগাই চরে বেড়াচ্ছে। মোতিরাম, আমার রাইফেল? জলদি করো ম্যান! বিড় বিড় করে কথা বলে

ফেলেন সুজীবন সেন।

লাঞ্চের পর রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে মাধবীলতা লাউঞ্জে এসে দেখতে পান, সুজীবন সেন তখনও হুইস্কির গেলাস সামনে রেখে বসে আছেন। কিন্তু সেজন্যে মাধবীলতার মুখের হাসির উজ্জ্বলতা নিবে যায় না। বড় জোর আর পাঁচ-সাত মিনিট পরেই পরিতোষ রায় আসবেন, আর রোমের বিস্ময় দেখাবার গাইড হয়ে মাধবীলতাকে ও রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে যাবেন। বরং মাধবীলতাকেই একটি চমৎকার পরিবর্তন বলে মনে হয়। ঠোঁটের ফাঁকে আর ছোট তারার ঝিকিমিকি হাসি নয়, সারা মুখে যেন ভরা চাঁদের হাসি ফুটে উঠেছে।

পরিতোষ আসেন ; রঞ্জু খুশি হয়ে লাফাতে থাকে। যাবার আগে সুজীবনের দিকে তাকিয়ে রঞ্জু শুধু বলে যায়—আমরা আসি বাবা। রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে মাধবীলতা আর পরিতোষ যেন নতুন বিস্ময়ের জগতে বেড়াবার জন্য চলে যান।

লাঞ্চের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেজন্যে সুজীবন সেনের চিন্তায় কোন ব্যস্ততা নেই। লাউঞ্জের এক কোণের কোচের উপর বসে, আর যেন ইচ্ছে করেই নেশার চোখের কাছে একটা তন্দ্রার সুখ তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। বিসুনগড়ের জঙ্গলের ভিতরে ছোট্ট নদী কোনারের স্রোত মস্ত বড় একটা পাথরের চটান ধুয়ে দিয়েছে। সুন্দর সাদা মোলায়েম পাথর। মার্বেল নাকি? জলদি করো মতিরাম, কুলি বোলাও, ডিনামাইট লাগাও।

কল্পনার ডিনামাইট সত্যি শব্দ করে ফেটে পড়ে না ; কিন্তু চমকে ওঠেন সুজীবন সেন। না, আর এখানে এভাবে পড়ে থাকবার কোন মানে হয় না। কালই নেপল্‌স্ রওনা হতে হবে। তারপর, প্রথম যে জাহাজে জায়গা পাওয়া যাবে, সেই জাহাজেই দেশের দিকে পাড়ি দিতে হবে।

কিন্তু চলে যাবার জন্য একটা প্রতিজ্ঞা করেও কিছুই করতে পারলেন না সুজীবন সেন। আরও একটা মাস পার হয়ে গেল। কি আশ্চর্য, মাধু কি অনন্তকাল ধরে রোমের বিস্ময় দেখে বেড়াবে আর একটুও ক্লান্ত হবে না? তাছাড়া, রঞ্জুর কথা থেকেও তো বোঝা যায়, আজকাল প্রায় রোজই সন্ধ্যাটা পরিতোষের সঙ্গে অপেরা হাউসে কাটিয়ে দিয়ে তারপর হোটেলে ফিরে আসে মাধু। মেয়েটারও অভ্যেস বদলে দিয়েছেন মেয়ের মা ; রঞ্জু আজকাল ওর মা'র সঙ্গে রাত দশটায় হোটেলে ফিরে এসেও গুন্‌গুন্ করে গান গায়, আগের মত ঘুমের ভারে রঞ্জুর চোখের পাতা আর নুয়ে পড়ে না।

সুজীবন জিজ্ঞাসা করলে রোজই একটা না একটা মিউজিয়ামের নাম বলে দেন মাধবীলতা, আজ নাকি সেখানে যাওয়া হবে। সেখানে নাকি চমৎকার মূর্তির কালেকশন আছে। মাধবীলতার ইচ্ছার কথাটা শুনতে একটুও ভাল লাগে না। ওই তো, যত সব বিবসনা ভেনাসের মূর্তি। পরিতোষের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, ইরোস আর সাইকি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাধুর তো বরং একটু লজ্জা পাওয়াই উচিত।

আজ সকালবেলাতেই মাধবীলতার সাজ আর হাতের ঘড়িতে বার বার সময় দেখবার ব্যাকুলতা দেখে সুজীবন সেন অনুমান করে নিয়েছেন, নিশ্চয় অনেক দূরে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা হয়েছে। কিন্তু কোথায়? মাধবীলতাকে আর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে না।

মাধবীলতাও পরিতোষের অপেক্ষায় লাউঞ্জের একেবারে ওদিকের একটি চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। কেউ যেন ঠাট্টা করে সুজীবনের বুকের পাঁজরের উপর খুব জোরে একটা টোকা মেরেছে। বেশ ব্যথা লেগেছে। হাতে-ধরা হুইস্কির গেলাসটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন সুজীবন সেন।

লাউঞ্জের ওদিক থেকে ছুটে আসে রঞ্জু। সুজীবনের গায়ের উপর এলিয়ে পড়েই আদুরে স্বরে একটা অদ্ভুত কথা বলে—বাবা, বল না?

সুজীবন—কি বলবো?

রঞ্জু--আমার কাকে বেশি ভাল লাগে? তোমাকে, না পরিতোষ কাকাকে?

চমকে উঠলেন সুজীবন সেন। পাঁজরগুলি যেন মট্ মট্ করে বেজে উঠেছে।

--এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছো রঞ্জু?

রঞ্জু--মা জিজ্ঞেস করছিল!

সুজীবন--কবে?

রঞ্জু--কালকে।

সুজীবন--কোথায়?

রঞ্জু--পরিতোষ কাকার স্টুডিওতে।

সুজীবন--তুমি কি বললে?

রঞ্জু--আমি বলেছি, তোমাকে ভাল লাগে। পরিতোষ কাকাকেও ভাল লাগে।

রঞ্জু আবার লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল। সুজীবন সেন আবার হুইস্কির গেলাসের দিকে দুটো অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকেন।

পরিতোষ রায় আসেন। দূরে দাঁড়িয়েই সুজীবন সেনের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আর মাথা হেলিয়ে একটা সৌজন্যের ভঙ্গি নিবেদন করেন।

চলে গেলেন পরিতোষ রায়, সঙ্গে মাধবীলতা আর রঞ্জু।

সঙ্গে সঙ্গে সুজীবন সেনও উঠে দাঁড়ান। হোটেলের অফিসের কাউন্টারে এসে পকেটের ব্যাগ থেকে নোটের তাড়া বের করেন।--বিল প্লীজ ; আমরা কাল সকালের ট্রেনে নেপল্‌স্ চলে যাব।

সন্ধ্যা হতেই ফিরে এসে যখন রঞ্জুর হাত ধরে হোটেলের ঘরে ঢোকেন মাধবীলতা, তখন সুজীবন সেন কোন কথা না বলে তাঁর সন্ধ্যার পিপাসা মেটাবার জন্যে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যান।

পরদিন সকালে, যখন ট্যাক্সি ডাকা হয়ে গিয়েছে, তখন সুজীবন সেন শুধু একটি কথা বলেন।--এখনই রওনা হব।

মাধবীলতা প্রায় এক মিনিট ধরে দুই চোখের তারা দিয়ে যেন একটা বিদ্যুতের ঝিলিক ধরে নিয়ে সুজীবন সেনের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলেন। একটিও কথা বললেন না।

* * *

ভিলা মাধবীর লনের সবুজের চারদিকে মরশুমী কসমসের বাহার সাংঘাতিক রঙিন হয়ে উঠেছে। রোমের হোটেলের বদ্ধ বাতাসে প্রাণটা যেন ভেপসে উঠেছিল। সুজীবন সেন তাই কসমসের ভিড়ের চারদিকে ঘুরে-ফিরে আর ইউকালিপটাসের বাতাস গায়ে মেখে এই দশদিনেরই মধ্যে মনে-প্রাণে বেশ ঝরঝরে হয়ে গিয়েছেন। হাঁপ ছেড়ে ছেড়ে শরীরেরও জড়তা কাটিয়েছেন। আর, শিকারে বের হবার জন্যে তৈরিও হতে শুরু করেছেন।

মাধবীলতা বলেন--আমি এলাহাবাদ যাব।

সুজীবন--যাও।

মাধবী--আজই যাব।

সুজীবন--যাও।

মাধবী--এখনই যাব।

সুজীবন--যাও।

মাধবীলতা ডাক দেন--রঞ্জু, এদিকে এস।

সুজীবন--রঞ্জুকে কেন?

মাধবী--ওকে খাইয়ে নিই।

সুজীবন--কোন দরকার নেই।

মাধবী—কেন?

সুজীবন—রঞ্জু এলাহাবাদ যাবে না।

মাধবী—কে বললে, যাবে না?

সুজীবন—আমি, রঞ্জুর বাবা বলছি।

মাধবী—রঞ্জু যদি এখানে থাকতে না চায়?

সুজীবন—থাকতে না চাইলেও থাকবে।

চুপ করে রইলেন মাধবীলতা। এলাহাবাদ রওনা হবার সব ব্যস্ততা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

দেখতে পেলেন মাধবীলতা, সন্ধ্যা হতেই হুইস্কির বোতল আর গেলাস নিয়ে, আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে লনের ভিতরে বসলেন সুজীবন সেন। দেখলেন, মাঝরাতও পার হয়ে যাচ্ছে, তবু সুজীবন সেনের নেশার শরীরটা লন ছেড়ে উঠতেই পারছে না।

কিন্তু ভোর হতেই যখন ব্যস্তভাবে রঞ্জুর ঘুম ভাঙিয়ে ঘরের দরজা খুলতে গেলেন মাধবীলতা, তখন একটা বাধা পেয়ে চমকে উঠলেন। বাইরে থেকে তালা বন্ধ। একটু পরেই বুঝতে পারলেন, কে যেন তালা খুলে দিচ্ছে। দরজার বাইরে এসে দেখতে পেলেন মাধবীলতা, তালা আর চাবি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছেন জিওলজিস্ট সেন সাহেব। পাথরের মানুষ মাঝরাত পর্যন্ত বিষ গিলেও কত শক্ত হয়ে হাঁটছে।

আজ বিকেল হলেই শিকারে বের হবেন সুজীবন সেন। ড্রাইভার মোতিরামকে জিজ্ঞেস করে আগেই জেনে নিয়েছেন মাধবীলতা।

বিকেল হলো। গাড়ি নিয়ে শিকারেও বের হয়ে গেলেন সুজীবন সেন। কিন্তু মাধবীলতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলেন, রঞ্জুকেও সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেল একটা নিদারুণ চতুর আর নির্মম সতর্কতা।

খানসামা স্টিফান মাধবীলতার কাছে এসে মাথা চুলকিয়ে যেন একটা সান্ত্বনার ভাষা শোনাতে চায়—মিস বাবার, বিছানা, গরম জামা, খেলনা, কিতাব আর দুধ-বিস্কুট-মাখন-ফ্রুট সবই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

মাধবীলতা—কোথায় কোন্ জঙ্গলে গেলো তোমার সাহেব?

স্টিফান—শুনেছি তো দানুয়া ফরেস্ট বাংলোতে দু'দিন থাকবেন।

আর তো বুঝতে কোন অসুবিধে নেই মাধবীলতার, বাপ তাঁর মেয়েকে এভাবেই আগলে রাখবেন ; নেশার চোখও সব সময় সজাগ থাকবে আর পাহারা দেবে ; মেয়ের মা যেন মেয়েকে নিয়ে পলাতকা হবার কোন সুযোগ না পায়।

চোখ জ্বলে, বুকের ভিতরে দুরন্ত একটা নিশ্বাস তপ্ত হয়ে ছটফট করে। লনের চারদিকের যত রঙিন কসমস দু'পায়ে মাড়িয়ে সারাটা সন্ধ্যা শুধু ফুঁপিয়ে কেঁদে আর চোখ মুছে মুছে ঘুরে বেড়াতে থাকেন মাধবীলতা।

দু'দিন পরে শিকারের সফর থেকে সুজীবন সেন ফিরে আসতেই মাধবীলতার চোখদুটো ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। রঞ্জু নেই।

—রঞ্জু কোথায়? চেঁচিয়ে উঠলেন মাধবীলতা।

—রঞ্জুকে রাঁচিতে বড়দির কাছে রেখে এলাম। এখন ওখানেই থাকবে রঞ্জু।

ধীর-স্থির ও প্রশান্ত স্বরে এইবার চরম কথাটা জানিয়ে দিলেন মাধবীলতা।—আমি চললাম।

সুজীবন—বলবার কোন দরকার ছিল না।

ভিলা মাধবী গেট পার হয়ে চলে গেলেন মাধবীলতা, মুখ ফিরিয়ে পিছনে একবার তাকালেনও না। ইউকালিপটাসের পাতা কেঁপে কেঁপে ঝিরিঝিরি শব্দ করে, গেটের আইভিলতা দুলে ওঠে, হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা খেয়ে গুলমোরের ঝরাপাতা মাধবীলতার পা

ছুঁয়ে উড়ে চলে যায়। কিন্তু ওদেরই বা কি সাধ্যি আছে যে, আজ মাধবীলতাকে থামিয়ে দিতে কিংবা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে? মাধবীলতা ভুলেই গিয়েছেন যে, উনিই হলেন ভিলা মাধবীর মাধবী।

সিংহানি হোটেল তো বেশি দূরে নয়। হেঁটে যেতে দশ মিনিটও লাগবে না। রেবা মাসিমাকে বললেই হবে আপনার গাড়িটা একবার দিন, আমাকে রোড স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

মাধবীলতাকে হেঁটে বের হয়ে যেতে দেখে ড্রাইভার মোতিরাম নিজের বুদ্ধিতে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করেছে। এতক্ষণে বেশ জোরে স্পীড নিয়ে গেট পার হয়ে চলেই যেত মোতিরাম, কিন্তু চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন সুজীবন সেন।

হতভম্ব মোতিরাম, আতঙ্কিত মোতিরাম সাহেবের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে।

সুজীবন সেনও কি বুঝতে পারছেন যে, ভিলা মাধবীর মাধবী চলে যাচ্ছে? না, জঘন্য একটা ট্রেসপাসের মূর্তি চলে যাচ্ছে। সুজীবন সেনের বাগানের ফুল চুরি করতে ঢুকেছিল-- হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে ; আর ধমক খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু বাঘিনী আবার মরিয়া হয়ে তার বাচ্চার খোঁজে রাঁচিতে হাজির হবে না তো? হাজির হলেও কোন সুবিধে হবে না। বড়দিকে শাসিয়ে বলে দিয়ে এসেছেন সুজীবন সেন,-- চারু রায়ের মেয়েকে যদি রঞ্জুর কাছে আসতে দাও, তবে তোমারই বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্রের মামলা আনবো। সাবধান, যেন ভুল না হয়।

বড়দি তাঁর ভাইকে ভাল করে চেনেন। ভাইয়ের কটকটে লাল চোখ আর নিশ্বাসের ভুরভুরে নেশার গন্ধ পেয়ে একটা আর্তনাদ চাপতে চেষ্টা করেছেন। বেশ ভয়ে ভয়ে বলছেন, আমাদের ভুল হবে না। কিন্তু এসব ঝগড়া তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেললেই ভাল হয় জীবু।

—এটা ঝগড়া নয় বড়দি। চেঁচিয়ে উঠেছেন সুজীবন সেন। চিৎকারের শব্দটা যেন সুজীবন সেনের আহত হৃদ্‌পিণ্ডের আর্তনাদ।

বড়দি আশ্চর্য হয়ে বললেন—ঝগড়া নয়, তবে কি?

পকেট থেকে দুটো চিঠি বের করে বড়দির সামনে ফেলে দিয়েছেন সুজীবন সেন।--পড়ে দেখ।

রোম থেকে মাধবীলতার কাছে পরিতোষের যে চিঠিটা ব্যাকুল হয়ে এয়ারমেলে পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে, সেই চিঠি। আর পরিতোষের কাছে মাধবীলতা যে সান্ত্বনার চিঠি লিখে বেয়ারা শুকদেওকে ডাকে ফেলতে দিয়েছিল, সেই চিঠি। দুটি চিঠি, যেন দুটি বিহ্বল স্বপ্নের ইচ্ছা আর স্বীকৃতির দলিল।

চিঠিদুটো পড়েই বড়দি চোখ বন্ধ করেন, কাঁপতে থাকেন। বড়দির দু'চোখ থেকে বড়-বড় জলের ফোঁটাও ঝরে পড়তে থাকে। বুঝতে পেরেছেন বড়দি, ঝগড়ার ব্যাপার নয় ; জীবনে-জীবনে শত্রুতার ব্যাপার। মিটিয়ে ফেলতে বললেই মিটিয়ে ফেলা যায় না। চারু রায়ের মেয়ে ভাগ্য বদল করতে চাইছে। বড়দির ভাই নেশার খুশিতে সব আঘাত ভুলে যায়, ক্ষমা করেও দিতে পারে, কিন্তু এই অপমানের আঘাত ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমা করা উচিতও নয়। দরকারই বা কি?

বড়দির চোখদুটো এইবার বেশ শুকনো হয়ে, যেন একটা জ্বালা নিয়ে আর ক্ষমাহীন হয়ে কেঁপে ওঠে।--ঠিক আছে জীবু, রঞ্জু এখন আমার কাছেই থাকুক। চারু রায়ের মেয়েকে এ-বাড়ির গেটের কাছেও দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। কখ্‌খনো না।

চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতার ছায়া ভিলা মাধবীর গেট পার হয়ে চলেই গিয়েছে। এখানে এখন আর কোন সমস্যা নেই। বেশ জোরে একটা হাঁপ ছাড়লেন সুজীবন সেন।

চুপ করে সোফার উপর বসে হুইস্কির গেলাসে তিনটি চুমুক দিয়েই যেন চমকে ওঠেন। টেলিফোনে রাঁচির বড়দির সঙ্গে কথা বলেন।--হ্যালো বড়দি, রাক্ষুসী চলে গেল।

হুইস্কির বোতল অর্ধেক খালি হয়ে যাবার পর সুজীবন সেন বেশ আশ্চর্য হয়ে সন্দেহ করেন, কি ব্যাপার? খানসামা স্টিফান কি বোতলের হুইস্কিতে জল মিশিয়ে রেখেছিল? কোন স্বাদ নেই, তৃপ্তি নেই, নেশার আরাম জমে না ; এ কী অদ্ভুত অস্বস্তি!

ভিলা মাধবীর সবই তো ঠিক আছে। টবের মেরি গোলাপ আছে, কসমসের রঙিন ভিড় আছে। মালী চমনরাম, ড্রাইভার মোতিরাম, খানসামা স্টিফান আর বেয়ারা শুকদেও, সবাই আছে। শুধু রাক্ষুসীটা নেই বলেই কি ভিলা মাধবী এত শূন্য হয়ে খাঁ-খাঁ করছে? না, শিকারে বেরিয়ে পড়াই ভাল। ভেলোয়ারা জঙ্গলের লেপার্ড আজকাল নিশ্চয় রাত্রির অন্ধকারে গাঁয়ের কুয়োর কাছে চৌবাচ্চার জল খাবার জন্যে আসে। এই বোশেখ মাসের গরমে জঙ্গলের কোন নদী আর নালাতে যে একফোঁটাও জল নেই।

হ্যাঁ, এলাহাবাদে প্লীডার প্রসাদবাবুকে এখনই সব কথা লিখে মামলাটা দায়ের করতে বলে দেওয়াই ভাল। দেরি করবার কোন মানে হয় না।

চিঠি লেখেন সুজীবন। কলমটা যেন কালির বদলে রক্ত দিয়ে একটা খুনের ইতিবৃত্ত লিখতে থাকে। উকিলের কাছে এসব কথা লেখার কোন দরকার হয় না, তবু লিখেই ফেললেন সুজীবন--চারু রায়ের এই মেয়ে, ইতিহাসের মেডেলওয়ালী এই নারী বোধহয় নিজেকে একটি ক্লিওপেট্রা বলে মনে করেছে। পুরনো পুরুষকে খুন করবে আর নতুন একটা ধরবে। ওর প্রাণের মধ্যে এই-রকম একটা ভয়ানক ইচ্ছার উৎসব আজ সাত বছর ধরে চলছে। সাত বছরের মধ্যে একটি দিনও আমার সঙ্গে হেসে কথা বলেনি। কেন হাসেনি সেটা আগে বুঝতে পারিনি। আজ বুঝতে পেরেছি, এ নারী মানবী নয়, একটা মাদি রেপটাইল। কাজেই, ডিভোর্স চাই। কেন চাই, সে-কথা আপনি সঙ্গের এই চিঠিদুটো পড়লেই বুঝতে পারবেন। মামলার জন্যে যেসব কাগজ-পত্রে আমার সই দরকার হবে, সেগুলি তাড়াতাড়ি পাঠাবেন। যদি দরকার মনে করেন, তবে মামলা তদ্বির করবার জন্যে ব্যারিস্টার ত্রিবেদীকে বলবেন। মোট কথা, পৃথিবী জেনে ফেলুক চারু রায়ের মেয়ে মাধবীলতা একটি সুন্দরী বীভৎসতা। লোকে যেন বলে ঃ ইতরতা দাই নেম ইজ মাধবীলতা।

চিঠি লেখা শেষ করেই ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার উপর ছটফট করে পায়চারী করেন সুজীবন ; যেন আগুন-লাগা একটা ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছেন ; ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগিয়ে গায়ের জ্বালা একটু জুড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন।

খানসামা স্টিফানকে কাছেই দেখতে পেয়ে খাবার টেবিলের কাছে যখন এগিয়ে গেলেন সুজীবন, তখন হুইস্কির বোতলের থিতানিটুকুও আর নেই। সুজীবন সেনের কটকটে লাল চোখ বেশ ছলছল করতে শুরু করেছে।

—স্টিফান! চেঁচিয়ে উঠলেন সুজীবন।

--হুজুর। এগিয়ে আসে স্টিফান।

সুজীবন--যাবার আগে মেমসাহেব কি খাবার-টাবার কিছু খেয়েছিলেন?

--না, হুজুর।

—তবে? তুমি একটি বেকুব।

খাবারের ডিসের উপর এলোমেলো করে চামচ আর কাঁটা চালিয়ে যা খেলেন সুজীবন সেন, সেটা খাওয়ার একটা ভঙ্গি মাত্র ; প্রায় না খাওয়া।

হাত ধুয়ে নিয়ে আবার এঘর-ওঘর করে, একটা মিথ্যে ব্যস্ততার ছুটোছুটি সহ্য করতে গিয়ে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়তে থাকেন সুজীবন। বুঝতেও পারেন, হুইস্কির কড়া নেশাটাও আজকের এই শূন্যতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হেরে যাচ্ছে আর হাঁপিয়ে পড়ছে।

কিন্তু বেশ হবে। চারু রায়ের মেয়ের কলঙ্কটা প্রচার করে দিলে রঞ্জুর বাবার আর রঞ্জুর জীবনের কি ক্ষতি হবে? চারু রায়ের মেয়ে ওর সুন্দর মুখের হাসি নিয়ে নতুন করে দীপ জ্বালতে চায়, জ্বেলে ফেলুক। কিন্তু ওর মুখে বেশ ভাল করে কালি ছিটিয়ে দিতে হবে।

হঠাৎ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবলেন সুজীবন। নেশায় বিভোর বুকটা বোধহয় ফুঁপিয়ে উঠলো। তখুনি, যেন একটা অদ্ভুত ঘুমের মধ্যে টলে টলে হেঁটে ঘরের ভিতরে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে উকিল প্রসাদবাবুর কাছে লেখা এত বড় চিঠিটা তুলে নিয়ে ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। নতুন করে লিখলেন—স্ত্রী স্বামীর কাছে থাকতে রাজি নয়। কেন রাজি নয়, তা জানি না। সুতরাং স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাই না। তাই, ডিভোর্স চাই।

—শুকদেও, ইধার আও। এই চিঠিটা এখুনি ডাকে ফেলে দিয়ে এস। চিঠি নিয়ে চলে যায় সুকদেও।

—মোতিরাম, গাড়ি বের কর।

ড্রাইভার মোতিরাম কুণ্ঠিতভাবে বলে—আজ আর শিকারে না গেলেন হুজুর ; মনে হচ্ছে, আপনার শরীরটা ভাল নয়।

—চুপ। আমি ভাল আছি। চল, খাঁ সাহেবের জমিদারীর সেই জঙ্গলের গাঁয়ে ; কি যেন নামটা!

—মোরাঙ্গি, হুজুর।

—সেখানে খাঁ সাহেবের একটা খামার বাড়িও তো আছে?

—জী হ্যাঁ, হুজুর।

—বনছাগল আর কাকার হরিণ পাওয়া যায় শুনেছি।

—জী হ্যাঁ, চিতল হরিণও পাওয়া যায়।

—ঠিক হ্যায়। জলদি কর।

কিন্তু সত্যিই তো শিকারের জন্য নয়। অন্তত আজকের এই রাতটা, ভিলা মাধবীর ভয়ানক শূন্যতার কামড়ের ভয় থেকে বুকটাকে একটু দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যেই শিকারে বের হয়ে গেলেন সুজীবন।

মোরাঙ্গির জঙ্গলে খাঁ সাহেবের খামার-বাড়ির একটি একচালার নিচে চারপায়ার উপর বসে সামনের নিরেট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শুধু রাতের প্রহরগুলিকে ক্ষয় করে দিতে থাকেন সুজীবন সেন। খামার বাড়ির ভাণ্ডারী এসে বলেছে—এখানে এভাবে একা বসে থাকবেন না সাহেব, এদিকে অনেক খারাপ জানোয়ারও আছে। তাছাড়া, হরিণও শেষ রাতের দিকে, প্রায় ভোরের সময়ে এই সব্জী ক্ষেতের শাক খেতে আসে। কাজেই আপনি এখন ভাণ্ডারের একটি ঘরে...।

সুজীবন—ঠিক হ্যায়, কোই বাত নেহি, আমি ঠিক আছি।

হাতে ঠাণ্ডা পাইপ, পাশে অলস রাইফেল, সুজীবন সেনের জাগা চোখের সামনে রাতের অন্ধকার ফিকে হতে হতে ফরসা হয়ে আসে। চোখদুটো ভোরের আকাশের প্রথম আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলেও প্রাণটা যেন একটা স্বপ্নের কাছে বসে থাকে।

ছোট্ট একটা শব্দ ; ভিলা মাধবীর গেট কারও হাতের ঠেলায় খুলে যাবার আগে যে-রকম ছোট্ট একটা শব্দ শিউরে দেয়।

চমকে উঠলেন সুজীবন সেন। দেখতেও পেলেন, সামনের মূলো ক্ষেতের উপরে ছুটে বেড়াচ্ছে ছোট্ট একটা কাকার। শব্দটা ওরই ফুর্তির শব্দ।

রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে চারপায়া থেকে উঠে দাঁড়ান সুজীবন। কিন্তু ছোট্ট কাকার হরিণটাকে মারবার জন্যে নয় ; ভিলা মাধবীতে ফিরে যাবার জন্য সুজীবনের রাত-জাগা প্রাণটা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সত্যিই কি এই ভোরে ভিলা মাধবীর গেট খুলে কেউ আবার

ভিতরে চলে গেল? তাহলে তো উপদ্রবটা আরও জঘন্য হয়ে উঠবে। চারু রায়ের মেয়েকে সরিয়ে দেবার জন্য শেষে কি পুলিস ডাকতে হবে?

ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকেই রাইফেলটাকে বিছানার উপর ফেলে দিলেন সুজীবন।

না, আজকের ভোরের আলো দেখা দিতেই ভিলা মাধবীর গেট খুলে কেউ ভিতরে ঢোকেনি। সেই ছোট্ট শব্দটা একটা কল্পনার মিথ্যে ভয়ের শব্দ। কাল বিকেলেও ও-ঘরের মিররের কাছে দাঁড়িয়ে পাউডার সেন্ট আর হেয়ার ক্রীমের একটা হাল্‌কা গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। সে-গন্ধ আজ এখন আর নেই।

যত সব বাজে চিন্তার কথা। ওসব আজ আর সুজীবন সেনের জীবনের কোন সমস্যার কথা নয়। জানকীলাল যমুনাদাস এসেছে ; এখন ওর সঙ্গে কাজের কথা আলোচনা করতে হবে। ভাল জাতের লাল হেমাটাইটের একটা ফিল্‌ডের খোঁজ পেতে চায় জানকীলাল। কিন্তু এ জেলাতে তো ও জিনিস পাওয়া যাবে না। রামগড়ের দিকে ভাল বোজাইটের খোঁজ দিতে পারেন সুজীবন সেন।

কাজে বেশি, শিকার কম, হুইস্কি আরও কম ; সুজীবন সেনের জীবনে সত্যিই যে একটা পরিবর্তনের কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছে, এটা তিনি নিজেও বোধহয় বুঝতে পারেন না। ছ'টা মাস পার হয়ে যাবার পরেও বুঝতে পারেন না। টাউনের অনেকেই কিন্তু এরই মধ্যে অনেক কিছু জানতে পেরেছে আর লক্ষ্যও করেছে, সেন সাহেবের মুখে আজকাল সেই হাসি থাকলেও বেশ একটা চিন্তার ভাব দেখা যায়।

এলাহাবাদের আদালতের কিছু খবর আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু এরই মধ্যে পেয়ে গিয়েছেন। মামলাতে সেন সাহেবের স্ত্রী নিজেকে ডিফেণ্ড করবার কোন চেষ্টা করেননি। উনিও সম্পর্ক ছাড়তেই চাইছেন। কাজেই শিগগিরই একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। সেন সাহেবের ডিভোর্সের আবেদন মঞ্জুর হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

আর ছ'টা মাস পার হয়ে যেতেই আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু ছাড়া আরও অনেকই জেনে ফেললেন, সেন সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে আদালতের রায় বের হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মেয়ের কাস্টডি পাওয়ার জন্যে সেন সাহেবের প্রাক্তনা স্ত্রী আদালতে দরখাস্ত করে ভয়ানক লড়ছেন। সেন সাহেবও ভয়ানক আপত্তি করে লড়ছেন। একদিন বার লাইব্রেরীর ঘরে বসে আদিত্যবাবু নতুন খবরটা সকলকেই শুনিয়ে দিলেন—শুনেছেন তো, সেন সাহেবই জিতেছেন। মেয়ের মা মেয়ের কাস্টডি পাননি। কিন্তু সেন সাহেব নিজেই এবার একটা গোঁয়ার্তুমির কাণ্ড শুরু করে দিয়েছেন।

জ্ঞানবাবু—সেটা আবার কি?

আদিত্যবাবু—মা যেন মেয়েকে চোখে দেখবারও অধিকার না পান ; আদালতে দরখাস্ত করে দাবি জানিয়েছেন সেন সাহেব।

জ্ঞানবাবু—এখানে সেন সাহেব সুবিধে করতে পারবেন বলে মনে হয় না। মাইনর মেয়ে ; তাকে দেখবার অধিকার মায়ের তো থাকবেই, এটা আদালত নাকচ করবে কেন?

ঠিকই ধারণা করেছিলেন জ্ঞানবাবু। একদিন বার লাইব্রেরির সকলেই খবরটা জানতে পারলে মেয়েকে চোখে দেখার অধিকার পেয়েছেন মাধবীলতা ; সুজীবনের আপত্তি নাকচ করে দিয়েছে আদালত।

কিন্তু টাউনের কোন ভদ্রলোক জানেন না, খুব রাগারাগি করে উকিল প্রসাদবাবুকে একটা চিঠিও লিখে ফেলেছেন সুজীবন সেন। আবার আদালতে দরখাস্ত করা হোক, মাধবীলতা যেন মেয়ের সঙ্গে কোন ঘরোয়া কথা বলাবলি করবে না বলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়। সুজীবন সেনের মেয়ে, দশ বছর বয়সের রঞ্জিতা সেনের কাঁচা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার

করবার সুযোগ মাধবীলতা যদি পায়, তবে তার ফলে সুজীবন সেনের পারিবারিক জীবনের শান্তি নষ্ট হতে পারে। মেয়ের জীবনেরও ক্ষতি হতে পারে।

জ্ঞানবাবু একদিন ক্লাবের ঘরে বসে গল্প করতে গিয়ে হেসে ফেললেন--ওঃ, সেন সাহেব সত্যিই ভয়ানক কড়া মেজাজের মানুষ। এলাহাবাদের আদালতের খবরটা দেখেছেন তো, আদিত্যবাবু?

আদিত্যবাবু--দেখেছি, মশাই। সেন সাহেবের জেদেরই জিত হয়েছে।

টাউনের লোক কেউই জানতে পারেনি, ঠিক আর তিন মাস পরের একটি দিনে, ওই সিংহানি হোটেলের বারান্দাতে কিরকমের একটি কাণ্ড ঘটে গেল।

সেদিন ভিলা মাধবীর ঝাউয়ের কাণ্ড দেখে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুজীবন সেন। ঝাউগুলি বিনা ঝড়েই উতলা হয়ে দুলছে। সিংহানি হোটেলের মিসেস চৌধুরীর গাড়িটা ভিলা মাধবীর গেটের সামনের রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে গেল, ঝাউগুলি কি সেই গাড়ির ভিতরে কোন চেনা মুখকে দেখতে পেয়েছে?

দু'দিন আগে মিসেস চৌধুরী চিঠি লিখে সুজীবনকে জানিয়ে দিয়েছেন, এলাহাবাদ থেকে মাধবী আসছে। সিংহানি হোটেলেই তিনদিন থাকবে মাধবী। আগামী সোম-মঙ্গল-বুধ, এই তিনদিন যেন রঞ্জুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মা ও মেয়ের সাক্ষাৎ হবে।

কাল বিকেলেই রাঁচিতে টেলিফোনে বড়দিকে জানিয়ে দিয়েছেন সুজীবন। কথা হয়েছে, বড়দি নিজেই রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসবেন। আর, মা ও মেয়ের সাক্ষাতের সময় বড়দি সামনেই থাকবেন। রঞ্জুকে শুধু আয়ার সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হবে না। রঞ্জুকে একা একা কাছে পেয়ে যা খুশি তাই বলে নেবার কোন সুবিধা চারু রায়ের মেয়েকে দেওয়া হবে না।

কিন্তু বড়দি এবার রঞ্জুকে নিয়ে এসে পড়লেই তো হয়। সকাল দশটায় রওনা হলে এর মধ্যেই তো পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল।

ঝাউয়ের শব্দ শুনে শুনে সুজীবন সেনের মনের অস্বস্তিটা এরই মধ্যে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। আর তো ভিলা মাধবীর এই ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না সুজীবন। এখান থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ, এখন সিংহানি হোটেলের একটি ঘরে বসে আছে চারু রায়ের মেয়ে ; ভাবতে যে গা ঘিন-ঘিন করে। নিশ্বাসে জ্বালা ধরে যায়।

রাঁচি থেকে বড়দির গাড়ি এসে পড়তেই হাঁপ ছাড়েন সুজীবন সেন। এগিয়ে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমো খান। তারপরেই চেঁচিয়ে ওঠেন—মোতিরাম গাড়ি বের কর।

--তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা? সুজীবনের হাত ধরে ঝুলতে থাকে রঞ্জু। সুজীবন হাসতে চেষ্টা করেন।—বাইরে যাচ্ছি রঞ্জু।

বড়দি বলেন—তোমার এখন বাইরে যাবার কি দরকার হলো, জীবু?

সুজীবন—অন্তত তিন চারটে দিন বাইরে থাকবো।

বড়দি—কোন মানে হয় না।

সুজীবন—না বড়দি ; আমার খুব খারাপ লাগছে। মানে হোক বা না হোক।

বড়দি—কিন্তু কোথায় চললে?

সুজীবন—তিনটে দিন ডুমরি ডাক বাংলোতে থাকবো।

বড়দি—কিন্তু বাজে জিনিস বেশি খেও না।

হেসে ফেলেন সুজীবন—না, আজকাল বেশি খাই না। শুধু সন্ধ্যে বেলা সামান্য একটু।

গাড়িতে উঠলেন সুজীবন। দেখতেও পেলেন সিংহানি হোটেলের বেয়ারা একটি চিঠি নিয়ে ঢুকছে। বড়দিকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য চলন্ত গাড়ি থেকেই মুখ বাড়িয়ে আর একজোড়া জ্বলন্ত চোখ নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সুজীবন—মনে থাকে যেন বড়দি ; লোকটার সঙ্গে আর একটিও নরম কথা নয় ; কোন আপোষ নয়।

আজ বিকেলে সিংহানি হোটেলের বারান্দার দিকে উঁকি দিলে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতেন আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু।

পাশাপাশি দু'টি চেয়ারে মাধবীলতা আর তাঁর রেবা মাসিমা। মুখোমুখি আর-দুটো পাশাপাশি চেয়ারে সুজীবন সেনের মেয়ে রঞ্জিতা সেন আর তার পিসিমা।

রঞ্জুর মুখের দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে আছেন মাধবীলতা আর বার বার চোখ মুছছেন। রঞ্জুর পিসিমা কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে দু'চোখে শুধু কঠোর দু'টি ভ্রূকুটি ধরে রেখে একমনে কাঁটা চালিয়ে উল বুনছেন।

মাধবীলতা বলেন—কেমন আছ রঞ্জু?

সঙ্গে সঙ্গে বড়দির গলা থেকে যেন একটা রুষ্ট আপত্তির স্বর ফেটে পড়ে।—একথা জিজ্ঞেস করবার কোন দরকার নেই।

রেবা মাসিমা মৃদুভাবে হেসে বড়দিকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন।—এ তো সামান্য একটা কথা। এর জন্যে আপনি রাগ করছেন কেন?

বড়দি—মেয়ে বাপের কাছে আছে ; ভালই আছে, সেটা তো জানা কথা। জিজ্ঞাসা করবার কোন মানে হয় না।

মাধবীলতা—আজকাল কি বই পড়ছো, রঞ্জু?

রঞ্জু—নেলসন্স্ রীডার সেকেণ্ড পার্ট।

মাধবীলতা হাসেন—বেশ। খুব মন দিয়ে পড়বে। কিন্তু...কিন্তু আমার কাছে এস একবার।

রঞ্জু একটা লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে মাধবীলতার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। মাধবীলতা বলেন—এতক্ষণ চুপ করে বসে রইলে কেন? কেউ কি আমার কাছে আসতে মানা করে দিয়েছে?

বড়দি চোখ তুলে রেবা মাসিমার দিকে কটমট করে তাকান।—শুনছেন মিসেস চৌধুরী? এরকমের অসভ্য প্রশ্ন করবার অধিকার আপনার বোনঝির নেই।

রেবা মাসিমা আবার হাসতে চেষ্টা করেন।—ওটা একটা দুঃখের প্রশ্ন মাত্র। আপনি কিছু মনে করবেন না।

বড়দি—আমি শুধু চাই যে, ভাল-মন্দ কোন রকমের ঘরোয়া কথা হবে না। তাহলেই কিছু মনে করবো না।

মাধবীলতা—বড়দি, মিছিমিছি রাগ করছেন কেন?

বড়দি—তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না ; আমি তোমার বড়দি নই।

মাধবীলতার মুখের হাসিটা হঠাৎ যেন আগুনের ফুল্‌কি হয়ে ঠিকরে পড়ে।—আপনিও আমাকে ধমক দিয়ে আর তুমি করে কথা বলবেন না। আপনি আমার ননদ নন।

বড়দির চোখদুটো যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। আর সাদা হয়ে যায়। তার'পরেই ভিজে গিয়ে চিকচিক করতে থাকে। একেবারে নীরব হয়ে আর মাথা হেঁট করে আবার একমনে দু'হাতে উলের কাঁটা চালাতে থাকেন বড়দি।

রঞ্জু হঠাৎ মাধবীলতার গায়ে আদুরে ভঙ্গিতে একটা ঠেলা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—তুমি কবে আসবে?

মাধবীলতা হাতের রুমালটাকে মুখের কাছে তুলে ধরেন, কোন কথা বলেন না।

রঞ্জু—তুমি কোথায় থাক?

মাধবীলতা মুখ ঘুরিয়ে দরজার রামধনু রঙের পর্দাটার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রঞ্জু—বাবার খুব খারাপ লাগছে। ডুমরির ডাক বাংলোতে চলে গেল বাবা।

মাধবীলতা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়ে কার্পেটের উপর থেকে একটা বল কুড়িয়ে নিয়ে লনের দিকে ছুঁড়ে দেন। কোথা থেকে একটা স্প্যানিয়েল ছুটে এসে বলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রঞ্জু বলে--বাবা আজকাল বাজে জিনিস বেশি খায় না। শুধু সন্ধেবেলা একটু।

বারান্দা থেকে নেমে স্প্যানিয়েলটাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকেন মাধবীলতা।

রঞ্জু রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে।--চল পিসি, মা ভয়ানক দুষ্টু ; আমার সঙ্গে কথাই বলছে না।

ছুটে আসেন মাধবীলতা। রঞ্জুকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে, রঞ্জুর মাথার উপর গাল পেতে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ; একেবারে নিস্পন্দ হয়ে কিছুক্ষণের জন্য যেন ঘুমিয়ে পড়েন মাধবীলতা। তারপরই রঞ্জুকে ছেড়ে দিয়ে আর চোখ মেলে কথা বলেন।--এস রঞ্জু।

বড়দি এইবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। রেবা মাসিমার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন--রঞ্জু, এবার কার্সিয়াং কনভেন্টে থাকবে। বছরে শুধু তিনটে মাস--ডিসেম্বর, জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী এখানে এসে বাপের কাছে থাকবে। কাজেই আপনার বোনঝি যদি রঞ্জুকে দেখতে ইচ্ছা করেন, তবে এই তিনটে মাসের মধ্যে কোন সময়ে যেন দেখে যান। যখন-তখন এলে দেখা হবে না।

রঞ্জুর হাত ধরে সিংহানি হোটেলের গেট পার হয়ে সড়কের উপরে দাঁড়ালেন আর হাঁপ ছাড়লেন বড়দি। রঞ্জু বলে--মা তাকিয়ে আছে, পিসি।

বড়দি কোন দিকে না তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন--চল, রঞ্জু।

মাত্র দশ মিনিটের পথ, বড়দির আর রঞ্জুর আস্তে আস্তে হেঁটে আসতে বড় জোর পনের মিনিট হয়েছে। ভিলা মাধবীর বারান্দায় এসে উঠতেই শুনতে পেলেন বড়দি, টেলিফোন বেজেই চলেছে।

--হ্যালো, কে? প্রশ্ন করেন বড়দি।

সিংহানি হোটেল থেকে মাধবীলতার রেবা মাসিমা বললেন।--মাধু এখনই এলাহাবাদ ফিরে যাচ্ছে। কাজেই বুঝতে পারছেন, কাল আর রঞ্জুকে এখানে নিয়ে আসবার দরকার নেই।

ভিলা মাধবীর ঝাউ আর উতলা হয়ে মাথা দোলায় না, যদিও সামনের সড়ক দিয়ে মাধবীলতাকে নিয়ে সিংহানি হোটেলের গাড়িটা ছুটে চলে গেল।

আর, মিনিট পনের পরে সিংহানি হোটেলের বেয়ারা একটি চিঠি ও একটি জিনিস হাতে নিয়ে ভিলা মাধবীর বারান্দার কাছে এসে বড়দিকে সেলাম জানালো।

মাধবীলতার রেবা মাসিমা লিখেছেন--মাধু এই আংটিটা আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে বলে গেল। কাজেই পাঠালাম।

আংটিটাকে হাতে তুলে নিতেই বড়দির হাতটা কেঁপে ওঠে। যেন একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো হাতে তুলে নিয়েছেন।

বিধবা মানুষ বড়দি। বড়দির স্বামী, নাগপুরের ব্যারিস্টার এস দত্ত আজ পাঁচ বছর হলো মারা গিয়েছেন। হঠাৎ একটা কঠিন অসুখে পড়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এস দত্ত। বড়দি প্রায় পুরো ষোলটি বছর মেয়ে-কলেজে পড়িয়েছেন, সংসারের খরচ চালিয়েছেন, আর একমাত্র ছেলে দশ বছর বয়সের মণ্টুকে বড় করে তুলেছেন। তার ওপর অন্ধ স্বামীকে নিজের হাতে স্নান করিয়ে আর খাইয়ে দিতে হয়েছে। মণ্টু আজ রেলওয়ের অফিসার হয়ে রাঁচিতে আছে। মণ্টুর বউও আছে। বড়দির একটি নাতিও আছে। এমন বড়দি মাধবীলতার ফেরত পাঠানো আংটিকে ভয়ানক একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো বলে না মনে করে পারবেন কেন?

আংটিটাকে সুজীবনের বইয়ের আলমারির এক কোণে গুঁজে রেখে দিয়ে বড়দি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন।

রঞ্জু এখন খাবে। খাবার টেবিলের কাছে রঞ্জুর পাশে বসে থাকেন বড়দি ; তারপর রঞ্জুকে শোবার ঘরের বিছানায় তুলে দিয়ে আবার বাইরের ঘরে এসে বসে থাকেন। রঞ্জুর আয়া বুড়িটা এখনও আছে ; কিন্তু আর কতদিন বেঁচে থাকবে? অথচ এই মেয়েটার জীবনটা যে

পড়েই রইল। দুটো মায়ার কথা বলে আর আদর করে ওর হাতে দুধের গেলাসটা তুলে দেবার মত একটা মানুষও যে এ বাড়িতে থাকবে না। বড়দি নিজে বার বার রাঁচি থেকে এসে কতটুকুই বা করতে পারবেন? তাঁকেও তো একটা দুষ্টু নাতির সব দুরন্তপনার দায় সামলাতে হয়।

জীবু অবশ্য হেসে-হেসে বলেছে, ছুটিতে কনভেন্ট থেকে এসে রঞ্জু যে তিনমাস এখানে থাকবে সে তিনমাস বড়দি যেন রাঁচির সংসার থেকে প্রিভিলেজ লীভ নিয়ে এখানে এসে থাকেন। কিন্তু ষাট বছর বয়সের মানুষ বড়দির পক্ষে আর কটা বছরই বা ওভাবে এখানে বার-বার আসা আর থাকা সম্ভব হবে?

জীবুর মনটাও তো এখন খালি হয়ে গিয়েছে। মিথ্যে বোঝার ভার নামিয়ে আর সরিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে গিয়েছে। এখন এই একলা জীবনের শূন্যতাকে ইচ্ছা করলেই তো একজন সঙ্গিনীর ভালবাসা দিয়ে ভরে ফেলতে পারে জীবু। রঞ্জু মেয়েটাও তাহলে অন্তত চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে আবোল-তাবোল কথা বলবার মত একটা মানুষকে পেয়ে যাবে। ভালই হবে। আবার বিয়ে করতে আপত্তি হবে কেন জীবুর?

পাশের ঘরের পর্দাটা হাওয়া লেগে দুলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বড়দির চোখদুটো যেন ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। পাশের ঘরের মেঝের এককোণে একজোড়া ভেলভেটের চটি। চারু রায়ের মেয়ে মাধবী যেন এখনও ওই ঘরের ভিতরে আছে।

এঘর আর ওঘর ঘুরে-ঘুরে দেখলেন বড়দি ; বার বার চমকে উঠলেন বড়দি ; আর চোখদুটো আরও ভয় পেয়ে সাদা হয়ে যেতে থাকে।

কে বলবে ভিলা মাধবীর মাধবী নেই? বড়দির ভাই এ কী ভয়ানক মাতলামির কাণ্ড করে রেখেছে! মাধবীলতার সব জিনিস যেখানে যেমন ছিল, সেখানেই তেমনি পড়ে আছে। কোন জিনিসকে এখনও সরিয়ে ফেলা হয়নি। মিররের হুকে যে তোয়ালেটা ঝুলছে, সেটা যে মাধবীরই মুখের ক্রীম মোছা তোয়ালে। আলমারির তাক ভর্তি হয়ে মাধবীর শাড়িগুলি এক-একটা রঙিন সমাদরের মত সাজানো রয়েছে। বাথরুমের কাচের তাকের উপরে মাধবীর হেয়ার অয়েলের শিশিটার ছিপি খোলা। সুজীবনের পাথরের মিউজিয়ামের ঘরের দেয়ালে মাধবীর অয়েল পোট্রেটও হাসছে। শীতের দিনে মাধবীলতা গলায় জড়াতো যে ফার, সেটাও একটা চেয়ারের উপরে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

বড়দির ভয় আর বিস্ময় কান্না হয়ে ফেটে পড়ে। এখনও এইসব ভয়ংকর জঞ্জালকে কেন পুষে রেখেছে সুজীবন? আজকাল তো খুব কমই মদ খায় সুজীবন ; তবে বেহুঁশ হয়ে এমন করে একটা মিথ্যের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে আছে কেন?

সেদিন ডুমরি ডাকবাংলোর প্রবাস থেকে ভিলা মাধবীতে ফিরে এলেন সুজীবন। সেদিনই বেশি দেরি না করে, আর গলার স্বর বেশ কঠোর করে নিয়ে কথাটা বলেই দিলেন বড়দি—আংটি ফেরত পাঠিয়েছে।

হেসে ফেলেন সুজীবন সেন—বেশ করেছে। রাক্ষুসীর বুদ্ধি আছে।

বড়দি—তুমিও ওর সব জিনিস ফেরত পাঠিয়ে দাও।

চেঁচিয়ে ওঠেন সুজীবন—ফেরত নয় ; ওর সব জিনিস আমি এখনই বোনফায়ার করে ছাই করে দেব।

বড়দি—তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি চুপ করে বসে থাক, আমিই ব্যবস্থা করছি।

মালীকে আর বেয়ারাকে ডাক দিয়ে চারু রায়ের মেয়ের সব জিনিস, সেই সঙ্গে ওই অয়েল পোট্রেটকেও একসঙ্গে বাঁধা-ছাঁদা করে সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন বড়দি।

কিন্তু দেখে চমকে উঠলেন বড়দি, হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়েই বড়দির সামনে এসে

দাঁড়িয়েছে তাঁর ভাই সুজীবন। কটকটে লাল চোখ ছলছল করছে ; চেঁচিয়ে হাসছেন সুজীবন।--খুব ভাল হলো বড়দি, তুমি ছিলে বলেই কাজটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আমি তো ঘেন্নায় ওসব জিনিস ছুঁতেও পারতাম না।

বড়দি বলেন--যখন-তখন এসব খেও না জীবু। গেলাস রেখে দাও।

সুজীবন--রঞ্জুকে দেখে চারু রায়ের মেয়ে কি বললেন? বাজে কথা বলতে সাহস করেনি তো?

বড়দি--না।

সুজীবন--তুমি কি বললে?

বড়দি--আমাকে বিশেষ কিছু বলতে হয়নি। রঞ্জু যা বলে দিয়েছে, তাই যথেষ্ট। শিক্ষা পেয়ে গিয়েছে। মেয়েকে আরও ক'দিন দেখবার সাধ ছেড়ে দিয়ে চলেও গিয়েছে।

সুজীবন--আমি এই তো চাইছিলাম বড়দি ; রঞ্জু যেন ওকে ভাল করে চাব্‌কে দেয়।

বড়দি আর কোন কথা বলেন না ; কিন্তু সুজীবন সেন যেন কৃতার্থ প্রতিশোধের তৃপ্তিতে বিহ্বল হয়ে বলতে থাকেন,--আমি চাই, রঞ্জু চিরকাল ওর ওই মাতাটিকে মনে-প্রাণে ঘেন্না করবে।

বড়দি--খেতে চল জীবু।

সুজীবন--আমাকেও খুব সাবধান থাকতে হবে বড়দি, চারু রায়ের মেয়ের নোংরা জীবনের কোন ছায়াও যেন আমার মেয়ের জীবনে ঘেঁষতে না পারে।

বড়দি--ভগবান রক্ষে করবেন ; তুমি একটুও চিন্তে করবে না।

পাঁচদিন পর, ভিলা মাধবীর লনের ঘাসের সব ধুলো যেদিন বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেল, সেদিন রঞ্জুকে কার্সিয়াংয়ের কনভেন্টে রেখে আসবার জন্য রঞ্জুকে নিয়ে রওনা হলেন বড়দি। সঙ্গে গেল বেয়ারা শুকদেও। সেদিন সারা সকালটা রঞ্জুর হাত ধরে বসে রইলেন সুজীবন সেন।

রঞ্জু বলে--তোমাকে অনেক চিঠি লিখবো, বাবা।

সুজীবন--নিশ্চয়, যখনই ইচ্ছে হবে, লিখবে। এস. সেন ; জিওলজিস্ট, ভিলা মাধবী, সিংহানি, হাজারিবাগ।...ও, নো নো, নট ভিলা মাধবী। কখ্‌খনো না। শুধু সিংহানি হাজারিবাগ।

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন সুজীবন, গেটের কাছে এগিয়ে গেলেন, মালীকে ডাক দিলেন।

তিন পোঁচ আলকাতরা মাখিয়ে থামের গায়ে সাদা পাথরের উপর লেখা নামটাকে ঢেকে কালো করে দিলেন সুজীবন। আইভিলতার শুঁড়গুলিকে টানাটানি করে নামিয়ে দিয়ে মালীটা আবার সেই নামহীন কালিমাকেও ভাল করে ঢেকে দেয়।

* * *

শুধু কাজ, অনেক কাজ, নানাদিকে ঘুরে-ফিরে কাজ করছেন সুজীবন সেন। করনপুরার কয়লা, খেলারির লাইম-স্টোন, গাঁওয়ার অভ্র আর গুমিয়ার ফায়ার-ক্লে তাঁকে ডেকেছে। প্রসপেক্টরের সঙ্গে মোটা টাকার ফী চুক্তি করে নিয়ে নতুন খাদ আর খাদানের খোঁজ দিয়েছেন। পাহাড়ের গায়ে ক্যাম্প করে থেকেছেন আর ভুট্টার খিচুরি খেয়ে দিন পার করে দিয়েছেন। শিকার করা যেন ভুলেই গিয়েছেন, আর হুইস্কির জন্যও কোন ছটফটানি নেই।

কার্সিয়াংয়ের কনভেন্ট থেকে রঞ্জু এসেছে। রঞ্জু এসেছে খবর পেয়ে, আয়াবুড়িও এসেছে। কাজেই এই তিনটে মাস সুজীবন কোন কাজের তাগিদে বাইরে আর যাবেন না।

বড়দি গল্প করেন। রাঁচিতে কত মেয়ের সঙ্গেই তো আমার চেনাশোনা হলো, কিন্তু শম্ভুবাবুর ভাইঝি কাবেরীর মত কেউ নয়। কাবেরীর সঙ্গে কারও তুলনা চলে না।

সুজীবন রঞ্জুর হাত ধরে বসে থাকেন আর পাইপ টানেন। বড়দির গল্প শুনে হাসতেও থাকেন।

বড়দি বলেন--খুব শিক্ষিত মেয়ে তো বটেই ; তাছাড়া কী চমৎকার স্বভাব। দেখতেও বেশ সুন্দর। সবচেয়ে ভাল এর হাসিটি। জুঁইফুলের মত শান্ত, মিষ্টি আর মিহি একটি হাসি সবসময় মুখে লেগেই থাকে। কলকাতার যে মেয়ে স্কুলে টিচার হয়ে ঢুকেছিল, এ বছর সেই স্কুলেরই হেড-মিসট্রেস হবে কাবেরী। কিন্তু শম্ভুবাবু তাঁর ভাইঝিকে আর চাকরী করতে দিতে রাজি নন।

সুজীবন--মণ্টুর সার্ভিসের খবর কি? প্রমোশন পেল?

বড়দি--পেয়েছে। শম্ভুবাবু আমাকে বলেছেন, আমি যদি কাউকে পছন্দ করে দিই, তবে তিনি খুশি হয়ে তারই সঙ্গে কাবেরীর বিয়ে দেবেন।

সুজীবন--মণ্টুর ছেলেটা রাস্তার লোকের গায়ে ঢিল মারবার অভ্যেস আজকাল বন্ধ করেছে? না, সেইরকমই চালিয়ে যাচ্ছে?

বড়দি--কাবেরীর মনটাকেও আমি যেটুকু চিনতে পেরেছি, তাতে অন্তত এটুকু বুঝেছি যে, এ মেয়ে যারই কাছে থাকুক, তাকে শান্তি দিতে আর সুখী করতে পারবে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন সুজীবন।--বড়দি, নেড়া একবারই বেলতলায় গিয়েছিল। কিন্তু আর যাবে না।

বড়দি--এ তোমার মিথ্যে ভয়, জীবু।

সুজীবন--না বড়দি, এসব কথা ছেড়ে দাও।

বড়দির সঙ্গে গল্প করে আর রঞ্জুকে আদর করে সুজীবনের একটির পর একটি দিন পার হয়ে যাচ্ছে ; কিন্তু দিনগুলির যে আরও একটা কাজ ছিল। চারু রায়ের মেয়ে তার মেয়েকে দেখতে আসবে। বড়দি রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে সিংহানি হোটেলের বারান্দাতে কিছুক্ষণ বসে থাকবেন। কিন্তু কই, সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমার চিঠি নিয়ে কোন বেয়ারা আর চাপরাশী তো রঞ্জুকে আজও ডাকতে এল না? রঞ্জুর কনভেন্টের ছুটির তিন মাসের শেষে ক'টা দিন তো শিগগিরই ফুরিয়ে যাবে ; আবার কার্সিয়াং চলে যাবে রঞ্জু।

মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে গিয়েছেন সুজীবন। ভাবতে একটু আশ্চর্যও লেগেছে। আদালতের কাছে ধরনা দিয়ে, মুখার্জিবাবুর মত উকিলকে লাগিয়ে, ছ'মাস ধরে দাবির লড়াই চালিয়ে আজ আইনের জোরে মেয়েকে চোখে দেখবার যে অধিকার পেয়েছ চারু রায়ের মেয়ে, সেটা যে একটা নেকড়েনীর রক্তমাংসের সাংঘাতিক জেদ, গুলি খেয়েও বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে চায় না।

সুজীবন সেন বোধহয় বিনা হুইস্কিতেই একটা অদ্ভুত নেশা জমিয়ে প্রাণের গোপনে পুষে রেখেছেন। চারু রায়ের মেয়ে যেন চিরকাল এভাবে বছরের কয়েকটি দিন সুজীবনের জীবনের নীড় থেকে সামান্য একটু দূরে এক হোটেলের বারান্দায় এসে ঠাঁই নেবে, আর সুজীবনের মেয়ে রঞ্জুকে আদর করে চলে যাবে। ভিলা মাধবীর ঝাউ দুলে উঠবে, আর চারু রায়ের মেয়েকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য সামনের সড়ক দিয়ে রেবা মাসিমার গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে চলে যাবে। বসে বসে শুধু দেখবেন আর হাসবেন সুজীবন ; কী অদ্ভুত ধুলো!

বড়দি তো আগেই একবার সন্দেহ করেছিলেন, জীবু যেন এখনও একটা নেশায় ভুলে আইনের অগোচরে একটা রাখীর সুতো দিয়ে চারু রায়ের মেয়ের সঙ্গে একটা অদ্ভুত মিথ্যে সম্পর্কের মোহটাকেই বেঁধে রেখেছে। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার দেড় বছর পরেও মাধবীলতার অয়েল পোর্ট্রেট সরিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিল এই জীবু। তাই জীবুর আনমনা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে বড়দি আজও আবার সন্দেহ করছেন, জীবু কি সত্যিই জানে না? এখনও জীবু কি শোনেনি যে, রঞ্জুকে দেখতে আর আসবে না চারু রায়ের মেয়ে?

বড়দি বলেন--রঞ্জুকে নিয়ে আমি রাঁচি চলে যাই। ওখান থেকেই রঞ্জুকে কার্সিয়াং পাঠিয়ে দেব। কেমন?

সুজীবন--তা দিও, কিন্তু মা আর মেয়ের বাৎসরিক ইন্টারভিউয়ের কি হলো?

বড়দি--সেটা আর কোনদিনও হবে বলে মনে হয় না।

--কেন?

--মাতৃদেবীর এখন বোধহয় আর কন্যাকে দেখবার জন্যে কোন চাড় নেই, কিংবা ফুরসত নেই।

--কেন?

--চারু রায়ের মেয়ে তো আবার বিয়ে করেছেন।

--কি বললে?

--হ্যাঁ, সেই পরিতোষ রায়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। ওরা এখন বাঙ্গালোরে আছে। এলাহাবাদ থেকে মন্টুর শ্বশুর সব কথাই আমাকে লিখে জানিয়েছেন।

--কথাটা তুমি এতদিন আমাকে জানাওনি কেন, বড়দি।

--আমি মনে করেছিলাম, তুমিও নিশ্চয়ই খবরটা জেনেছো।

--না, জানতে পাইনি। যাক্ খুব ভাল হলো, বড়দি।

বেশ শান্তভাবে হেসে পাইপ ধরালেন সুজীবন। আর বেশ শান্তভাবেই আস্তে আস্তে হেঁটে লনের চারদিক ঘুরে বেড়ালেন। তারপর ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

অনেকক্ষণ পরে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলেন বড়দি। ঘরের ভিতরে যেন একটা কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে আর ঝনঝনিয়ে ভেঙে গেল।

এগিয়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে বড়দি বেশ একটু বিরক্তভরা স্বরে কথা বললেন--আবার এসব কেন শুরু করলে, জীবু? ছিঃ।

সুজীবনের কটকটে লাল চোখ হাসতে থাকে।--এবার তো প্রমাণ পেয়ে গেলে বড়দি, চারু রায়ের মেয়ের চোখে রঞ্জুও একটা জঞ্জাল। ওটা তাহলে নেকড়েনীর চেয়েও ইতর একটা প্রাণী।

বড়দি--চুপ কর। আমরা এখন রওনা হব।

সুজীবন--হ্যাঁ, যাও। কিন্তু রঞ্জুকে বেশ স্পষ্ট করে বলে বুঝিয়ে দিও, ওর মা ওকে একটা অচেনা কুকুরের বাচ্চা বলে মনে করে।

বড়দি--চুপ কর। কথা বলো না। সুজীবনের হাতের কাছের ছোট টেবিল থেকে হুইস্কির বোতলটা সরিয়ে নিয়ে আলমারিতে বন্ধ করেন বড়দি।

গাড়ি বের করে তৈরি হয়েছে ড্রাইভার মোতিরাম। রঞ্জুর কপালে এক মিনিট ধরে মুখ ঠেকিয়ে চুমো খেলেন সুজীবন। রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন বড়দি।

ঝড়ের হাওয়াতে শনশন করছে ভিলা মাধবীর ঝাউ। আর, সুজীবন সেন নিজেও যেন একটা ছটফটে অস্থিরতার ঝড় হয়ে ভিলা মাধবীর এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়াতে থাকেন। ইউকালিপটাসের ছায়াতে দাঁড়িয়ে পাইপ ধরান। হাত থেকে ফসকে গিয়ে পাইপটা ঘাসের উপর পড়ে যায়। তুলে নিয়েই আবার বাগানের নিরালাতে একটা বুড়ো দেবদারুর ছায়াতে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন।

বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। তবু ভিলা মাধবীর ঝাউয়ের শনশনে শব্দের মাতলামি থামতে চাইছে না।

ঘরে ঢুকলেন সুজীবন। লেখার টেবিলটার কাছে বসলেন। তারপর দেরাজের হাতলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে দেরাজটাকে টানলেন! রঙিন নক্সা-করা চামড়ার একটা ব্যাগ বের করলেন।

শূন্য ব্যাগ। চুপসে রয়েছে ব্যাগটা। মাধবীলতার লেখা, সেই দুর্বার ভালবাসার একান্নটা চিঠির একটি চিঠিও নেই। সুজীবন সেনের গোপন যাদুঘর একেবারে খালি হয়ে পড়ে আছে।

কেউ যেন সুজীবনের জীবনের গুপ্তধন চুরি করে নিয়ে সরে পড়েছে। সুজীবনের চোখদুটো যেন একটা নীরব হাহাকার নিয়ে আর একেবারে স্তব্ধ হয়ে সেই শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভাল করেছেন চারু রায়ের অতিচালাক আর অতিসাবধান মেয়ে। একান্নটা মিথ্যের দলিলকে একদিন সময় বুঝে সরিয়ে নিয়ে আর ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে বোধহয় কিচেনের জ্বলন্ত উনুনের ভিতর ফেলে দিয়েছেন। খানসামা স্টিফান তখন বোধহয় কিচেনে ছিল না, ভাল টমেটো কিনতে গাঁয়ের হাটে গিয়েছিল।

চোখে নয়, বুকেরই ভিতর একটা জ্বালা কটকট করছে। এলাহাবাদের অ্যাডভোকেট চারু রায়ের মেয়ে যে নিজেই ইচ্ছে করে সুজীবন সেনকে ভালবেসেছিল আর বিয়ে করেছিল, সে-কথা বলে দেবার মত একটা সামান্য লেখার চিহ্নও আর পৃথিবীতে রইল না।

হেসে ফেলেন সুজীবন। মিররের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান, হাসিটা যেন কুৎসিত একটা কাঁদুনে হাসির মত কাঁপছে।

চারশো বোরের কর্ডাইট রাইফেল সামনের সোফাটারই উপর পড়ে রয়েছে। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে আর নিথর হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন সুজীবন সেন। তারপরেই টেলিফোন করে চাতরার এস ডি ও'র সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন আর খবর শুনে খুশিও হলেন, এই সীজনেও চাতরার জঙ্গলে একদল নীলগাই এসেছে।

রাঁচি থেকে গাড়িটা ফিরে আসতেই ডাক দিলেন সুজীবন।--মোতিরাম, এক্সকিউজ মি, তুমি তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নাও। এখনই শিকারে বের হব।

জঙ্গলের পাশে একটা গাঁয়ের একটা খড়ের মাচান। মাঝরাতে চাঁদ উঠেছে আর জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে সামনের অড়হরের ক্ষেত। রাইফেলটাকে কোলের উপর তুলে চুপ করে বসে থাকেন সুজীবন।

ঘুমিয়ে পড়েননি, স্বপ্নও দেখেননি সুজীবন। কিন্তু এ যে অদ্ভুত একটা আশার স্বপ্নময় ছবি। একটা নীলগাই খড়ের মাচান থেকে দশ হাত দূরে আস্তে আস্তে ঘুরে-ফিরে কচি অড়হর ভাঙছে, ছিঁড়ছে আর খাচ্ছে। চাঁদের আলো পড়ে চিকচিকিয়ে উঠছে প্রাণীটার চোখদুটো ; তাই ঠিক কপালের মাঝখানে তাক করতে কোন অসুবিধেও নেই। ভালই হবে ; এক গুলিতে কপালটাকে ফুটো করে দিলেই চলবে। বেশ নিখুঁত ও আস্ত একটা ছাল পাওয়া যাবে ; কোন ফুটো-ফাটা থাকবে না। কলকাতার ট্যাক্সিডার্মিস্ট খান্নার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ছালটাকে ভাল করে প্রসেস করিয়ে নিতে হবে। তারপর ওটাকে ড্রইং রুমের পর্দা করে ঝুলিয়ে রাখলে আরও চমৎকার দেখাবে। কিন্তু দূরে ওটা আবার কে? কি আশ্চর্য, আরও একটা নীলগাই একেবারে নিশ্চল হয়ে, গলা উঁচু করে আর মুখ তুলে এই নীলগাইটার দিকে যেন ভয়ানক সতর্ক একটা প্রেমের পাহারা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। উনি বোধহয় সঙ্গিনী আর ইনি হলেন সঙ্গী।

রাইফেলটাকে কোলের উপর থেকে তুলে নিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখেন সুজীবন। ফ্লাস্কের ছিপি খুলে হুইস্কি মেশানো ঠাণ্ডা বীয়ারেব ছোট্ট একটি ঝর্ণাকে গলগল করে গিলে নিয়ে ঢেকুর তোলেন। তারপর হেসে ফেলেন। নাঃ, বড়দি এখন কাছে থাকলে আরও জোরে হেসে আর তামাশা করে বলে দিতে পারা যেত, ওদিকের ওটা হলো চারু রায়ের মেয়ে, আর এদিকের এটা হলো বেচারা পরিতোষ। এটাকে গুলি করে মাববার কোন মানে হয় না।

চেষ্টা করলে ওটাকে অবশ্য এক গুলিতে সাবড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দরকার কি? হাত নোংরা করে লাভ নেই।

মাচান থেকে নেমে আর আস্তে আস্তে হেঁটে আবার গাঁয়ের মাহাতোর বাড়ির কাছে ফিরে এসে, গাড়ির বনেটের উপর আস্তে একটা চাপড় মেরে ড্রাইভার মোতিরামের ঘুম ভঙিয়ে

দিলেন সুজীবন।--চল, মোতিরাম।

ভিলা মাধবীর মাধবী নেই। আলকাতরার কালো দিয়ে পুরু করে ঢাকা পাথরের ফলকটার নামহীন চেহারার ওপর আরও একটা আবরণ হয়ে আইভিলতার শুঁড়গুলি আরও ঘন হয়ে দুলছে। তবু লোকে বলে, ভিলা মাধবী।

সুজীবন সেনের জীবনে আর কোন কাজ নেই, পাথরের রোমান্স নেই, শিকারও নেই, শুধু আছে হুইস্কি। এক-একটা নতুন বছর আসছে আর ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুজীবন বোধহয় মনে করেন, কিছুই ফুরিয়ে যাচ্ছে না। আর কী আছে যে ফুরিয়ে যাবে?

জানকীলাল যমুনাদাস কতবার এসেছেন আর কত সাধাসাধি করেছেন ; কিন্তু আর কোন কাজের দায় নিতে রাজি হননি সুজীবন। ইচ্ছে করলে একদিনের জন্য ওদারনা ভ্যালিতে গিয়ে ভাল সালফাইটের খোঁজ দিতে পারতেন, কিন্তু তাও দেননি।

হ্যাঁ, শুধু বছরের তিনটে মাস রঞ্জু যখন কনভেন্ট থেকে এসে এখানে থাকে, তখন সুজীবন সেনের হুইস্কির বোতল একটু আড়াল হয়ে লুকিয়ে থাক। আর, সকালবেলা একবার ঘণ্টা দু'তিনের মত সেন্ট কলাম্বাস কলেজের সামনের বিরাট ময়দানে গল্‌ফ্ খেলে একটু বেড়িয়েও আসেন।

কিন্তু ভিলা মাধবীর লন আর বাগানকে রঙিন করে রেখেছে মালী চমনরাম। ঘর বারান্দা শার্সি কার্পেট আর আসবাব, সবই ঝকঝকে আর তক্‌তকে করে রেখেছে বেয়ারা শুকদেও।

বড়দির সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে বেশ বিরক্ত হয়ে কয়েকবার চেঁচিয়ে উঠেছেন সুজীবন--এ এক আপদ হয়েছে, বড়দি। এখনও যেসব চিঠি আসে, তাতে ঠিকানার সঙ্গে বাড়িটার সেই বাজে নামটাও থাকে।

বড়দি হেসে ফেলেন--ওতে কি এসে যায়? তুমিই বা এটা থামাতে পারবে কেমন করে?

টাউনের লোকে এখনও বলে, ভিলা মাধবী। সত্যিই তো, এ আপদ কি করে ঠেকাতে পারবেন সুজীবন? মনে-প্রাণে, জীবনে ও আইনে যেটা একেবারে নিছক মিথ্যা, সেটা যেন একটা বাতাসের অদেখা চক্রান্তে চিরকালের কথা হয়ে থেকে যাচ্ছে। এই একটা অস্বস্তি ; একটা বিশ্রী বাজে ঠাট্টার ঠোকর। এছাড়া সুজীবনের জীবনে কোন অস্বস্তি আর নেই।

টাউনের লোক দেখতে পায়, সেনসাহেব একটু বুড়িয়ে গিয়েছেন। মাথার পাশে কানের কাছের সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। তবু বেশ শক্ত আছেন। গল্‌ফ্ খেলতে বের হয়ে ময়দানের ঘাসের উপর কী সুন্দর স্টান্সে দাঁড়িয়ে আর ক্লাব তুলে ড্রাইভ দিতে পারেন সেনসাহেব। বল যেন হাউইয়ের মত শিস দিয়ে উড়ে চলে যায়।

কলেজের সায়েন্সের ছাত্র ছেলেরা এখনও মাঝে-মাঝে, বছরে অন্তত একটিবার সেনসাহেবের পাথরের মিউজিয়াম দেখতে আসেন। কিন্তু সেনসাহেব নিজে আর ব্যস্ত হয়ে ছেলেদের কাছে পাথরের রোমান্সের কোন গল্প বলেন না। শুধু বেয়ারা শুকদেও এসে মিউজিয়াম ঘরের দরজা খুলে দেয়। ছেলেরা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শুধু শুকদেও দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু সেনসাহেবের সেই সৌজন্যের পুরানো হাসিটা এখনও আছে। ছেলেরা চলে যাচ্ছে দেখতে পেয়েই এগিয়ে আসেন, আর হাসিমুখে অনুরোধও করেন--আরও কিছুক্ষণ থাক। চা খেয়ে যাও।...স্টিফান, কোথায় তুমি? এদের চা খাইয়ে দাও।

ছেলেরা লনের উপর শুয়ে বসে আর গড়িয়ে অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না স্টিফান খানসামা চা নিয়ে আসে।

ছেলেরাও বলাবলি করে--সেনসাহেবকে দেখলে কিন্তু স্কলার বলে মনে হয় না। একটা রিটায়ার্ড মিলিটারী জেনারেল বলে মনে হয়। এত বয়স হয়েছে ; তবু কত স্মার্ট।

কথাটা খুব ভুল বলেনি কলেজের সায়েন্সের ছেলেরা। শুধু রিটায়ার্ড নয়, বেশ টায়ার্ড

জীবনও বটে। যেন লড়াই করবার আর কিছু নেই। আর যেটুকু লড়াই করা হয়েছে তাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন সুজীবন। বছরে যে ক'টা দিন রঞ্জু থাকে, সেই ক'টা দিন একটু বেশি নড়া-চড়া করেন ; একটু ছুটোছুটিও করে ফেলেন। কিন্তু তারপর আর কিছু করবার থাকে না। বারান্দায় আর লনে একটি ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকেন আর পাইপ টানেন।

অবশ্য, এক-আধবার উঠে গিয়ে ঘরের ভিতরেও যান ; আর মুখের রঙ লালচে করে আবার ফিরে আসেন। কিন্তু বড়দি স্টিফানকে আড়ালে ডেকে নিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই হুইস্কির বোতলে জল মিশিয়ে রাখে স্টিফান। তা না হলে সুজীবন সেনের চোখদুটো আজও লাল হয়ে উঠতো।

রঞ্জুর আয়াবুড়ি গত বছর মরেই গিয়েছে। আয়াবুড়িকে দেখতে না পেয়ে খুব কেঁদেছিল রঞ্জু। ড্রাইভার মোতিরামের মাথায় টাক পড়েছে। খানসামা স্টিফানের একটা পায়ে বাত ধরেছে ; আজকাল একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে স্টিফান। বেয়ারা শুকদেও সব দাঁত তুলে ফেলেছে, চুপসে গিয়েছে শুকদেও বেয়ারার মুখটা।

কিন্তু একটুও চুপসে যায়নি ভিলা মাধবীর চেহারা। ইউকালিপটাস আর ঝাউগুলির চেহারা একটুও বড়ো হয় না। বারান্দার কার্পেট কোথায়ও একটুও ছিঁড়ে যায় না। এক-একটা বর্ষা পার হয় ; তবু দেওয়ালের গোড়াতে একটু শেওলাও ধরে না।

জ্ঞানবাবুর একটা ধারণা, বেশি ড্রিঙ্ক করে করে সেনসাহেবের চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভিলা মাধবীতে এসে একটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন, তা নয় ; সেনসাহেব শুধু শান্ত হয়ে ইজিচেয়ারে বসে ভিলা মাধবীর যত গাছ, লতাপাতা, ফুল ও আলো-ছায়ার দিকে তাকিয়ে আর শুধু হেসে হেসে বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

যত ডাকবাংলো আর ফরেস্ট-বাংলোর চাপরাশিদের অনেকেই মাঝে মাঝে এসে সুজীবন সেনের সামনে দাঁড়ায় আর সেলাম জানায়। ওদের আক্ষেপ, সাহেব কেন আর শিকারে যান না। সুজীবন সেন সবারই হাতে একটা-দুটো টাকা বখশিশ ধরিয়ে দেন আর জঙ্গলের নতুন জানোয়ারের খবর শোনেন।

শুধু শোনাই সার। সুজীবন সেনের কর্ডাইট রাইফেল আর ছটফট করে ওঠে না। এক গুলিতে নীলগাইয়ের ধড় মাটিতে লুটিয়ে দেবার জন্য সুজীবন সেনের মনের মধ্যে যেন আর কোন পিপাসাই নেই।

বড়কা-গাঁওয়ের জঙ্গলে চৌশিঙ্গা দেখা দিয়েছে। গয়া থেকে এক সাহেব এসে ইচাকের কাছে খেলা মাঠের মধ্যেই একটা সাদা বাঘ পেয়েছেন আর মেরেছেন। সিমারিয়ার জঙ্গল থেকে দাঁতাল শুয়ার বের হয়ে রোজই মাহাতোদের আলুর ক্ষেত তছনছ করছে। এই তো এত কাছে ওই কানারি হিলের কাছে সড়কেরই উপর দুটো ভালুক রোজ রাতে একবার আসে আর চলে যায়। নতুন হাঁস নেমেছে চিতরপুরের ঝিলে।

খবরগুলিকে শুধু একটা ক্লান্ত হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করেন আর নীরব হয়ে বসে থাকেন সুজীবন সেন। সুজীবন সেন নিজেই যেন একটা ক্লান্তির গল্প হয়ে তাড়তাড়ি ফুরিয়ে যেতে চাইছেন।

কিন্তু সুজীবন সেন তাঁর মেয়ে রঞ্জিতা সেনের জীবনটাকে সুখী করে হাসিয়ে রাখবার জন্যে যা করা দরকার তার কিছুই না করে ছাড়েননি। বছরের নয়টি মাস কনভেণ্ট, তারপর মাসখানেক রাঁচিতে পিসির কাছে, তারপর মাস দুই বাপের কাছে ; তিনটি আশ্রয়ের স্নেহ আর প্রীতি রঞ্জুকে এক মুহূর্তের জন্যেও মনমরা হতে দেয়নি। আজকাল কার্সিয়াং থেকে কনভেণ্টের মিসেস ডি'সিলভা নিজেই রঞ্জুকে রাঁচিতে পৌঁছে দিয়ে যান। আর রঞ্জুর কার্সিয়াং রওয়ানা হবার ঠিক একদিন আগে কনভেণ্টের মাদার মণিকা কলকাতা থেকে এখানে চলে আসেন আর রঞ্জুকে নিয়ে যান। সঙ্গে যায় বেয়ারা শুকদেও। গত বছর রঞ্জুকে দেড় হাজার

টাকা দামের একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছেন সুজীবন। কলকাতার তিনটে প্রভিজান স্টোরের দোকানে টাকা জমা দিয়ে রেখেছেন সুজীবন ; রঞ্জু চিঠি লিখে যখন যে জিনিসের অর্ডার দেবে, তখনই যেন সে জিনিস রঞ্জুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

গত বছরেব মত এ-বছরেও ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহের সোমবারের সকালবেলার রোদ যখন ভিলা মাধবীর লনের ঘাসের সব শিশির গলিয়ে দিতে থাকে, তখন সুজীবন সেনের মুখটা করুণ হয়ে যায়। কালই এসে গিয়েছেন মাদার মণিকা, আজ এখনই রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে কার্সিয়াং রওনা হয়ে যাবেন। ড্রাইভার মোতিরাম গাড়ি বের করছে শুনতেও পাওয়া যায়, চায়ের টেবিলের কাছে বসে গল্প করেছেন মাদার মণিকা আর বড়দি। রঞ্জুর গলার স্বরও শোনা যায়। কথা বলছে রঞ্জু যেন সকালবেলার একটা খুশির পাখি মিষ্টি স্বরে ডাকছে। বুঝতে পারেন সুজীবন, ওরা সবাই সুজীবনের অপেক্ষা করছে।

রঞ্জু ডাকে—বাবা, এস।

কী অদ্ভুত ডাক! সুজীবন সেনের বুকটা যেন মিষ্টি বাতাসে ভরে যায়।

কিন্তু আর কতক্ষণ? চা খাওয়ার পালা শেষ হবার পর রঞ্জুর হাত ধরে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যান সুজীবন। গাড়িতে ওঠে রঞ্জু। মাদার মণিকাও উঠে বসেন। কিন্তু বিপদে পড়ে ড্রাইভার মোতিরাম। গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আর বাম্পারের উপর একটা পা তুলে দিয়ে, আনমনার মত, কে জানে কোন্ দিকে তাকিয়ে পাইপ টানতে থাকেন সুজীবন। সাহেব সরে না গেলে মোতিরাম যে গাড়ি স্টার্ট করতেই পারবে না।

গাড়ির ভিতর থেকে নেমে আসে রঞ্জু। সুজীবনের মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে সুজীবনের গালের উপর গাল পেতে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জু, তারপর হাসতে থাকে—আমাদের যেতে দাও বাবা। তুমি এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে বসো।

গাড়িতে ওঠে রঞ্জু। বাস্ তারপর আর কোন বাধা থাকে না। সুজীবন সেনের জীবনের নতুন নেশাটা খুশি হয়ে গিয়েছে। সরে যায় সুজীবন। অবাধ পথ পেয়ে গাড়িটা ছুটে চলে যায়।

সুজীবন বলেন—আর কি বড়দি? রঞ্জু আর-একটু বড় হলেই একদিন ওর বিয়েটা দিয়ে দেব। তারপর আমার ছুটি।

বড়দি বেশ জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়েন।—আমি বেঁচে থাকতে থাকতে রঞ্জুর বিয়েটা হয়ে গেলে ভাল হতো। তা কি আর হবে?

সুজীবন—নিশ্চয় হবে।

কিন্তু দেখে খুশি হয়েছেন বড়দি তাঁর ভাইয়ের জীবনে সেই ভয়ানক কোলাহলের সব শব্দ শান্ত হয়ে গিয়েছে। জীবুর কথা শুনেই বোঝা যায়, ওর মনের সেই আগুন আর নেই শুনে খুশি হয়েছেন বড়দি, জীবু এখন থেকেই রঞ্জুর বিয়ের কথা চিন্তা করছে। খুব ভাল কথা। বড়দির মনটাও একটা শান্তি পেয়েছে। জীবুরও তো বয়স হয়েছে। সময়ে সব তাপই শান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু সেদিনই অনেক রাতে বড়দির চোখদুটো হঠাৎ চমকে উঠে আতঙ্কে ভরে গেল স্পষ্ট দেখতে পেলেন বড়দি, তাপ যেন ধিকিধিকি করে জ্বলছে।

ঘুম আসছে না, তাই ঘুমের একটা পিল খাবেন বলে বিছানা থেকে নেমেই দেখতে পেলেন বড়দি, পাশের ড্রইং-রুমের অন্ধকারে সুজীবনের পাইপটার আগুন একটা লালচে জ্বালা হয়ে দপ্ দপ্ করছে।

সুইচ টিপে আলো জ্বালেন বড়দি।—এ কি জীবু! তুমি এখনও ঘুমোওনি কেন?

সুজীবন হাসেন—আমি তো রাত্রিবেলা ঘুমোই না বড়দি।

—কেন? রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন বড়দি। সুজীবন আবার হাসেন—একটা অস্বস্তি

ভয়ানক বিশ্রী লাগে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমি দিনের বেলা সোফার উপর পড়ে বেশ ভাল করে ঘুমিয়ে নিই।

বড়দি--কিন্তু অস্বস্তি আবার কেন?

এবার আর পাইপের আগুন নয় ; সুজীবন সেনের চোখদুটোই দপ্ করে জ্বলে ওঠে।-- ঘেন্না করে। রাত্রিবেলা ও-ঘরে ঢুকতে আর ওই খাটের বিছানাটাকে ছুঁতেও ঘেন্না করে।

--খুব ভুল করছো জীবু! খুব অন্যায় করছো। কেঁদে ফেলেন বড়দি।

বড়দিরও আজকাল এটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। একটুতেই ভয় পান আর কেঁদে ফেলেন।

বড়দিরও তো বেশ বয়স হয়েছে। আজকাল চোখে একটু কম দেখেন। চলতে ফিরতে বেশ হাঁপিয়েও পড়েন।

পরদিন সকালে রাঁচি রওনা হবার সময় যখন গাড়িতে উঠলেন বড়দি, তখন ভিলা মাধবীর ঝাউয়ের শব্দ শুনে আর-একবার ভয় পেয়ে চমকে উঠলেন আর চোখ মুছলেন।

* * *

বেড়াতে বের হয়ে টাউনের আদিত্যবাবু আর জ্ঞানবাবু গল্প করতে করতে যেদিন সিংহানি পর্যন্ত চলে এলেন, সেদিন ভিলা মাধবীর গেটের কাছে একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে আর বেশ ভাল করে দেখে নিলেন, সেনসাহেব লনের ঘাসের উপর একটি চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সেনসাহেবের মাথাটা আরও সাদা হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, একটু ঝুঁকে পড়েছেন সেনসাহেব।

আদিত্যবাবু--কত বয়স হলো সেনসাহেবের?

জ্ঞানবাবু--তা পঞ্চাশ তো কবেই পার হয়ে গিয়েছে। তবু, বয়সের তুলনায় মাথাটা একটু বেশি সাদা হয়েছে।

আদিত্যবাবু--তাহলে আর বিয়ে-টিয়ে করবেন বলে মনে হয় না।

জ্ঞানবাবু হাসেন।--না, করলে তো আট বছর আগেই করতেন। এখন তো মেয়ের বিয়ে দেবার কথা।

আদিত্যবাবু--মেয়েটির বয়স কত হবে এখন?

জ্ঞানবাবু--ধরুন না, সেনসাহেবের ডিভোর্স নেবার সময় মেয়েটির বয়স প্রায় দশ বছর ছিল। তার সঙ্গে আরও আটটা বছর যোগ করুন। মেয়েটির বয়স তাহলে গিয়ে দাঁড়ায়, এই সতেরো-আঠারো।

ঠিক হিসাব করেছেন জ্ঞানবাবু। বিকেলে রাঁচি থেকে বড়দির গাড়িটা ছুটে এসে যখন ভিলা মাধবীর লনের কাছে থামে, তখন বড়দির সঙ্গে সঙ্গে শাড়িপরা একটি আঠারো বছর বয়সের মেয়ে গাড়ি থেকে নামে। ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ি, বেশ একটা খোঁপা, হাতে সোনার সরু চেনব্যাণ্ডের সঙ্গে পাতলা একটি সোনালী ঘড়ি ; এক হাতে গরম ওভারকোট জড়িয়ে ধরে আর হাসতে হাসতে সুজীবনের চোখের কাছে এসে যে মেয়েটি দাঁড়ালো, সে মেয়ে আর কেউ নয় ; সুজীবন সেনের মেয়ে রঞ্জিতা সেন।

এগিয়ে গিয়ে সুজীবনের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দুলে দুলে হাসতে থাকে রঞ্জু--তোমার জন্যে আমি একটি জিনিস এনেছি, বাবা ; একটি তিব্বতী টুপি।

দুই চোখ অপলক করে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুজীবন। খুশি হয়ে হাসতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হাসিটা যেন ভয়ানক এক বিস্ময়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে ছটফট করে ওঠে। আজ হঠাৎ কোথা থেকে কার চেহারা দিয়ে নিজেকে এমন করে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে রঞ্জু? সেই চোখ, সেই ঠোঁট, গলাতেও ঠিক সেইরকম দুটো খাঁজ। চোখদুটো বন্ধ করতে ইচ্ছে করে, চেঁচিয়ে ডাকতে ইচ্ছে করে--একি হলো বড়দি? রঞ্জু যে আমাকে ভয়ানক

ঠাট্টা করছে।

হাতে-ধরা গরম জামাটাকে সুজীবনের কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে বাগানের ফুল দেখতে ছুটে যায় রঞ্জু। খানসামা স্টিফান ডাকতে থাকে--আগে চা খেয়ে নাও, মিস বাবা। তারপর যত খুশি বাগান দেখ।

বড়দি বলেন--মিসেস ডি'সিলভা এবার এসে রঞ্জুর কত প্রশংসা করলেন। রঞ্জু শুধু এক অঙ্ক ছাড়া সব সাবজেক্টে ফার্স্ট হয়েছে।

সুজীবন হাসতে চেষ্টা করেন।--হিস্ট্রিতে ফার্স্ট হয়েছে কি?

বড়দি--নিশ্চয় ; শুধু অঙ্ক ছাড়া সব বিষয়ে...

সুজীবন সেন হঠাৎ অদ্ভুতভাবে বড়দির দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত কথাই বলে ফেলেন--হিস্ট্রিতে ফেল করলেই ভাল করতো রঞ্জু।

চমকে ওঠেন বড়দি। ভাই সুজীবন কি নেশার মেজাজে কথা বলছে?

সুজীবন--কিছু মনে করো না, বড়দি। তোমার এসব খুশির কথা শুনে আমার কিন্তু ভাল লাগলো না।

বড়দি বেশ রাগ করে কথা বলেন।--তোমার এসব কথা শুনে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

সুজীবন--তুমি কি চাও যে, রঞ্জু ঠিক মায়ের মত মেয়ে হয়ে উঠুক?

বড়দি--কখ্খনো না। আমি পাগল? কেঁদে ফেললেন বড়দি।

সুজীবন হাসতে চেষ্টা করেন।--আঃ, আমি ঠাট্টা করে একটা কথা বললাম ; তাই তুমি কি বিশ্বাস করে কেঁদে ফেললে?

বড়দি--ওকথা ঠাট্টা করেও বলতে নেই।

তর্ক করে বড়দিকে আর বিরক্ত করতে চান না সুজীবন, তাই বেশ শান্ত দুটো চোখ নিয়ে, বড়দির উপদেশের বাধ্য ভাইটির মত নীরব হয়ে বসে থাকেন। বড়দিও খুশি হয়ে বলেন--রঞ্জু হলো রঞ্জু, তোমার মেয়ে, ডাক্তার প্রশান্ত সেনের মত মানী মানুষের নাতনি। আজেবাজে মানুষের সঙ্গে রঞ্জুর তুলনা করা উচিত নয়।

সুজীবন--খুব সত্যি কথা।

বড়দি--কাজেই তুমি ভুল করে কোন বাজে ভয়-টয় করবে না।

সুজীবন--একটু বেশি আশ্চর্য হয়েছি বলেই ভয় করতে হচ্ছে।

বড়দি--কিসের আশ্চর্য?

হেসে ফেলেন সুজীবন--বায়োলজির আশ্চর্য।

বড়দি--তার মানে?

সুজীবন--অবিকল চারু রায়ের মেয়ের চেহারাটি পেয়েছে রঞ্জু।

বড়দি ভ্রূকুটি করেন।--এটা কি রঞ্জুর ভুল?

সুজীবন আবার হেসে ফেলেন। আমার ভুল। আমি বায়োলজি পড়িনি। শুধু সারা জীবন পাথরের লজি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। তাই ঠিক বুঝতে পারছি না।

বড়দি হেসে ফেলেন।--তবে আর তর্ক করো না।

সুজীবন--কিন্তু, কী ভয়ানক বায়োলজি! চারু রায়ের মেয়েরই চেহারাটা বেচারা রঞ্জুর ঘাড়ে চেপে বসলো কেন? রঞ্জু তো তোমার চেহারা পেতে পারতো?

বড়দি হাসেন।--ভগবান তোমার প্রশ্নের জবাব দিন ; আমি দিতে পারবো না।

সুজীবন--তোমাদের বেশ একটা সুবিধে আছে বড়দি। যত গোলমালের জবাব দেবার দায় ওই একজন দারোগার ওপর চাপিয়ে হালকা হয়ে যাও।

বড়দি--ওভাবে কথা বলো না।

সুজীবন--সে গল্পটা জানো না? গাঁয়ের লোক সব প্রশ্নের জবাবে শুধু একটি কথা বলতো, দারোগা জানে। গাঁয়ের কলেরা লাগলো কেন?--দারোগা জানে। জলের বাঁধ ভেঙে গেল কেন?--দারোগা জানে। ধান হলো না কেন?--দারোগা জানে। বেচারা ম্যাজিস্ট্রেট গাঁয়ের দুরবস্থার কারণ তদন্ত করতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

বড়দি--আমিও একটা গল্প বলতে পারি। গাঁয়ের এক মাসি ছিল ; ঝগড়া বাধাবার জন্যে যখন কাউকে দেখতে পেত না, তখন নিজেই সুপুরি গাছের সঙ্গে চুল বেঁধে নিয়ে ছাড়-ছাড় বলে চেঁচাতো।

সুজীবন--আমিও কি তাই করছি?

বড়দি--করছো বইকি। কবেকার কোন্ ছাই ব্যাপার, যেটা চুকেবুকে মিটেও গিয়েছে, তারই সঙ্গে এখনও মনে মনে ঝগড়া করেই চলেছ।

সুজীবন--ঝগড়া নয়, ঘেন্না।

বড়দি--বড় অদ্ভুত ঘেন্না। কোন মানে হয় না।

সুজীবন--মানে হোক বা না হোক ; একটা ভয়ানক মেয়েলোকের চেহারার সঙ্গে রঞ্জুর চেহারার কোন মিল না থাকলেই ভাল ছিল।

বড়দি বিড়বিড় করেন--আমি তো তেমন কিছু মিল দেখি না।

সুজীবন--তুমি তো আজকাল চোখে কম দেখ।

বড়দি এবার বিরক্ত হয়ে সরেই যান।--তুমি চোখে একটু বেশি দেখছো।

বড়দি ঘরে নেই ; হুইস্কির আলমারির চাবিটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। চুপ করে আবার চেয়ারের উপরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন সুজীবন। বড়দির রাগের কথার ধমকটা নয় ; যেন বিদ্‌ঘুটে একটা নিয়ম ছাড়া ভাগ্যের ধমক সুজীবনকে চুপ করিয়ে, স্তব্ধ করিয়ে আর একলা করে দিয়ে ঘরের ভিতরে বসিয়ে রেখেছে।

কিন্তু বড়দি যেন সব বুঝেও কিছুই বুঝতে পারলেন না। মায়ের চেহারা পেয়েছে মেয়ে, মানুষের জগতের এই সাধারণ নিয়মের সত্যটা যে সুজীবনের জীবনে একটা অভিশাপের জয় ছাড়া আর কিছু নয়। রঞ্জুকে দেখতে চোখ ঘিন-ঘিন করে উঠবে, এ শাস্তি কেমন করে সহ্য করবেন সুজীবন? বুকের ভিতরে এখন হুইস্কির নেশার জ্বালা থাকলে চেঁচিয়ে বলে দিতে পারতেন সুজীবন--বুঝতে পারছো কি বড়দি ; চারু রায়ের মেয়ে আমার কী ভয়ানক ক্ষতি করে দিল? আজ রঞ্জুকে চোখে দেখতেও আমার ভয় করছে।

চুপ করে বসে শুধু দেখতে থাকেন সুজীবন, রঞ্জুর সঙ্গে গল্প করে করে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বড়দি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তাই রঞ্জুর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেয়ে ভিলা মাধবীর ইউকালিপটাসের পাতার মর্মরও শান্ত হয়ে গিয়েছে।

সুজীবন সেনও শান্ত হয়ে বসে থাকতে চাইছেন। কিন্তু পারলেন না। হঠাৎ চমকে উঠতে হলো। যেন ভিলা মাধবীর বুকটা ঝংকার দিয়ে হঠাৎ বেজে উঠেছে। পিয়ানো বাজছে।

উঠে দাঁড়ালেন সুজীবন সেন। এগিয়ে গেলেন। একটা ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলেন। দেখতেও পেলেন, সে ঘরের আলোর ওপর রঙিন শেড টেনে দেওয়া হয়েছে। বড়দি একটা কোচের উপর বসে আছেন। আর, দু-হাত চালিয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে রঞ্জু।

একফোঁটাও হুইস্কি খাননি সুজীবন সেন, চোখদুটোও লাল হয়ে ওঠেনি। তবু, বিনা নেশার চোখদুটোও যেন মাঝে মাঝে ভুল করে দেখে ফেলছে, রঞ্জু যে ঠিক সেই মানুষটারই মত বিহ্বল দুটো চোখ নিয়ে একমনে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। কিসের সুর বাজাচ্ছে রঞ্জু? ঠিক যে সেইরকমই একটা সোনাটা বলে মনে হয়।

ঘরটাকে একটা হেঁয়ালির ঘর বলে মনে হয়। দেখতে আশ্চর্য লাগে আর ভয় করে।

ঘেন্না করে আর ভাল লাগে। শান্তি পাওয়া যায়, আর ভয়ানক অস্বস্তি হয়। রঞ্জুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুজীবন, কিন্তু ঘরের ভিতরে আর ঢুকলেন না।

জীবু ঘরের ভিতর না এসে চলে গেল কেন? বড়দির মনে একটা খট্‌কা লেগেছে। দরজার পর্দার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর হঠাৎ ওভাবে একেবারে টলমল হয়ে চলে গেল জীবু ; স্টিফান কি আলমারির লুকোনো চাবিটা বের করে দিয়েছে? না, আলমারির কাচ ভেঙে দিয়ে বোতল বের করে ফেলেছে জীবু?

ছি-ছি, ডাক্তার এত করে বলে গিয়েছেন, ও-জিনিস এখন আর স্পর্শ না করাই ভাল ; নইলে শরীরের ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। জীবুর কি তবুও একটু ভয় হলো? একটুও না।

উঠলেন বড়দি ; এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেলেন. বারান্দার একটি চেয়ারে চুপ করে বসে আছে তার বাহান্ন বছর বয়সের দুরন্ত অবাধ্য ভাই, কিন্তু কী ভয়ানক দুঃখী ভাই।

কিন্তু সুজীবনের হাতে হুইস্কির গেলাস নেই। হাতদুটোকে শক্ত করে বুকের উপর চেপে ধরে যেন একটি সুকঠিন গ্র্যানাইট হয়ে বসে আছেন সুজীবন।

বড়দি—কি হলো জীবু!

সুজীবন—কিছু না।

বড়দি—এখানে এভাবে চুপ করে বসে আছ কেন? ও-ঘরে চল।

সুজীবন—না।

বড়দি—রঞ্জু কী সুন্দর মিষ্টি সুর বাজাচ্ছে, শুনবে চল।

সুজীবন—না।

বড়দি—রঞ্জুর সঙ্গে একটু গল্প করবে, চল।

সুজীবন—না।

বড়দি ডাকেন—রঞ্জু, এখানে এস।

সিল্কের শাড়ির আঁচল দুলিয়ে ছুটে আসে রঞ্জু।

বড়দি বলেন—বসো। তোমার কার্সিয়াংয়ের গল্প বল, শুনি।

রঞ্জু একটা চেয়ারে একটু বসে নিয়েই ছটফট করে উঠে দাঁড়ায়।—না, এখন গল্প করবো না। বাবার একটা ফটো তুলবো।

ক্যামেরা নিয়ে এসে সুজীবনের সামনে দাঁড়িয়েই রঞ্জু চেঁচিয়ে ওঠে। বুকের উপর থেকে হাতদুটো নামিয়ে দাও বাবা। বিশ্রী দেখাচ্ছে।

সুজীবনের হাতদুটো সেই মুহূর্তে কেঁপে ওঠে আর শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে।

রঞ্জু বলে—আঃ, ওরকম স্টিফ হয়ে বসে আছ কেন? চেয়ারের পিঠে গা হেলিয়ে দাও।

তখনি চেয়ারের কাঁধের উপর একটা হাত তুলে দিয়ে আর গা হেলিয়ে বেশ একটু কাত হয়ে বসেন সুজীবন।

রঞ্জু—পাইপটাকে ওরকম শক্ত করে খিমচে ধরে রয়েছো কেন? মুঠোটা ঢিলে করে দাও, একটু আলগা করে ধর।

পাইপটাকে বেশ আলগা করেই ধরে রইলেন সুজীবন। কঠোর গ্র্যানাইট যেন রঞ্জুর এক-একটা হুকুম আর ধমকের শব্দ শুনে চমকে উঠছে আর নরম কাদা হয়ে যাচ্ছে।

রঞ্জু বলে—এবার তাকাও, ক্যামেরার দিকে নয়। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক। ভাল করে চোখ খুলে তাকাও।

দুই চোখ অপলক করে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুজীবন। ক্যামেরা ক্লিক করেই এগিয়ে আসে রঞ্জু।—কাল সকালে তোমাকে তিব্বতী টুপিটা পরিয়ে লনের উপর তোমার একটা ফটো নেব।

--তুমি আমাকে কী পেয়েছো, রঞ্জু? আমি কি একটা খোকা? রঞ্জুর একটা হাত ধরে আর রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন সুজীবন।

রঞ্জু--তুমি একটি বোকা। সবসময় এত গম্ভীর হয়ে বসে থাক কেন?

বড়দি এতক্ষণ মুখ টিপে হাসছিলেন, এইবার একেবারে মুখ খুলে হেসে ওঠেন--খুব করে বল রঞ্জু, আরও বল ; সেনসাহেব একটু ভাল করে বুঝুন, মিছিমিছি এত গম্ভীর হয়ে থাকবার কোন মানে হয় না।

সুজীবন হাসেন--বেশ, কথা রইল, আর কোনদিন গম্ভীর হব না।

রঞ্জু--মনে থাকে যেন।

সুজীবন--নিশ্চয়।

রঞ্জু--আমি তাহলে এখন যাই, তুমি পিসির সঙ্গে গল্প কর।

সুজীবন--তুমিও এখানে বসো, দুচারটে বাঘের গল্প শোনো।

রঞ্জু--শুনবো ; কিন্তু নমিতাকে একটা চিঠি লিখে আসি।

সুজীবন--কে নমিতা?

রঞ্জু--কলকাতার নমিতা ; আমার বন্ধু। নমিতাও কনভেণ্টে পড়ে।

কলকাতার বন্ধু নমিতাকে চিঠি লিখতে বেশ দেরি হয়েছে রঞ্জুর ; তাই আর এই বারান্দাতে নয়, রাতের খাবারের টেবিলের কাছে বসে, খাওয়া শেষ হবার পরও প্রায় দু'টি ঘণ্টা ধরে বাঘের গল্প বললেন সুজীবন। টাউন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ছাড়োয়া জঙ্গলের বাঘ একবার সুজীবনের একটা সাইকেলকে একলা পেয়ে জঙ্গলের প্রায় তিন মাইল ভিতরে টেনে নিয়ে একটা কুলের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল।

রঞ্জুর হাসি থামে। দেয়ালের ঘড়িতে রাত এগারটার সঙ্কেতও টুং-টাং করে বাজতে থাকে। বড়দি বলেন--না, আর নয়। আজকের মত তোমার গল্প থামিয়ে রাখ জীবু।

আজও মাঝরাতে একবার ; আর শেষ রাতে একবার বিছানা থেকে নেমে পাইপ ধরিয়েছেন সুজীবন। কিন্তু সে-ঘরের খাটের বিছানাতে নয়, অন্য একটা ঘরের খাটে নতুন করে পাতা একটা বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছে। রাত জেগে সোফার উপর বসে থাকবার সুবিধে পাননি। বড়দি আগেই শাসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়দির শাসানীর জন্য নয়, রঞ্জুরই ভয়ে এই ঘরের ভিতরে ঢুকে এই নতুন বিছানায় গড়িয়ে পড়তে হয়েছে। বড়দি স্পষ্ট করে না বলেও বুঝিয়ে দিয়েছেন, রাত জেগে সোফার উপর বসে থাকলে হয়তো রঞ্জু নিজেই এসে ধমক দেবে। তখন তো রঞ্জুর কথা না শুনে পার পাওয়া যাবে না।

বড়দি ঘুমিয়ে আছেন, রঞ্জু ঘুমিয়ে আছে। উঁকি দিয়ে কেউ দেখছে না। শুধু এক ভিলা মাধবীর অন্ধকারটাই যেন দেখতে পাচ্ছে, সুজীবন সেনের পাইপের মুখটা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। সেই পুরনো জ্বালা জেগেই আছে। চারু রায়ের মেয়েকে ক্ষমা করতে পারবে না সুজীবন সেন।

বড়দির কাছ থেকে একটা কথা জানতে পেরে খুশি হয়েছেন সুজীবন, রঞ্জু কোনদিনও ওর মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। সুজীবনও তো নিজের চোখে দেখছে, আয়াবুড়িটা মরে গিয়েছে শুনে কত কেঁদেছিল রঞ্জু। কিন্তু চারু রায়ের মেয়েকে দেখতে না পেয়ে এই আট বছরের মধ্যে কোনদিন কাঁদেনি। শুধু সেই প্রথমবার কনভেণ্টে যাবার আগে বড়দিকে একবার শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল মা কবে আসবে?

নমিতা নামে একটি বন্ধু আছে রঞ্জুর। কিন্তু নমিতার কাছে কি কোনদিনও বলতে পেরেছে রঞ্জু, কোথায় ওর মা? নিশ্চয় বলতে হয়েছে, মা নেই--থেকেও না-থাকা এমন একটা ভয়ানক মাকে আরও ঘেন্না করতে শিখুক রঞ্জু।

হুইস্কির আলমারির চাবিটাকে খুঁজতে চেষ্টা করেন সুজীবন, কিন্তু খুঁজে পান না।

কিন্তু ভোরের আলোর ছোঁয়া লেগে ভিলা মাধবীর ইউকালিপটাসের কুয়াশা-ভেজা পাতা চিকচিকিয়ে উঠতেই সুজীবন সেনের এই রাত জাগা নিদারুণ ঘৃণার নীরব ধ্যান কোথায় যেন পালিয়ে গিয়ে আর মুখ লুকিয়ে পড়ে থাকে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও সুজীবন সেনের আর গম্ভীর হয়ে থাকবার সাধ্য হয় না। একটু আনমনা হবারও উপায় নেই। লনের চারদিকে ঘুরে ঘুরে রঞ্জুর সঙ্গে বেড়াতেই হয়। রঞ্জুর প্রত্যেকটি হাসির সঙ্গে হাসতে হয়। তিব্বতী টুপী মাথায় দিয়ে ফটো তুলতে হয়েছে। শুধু ছাড়োয়া জঙ্গলের বাঘের গল্প নয় ; পালামো জেলার জঙ্গলের বাইসন শিকারের গল্পও বলতে হয়েছে। ওই যে দেখা যাচ্ছে, খুব কাছেই, জোড়া পাহাড়ের একটা পাহাড়ের মাথায় অনেককাল আগের একটা বুরুজ দাঁড়িয়ে ; আছে তারই ভিতরে প্রকাণ্ড একটা সাপ মেরেছিলেন সুজীবন, প্রকাণ্ড একটা পাইথন।

প্রায় রোজই সকালে স্টিফান খানসামাকে রান্নার উপদেশ দিয়ে বড়দি কিচেনের বাইরে এসে দেখেছেন রঞ্জুর ফটো তুলছে জীবু। রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যামেরা ধরছে জীবু ; যেন দুটো মুগ্ধতার চোখ রঞ্জুর মুখটাকে দেখে দেখে অনেকদিনের অদেখার শোধ তুলছে। জীবু যেন একেবারে প্রাণের সাধ মিটিয়ে রঞ্জুর মুখটিকে দেখছে আর হাসছে। বাঃ, এক-এক সময় সন্দেহ হয় বড়দির, চারু রায়ের মেয়ের মুখের মধ্যে রঞ্জুর মুখের মিল আছে বলেই কি এত খুশির হাসি হাসছে সুজীবন? যেমন সুজীবনের রাগের, তেমনই সুজীবনের হাসিরও কোন তাল খুঁজে পাওয়া যায় না।

যাক, তবু ভাল। শুধু মনমরা হয়ে আর মুখভার করে একটা যুগ পার করে দেবার পর বড়দির ভাই জীবু আজ হাসছে। রঞ্জুকে দেখতে ভয় করবে, ইস্, কী সব অদ্ভুত কথা! কই, এখন ভয় করছে না? বড়দির মুখটাও শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে হাসতে থাকে।

মাদার মণিকা ঠিক তারিখেই দেখা দিলেন, আর ঠিক পরের দিনই রঞ্জুকে নিয়ে কার্সিয়ং চলে গেলেন। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা সিংহানির সড়ক ধরে বেড়িয়ে বাড়ি ফেরবার সময় আদিত্যবাবু বলেন—কই? ভিলা মাধবীতে আজ পিয়ানো বাজে না কেন? সেনসাহেবের মেয়ে কি চলে গেল?

ভিলা মাধবীর মাধবী নেই, তবু নামটা ভিলা মাধবী। আদিত্যবাবুর মত মানুষ, যিনি এখন ভাল করেই জানেন যে মাধবীলতা নয়, সেনসাহেবের মেয়ে রঞ্জিতাই এই একটা মাস পিয়ানো বাজিয়েছে, তিনিও বলেন—ভিলা মাধবী।

* * *

সুজীবন সেনের জীবনে আর কাজ নেই, শিকার নেই, হুইস্কিও নেই, শুধু আছে একটি অপেক্ষা, রঞ্জু আবার কবে আসবে?

এই অপেক্ষার তৃপ্তি হয়ে রঞ্জুও প্রতি বছরেই ঠিক সময়ে সুজীবন সেনের চোখের কাছে দেখা দেয়। দু-এক মাস থাকে তারপর চলে যায়। কনভেন্টের মিসেস ডি' সিলভা জানিয়েছেন, কোন চিন্তা করবেন না ; রঞ্জিতার জন্যে আমাদের যত্নের অন্ত নেই। রঞ্জিতা নিজেও ফুলের মত সুখী, হ্যাপি লাইক এ ফ্লাওয়ার।

হ্যাঁ, রঞ্জু এখন আর কনভেন্টের স্কুলের ছাত্রী নয়। স্কুলের পড়া কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে। রঞ্জু এখন কনভেন্টের স্কুলেরই একজন শখের শিক্ষিকা।

সুজীবন বলেছিলেন, তাই বড়দি কনভেন্টের মিসেস ডি'সিলভাকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছেন ঃ খুবই আনন্দের কথা, রঞ্জিতা এখন ফুলের মত সুখী, ফুলের জন্যে আপনাদের যত্নেরও অন্ত নেই। তবু বিশেষ অনুরোধ এই যে, ফুলের জন্যে আপনাদের একটু সাবধানতাও যেন থাকে। মনের কথাটা আপনাকে স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই ; রঞ্জিতা যেন নিজের ইচ্ছেতে কোন কাণ্ড না করে ফেলে। বিশ্বাস করি, কনভেন্টের মেয়েরা বাইরে

মেলামেশা করবার সুযোগ পায় না। আশা করি, আপনাদের যত্নের ফুল সবসময় শুধু আপনাদেরই কাছে থাকবে আর হাসবে। যতদিন না রঞ্জিতার বিয়ের ব্যবস্থা করছি, ততদিন রঞ্জিতাকে সাবধানে রাখবার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করবেন। ধন্যবাদ।

জ্ঞানবাবু দেখেছেন, সেনসাহেবের মাথাটা একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডাক্তার ঘোষ বলেছেন, সেনসাহেব প্রায় পাঁচ বছর হলো মদ ছেড়ে দিয়েছেন। তবে সেনসাহেবের এই বয়সেই মাথার সবটা সাদা হয়ে গেল কেন?

আদিত্যবাবু--এখনও তো ষাট হয়নি সেনসাহেবের।

জ্ঞানবাবু--না না, ষাট কেন হবে? পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বড় জোর সাতান্ন আটান্ন হবে।

আদিত্যবাবু--তাহলে মেয়েটিরও তো বেশ বয়স হয়েছে।

জ্ঞানবাবু--তেইশ চব্বিশ তো হবেই।

ঠিক হিসেবই করেছেন জ্ঞানবাবু। ক'দিন আগে রাঁচি থেকে বড়দির চিঠি পেয়েছেন সুজীবন সেন--রঞ্জুর বয়স চব্বিশে দাঁড়িয়েছে। এখন বিয়েটা দিয়ে দিলেই হয়। আর দেরি করা চলে না। দেরি করা উচিতও নয়।

বড়দির চিঠি পড়ে খুশি হতে পারেননি সুজীবন। কে বলছে দেরি করতে? সুজীবন তো এই পাঁচ বছরের প্রত্যেক বছরেই অন্তত তিন-চারবার বড়দিকে অনুরোধ করেছেন, রঞ্জুর জন্যে একটি পাত্র খুঁজে দাও। বড়দিও বলেছেন--খোঁজ করা হচ্ছে। কোন চিন্তা করো না। মণ্টু বলেছে, রেলওয়েতে বেশ ভাল চাকরি করে, চমৎকার একটি ছেলে আছে।

সুজীবনও তাই বেশ একটু বিচলিত ভাষায়, বড়দির চিঠির জবাব দিয়ে দিলেন।--আমার তো অস্ত যাবার সময় হয়ে এল, বড়দি। আমি আর এখানে এ-বাড়িতে থাকতে চাই না। সিমলা স্যানাটোরিয়ামে টাকা জমা করে দিয়েছি। যত তাড়াতাড়ি পারি সেখানে চলে যেতে চাই। কিন্তু তার আগে রঞ্জুর বিয়েটা হয়ে গেলেই হয়? তুমি যে বলেছিলে মণ্টুর চেনা খুব ভাল একটি ছেলে আছে--সেই ছেলের সঙ্গে রঞ্জুর বিয়ে ঠিক করে ফেললেই তো হয়।

সুজীবনের চিঠি পড়ে কেঁদে ফেললেন বড়দি ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাবও দিয়ে দিলেন--হ্যাঁ, বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছে।

বড়দির চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছেন সুজীবন। কিন্তু একটু চমকেও উঠেছেন। চিঠিটাকে একটা হঠাৎ আশ্চর্যের বার্তা বলে মনে হয়। একদিনের মধ্যেই কেমন করে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেললেন বড়দি?

ঠিক দু'দিন পরে বড়দির গাড়িটাও হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে রাঁচি থেকে ছুটে এসে ভিলা মাধবীর লনের কাছে থামে। বড়দি এসেছেন। দেখতে পেয়ে সুজীবন সেনের চোখদুটো চমকে ওঠে। আসবার আগে টেলিফোনে একটা খবরও দেননি বড়দি। বড়দির এই হঠাৎ আবির্ভাবও যেন একটা হঠাৎ-বিস্ময়ের আগমন।

সুজীবন এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বড়দিকে ধরে গাড়ি থেকে নামালেন।--তুমি এত হাঁপাচ্ছো কেন বড়দি?

বড়দির শরীরটা বেশ কুঁজো হয়ে গিয়েছে। বেশ চেষ্টা করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বড়দি।--হাঁপাবার বয়স হয়েছে জীবু, আমি যে তোমার চেয়ে পনেরো বছরেরও বড়।

ভাইয়ের হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকেন বড়দি ; বারান্দায় উঠেই একটা কোচের উপর বসে পড়েন। নিজের গাড়িতে বসে রাঁচি থেকে আসতেই কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বড়দি।

কিন্তু ক্লান্তির কথা তুলে সুজীবনের সঙ্গে গল্প করবার জন্য বড়দি আসেননি। যে কথাটা বলতে এসেছেন, সেই কথাটাই বলে দিলেন।--রঞ্জুর বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গিয়েছে। তুমি এবার এদিকের সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেল।

সুজীবন--রেলওয়েতে কাজ করে, সেই চমৎকার ছেলেটির সঙ্গেই কি...।

বড়দি--না। সে ছেলে নয়। এ ছেলে হলো রঞ্জুরই বন্ধু নমিতার দাদা দেবাশিস বসু। দেবাশিসের বাবা কলকাতায় একজন স্টিভেডোর। দেবাশিস হলো অটোমোবিল এঞ্জিনিয়ার। দেখতে সুন্দর। স্বাস্থ্য ভাল।

সুজীবন--এ ছেলের খোঁজও কি মণ্টু দিয়েছে?

বড়দি--না। খোঁজ হঠাৎ পাওয়া গেল। যাই হোক, ছেলে যে খুবই ভাল, তাতে একটুও সন্দেহ নেই।

বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুজীবন। সুজীবনের চোখের পাতা যেন থরথর কাঁপছে। যে চোখে অনেকদিন হলো কড়া হুইস্কির নেশার কোন জ্বালা ফুটে ওঠেনি, সেই চোখ লালচে হয়ে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। চেঁচিয়ে ওঠেন সুজীবন।--রঞ্জু নিজেই বোধহয় খোঁজ দিয়েছে।

বড়দি--হ্যাঁ।

সুজীবন--ভালবাসা হয়েছে?

বড়দি--হ্যাঁ।

সুজীবন--কার ইচ্ছেতে এ ব্যাপার হলো?

বড়দি--নমিতা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, রঞ্জুর ইচ্ছে। তাই দেবাশিস রাজি হয়েছে।

সুজীবন--কবে থেকে এ ব্যাপার চলছে?

বড়দি--নমিতা লিখেছে, প্রায় তিন বছর হলো।

সুজীবন--কবে কোথায় কেমন করে দেবাশিসের সঙ্গে দেখা হলো?

বড়দি--কনভেন্ট থেকে ছুটির সময় নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে যে-ট্রেনে কলকাতায় ফিরতো দেবাশিস, সেই ট্রেনেই রঞ্জুর সঙ্গে দেবাশিসের চেনা-শোনা হয়েছে।

সুজীবন--তারপর?

বড়দি--দেবাশিসের কাছে অনেক চিঠি লিখেছে রঞ্জু। কাজেই...।

সুজীবন--কি?

বড়দি--ছেলেটিও যখন শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে, তখন তো আর কোন সমস্যা নেই।

সুজীবন--বেশ চমৎকার গল্প শোনালে বড়দি। বাঃ! মায়ের কীর্তিতে আর মেয়ের কীর্তিতে একটুও অমিল নেই। তুমিও কি ভুলে গিয়েছ যে, চারু রায়ের মেয়ে একদিন একটা ট্রেনের কামরাতে সুজীবন সেনকে দেখে আর আলাপ করে, তারপর ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড ভালবাসা জমিয়ে ফেলেছিলেন।

সারা গায়ে যেন আগুন লেগেছে, ছটফট করে উঠে দাঁড়ান সুজীবন। চেয়ারটার গায়ে একটা লাথি মেরেই সরে যান। ঘরের ভিতর ঢুকে টেবিলের ফুলদানিটা তুলে নিয়ে আলমারির কাচের উপর আছাড় মারেন। ঝনঝনিয়ে আর্তনাদ করে আর টুকরো-টুকরো হয়ে আলমারির কাচ ঘরের মেঝের কার্পেটের উপর ছড়িয়ে পড়ে। চিৎকার করেন সুজীবন।---স্টিফান গেলাস দিয়ে যাও।

কিন্তু আলমারির কোথাও কোন হুইস্কির বোতল নেই। খানসামা স্টিফানও ভয়ে ভয়ে দূরে সরেই থাকে, কাছে আসে না। বড়দি দুই হাতে মুখ ঢেকে বারান্দার কোচের উপর অনড় হয়ে বসে থাকেন, আর হাঁপাতে থাকেন।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আবার বড়দির সামনে দাঁড়িয়ে যেন টলতে থাকেন সুজীবন।--খুব ভাল কথা বলেছ, বড়দি। যখন নিজেই ইচ্ছে করে ভালবেসে বিয়ে করছে রঞ্জু, তখন আর কোন সমস্যাই থাকতে পারে না। শুধু একদিন স্বামীর সঙ্গে রোম বেড়াতে যাবে, তারপর ফিরে এসেই স্বামীকে ছাড়বে। আর ওই হতভাগা দেবাশিস সারা জীবন অপমানের

জ্বালায় জ্বলবে।

বড়দির চোখ-ঢাকা দুই হাত ভিজে গিয়েছে। তবু হাত সরিয়ে নেন না বড়দি।

সুজীবন--তুমি কাঁদলে হবে কি? চারু রায়ের মেয়ে যে শুনতে পেলে হেসে হেসে লুটিয়ে পড়বে।

বড়দি--তুমি এখন একটু চুপ কর জীবু।

সুজীবন--আমি একেবারেই চুপ হয়ে যাব বলেই কয়েকটা কথা বলে নিচ্ছি, শুনতে চাও তো শোন।

বড়দি--বল।

সুজীবন--মণ্টুকে এখানে এসে রঞ্জুর বিয়ের ব্যবস্থা করতে বল। আমি ওর মধ্যে নেই।

বড়দি--না থাকলে চলবে কেন?

সুজীবন--না। আমি চলে যাব।

বড়দি--তা হয় না।

সুজীবন--হতে হবে। এমন বিয়ে দেখতে আমার ভয় করবে। এমন বিয়ের আসরে থাকতেও আমার ঘেন্না করবে।

বড়দি--এখনই কেন উতলা হয়ে ওসব বাজে কথা ভাবছো?

সুজীবন--আমি হুইস্কি খাইনি, বড়দি। বাজে কথা ভাবছি না, বলছিও না।

বড়দি--রঞ্জুর ওপর তুমি নিষ্ঠুর হতে পারবে না।

সুজীবন--না পারি, পারবো না ; কিন্তু রঞ্জুকে ক্ষমা করতেও পারবো না।

বড়দি--এমন ভয়ানক কথা বলো না। রঞ্জুকে ক্ষমা করে দাও।

সুজীবন--তা হয় না, বড়দি। ওর মাকে আমি এজীবনে ক্ষমা করতে পারিনি, পারলাম না, পারবোও না। রঞ্জুকেই বা ক্ষমা করবো কেন? রঞ্জু যে সেই রাক্ষুসীটারই রক্তের বিষ। কথা নেই, বার্তা নেই, ফট্ করে এক ভদ্রলোকের ছেলেকে ভালবেসে বসে আছে। ছেলেটার জন্যে আমার দুঃখ হয়, বড়দি। আজ বেচারার একটু সন্দেহ করবারও সাধ্যি নেই যে, একদিন ওকে একটা সুজীবন হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

বড়দি এবার রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠেন।--চুপ কর জীবু।

সুজীবন--হ্যাঁ, চুপ করতেই হবে। রঞ্জু শেষ পর্যন্ত ওর মায়ের পক্ষেই চলে গেল। চারু রায়ের মেয়ে আজ বিনা মামলাতেই আমাকে হারিয়ে দিল। আমার আর কিছু বলবার নেই। শুধু শেষ কথাটি বলে দিচ্ছি ; রঞ্জুর বিয়ে তোমরা দেখবে, আমি দেখবো না।

* * *

ভিলা মাধবীর কয়েকটা ঝাউয়ের মাথায় মাকড়সার জাল ঝুলছে। সকালবেলার প্রথম রোদে কুয়াশা যখন গলে যায়, তখন ওই মাকড়সার জাল থেকে ছোট-ছোট জলের ফোঁটা চিকচিক করে কেঁপে ঝরে পড়ে।

কিন্তু মালী চমনরাম আর দেরি করেনি। ঝাউয়ের গায়ে মই লাগিয়ে উপরে উঠেছে আর লম্বা বাঁশের খোঁচা দিয়ে দিয়ে মাকড়সার সব জাল ছিঁড়ে মুছে আর সরিয়ে ঝাউগুলিকে ছিমছাম করে দিয়েছে।

মজুর লাগিয়ে বাগানের শুকনো পাতা রোজই ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়ে আর দূরের পাঁচিলের এককোণে জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে মালী চমনরাম। লনের ঘাস আর যত ফুলগাছের ঝাড় নতুন করে ছেঁটে দিয়েছে। বাগানটাও পরিচ্ছন্ন হয়ে হাসছে। উৎসব আসন্ন, আর সাতটা দিনও বাকি নেই। ভিলা মাধবীও তাই খুব তাড়াতাড়ি করে তৈরি হয়ে নিচ্ছে।

বেয়ারা শুকদেও খুব ব্যস্ত। লোক লাগিয়ে এত বড় বাড়িটার সব দরজা-জানলার কপাট খড়খড়ি আর শার্সি ঘসামোছা করিয়েছে শুকদেও। সব কার্পেটের ধুলো মুছে নেওয়া হয়েছে।

এরই মধ্যে রাঁচি থেকে মণ্টু একবার এসেছে আর টাউনের অনাদিবাবুকে ডেকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আবার রাঁচি চলে গিয়েছে। বাগানের ভিতরে একটা রঙিন সামিয়ানা তুলবেন অনাদিবাবু ; আর চমৎকার করে ফুল, আলো আর সিল্কের ঝালর দিয়ে সাজিয়েও দেবেন।

ভিলা মাধবীর ইউকালিপটাস রোজ বিকেলের বাতাসে আস্তে আস্তে মাথা দোলায়। বিকেলের পাখিগুলি গাছের পাতার ঝুরু ঝুরু শব্দের সঙ্গে ফুর্তি মিশিয়ে দিয়ে আর ডাকাডাকি করে উড়তে থাকে।

বড়দি তো আগে থেকেই আছেন।

বড়দির টেলিগ্রাম পেয়ে এলাহাবাদ থেকে মণ্টুর শ্বশুর বিনয়বাবু এসে পড়লেন। রঞ্জু এখন বড়দির রাঁচির বাড়িতেই আছে। মণ্টুর বউ শোভা আর রঞ্জু একসঙ্গেই আসবে।

যা ব্যবস্থা করা দরকার তার সবই বড়দির সঙ্গে পরামর্শ করে বিনয়বাবু যথাসাধ্য করেছেন। ব্যবস্থা হয়েছে, কলকাতা থেকে যারা আসবে তারা জোন্স সাহেবের দিলখুশা ক্লাবের গেস্ট-হাউসে থাকবে। ওরা তো মাত্র সাতজন। দেবাশিস আর নমিতা ; দেবাশিসের এক কাকা আর চারজন বন্ধু। কার্সিয়াং থেকে মিসেস ডি'সিলভাও আসবেন।

বড়দি বলেছেন টাউনের অনেককেই নিমন্ত্রণ করা হোক। বিনয়বাবু তাই বার লাইব্রেরির সবাইকে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। রেজিস্ট্রার গুপ্তবাবু শুধু একা আসবেন না ; তাঁর বাড়ির মেয়েরাও সবাই আসবেন।

ভিলা মাধবীর এত ব্যস্ততার মধ্যে শুধু একটি অলস উদাস স্তব্ধতা এককোণে একেবার নীরব হয়ে পড়ে আছে। একটি ঘরের ভিতরে কোচের উপর চুপ করে বসে থাকেন সুজীবন সেন। এক হাতে পাইপ, আর এক হাতে শিকারের একটা পত্রিকা। হিমালয়ের স্নো-লেপার্ডের জীবনের গল্প খুব মন লাগিয়ে আর চোখে পুরু কাচের চশমা লাগিয়ে রোজই পড়ছেন সুজীবন সেন।

ওই পুরু কাচের চশমার ভারেই যেন সুজীবনের ঘাড়টা নুয়ে গিয়েছে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। সুজীবন সেনের ওই শরীরে একটু টান হয়ে দাঁড়াবারও শক্তি যেন আর নেই। কোচের উপর বসে আছেন যেন তিন ভাগ হয়ে ভেঙে পড়ে রয়েছেন সেই সুজীবন সেন, একদিন যাঁর চেহারাকে একজন মিলিটারী জেনারেলের মত স্মার্ট চেহারা বলে মনে করেছিল কলেজের সায়েন্সের ছেলেরা।

ক'দিন আগে চলে যাবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন সুজীবন। কিন্তু মণ্টুর শ্বশুর বিনয়বাবু অনেক করে বুঝিয়েছেন বলেই আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন। বেশ মিনতি করে বুঝিয়েছেন বিনয়বাবু।—আপনি অন্তত বিয়ের দিনটা পর্যন্ত থাকুন সুজীবনদা ; নইলে লোকের চোখে ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে। আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না, কিচ্ছুই দেখতে হবে না, আপনি যেমন বসে আছেন তেমনই শুধু বসে থাকুন।

তাই বসে আছেন সুজীবন সেন। তাঁর কাছে আজ এই ভিলা মাধবী যেন তকতকে ঝকঝকে একটি জেলবাড়ি, তারই একটি আবছায়াময় কুঠুরির ভিতরে পনের বছরের শাস্তির মেয়াদ-খাটা একটি বুড়ো কয়েদির মত খালাস পাওয়ার দিনটির অপেক্ষায় বসে আছেন। সত্যিই, সুজীবনের এই ঘরের জানলার পর্দা সব সময়েই টানা থাকে ; বাইরের আলো-বাতাস হু হু করে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে না।

বড়দির গাড়িটা রাঁচি থেকে ছুটে এসে যখন লনের কাছে থেমেই হর্ণ বাজিয়ে ভিলা মাধবীর বাতাসে একটা খুশির সাড়া জাগিয়ে তোলে, তখন বড়দির বুকটা দুর দুর করে কাঁপতে থাকে। জানেন বড়দি, কারা এসেছে। ঘণ্টা তিন আগে রাঁচি থেকে ফোন করেছিল মণ্টুর বই শোভা—আমরা রওনা হচ্ছি।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসছে মণ্টুর বউ শোভা, মণ্টুর ছেলেটা ; আর রঞ্জু।

মিসেস ডি'সিলভা অনেকবার খুশি হয়ে যে-কথাটা চিঠিতে লিখতেন, সেটা একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য একটি কথা। রঞ্জুর মুখের দিকে একবার তাকালেই বুঝতে আর বাকি থাকে না, মেয়েটা সত্যিই ফুলের মত সুখী, হ্যাপি লাইক এ ফ্লাওয়ার। চব্বিশ বছর বয়সের মেয়ে ; ওর ভালবাসার আশা ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। ওর স্বপ্ন যাকে কামনা করেছে, তাকেই জীবনে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ভগবান জানেন, এর মধ্যে কী ভুল থাকতে পারে।

বড়দির কাছে এসেই জিজ্ঞেস করে রঞ্জু--বাবা কোথায়, পিসি?

বড়দি--ওঘরে আছে। কিন্তু...।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন বড়দি, কিন্তু বলা হলো না। রঞ্জু ওর মুখের ওই ফোটা ফুলের হাসি উথলে দিয়ে ছুটে চলে গেল।

সুজীবনের কাছে এসে দাঁড়ায় রঞ্জু। সুজীবনের হাতের পত্রিকাটাকে সুজীবনের হাত থেকে একটান দিয়ে তুলে নেয় রঞ্জু।--এখনও স্নো লেপার্ডের ছবি দেখছো? দেখছো না, আমি এসেছি?

সুজীবনের মুখের দিকে আর-একবার তাকিয়েই চমকে ওঠে রঞ্জু--কী হলো? তুমি এত গম্ভীর কেন, বাবা?

সুজীবন বলেন--তুমি এখন তোমার পিসির কাছে গিয়ে বসো। আমাকে একা থাকতে দাও।

--কি বললে? সুজীবনের কাঁধের উপর হাত রেখে আস্তে একটা ঠেলা দেয় রঞ্জু।--তুমি বলেছিলে না, কখ্খনো গম্ভীর হবে না?

রঞ্জুর চোখদুটো যেন ভয়ানক বিস্ময়ের খোঁচা লেগে একটা ব্যথা পেয়েছে ; আর গলার স্বরেও একটা অভিমানের করুণ সুর বেজে উঠেছে।

বড়দি ঘরের ভিতরে ঢুকেই রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে কথা বলেন।--ভুল করছো রঞ্জু। জীবুর সঙ্গে ওভাবে কথা বলো না। জীবুর শরীর খুব খারাপ।

সুজীবনের একটা হাত শক্ত করে ধরে রঞ্জু,--তাই তো দেখছি, পিসি। তোমার শরীর এত খারাপ হয়ে গেল কেন, বাবা?

বড়দি--আমার কথা শোন, রঞ্জু ; জীবুকে এখন এভাবে বিরক্ত করে কথা বললেই তো ওর শরীর ভাল হয়ে যাবে না।

সুজীবনের হাত ছেড়ে দিয়ে রঞ্জু এবার সুজীবনের কানের কাছে মুখ এগিয়ে খুব মৃদুস্বরে কথা বলে--আচ্ছা, আমি এখন যাই, কেমন? পরে আসবো।

সারা দুপুর, সারা বিকেল, আর সারা সন্ধ্যা ; রঞ্জু বারবার বড়দিকে শুধু দু'টি কথা জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করেছে।--বাবা এত গম্ভীর কেন, পিসি? বাবার শরীর হঠাৎ এত খারাপ হয়ে গেল কেন, পিসি?

বড়দি বলেন--ভগবানের হাত ; তুমি আর আমি কি করতে পারি বল?

রঞ্জু--কিন্তু আমার যে একটুও ভাল লাগছে না। কিছুই ভাল লাগছে না।

বড়দি--তুমি মন খারাপ করো না।

সন্ধ্যাবেলা লনের কাছে বসে রঞ্জুকে একটা কথা নিজেই ইচ্ছে করে বলে দিলেন বড়দি। --জীবুর এখন সিমলা স্যানাটোরিয়ামে চলে যাবার কথা। ওখানে থাকলেই শরীর ভাল হয়ে যাবে। এতদিনে চলেও যেত। কিন্তু তোমার বিয়ের দিনটা পর্যন্ত থাকা উচিত বলেই এখনও এখানে আছে।

কথা বলতে গিয়ে রঞ্জুর গলার স্বর উদাস হয়ে যায়।--সবই কেমন যেন হয়ে গেল, পিসি।

বড়দি--তুমি দুঃখ করো না। আর, তোমার বাবাকেও কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না।

দেখছো না, আমিও ওর সঙ্গে খুব কম কথা বলছি। কেউ কোন কথা বললে আজকাল ওর খুব অস্বস্তি হয়।

পিসির এই উপদেশ মনে রেখেছে রঞ্জু। রোজই সকালে একবার, আর সন্ধ্যেবেলা একবার সুজীবনের ঘরে ঢুকে, সুজীবনেরই পাশে কোচের উপর চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে রঞ্জু। তারপর চলে যায়।

কিন্তু, কি আশ্চর্য! পিসির যেন তাতেও আপত্তি।--বারবার জীবুর কাছে গিয়ে ওভাবে বসে থেকো না রঞ্জু। জীবুর অস্বস্তি হয়।

পিসির এই উপদেশ যেন একটা নির্মম মিথ্যের উপদেশ। রঞ্জু গিয়ে সুজীবনের পাশে কোচের উপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলে অস্বস্তি বোধ করবেন সুজীবন, এমন ভয়ানক বিস্ময় সহ্য করতে রাজি নয় রঞ্জু। রঞ্জু বেশ স্পষ্ট করেই বলে দেয়।--তা হয় না, পিসি। ওতে বাবার কোন অস্বস্তি হতেই পারে না। অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না। রুমাল তুলে বার বার চোখ মুছতে থাকে রঞ্জু।

বড়দিও আর কথা বাড়িয়ে রঞ্জুর সঙ্গে তর্ক করতে চান না। চুপ করেই থাকেন। জানেন বড়দি, এই তো আর মাত্র একটা দিন। রঞ্জুকে আর এই নিষ্ঠুর উপদেশের কথাটা বলতে হবে না।

সকালবেলাতেই খবর দিলেন বিনয়বাবু--ওরা সবাই এসে গিয়েছে। মিসেস ডি'সিলভাও এসেছেন। দিলখুশা ক্লাবের গেস্টহাউসের ব্যবস্থাও খুব ভাল হয়েছে। দেবাশিস ওর বন্ধুদের নিয়ে লেক দেখতে বের হয়েছে। নমিতা বলেছে, সন্ধ্যার পর সবাইয়ের সঙ্গে আসবে নমিতা; আগে আসতে একটু অসুবিধে আছে।

বড়দি--তা নমিতা একটু আগে না এলেও চলবে। শোভা তো আছে, রঞ্জুকে সাজিয়ে দিতে পারবে।

সন্ধ্যা হতেই শোভা এসে রঞ্জুকে একটা ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়ে যায়। শোভা কিন্তু অনেক চেষ্টা করে আর সাধাসাধি করেও রঞ্জুকে খুব বেশি সাজাতে রাজি করাতে পারলো না। রঞ্জু বলে--না বউদি। একটা নতুন শাড়ি পরেছি, এই যথেষ্ট। রং-টং মাখতে পারবো না।

শোভা আশ্চর্য হয়।--কেন?

--আমার ভাগ্য। বাবার মুখে হাসি নেই।

--ওর তো শরীর খারাপ।

--সেইজন্যেই তো বলছি; বেশি সাজাসাজি করবার মানে হয় না। ভাল দেখায় না।

ভিলা মাধবীর গেট দিয়ে এক-একটি গাড়ি ঢুকছে আর লনের পাশে থামছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা একে একে আসতে শুরু করছেন। মণ্টু ওদিকে ব্যস্ত আছে।

ভিলা মাধবীর বাগানে সামিয়ানার তলায় চেয়ার-পাতা আসর রঙিন আলোতে ঝলমল করছে। অনাদিবাবু সত্যিই বেশ সুন্দর করে আসর সাজিয়েছেন। যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে, সেখানে মস্ত বড় একটা কার্পেট পাতা হয়েছে। কার্পেটের চারিদিকে আলো আর ফুলের স্তবকের একটা ঘেরান দিয়েছেন অনাদিবাবু।

বিনয়বাবু কিন্তু একটু উদ্বিগ্ন হয়েছেন, তাই একটি ঘরের ভিতরে বড়দির সঙ্গে কথা বলছেন।--সুজীবনদা বলছেন, উনি সই-টই করতে পারবেন না।

বড়দি--তাতে অবিশ্যি বিয়ে ঠেকে থাকবে না। আপনি আছেন, মণ্টু আছে, মিসেস ডি'সিলভাও থাকবেন; তিন সাক্ষীর সই থাকলেই বিয়ে হয়ে যাবে।

বিনয়বাবু দেখতে পাননি, বড়দিও না, ঘরের দরজার পর্দার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জু।

তাই বিনয়বাবু বেশ গলা খুলেই কথা বলেন আর আক্ষেপ করেন।--কিন্তু সুজীবনদা বিয়ের আসরে এসে একবার বসবেনও না, এটা কেমন কথা?

বড়দি--জীবু কি তাই বলছে?

বিনয়বাবু--হ্যাঁ। আমি তো আমার সাধ্যমত অনেক অনুরোধ করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বুঝলেন না। রাজি হলেন না।

বড়দি--থাক তবে। জীবুকে আর ঘাঁটাবেন না। কোন লাভ হবে না।

বিনয়বাবু--কিন্তু...।

বড়দি--না। ঘা খাওয়া মানুষ, পনেরটা বছর ধরে ওর মন জ্বলছে আর পুড়ছে। চারু রায়ের মেয়েকে এখনও জীবু যে কী ভয়ানক ঘেন্না করে, সেটা আমি দেখেছি, আপনারা দেখেননি।

বিনয়বাবু--কিন্তু সেজন্যে নিজের মেয়ের বিয়ের ওপরেও রাগ করে আর অখুশি হয়ে...।

বড়দি--বুঝতে ভুল করছেন। চারু রায়ের মেয়ে ঠিক যেমনটি নিজে ইচ্ছে করে জীবুকে ভালবেসেছিল আর বার বার চিঠি লিখে জীবুকে আশ্চর্য করে দিয়েছিল, রঞ্জুও যে ঠিক তাই করেছে। দেখলেন তো, চারু রায়ের মেয়ের সে ভালবাসা কি সাংঘাতিক একটা মিথ্যে। একটা মানুষকে অপমান করে মেরে রেখে দিয়ে কোথায় সরে পড়লো।

বিনয়বাবু হাসতে চেষ্টা করেন।--ওটা একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা মাত্র। সবাই কি আর চারু রায়ের মেয়ের মত...।

বড়দি--সেটা আমরা বুঝি বিনয়বাবু। কিন্তু যে মানুষ ঘা খেয়েছে, অপমানে পুড়েছে, ভালবাসার জঘন্য কাণ্ড দেখে যার বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছে, সে কি করে আজ খুশি হবে? জীবু যে খুব আশা করেছিল, রঞ্জু ওর মায়ের মত হবে না। যাই বলুন আপনি, আর আমিও জীবুর গোঁয়ার্তুমিকে যতই নিন্দে করি, আমিও তো দেখছি, আজ পর্যন্ত যা হয়েছে, আর যা করলো রঞ্জু, সবই ঠিক মায়েরই মত। দেখতেও ঠিক মায়ের মত ; ভালবাসাবাসি করলো ঠিক ওর মায়েরই মত। এরপর, অবিশ্যি ভগবান না করুন...।

দরজার পর্দা সরিয়ে রঞ্জু বলে ওঠে।--আর বলতে হবে না, পিসি। দুঃখ করো না। কোন চিন্তাও করো না!

চলে যায় রঞ্জু।

বিনয়বাবু চমকে ওঠেন। আর বড়দির চোখদুটো ভয় পেয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপরেই কাঁদতে থাকেন আর ডাকতে থাকেন বড়দি--রঞ্জু, রঞ্জু, একবার আমার কাছে এসে একটা কথা শুনে যাও।

রঞ্জু আসে না। বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বড়দির কান্নার চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে।--এ কী বিপদ ডেকে আনলাম, বিনয়বাবু! রঞ্জু কোথায় গেল?

বিনয়বাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জবাব দেন--সুজীবনদার ঘরে। কিন্তু আপনি বিচলিত হবেন না। আপনি বরং বারান্দায় এসে শান্ত হয়ে বসে থাকুন। ভদ্রলোকেরা আসতে শুরু করেছেন।

বুকের ভিতরে দুঃসহ একটা অপরাধের জ্বালা নিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে থাকেন বড়দি। শান্ত হয়ে থাকতেই চেষ্টা করেন।

বিনয়বাবু এসে বলে গেলেন, রেজিস্ট্রার গুপ্তবাবু এসে গিয়েছেন।

গুপ্তবাবুর বাড়ির মেয়েরাও গাড়ি থেকে নামছে। বড়দি তার উতলা মনটাকে প্রাণপণে সংযত করে ডাকতে থাকেন--ও শোভা, কোথায় তুমি?

মন্টুর বউ শোভা ততক্ষণে নিজেই এগিয়ে গিয়ে গুপ্তবাবুর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে।

ভিলা মাধবীর ঝাউ আর ইউকালিপটাস দুলছে। মন্টুর ছেলেটা এলোপাথাড়ি হাত চালিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। হর্ণ বাজিয়ে আর ভিলা মাধবীর গেটের উপর আলো

ছড়িয়ে দিয়ে এক-একটি গাড়ি ঢুকছে।

মন্টু এসে ব্যস্তভাবে কথা বলে--সবাই এসে গিয়েছে। দিলখুসা ক্লাব থেকে আর কারও আসতে বাকি নেই। দেবাশিস আর ওর বন্ধুরা চা খাচ্ছে। দেবাশিসের কাকা বাবার সঙ্গে গল্প করছেন।

বউদি--বেশ তো, তুমিও এখন ওদিকেই থাক। এদিকে একটু দেরি আছে।

মন্টু--কিন্তু নমিতা আর মিসেস ডি'সিলভা রঞ্জুর কাছে একবার আসত চাইছেন। কোথায় রঞ্জু?

বড়দির গলার স্বর কাঁপে।--জীবুর কাছে বসে আছে।

মন্টু--কাঁদছে নাকি?

বড়দি--তাই তো মনে হচ্ছে।

মন্টু--এখন কাঁদতে বারণ করে দাও। ওসব পরে হবে।

বড়দি--দেখি। কিন্তু তোমরা এত তাড়াহুড়ো করো না, মন্টু।

মন্টু চলে যেতেই, বড়দি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বুকভরা আতঙ্কের ভার সামলাতে গিয়ে টলে ওঠেন। দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আর খুব আস্তে আস্তে হেঁটে সুজীবনের ঘরের দরজার কাছে এসেই পর্দা সরিয়ে ডাক দিলেন বড়দি--রঞ্জু, এস।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় রঞ্জু--যাচ্ছি, পিসি।

হাসছে রঞ্জু ; সুজীবনের হাতের উপর হাত রেখে বসে আছে। কে জানে এতক্ষণ ধরে সুজীবনের সঙ্গে কী কথা আর কত কথা বলে নিয়েছে মেয়েটা। বড়দির চোখদুটো শুধু আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে। জীবু কিন্তু তেমনই গম্ভীর হয়ে আর চুপ করে একটা অবিচল পাথরের মত বসে আছে।

রঞ্জু বলে--তুমি বিশ্বাস কর বাবা, আমি তোমার চেয়েও বেশি ঘেন্না করি।

উঠে দাঁড়ায় রঞ্জু। ঘরের বাইরে এসেই বড়দির দিকে তাকিয়ে আর একটা হাঁপ ছেড়ে হেসে ফেলে।--বিয়ে হবে না পিসি।

বড়দি নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে পড়ে যেতেন। রঞ্জু হাত বাড়িয়ে বড়দির একটা হাত ধরে ফেলে।

বড়দিকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বারান্দার চেয়ারের উপরে বসিয়ে দিয়েই রঞ্জু বেশ শান্তভাবে কথা বলে--বউদির বাবাকে বলে দাও, বিয়ে হবে না। যদি দরকার হয়, তবে আমি সবারই কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব।

বড়দি--পাগলের মত কথা বলো না, রঞ্জু।

রঞ্জু--না পিসি। এত লজ্জা আর এত ভয় নিয়ে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

রঞ্জু, আমার কথা শোন।--কাঁদতে থাকেন বড়দি। ভদ্রলোকের ছেলেকে এভাবে অপমান করো না।

রঞ্জু--দশ বছর পরে তাকে অপমান করে মেরে ফেলার চেয়ে এখনই শুধু এক কথায় সামান্য একটু আশ্চর্য করে দিয়ে সরিয়ে দেওয়াই ভাল।

বড়দি--না না রঞ্জু, নিজেকে মিছিমিছি এত গালমন্দ করো না। তুমি লক্ষ্মীমণি, তুমি সুজীবন সেনের মেয়ে, তুমি প্রশান্ত সেনের মত মানুষের নাতনি। তুমি কেন নিজেকে এমন ভয়ানক অবিশ্বাস করবে?

দুহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে রঞ্জু।--সব বুঝেও কিছুই বুঝতে পারছি না, পিসি।

রঞ্জুকে জড়িয়ে ধরেন বড়দি--তুমি তো মা-মরা মেয়ে। আমরা তোমাকে মানুষ করেছি। আমরা যা, তুমিও তা। সেই জঘন্য অবিশ্বাসের মানুষটার সঙ্গে তো তোমার কোন সম্পর্কই নেই।

—সত্যিই ট্রেসপাস করেছি। মাপ করবেন। বারান্দার সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন এই অদ্ভুত কথাটা বলে উঠেছে। চোখে কম দেখেন বড়দি, তাই চোখ টান করে তাকিয়ে থাকেন আর চিনতে চেষ্টা করেন।

কথা বলেছেন সিংহানি হোটেলের রেবা মাসিমা। সাদা ধবধবে আদ্দির পাড়ছাড়া শাড়ি, পায়ে সাদা জুতো, মাথার খোঁপাটা একটা ধবধবে সাদার স্তবক ; রেবা মাসিমা বেশ করুণভাবে হেসে-হেসে কথাটা বলেছেন।

রেবা মাসিমার ঠিক পিছনে আরও একজন দাঁড়িয়ে আছেন। এক প্রৌঢ়া মহিলা। চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি, সাদা লেসের ব্লাউজ, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, আর পায়ে ধূসর শামোয়ার জুতো।

বড়দির দিকে তাকিয়ে রেবা মাসিমা আবার হাসতে চেষ্টা করেন।—আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন বলেই আপনার কাছে এসে কথাটা বলতে চাইছি!

বড়দি—বলুন।

রেবা মাসিমা—শত হোক, আইন-টাইনের চেঁচামিচি করে যে যা-ই বলুক না কেন, রঞ্জু তো মাধুরই মেয়ে।

বড়দি—না, রঞ্জু আপনাদের মাধুর মেয়ে নয়।

রেবা মাসিমা—এটা একটা রাগের কথা বললেন, অবিশ্যি রাগ করতে পারেন আপনারা।

বড়দি—আজ হঠাৎ এক যুগ পরে এখানে এসে আপনিই বা এসব কথা তুলছেন কেন?

রেবা মাসিমা—আজ তো রঞ্জুর বিয়ে।

বড়দি—হ্যাঁ।

রেবা মাসিমা—খবরটা অবিশ্যি ক'দিন আগেই পেয়েছি ; কিন্তু...।

বড়দি—আমরা তো আপনাকে কোন খবর দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না।

রেবা মাসিমা—না না, সে-কথা বলছি না। খবরটা আপনাদের খানসামা স্টিফানের কাছ থেকেই শুনতে পেয়েছি। কাজেই খবরটা মাধুকেও জানিয়েছিলাম।

বড়দি—সে কথাটা এখানে এসে আমাদের জানিয়ে লাভ কি?

রেবা মাসিমা—তাই মাধু এসেছে।

বড়দি—কি বললেন?

রেবা মাসিমা—আপনারা বিরক্ত হবেন না ; আপত্তি করবেন না। মাধু শুধু চুপ করে, বলেন তো আড়ালে এককোণে দাঁড়িয়ে, ওর মেয়ের বিয়ে দেখেই চলে যাবে।

চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, প্রৌঢ়া মহিলা তাঁর মাথার কাপড়টা একটু টেনে বড় করে দিয়ে রেবা মাসিমার পিছন থেকে এগিয়ে এসে সিঁড়িটার শেষ ধাপের কাছে দাঁড়ালেন!

চেঁচিয়ে ওঠেন বড়দি—আপনি এসেছেন কেন? বড়দির চোখের দৃষ্টিটা জ্বলতে থাকে।

মহিলা কিন্তু বড়দির এত কঠোর ধমকের শব্দটাও শুনতে পেয়েছেন কি না সন্দেহ। দুই চোখ অপলক করে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বড়দি তাঁর গলার স্বরে যেন এক-সাগর বিষ ঢেলে দিয়ে আবার চেঁচিয়ে ওঠেন—চারু রায়ের মেয়ের আবার এরকম ভিখিরিনীর ঢঙ কেন? না, কোন মানে হয় না, আপনার এখানে আসা একটুও উচিত হয়নি।

সিঁড়ি ধরে নামতে থাকেন বড়দি। বড়দির রুক্ষ কঠোর মুখটা যেন একটা প্রতিজ্ঞা। এই বে-আইনী আবির্ভাবকে এখনই চরম কথা বলে দিয়ে বিদায় করে দিতে চাইছেন বড়দি।

সিঁড়ি ধরে নেমে আসে রঞ্জু। মাধবীলতার চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়! এক যুগের অন্ধকারের ওপার থেকে আজ হঠাৎ ইনি কি মনে করে মেয়ের বিয়ে দেখতে এসেছেন? জলে ভরে গিয়েও রঞ্জুর চোখ দুটো যেন চিকচিক করে আগুনের কণা ছুঁড়ছে। চেঁচিয়ে ওঠে

রঞ্জু—আপনি কেন এসেছেন?

—ও কি হচ্ছে রঞ্জু? ছিঃ, ওভাবে কথা বলতে নেই। এত বড় হয়েছ, কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জান না?

চমকে ওঠেন রঞ্জু। চমকে ওঠেন বড়দি। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসেছেন সুজীবন সেন। হাতে পাইপ, সাদা জিনের ট্রাউজার, বুকের বোতাম খোলা একটা ঢিলে কামিজ আর পায়ে স্লিপার ; ঘাড়টা ঝুঁকে পড়েছে, কাঁধটা দু'পাশে বেশ উঁচু হয়ে গিয়েছে। বারান্দার উপর একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে সুজীবন।

কি বলতে চাইছেন সুজীবন? শুধু বড়দি আর রঞ্জু নয়, এই সন্ধ্যার ভিলা মাধবীর যত আলো আর ফুলও যেন বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে।

সুজীবন বলেন—শোভাকে একবার ডাক বড়দি। রঞ্জুকে নিয়ে যাক।

রঞ্জু চেঁচিয়ে ওঠে।—আমাকে কোথায় যেতে বলছো বাবা?

সুজীবন—যাও, একবার বসো গিয়ে।

রঞ্জু—না, বিয়ে হবে না।

সুজীবন—আমি বলছি, হবে।

রঞ্জুর গলার স্বর কাঁপতে থাকে।—তবু ভয় করছে বাবা।

সুজীবন—কোন ভয় নেই। আমি বলছি, কোন ভয় নেই।

শোভা নিজেই ব্যস্তভাবে ছুটে এসেছে। কারণ গুপ্তবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেছেন—আর দেরি কিসের।

সুজীবন বলেন—যাও, রঞ্জু।

রঞ্জু তবু অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রেবা মাসিমা আবার করুণভাবে হাসেন।—মনে হচ্ছে রঞ্জুরই আপত্তি। বোধহয় রঞ্জুর ইচ্ছে নয় যে আমরা ওর বিয়ে দেখি। আমরা তাহলে যাই।

রেবা মাসিমা এবার মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—চল মাধু।

মাধবীলতাও বলেন—হ্যাঁ, একটু দাঁড়ান।

সিঁড়ি ধরে এগিয়ে গিয়ে, সুজীবনের মুখের দিকে না তাকিয়ে, সুজীবনের কাছে একবার দাঁড়ালেন মাধবীলতা। তারপর ঝুঁকে পড়লেন, পায়ে হাত দিলেন, আর সোনার চশমাটাও চোখ থেকে ফস্‌কে গিয়ে কার্পেটের উপর পড়ে গেল।

মাধবীলতাই জানেন, এমন একটা কাণ্ড হঠাৎ কেন করে বসলেন? আইন-টাইন ভুলে গিয়ে এক যুগ আগের একটি চেনা মানুষকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়েছে? না, রঞ্জুর ভয় ভাঙাতে ইচ্ছে হয়েছে?

কার্পেটের উপর থেকে চশমাটাকে তুলে নিয়েই আবার সিঁড়ি ধরে নেমে এসে রেবা মাসিমার কাছে দাঁড়ালেন মাধবীলতা। রঞ্জুর মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে নিলেন।

মন্টুর বউ শোভা ডাকে—চল রঞ্জু।

সুজীবনের দিকে তাকায় রঞ্জু—যাই বাবা।

সুজীবন—এসো...শুনছো, বড়দি?

বড়দি—বল।

সুজীবন—তুমি তোমার সঙ্গে ওঁদেরও নিয়ে যাও। বিয়ে দেখে তারপর ওঁরা যাবেন।

পাইপ মুখে দিয়ে সাদা মাথাটি আস্তে আস্তে দুলিয়ে, ঘাড়কুঁজো হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে-হেঁটে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন সুজীবন সেন।

বিয়ে যখন শেষ হয়েছে, তখন বিয়ের আসরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন সুজীবন সেন গায়ে ফ্লানেলের লম্বা কোট, হাতে মালাক্কা বেতের একটি স্টিক। সবারই দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আর দুই হাত তুলে নমস্কার জানালেন সুজীবন। স্টিকটাও সেই নমস্কারের

জোড়বাঁধা হাতের সঙ্গে ঝুলতে থাকে।

জ্ঞানবাবু বলেন--ওঃ, সেনসাহেবের শরীর সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে।

আদিত্যবাবু বলেন--কিন্তু সেনসাহেবের মুখের হাসিটা ঠিক তেমনই আছে।

রঞ্জু আর দেবাশিসের কাছে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন সুজীবন। রেজিস্ট্রার গুপ্তবাবুকে ধন্যবাদ জানান। তারপর মালাক্কা বেতের স্টিকের উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যান।

ড্রাইভার মোতিরাম গাড়ি ঠিক করেই রেখেছিল। গাড়িতে উঠে বসলেন সুজীবন। বড়দি ছুটে এলেন, বিনয়বাবু এসে অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু সুজীবনের ইচ্ছাটাকে কেউ টলাতে পারলেন না। সুজীবন শুধু হেসে হেসে একটি কথা বললেন--না, আর এখানে একমিনিটও নয়।

কেউ না বুঝুক, অন্তত বড়দি বুঝতে পারলেন, সুজীবন যেন একটা ভয়ানক অপেক্ষার দুঃখ মুছে দিয়ে, হাল্কা হয়ে, শান্ত হয়ে, খুশি হয়ে আর তৃপ্ত হয়েই চলে যাচ্ছে। যাক সুজীবন ; রঞ্জু না হয় একটু কাঁদবে। কিন্তু সুজীবনের শরীরটা তো সত্যিই খুব খারাপ হয়েছে। ভগবান করুন, সিমলার স্যানেটোরিয়ামে থেকে ওর শরীর যেন ভাল হয়।

ভিলা মাধবীর ফটক পার হয়ে চলে গেল সুজীবনের গাড়ি।

একরাতের উৎসবের পর ভোর হতেই ভিলা মাধবীর বাগানে কোকিল ডাকতে থাকে। আর দুপুর হতে হতেই ভিলা মাধবীর ঘরের কলরব শেষ হয়ে যায়। সবাই চলে গিয়েছে। অনাদিবাবু এসে তাঁর সামিয়ানাও নিয়ে চলে গেলেন।

আজ এ-বাড়িতে মাধবী নামে কোন মানুষ নেই, মাধবী নামে কোন লতাও নেই। মাধবী নামটা একটা লেখা হয়েও কোথাও নেই। তবু লোকে বলে, ভিলা মাধবী।

একদিন বার লাইব্রেরির ঘরে বসে আদিত্যবাবু তাঁর হাতের খবরকাগজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন—এ কি হলো! জিওলজিস্ট এস. সেন ডেড?

জ্ঞানবাবু—তার মানে?

আদিত্যবাবু—ভিলা মাধবীর সেনসাহেব মারা গিয়েছেন।

গল্প

ড্রামের শব্দ আবার মৃদু হয়ে দুরুদুরু করে। আর, ক্ল্যারিওনেটও যেন গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বাজে। কেমন যেন কাটা-কাটা সুর, চাপা-চাপা স্বর। গ্যালারির ভিড় বড় বেশি শান্ত। হঠাৎ মরে গিয়েছে সব মুখরতা। অনেকের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়েছে। অনেকের বিস্ময় এরই মধ্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। দর্শকদের অপলক চোখগুলি নিরুদ্দাম হয়ে সেই বিরাট তাঁবুর ভিতরে উপরের শূন্যলোকের দিকে তাকিয়ে সুন্দর এক উদ্দামতার খেলা দেখছে। ট্রাপিজের খেলা খেলছে মিস সুধালক্ষ্মী। একটার পর একটা নতুন খেলা।

ঘাড় অনেকখানি কাত করে আর মুখ বেশ খানিকটা তুলে নিয়ে দেখতে হয়। অনেক উপরে, তাঁবুর সবচেয়ে উঁচু দুটি খুঁটির মাথায় নীল আর লাল আলো জ্বলে। দুই আলোর মাঝখানের ব্যবধান জুড়ে জরির ঝালর লাগানো লম্বা একটি চাঁদোয়া। ঠিক তারই নীচে দুলছে দুটি ট্রাপিজ—একটি এদিকে এবং আর-একটি ওদিকে। ট্রাপিজের রডে দুই পায়ের পাতা হুকের মতো এঁটে দিয়ে, আর ছিপছিপে শরীরটাকে সাপের মত নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে, দুলছে ডেকান গ্র্যাণ্ড সার্কাসের মিস সুধালক্ষ্মী। সাদা সিল্কের টাইট দিয়ে সারা দেহটাই মোড়া। অতি নিখুঁত আর বড় স্পষ্ট একটি মেয়েলী গড়ন নিয়ে দুলছে সাদা সিল্কের একটা স্তবক। সেই স্তবকের কোমর ঘিরে সবুজ মখমলের খাটো জাঙিয়া। বুকটা এক টুকরো চওড়া মসলিন দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। সেই বাঁধনের ফাঁস যেন একটা রঙিন টিড়িতন, পিঠের কাছে কেঁপে কেঁপে দুলছে। মোটা চাবুকের মতো শক্ত করে বাঁধা বিনুনিটাও অনেক নীচের রিং-এর মাটিকে যেন ছলনা করে বাতাস কেটে সোঁ-সোঁ করে দুলছে। বুকের মসলিনের উপর গাঁথা পর পর তিনটে মেডাল। মেডালের সারিও উল্টে গিয়ে, মাথা নীচু করে দুলছে। এলোমেলো নয়, বেশ সুন্দর ছন্দে বাঁধা সেই উদ্দামতা, সেই ভয়াল কুহকের খেলা। দর্শকের চোখের শঙ্কাকে আনন্দে শিউরে দিয়ে, আবার কখনও বা চোখের আনন্দকে শঙ্কিত করে দিয়ে, দুলে দুলে ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছে মিস সুধালক্ষ্মী। উপরের ওই সুন্দর দোলানির দেহটা যদি হঠাৎ ভুলে ফসকে গিয়ে অনেক নীচে রিং-এর এই ভয়ানক শক্ত মাটির উপর পড়ে যায়? সুধালক্ষ্মী দোলে, সেই সঙ্গে গ্যালারির ভিড়ের আতঙ্কও দোলে।

কিন্তু কোন আতঙ্কেই দোলে না, আর একেবারে ধীর ও স্থির হয়ে চুপ করে রিং-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন। সে-ও সুধালক্ষ্মীর ওই সুন্দর দোলানির দিকে তাকিয়ে আছে। ওর খেলা এখন থেমে রয়েছে! সুধালক্ষ্মী যখন খেলা থামিয়ে ট্রাপিজের রডের উপর বসে জিরোয়, তখন ওর খেলা শুরু হয়। ওর খেলা হল রিং-এর এই মাটির উপর ঘুরে-ফিরে আর নেচে-কুঁদে যত উদ্ভট রগড়ের হুল্লোড় দুলিয়ে দেওয়া। বিদঘুটে স্বর, কুতকুতে হাসি ড্যাবড্যাবে চাউনি আর যত কটরমটর বোল-বুলি ও আওয়াজ। রং-ঢং আর মস্করা।

"লাপ্‌টি লিটিল! লাপ্‌টি লিটিল।" দর্শকদের দিকে তাকিয়ে রগুড়ে বুলি ছাড়ে আর তিন পেয়ে কুকুরের মতো থমকে থমকে হাঁটে ; রিং-এর মধ্যে ছোট একটা চক্কর দেবার পর, সোজা টান হয়ে দাঁড়িয়ে গ্যালারিকে লক্ষ্য করে বীরদর্পে একটা মিলিটারী স্যালুট ছাড়ে, তারপর ভাঙা কাঁসার বাসনের মতো খ্যানখ্যানে স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে এই সার্কাসের জোকার দাশগুপ্ত, "বাবা আমার নাম দিয়েছেন কর্ণেল পোটাটো। ওরে আমার বাবা রে!"

গ্যালারিতে হুল্লোড় ফেটে পড়ে। "কর্ণেল পোটাটো ইধার আও। এদিকে এস কর্ণেল পোটাটো।" কখনও এদিক থেকে কখনও বা ওদিক থেকে তারস্বরের আহ্বান শোনা যায়।

চট করে মাটির উপর হাত দুটোকে থাবার মতন পেতে আর শরীরটাকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একটা ভল্ট খায় কর্ণেল পোটাটো। হাতে ভর দিয়ে উলটো শরীরটাকে খাড়া

রেখে তড়বড় করে দৌড়তে থাকে, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পা-তালি বাজায়।

রিং-এর অনেক উপরে উর্ধ্বলোকের দুই রঙিন আলোর মাঝখানে ট্রাপিজের সুধালক্ষ্মী, আর নীচে মাটির রিং-এর মাঝখানে জোকার দাশগুপ্ত। এই খেলাটি মোটামুটি মজা জমায় ভালো, এবং সেই জন্যই বোধহয় আজও ভিড় টানছে ভালো, টিকিট বিক্রি মন্দ হয় না। নইলে কবেই তাঁবু গুটিয়ে এই শহর থেকে চলে যেত ডেকান গ্র্যাণ্ড।

দোলানি থামিয়ে ট্রাপিজের রডের উপর শান্তভাবে দাঁড়িয়েছে সুধালক্ষ্মী। আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। আস্তে আস্তে টিপটিপ করছে নরম মসলিনের উপর চকচকে মেডালের শাড়ি। রুমাল হাতে নিয়ে কপালের ঘাম স্পঞ্জ করছে সুধালক্ষ্মী।

গ্যালারির দর্শকের মতো জোকার দাশগুপ্ত যেন মুগ্ধ হয়ে উপরের ওই সুন্দর কুহকের দিকে তাকিয়ে আছে। জোকারও বোধহয় ভুলেই গিয়েছে যে, এই মুহূর্তে ওকে ওর খেলার পালা মাতিয়ে তুলতে হবে। শুধু আজ নয়, অনেক দিন থেকে এই একটা ভুল করে আসছে জোকার দাশগুপ্ত। মনে থাকে না, নিয়মটা প্রায়ই ভুলে যায়, একটু দেরি করে ফেলে দাশগুপ্ত। কিন্তু মনে করিয়ে দেবার লোক আছে। রিং-এর বেড়ার গা ঘেঁষে কাপড়-ঢাকা যে প্রকাণ্ড খাঁচা-গাড়িটা এখন নিঃশব্দে স্থির হয়ে রয়েছে, তারই একপাশে টুলের উপর বসে চুরোট টানেন বাঘের ট্রেনার কালাসাহেব জন রাজারাম। বাঘের মতোই গম্ভীর গোঁফালো একটা মুখ।

নিজের খেলা ভুলে গিয়ে হাঁ করে সুধালক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে কি দেখছে জোকার? ভ্রূকুটি করেন কালাসাহেব জন রাজারাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের ছিপছিপে বিজলি চাবুকটাও সেই আড়াল থেকে সপাং করে শব্দ করে ওঠে। সেই মুহূর্তে এক লাফ দিয়ে সরে যায় আর তিনটে সামারসল্ট খায় দাশগুপ্ত। রিং-এর কিনারায় এসে কুতকুতে হাসি হেসে আর মাথার টুপি বুকে ছুঁইয়ে অতি বিনীত একটা ঢং ছাড়ে ঃ "বাবানে মেরা নাম রখ্‌খা থা কর্ণেল পোটাটো। আরে বাহ্‌রে মেরা বাপ!"

কর্নেল পোটাটো! কর্ণেল পোটাটো! গ্যালারির এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত হাঁকডাকের হুল্লোড় গড়াতে থাকে। ঢিলে-ঢালা আব ন্যাতপেতে একটা নিকার-বোকার, মাথায় লম্বা একটা ধুচুনি টুপি, খড়িমাখা মুখ, চোখের চারদিকে গোল করে আঁকা বড় বড় দুটো লাল রঙের চক্কর, কালো রঙ দিয়ে আঁকা একজোড়া ভোঁতা গোঁফ ; জোকারের সেই মূর্তি দেখলেই কোমরে যেন কাতুকুতু লাগে।

দাশগুপ্ত বড় স্মার্ট জোকার। গ্যালারির সামনের সারির কতকগুলি বড় বড় পাঞ্জাবী পাগড়ির দিকে তাকিয়ে ভালুকের মতো একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে হাঁক ছাড়ে জোকার দাশগুপ্ত ঃ "পিতা-জী মৈনু নাম দিত্তী কার্ণাইল পোটাটো।" তারপর আর-এক লাফ, ক্ষেপা গরুর মতো। কপালে তিলক আঁকা কালো টুপি মাথায়, আর সাদা চাদর গলায় পণ্ডিতের মতো মূর্তি নিয়ে বসে আছে যারা, তাদের সামনে এসে দাঁত বের করে জোকার দাশগুপ্ত হাসতে থাকে ঃ "বাপনে ম-অলা নাম দিলী কারনেল পোটাটো।" তারপর আবার। থামে না, এক মুহূর্ত চিন্তা করে না। হাসিয়ে সারা গ্যালারির পেটে খিল ধরিয়ে দিয়ে জোকার দাশগুপ্ত তার সেই বিদঘুটে রঙিলা মূর্তি নিয়ে এক-একটা ঢং ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুরতে থাকে, আর তার সেই প্রচণ্ড পরিচয় রটিয়ে দিতে থাকে।

"বাপ-নে ম-নে নাম আপী কারনেল পোটাটো!" শুনেই চোখ বড় করে তাকায়, তারপর হেসে ওঠে গ্যালারির স্পেশাল সীটের কয়েকটা চিন্তামাখা মুখ, যাদের গায়ে লম্বা লম্বা ভাটিয়া কোট।

"তগপ্পন্ এনক্কু নাম কারনেল পোটাটো কোড়ুত্তান!" শুনেই শিউরে ওঠে, তারপর খিলখিল করে হেসে ওঠে হীরার নাকছাবি পরা একদল মেয়ের মুখ।

"স্তড়া মশ্, স্তড়া মশ্। অল্লার মে নামশ্ বুখ্ কারনেল পোটাটো!" শুনেই আঁতকে ওঠে, তারপরেই মিচকে মিচকে হাসতে থাকে, নীল চোখে সুর্মা আঁকা, গোটা পাঁচেক লালচে মুখ, আলখাল্লার উপর চামড়ার পোস্তিন গায়ে চড়িয়ে বসে আছে যারা।

"বাবা হমর নাম কারনেল পোটাটো দেলথিনহি হো।" হাতের তেলো টিপে টিপে মিথ্যে খেনি খায় জোকার দাশগুপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে হি-হি করে হেসে ওঠে আর টিকি চুলকোয় পিছনের বেঞ্চির একদল দর্শক। গায়ে ফতুয়া আর কাঁধে গামছা, লোকগুলি আহ্লাদে এর-ওর গায়ে ঢলে পড়ে।

আবার নীরব হয় গ্যালারি। কাটা-কাটা গম্ভীর সুরে ক্ল্যারিওনেট বাজে। গ্যালারির সব চোখ আবার উপর দিকে তাকিয়ে রঙিন হয়ে গিয়েছে। আবার খেলা শুরু করেছে সুধালক্ষ্মী। রিং-এর শক্ত মাটির উপর আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে জোকার দাশগুপ্ত। এদিকের এই ট্রাপিজে দুলছে সুধালক্ষ্মী। সামনের ওই ট্রাপিজটা শূন্য আসনের মতো যেন একটু একলা হয়ে দূরে সরে আছে। হঠাৎ খুব জোরে একটা দোল খেয়ে সুধালক্ষ্মী তার ছিপছিপে শরীরটাকে একেবারে আলগা করে যেন ঝড়ের পাখির মতো বাতাসের বুকে ছেড়ে দেয়। ঝুপ করে নীচে লুটিয়ে পড়তে গিয়েই টুপ করে শূন্য ট্রাপিজের রড ধরে ফেলে সুধালক্ষ্মী। গ্যালারিতে হাততালির শব্দ চটপট করে বাজতে থাকে।

ভালো খেলা। বেশ খেলা। তবু দর্শকদের মনে একটা অভিযোগ আছে। এবং সার্কাসের ম্যানেজার, ছেঁড়া নেকটাই-পরা সেই গোবেচারা স্বভাবের চিপ-লুংকার অভিযোগের জবাব দিতে দিতে রোজই হয়রান হন। ট্রাপিজের খেলায় একা সুধালক্ষ্মী কেন? জুড়ি নেই কেন? একজোড়া দোলনা ঝুলবে অথচ দুলবে শুধু একজন? এই খেলা একটু ফাঁকির খেলা। গত বছরেও এই শহরে এসে খেলা দেখিয়ে গিয়েছে এই ডেকান গ্র্যাণ্ড। শহরের লোকের আজও মনে আছে, কী সুন্দর ট্রাপিজের খেলা দেখিয়েছিল সেই মিস মঞ্জরী আর চট্টোপাধ্যায়। আজ যদি থাকত চট্টোপাধ্যায়, তবে সুধালক্ষ্মী আজ আর একলা পাখির মতো ঝুপ করে ওই ট্রাপিজের শূন্য দাঁড়ে গিয়ে বসত না। টুপ করে একেবারে চট্টোপাধ্যায়ের কোলের উপর গিয়ে পড়তে হতো। তারপর, শেষের দিকের সেই খেলাটা, সেই লাস্ট গ্রিপ। কী চমৎকার! কোথায় গেল সেই ফুটফুটে চেহারার চট্টোপাধ্যায় আর কাজলপরা সেই মিস মঞ্জরী? নিশ্চয় ডেকান গ্র্যাণ্ড ওদের ভালো মাইনে দিতে পারেনি বলে ওরা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। বোধহয় ওরা এখন গ্রেট হিপোড্রোমে আছে।

এতদিন ধরে অভিযোগটা তবু একটু শান্ত ছিল, কিন্তু আর শান্ত থাকার কথা নয়। আজই সারা সকাল আর বিকাল জোরে ব্যাণ্ড বাজিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করছে ডেকান গ্র্যাণ্ড, আজকের খেলার প্রোগ্রামে সেই বিচিত্র লাস্ট গ্রিপ থাকবে। আজ আর সুধালক্ষ্মী একা ট্রাপিজে দুলবে না, তার জুড়িও থাকবে। কিন্তু কই? সুধালক্ষ্মীর জুড়ি কই? সত্যিই কি একটা ভাঁওতা দিল ডেকান গ্র্যাণ্ড? কোন্ সাহসে এমন ভাঁওতা দেয়?

ভাঁওতা নয়। ম্যানেজার চিপলুংকার তখন ছেঁড়া নেকটাই-এ হাত বুলিয়ে হাসছিলেন। টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, নতুন খেলোয়াড় এসে গিয়েছে। পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছে, এই যা। কিন্তু কী ভাগ্য, ঠিক সময়মত পৌঁছে গিয়েছে। চিতে বাঘের মতো আঁটসাঁট চেহারা, ফিকে হলদে রঙের টাইটের উপর কালো জাঙিয়া, হঠাৎ এক নতুন খেলোয়াড় এসে রিং-এর মধ্যে ঢুকেই দর্শকদের দিকে একটা স্যালুট ছাড়ে, তারপর কাঠবিড়ালীর মতো তরতর করে দড়ি বেয়ে মুহূর্তের মধ্যে উপরে উঠে গিয়ে শূন্য ট্রাপিজের রডের উপর দাঁড়ায়।

"চিনাপ্পা! চিনাপ্পা! গ্রেট হিপোড্রোমের সেই চিনাপ্পা!" চিনতে পেরে গ্যালারির ভিড় আনন্দে হাততালি দেয়।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরে যার চোখে কোন আতঙ্ক ছিল না, শুধু তারই চোখ দুটো

হঠাৎ একটা ভয়ের নিষ্ঠুর খোঁচা লেগে শিউরে ওঠে। লাল রঙে আঁকা দুটো গোল গোল চক্করের মধ্যে জোকারের সেই দুটি চোখর ড্যাবডেবে চাউনি যেন শ্রান্ত হয়ে মুদে আসতে থাকে।

ওই ট্রাপিজে দাঁড়িয়ে আছে সুধালক্ষ্মীর খেলার জুড়ি। কোঁকড়া চুল, কালো রঙ, টিকটিক করছে নাকটা, বেশ চেহারা। সুধালক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে চিনাপ্পা। এরই মধ্যে চিনাপ্পার চোখের তারায় একটু রঙ ধরে গিয়েছে বলে মনে হয়। যেন মুগ্ধ হয়ে রয়েছে একটা হঠাৎ-পাওয়া আশার উল্লাস। মুগ্ধ হবারই কথা।

আর ওই তো, সুধালক্ষ্মীও সামনের ওই ট্রাপিজের রডে দাঁড়িয়ে আছে। আয়নার মতো চকচক করছে দুটি টানা টানা চোখ, ঠোঁট দুটি যেন একটু ফুঁপিয়ে রয়েছে। টলটল করে সুডোল থুতনির ছাঁদ ; তা ছাড়া কপালের উপর মালাবার চন্দনের ওই টিপ। সুধালক্ষ্মীর ওই মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ না হওয়াই তো আশ্চর্য। তবু তো এখনও জানে না, বোধহয় কল্পনাও করতে পারে না চিনাপ্পা, শক্ত চাবুকের মতো বাঁধা সুধালক্ষ্মীর ওই মোটা বেণীতে মহীশূর অগুরুর কী সুন্দর গন্ধ ফুরফুর করে।

চিনাপ্পা হাসছে, হাসুক। কিন্তু সুধালক্ষ্মী অমন করে হাসে কেন? আজ এক বছর ধরে সুধালক্ষ্মীর ওই সুন্দর মুখের কত রকমের হাসি দেখেছে দাশগুপ্ত, কিন্তু আজ এ কী-রকম উদ্দাম উল্লাসের হাসি! শিউরে উঠছে সুধালক্ষ্মীর ফোঁপানো ঠোঁট, আয়নার মতো চকচকে চোখে বিদ্যুতের চমক খেলছে। এ কী হলো সুধালক্ষ্মীর? এক মুহূর্তে এক বছরের ইতিহাস ভুলে গেল?

মাত্র এক মাসের জন্য হিসাব লিখবার একটা চাকরি নিয়ে এই ডেকান গ্র্যাণ্ডের তাঁবুতে যেদিন এসেছিল দাশগুপ্ত, সেদিনের কথাগুলিও কি সুধালক্ষ্মী ভুলে যেতে পারে? হিসাব লেখার কাজ ছেড়ে দিয়ে খেলার কাজ ধরবার জন্য দাশগুপ্তের কানে কানে কে সেদিন অদ্ভুত উৎসাহের মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছিল?

"আপনাকে হিসাব লেখার কাজে একটুও মানায় না!" বলতে বলতে একেবারে দাশগুপ্তের টেবিলের কাছে এসে সেদিন দাঁড়িয়েছিল সুধালক্ষ্মী। চমকে মুখ তুলে তাকিয়ে দাশগুপ্তও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। কে এই মেয়ে, যার ফোঁপানো দুটি ঠোঁট অদ্ভুত হাসি হাসছে?

প্রশ্ন না করতেই নিজের পরিচয় নিজেই বলতে থাকে সুধালক্ষ্মী, "আমি সুধালক্ষ্মী, ট্রাপিজের খেলা দেখাই। মাইনে এক শো দশ টাকা।"

দাশগুপ্ত হাসে, "আমার মাইনে ত্রিশ টাকা।"

"ত্রিশ টাকা মাইনের কাজ করতে আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।"

দাশগুপ্ত ভ্রূকুটি করে, "তার মানে?"

"আপনার এত সুন্দর মজবুত চেহারা ; ইচ্ছে করলে, আর একটু চেষ্টা করে খেলা শিখে নিলে, আপনিও এক শো দশ টাকা পেতে পারেন।" চলে গেল সুধালক্ষ্মী, কিন্তু দাশগুপ্তের কানের কাছে যেন একটা গানের রেশ রেখে দিয়ে চলে গেল। আবার হিসেব লিখতে গিয়ে আনমনা হয়ে যায় দাশগুপ্ত। আশ্চর্য, এমন ভালো একটা শান্ত-শিষ্ট কাজের আনন্দকে একেবারে বিস্বাদ করে দিয়ে চলে গেল ওই ফোঁপানো ঠোঁটের হাসি।

প্যারালাল-বার ভালোই রপ্ত করা আছে, হরাইজণ্টালও কিছু কিছু। পরীক্ষায় ফেল করলেও কলেজের জিমনাসিয়ামের সেই উচ্ছল খেলাভরা দিনগুলির আনন্দ এখনও দাশগুপ্তের এই তরুণ শরীরের পেশীতে সঞ্চিত হয়ে আছে। একটু চেষ্টা করলে আরও ভালো খেলা শিখে ফেলতে পারে বই কি দাশগুপ্ত। কিন্তু সে সুযোগ কই? আর এক মাস পরে হিসাব লেখার এই চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সার্কাসের পুরনো কেরানী ছুটির

ার ঠিক সময়েই ফিরে আসবে। তারপর? তারপর এই তাঁবুতে আর একটি দিনও থাকবার ভরসা কই? একটু ভরসা পাওয়ার জন্য ছটফট করে মনটা। এই তাঁবু আর এই ত্রিশ টাকার চাকরিটাই যদি কোন জাদুবলে অন্তত এক বছরের মতো বেঁচে থাকতে পারে, তবে তো অন্তত...। দাশগুপ্তের জীবনের এই গোপন ধ্যানের মতো চিন্তাগুলি যেন হঠাৎ মহীশূর অগুরুর গন্ধে ভরে ওঠে। কী চমৎকার বেণী বাঁধে সুধালক্ষ্মী!

এক মাস পরে যেদিন শেষদিনের মতো চাকরি করে চলে যাবার কথা, সেদিন সকালবেলা ম্যানেজার চিপলুংকার তাঁর ছেঁড়া নেকটাই-এ হাত বোলাতে বোলাতে দাশগুপ্তের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সুধালক্ষ্মী।

ম্যানেজার বলেন, "সুধালক্ষ্মী বলছে, আপনি নাকি খেলা শিখতে চান?"

চমকে ওঠে বিড়বিড় করে দাশগুপ্ত, "কই, না তো! আমি তো কাউকে ওকথা বলিনি!...হ্যাঁ, ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু...।"

ম্যানেজারও মাথা চুলকে আমতা-আমতা করেন ঃ "হ্যাঁ, ওই কিন্তুই হলো আসল কথা। আপনাকে মাইনে দিয়ে রাখবার উপায় কই? এদিকে সুধালক্ষ্মী এমন জোর করছে যে...।" বোধহয় মুখের হাসি লুকিয়ে ফেলবার জন্য অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সুধালক্ষ্মী।

ম্যানেজার বলেন, "একটা উপায় হতে পারে। জোকার ভোলাবাবু আর এক মাস পরে ছুটিতে বাড়ি যাবেন। আপনি যদি এই এক মাসের মধ্যে ভোলাবাবুর সাকরেদি করে জোকারের কাজটা মোটামুটি শিখে নিতে পারেন, তবে...।" ম্যানেজার দেখতে পান, সুধালক্ষ্মী মাথা দুলিয়ে ইশারায় দাশগুপ্তকে বলছে ঃ "রাজি হয়ে যান।" বিব্রতভাবে নেকটাই নাড়েন গোবেচারা ম্যানেজার চিপলুংকার ঃ "তবে আপনি সেকেণ্ড জোকার হয়ে এখানে অন্তত একটা বছর থাকতে পারবেন, মাইনে পাবেন পঞ্চাশ টাকা।"

সুধালক্ষ্মী এইবার সামনে এগিয়ে এসে, একেবারে হিতাকাঙ্ক্ষিণী অভিভাবিকার মতো উপদেশের সুরে বলতে থাকে, "আর, অবসর সময়ে প্র্যাকটিস করে ভালো ভালো খেলাগুলি, এমন কি ট্রাপিজের খেলাটাও শিখে ফেলতে পারেন।"

ম্যানেজার বিস্মিত হয়ে একবার সুধালক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকান। তারপর দাশগুপ্তের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওঃ, তা হলে তো কথাই নেই দাশগুপ্ত। ইউ ইউল বি ভেরি ভেরি হ্যাপি।"

ভ্রূভঙ্গী করে সুধালক্ষ্মী। ফোঁপানো ঠোঁটের মিষ্টি হাসিটা যেন রাগ করে আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে ঃ "কী বললেন ম্যানেজার? তার মানে?"

গোবেচারা চিপলুংকার এইবার বেশ চালাক হাসি হেসে জবাব দেন, "তার মানে, দাশগুপ্ত অন্তত একশো দশ টাকা মাইনে পাবে।"

ম্যানেজার চলে যেতেই সুধালক্ষ্মী বলে, "আপনি আমার ওপর রাগ করলেন না তো?"

দাশগুপ্ত হাসে ঃ "একটুও না। কিন্তু আপনি কেন আমার জন্য ম্যানেজারের কাছে গিয়ে এত কাণ্ড করলেন?"

"জানি না।" গম্ভীর হয়, আস্তে আস্তে চলে যায় সুধালক্ষ্মী।

এই তো সেই সুধালক্ষ্মী। জোকার দাশগুপ্তের দুই চক্ষু যেন একটা জ্বালার ছোঁয়ায় ছটফট করে। কোথায় গেল সুধালক্ষ্মীর সেই গম্ভীর মুখ? আজও কি বুঝতে পারেনি সুধালক্ষ্মী, তাকে এই এক বছর ধরে ভালোবেসে ধন্য হয়ে আছে যার জীবন, সে নীচের এই রিং-এর শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে?

শুরু হয়েছে খেলা। কী উদ্দাম খেলা! এই ট্রাপিজ থেকে ওই ট্রাপিজ. ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে সুধালক্ষ্মী আর চিনাপ্পা। যেন এক ভয়ানক ধরা-ছোঁয়ার আবেগ শূন্যলোকে লুকোচুরি খেলছে।

কেউ কাউকে কাছে পায় না। দুটি সুন্দর উল্কা যেন পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে আর আসছে।

তাই তো! সুধালক্ষ্মীকে এখনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। ধরা দিচ্ছে না সুধালক্ষ্মী। জোকারের ড্যাবডেবে চোখ একটু শান্ত হতে আর খুশি হতে চেষ্টা করে।

এতদিনে ওই ট্রাপিজে সুধালক্ষ্মীর জুড়ির আসনে দাশগুপ্তকেই আজ দেখতে পেত গ্যালারির ভিড়, যদি বুকের একটা অদ্ভুত ব্যথা এই তিন মাস ধরে দাশগুপ্তের চেষ্টায় নেশাটাকে দমিয়ে না দিত। ডাক্তার বলেছেন, এখন কয়েকটা মাস আর কোন শক্ত খেলা নয়, কোন শক্ত খেলার প্র্যাকটিসও নয় ; হয় রেস্ট, নয় হাল্কা খেলা খেলে দিন কাটাতে হবে। দাশগুপ্তের জীবনের স্বপ্নটা যেন উপরের রঙিন জগতের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত উঠে তারপর গড়িয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে। বড় তাড়াতাড়ি করেছিল দাশগুপ্ত, তাই বোধহয় একটা নিষ্ঠুর হোঁচট খেতে হয়েছে। অল্প মাইনে, ডবল খাটুনি আর দুর্বল খোরাক শরীরের উপর বেশ প্রতিশোধ নিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু একটা হোঁচট বই তো নয়? ডাক্তারের কথা শুনেও দাশগুপ্তের জীবনের স্বপ্ন একটুও দমে যায়নি। মাত্র তিনটা মাস, তারপর আবার দাশগুপ্তের এই মজবুত দেহের সব রক্ত স্নায়ু আর পেশী মরিয়া হয়ে ওই ট্রাপিজের কাছে যাবার জন্য প্র্যাকটিস করবে। কী-ই বা আর বাকি আছে? ভল্টিং আর টামলিং বেশ দুরস্ত করা হয়েছে। বাকি শুধু টাইপরোপ আর ল্যাডার। তারপর ওই ট্রাপিজ রপ্ত করতে দুটি মাসের বেশি লাগবে না। তারপর এক শো দশ টাকার মাইনে এবং তার চেয়ে বড় উপহার ওই রঙিন আলোর কাছে জরির চাঁদোয়ার নীচে শূন্যলোকের কুহকের মধ্যে সুধালক্ষ্মীর সঙ্গে লাস্ট গ্রিপ।

সেদিন হঠাৎ উদ্দাম হবে ক্ল্যারিওনেটের সুর। হঠাৎ মরিয়া হয়ে দুলে উঠবে দু'দিকের দুই ট্রাপিজ। রড ছেড়ে দিয়ে দু'দিক থেকে দুই মূর্তি বাতাসে শরীর ছুঁয়ে দেবে। তারপরেই বুকের কাছে বুক, মুখের কাছে মুখ। মালাবার চন্দনের টিপ দাশগুপ্তের একেবারে চোখের কাছে ভাসবে। দুই জোড়া বাহুর বাঁধনে জড়ানো একটি মিলনের মূর্তি যেন স্বর্গে থেকে জয়ী হয়ে নীচের টান করা তেরপলের ক্যাচের উপর ঝুপ করে নেমে পড়বে। সব পাওয়া, পরম পাওয়া পেয়ে যাবে দাশগুপ্তের এক বছরের আশার জীবন। খেলার সঙ্গিনীকে চির জীবনের সঙ্গিনী করে, এক উৎসবের রাতে হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে দাশগুপ্ত।

এই এক বছরের মধ্যে দাশগুপ্তের চোখের কাছে ক'বারই বা এসেছে সুধালক্ষ্মী? সেই দুবার, আর ডাক্তার যেদিন এলো সেদিন একবার। কে জানে, কেমন করে আর কার কাছে থেকে খবর পেয়েছিল সুধালক্ষ্মী, বুকে একটা ব্যথা নিয়ে অফিসঘরের পিছনে ছোট তাঁবুর ভিতরে একা শুয়ে আছে জোকার দাশগুপ্ত।

একেবারে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে দাশগুপ্তের বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল সুধালক্ষ্মী সুধালক্ষ্মীর মূর্তিটাই কেমন যেন ভীত আর অনুতপ্ত উদ্ভ্রান্তের মতো। খোলা বেণী, একরাশ ঘন কালো চুল যেন ঢেউ তুলে ফেঁপে রয়েছে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেও উপচে পড়বে, বেড় পাওয়া যাবে না। বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গিয়েছে সেই ফোঁপানো ঠোঁট। শাড়িটা এলোমেলো করে যেন কোনমতে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। ঘাড়ে আর গলায় সাবানের ফেনা শুকিয়ে রয়েছে। তবে কি স্নান বন্ধ করে হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে সুধালক্ষ্মী?

দাশগুপ্তের বুকের ব্যথা পরীক্ষা করে ডাক্তার চলে যাবার জন্যে এগিয়ে যেতেই গলা কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সুধালক্ষ্মী, "একটা আশা দিয়ে যান ডাক্তারবাবু।"

ডাক্তার ঘাবড়ে গিয়ে সুধালক্ষ্মীর দিকে তাকান ঃ "হতাশার তো কারণ নেই। এই ব্যথা সেরে যাবে।"

ডাক্তার চলে যাবার পর আরও কিছুক্ষণ চুপ করে দাশগুপ্তের বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল

সুধালক্ষ্মী। দাশগুপ্তের মনের ভিতরে আকুল হয়ে ছটফট করছিল একটা প্রশ্ন। সত্যিই ভালোবেসে তো সুধালক্ষ্মী? না, শুধু মিথ্যে একটা উপকার করবার জন্য ছুটে আসে? কিন্তু কী আশ্চর্য, এই মেয়ের মনটা সীলমোহর করা। সেই মনের ভাষা শোনা যায় না। ভুলেও মুখ খুলে সেই মনের কথার একটি কথাও বলে না।

দাশগুপ্ত বলে, "আমার অসুখের কথা শুনে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন?"

"জানি না।" কথাটা বলেই বেশ একটা ব্যস্তভাবে হন হন করে হেঁটে চলে গেল সুধালক্ষ্মী।

হ্যাঁ, সীলমোহর-করা মনই বটে! কে জানে, কী রহস্যের রত্ন লুকিয়ে আছে সেই মনের ভিতর!

থেমেছে খেলা। এই ট্রাপিজে চিনাপ্পা। আস্তে আস্তে হাঁপায় আর দম ছাড়ে। ওই ট্রাপিজে সুধালক্ষ্মী, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

আবার ডিউটি ভুলে থমকে দাঁড়িয়ে আছে জোকার। সপাং করে শব্দ ছাড়ে কালাসাহেব জন রাজারামের বিজলী চাবুক।

"ওরে বাবা!" ভাঙা-গলায় কর্কশ ডাক ছেড়ে এক-একটা লাফ দিয়ে রিং-এর চারিদিকে ছুটতে থাকে জোকার। ভিরমি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে। নকল ভয়, নকল আতঙ্ক, আর নকল ক্লান্তির ঢঙ দেখায়। মিথ্যা হাঁপানি হাঁপায়। হাত দিয়ে পা টিপে আর পা দিয়ে হাত টিপে নিজেই নিজের সেবা করে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়। অ্যাঁও অ্যাঁও অ্যাঁও--মুখ বেঁকিয়ে ছিককাঁদুনি কাঁদে। দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে জলের ফোয়ারা গড়িয়ে পড়তে থোকে। গ্যালারির ভিড় চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। "নকল কান্না, নকলি আঁসু। ওই যে কর্ণেল পোটাটোর ড্যাবডেবে চোখের কোণে খুব সরু একটা টিউবের মুখ দেখা যায়।"

নীরব হয় গ্যালারি। আবার শুরু হয়েছে খেলা। সুধালক্ষ্মী আর চিনাপ্পার মুখের হাসিতে যেন আগুনের রঙের মতো আভা। আর, নীচে রিং-এর মাঝখানে শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে দাশগুপ্ত। জোকারের বুকের পাঁজরে যেন কাঁটা বিঁধেছে, চিনচিন করছে ব্যথাটা। আর বুঝতে কিছু বাকি নেই, উপরের রঙিন আলোর কাছে মত্ত হয়ে দুলছে দুই অভিসন্ধির কুহক। দাশগুপ্তের স্বপ্নের ঘরে ডাকাত পড়েছে। পড়ুক! কিন্তু সুধালক্ষ্মীই যে হেসে হেসে দরজা খুলে দিল, সহ্য করা যায় না শুধু এই জ্বালার কামড়।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে ক্ল্যারিওনেট। গ্যালারির ভিড় হাততালি দিয়ে বাতাস ফাটায়। দুই ট্রাপিজ দু'দিকে ছিটকে সরে গিয়েছে, আর জরির চাঁদোয়ার নীচে সেই রঙিন শূন্যলোকের মধ্যে ফুটে উঠেছে এক কঠোর হিংস্র নিষ্ঠুর লাস্ট গ্রিপ। সুধালক্ষ্মী আর চিনাপ্পা দু'জনেই দু'হাত দুজনের গলা জড়িয়ে ধরেছে। একটা ক্লান্ত উদ্দামতার ছবি ধরাতলে লুটিয়ে পড়ার আগে আকাশে ভেসে উঠেছে।

"ওরে বাবা রে--!" চিৎকার করে একটা লাফ দিয়ে সরে যায় দাশগুপ্ত। জোকার দাশগুপ্তের ন্যাতপেতে নিকার-বোকারে যেন আগুন ধরে গিয়েছে। হাতে ভর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ভল্ট খেতে গিয়ে রিং-এর শক্ত মাটির উপর মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়ে যায় জোকার। গ্যালারির হো-হো হাসির হুল্লোড় ফেটে পড়ে।

পড়েই আছে জোকারের অসাড় শরীর। বেশ কিছুক্ষণ। এ আবার কর্ণেল পোটাটোর কোন নতুন খেলা? "ওঠো কর্ণেল পোটাটো।"--ডাক দেয়, হাঁক ছাড়ে আর চিৎকার করে গ্যালারির ভিড়।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় দাশগুপ্ত। "লাপ্‌টি লিটিল, লাপ্‌টি লিটিল্!" বিড় বিড় করে কুতকুতে হাসি হেসে আর তিন-পেয়ে কুকুরের মতো ভঙ্গী করে রিং-এর চারিদিকে খুঁড়িয়ে

খুঁড়িয়ে ঘুরতে থাকে জোকার দাশগুপ্ত। জোকারের নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত গড়ায়। কপালের কাছেও একটা ক্ষত, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে।

"নকল রক্ত, নকলি খুন।" গ্যালারির ভিড় চালাক হাসি হেসে চেঁচায়। কিন্তু কেয়াবাৎ হ্যায়, বাহবা, কী অদ্ভুত কর্ণেল পোটাটোর খেলা, কায়দাটা একেবারেই ধরতে পারা যাচ্ছে না। কেমন করে নাক দিয়ে এমন সুন্দর রক্ত ঝরাচ্ছে কর্ণেল পোটাটো?

ঘড় ঘড় শব্দ করে বাঘের খাঁচাগাড়িটা রিং-এর মাঝখানে চলে এসেছে। বিজলী চাবুক হাতে নিয়ে খাঁচার দরজা খুলে বাঘের মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন কালাসাহেব জন রাজারাম।

আরে, এ কী কাণ্ড! চমকে ওঠে গ্যালারির ভিড়। কর্ণেল পোটাটোর সাহস তো কম নয়। হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে একটা দৌড় দিয়ে বাঘের খাঁচার ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়েছে জোকার।

"ওরে বাবা!" বাঘের শান্ত গম্ভীর ও উদাস মুখের কাছে মাথা দুলিয়ে নকল ভয়ের ঢঙ দেখায় জোকার দাশগুপ্ত। হঠাৎ গর্জন করে লাফিয়ে ওঠে বাঘ। জন রাজারামের বিজলী চাবুকের সপাসপ বাড়ি খেয়েও বাঘের হুটোপুটি শান্ত হতে চায় না।

বিব্রত বিস্মিত ও আতঙ্কিত কালাসাহেব, জোকারের মুখের দিকে তাকিয়ে কী-যেন সন্দেহ করেন। তারপর চাবুক তুলে চেঁচিয়ে ওঠেন, "আসলি খুন, এ যে আসলি খুন!"

"সে কী? কী ব্যাপার?" দর্শকদের মনের প্রশ্নও আশ্চর্য হয়ে নীরবে ছটফট করে। গ্যালারির মুখরতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। সেই ভয়ানক গম্ভীর নীরবতাকে আবার চমকে দিয়ে হুংকার ছাড়েন কালাসাহেব জন রাজারাম ঃ "জানোয়ার বিগড় গিয়া। নাকে-মুখে খাঁটি রক্ত মেখে বাঘের মুখের কাছে আসে হতভাগা। ভাগো, জলদি ভাগো, বেকুব জোকার!"

কিন্তু একেবারে আতঙ্কহীন, কর্ণেল পোটাটো তার সেই কুতকুতে হাসি আর ড্যাবডেবে চাউনি নিয়ে আস্তে আস্তে সরে যায়। "লাপ্‌টি লিটিল, লাপ্‌টি লিটিল্।" হেলে দুলে ভঙ্গী করে রিং-এর চারিদিকে ঘুরতে থাকে। গ্যালারির ভিড় কিন্তু আর হাসে না। ক্ল্যারিওনেটও বাজে না। অশান্ত অতৃপ্ত তৃষ্ণাতুর বাঘটাই শুধু গর্জন করে।

রিং-এর পাশের পর্দা ঠেলে বের হয়ে ছুটে আসছে কে? চমকে ওঠে গ্যালারির নীরব বিস্ময়।

আর কেউ নয়। মিস সুধালক্ষ্মীই ছুটে এসেছে। বেণী খুলে দিয়েছে, রঙিন একটা শাড়ি পরেছে সুধালক্ষ্মী ; তবু ওকে চেনা যায়। বাঃ, বেশ সুন্দর, ট্রাপিজের সুধালক্ষ্মীকে এখন যে ঠিক ঘরের লক্ষ্মীটিরই মতো দেখাচ্ছে।

ও কি? আরও আশ্চর্য হয় গ্যালারির হাজার চোখ। জোকারের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন রাগে কটমট করে সুধালক্ষ্মীর চোখ। রঙিন শাড়ির আঁচল মুঠো করে ধরে জোকারের কপালের ক্ষত চেপে ধরেছে সুধালক্ষ্মী। তারপরেই হাত ধরে এক টান দিয়ে রিং-এর ভিতর থেকে জোকারকে যেন জোর করে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

ছেঁড়া নেকটাই-এ হাত বুলিয়ে ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন গোবেচারা ম্যানেজার চিপলুংকার ঃ "কী হয়েছে? কি ব্যাপার সুধালক্ষ্মী?"

সুধালক্ষ্মীর ফোঁপানো ঠোঁট মিষ্টি হাসি হাসে ঃ "খেলা হলো খেলা। কিন্তু তাই দেখে কী ভয়ানক রাগ করে পাগল হয়ে গিয়েছে আপনাদের জোকার।"

"সত্যি নাকি?" বড় বড় চোখ করে দাশগুপ্তের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হন চিপলুংকার।

এইবার সুধালক্ষ্মীর চোখ দুটোই যেন হেসে ওঠে এবং হাসতে গিয়ে ছলছল করে। "আমাকে আজও বোধহয় চিনতে পারেনি দাশগুপ্ত, নইলে বুঝতে পারত যে আমিই ওর..."

এক গলা হাসি হেসে চিপলুংকার বলেন, "ও ইয়েস।"

সুপ্রিয়া

ওটি একটি দুর্নামের বাড়ি। আষাঢ়ের শেষ দিকে যখন উশ্রীর বুকে ঘোলা জলের ঢল নামে, তখন এই বাড়ির একটি জানালার কাছে দাঁড়ালে উশ্রীর সেই পাগলা চেহারা দেখা যায়।

ওটি একটি উচ্ছল কল-কল হাসির বাড়ি। হয় বাইরের ঘরে, নয় বারান্দায়, কিংবা সামনের এক টুকরো ঘেসো জমির উপর তিন চারজন মানুষের জটলা সর্বক্ষণ মুখর হয়ে থাকে। সেই মুখরতার সঙ্গে মাঝে মাঝে উচ্চকিত হাসির হল্লা।

ওটি একটি অফুরান চা-এর বাড়ি। সর্বক্ষণ স্টোভ জ্বলে, আর স্টোভের উপর ডেকচিতে জল ফোটে। পেয়ালা-পিরিচের ঝনঝনানি সবসময় শোনা যায়। চাকর রামসেবক শুধু চা তৈরি করবার চাকর।

ওটি একটি গানের বাড়ি। যখন তখন হারমোনিয়াম বাজে, কখনো বা এসরাজ। কখনো মেয়ে-গলায় এবং কখনো বা পুরুষ-গলার গানে সুরেলা হয়ে ওঠে এই বাড়ির বাতাস।

ওটি একটি খেলার বাড়ি। ক্যারামের ঘুঁটির শব্দ ঠকাস্ ঠকাস্ করে ঘরের ভিতরে, এবং ঘরের বাইরে হলে ঘেসো জমির উপর ব্যাডমিন্টনের লাফালাফি।

উশ্রীর কিনারায় পেঁপেগাছের ছায়ায় ঘেরা এই ছোট-বাড়িটা যেন সর্বক্ষণের উল্লাস আর গুঞ্জনের এক মৌচাক। সেই উল্লাস আর সেই গুঞ্জনের মাঝখানে বসে আছে এই বাড়িরই মেয়ে। বিধু চৌধুরীর মেয়ে সুপ্রিয়া চৌধুরী।

মাসের মধ্যে বিধু চৌধুরী ক'টা দিনই বা বাড়িতে থাকেন? বড় জোর সাত-আটটা দিন। অভ্রের কেনা-বেচার কাজ করতে হলে শহর ছেড়ে দূরের যত খনির কাছে কাছে ঘোরাফেরা করতে হয়। বিধু চৌধুরী তাই করেন। জঙ্গলে ঘেরা এক-একটি খনি-অঞ্চলের ভিতরে ঢুকলে পাঁচ দিনের আগে কাজ সেরে ফিরে আসতে পারেন না।

ফিরে আসলেই বা কি? বাড়ির এই সর্বক্ষণের উৎসবের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বাধাও দেন না, বাহবাও করেন না। কর্মক্লান্ত জীবনটাকে শুধু দু'-তিনটি দিনের মতো একটু চুপ করে থাকবার আর ঘুমিয়ে পড়ে থাকবার আরাম পাইয়ে দিয়ে তিনি আবার বের হয়ে যান। তাঁর এই একঘেয়ে খাটুনির পালা দু'চোখে দেখে যিনি সহ্য করতে পারতেন না, এবং উদ্বিগ্ন হয়ে বাধা দিতেন, তিনি আর নেই। সুপ্রিয়ার মা মারা গিয়েছেন, সে আজ দশ বছরেরও আগের কথা। বিধু চৌধুরীর এই সংসারের ক্ষুধা-তৃষ্ণার হিসাব রাখে আর সব কাজের দায় সহ্য করে চাকর রামসেবকের মা।

এই বাড়িতে আর যারা থাকে তারা নেহাতই ছেলেমানুষ। সুপ্রিয়ার দু'টি ভাই আর একটি বোন, যারা সময়মত স্কুলে যায় কি না যায়, তা'ও কিছু বোঝা যায় না।

এই বাড়ি একটি অভাবেরও বাড়ি বটে, টাকা-পয়সার অভাব। কিন্তু সে অভাব চোখে দেখে বুঝতে পারবে, এমন সাধ্য কার? যাঁরা বিধু চৌধুরীর কাজ-কারবারের খবর রাখেন, তাঁরাই শুধু জানেন যে, দেনার উপর দেনা করে দিন পার করে দিচ্ছেন বিধু চৌধুরী। একবার লাভ করলে তিনবার লোকসানে পড়েন বিধু চৌধুরী। কিন্তু তবু এই ক্যারাম ব্যাডমিন্টন হারমোনিয়ম আর চা-এর নিত্য উৎসবে আত্মহারা হয়ে আছে বিধু চৌধুরীর বাড়ি।

তাই, তাই তো এই পাড়ায়, আর ঐ পাড়ায়, এই মকতপুর ও বারগণ্ডায় আর সেই দূর পচম্বাতে পর্যন্ত নানাজনের মুখে মুখে নানা দুর্নামের গুঞ্জন ঘুরে বেড়ায়। তাই মেয়েটাকে একেবারে ওপেন জেনারেল লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছেন বিধু চৌধুরী। টাকাপয়সা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য নেই বিধু চৌধুরীর, এখন মেয়েটা যদি নিজের চেষ্টায় মনের মতো একটা ছোকরাকে ধরে ফেলতে পারে।

লোকের চোখের সন্দেহকে নিন্দা করা যায় না। বিয়ের বয়সের একটি সুন্দর মেয়ে, এবং তার চারদিক ঘিরে বিয়ের বয়সের গোটা তিন চারেক ছেলেকে যদি প্রায় সব সময় ব্যস্ত আর উল্লসিত হয়ে থাকতে দেখা যায়, তবে সে-সন্দেহ হবেই বা না কেন? সুপ্রিয়ার জন্মদিনে সুপ্রিয়ার বান্ধবদের উপহারের সামগ্রীতে টেবিল ভরে যায়।

বিধু চৌধুরীর দুর্নাম হলো তাঁর হতাশা ও অক্ষমতার দুর্নাম। টাকা-পয়সার অভাব আছে বলে কি মেয়েকে এইভাবে যথেচ্ছার সুযোগ দিতে হয়? কিন্তু সত্যিকারের দুর্নাম হলো বিধু চৌধুরীর মেয়ে সুপ্রিয়ার দুর্নাম সুপ্রিয়া যা করছে, তাকে এক কথায় বলা যায় পুরুষ নিয়ে খেলা।

সময়ে অসময়ে এক-একটা সাইকেল ছুটে এসে গেটের কাছে থামে, তারপর ভিতরে চলে যায়। মাঝে মাঝে একটি বেবি অস্টিনও দেখা যায়, পচাম্বার সেই স্বর্গত রায় বাহাদুরের ছেলে বঙ্কিমের বেবিঅস্টিন। ওদের সকলেরই জন্য এখানে সুপ্রিয়ার মুখের সমান মাপের হাসিভরা অভ্যর্থনা সবসময় তৈরি হয়ে রয়েছে।

এই পাড়া আর ঐ পাড়ার কত মেয়ে কত বাড়িতে বেড়াতে যায়, কিন্তু এই বাড়িতে কেউ আসে না। এমন কি সুপ্রিয়ার মাসতুতো বোন শৈলও এক বছর হলো এই বাড়িতে আসা ছেড়ে দিয়েছে।

অনেক সময় অনেকের মনের আশঙ্কা চাপা-গলার আলোচনার মধ্যেই বেশ একটু উগ্র হয়ে ওঠে। ও মেয়ে বের হয়ে গেল বলে। ও মেয়ে হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডে ভর্তি হলো বলে। প্রকৃতির প্রতিশোধ যে বেশিদিন চুপ করে থাকে না মশাই।

সুপ্রিয়া চৌধুরীও কোন বাড়িতে বেড়াতে যায় না। সময় পেলে তো যাবে? তাছাড়া পাড়ার কোন বাড়ির মা-মাসিও পছন্দ করেন না যে, সুপ্রিয়া তাঁদের বাড়িতে আসুক। আসে না সুপ্রিয়া, অন্য বাড়ির কোন মেয়ের সঙ্গে এখন আর মেশেও না সুপ্রিয়া। অন্তত একটা ভয় থেকে কিছুটা রেহাই পায় অনেক বাড়ির মন।

একটা আশ্চর্যের ব্যাপার লক্ষ্য করতে হয়। সুপ্রিয়ার চোখের কাছাকাছি এসে ভিড় করে যেসব তরুণ মন আর যুবক চেহারা, তাদের সুনামের গায়ে কখনও কোন নিন্দুকের সন্দেহ ও সমালোচনার জ্বালা লাগেনি। এদের সুনাম বিপন্ন হয়েছে, সন্দেহ আর অপবাদের বোঝা এদের মাথায় চেপেছে, শুধু এই অফুরান চায়ের আসরে এসে বসবার পর থেকে। সত্যি সত্যি, লোকের ধারণায় যেসব যুবকের মতিগতি সম্বন্ধে নিন্দা-ঘৃণা আছে, তাদের কাউকে আজ পর্যন্ত সুপ্রিয়া চৌধুরীর হাসিমধুরসে উচ্ছল এই উল্লাসের মৌচাকের কাছে এসে গুঞ্জন করতে দেখা যায়নি, এবং শোনাও যায়নি। সত্যি সত্যি ভালো ছেলে বলে পরিচিত সুনামের মানুষগুলিই এখানে এসে ভিড় করে।

এইজন্যই তো সুপ্রিয়া চৌধুরীর নাম শুনলে ভয় পায় অনেক পরিবারের মন। ঠিক এই জন্যই তো সুপ্রিয়ার দুর্নাম বড় তীব্র হয়ে ওঠে। বিধু চৌধুরীর ঐ মেয়ে বেছে বেছে ঠিক ভালো ভালো মাথাগুলিকে ডেকে এনে নষ্ট করে! যে পরিমল ফার্স্ট ক্লাস কোলিয়ারি ম্যানেজার হবে বলে রোজ সন্ধ্যাবেলা মাইনিং ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে এসে বই পড়ত, সেই পরিমলকেই দেখা যায় রোজ সন্ধ্যাবেলা ঐ এক-টুকরো ঘেসো জমির উপর সুপ্রিয়ার সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলছে।

কেমন করে এমন অসম্ভব হয়? অনেকে বলে যে, মেয়েটা অদ্ভুত এক মিষ্টি হাসির জাল ফেলে এক-একটি ভালো ছেলের মন টেনে নিয়ে এসে ঐ অফুরান চায়ের ঝরনার মধ্যে ছেড়ে দেয়। পথে যেতে যেতে পরিমলদের মতো কোন ভালো স্বভাব, ভালো চেহারা আর ভালো অবস্থার ছেলেকে দেখতে পেলে হঠাৎ না কি নিজে থেকেই যেচে আলাপ করে সুপ্রিয়া, তারপর চা-এর নেমন্তন্ন করে ফেলে।

জিমন্যাসিয়ামের পরেশ আর নেপাল কিন্তু বলে—চা-এর নেমন্তন্ন করে, না ঘেঁচু করে! বিধু চৌধুরীর মেয়ে রীতিমত অহংকারী, নিজের থেকে যেচে আলাপ করবার মতো মেয়েই সে নয়। পরিমলেরাই নিজের থেকে যেচে সুপ্রিয়ার ভাই পল্টুকে একটা বাজে কাজের ছুতো নিয়ে ডাকতে যায়। ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্য সুপ্রিয়া ওদের চা খেতে বলে। ব্যস, তারপর আর কি? তারপর থেকে ওরা ওদের ক্যাংলা চোখের লোভ নিয়ে সুপ্রিয়া চৌধুরীর সুন্দর মুখের হাসি দেখবার জন্য রোজই চা খেতে আসে।

কে জানে কাদের কথা সত্যি! সুপ্রিয়া পথে যেতে যেতে কোন ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে তাঁকে চা-এর নেমন্তন্ন করছে, এই দৃশ্য অবশ্য কখনও কারও চোখ পড়েনি। আর পরিমলেরাই বা কেন যে পল্টুর মতো একটা ছেলেকে কোন বাজে কাজের ছুতো করে ডাকতে যাবে, তা'ও কিছু বোঝা যায় না।

কিন্তু এটা তো খুবই স্পষ্ট করে বোঝা যায় যে, সুপ্রিয়া তার হাস্যময় সুন্দর মুখের অভ্যর্থনা অবারিত করে রেখেছে। সুপ্রিয়ার মনে কোন আপত্তি নেই, প্রতিবাদ নেই। এই সব বান্ধবদের কোন মুখরতাকে কখনো একটুখানি ভুরু কুঁচকেও শাসন করে না সুপ্রিয়া। যেন একদল মূর্তিমান স্তব সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে হল্লা করছে, এবং সুপ্রিয়া তার মুখের সেই সুস্থির হাসির জ্যোতি নিয়ে মন্দিরেশ্বরী দেবিকার মতো নীরবে সবই শুনছে।

একমাস বা দু'মাস, স্তবগুলি যেন ক্লান্ত হয়ে আসে। তারপর দেখা যায়, পরিমল আবার রোজ সন্ধ্যায় মাইনিং ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে বই পড়ছে। বিধু চৌধুরীর বাড়ির এই অফুরান চা-এর ফোয়ারার চারদিকে তৃষ্ণার্ত পরিমলেরা আর কলরব করে না। কলরব করে অমিয়, অধীর আর শান্তিনাথ।

পরিমলদের বিপন্ন সুনামের বিপদ কেটে যায়। বরং সুনাম আরও বেশি প্রশংসার গৌরব নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সত্যি এরা বড় ভালো ছেলে, বড় শক্ত মনের ছেলে। বিধু চৌধুরীর ঐ মেয়ের চোখের লোভ আর মিষ্টি হাসির উদ্দেশ্য পরিমলদের কাউকেই শিকার করতে পারল না। নিশ্চয় সুপ্রিয়া চৌধুরীকে হয় ভয় পেয়ে, নয় ঠাট্টা করে ওরা সরে গিয়েছে। টাকাপয়সা খরচ না করে ভালো জামাই পেয়ে যাবেন, বিধু চৌধুরীর সেই ধূর্ত স্বপ্ন সফল আর হলো না। হবেও না বোধ হয়।

কিন্তু সুপ্রিয়া চৌধুরীর মতিগতি সম্বন্ধে সন্দেহগুলি এরপর একেবারে একটি কঠিন বিশ্বাসের হাওয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর সন্দেহ করবার কি দরকার? প্রমাণই তো পাওয়া যাচ্ছে, একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা। পরিমলেরাই আক্ষেপ করে আর বলতে গিয়ে লজ্জা পায়, সুপ্রিয়ার বাড়ির ঐ অফুরান চা-এর ফোয়ারার উদ্দেশ্য যে-মুহূর্তে ওরা টের পেয়েছে, সেই মুহূর্তে ওরা পালিয়ে এসেছে। একেবারে কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে সুপ্রিয়া স্বচ্ছন্দে যে-সব কথা বলে, সে কথা শোনবার পর কোন ভদ্রলোকের পক্ষে আর ওখানে এক মিনিটও বসে থাকা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

সেদিন উশ্রীর বালিয়াড়ির উপর এক রক্তসন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে পুব আকাশের কোল থেকে পূর্ণচাঁদের ছায়া যখন ছড়িয়ে পড়ল, ঠিক তখনই বিধু চৌধুরীর বাড়ির বারান্দায় চায়ের আসরে অমিয়দের উল্লাস আর হাসি হল্লার পাশে একটি নতুন মুখের হাসি দেখতে পাওয়া গেল। কী আশ্চর্য, শেষে সুধাংশুর মতো ছেলেও এসে ধরা দিল সুপ্রিয়া চৌধুরীর মিষ্টি হাসির কাছে!

পরিমলেরা আর অমিয়রা যদি আসে, এবং সুপ্রিয়া যদি ওদের ধরে আনবার চেষ্টা করে, তবে তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট করে বোঝা যায়, কারণ পরিমলেরা আর অমিয়রা সকলেই অবিবাহিত যুবক, এবং ওদের বিয়ে দেবার জন্য ঘরের মানুষ এখনও তেমন কিছু ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সুধাংশু যে প্রায়-বিবাহিত। কে না জানে, হৃদয়বাবুর একমাত্র মেয়ে মাধুরীর

সঙ্গে সুধাংশুর বিয়ের প্রস্তাব একেবারে পাকাপাকি সুস্থির হয়ে গিয়েছে। ছেলে নেই হৃদয়বাবুর, ঐ একটি মাত্র মেয়ে। অথচ সম্পত্তি অনেক। হৃদয়বাবুর মেয়ে মাধুরী দেখতেও বেশ সুন্দর। সুধাংশুর মতো ছেলের সঙ্গে মাধুরীর মতো মেয়ের বিয়ে হলে ভালো হয়, এই সত্য কে না স্বীকার করবে? হৃদয়বাবুর সম্পত্তি পাবে তাঁর জামাই সুধাংশু, এবং সুধাংশু বিয়ের পর তিন বছরের জন্য বিলেতে গিয়ে একটা পরীক্ষা দিয়ে আসবে, এই ব্যবস্থাও যে একেবারে হিসেব করে তৈরি করে রাখা হয়েছে। সুধাংশু সবই জানে! সুধাংশুর বাবাও বড় বেশি খুশি হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সুধাংশুর বাবার আর্থিক অবস্থাও সুবিধার নয়। টাকাপয়সার অভাবের জন্যই সুধাংশু আর তিনটে বছর রিসার্চ করবার সুযোগ পেল না। বাধ্য হয়ে একটা ছোট কোলিয়ারির তিনশো টাকা মাইনের ম্যানেজার হয়ে দিন কাটাচ্ছে সুধাংশু।

আর কিছুদিন পরে হৃদয়বাবুর মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ে হবে, এবং বিয়ের পর হৃদয়বাবুর টাকায় তিন বছরের মতো বিলেতে থেকে যাকে পড়াশুনা করতে হবে, সেই মানুষ বিধু চৌধুরীর মেয়ের পাল্লায় পড়ে এ কী ভয়ঙ্কর ভুল করছে! ওর সুনাম যে এখনি বিপন্ন হবে। ওর মতি-গতির রহস্য বুঝতে না পেরে স্বয়ং হৃদয়বাবুই যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন। হৃদয়বাবুর মেয়ে মাধুরীও কি শুনতে পাবে না? সুপ্রিয়া চৌধুরীর চা আর হাসিছড়ানো কথার মায়ার কাছে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকবে যে-সুধাংশু, সেই সুধাংশুকে বিয়ে করতে মাধুরীর মনও কি বেঁকে বসবে না?

একদিন দু'দিন তারপর আর দুটো সপ্তাহ, সুধাংশুকে বিধু চৌধুরীর বাড়িতে রোজই সন্ধ্যায় যেতে দেখা যায়। এবং এত ভালো ছেলে সুধাংশুকেও লোকের মনের সন্দেহগুলি আর ক্ষমা করতে পারে না। সুধাংশুর দুর্নামের গুঞ্জন প্রথমে মৃদু মৃদু, তারপর একেবারে মুখর হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

পথে যেতে যেতে সুপ্রিয়ার সঙ্গে সুধাংশুর কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি এবং সুপ্রিয়াও গায়ে পড়ে সুধাংশুকে চা খেতে বলেনি। সুপ্রিয়ার ভাই পল্টুকে ম্যাজিক্ শেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে অমিয়র মতো একটা ছুতো করে বিধু চৌধুরীর বাড়িতে আসেনি সুধাংশু। সত্যি সত্যিই একটা কাজের দায়ে এক সন্ধেবেলা হঠাৎ এসে বিধু চৌধুরীর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল সুধাংশু। বাইরের ঘরে তখন সুপ্রিয়ার গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অমিয়র এসরাজ বিভোর হয়ে বাজছিল।

মস্ত বড় একটা কাপড়ের বাণ্ডিল এক হাতে কাঁধের উপর তুলে, আর দশটাকার দশটা নোট হাতে নিয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে থাকে সুধাংশু। অকস্মাৎ সুপ্রিয়ার গান থেমে যায় এবং দু'টি অতি তীব্র উৎসুক চক্ষু নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে সুপ্রিয়া হাসতে থাকে—এ কি ব্যাপার, সুধাংশুবাবু?

সুধাংশু—আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হলো কোডারমা স্টেশনে। তিনি আরও পাঁচদিন পরে ফিরবেন। আপনার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এই কাপড়ের বাণ্ডিল আর এই টাকা আমার কাছে গছিয়ে দিলেন।

দুঃখ প্রকাশ করে সুপ্রিয়া—তাই বলে আপনি নিজেই এত বড় একটা বোঝা বয়ে নিয়ে এলেন কেন? চিঠি পাঠিয়ে একটা খবর দিলেই তো আমি রামসেবককে আপনার কাছে পাঠিয়ে এগুলি আনিয়ে নিতে পারতাম।

সুধাংশু হাসে—আপাতত বোঝাটা রাখি কোথায়?

সুপ্রিয়া লজ্জা পেয়ে নিজেকেই ধমক দেয়—আঃ ছিঃ, আমি এতক্ষণ করছি কি? দিন, আমার হাতে দিন।

হাত বাড়িয়ে সুধাংশুর হাত থেকে কাপড়ের বাণ্ডিলটা তুলে নেয় সুপ্রিয়া।

চলে যাচ্ছিল সুধাংশু। সুপ্রিয়া অনুরোধ করে—একটু বসুন সুধাংশুবাবু, এক মিনিট।

রামসেবক নয়, নিজের হাতেই চা-এর কাপ নিয়ে এসে সুধাংশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় সুপ্রিয়া।

চা খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় সুধাংশু। সুপ্রিয়া বলে--না, আর আপনার সময় নষ্ট করব না।

সুপ্রিয়া নিজেই একটু সময় নষ্ট করে সুধাংশুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে গেট পর্যন্ত আসে।

আর একদিন এসে চা খাবার জন্য সুধাংশুকে অনুরোধ করতে ইচ্ছে করে। হাসিমুখে চট করে এই সামান্য একটু অনুরোধ করে ফেললেই তো হয়। কিন্তু হাসতে গিয়ে বার বার গম্ভীর হয়ে যায় সুপ্রিয়ার চোখ দুটো, অনুরোধটা মুখের কাছে এসেও বার বার আটকে যায়।

শেষ পর্যন্ত অনুরোধ করেই ফেলে সুপ্রিয়া--আপনি কি আর একদিন একটু সময় নষ্ট করতে পারবেন?

সুধাংশু হাসে--আর একবার এসে চা খাবার জন্য?

সুপ্রিয়া--হ্যাঁ, বুঝেই তো ফেলেছেন।

সুধাংশু বলে--আসব।

চলে যায় সুধাংশু। অমিয়র হাতের এসরাজ আবার সুর ছড়াতে আরম্ভ করে। কিন্তু যার গলার গানকে আপন করে কাছে ধরে রাখবার জন্য অমিয়র এসরাজের এই আকুলতা, সে কোথায়? যেন এই উল্লাসের ছন্দ ভেঙে দিয়ে সুপ্রিয়া অন্য কোন একটা কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ঘুরঘুর করছে।

ঠিকই অনুমান করেছে অমিয়রা। ভিতরের বারান্দার উপরে বসে এখন ব্যস্তভাবে কাপড়ের বাণ্ডিল খুলছে সুপ্রিয়া। নোটগুলিকে রুমালে বাঁধছে। পল্টুকে হাঁক দিয়ে ডাকছে। মণ্টুকে নতুন প্যাণ্টটা পরিয়ে দেখছে। সংসারের কাজের জন্য যেন হঠাৎ মায়া উথলে উঠেছে সুপ্রিয়ার মনে।

অমিয় তার এসরাজ থামায়। এই কয়েক মিনিটের ঘটনার মধ্যে একটা নতুন বিস্ময়ের রহস্য যেন ফুটে উঠেছে, চুপ করে বসে বোধহয় তাই দেখতে থাকে অমিয়দের মনের চোখ। যে সুপ্রিয়া কোনদিন অমিয়দের কাউকে নিজের হাতে চা-এর কাপ এনে চা খেতে অনুরোধ করেনি, সেই সুপ্রিয়া আজ যে বেশ স্বচ্ছন্দে আর বেশ খুশি হয়ে নিজের হাতে চা-এর কাপ নিয়ে সুধাংশুর হাতের কাছে তুলে ধরল! সুধাংশুর সঙ্গে গেট পর্যন্ত এগিয়েও গেল। এ যে সুপ্রিয়ার বড় বেশি ভদ্রতা। কোনদিন পরিমলের মতো মানুষকেও গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেনি সুপ্রিয়া। সুধাংশুর সঙ্গে কথাও তো বলেছে সুপ্রিয়া। কে জানে কি কথা, আর কেমন করে হেসে হেসে কথাগুলি বলেছে সুপ্রিয়া।

অমিয়দের চোখ ভুল সন্দেহ করেনি। এক সপ্তাহ যেতে না যেতে তিনবার সুধাংশুকে চা খেতে আসতে দেখে শুধু সুধাংশুকে ভালো করে চিনতে পেরেছিল অমিয়রা। কিন্তু তখনো বুঝতে পারেনি যে, সুপ্রিয়াকেই ভালো করে চিনে ফেলবার দরকার হয়ে পড়েছে।

দশটা দিন পার হতেই অমিয়রা বেশ ভালো করে চিনে ফেললো সুপ্রিয়াকে। সুপ্রিয়ার গানের সঙ্গে এসরাজ বাজাবার জন্য বৃথা আর আশা না করাই ভালো। সুধাংশু আসা মাত্র সব ভুলে যায় সুপ্রিয়া। আরও অদ্ভুত, সুধাংশুকে যেন চীফ গেস্টের মতো বিশেষ আদর আর বিশেষ সম্মানে তুষ্ট করার জন্য সবার ভিড়ের হাসি ও হল্লা থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখে সুপ্রিয়া। অমিয়রা যখন বাইরের ঘরের ভিতরে, সুধাংশু তখন বারান্দার চেয়ারে। অমিয়রা যখন বারান্দায়, সুধাংশু তখন সামনের ঘেসো জমির উপর একটা বেতের মোড়ার উপর। অমিয়দের চোখের সামনে সুপ্রিয়ার মুখ সব সময় এবং শুধুই হাস্যোচ্ছল, আর সুধাংশুর চোখের সামনে সুপ্রিয়ার সেই মুখই তো মাঝে মাঝে বেশ গম্ভীর, আর চোখ দুটি

তো বেশ শান্ত।

আর বেশি দিন নয়, বিধু চৌধুরীর বাড়ির গরম চা-এর ঝরনার উত্তাপ আর সহ্য করতে না পেরে অদৃশ্য হয়ে গেল অমিয়রা। এবং তারপর বেশিদিন নয়, অমিয়দের আতঙ্ক আক্ষেপ আর অস্বস্তিভরা নিঃশ্বাসের রটনায় এই সত্য জানতে আর কারও বাকি থাকে না যে, বেচারা অমিয়রা পালিয়ে আসতে পেরেছে আর বেঁচেছে। কিন্তু সুধাংশুর বোধহয় বাঁচবার আশা নেই।

এই অভিযোগের প্রমাণও স্বচক্ষে দেখা যায়। বিধু চৌধুরীর বাড়ির সেই উল্লাসের মৌচাক ভেঙে গিয়েছে, একেবারে গুঞ্জনহীন একটা স্তব্ধতা। না ক্যারাম, না হারমোনিয়ম, না ব্যাডমিণ্টন ; সবই যেন উল্লাস হারিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু দুটি মূর্তি। সুধাংশু আর সুপ্রিয়া। কখনও ঘরের ভিতর, কখনও বা বারান্দায় এবং প্রায়ই চুনের দাগ-আঁকা ব্যাডমিণ্টন লনের ঘাসের উপর দুটি বেতের মোড়ার উপর মুখোমুখি বসে ; কে জানে কিসের গল্প করে ওরা দুজন।

হাতে একটা পাখা নিয়ে সুপ্রিয়া যেদিন সুধাংশুকে বাতাস করবার জন্য হঠাৎ মোড়া থেকে উঠে দাঁড়াল, সেদিন যেন এক পলকের চমক খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল সুধাংশুর।

সুধাংশু আশ্চর্য হয়ে বলে—একি করছ তুমি?

সুপ্রিয়া গম্ভীর মুখ নিয়েই বলে—আমার যা ভালো লাগছে, তাই করছি।

সুধাংশু ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়—তুমি না বুঝে ভুল করছ সুপ্রিয়া, তুমি নিজেরই ক্ষতি করছ।

সুপ্রিয়া বলে—নিজের ক্ষতির কথা ভাবি না, ভাববার দরকার নেই।

পাখা থামিয়ে কি-যেন ভাবে সুপ্রিয়া। তারপর আরও জোরে হাত চালিয়ে, যেন অদ্ভুত এক গম্ভীর মনের বেপরোয়া উল্লাসে, পাখার বাতাস ছড়াতে থাকে সুপ্রিয়া। তারপর বলেই ফেলে—আপনি আর এখানে চা খেতে আসবেন না, এই তো ভয়। সেই ভয়ের জন্য তৈরি হয়েই আছি।

দু'চোখ বন্ধ করে এবং একটু ভয় পেয়ে কিছুক্ষণ পাখার বাতাস সহ্য করে সুধাংশু, তারপর চলে যায়।

হয়তো এই বাড়ির গেটের কাছে সুধাংশুর ছায়া আর দেখা দিত না কোন দিন। সুপ্রিয়া চৌধুরীর হাতের এগিয়ে দেওয়া চা-এর কাপ আর ঐ পাখার বাতাসের সংকল্প স্পষ্ট করে বুঝে ফেলতে আর একটুও দেরি হয়নি। তবু সুধাংশুকে আসতে হলো একদিন। বিধু চৌধুরীর বাড়ির চায়ের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে নয়, সুপ্রিয়ার হাতের পাখার বাতাসকে ধিক্কার দেবার জন্যই মনের জ্বালা নিয়ে ছুটে আসে সুধাংশু। সুধাংশুর জীবনে একটা ক্ষতি হতে চলেছে এবং সেই ক্ষতির কারণ হলো সুপ্রিয়া।

সুধাংশু বলে—তুমি যে নিতান্ত একটি দুর্নামের মেয়ে, একথা আমি জানতাম না, এবং জানতাম না বলেই তোমার যত ছল নেমন্তন্নের পাল্লায় পড়ে এখানে এসে দুর্নাম কুড়িয়েছি।

সুপ্রিয়া—এই কথা বলবার জন্যই কি এসেছেন?

সুধাংশু—বলতে এসেছি, তুমি আমার যা ক্ষতি করবার তা তো করলেই কিন্তু আর কারও ক্ষতি করো না। ভদ্রলোকের মেয়ে একটু ভদ্রভাবে সুখী হতে চেষ্টা কর।

সুপ্রিয়া—আপনার কি ক্ষতি হলো বুঝতে পারছি না।

সুধাংশু—হৃদয়বাবু আমার দুর্নাম শুনে ভয় পেয়েছেন। বাবার কাছে এসে বলেই গিয়েছেন যে, তিনি এখন বেশ কিছুদিন দেরি করতে চান। আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন কি না, সেটা আর একবার ভেবে দেখতে চান।

সুপ্রিয়া—বিয়ের কথা কি ঠিক হয়েই গিয়েছিল?

সুধাংশু--সবই ঠিক ছিল, বিয়ের পর বিলেত গিয়ে পড়াশুনা করবার ব্যবস্থাও ঠিক হয়েছিল। তার জন্য হৃদয়বাবু টাকা দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।

সুপ্রিয়া দুই অপলক চক্ষুর তীব্র আগ্রহ নিয়ে শুনতে থাকে সুধাংশুর এই ধিক্কার আর অভিযোগ। তারপর শান্তভাবে প্রশ্ন করে--যদি আমি আপনার সুনাম রটিয়ে দিতে পারি তা হলে বিয়ে ভেঙে যাবে না তো?

সুধাংশুর মুখের হাসিতে যেন কঠোর একটা শ্লেষ শিউরে ওঠে--তুমি আমার সুনাম বাঁচিয়ে তুলবে? কিছু বলবার থাকলেও এইরকম বাজে কথা বলতে হয় না, অন্তত আমার কাছে বলে কোন লাভ নেই।

সুপ্রিয়া--কেন বলুন তো?

সুধাংশু--আমি তোমাকে চিনেছি।

চলে যায় সুধাংশু।

এর পরে আর বোধহয় একটা মাসও পার হয়নি, যেদিন উশ্রীর বুকে ভরা আষাঢ়ের ঢল নেমেছিল।

এরই মধ্যে অদ্ভুত এক ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। হৃদয়বাবু এসে সুধাংশুর বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে গিয়েছেন। সুধাংশুর মতো ছেলের মতিগতি সম্বন্ধে তাঁর যে ভুল সন্দেহ হয়েছিল, সেই ভুলের জন্য তিনি লজ্জিত, অনুতপ্ত, দুঃখিত। সুধাংশুর বিপন্ন সুনাম আবার নতুন করে আরও প্রশংসার গৌরবে মহীয়ান হয়ে এই পাড়া আর ঐ পাড়ার প্রায় সব বাড়ির মুখে মুখে বেজে উঠেছে। এই মাসের মধ্যেই কোন একটি ভালো দিনে সুধাংশুর সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে চুকিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন হৃদয়বাবু। সুধাংশুর বাবা বলেছেন--তবে তাই হোক।

কিন্তু কী আশ্চর্য, আর ক'দিন পরে হৃদয়বাবুর মেয়েকে বিয়ে করে এবং তার কিছুদিন পরে যার বিলেত চলে যাবার কথা, সেই সুধাংশু ধীরে ধীরে এক মেঘলা সন্ধ্যায় আস্তে আস্তে হেঁটে বিধু চৌধুরীর বাড়ির বারান্দার উপর এসে দাঁড়ায়।

বাইরের একটি তক্তাপোশের উপর বাক্স-বন্ধ হারমোনিয়ম। তারই উপর একটা খোলা বই। এবং সেই খোলা বইয়ের উপর কপাল উপুড় করে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে আছে সুপ্রিয়া।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সুধাংশু। ঐ তো সেই দুর্নামের মেয়ে, যে মেয়ে নিজের বুকে ইচ্ছা করে আর-এক দুর্নামের ছুরি বসিয়েছে। কিন্তু তবু কেমন চুপটি করে আর শান্তটি হয়ে স্বচ্ছন্দ ঘুম ঘুমোচ্ছে।

আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যায় সুধাংশু, সুপ্রিয়ার মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে ডাকে—সুপ্রিয়া!

চমকে উঠলেও মুখ তুলতে পারে না সুপ্রিয়া। সুধাংশু বলে—বেশ তো, সময় দিচ্ছি ভালো করে চোখ মুছে নিয়ে তারপর তাকাও।

মুখ না তুলেই সুপ্রিয়া বলে—আপনি আজ আবার কেন এলেন?

সুধাংশুর গলার স্বর যেন আবার এক দুঃসহ বিস্ময়ের জ্বালায় তপ্ত হয়ে বেজে ওঠে—আমার সুনাম রটেছে আবার কিন্তু তোমার কি লাভ হলো সুপ্রিয়া?

সুপ্রিয়া—আপনার ক্ষতি হলো না, এই লাভ।

সুধাংশু চেঁচিয়ে ওঠে—কিন্তু এরকম জঘন্যভাবে তুমি আমার সুনাম রটালে কেন? ছিঃ!

সুপ্রিয়া—কে বললে আমি আপনার সুনাম রটিয়েছি?

সুধাংশু ক্রুদ্ধস্বরে যেন ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকে—মাধুরীর মেজদির কাছে কে গিয়ে গল্প করেছে? তুমিই আমার হাত চেপে ধরেছিলে একদিন, আর আমিই ঘেন্না করে তোমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছি, এই অদ্ভুত বাজে মিথ্যে কথা কে নিজের মুখে হেসে

হেসে বলে এসেছে মাধুরীর মেজদির কানের কাছে?

সুপ্রিয়া—মিথ্যে কথা ঠিকই, কিন্তু বড় দুর্নামের মেয়ের দুর্নাম তাতে এমন কিছু বাড়েনি। আমার কোন ক্ষতি হয়নি, অথচ আপনার লাভ হলো।

সুপ্রিয়ার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকে সুধাংশু। চোখ দুটোও যেন হঠাৎ পিপাসিতের মতো ছলছল করে।

সুপ্রিয়ার মুখটা করুণ হয়ে ওঠে—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

সুধাংশু—কি ক্ষমা করব?

সুপ্রিয়া—আমার মিথ্যা কথা।

সুধাংশু—কেমন করে ক্ষমা করব?

সুপ্রিয়া হাসে—আজ শেষবারের মতো চা খেয়ে আর রাগ না করে চলে যান।

মুখ ঘুরিয়ে, চোখ লুকিয়ে, ব্যস্তভাবে চা আনবার জন্য উঠে দাঁড়ায় সুপ্রিয়া। কিন্তু চলে যেতে পারে না। হাত বাড়িয়ে সুপ্রিয়ার একটি হাত শক্ত করে ধরে ফেলে সুধাংশু।

সুপ্রিয়া চমকে ওঠে, ভয় পায়, চোখ তুলে তাকাতে পারে না—আপনি কেন ভুল করছেন?

সুধাংশু—তোমার একটা মিথ্যে গল্প আমার হাত ধরেছিল, কিন্তু আমি সত্যি সত্যি তোমার হাত ধরলাম। বিশ্বাস না হয়, তাকিয়ে দেখ ভালো করে।

তারপর, উশ্রীর বুক প্লাবিত করে আরও কয়েকবার আষাঢ়ের ঢল নেমেছিল, এবং বিধু চৌধুরীর বাড়ির এই ঘরের জানালার কাছে বসে সেই প্লাবন দেখে একা একা নীরবে হেসেছিল সুপ্রিয়ার জলভরা চোখ।

এবং তারপর আর বেশিদিন নয়। বিধু চৌধুরীর এই বাড়ির দিকে তাকাতে গিয়ে পথের লোক বুঝতে পারে, ওটি একটি বিয়ের বাড়ি।

পুষ্পকীট

পথের উপর মস্তবড় একটা ভিড় এবং সেই ভিড়ের পাশ কাটিয়ে যাবার মতো একটু জায়গাও নেই! এক কুঁজো-ঠানদির হাত ধরে এক তরুণী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, এগিয়ে যাবার জন্য পথ খুঁজছে, কিন্তু পথ পাচ্ছে না।

কে পথ পেল বা না-পেল, তার জন্য সেই ভিড়ের মনে কোন চিন্তা নেই, একটু ভ্রূক্ষেপও নেই। ভিড়ের মাঝখানে এক ভেলকিওয়ালা তখন একটা ছোট ছেলের জিভ কেটে ফেলেছে ; ছটফট করে কাতরাচ্ছে ছেলেটা, তার দু'কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মাথায় বাবরি চুলের গোছা ঝাঁকিয়ে, গলাফাটা স্বরে চেঁচিয়ে আর হাতে একটা বড় ভোজালি নিয়ে ভেলকিওয়ালা সেই ভিড়ের যত থরথর দৃষ্টি, কোঁচকানো ভুরু, সিঁটকানো নাক আর ফ্যালফ্যালে চোখের দিকে তাকিয়ে তখন এক ভয়ংকর আবেদন জানাতে আরম্ভ করেছে, "অর্ডার মি স্যার, সাহেবলোগ অর্ডার কর, বাবুলোগ হুকুম দাও, আর মশাইলোগ আজ্ঞা শুনাও। কাবুলী হো আর বাঙালী হো, জাপানসে এসে থাক আর জার্মানীসে এসে থাক, জহুরী হো আউর বকরিওয়ালা হো, শেঠ ভিস্তি আমির ফকির মহাত্মা সব কোই দাঁড়িয়ে দেখ, হামি এই ভোজালিসে হামার এই ছেলেকে এখনি দুই টুকরা করিয়ে দেবে। তারপর. .দেখ না জাদুকা খেল, ওই কাটা ছেলে বাঁচিয়ে উঠবে, হাসিয়ে হাসিয়ে আপনাকে সেলাম দিবে।"

ভিড়ের শত শত মুখ থেকে একসঙ্গে হুকুমের হল্লা জেগে ওঠে ঃ "হ্যাঁ, কাট কাট কাট, দেখি তোমার কেরামতি!"

ভেলকিওয়ালা তার হাতের ভোজালিতে টোকা মেরে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে জাদুর বুলি আওড়াতে থাকে, "ইরি মিরি চিরি, চিরি মিরি বাউ। কাম অন মাংকি স্কাল, কাম অন নাউ।"

হঠাৎ এক খেপা মহিষের গর্জন, ভিড়ের বাঁ দিক থেকে তেড়ে আসছে গর্জনটা, প্রায় এসে পড়েছে। ভাগ্ ভাগ্—পালা পালা—আতঙ্কিত ভিড়ের গলা ভেদ করে একটা ভয়ার্ত হল্লার রব জেগে ওঠে। এত জমাট আর নিরেট ভিড়টা সেই মুহূর্তে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ে। ভেলকিওয়ালা জিভ-কাটা ছেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ভেলকিওয়ালার হাত ধরে চেঁচায়, "ভাগিয়ে বাবাজান।"

ভেলকিওয়ালাও ভীতভাবে চেঁচায়, "ভঁইস, পাগলা ভঁইস।" তারপর ছেলের হাত ধরে আর লাফ দিয়ে মিঠাইওয়ালার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে।

ফাঁকা পথ। শুধু দেখা যায়, পথের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে চলে যাচ্ছে এক তরুণী, সঙ্গে এক কুঁজো বুড়ি। তরুণীর সুন্দর মুখটা মিট মিট করে হাসছে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই তরুণী একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিক করে হেসে ওঠে।

পিছু পিছু আস্তে আস্তে হেঁটে আর সিগারেট টানতে টানতে আসছে যে, তারই দিকে তাকাচ্ছে তরুণী, আর যেন মনের খুশি চাপতে না পেরে ফিক করে হেসে ফেলছে। আশ্চর্য, খেপা মহিষের গর্জন শুনে এতবড় একটা ভিড় ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল, শুধু পালিয়ে গেল না ওই একটা কুঁজো বুড়ি আর একটি সুন্দর মেয়ে, যারা আগে আগে চলেছে। আর তাদের পিছনে ওই একটা ছোকরা, মনের সুখে সিগারেট টানতে টানতে চলে যাচ্ছে। হাফ-হাতা একটা কামিজ গায়ে, ধুতির কোঁচা কামিজের পকেটে গোঁজা, পায়ে ধুলোমাখা নাগরা, আর হাতে একটা ঝোলা। কে জানে, কী আছে ছোকরার ওই ঝোলার মধ্যে!

আতঙ্কিত ভিড়ের যারা পথের দু'পাশের দোকানে এসে ঠাঁই নিয়েছে, তারা আশ্চর্য হয়ে

প্রশ্ন করে, "কই, খেপা মহিষ গেল কোন্ দিকে? ইস, কী বিশ্রী গর্জন রে বাবা!"

দোকানদারেরা হেসে ওঠে, "মহিষ-টহিষ নয় মশাই, ওটা একটা হরবোলা।"

"হরবোলা? কী আশ্চর্য! না, কখনই হতে পারে না।"

দোকানদারেরা হাত তুলে পথের সেই ছোকরাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে, "হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ ওই দেখুন, ওই ছোকরাটাই খেপা মোষের ডাক ডেকে আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে।"

তবু ভুল ভাঙতে চায় না। অনেকেই বেশ একটু রাগ করে আবার পথের উপরে নেমে আসে। দোকানদারেরা চেঁচিয়ে আর হেসে ডাক দেয়, "ও নৃপেন, তোমার কেরামতিটা আর একবার দেখাও, নইলে এরা বিশ্বাস করছে না।"

গাঁ গাঁ গাঁ--কী ভয়ানক গর্জন! মুখের সিগারেট ফেলে দিয়ে সেই ছোকরা সত্যিই শিঙেল জন্তুর মতো মাথা দুলিয়ে, একেবারে খাঁটি খেপা মহিষের ডাক ডেকে দোকানের দিকে ছুটে আসে। হো-হো হাসির সাড়া জেগে ওঠে চারদিকে। ছোকরাও আবার ব্যস্তভাবে হন হন করে চলে যায় পথের ওই সেদিকে, যেদিকে এগিয়ে চলেছে সেই তরুণী আর কুঁজো ঠানদি।

ওর নাম নৃপেন। দোকানদারেরা ওকে চেনে। রোজ সকালে এই রাস্তা দিয়ে নৃপেন ওই বেগুনী রঙের ঝোলা হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যায়। ঝোলার ভিতর আছে একগাদা সুগন্ধ ধূপকাঠি। সারাদিন ফেরি করে ধূপকাঠি বেচে যখন রাতের দিকে ঘরে ফেরে নৃপেন, তখনও এই পথ দিয়ে যায়। প্রায় রোজই বাড়ি ফেরার সময় এই পথের দু'দিকে যত ব্যস্ততা আর গম্ভীরতা, যত হিসাব আর দুশ্চিন্তা, যত আক্ষেপ আর মতলবগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য হাসিয়ে দিয়ে চলে যায় নৃপেন।

দোকানে আলোগুলি যখন মিটমিট করে, পথের উপর রাতের ধোঁয়া আর ধুলো যখন কিছুটা থিতিয়ে আসে, নিবু-নিবু হয়ে জ্বলতে থাকে পথের দু-পাশে মরচে-পড়া লোহার পোস্টের মাথায় মিউনিসিপ্যালিটির বাতি, তখন পথের সেই আলো-আঁধারি রহস্যের মধ্যে আর-এক রহস্য চমকে ওঠে। সবাই শুনতে পায়, যেন শোকের কান্না কাঁদতে কাঁদতে কোন মেমসাহেব চলে যাচ্ছে, কী করুণ সেই বিলাতী সুরের কান্না! সবাই ব্যথিতভাবে আশ্চর্য হয় এই তল্লাটে মেমসাহেবের কান্না এল কোথা থেকে?

কিন্তু পরমুহূর্তে ভুল ভাঙে। আর বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। হরবোলা নৃপেনই ওই কান্না কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে। পথের লোকের মুখে, আর দোকানের ভিড়ের চোখে-মুখে হাসির দমক লাগে।

এইভাবে এক-একদিন কুকুরের ডাক ডেকে পথের দু'পাশের যত কুকুরকে রাগিয়ে দিয়ে চলে যায় নৃপেন। কুকুরগুলোর রাগ দেখে পথের মানুষ অস্বস্তি বোধ করে। তারপর হঠাৎ এক আষাঢ় মাসের স্যাঁতসেঁতে রাতে পথের বাতাসে যেন আঁতুড় ঘরের বাচ্চা ছেলে কেঁদে ওঠে। অফুরান কান্না, কোন সান্ত্বনা মানছে না, কান্নার স্বর যেন বাচ্চাটার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। প্রথম শুনে চমকে উঠলেও রাস্তার লোক বুঝতে পারে এবং একটু পরেই দেখতে পায় যে, হ্যাঁ, ঠিকই সন্দেহ করা হয়েছে, নৃপেন-হরবোলা আঁতুড়ে কান্না কেঁদে কেঁদে চলে যাচ্ছে। হেসে ফেলে সবাই, এবং কেউ কেউ একটু বেশি খুশি হয়ে প্রশংসাও করে ফেলে কায়দাগুলো বড় সুন্দর রপ্ত করেছে ন্যাপাশালা।

হরবোলা নৃপেনের কেরামতি দেখে এত লোক খুশি হয়, কিন্তু নৃপেন নিজে বোধহয় জীবনে এই প্রথম খুশি হলো। মেয়েটি, সেই সুন্দর মেয়েটি কুঁজো ঠানদির হাত ধরে পথের উপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু এগিয়ে যাবার পথ পাচ্ছিল না। ভিড়ের কোন বো একটু ভ্রূক্ষেপও করছিল না। সবাই বিভোর হয়ে ভেলকিওয়ালার একটা বাজে খেলা দেখছে পথের দু'পাশ জুড়ে যেন এঁটে দাঁড়িয়ে আছে ভিড়টা। মেয়েটির পক্ষে, আর ওই কুঁজো বুড়ির পক্ষে এগিয়ে যাবার উপায় নেই, সাধ্যিও নেই। দূরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে নৃপে

সেই অবস্থার দৃশ্যটা দেখেছে। শুনেছে নৃপেন, মেয়েটি কতবার চেঁচিয়ে অনুরোধ করেছে-- আমাকে একটু পথ ছেড়ে দিন। কিন্তু ফল হয়নি। ভিড়ের মধ্যে যারা তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখল আর সেই অনুরোধও শুনল, তারাও নড়ল না। সবাই একেবারে নিরেট হয়ে ভেলকিওয়ালার খেলা দেখতে থাকে।

এগিয়ে আসে নৃপেন। মেয়েটিকে প্রশ্ন করে, "কেউ সরছে না বুঝি?"

মেয়েটি বলে, "হ্যাঁ দেখুন না, পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত বলছি, তবু কেউ সরে যাবার নাম করে না।"

নৃপেন বলে, "এখুনি সরিয়ে দিচ্ছি।"

তারপর সেই গাঁ-গাঁ-গাঁ, খেপা মহিষের প্রচণ্ড-গম্ভীর গর্জন। সেই মুহূর্তে ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। ফিক করে হেসে ফেললো মেয়েটি।

কেরামতিটা যে এমন সুন্দর একটি তরুণীর উপকারের কাজে লাগবে না বা লাগতে পারে, এমন ধারণা নৃপেনের কল্পনাতেও কোনদিন দেখা দেয়নি। বোধহয় তাই নৃপেনের মনটা এই প্রথম এত খুশিতে ভরে উঠেছে। নৃপেনের কেরামতিটা দেখে কত শত মানুষই তো রোজ হাসছে, কিন্তু ওরকম মিষ্টি হাসি তো কেউ হাসেনি।

হাতে বেগুনী রঙের ঝোলা, এক-গাদা ধূপকাঠি এখনও ঝোলাটাকে ভারী করে রেখেছে। আজ ভাল বিক্রি হয়নি। শরীরটাও বড় ক্লান্ত। তবু মনটা যেন হঠাৎ বড় বেশি ভালো হয়ে গিয়েছে। নৃপেনের মনে হয়, অগুরু ধূপের গন্ধমাখা একটা বাতাস যেন বুকের ভিতরে ঢুকেছে।

কুঁজো ঠানদির হাত ধরে সেই মেয়েটির পিছু পিছু অনেক দূর একই পথে হেঁটে এসেছে নৃপেন। গাঙ্গুলীপাড়ার কাছে এসে একবার শুধু থমকে দাঁড়িয়েছে আর দেখতে পেয়েছে নৃপেন, ওরা বাঁ দিকের কাঁচা রাস্তাটা ধরে চলে গেল। কোথায় গেল কে জানে! কোথায় থাকে ওরা? অমন ছিমছাম ফিটফাট আর সুন্দর মুখের মেয়ের পক্ষে তো ওদিকের কোন বাড়িতে থাকবার কথা নয়। ওদিকে তো শুধু কতগুলি ডোবা আর কেয়ার ঝোপ আর ইটখোলা। হ্যাঁ, গোটাকয়েক মেটে বাড়ি ওদিকে আছে, তার একটিতে থাকেন লক্ষ্মী কেবিনের শিবুদা। বেচারা শিবুদা, মাসে দশ টাকা বাড়ি ভাড়া দিতেই হিমসিম খেয়ে একবেলা উপোস করেন। ইটখোলার কালি-সরদারেরাও ছাগল-ভেড়া নিয়ে কেয়াতলার ওই সব মেটে বাড়িতে থাকে। ওই মেয়ে, ফোটা ফুলের মতো অমন সুন্দর মুখ, সে কেন কেয়াতলার মতো বাজে জায়গায় মেটে বাড়িতে থাকবে? কিন্তু যদি থাকে? যদি ওরা নৃপেনের মতো খুব গরীব হয়? নৃপেনের বুকের ভিতর অদ্ভুত একটা আশা যেন দুরু-দুরু করে।

গাঙ্গুলীপাড়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ডান দিকের বস্তিটার দিকে তাকায় নৃপেন। ওই বস্তির মধ্যে একটি ঘরের ঘুলঘুলিতে এখনও আলো ফুটে ওঠেনি। ওটা হলো নৃপেনের ঘর। এখন ঘরে গিয়ে এই ঝোলা নামাতে হবে, কেরোসিনের কুপি জ্বালতে হবে, উনুন ধরাতে হবে, তারপর রাঁধতে হবে।

নাঃ, আর ভালো লাগে না। আজ শুধু কয়েকমুঠো চাল জুটিয়ে শুধু আচারের লঙ্কা দিয়ে খেয়ে নিলেই চলবে। মাঝরাত পর্যন্ত ছ্যাঁকছোঁক করে রান্না করা আর ভালো লাগে না। মিছে সময় নষ্ট। তার চেয়ে বরং ওই মেয়েটির সুন্দর মুখটাকে ঘণ্টাখানেক ভাবলে কাজ হবে।

যেন পেটের ক্ষুধাটারও চাড় নেই। আস্তে আস্তে বস্তির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে নৃপেন।

কেয়াতলার এক ডোবার ধারে ছোট একটা মেটে বাড়ি। কুঁজো ঠানদি সকালের রোদে দাওয়ার উপর পা টান করে বসে এদিক-ওদিক তাকান। তারপর গলার স্বর চড়িয়ে যেন এই

সকালবেলার শোভাটাকে গাল পাড়েন ঃ "শুধু সাজ আর সাজ, শুধু বাহার দিয়ে শাড়ি পরা আর খোঁপা বাঁধা। বলি, তোর কোন্ নাগর এসে তোর রূপ দেখে ভিরমি খাবে যে, দিনরাত এত সাজছিস?"

ঘরের ভিতরে জানালার উপর আরশি রেখে মনে মনে হেসে ওঠে সুমতি। কুঁজো ঠানদির ঠাট্টা আর গালাগালি দুই-ই সমান। রোজই ও-রকম দুটো চড়া কথা শুনতে হয়, শুনে শুনে গা-সহা হয়ে গিয়েছে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রোজই গুনগুন করে গান করে, খোঁপা বাঁধে, কপালে টিপ আঁকে আর চোখে কাজল দেয় সুমতি।

কুঁজো ঠানদি তারপর সুমতিকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর নিজের ছেলেকেই গালমন্দ করতে থাকেন, "ওরে ও নুটু, বলি তোর আদুরে বোনঝিকে কি পরী বানিয়ে সাহেবপাড়ায় বেচতে নিয়ে যাবি?" ছুঁড়িকে এত লাই দিস কেন? শুধু সাজবে সাজবে সাজবে, একটা ঘুঁটে ভেঙে দিয়েও সংসারের কম্মি করবে না। ছুঁড়ি ভেবেছে কি?"

নুটবিহারী দাঁতের মাজন আর ঘটি নিয়ে দাওয়ার উপর এসে বসেন ঃ "সকালে উঠেই বাপ-মা-মরা মেয়েটাকে গালমন্দ করছ কেন মা? সাজলে সুন্দর দেখায়, সাজতে ভালো লাগে, এই তো সাজবার বয়স, এতে দোষ কি আছে?"

কুঁজো ঠানদি ফেটে পড়েন ঃ "না, ওর কোন দোষ নেই। যত দোষ আমার। বেশ তো, আদুরে বোনঝিকে পরী সাজিয়ে সাহেবপাড়াতে দিয়ে আয়, আর আমি মরি, তারপর আমার পেটে খড় পুরে জাদুঘরে রেখে দিয়ে আসিস।"

সুমতির নুটুমামা কিন্তু একটুও বিচলিত হন না, রাগও করেন না। হাত মুখ ধুয়ে শান্তভাবে ঘরের ভিতর চলে যান। তারপর নিজের হাতে কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার আয়োজন করেন। সকাল নটার মধ্যে বের হয়ে যেতে হবে। গাঙ্গুলীপাড়া থেকে অনেক দূরে, চিড়িয়ামোড় পার হয়ে বি.টি. রোডের উপর একটা কারখানার আপিসে ফাইল-দপ্তরীর কাজ করেন সুমতির নুটুমামা।

ততক্ষণে সুমতির সাজ সারা হয়ে গিয়েছে। তবুও আর একবার জানালার কাছে দাঁড়ায়, আরশিতে মুখ দেখে, ঘাড়ের দু'পাশে পাউডার ছড়ায়। তারপর? তারপর ডোবার ওপারে সুপুরিবাগানের মাথার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কুহু কুহু কুহু—কোকিলের মিষ্টি ডাক। অঘ্রাণ মাসের সকালবেলায় কোকিল এল কোথা থেকে?

সুমতির চঞ্চল চোখ দুটো যেন উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে যত সুপুরি-নারকেল আম-নিম আর শিমুলের ডালপালাগুলির দিকে তাকিয়ে কোকিল খুঁজতে থাকে। কিন্তু বোঝা যায় না, কোকিলের স্বর ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে সুমতি। ও কে? শিবুবাবুর বাড়ির দাওয়ার উপর বসে রয়েছে কে? হাফ-হাতা কামিজ গায়ে, কোঁচাটা পকেটে গোঁজা, হাতের কাছে বেগুনীরঙের ঝোলা। কী আশ্চর্য, সুমতির মনের বিস্ময় যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে।

চোখ তুলে বেশ ভালো করে দেখতে থাকে সুমতি। কাল রাতে পথের ভিড়ের পাশে মানুষটাকে দেখে ঠিক বুঝতে পারা যায়নি যে, ওর মুখটা এত কচি। বেশ দেখতে। যতই বয়স হোক, পঁচিশের বেশি হবে না।

কুঁজো ঠানদি চিৎকার করেন, "বলি ও তেইশ বছরের ধিঙ্গি! রোগা মামাটা হাত পুড়িয়ে ভাত রাধছে, আর তুই চোখে কাজল বুলিয়ে কার চোখের মাথা খাচ্ছিস, অ্যাঁ?"

কুহু কুহু কুহু। আবার কোকিল ডেকে ওঠে, কিন্তু আর আশ্চর্য হয় না সুমতি। আর বুঝতে কিছু বাকি নেই। কোকিলের ডাক ডাকছে যে, সে-ই তো শিবুবাবুর বাড়ির দাওয়ার উপর বসে সোজা এইদিকে তাকিয়ে আছে। সুমতির সারা মুখটাই মিষ্টি হয়ে ওঠে, দু'ঠোঁটের

ফাঁকে মিটমিট করে সুন্দর একটি হাসি।

সেই হাফ-হাতা কামিজ, পকেটের ভিতর কোঁচাটা গোঁজা, হাতে বেগুনী রঙের ঝোলা, পায়ে ধুলো-মাখা নাগরা, কিন্তু নৃপেনের প্রতিদিনের জীবনের পথটা যেন একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে একটু বড় হয়ে গিয়েছে। বস্তি থেকে বের হয়ে কেয়াতলার এই পথ দিয়ে একটু ঘুরে গিয়ে তারপর গাঙ্গুলীপাড়ার পথ ধরে নৃপেন। একটা মেটে বাড়ির জানালায় ফোটা ফুলের মতো সুন্দর একটা মুখের হাসিকে রোজই দু'চোখে একবার দেখে নিয়ে তবে কাজের পথে এগিয়ে যেতে পারে। শিবুদা বলেছেন, "ও মেয়ের বিয়ে হবে না। বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই সুমতির মামা নুটুবাবুর। ফাইল-দপ্তরীর কাজ করেন নুটুবাবু, ছাপান্ন টাকা মাইনে পান, বিয়ের খরচ যোগাবেন কেমন করে?"

নৃপেন বলে, "কেন, কেউ যদি যেচে ওই মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তবে?"

শিবুদা হাসেন, "কে ওই মেয়েকে যেচে বিয়ে করতে যাবে? তুই?"

কোনও উত্তর দেয় না নৃপেন। শুধু চুপ করে বেহায়ার মতো হাসে! লক্ষ্মী কেবিনের শিবুদা চোখ পাকিয়ে ঠাট্টা করেন, "বেটা কচুবনের বেড়াল, তুই যেচে মরলেও তোকে কোন মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হবে না।"

—ফ্যাঁস ফ্যাঁস ফ্যাঁস! রাগী বেড়ালের ডাক ডেকে দু'থাবা তুলে শিবুদার ভুঁড়িটাকে আঁচড়ে আর খিমচে দিয়ে হাসতে হাসতে সরে পড়ে নৃপেন।

শিবুদা বিশ্বাস করেন না, এই পৃথিবীর বোধহয় কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু নৃপেন বিশ্বাস করে, কেয়াতলার নুটুবাবুর বাড়ির ওই মেয়ে, সুমতি যার নাম, সে-মেয়ে রোজ সকালে জানালার ধারে নৃপেনেরই আসার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেয়াতলার পথের উপর এসে দাঁড়াতেই সুমতির সারা মুখে অদ্ভুত একটা হাসি চমকে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে নেয় না, একটুও লজ্জা পায় না সুমতি। যতক্ষণ দেখা যায়, যতক্ষণ না নৃপেন গাঙ্গুলীপাড়ার রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে যায়, ততক্ষণ নৃপেনের দিকে তাকিয়ে থাকে সুমতি।

কেয়াতলার মেটে বাড়ির ওই জানালা, প্রতিদিন যেন নৃপেনকে একটি আশার আশ্বাস দেয়। ফোটা ফুলের মতো হেসে সুন্দর হয়ে রয়েছে সুমতির মুখ। কোনওদিন কোন মুহূর্তে একটুও গম্ভীর হয়ে যায় না। বিরক্ত হয় না, কোন অভিমানও কেঁপে ওঠে না ওই মেয়ের কাজলপরা চোখের ভুরুতে। নৃপেনের প্রতিদিনের জীবনের পথে যেন হাসিভরা নৈবেদ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুমতি।

আর ভয় করবার কিছু নেই। শিবুদার কথাগুলি নিছক একটা মিথ্যার হুমকি। আকাশে চাঁদ থাকলে এই কেয়াতলার জ্যোৎস্না ছড়ানো পথের উপর দিয়ে একবার না ঘুরে গিয়ে পারে না নৃপেন। বেশ সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি নাকিসুরে কেঁপে কেঁপে যেন একটা বেহালার সুর নৃপেনের মুখে সুরেলা হয়ে বাজে। খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে সুমতি। সুমতির মুখের হাসিটা যদিও দেখা যায় না, কিন্তু মনে হয় নৃপেনের, এই মিথ্যা বেহালার সুর শুনে সুমতির প্রাণটা খুশি হয়ে হাসছে।

তারপর একদিন, সে-রাতে নৃপেনের মনের সাহসটা যেন হঠাৎ হেসে উঠল। নুটবিহারীবাবুর সেই মেটে বাড়ির ছোট জানালাটার একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায় নৃপেন। সুমতি হাসে ঃ "কাকে খুঁজছেন?"

নৃপেন বলে, "বড় ক্লান্ত হয়েছি, এক গেলাস জল খাওয়াও সুমতি।"

চমকে ওঠে সুমতি ঃ "অ্যাঁ? আপনি আমার নামটাও জানেন দেখছি!"

"তা আর জানব না। না জেনে উপায় কি?"

"কী বললেন?"

"আমার নামটাও তো তোমার জানা উচিত।"

সুমতি হাসে ঃ "বলুন।"

"আমার নাম নৃপেন। তোমাদের মতো আমিও কায়স্থ।"

"আপনি কি করেন?"

"এতদিন বলতে গেলে কিছুই করছিলাম না। কিন্তু এখন করছি।"

"কি?"

সিঁথির ঢালাই-কারখানায় কাজ শিখছি। একবছর কাজ শেখার পর ষাট টাকা মাইনের চাকরি হবে।"

"তারপর?"

"তারপর তুমিই বলো না?"

"আমি কেন বলব? আপনি মামাবাবুকে বলুন।"

"সময় হলেই বলব, সুমতি।"

বাড়ির ভিতরের দাওয়া থেকে কুঁজো ঠানদির চিৎকার হঠাৎ বেজে ওঠে ঃ "ফিসির ফিসির কিসের শব্দ হচ্ছে, কে কথা বলছে, ও সুমতি?"

—চিক চিক চিক! কিচ কিচ কিচ! তালুতে জিভ ঠেকিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে কুঁজো ঠানদির ওই সন্দেহটাকে যেন ঠাট্টা করে নৃপেন। মুখে আঁচল দিয়ে হাসির শব্দ চেপে রাখে সুমতি। কুঁজো ঠানদি আরও জোরে আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, "ছুঁচো ছুঁচো, ঘরে ছুঁচো এলো কোত্থেকে সুমতি, শিগগির বাতি নিয়ে দেখ।"

আর দেরি করে না নৃপেন। সুমতিও বাতি হাতে তুলে নেয়। বাতির আলোর আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে সুমতির মুখ। নৃপেনের মনে হয়, শুধু বাতির আভায় নয়, জীবনের সবচেয়ে আনন্দের একটা আশ্বাস পেয়ে রঙিন হয়ে উঠেছে সুমতির মুখ।

পথে এসে নৃপেন একবার ভাবে, শিবুদার কাছে এত তাড়াতাড়ি সব কথা না বলে ফেলাই ভালো। বড় বেশি আশ্চর্য হয়ে যাবেন অবিশ্বাসী শিবুদা।

মিথ্যে কোকিল ডেকেছিল অঘ্রান মাসের এক সকালে, আর সত্যি কোকিল ডেকে উঠল ফাল্গুন মাসের এক সন্ধ্যায়। কেয়াতলার শিবুদার বাড়ির দাওয়ার উপর বসে নুটবিহারীবাবুর বাড়ির আলোমাখা মূর্তির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। নৃপেন সিঁথির ঢালাই-কারখানায় হাড়ভাঙা অ্যাপ্রেন্টিসের কাজ সারতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। এখানে এসে পৌঁছতে সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে।

কেয়াতলার কাঁচা সড়কে ধুলোর উপর একটা মোটরগাড়ি। নুটবিহারীবাবুর বাড়ির দাওয়ায় আর উঠোনে গ্যাসবাতি জ্বলছে। শাঁখের শব্দ আর বার বার উলু-উলু রব। আমবাগানের অন্ধকারের মধ্যে সত্যিই কোকিল ডাকে বার বার।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল নৃপেন। তারপর শিবুদার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, "সুমতির বিয়ে হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।"

"তোর কি এখনও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?"

"না, কিন্তু হঠাৎ এ-রকম একটা বিয়ে জমে উঠল কেমন করে?"

"মেয়ের রূপ দেখে নুটবিহারীবাবুর অফিসের স্টোরবাবু মেয়েকে পছন্দ করে ফেলেছে। মেয়েকে একসেট জড়োয়া দিয়ে আশীর্বাদ করেছে। বিয়ের খরচ পর্যন্ত স্টোরবাবু দিয়েছে। বেশ ভদ্রলোক, টাকাপয়সাও বেশ আছে, যদিও ঠিক সুমতির মতো মেয়ের বর হবার মতো ইয়ং নয়, আর চেহারাটাও কালো, তার উপর মাথায় চকচকে একটা টাক আছে।"

"বাঃ, বেশ মানিয়েছে।" হেসে চেঁচিয়ে ওঠে নৃপেন। নৃপেনের দু'চোখে যেন দুরন্ত একটা ঠাট্টার আগুন দপ করে জ্বলে ওঠে।

শিবুদা জিজ্ঞাসা করেন, "চা খাবি?"

"না, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে শিবুদা।"

"কি?"

"কাল যখন বর-বউ রওনা হবেন তখন..."

"কাল নয় রে, আজই আর একটু পরে বর-বউ হবে। বেলঘরিয়াতে বরের বাড়িতেই বাসর হবে।"

একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নৃপেন ঃ "তা হলে এখুনি উঠুন শিবুদা, বিয়ে বাড়ির সামনে পথের কাছে গিয়ে দাঁড়াই।"

"কেন রে?"

"গাধার ডাক ডাকব।"

হেসে ফেলেন শিবুদা। কিন্তু আপত্তিও করেন, "পরের বাড়ির ব্যাপারে যেচে এ সব রগড় করার দরকার কি নৃপেন? আমার বিয়ে যখন হবে তখন যত খুশি গাধার ডাক আর ঘোড়ার ডাক ডাকিস।"

উলুর শব্দ আরও জোরে শোনা যাচ্ছে। বরযাত্রীর দল উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। মোটর গাড়ির ড্রাইভার মুখের বিড়ি ফেলে দিয়ে স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়েছে। বর-বউ বের হয়ে এসেছে। গাড়ির ভিতর উঠছে।

"শিগগির চলুন শিবুদা।"—ছুটে এসে পথের উপর দাঁড়ায় নৃপেন।

সুমতির মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়। কী আশ্চর্য, ঠিক সেই ফোটা ফুলের মতো হাসি হাসি মুখ। এক ফোঁটা ব্যথা নেই সেই মুখের উপর। কাজল-আঁকা চোখের কোণে এককণাও জল নেই।

গাড়ির এঞ্জিন গোঁ গোঁ করছে। এইবার স্টার্ট নেবে গাড়ি। শিবুদার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে নৃপেন, সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা থাবা দিয়ে নিজের মুখটাকে আঁকড়ে ধরে গাধার ডাক ডাকবার জন্য তৈরি হয়।

গীয়ার টেনেছে ড্রাইভার। আর, গাড়ির চাকা সবেমাত্র গড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র এক আর্তনাদের সঙ্গে চমকে উঠে ব্রেক কষে গাড়ি থামায় ড্রাইভার। মর্মভেদী করুণ ও তীক্ষ্ণ একটা আর্তস্বর। কেঁউ কেঁউ কেঁউ, কাঁই কাঁই কাঁই। গাড়ির চাকায় চাপা পড়েছে একটা কুকুর।

বাধা পড়েছে, শুভযাত্রায় বড় বিশ্রী একটা বাধা। বরযাত্রীর দল চঞ্চল হয়ে গাড়ির চাকার দিকে তাকায়। ড্রাইভার এক লাফ দিয়ে বের হয়ে এসে পথের উপর উবু হয়ে বসে ও মাথা ঝুঁকিয়ে গাড়ির তলার দিকে তাকায়। কিন্তু কই? গাড়ির চাকার তলায় কোন আহত কুকুরের দেহ তো পড়ে নেই। কি ব্যাপার? বরযাত্রীর দল বলাবলি করে, এ কী রকমের ব্যাপার হলো?

শিবুদাও আশ্চর্য হয়ে নৃপেনের কানের কাছে ফিসফিস করেন, "কি ব্যাপার রে নৃপেন? রগড় করতে গিয়ে কাঁই কাঁই করে কেঁদে উঠলি কেন?"

ড্রাইভার এদিক ওদিক তাকায় ; তারপর হো-হো করে হেসে ওঠে ঃ "তাই বলি, হরবোলা নৃপেন দাঁড়িয়ে আছে এখানে!"

গাড়ির ভিতর থেকে চন্দনের ফোঁটা-আঁকা মুখ আর কাজলপরা চোখ নিয়ে সুমতি আস্তে আস্তে নৃপেনের দিকে তাকায়। ঠোঁটের ফাঁকে মিটমিট করছে সেই সুন্দর হাসি।

নৃপেনের হাত ধরে টান দেয় শিবুদা ঃ "হাঁ করে আর কী দেখছিস নৃপেন? ফোটা ফুলের মতো সুন্দর মুখ?"

নৃপেন বলে, "হ্যাঁ শিবুদা, কিন্তু বুঝতে পারছি না, ফুলের মধ্যেও কোন পোকা আছে।"

"আর বুঝতে হবে না, চা খাবি চল্।"

মায়াকুহেলী

ঘড়ির কাঁটা বলছে ভোর হয়েছে। সাড়ে পাঁচটা। কিন্তু মাঘ মাসের ভোরের এই কুয়াশাকে রাতের অন্ধকারের শেষঘুমের যত নিঃশ্বাসের বাষ্প বলে মনে হয়। দমদম এয়ারপোর্টের সব আলো কুয়াশার প্রলেপে ভেজাভেজা হয়ে ছলছল করে, জ্বলজ্বল করে না।

যাকে বিদায় দেবার জন্য এই ভোরে এয়ারপোর্টে এসে ঝলমলে রেস্টরুমের একটি কোচের উপর বসে আছে মানসী, সে কিন্তু এখনও এসে পৌঁছায়নি। নীতীশকে বোম্বাই নিয়ে যাবে যে ভাইকাউন্ট, সেটা ছাড়বে সকাল সাতটায়।

যার জন্যে আরও দুটি বছর অপেক্ষার কষ্ট সহ্য করতে হবে, তারই জন্যে বড়জোর আরও দেড়ঘণ্টার অপেক্ষা। বুকের ভিতর একটা চাপা-নিঃশ্বাসের যে কষ্টটা মাঝে মাঝে ছটফটিয়ে উঠছে সেটাই মানসীর আশার জীবনটাকে যেন ভয় পাইয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, মাত্র আর দেড় ঘণ্টার পথ-চাওয়া প্রতীক্ষাতেই যদি এত বেদনা থাকে, তবে পুরো দুটি বছরের পথ-চাওয়া আশার জীবন যে শুধু ভেবে ভেবে আর কষ্ট পেয়ে পেয়ে একটা শাস্তির জীবন হয়ে উঠবে।

সঙ্গে এসেছেন ভক্তি মাসিমা। তিনি তাঁর সর্বক্ষণের আদরের সেই উলের থলি আর কাঁটা জোড়াও সঙ্গে নিয়ে আসতে ভুলে যাননি। বয়স হয়েছে ভক্তি মাসিমার। কিন্তু চলাফেরার কাজে এখনও কোন স্থবিরতার বাধার ভার বোধহয় অনুভব করেন না। চিরকুমারী মানুষ, স্কুলের মেয়ে পড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন। সবচেয়ে সিনিয়র টিচার ভক্তি মাসীমা এখন তাঁর মেয়ে-স্কুলে হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সাদা চুলের খোঁপাটা শক্ত করে বাঁধা, চশমাটা শুধু একটু ঝুঁকে পড়েছে, মানসীর পাশের কোচের উপরে বসে একমনে উলের একটা জামপার বুনছেন ভক্তি মাসীমা। সেজভাই সমীরের বড় মেয়ে সুনন্দার জন্মদিনে এই জামপার উপহার দিতে হবে। আর মাত্র সাতটা দিন বাকি ; কাজেই. ভক্তি মাসিমা শুধু তাঁর হাতের উল আর কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত।

মানসীও টিচার। ঐ একই স্কুলে, যে-স্কুলের সবচেয়ে সিনিয়র টিচার হলেন ভক্তি মাসিমা। আর, ঐ মেয়ে-স্কুলেরই হস্টেলের একটি ঘর হলো মানসীর জীবনের ঘর। বাবা মারা গেছেন পনর বছর আগে। মা মারা গেলেন, সেও তো আজ প্রায় পাঁচ বছর আগের ব্যাপার। দাদা তো মা মারা যাবারও সাত বছর আগে থেকে আম্বালাতে থাকেন। দাদা বিয়ে করেছিল কানপুরে ; কিন্তু সেই বউদি আজ আর বেঁচে নেই। শুনেছিল মানসী, বউদি বেচারা খুবই ভালোমানুষ ছিল। দেখতে খুব সুন্দর। দাদা কিন্তু, যেন একটা প্রতিজ্ঞা করে, বউদিকে কোনদিন আম্বালাতে নিয়ে যাননি। বিয়ের পর তিন বছর ধরে, যেন একটা আশার অপেক্ষায় থেকে থেকে, শেষে কঠিন একটা অসুখে পড়ে মরেই গেলেন সেই বৌদি। মারা যাবার আগে মানসীকে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছিলেন সেই বউদি—আমি তো ইচ্ছে করলেই আম্বালাতে যেতে পারি। কিন্তু গিয়ে লাভ কি? সে এসে যদি না নিয়ে যায়, তবে গিয়ে লাভ নেই। কারও অনিচ্ছার সঙ্গে জেদ করে ঘর করা যায় না।

ভক্তি মাসিমা মানসীকে বলেছিলেন—মেয়েদের জীবনে একটা অসম্মানের বিয়ের চেয়ে চিরকুমারী হয়ে আর একলা হয়ে পড়ে থাকাও শান্তির জীবন। তা ছাড়া...কথাটা বলতে গিয়ে ভক্তি মাসিমা যেন বেশ জোরে একটা হাঁফ ছেড়েছিলেন—মানুষ চেনা বড় কঠিন।

মানসীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল। ভক্তি মাসিমা কি মানসীকে সাবধান করে দিচ্ছেন? নীতীশকেও কি চিনতে পারেনি মানসী? আজ দু'বছর ধরে যে মানুষ মানসীকে ভালোবেসে সুখী হয়ে আছে, মানসীর মুখের দিকে তাকালে যার চোখ দুটো এত

স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে, সেই মানুষ, সেই নীতীশও কি কঠিন মানুষ? চেনা কঠিন।

এ-কথা অজানা নয় মানসীর, নীতীশের বাড়ির মানুষেরা নীতীশের বিয়ে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। অনেক শিক্ষিতা সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু নীতীশ স্পষ্ট ভাষায় বাড়ির সব মানুষকে জানিয়ে দিতে পেরেছে, নামটাও বলে দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেনি ; টিচার মানসী সেনের সঙ্গেই একদিন বিয়ে হবে নীতীশের।

রাণু কাকিমা প্রশ্ন করেছিলেন--ভালোবাসার ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে?

নীতীশ বলেছিল--হ্যাঁ।

রাণু কাকিমা মুখ ভার করেছিলেন--তবে আর আমাদের কিছু বলার নেই।

কিন্তু নীতীশের দিদি আর বোন, অর্থাৎ অনুভা আর মৃদুলা তবু আপত্তির স্বরে প্রশ্ন করেছিল--তোমার মতো পজিশনের মানুষের সঙ্গে কি মানসীকে মানায়?

নীতীশ--আমি মানিয়ে নিলেই মানায়!

কথাটা ঠিকই বলেছিল নীতীশ। আর নীতীশের মুখ থেকে একথা শুনতে পেয়ে মানসীর সব নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নীতীশ ভালোবাসে মানসীকে, এ-ভালোবাসাকে অসাধারণ একটা উদার হৃদয়ের ভালোবাসা বলে বিশ্বাস করতেই হয়। ম্যাট্রিক পাস-করা এক অতি সাধারণ মেয়ে, পঁয়ষট্টি টাকা যার মাইনে, আর এই পঁয়ষট্টি টাকা না পেলে যার প্রাণ বোধহয় উপোস করে মরে যাবে, সে মেয়েকে ভালোবেসেছে ব্রাইট এ্যাণ্ড টমান মেশিন কোম্পানির চীফ-ইঞ্জিনীয়ার নীতীশ, সে মেয়েকে ভালোবেসেছে ব্রাইট এ্যাণ্ড টমসন মেশিন কোম্পানির চীফ-ইঞ্জিনীয়ার নীতীশ ; মাইনে যার দু'হাজার টাকা, তিনতলা যার বাড়ি, আর, যার গ্যারেজে তিনটে গাড়ির মধ্যে একটা গাড়ি শুধু অলস হয়ে পড়ে থাকে। নীতীশের তিন কুলের কোন ছেলে মানসীর মতো এত সাধারণ কোন মেয়েকে বিয়ে করেনি।

সাধারণ মেয়ে মানসী, ঠিকই, ঝলমলে রূপসী সে নয়। কিন্তু চোখ দুটোকে একটু অসাধারণ বলে মনে করতেই হয়। টানা-টানা চোখ, কালো তারা দুটোতে অদ্ভুত এক নিবিড়তার মায়া টলমল করে। চোখের বড় বড় পাতায় যেন একটা ঘুমন্ততার ছায়া জড়িয়ে আছে। চোখ বড় করে তাকাতে পারে না মানসী কিন্তু চোখ ছোট করে তাকাবার এই ভঙ্গীটা যেন একটা বিস্ময়, মানসীর সারা মুখ সেই বিস্ময়ের অদ্ভুত রকমের সুন্দর হয়ে ওঠে। ভক্তি মাসিমা বলেন, কালো মেয়ে। কিন্তু এক-একদিন যখন স্নান সেরে ভক্তি মাসিমার কাছে এসে চুপ করে আনমনার মতো দাঁড়িয়ে থাকে মানসী, তখন ভক্তি মাসিমার চোখে যেন অদ্ভুত এক স্নেহ চিকচিক করতে থাকে। ভক্তি মাসিমা বলেন, আমাদের সুনন্দার মুখটাও ঠিক তোর মুখের মতো। চন্দনের মতো রঙ।

শুনে হেসে ফেলে মানসী। নীতীশও একদিন বলেছিল, বুঝতে পারি না মানসী, তোমাকে মাঝে মাঝে কেন এত সুন্দর মনে হয়!

একদিন সাহস করে, আর বেশ একটু নির্লজ্জ হয়ে মানসীও বলে দিয়েছিল, তোমার চোখ দুটো এত সুন্দর, তাই।

কিন্তু...,যে-কথাটা বলতে গিয়ে আজও লজ্জার বাধা অনুভব করে মানসী, সে-কথা সেদিন নীতীশ নিজেই বলে ফেলেছিল--কিন্তু ভাবছি, বিয়েটা কবে হবে।

অপলক চোখ তুলে, যেন জীবনের এক পরম প্রতিশ্রুতির বাণী শোনবার আশায় নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মানসী। ময়দানের কৃষ্ণচূড়ার উপর তখন সন্ধ্যার আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সাদা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালও যেন লালচে হয়ে উঠেছে। মানসীর একটা হাত শক্ত করে ধরে নীতীশ বলে--আগে বিদেশ থেকে ঘুরে আসি। তারপর...।

--কি বললে? চমকে ওঠে মানসী।

নীতীশ--বড়জোর দুটো বছর ; ছটা মাস লণ্ডন, তারপর জার্মানী আর ইতালী। মেশিন

তৈরির কয়েকটা প্রসেস স্টাডি করে দেশে ফিরে আসব। ব্রাইট এ্যাণ্ড টমসনের ডিরেক্টর বোর্ড বলেছে, তাহলে আমার মাইনে হবে প্রায় তিন হাজার টাকা।

আরও নিবিড় আগ্রহের সুরে, মানসীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে, যেন তৃপ্তিময় নিঃশ্বাসের ভাষার মতো ফিসফিস করে কথা বলে নীতীশ--আমার অদ্ভুত একটা ধারণা হয়েছে মানসী, তোমাকে ভালোবাসি বলেই যেন আমার প্রসপেক্ট দিন দিন বড় হয়ে উঠছে। আমার অ্যামবিশন, আমি একদিন ব্রাইট এ্যাণ্ড টমসনের জেনারেল ম্যানেজার হব।...কি? কথা বলছ না কেন মানসী?

--হুঁ। মানসীর মুখের চন্দন রঙ যেন ঝলক দিয়ে উথলে ওঠে।

ঘড়ির কাঁটা বলছে, ছটা বেজেছে। কুয়াশা একটু ফিকে হয়েছে বলে মনে হয়। এয়ারফিল্ডের ট্যাক্সি-ট্রাকে তখনও জ্বলছে গুজ-নেক ফ্লেয়ার। রানওয়ের নিশানা জানিয়ে দিয়ে সোডিয়াম বার-লাইট জ্বলজ্বল করছে। মাইক ডাকছে, এয়ার-ফ্রান্সের যাত্রীদের তৈরি হয়ে নেবার জন্য। ইন্দোনেশিয়া থেকে একজন মহামান্য নাকি আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য জাতীয় পতাকা উড়িয়ে নিয়ে আর প্রচণ্ড শব্দ করে দুটো হেলিকপ্টার পূবের আকাশে উধাও হয়ে গেল। একদল বলাবলি করে--হাওয়াই ফৌজের কয়েকটা তুফানীও এইবার রওনা হবে।

ঘড়ির কাঁটা বলছে, ছ'টা পনের। এয়ার-ফ্রান্সের জেট প্লেন অনেকক্ষণ আগেই গোঁ গোঁ করে উধাও হয়ে গিয়েছে। রেস্টরুমের চাঞ্চল্য বেশ মৃদু হয়ে এসেছে। কে জানে কোন্ দেশ থেকে কোন্ প্লেনের হসটেস ঐ মেয়ে দুটি, যারা এখন ক্লান্তভাবে একটা কোচের উপর বসেছে আর হাতের ব্যাগ খুলে আয়না বের করেছে। একজন চুল আঁচড়ায় ; একজন ঠোঁটে লিপস্টিক বোলায়।

মানসীর কোচ থেকে দুটি কোচের পরেই একটি কোচে অনেকক্ষণ থেকে চুপ করে বসেছিলেন এক প্রৌঢ়া শ্বেতাঙ্গী, হাতে একটা হিন্দি বই। গাউনপরা সাজ বটে, তবু একটা কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়িয়েছেন। মনে হয়, অনেকদিন ভারতে আছেন এই মহিলা। মানসীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মহিলা স্নিগ্ধ হাসি হেসে আর দুই হাত তুলে বলেন—নমস্তে শ্রীমতী, নমস্তে।

ভক্তি মাসিমা আশ্চর্য হয়ে শ্বেতাঙ্গী প্রৌঢ়ার মুখের দিকে তাকালেন।

শ্বেতাঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—বিউটিফুল ইণ্ডিয়াকো ম্যাঁয় বহুত পিয়ার করতা হুঁ।

একজন কাস্টম-অফিসার এসে মহিলার একটা ব্যাগের দিকে তাকিয়ে কি যেন বললেন।

সেই মুহূর্তে শ্বেতাঙ্গী মহিলা রুষ্টস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—হোয়াট্ ! সাস্‌পেক্ট মি?

কাস্টম-অফিসার বিনীতভাবে হাসেন--আমি আমার ডিউটি করছি, ম্যাডাম।

মহিলা বলেন--ব্যাগের মধ্যে সন্দেহের কিছুই নেই। ওনলি এ ব্রঞ্জ নাটারাজা এণ্ড এ স্টোন গ্যানডি।

—আই বিলিভ ইট। কাস্টম-অফিসার জানালেন কিন্তু ব্যাগটার ভিতরটা একবার দেখবার দাবি ছাড়লেন না।

অগত্যা ব্যাগ খুললেন শ্বেতাঙ্গী প্রৌঢ়া। ঠিকই, ব্রঞ্জের নটরাজ ছিল, পাথরের গান্ধীও ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল পনের জোড়া জুতো।

কাস্টম অফিসার বললেন—নাউ, প্লীজ, পে ফর ইট।

—হোয়াট! ইজ দিস ইণ্ডিয়ান ম্যানার্স?

ও ইয়েস। কাস্টম-অফিসার আবার হাসেন।

শ্বেতাঙ্গী প্রৌঢ়া বলেন--শেম!

কিন্তু একি? চমকে ওঠে মানসী। কখন এসেছে, আর এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নীতীশ, দেখতেই পায়নি মানসী। মানসীর এত সাধের অপেক্ষার আর আশার চোখ দুটো যেন ধন্য হয়ে নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

--কখন এসেছ মানসী?

প্রশ্ন করতে গিয়ে নীতীশের চোখও যেন একটা মুগ্ধতার সুখে জ্বলজ্বল করে।

মানসীর পাশের কোচটা খালি। যেন নীতীশের জন্য, মানসীর বিষণ্ণ মনটাকে আর একবার ভালোবাসার আশ্বাসে ভরে ওঠবার সুযোগ দেবার জন্য কোচটা খালি হয়ে পড়ে আছে। বসুক নীতীশ, বিদায়-মুহূর্তের আগের সময়টা মধুরতায় ভরে যাক্। নীতীশের এই মুগ্ধ চোখ দুটো মানসীর ঝাপসা চোখের দিকে তাকিয়ে ঝাপসা হয়ে যাবে, আজ নীতীশের এই দূরে চলে যাবার কঠোর ঘটনাটাও মানসীর জীবনে একটা স্নিগ্ধ প্রতিশ্রুতির আনন্দ হয়ে উঠবে।

মানসীর পাশের কোচের উপর বসে ব্যস্তভাবে কথা বলে নীতীশ--আমাকে বোধহয় পুরো তিনটে বছর বিদেশে থাকতে হবে।

মানসীর চোখের কালো তারায় যেন একটা হঠাৎ-বেদনার আঘাত লেগে চমকে ওঠে--আরও একটা বছর!

নীতীশ হাসে--হ্যাঁ।

মানসীর কালো চোখের বিস্ময় একটু হতভম্ব হয়ে যায়। কী অদ্ভুত প্রসন্নতার আবেগে উচ্ছল হয়ে হাসছে নীতীশের দু চোখ। নীতীশ যেন বিদায়-মুহূর্তের করুণতার মধ্যে একটুও বেদনার ছায়া দেখতে পাচ্ছে না।

বেশ সুস্থ বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোক, বয়সে নীতীশের সমান হবে বলে মনে হয়, পাটকিলে রঙের পশমের ট্রাউজার আর কোট গায়ে, হাতে একটা ছোট ব্যাগ, ঠিক মানসীর মুখোমুখি হয়ে অপর সারির একটা কোচের উপর বসলেন।

মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীতীশ বলে--এখন পুরো দুটো বছর লণ্ডনে, তারপর কন্টিনেণ্ট।

অপরিচিত ভদ্রলোক যেন হঠাৎ একটা খুশির উল্লাসে বলে ওঠেন--আপনি লণ্ডন যাচ্ছেন?

নীতীশ--হ্যাঁ।

--এখন তাহলে এই সাতটার প্লেনে বোম্বাই যাবেন?

--হ্যাঁ।

--আমিও যাচ্ছি।

--কোথায়?

--লণ্ডন।

--উদ্দেশ্য?

--উদ্দেশ্য হলো প্রসপেক্ট। রয়্যাল নেভিতে অ্যাণ্টি-সাবমেরিনের ট্রেনিং নেবার জন্য সিলেক্টেড হয়েছি। তিনজন ভাগ্যবানের মধ্যে আমি একজন।

--আপনি কি এখন ইণ্ডিয়ান নেভিতে...?

--হ্যাঁ, এতদিন অবশ্য মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ছিলাম।

অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কথা বলবারও কোন আগ্রহ নেই। দরজার দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় নীতীশ--এসেছে, ওরা সবাই এসেছে।

মানসী--কারা এসেছে?

--আমার অফিসের স্টাফ।

মস্ত বড় ফুলের মালা আর অনেক ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে নীতীশের অফিসের একদল লোক এসেছে!

এসেছে ব্রাইট এ্যাণ্ড টমসনের কমার্শিয়াল ম্যানেজার উইলিয়ামসন। এসেছে দিদি অনুভা আর বোন মৃদুলা। রাণু কাকিমাও এসেছেন। বিপুল এক সমাদরের আর শ্রদ্ধার জগৎ থেকে যেন নানা উপহারের একটা মুখর ভিড় নীতীশের বিদায়ের উৎসবকে হাসিতে-খুশিতে রঙিন করে দেবার জন্য এসেছে। আর, নীতীশও যেন মন-প্রাণের সব আগ্রহকে বিপুল ব্যস্ততায় মত্ত করে নিয়ে এই বিদায়-উৎসবের আনন্দকে ধন্য করে দিতে চায়। ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় নীতীশ।

মৃদুলা ডাকছে—নীতুদা, শিগগির এদিকে এস।

চলে যায় নীতীশ। চোখ তুলে দেখতে পায় মানসী, সত্যি ব্যস্ততাময় একটা প্রশস্তির উৎসবের মধ্যে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীতীশ। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া আর করমর্দন। শুধু গুড লাক আর গুড লাক! কত রকমের খুশির গুঞ্জন নীতীশকে ঘিরে ধরেছে।

মানসীর মনের সেই অসার কল্পনাটা যেন নিজের লজ্জায় মরে যায়। আজ নীতীশের ঝাপসা চোখ দেখবার আশাটা যেন একটা বিদ্রূপ।

ঘড়ির কাঁটা বলছে, ছটা পঁয়তাল্লিশ। মাত্র আর পনেরটা মিনিট, মানসীর জীবনের গত দু'বছরের ভালোবাসার মানুষ, মানসীর আশার প্রতিশ্রুতি ঐ নীতীশ রায় তারপর আকাশলোকের যত মেঘের ঢেউ পার হয়ে চলে যাবে।

মাইক বলছে, ফগ গলে গিয়েছে, ভিজিবিলিটি অতি চমৎকার। কিন্তু মানসীর চোখ দুটো যেন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথায় ভিজিবিলিটি? কিচ্ছু না। সবই ধোঁয়াটে মনে হয়।

তবু দেখতে পাওয়া যায়, অনুভাদি যেন কটমট করে মানসীর দিকে তাকিয়ে মৃদুলার সঙ্গে কথা বলছেন। মৃদুলার ঠোঁটের ফাঁকে একটা হাসির রেখা কুঁচকে রয়েছে। মানসীর আশার দুঃসাহসকে যেন তীব্র একটা শ্লেষ দিয়ে বিঁধে বিঁধে খুশি হয়ে উঠেছে মৃদুলার হাসিটা।

ভক্তি মাসিমা হঠাৎ কি যেন বললেন। মানসী চমকে ওঠে—কি?

দূরের কোচের উপর তেমনই শান্তভাবে বসে আর হাতের উলের দিকে তাকিয়ে ভক্তি মাসিমা বললেন—চল, এবার যাই।

সামনের কোচের উপর বসা সেই ভদ্রলোক হঠাৎ বলে ওঠেন—এখনও সময় আছে।

—কি বললেন? ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করে মানসী।

—বলছিলাম...ঐ যে উনি...আপনার কে হন জানি না...উনি তো এখনও চলে যাননি। প্লেন ছাড়ার এক মিনিট আগেও সীট নেওয়া যায়।

মানসী বিড় বিড় করে—বুঝলাম না।

—উনি যে প্লেনে বোম্বাই যাবেন, আমিও সেই প্লেনে বোম্বাই যাব। এখনও সময় আছে। উনি আবার এখানে ফিরে আসবেন ; কাজেই আপনার এখনই চলে যাবার দরকার হয় না।

মানসী হাসে—কিন্তু আপনি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?

—আজ্ঞে?

—যাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁদের এতক্ষণে এসে পড়া উচিত ছিল।

—না না, কেউ আসবে না। কারও আসবার কথা নেই। আমি কারও অপেক্ষা করছি না।

মানসী আবার হাসতে চেষ্টা করে—এটা একরকম ভালো। দেখাসাক্ষাৎ আগেই সেরে নিয়ে এখানে আসা উচিত। এখানে হৈ হৈ করে বিদায় দেবার আর নেবার ঘটা দেখাবার কোন মানে হয় না।

--আমার অবশ্য ওসব কোন ঝঞ্ঝাটের ভয় নেই। এখানে-ওখানে কোথাও কারও কাছ থেকে বিদায়-টিদায় নেবার ব্যাপার আমার অদৃষ্টে নেই।

--কেন?

--আপনজন বলতে একমাত্র মা ছিলেন। তিনিও ছ'মাস আগে চিরকালের মতো চলে গিয়েছেন। কাজেই...

--কেন, বন্ধু-বান্ধব?

--কিচ্ছু না। আমি সেদিক দিয়ে খুব ফরচুনেট, একেবারে একলা।

ঠিকই, ভদ্রলোক যেন একেবারে একলাটি হয়ে শান্তভাবে বসে আছেন। বিদায় দিতে একটা মানুষও আসেনি। কোন উৎসবে এসে খুশি হয়ে এই ভদ্রলোকের হাতে অভ্যর্থনার ফুল তুলে দিচ্ছে না। কোন চোখ করুণ হয়ে এই ভদ্রলোকের দিকে তাকাচ্ছে না।

হাতের ঘড়ির দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে যেন নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন ভদ্রলোক--মা বলেছিলেন, আমাকে আগে মরতে দে অজয়, তারপর যেখানে ইচ্ছে চলে যাস্। তাই হলো, মা মারা গেলেন, আর ছ'মাস পরেই বাইরে যাবার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

অজয় হঠাৎ যেন আনমনার মতো তাকিয়ে কথা বলতে থাকে--আমারও ইচ্ছে করে চিরকাল বাইরে থাকি। তা অবশ্য সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তবে কম্যাণ্ডের কর্তারা খুশি হলে আরও দু-চার বছর ট্রেইনি হয়ে বিদেশে থাকবার সুযোগ পাওয়া যাবে!

বুঝতে পারেনি মানসী, শুনতেও পায়নি বোধহয়, আরও কত কথা বকবক করে বলেই চলেছেন এই ভদ্রলোক, যাঁর নাম অজয়। মনে হয়, সংসারের সব মায়ার টান থেকে ছাড়া-পাওয়া একটা মানুষ যেন সমুদ্রের জলে চিরকাল ভেসে থাকবার স্বপ্নের সঙ্গে কথা বলছে, রূপকথার মতো সে-সব কথার কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। ঝড়ের দিনে অশান্ত সমুদ্রের ঢেউ তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে ডেস্ট্রয়ার। শত্রুর সাবমেরিনের পেরিস্কোপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, পাঁচ মাইল নৈর্ঋতে। ডেকের উপর ভয়াল ডেপথ-চার্জ মজুত হয়ে আছে। রাডারে অনেক দূরের একটা বিমানের চোরা আবির্ভাবের গুঞ্জনও ধরা পড়ে গিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠেছেন অফিসার--চার্জ। বাতাসের বুকের উপর যেন একটা ক্ষিপ্ত আক্রোশের গর্জন ফেটে পড়ল। তোলপাড় সমুদ্রের বুকে একটা জলস্তম্ভ উথলে উঠছে।

অজয় বলে--ভাবতে মন্দ লাগছে না। এরকম কাজে দিনগুলি একরকম ভালোই কেটে যায়।

পোড়ো সিগারেটের ছোট টুকরোটাকে ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে হাতঘড়ির দিতে তাকায় অ্যান্টি-সাবমেরিনের অজয়।

ভক্তি মাসিমা ডাক দেন—চল্ মানসী।

মানসী যেন ভক্তি মাসিমার এই চেঁচিয়ে বলা কথাটাও শুনতে পায়নি। অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মানসীর কালো চোখর তারা দুটো যেন ছটফট করে একটা অভিযোগ জানাতে চাইছে। হঠাৎ বলে ওঠে মানসী--তাই বলে ওভাবে সারাজীবন বাইরে বাইরে পড়ে থাকাও উচিত নয়।

অজয় হাসে—সারাজীবন কিন্তু মাইনেটা ভালো পাওয়া যায়। প্রসপেক্ট আছে।

—প্রসপেক্ট না ছাই। হঠাৎ ভ্রূকুটি করে কেমন-যেন রুষ্টস্বরে কথাটা বলে ফেলেছে মানসী। অজয়ও আশ্চর্য হয়ে তাকায়।

বোধহয়, নিজেরই এই হঠাৎ-মুখরতার রকম দেখে একটু লজ্জিত হয়ে মানসী বলে--আপনার আপনজন কেউ নেই বলেই কি আপনি নিজের উপর নিষ্ঠুর হবেন?

অজয়—কি বললেন?

মানসী--কাজ সিখে দেশে ফিরে আসুন।

অজয়--আপনি. .সত্যিই কি আপনি আমাকে অনুরোধ করছেন?

মানসী--হ্যাঁ।

দোপাটির ছোট একটা গুচ্ছ, জরি দিয়ে জড়ানো। মানসীর হাতটা কখন ভুল করে দোপাটির সেই গুচ্ছটাকে পাশের কোচের উপর রেখে দিয়েছে, সেটা বোধহয় বুঝতে পারেনি মানসী। কিন্তু এইবার বুঝতে হয়, কারণ দেখতে পেয়েছে মানসী, অজয় যেন পিপাসিতের মতো জরি-জড়ানো দোপাটির ছোট গুচ্ছটার দিকে তাকিয়ে আছে।

মাইক অনুরোধ করছে, বোম্বাই-যাত্রীরা এবার এগিয়ে গিয়ে প্লেনে উঠুন। মানসী বলে--সময় হয়েছে।

অজয় বলে--হ্যাঁ।

কিন্তু অ্যান্টি-সাবমেরিনের অজয় যেন সমুদ্রের আহ্বানের সব আবেদন ভুলে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি-যেন বলতে চাইছে অজয়।

মানসীর বুকের ভিতরেও যেন দুরন্ত একটা অস্বস্তি ছটফট করছে। বিড়বিড় করে মানসী--আসুন তাহলে।

অজয় বলে--আশ্চর্য ব্যাপার।

মানসী--কি?

অজয়--যেতে ইচ্ছে করছে না।

মানসীর চোখের কালো তারা ছটফট করে ওঠে--ছি, ছি, না না, এ কী অদ্ভুত কথা বলছেন! আপনার প্রসপেক্ট...।

অজয় করুণভাবে হাসে--হ্যাঁ, কথাটা ঠিক...কিন্তু আপনাদের সঙ্গে জীবনে আর যে দেখা হবে না, সেটা তো প্রসপেক্ট নয়।

কী অদ্ভুত কথা! টিচার মানসী যেন পনের মিনিটের একটা অদৃষ্টের ম্যাজিকে মায়াময়ী হয়ে নেভির কনিষ্ঠ অফিসার এই অজয়ের জীবনের সব কামনার প্রেয়সী হয়ে উঠেছে, যার জন্যে বড় অফিসার হবার প্রসপেক্টও শূন্য করে দিতে চায় অজয়।

মানসী বলে, আর বলতে গিয়ে চোখ দুটো সত্যিই ঝাপসা হয়ে যায়--দেখা হবে না কেন? ফিরে এলেই দেখা পাবেন।

অজয়--আসি তাহলে?

মানসী--আসুন।

ঘড়ির কাঁটা বলছে, সাতটা বাজতে দু'মিনিট বাকি।

চলে গিয়েছে অজয়। রেস্টরুমের ভিড় বেশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

চমকে ওঠে মানসী, পাশের কোচের উপর জরি-জড়ানো দোপাটির গুচ্ছটা নেই।

--কি খুঁজছ মানসী? প্রশ্ন করেন ভক্তি মাসিমা।

--ফুলের তোড়াটা গেল কোথায়?

--নিয়ে গেছে।

--কে? কে নিয়ে গেছে?

--নাম জানি না।

--অজয়?

--তাই হবে।

হ্যাঁ, দেখতে পায় মানসী, প্লেনে সীট নেবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে নীতীশ। প্রশস্তির আর সংবর্ধনার আর প্রীতির সেই উৎসবটাও নীতীশের সঙ্গে সঙ্গে সরে যাচ্ছে। মানসীর দিকে

তাকিয়ে হাতটা একবার দুলিয়ে বিদায়ের সংকেত জানিয়েছে নীতীশ।

শুধু কয়েকটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী। তারপর রেস্টরুম থেকে বের হয়ে করিডর পার হয়েও এগিয়ে যায়। রেলিংয়ের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যত বিদায়-ঘটার আনন্দ আর উদ্বেগ তখন রুমাল উড়োতে শুরু করেছে। অনুভাদি আছেন, মৃদুলাও আছে।

মানসীকে দেখতে পেয়ে অনুভাদি আর মৃদুলার মুখের সেই ঠাট্টার হাসি আবার কুঁচকে ওঠে। কিন্তু তারপর যেন হঠাৎ বিস্ময়ে চমকে ওঠে অনুভাদি আর মৃদুলার ঠাট্টার চোখ।

ও কি? কার চোখের আশাকে আশ্বাস দিয়ে সুখী করবার জন্য রুমাল দোলাচ্ছে মানসী?

প্লেনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অপিরিচিত যে ভদ্রলোক হাত তুলে বিদায়ের সংকেত জানিয়েছেন, তাঁরই উদ্দেশে রুমাল দুলিয়ে যেন সান্ত্বনার অর্ঘ্য ছুঁড়ে দিয়েছে মানসী।

অনুভাদি বলেন—ভুল করলেন।

মানসী—না।

মৃদুলা বলে—উনি কিন্তু আমাদের মেজদা নন ; আপনি চিনতে ভুল করেছেন।

মানসী বলে—জানি। চিনতে একটুও ভুল করিনি।

কৌন্তেয়

কোনকালে ওর গায়ের রং বেশ ফরসা ছিল বলে মনে হয়, এখন অবশ্য রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে একেবারে তামাটে হয়ে গিয়েছে।

ওর নাম সুহাসিনী পল। ছেঁড়া একটা শাড়িকে, তাও আস্ত একটা শাড়ি নয়, শাড়ির আধখানা একটা টুকরোকে গাউনের মতো ভঙ্গিতে গায়ে জড়িয়ে, তার উপর লম্বা একটা গরম কোট চাপিয়ে পথে পথে হেঁটে বেড়ায় মিস সুহাসিনী পল। আজ ওর বয়স ষাটের কম হবে না, এবং বুড়োরা বলে থাকেন যে, বছর ত্রিশ আগেও ঐ সুহাসিনী পলকে আস্ত একটা সিল্কের গাউন পরে আর চকচকে হাই-হিল জুতো ঠকঠকিয়ে এণ্টালির বাজারে বসে মুর্গি আর ফুলকপি কিনতে তাঁরা দেখেছেন।

এখন পথ চলতে গিয়ে মিস সুহাসিনী পলের জীর্ণ-শীর্ণ ছোট্ট চেহারাটা ঠুক ঠুক করে কাঁপে। শীত গ্রীষ্ম বা বর্ষা, গায়ের উপর সব সময় ঐ লম্বা গরমকোট। গরমকোটের সারা গায়ের এখানে-ওখানে পশম ঝরে গিয়েছে, ঘিয়ে ভাজা কুকুরের ছালের মতো দেখতে। পুরুষমানুষের পায়ের একজোড়া জুতো, তাও ছেঁড়া আর রং-চটা, সুহাসিনী পলের দু'পায়ে যেন আলগা হয়ে লেগে রয়েছে। মাথার সব চুলই সাদা। সেই সাদা চুলের খোঁপার উপর কালো একটা চিরুনি গোঁজা, সেই চিরুনির সব দাঁতের প্রায় অর্ধেকই ঝরে পড়ে গিয়েছে।

ফ্যাকাসে একটা ছাতা আছে, আর আছে ময়লা একটা ঝোলা ; এই দুটি বস্তুও মিস সুহাসিনী পলের দুই হাতের দুটি প্রয়োজনের শোভা। কিন্তু ঐ ময়লা ঝোলার ভিতরে আর একটি যে বস্তু আছে, সে বস্তুটি জীর্ণ-শীর্ণ নয় এবং ছেঁড়া-ময়লাও নয়। বেশ সাদা আর বেশ চকচকে কতকগুলি ছোট ছোট কার্ড, কার্ডের উপর কালো হরফে ছাপা নাম—মিস সুহাসিনী পল।

বেশ একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে মিস সুহাসিনী পল। মুখের শুকনো চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে যেন ভারবাহী বৃদ্ধ পশুর মতো একটা জীবনের যত ক্লান্তি আর বিরক্তি ফুটে ওঠে। যেন পায়ের নাল খুলে গিয়েছে, সুহাসিনী পলের দু'পায়ের নড়বড়ে জুতো দুটোর দিকে তাকালে তাই মনে হয়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আর দু'পায়ের নড়বড়ে জুতো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পথ চলে মিস সুহাসিনী পল। কোন একটা বাঙালী-পাড়ার ভিতরে গিয়ে ঢুকতে হবে এবং বেছে বেছে ভালো ভালো বাড়িগুলির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই হলো মিস সুহাসিনী পলের নিত্যদিনের কর্মসূচী। তাই বড় রাস্তার উপর আর বেশিক্ষণ নয় ; হয় ডাইনে নয় বাঁয়ে কোন একটা ছোট রাস্তা কিংবা গলি ধরে চলতে থাকে সুহাসিনী পল, এবং হঠাৎ থেমে মুখ তুলে তাকায়। হ্যাঁ, টাকাপয়সা আছে এই বাড়িতে ; কল্পনাও করে ফেলতে পারে সুহাসিনী পল, এই বাড়ির মনের ভিতর দয়া-মায়াও আছে বোধ হয়।

তালতলার এই গলিতে দত্তবাবুদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে সুহাসিনী পল। প্রথম ঘরের ভিতরে চেয়ারের উপর বসে রয়েছে এক যুবক। এগিয়ে যায় সুহাসিনী পল। যুবকের চোখের কাছে নাম ছাপানো একটা কার্ড আচমকা এগিয়ে দিয়ে অভিবাদন জানায় সুহাসিনী পল—গুড মর্নিং মাই বয়!

—কি চাই আপনার?

—চ্যারিটি, ওল্ড লেডি আপনার কাছ থেকে চ্যারিটি আশা করে। মাত্র একটি দশ টাকার নোট, তার বেশি কিছু নয়।

কোন কোন বাড়ির লোক হেসে ফেলে, আবার কোন কোন বাড়ির লোক বেশ বিরক্ত হয়। কিন্তু বিরক্তই হোক কিংবা হেসেই ফেলুক, সকলেই যেটুকু চ্যারিটি করে, তার দাম এক

আনার বেশি নয়, বড়জোর দু-আনা।

কিন্তু এই ইয়ংম্যান চকচকে একটা আধুলিকে সুহাসিনী পলের চোখের সামনে তুলে ধরল। সুহাসিনী পল তবুও অপ্রসন্নভাবে মুখ বাঁকা করে বলতে থাকে--তুমি একি করছ জেণ্টেলম্যান! আমি সত্যিই তো একটা বেগার উওম্যান নই। তোমার কাছ থেকে ঐ সামান্য একটা হাফ-রুপি আমি আশা করি না।

--এর বেশি হবে না। ইচ্ছে হলে নিন, নয়তো চলে যান।

সুহাসিনী পল গম্ভীরভাবে বলে--এত কড়া কথা বলো না ইয়ংম্যান। ওল্ড লেডি তোমার কাছ থেকে একটা রেসপেক্ট আর কার্টসি আশা করে।

--এর বেশি দিতে পারব না।

সুহাসিনী পলের অলস ও শিথিল দুই চক্ষুর তারা দুটো যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকে।--তুমি বোধহয় জান না, আমার লেট গ্র্যাণ্ডফাদার হলেন দি ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান ড্রিল মাস্টার অব ইণ্ডিয়া। তুমি বোধহয় জান না যে, আমার ফাদার মোহিট পল সিমলার সবচেয়ে বড় পোলট্রির মালিক ছিলেন। তুমি নিশ্চয় জান না যে, আমিই ত্রিশ বছর আগে তোমার এই বাড়ির সামনের ঐ রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বেড়াতে গিয়েছি। সেই মানুষকে তুমি সামান্য হাফ-রুপি দিয়ে তাড়িয়ে দিতে চাইছ?

যুবক বলে—এত কথা শুনবার সময় আমার নেই, আপনি যদি...

আর বেশি বলতে হয় না। মিস সুহাসিনী পল তার গলার স্বরে যেন একটা কটকটে অভিমান কাঁপিয়ে বলে ওঠে—বেশ, তবে তাই হোক। গড ব্লেস ইউ।

হাত বাড়িয়ে খপ করে আধুলিটা তুলে নিয়ে ঝোলার ভিতর ফেলে দেয় সুহাসিনী পল। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে চলে যায়। তারপর আবার সেই নড়বড়ে জুতো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পথ চলতে থাকে।

আট আনা দিয়েছে এই বাড়ির ইয়ং লোকটা। মন্দ কি? আবার আসতে হবে এই বাড়িতে, কারণ, এক-আনা দু'আনার বেশি দেবার মতো লোক যে এই পৃথিবী থেকে সরেই গিয়েছে।

এইভাবে নানা পাড়ায় যত ভালো-ভালো চেহারার বাড়িতে চ্যারিটি যেচে বেড়ায় ওল্ড লেডি সুহাসিনী পল। কোন কোন পাড়ায় হঠাৎ পথের উপর দাঁড়িয়ে তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। কারণ, একটা কুকুর ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসে সুহাসিনী পলের ছাতা কামড়ে ধরেছে। পাড়ার ছেলেরা দৌড়ে এসে কুকুরটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সুহাসিনী পল শান্ত হয় না। আধঘণ্টা ধরে পথের উপর সেখানেই দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে পাড়াটাকে নানারকম অভিশাপ আর ধিক্কার দিয়ে তারপর অন্য পাড়ার দিকে চলে যায়।

আর-একটা বাড়ি। এই বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে সুহাসিনী পল একটা মহৎ উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে। দশ-বারোটা ছোট ছোট অনাথ শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানুষ জাতিকে একটু সার্ভিস না দিতে পারলে মনে শান্তি নিয়ে মরতে পারবে না সুহাসিনী পল। তাই তো এই বুড়ো বয়সে লোকের কাছ থেকে এত অপমান সহ্য করেও দরজায় দরজায় ঘুরে চাঁদা চাইতে হয়। মাত্র দশটা টাকা চাঁদা চায় সুহাসিনী পল।

বাড়ির লোকেরা এক-আনা পয়সা দিয়ে বিদায় করে দেয়। আবার পথ চলতে থাকে সুহাসিনী পল। কিন্তু সন্ধ্যার পর আর এইসব পাড়ার ভিতরে কোথাও তাকে দেখা যায় না। ঠিক সন্ধ্যার সময় কোন কোন লোকের চোখ হঠাৎ দেখতে পায়, এণ্টালি বাজারের কাছে এক ল্যাম্পপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে ঝোলার ভিতর নানারকম জিনিস ভরছে সুহাসিনী পল। সেই সব জিনিসের মধ্যে একটা পাঁউরুটি আর দেশী মদের ছোট একটা বোতলও

দেখা যায়।

তারপরে কোথায় চলে যায় মিস সুহাসিনী পল এণ্টালি-বাজারের দোকানদারেরাও ঠিক বলতে পারে না, কোন্ দিকের কোন্ গলিতে থাকে ঐ ভিক্ষুক বুড়িটা।

যেখানেই থাকুক, এণ্টালি বাজারের কাছাকাছি কোন পাড়াতে সকাল দুপুর ও বিকেলে ঐ বুড়িকে দেখতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে কোন বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাগ করে একটা হল্লা জাগিয়েও তোলে সুহাসিনী পল। এক আনাও নয়, মাত্র দুটো পয়সা দিয়েছে এই এত বড় একটা বাড়ি। সুহাসিনী পল বাড়ির চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আর শিথিল চক্ষুর অলস তারা দুটোকে ধিকি ধিকি ক'রে জ্বালিয়ে চেঁচাতে থাকে। ঐ বাড়ির মোটা মোটা থাম কি কোনদিন ধূলো হয়ে যাবে না? ঐ গাড়ির চাকা কি কোনদিন ভেঙে পড়বে না? টাকাপয়সা থাকতে যারা চ্যারিটি করে না, তারা নরকে যাবে, তাদের টাকা পয়সাকে ডেভিলে খাবে।

আবার পথ চলতে থাকে সুহাসিনী পল এবং মনে পড়ে তালতলার গলির সেই বাড়িটাই সবচেয়ে ভাল বাড়ি! সেই বাড়ির সেই ইয়ং জেণ্টেলম্যান একটা আধুলি দিয়েছিল। ঐ বাড়ির মনে সত্যিই একটু চ্যারিটি আছে।

এখান থেকে বেশি দূরে নয় তালতলা, পৌঁছে যেতেও বেশি দেরি হয় না।

মাঝদুপুরে তালতলার সেই গলি বেশ নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। বাড়ির ভিতরে ঢুকে সেই ঘরেরই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় সুহাসিনী পল, ইয়ং জেণ্টেলম্যান নয়, তার বদলে এক প্রৌঢ়া লেডি চেয়ারের উপর বসে বই পড়ছেন।

মিস সুহাসিনী পলের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়েই মহিলা রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন—তুমি আবার এসেছ?

সুহাসিনী পল বলে—না এসে উপায় কি? তোমাদের মতো ভালো মানুষের কাছ থেকে বেশি দয়ামায়া আশা করি।

মহিলা বললেন—তুমি তো একটা ঠগ, একটা মিথ্যাবাদী।

মিস সুহাসিনী পলের শিথিল চোখের তারা ধিকি ধিকি করে জ্বলতে আরম্ভ করে।

মহিলা বলেন—তুমি সেদিন আমার ছেলের কাছ থেকে আট আনা ঠকিয়ে নিয়ে গিয়েছ। আমার ছেলে বোকা, কিন্তু আমি বোকা নই ; চলে যাও এখান থেকে।

সুহাসিনী পল মুখ বিকৃত করে বীভৎসভাবে তাকায়।—তুমি বুঝি খুব চালাক?

হাতের বই বন্ধ করে আর সেই বন্ধ বই-এর উপর চোখের চশমা নামিয়ে প্রৌঢ়া বলেন—আমি জানি, তুমি জোচ্চুরি করে বেড়াও, তুমি মদ খাও।

সুহাসিনী পল তার ছেঁড়া গরমকোটের কলার খিমচে ধরে যেন একটা হিংস্র নিঃশ্বাসকে কোন মতে চাপতে চাপতে চেঁচিয়ে ওঠে—তুমি দেখেছ?

মহিলা বলেন—আমার চাকর দেখেছে।

সুহাসিনী পল বলে—চাকরকে এত বিশ্বাস না করে ভগবানকে বিশ্বাস করতে চেষ্টা কর। তোমার বয়স হয়েছে।

মহিলা উঠে এসে সুহাসিনী পলের একটা হাত চেপে ধরেন। তারপর আস্তে একটা টান দিয়ে, সুহাসিনী পলের থমকানো মূর্তিটাকে যেন উপড়ে নিয়ে গেটের দিকে চলে যেতে থাকেন মহিলা। মহিলার হাতের টানের সঙ্গে সামাল দিতে গিয়ে নড়বড়ে জুতো জোরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলতে থাকে সুহাসিনী পল। কিন্তু গেটের কাছে এসেই হুঙ্কার ছাড়ে সুহাসিনী পল—তুমি আট আনা পয়সার জন্য আমাকে অপমান করলে, আমি অভিশাপ দিয়ে তোমার আট হাজার টাকা শেষ করে দিতে পারি।

—তোমার কপাল। মহিলা গেটের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

শিউরে উঠে একটা চিৎকার করতে গিয়েই চুপ হয়ে যায় সুহাসিনী পল। দুই শিথিল চক্ষুর ধিকি ধিকি জ্বালা নিয়ে বাড়িটার সুখী চেহারার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে। ডাকাতের মতো লোভ নিয়ে কি যেন প্রতিজ্ঞা করছে সুহাসিনী পলের চতুর প্রবঞ্চক ধূর্ত ও মিথ্যাবাদী জীবনের একটা সাহস।

বোধ হয়, সত্যিই আজ বিশ্বাস করেছে সুহাসিনী পল, একটা অভিশাপ দিয়ে এই বাড়ির আট হাজার টাকা বের করে আনা যায়। এই বাড়ির বোকা ইয়ংম্যানের ঐ ভয়ানক চালাক মা-এর অহংকারকে কাঁদিয়ে জব্দ করে দিতে পারা যায়, এমন অভিশাপ কি হয় না?

দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত তালতলার গলির দত্তবাবুদের এই বাড়ির গেটের কাছে পথের উপর একটা জীর্ণ অসহায় অথচ ভয়ংকর ক্ষুব্ধ অভিসন্ধির মতো ঘোরাফেরা করতে থাকে সুহাসিনী পলের ভিক্ষুক মূর্তিটা। ঐ চালাক মায়ের বোকা ছেলেকে একবার কাছে পেলে হয়। তারপর সুহাসিনী পল তার অভিশাপের অস্ত্র ছাড়বে। তারপর বোকা ছেলের হাত থেকে কয়েক হাজার টাকা আদায় না করা পর্যন্ত রেহাই দেবে না সুহাসিনী পল।

মাধব দত্ত ইয়ংম্যান, জার্মানী থেকে ফিরে কলকাতায় এক কারখানায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে। বাপ বেঁচে নেই, মায়ের একমাত্র ছেলে। ছেলের শ্রদ্ধায় আর ছেলের রোজগারের টাকায় সত্যিই সুখী হয়ে আছে মাধব দত্তের মা-এর মন। শুধু সুখে নয়, শান্তিতেও আছেন মাধব দত্তের মা। এবং রোজ দুপুরে চশমা পরে গীতার পাঠ করে আরও শান্তি লাভ করেন।

বাড়ি ফিরছে মাধব দত্ত, সেই ইয়ংম্যান। সেই মুহূর্তে দু'চোখ জলে ভাসিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে আসে সুহাসিনী পল। মাই বয়! মাই বয়!

বাড়ির গেটের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় মাধব। আশ্চর্য হয়।

সুহাসিনী পল মাধব দত্তের মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে ফোঁপাতে থাকে—ভেবেছিলাম তোমাকে কোনদিন বলব না। কিন্তু আর না বলে থাকতে পারছি না।

মাধব—কি বলতে চান?

সুহাসিনী পল—তুমি নিশ্চয়ই জান না, কেন আবার আমি তোমার বাড়িতে এসেছিলাম।

মাধব—জানি বৈ কি, টাকা চাইতে এসেছিলেন।

সুহাসিনী পল—নো মাই বয়, আমি তোমাকে দেখতে এসেছিলাম।

মাধব—কেন?

সুহাসিনী পল—তুমি যে আমারই ছেলে।

মাধব ভ্রূকুটি করে—তার মানে? আপনি তো মিস সুহাসিনী পল।

সুহাসিনী পল—সেই জন্যই তো তোমাকে পরের কাছে ছেড়ে দিয়ে সারা জীবন আমার বুক উপোসী হয়ে কাঁদছে। সে যে আমার জীবনের প্রায় ত্রিশ বছর আগে একটা ভুল ভালোবাসার লজ্জা। সম্মানের ভয়ে আমার সন্তানকে চুপে চুপে অরফ্যানেজে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল।

মাধবের বুক থরথর করে কাঁপতে থাকে। বিস্ময়ের শিহরটা যেন শরীরের রক্তের ভিতরে ছুটোছুটি করছে। মাধব বলে—আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

সুহাসিনী পল বলে—জানি, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু যদি কোনদিন বিশ্বাস হয় তবে...।

আর কোন কথা না বলে চোখ মোছে সুহাসিনী পল, চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। মাধব একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বের করে বলে—এই নিন, কিন্তু ঐসব বাজে কথা আর কখনো বলবেন না।

দপ্ করে যেন হেসে ওঠে সুহাসিনী পলের শিথিল চক্ষুর অলস তারা দুটো।—দশ টাকায়

আমার কি হবে? এতদিন পরে নিজের ছেলের কাছ থেকে হাত তুলে টাকাই যদি নেব তবে দশ টাকা নেব কেন? না, নেব না, চাই না টাকা।

বলতে বলতে চলে যায় সুহাসিনী পল।

মাধব হাসে, মাধবের কথা শুনে মাধবের মা'ও হাসতে থাকেন।

মাধবের মা বলেন--ভিক্ষুক বুড়িটা যে কত বড় ঠগ তা তুই জানিস না, তাই সেদিন আটআনা পয়সা দিয়ে দিলি, আর আজও আবার দশটা টাকা দিতে গিয়েছিলি। দয়া করতে হয় ঠিকই, কিন্তু অপাত্রে দয়া করতে নেই।

মাধব হাসে--সে কথা ভেবে হাসছি না। আমার ভাবতে হাসি পাচ্ছে, কি অদ্ভুত একটা মিথ্যে গল্প অনায়াসে কেঁদে কেঁদে বলে চলে গেল জোচ্চোর বুড়িটা।

মাধবের মা গম্ভীর হন।--তুই যে কত বড় বোকা, তার প্রমাণ এই যে, তুই জোচ্চোর বুড়িটার মিথ্যা গল্পটাকে বার বার করে ভাবছিস।

মাধব তবু ভাবে--তাই তো ভাবছি, এইরকম একটা মিথ্যা গল্প বলবার কি দরকারই বা ওর ছিল?

মাধবের মা-এর চোখের চশমার কাচে ছোট একটা আতঙ্কের ছায়া যেন কেঁপে ওঠে। বোকা ছেলের মনের মধ্যে সত্যই সন্দেহ জাগল না কি, কে ওর মা? গীতা বন্ধ করে চেঁচিয়ে ওঠেন মাধবের মা--তোমার মতো বোকার কাছ থেকে টাকা আদায় করা দরকার, তাই ঐ অদ্ভুত গল্প ফেঁদে তোমার মতো বোকার মন ভোলাতে চায়। এটুকু বুঝতে তোমার এত দেরি হয় কেন?

আক্ষেপ করেন মাধবের মা।--মানুষের জন্মের ঠিকানাই ভুল করিয়ে দিতে চায়, এ কী ভয়ংকর বুড়ি রে বাবা!

গীতার পাতা খোলবার আগে প্রতিজ্ঞা করেন মাধবের মা--আবার যদি বুড়িটা আসে, তবে আমি পুলিস ডেকে ওকে ধরিয়ে দেব।

কিন্তু ঐ প্রতিজ্ঞার পর প্রায় একটা মাস পার হয়ে যায়, মিস সুহাসিনী পল তবু তালতলার দিকে আর আসে না। নিশ্চিন্ত হন মাধবের মা। কিন্তু মাধব মাঝে মাঝে ভাবে, আর আসে না কেন বুড়িটা? টাকা বাগাবার লোভ যখন এতবড় একটা অদ্ভুত গল্প তৈরি করে আর বলে দিয়ে চলে গেল, তখন টাকা বাগাবার জন্য চেষ্টা করতে আর আসে না কেন? কিংবা মরেই গেল? থাকে কোথায় বুড়িটা?

ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলে আর লজ্জাও পায় মাধব। কিন্তু কী আশ্চর্য, তবু আর একবার দেখতে ইচ্ছা করে বুড়িকে। বুড়ির গল্পটা যেন মাধবের শরীরের রক্তের মধ্যে গোপন কৌতুকের মতো সিরসির করছে। সেই ভুয়ো গল্পটা যেন ঠাট্টা করে বলছে, আহা, এখন এই প্রকাণ্ড কলকাতা শহরে কোন্ অলিগলির ভিতর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে মাধবের সত্যিকারের মা, বেচারা ঐ সুহাসিনী পল!

সুহাসিনী পলকে সত্যিই খুঁজতে বের হয়নি মাধব। কিন্তু এন্টালি বাজারের কাছে পথের উপর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় সুহাসিনী পলকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল মাধব। তারপর কাছে এগিয়ে গিয়ে হেসে ফেললো--কেমন আছেন আপনি?

সুহাসিনী পল হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে।--তুমি? তুমি কোথা থেকে এলে, মাই বয়?

মাধব--বেড়াতে বের হয়েছি। কিন্তু আপনি আমাদের ওদিকে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলেন কেন?

সুহাসিনী পল--তোমার মা আমাকে পুলিসের কাছে ধরিয়ে দেবে বলেছে। তাই আর যেতে সাহস পাই না।

মাধব--কে বলছে এই কথা?

সুহাসিনী পল--তোমাদের চাকর।

মুখের হাসি রুমাল দিয়ে চেপে মাধব বলে--কিন্তু পুলিসের ভয়ে আপনি আপনার ছেলের কাছে যাবেন না, এ কেমন কথা?

অবাক হয়ে, দুই চোখ অপলক করে মাধবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুহাসিনী পল। শিথিল চক্ষুর অলস তারা দুটো যেন অদ্ভুত এক বিস্ময়ে স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। গলার স্বরটা অদ্ভুতভাবে কাঁপতে থাকে, আস্তে আস্তে বলে সুহাসিনী পল--গুড গড! তুমি কি সত্যিই আমার গল্পটা বিশ্বাস করেছ, মাই বয়?

মনের হাসি মনের ভিতরে চেপে মাধব বলে—নিশ্চয় বিশ্বাস করি।

ঝিক ঝিক করে সুহাসিনী পলের ঘোলাটে চোখের তারা। যেন ঝিক ঝিক করছে এক ভিক্ষুক বুড়ির ধূর্ত মনের মতলব। বুঝতে পারে মাধব, বুড়ির মনের হতাশ অভিসন্ধিটা আবার আশার আলো দেখতে পেয়ে টাকা বাগাবার লোভেতে আর খুশিতে চমকে উঠেছে।

সুহাসিনী পল বলে--তাহলে আমি এখন করি কি?

মাধব--কি করতে চান?

সুহাসিনী পল--তুমি শুধু এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাক মাই বয়, আমি এখনি আসছি।

ঝোলা হাতড়ে পয়সা বার করে সুহাসিনী পল। জুতো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ছুটে গিয়ে সামনের দোকান থেকে দু'টি মোড়ক হাতে নিয়ে ফিরে আসে।

মাধব--এগুলি কি কিনলেন?

সুহাসিনী পল--চা আর চিনি। তোমাকে একটু চা খাওয়াতে চাই। একটু কষ্ট কর মাই বয়। বেশি দূর নয়, ঐ পানের দোকানের পিছনে গলির ভিতরে একটি বাড়িতে আমার একটি কেবিন আছে, সেখানে আমি থাকি। আমার সঙ্গে এস।

জুতো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে যেতে থাকে বুড়ি সুহাসিনী পল। অদ্ভুত মজার আর মিথ্যার একটা নির্লজ্জ গল্প যেন খুঁড়িয়ে হাঁপিয়ে আর মরিয়া হয়ে এগিয়ে চলেছে। বুড়ির এই ধূর্ত অভিনয়ের চরমটুকু দেখবার জন্য মাধবের মনটাও যেন একটা কঠিন লোভের টানে পিছু পিছু চলতে থাকে।

মিস সুহাসিনী পলের কেবিন যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনই একটি কেবিন। পুরনো একটা দোতলা বাড়ির সিঁড়ির বাঁকের পাশে যেন এক টুকরো অন্ধকার চট দিয়ে ঘেরা। চট সরিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে কেরোসিনের বাতি জ্বালে সুহাসিনী পল। শূন্য একটা প্যাকিংবাক্সের দিকে তাকিয়ে সুহাসিনী পল বলে, বসো মাই বয়।

কেটলি হাতে নিয়ে গরম জল আনতে চলে গেল সুহাসিনী পল। কোথায় গেল কে জানে। মাধব একবার পকেটে হাত দিয়ে দেখে, কিছু টাকা আছে কি না? যাবার সময় বুড়ি তো হাত পেতে বেশ মোটারকম টাকা চেয়ে বসবে। কিছু তো দিতেই হবে। সেদিন দশটাকার নোট নিতে রাজি হয়নি বুড়ি, আজ যে দশ টাকার চেয়ে অনেক বেশি আশা করে এই চা খাওয়াবার ফাঁদ পেতেছে। পঁচিশ টাকা আছে পকেটে। কে জানে পঁচিশ টাকায় খুশি হবে কি না বুড়ি। বুড়ির সঙ্গে একটা তামাশা করবার লোভে এই ছন্নছাড়া অন্ধকারের বিবরের মধ্যে না এলেই ভালো ছিল।

গরম জল কেটলিতে ভরে নিয়ে ফিরে আসে সুহাসিনী পল। চা তৈরি করে। ঝোলার ভিতর থেকে পাউরুটি বের করে ; তারপর ছুরি দিয়ে ছোট ছোট স্লাইস কাটতে থাকে। ঘরের কোণে রয়েছে অনেকগুলি শিশির স্তূপ। তার ভিতর থেকে একটা শিশি বের করে

নিয়ে এসে চামচ দিয়ে চেঁছে চেঁছে জেলি বার করে সুহাসিনী পল!--খেতে খুব খারাপ লাগবে না মাই বয়!

ঝোলার ভিতর থেকে হাতড়ে হাতড়ে একটা কলা বের করে সুহাসিনী পল।--আগে কলা দিয়ে রুটি খেয়ে নাও, তারপরে জেলি খেও।

বেশ ভালো অভিনয় করছে সুহাসিনী পল। কোন খুঁত নেই। জীর্ণ-শীর্ণ দুটি হাত নেড়েচেড়ে যেন দু'হাতের যত উপোসী স্নেহ ঢেলে দিয়ে ভাঙা ডিশের উপর খাবার সাজায় সুহাসিনী পল। তারপর ডিশটা মাধবের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলে--খাও।

আপত্তি করে না, ঘেন্না করে ঠেলে সরিয়ে দেবার সাহসও হয় না, চুপ করে আনমনার মতো উদাস চোখ নিয়ে খাবার খেতে থাকে মাধব।

গরম চায়ে চুমুক দিতেই মাধবের চোখ দুটো যেন একটা কুয়াশার ধাঁধার মধ্যে পড়ে ছটফট করে ওঠে। চোখ দুটো হঠাৎ ঝাপসা হয়ে উঠেছে, তাই বোধহয় কেরোসিনের বাতির টিমটিমে আলোটা একেবারে ঝাপসা দেখায়। অস্বস্তি বোধ করে মাধব। হাঁসফাঁস করে বুকের ভিতরে একটা ভয়াতুর নিঃশ্বাস। চা-এর কাপ হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে মাধব।

কী ভয়ংকর সুহাসিনী পলের এই কেবিন। চট জড়ানো বিছানার একটা নোংরা স্তূপ, তোবড়ানো একটা টিনের বাক্স, আর একরাশ ছেঁড়া-ছেঁড়া জামাকাপড়, ঘরের জিনিসগুলো যেন আবছা অন্ধকার জড়িয়ে পিণ্ড পিণ্ড মাংস আর নাড়ির মতো মাধবের প্রাণের চারদিক জুড়ে বেদনাভরা জন্মলোকের জঠর রচনা করে রেখেছে। সত্যিই ভয় পায় মাধব, সুহাসিনী পলের এই কেবিনের গর্তে যেন একটা শিশু প্রাণের মতো ধুকপুক করছে মাধবের ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণ।

নাঃ, এখানে আসাই উচিত হয়নি। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে উঠে দাঁড়ায় মাধব। ব্যস্তভাবে, সিঁড়িতলার এই খুপরির গুমোট থেকে বের হয়ে বাইরে এসে গলির উপর দাঁড়ায়। সুহাসিনী পলও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে কাছে দাঁড়ায়। মাথা দুলিয়ে মাধবের মুখের দিকে আবার কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে তারপর হাসতে থাকে সুহাসিনী পল। যেন আহ্লাদে মাধবের গায়ের উপর ঢলে পড়তে চায় বুড়ি।

চমকে পিছনে দু'পা সরে যায় মাধব। মাধবের মাথাটা ধরবার জন্য হাত তুলেছে কেন বুড়ি? সত্যিই চুমো খাবে না কি বুড়ি?

সুহাসিনী পল বলে--এই রকম ঠাণ্ডার রাতে এত পাতলা জামা গায়ে দিও না মাই বয়। প্রতি মাসে একবার করে ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেবে, রাত জেগে কাজ করবে না। সময় মতো খাবে আর ঘুমোবে।

হেসে ফেলে মাধব। সুহাসিনী পল বলে--তুমি এত বেশি কাশছো বলেই বলছি। মনে হচ্ছে, তুমি ভয়ানক দুষ্টু ছেলে, সময় মতো খাওয়া-দাওয়া কর না।

মাধব বলে--আচ্ছা, আমি যাই এবার।

সুহাসিনী পল যেন নিজের মনের খুশিতে ধন্য হয়ে আর জীর্ণ-শীর্ণ চেহারাটাকে অদ্ভুত এক গর্বের গৌরবে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে মাধবের দিকে তাকায়। এক হাত তুলে বিদায় দোলানি দুলিয়ে বলে--আচ্ছা, মাই বয়।

কিন্তু এখনও টাকা চাইছে না কেন বুড়ি? মাধব একটু আশ্চর্য হয়, এবং অপ্রস্তুত হয়। কিন্তু সুহাসিনী পল সত্যিই তার সেই ভয়ানক কেবিনের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে ব্যস্তভাবে বলে ফেলে--কিছু টাকা নিন।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে আসে সুহাসিনী পল। আস্তে আস্তে চোখ তুলে মাধবের মুখের দিকে তাকায়--কিসের জন্য টাকা দিচ্ছ, মাই বয়? চ্যারিটি?

মাধব--হ্যাঁ, কিছু টাকা আপনাকে দেওয়া উচিত।

সুহাসিনী পলের শিথিল চক্ষুর তারা দুটো আবার ধিকি ধিকি জ্বলতে আরম্ভ করে--আমাকে বকশিস দিচ্ছ?

মাধব--হ্যাঁ, পঁচিশ টাকা।

সুহাসিনী পল--তবে কি তুমি সত্যিই আমার গল্পটা বিশ্বাস করনি?

মাধব--ওসব কথা ছাড়ুন, ওটা তো একটা গল্প।

সুহাসিনী পল--ও, এইবার বুঝলাম, চালাক মায়ের চালাক ছেলে।

লোভী শকুনের মতো ছোঁ মেরে মাধবের হাত থেকে নোটগুলি হাতে তুলে নিয়ে টলতে টলতে আর হাসতে হাসতে সেই অন্ধকারের বিবরে অদৃশ্য হয়ে যায় সুহাসিনী পল। মাধবও এক দৌড় দিয়ে বড় রাস্তার আলোর কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ে। ভীরু মনটা যেন বিড়বিড় করে--উঃ, আর একটু হলে মিথ্যুক বুড়িটা সত্যিই বোধহয় মা বলিয়ে ছাড়ত।

জলরাক্ষস

মানুষ নয়, জন্তু নয়, ভূতও নয়। তবে কি? সবাই বলে, ওটা হল মানুষেরই মতো দেখতে এক ধরনের ভূতুড়ে জন্তু। নদীর জলের গভীরে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। ভেসে উঠলেও চেহারার সবটুকু ঠিক দেখা যায় না। শুধু মাথার লম্বা লম্বা চুলের গোছা জলের উপর ভাসতে থাকে। শাঁখ বাজালেই তলিয়ে যায়।

দফাদার বলে--ওকে বলে চুলিয়া, জলের রাক্ষস। অনেকদিন আগে, আমরা তখন নেহাতই বাচ্চা, এই তল্লাটে খুব জোর চুলিয়ার হামলা হয়েছিল। আমরা গাঁ ছেড়েই চলে গিয়েছিলাম। নদীর এদিকে পাঁচ ক্রোশ আর ওদিকে পাঁচ ক্রোশ, আষাঢ় থেকে ভাদ্দর পর্যন্ত তিনটে মাস নদীর কোন ঘাটের জলে মানুষ নামত না। ইলিশ ধরতে বাঙাল জেলের দল এসেছিল, তারাও পালিয়ে গেল। ব্যাপারীদের নৌকা পর্যন্ত ঘাটে ভিড়তে সাহস পেত না। রায়নগরের বাজার উঠেই গেল। দশ ক্রোশ জুড়ে গঙ্গার দুদিকের ঘাটগুলি যেন ছাড়া শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করত।

নায়েব মশাই বলেন--আবার এই তল্লাটের সেইরকমই দশা হবে বলে মনে হচ্ছে। হিসেব করে দেখেছি, এই সাত দিনের মধ্যে মোট এগারটা গরু, একটা ঘোড়া, তিনটে বাছুরকে চুলিয়াতে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বলেন--ভগবানগোলার খবর আরও ভয়ানক। শিবমন্দিরের সেবাইতের বউ, দিব্যি ফুটফুটে চেহারা, কাঁচা বয়সের মানুষটি, শেষরাতে গঙ্গায় নাইতে গিয়েছিল। গায়ে এগার ভরি সোনার গয়না ছিল। গেল, একেবারে তলিয়ে গেল। আজ পর্যন্ত লাশের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

দফাদার বলে--গরু-বাছুরের লাশগুলির অবিশ্যি খোঁজ পাওয়া যায়। তলিয়ে যাবার দু-এক দিনের মধ্যেই ভেসে ওঠে। আর দেখা যায়, গরু-বাছুরের শুধু চোখ দুটো খেয়ে ফেলেছে, চোখ খেতে খুব ভালবাসে চুলিয়া।

ভাদ্রের ঢেউ-ছলছল গঙ্গার ধারে কাপ্তেনগঞ্জ নামে যে জায়গার ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে গেঁয়ো লোকজনের একটা ভিড় কথা বলছিল, সেখানে আজ আর কোন গঞ্জ নেই। কোন্ কাপ্তেন এখানে গঞ্জের পত্তন করেছিল, তার নামও লোকে জানে না। নায়েব মশাই বলেন, ক্লাইভের আমলের এক ইংরেজ কাপ্তেন নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে রেশমের কুঠি করেছিল। ঐ যে ঘাট থেকে সামান্য একটু দূরে, গাব ডুমুর আর চালতা গাছের জংলা বাগানটার কাছে ভাঙা ভাঙা ইঁটের স্তূপ পড়ে রয়েছে, ওটাই ছিল সেই রেশম কুঠি।

কাপ্তেনগঞ্জ এখন যে চৌধুরীবাবুর জমিদারি, সে-ও এই ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সব কাহিনী শুনছে।

বছর পঁয়ত্রিশ বয়স হবে, দিব্যি সুশ্রী চেহারা, কাপ্তেনগঞ্জের বাবু অতীন চৌধুরী যেন সেই ক্লাইভেরই আমলের এক বনেদী গৌরবের শেষ প্রদীপের মতো জ্বলছে। কাপ্তেনগঞ্জের সাবেক কালের সৌখীন জীবনের সুগন্ধ যেন এখনও অতীন চৌধুরীর সাজ-পোশাকে ভুরভুর করে। সিল্কের পাঞ্জাবী ও সিল্কের পায়জামা, গায়ে জরি লাগানো মখমলের চটি। এই পরিপাটি পোশাকদুরস্ত মূর্তি নিয়ে আজ ভোর থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত গাঁয়ের একদল লোকের সঙ্গে গঙ্গার ধারে পাঁচ মাইল হেঁটেছে অতীন চৌধুরী। চুলিয়ার ভয়ে গাঁয়ের যত ঘাট ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। কাল রাতে একটা বরযাত্রী দল ঘাটে নৌকা না ভিড়িয়ে সোজা ফিরে চলে গিয়েছে! বিয়েবাড়ির সব আয়োজন আর আনন্দ পণ্ড হয়েছে। জলের রাক্ষস চুলিয়া নাকি ভোরের দিকেই ভেসে ওঠে। তাই গাঁয়ের লোকের অনুরোধে ভোর হতেই আজ

বের হয়েছে অতীন চৌধুরী। সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, নায়েবমশাই, দফাদার আর জন দশ-পনের জনচাষী।

চুলিয়া-কাহিনীকে বিশ্বাস করে না অতীন চৌধুরী। শুধু গ্রামের দশজনের অনুরোধের দাবী রক্ষা করা ছাড়া তার মতো মানুষের পক্ষে গঙ্গার ধারে পাঁচ মাইল হেঁটে ক্লান্ত হবার কথা নয়। সব কাহিনী শুনে মনে মনে হাসে অতীন চৌধুরী, কিন্তু মুখে বলে--তাহলে আরও ভাল করে একটা পাহারা রাখবার ব্যবস্থা করা হোক।

দফাদার বলে--আমার সঙ্গে অন্তত জন পাঁচেক বেশ সাহসী মদ্দ থাকলে আমি রোজ শেষরাতে এই দেড় ক্রোশের উপর নজর রাখতে পারি।

অতীন চৌধুরী বলে--দফাদারের কাজে সাহায্য করবে এই রকম জন পাঁচেক লোকের বন্দোবস্ত করে দিন নায়েবমশাই।

নায়েবমশাই বলেন--কিন্তু সত্যি যদি দেখা যায় যে চুলিয়া ভেসে উঠেছে, তবে কি হবে?

অতীন চৌধুরী হাসে--শুধু আমাকে তৎক্ষণাৎ খবর দিতে হবে। তারপর আমি আছি আর আমার রাইফেল আছে।

অনেক দূরে, এই গঙ্গারই ধারে এক গাঁয়ে যেন শত শত শাঁখ বাজছে। চমকে ওঠে দফাদার। নায়েবমশাই আতঙ্কিতের মতো চোখ ঘোলা করে দূরের সেই ভয়ার্ত শঙ্খের শব্দ শুনতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, বোধহয় উত্তর রঘুনাথপুরের গঙ্গায় চুলিয়া ভেসেছে। ওদিকটা এতদিন নিরাপদ ছিল।

অতীন চৌধুরী আরও জোরে হাসতে থাকে--তুমিও কিন্তু শাঁখ বাজিয়ে ফেলো না দফাদার। ভাল একটা টর্চ সঙ্গে রাখবে, আর লম্বা লম্বা চুল ভেসে রয়েছে দেখলেই আমাকে খবর দেবে।

চলে গেলেন অতীন চৌধুরী।

কাপ্তেনগঞ্জের এই ঘাটে দাঁড়িয়ে জমিদারবাড়ির চিলকোঠা দেখতে পাওয়া যায়। কিরকম যেন দেখতে এই প্রকাণ্ড বাড়িটা। বাড়ি থেকে বেশি দূরে মস্ত একটা ফটক, সে ফটকের সব পলেস্তারা ঝরে পড়ে গিয়েছে। ফটকের মাথার ওপর দুটো বড় বড় গম্বুজ। ভাল করে দেখলে এখনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে, গম্বুজের গায়ে মীনাকরা রঙীন নক্সাব ছিটেফোঁটা লেগে রয়েছে। ফটকের নামটা এখনও মরে যায়নি। লোকে বলে হাতিদরজা।

হ্যাঁ, কাপ্তেনগঞ্জের সেই বিলাস আর বৈভবে ভরা অতীতে এই ফটক দিয়েই রাজা রামগোবিন্দ চৌধুরী হাতির পিঠে ঝকঝকে রূপোর হাওদায় বসে যাওয়া-আসা করতেন। ক্লাইভের হুকুমনামার জোরে গঙ্গার পঁচিশ ক্রোশ জলকর হাসিল করতেন। অতীন চৌধুরী এখন যে ভাঙা দালানটার কাছ দিয়ে যেতে যেতে বিছুটির ঝোপের ছোঁয়া থেকে সিল্কের পায়জামা বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে আর সিগারেট খাচ্ছে, সেখানে এখনও বড় বড় ভারি লোহার জিঞ্জিরের টুকরো মরচে ধরে পড়ে রয়েছে। ঐ জিঞ্জিরে হাতি বাঁধা থাকত। চারদিকের গড় ভরাট হয়ে গিয়েছে, সেই দেউড়ি ধসে পড়ে গিয়েছে, এবং দেউড়ির কাছে শান-বাঁধানো চাতালের উপর সেই তোপগুও আর নেই, যদিও ফাটলধরা ও কাঁকড়াবিছার আড্ডা এই চাতালের নাম আজও তোপখানা।

জংলা লতাপাতায় একেবারে আগাগোড়া মোড়া যে বারদুয়ারী দালানটার ছাদ এখনও ভেঙে পড়েনি, সেটার নাম বাইমহল। চৌধুরীদের তিন পুরুষ পর্যন্ত এই বারদুয়ারী বাইমহলে আতর গুলাবের ছড়াছড়ির মধ্যে রূপসী বাঈজীর নাচ দেখেছেন আর খুশির রাত জেগেছেন। আজ এই শূন্য দালানের ভিতরে দাঁড়িয়ে টুঁ শব্দ করলে সেই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর একটা প্রতিধ্বনি হাঁউমাউ করে বেজে ওঠে।

এই পুরনো ধ্বংসেরই এক পাশে আজ যে তিনতলা বাড়িটার ভিতরে অতীন চৌধুরীর

জীবনের দিনরাত পার হয়, সেই বাড়ি তিনপুরুষ আগের ঐশ্বর্যের খোলস মাত্র। সেকেলে সব আসবাব, সব সিন্দুক, সব গালিচা, মূর্তি, বেলোয়ারী ঝাড় ও তৈজস একে-একে বিদায় নিয়েছে। এই বাড়ির একটা ঘর শুধু হাল আমলের মিরর ও আলমারি আর সেকেলে পালঙ্ক দিয়ে সাজানো। আর আছে একটি একেলে মানুষ, অতীনের স্ত্রী মঞ্জুলতা। কলেজের পড়া শেষ না হতেই অতীনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে কলকাতা থেকে সেই যে এই বনেদী গৌরবের খোলসের মধ্যে চলে এল মঞ্জুলতা, তারপর আর বাপের বাড়ি যায়নি। একটানা এই পাঁচ বছর ধরে স্বামীর কাছেই আছে মঞ্জুলতা। যতক্ষণ মাসিক পত্রিকার গল্প পড়ে মঞ্জুলতা শুধু ততক্ষণ যেন কলকাতার জীবনের স্বাদ পায়। আর মনে হয়, জীবনটা যেন একশো বছর ধরে পিছিয়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর এক বনেদী কারাগারের মধ্যে হাঁসফাঁস করছে।

স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে এসে কাপ্তেনগঞ্জের বনেদী ধ্বংসের মাঝখানে তিনতলা বাড়ির এই কক্ষের ভিতরে প্রথম দিনেই সমস্যাটাকে ঠিক বুঝতে না পেরে চমকে উঠেছিল মঞ্জুলতা। আর দ্বিতীয় দিন ঠিক সন্ধ্যা হতেই সমস্যাটাকে বুঝতে পেরে চমকে উঠেছিল।

সাজ সেরে এই পালঙ্কেরই উপর বসেছিল মঞ্জুলতা, অতীনও সাজ সেরে তার সিল্কের পাঞ্জাবির উপর আধ শিশি সেন্ট ঢেলে দিয়ে ঘরের বাইরে যাবার জন্য এগিয়ে যেতেই মঞ্জুলতা বলে--একি? কাল সন্ধ্যাবেলাতে এভাবে বেরিয়ে গেলে আর ফিরে এলে সকালবেলা, আজও আবার সন্ধে হতেই বেরিয়ে যাচ্ছ, এর মানে কি?

অতীন হাসে--এর মানে তোমার না জানলেও চলবে মঞ্জু।

মঞ্জু--বেশ বললে! স্ত্রী জানতে পারবে না তার স্বামী কোথায় গিয়ে রাত কাটায়?

অতীন--সেটা জানলেও আমি তোমার স্বামী, না জানলেও আমি তোমার স্বামী।

মঞ্জু বলে--বুঝলাম, কিন্তু বলতে হবে তুমি কোথায় যাচ্ছ।

অতীন--আমার বৈঠকখানায়।

মঞ্জু আশ্চর্য হয়--কোথায় তোমার বৈঠকখানা?

অতীন--ঐ যে, বারদুয়ারী বাইমহলের পাশে আমড়া বাগানটার মধ্যে একটা নতুন কেবিনঘর দেখছ, সেটাই আমার বৈঠকখানা।

মঞ্জু--মানুষে বৈঠকখানায় বসে বলেই জানি, ঘুমিয়ে রাত কাটায় না।

অতীন--আমিও ঘুমিয়ে রাত কাটাই না। ঘুমোতে হলে তোমার কাছেই এসে ঘুমোব।

পাগলের কথা বলেই সন্দেহ হয়, কিন্তু সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যে মানুষটা এত ভাল ভাল কথা বলেছে, সে মানুষটা সন্ধে হতেই পাগল হয়ে উঠবে কেন? মঞ্জু বলে--তুমি আমাকে ঠকাচ্ছো।

অতীন বলে--না। আমি ভগবানকেও ঠকাতে পারি, কিন্তু তোমাকে ঠকাবো না।

মঞ্জু--তবে কেন যাচ্ছ?

অতীন--না যেয়ে পারি না! এটা আমার সাতপুরুষের নিয়ম। ঐ নিয়ম আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে। না গিয়ে পারব না মঞ্জু, যেতেই হবে, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।

মঞ্জু--বিয়ের আগেও কি তোমার এই অভ্যাস ছিল?

অতীন--হ্যাঁ, যখন স্কুলও পার হইনি, সেই ষোল বছর বয়স থেকেই।

আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকে মঞ্জুলতা। এবং আর এক মুহূর্তও দেরি না করে বের হয়ে যায় অতীন।

এই দৃশ্যটাও অতীনের কাছে এমন কিছু অভিনব নয়। মনে পড়ে বিশ বছর আগের কথা, যখন বাবা আর মা বেঁচে ছিলেন, ঠিক মঞ্জুর মতো এইভাবেই এই পালঙ্কেরই উপর বসে মা চোখে আঁচল চাপা দিতেন, আর বাবা জুঁই-এর মালা হাতে জড়িয়ে, গলায় পাকানো চাদর চড়িয়ে আর আতর মাখানো মোষের শিঙের লাঠি হাতে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা বের হয়ে যেতেন

মাঝরাতে গঙ্গার ঘাটে বজরার মধ্যে যখন খেমটা নাচের ঘুঙুর বাজত তখন ঠাকুরঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন মা। এটা কাপ্তেনগঞ্জের সাতপুরুষের নিয়ম।

কিন্তু কলকাতার মেয়ে মঞ্জুলতা ভাবে, কি বীভৎস ও কি ভয়ানক নিয়ম! একেই বোধহয় বলে প্রেত-নিশির ডাক। চক্কোত্তি মশাই যেমন প্রতি সন্ধ্যায় ঠিক সময়টিতে এসে এ-বাড়ির পুজোর ঘরে আরতি করে চলে যান, এই নিয়মও যেন ঠিক তেমনি এক নিষ্ঠার নিয়ম। সন্ধ্যা হতেই বাড়ির কর্তা তাঁর বৈঠকখানায় চলে যান, কে জানে কোন ভয়ঙ্কর রহস্যের আরতি করতে!

বুঝতে দেরি হয়নি। সকাল হতে অতীন ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই ঘরের বাতাস আতরমাখা পচাটে গন্ধে ভরে যায়। অতীনের চোখ দুটো রাতজাগা ক্লান্তি আর মদের নেশার ঝাঁঝে লাল হয়ে আছে। আস্তে আস্তে টলতে টলতে এসে পালঙ্কের উপর গড়িয়ে পড়ে অতীন, অঘোরে ঘুমোতে থাকে। এবং ঘুমের ফাঁকে ফাঁকেই এক একবার চোখ মেলে তাকিয়ে ডাক দেয়--তুমি একটু কাছে বসো মঞ্জু।

দেখতে পায় মঞ্জু, ঘুমের মধ্যেই যেন হাতড়ে হাতড়ে কারও হাত খুঁজছে অতীন।

দুপুর পর্যন্ত ঘুম। তারপরেই উঠে বসে অতীন। স্নান সেরে, খাওয়াদাওয়ার পর পান চিবিয়ে আর হাতপাখা হাতে নিয়ে যখন চেয়ারের উপর বসে অতীন, তখন যেন একেবারে নতুন মানুষ হয়ে যায়। কত হাসি, কত গল্প, কত ঠাট্টা আর ভাল ভাল কথা। মঞ্জু তখন ভাবে, কি আশ্চর্য, এই মানুষই সন্ধ্যা হতেই আবার পাগল হয়ে যাবে!

বুঝতে কিছু বাকি নেই, সহ্য করা যায় না, উচিতও নয়, তবু সহ্য করে মঞ্জু। যেন কাপ্তেনগঞ্জের এই বনেদী অভিশাপের শেষ দেখবার জন্য একটা আশা নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে মঞ্জুলতা। কে জানে কেমন সেই শেষ!

চা খায় ইন্দুপ্রকাশ, কাছেই চেয়ারে বসে ইন্দুর সঙ্গে গল্প করে মঞ্জুলতা। কাদামাখা মখমলের জুতো পায়ে অতীন সামনে এসে দাঁড়াতেই চেঁচিয়ে ওঠে ইন্দু--কি হে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

অতীন বলে--গাঁয়ের লোকগুলোর মাথা খারাপ হয়েছে। ওদের ধারণা গঙ্গায় নাকি জলরাক্ষস দেখা দিয়েছে! মানুষ আর গোরু জলে নামলেই তলিয়ে যাচ্ছে। এ গাঁয়ের অনেক গোরু আর ভগবানগোলার এক সুন্দরীকে মেরে ফেলেছে জলরাক্ষস। তাই ভীতু মানুষগুলোকে একটু সাহস দিয়ে এলাম।

অতীনের কলেজ-বন্ধু ইন্দুপ্রকাশ। ভাগ্যচক্রের ফেরে পড়ে ইন্দুও আজ সাত-আট মাস হল এই কাপ্তেনগঞ্জের মাটির টানে অতীনের বড় কাছাকাছি এসে ঠাঁই নিয়েছে। তিনশ বিঘা জমি নিয়ে আখের চাষ করে ইন্দু। কাপ্তেনগঞ্জের চৌধুরী বাড়ির হাতিদরজা থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে সড়কের ধারে পাতলা দেয়ালের একটি বাংলো তৈরি করে নিয়েছে ইন্দু। এই বাংলোই হল ইন্দুর কৃষি অফিস, থাকবার ঘর, গান গাইবার আসর আর নানা শস্যের বীজ নিয়ে রিসার্চ করার লেবরেটরী। অতীনেরই অনুরোধ, সকাল বেলাটা এখানে এসে ইন্দু যেন রোজই চা খেয়ে যায়। ইন্দুও খুশি মনে সে অনুরোধের সম্মান রক্ষা করেছে। এই সাত-আট মাসের মধ্যে বোধহয় দশ-বার দিন বাদ দিয়েছে, নইলে রোজই এসে চা খেয়ে গিয়েছে ইন্দু।

যতক্ষণ ইন্দু থাকে, মঞ্জুলতার মনটাও যেন ততক্ষণ কাপ্তেনগঞ্জের জীবনের সব ভয়গুলিকে ভুলে যায়। ইন্দুর মুখ থেকেই কলকাতার গল্প শোনে মঞ্জুলতা, মাসিক পত্রিকার গল্প আর না পড়লেও চলে।

ইন্দু বলে--বিয়ের সময় আপনাকে যেন একটু রোগাই দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে এসে তার চেয়েও রোগা হয়ে গেলেন কেন?

মঞ্জু বলে--আমার কথা ছেড়ে দিন, আপনার কথা বলুন।

ইন্দু--আমার কথা হল, একদিন রাত্রিবেলা আসতে বলুন, আপনার হাতের রান্না পোলাও-টোলাও খেয়ে যাই। রোজই শুধু চা খাইয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন, এ কী রকমের ব্যবহার?

অতীন বলে--বেশ তো, ইন্দুকে আজ রাতেই খাইয়ে দাও না মঞ্জু।

মঞ্জু বলে--আচ্ছা।

ইন্দু চলে যেতেই মঞ্জু বলে--আমি এবার কলকাতায় চলে যাই।

অতীন হাসে--যেতে পারবে?

মঞ্জু বলে--কোন্ দুঃখে যেতে পারব না?

অতীন--তুমি আমাকে ভালবাস। আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

মঞ্জু--তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ভালবাসি?

অতীন--নিশ্চয়ই। নইলে কবে চলে যেতে।

মঞ্জু--যদি কোনদিন ভালবাসতে না পারি, তবে?

অতীন হো হো করে হাসে--তবুও কলকাতায় চলে যেতে পারবে না মঞ্জু, সে মেয়ে তুমি নও। যদি সত্যিই এমন অঘটন ঘটে, তবে তুমি নিজেকেই ঘেন্না করে মরে যাবে।

কী অদ্ভুত বিশ্বাস! আমড়া বাগানের এক কেবিনঘরে যত পাপিনীর শরীর নিয়ে সারারাত খেলা করে যে নেশাড়ে মানুষটা, সে এই অটল বিশ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে আছে, তার স্ত্রী কোনদিন ভালবাসা হারাবে না। চোখ ছলছল করে, মুখ ঘুরিয়ে নেয় মঞ্জু, আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

হঠাৎ আহতা নাগিনীর মতো যেন দুঃসহ আক্রোশে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে মঞ্জু--কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।

অতীন--কী?

মঞ্জু--এই পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ভালবাসতে পেরেছ, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

অতীন হো হো করে হাসে।--এই পাঁচ বছরের প্রতি মুহূর্তে তোমাকেই ভালবেসেছি। তুমি বুঝতে পারনি।

মঞ্জু--তুমি কেমন করে বুঝলে?

অতীন--স্বপ্নে দেখেছি, তুমি মরে গিয়েছ আর আমি কাঁদছি।

চুপ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জু। অতীন বলে--আমি জীবনে কারও জন্য কাঁদিনি, কিন্তু বিশ্বাস কর মঞ্জু, আমি শুধু একজনের জন্যই কাঁদব, সে হল তুমি, যদি তুমি আমার আগে চলে যাও।

ছুটে কাছে এগিয়ে এসে অতীনের হাত ধরে মঞ্জু। ক্লান্ত বিকালের রোদ তখন লাল হয়ে নারকেলের পাতার ঝালরে খেলা করতে শুরু করেছে। সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই।

আকুল হয়ে মিনতি করে মঞ্জু--তাহলে বল লক্ষ্মীটি, আজ সন্ধ্যায় ঐ কেবিন ঘরে আর যাবে না!

জানালা দিয়ে আকাশের দিকে একবার তাকায় অতীন। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতর পায়চারি করে। সন্ধ্যার লাল আলো কালো ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

ব্যস্ত হয়, ছটফট করে অতীন! তাড়াতাড়ি সাজ সারে। সেন্টের শিশি রুমালের উপর উপুড় করে ঢেলে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। তার পরেই আস্তে আস্তে হেঁটে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জু। পাঁচ বছর তো এইভাবে পার হয়ে গেল। কিন্তু আর কতদিন?

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে মঞ্জু, চলে যাচ্ছে অতীন। ক্লাইভের আমলের জলকরের ইজারাদার সেই রাজাবাবু চৌধুরীদের হাতি-ঘোড়া কবেই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু অভিশাপগুলি আছে। বারদুয়ারী বাইমহলে ঘুঙুর বাজে না, বাজাবার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু আমড়াবাগানের এক কেবিনঘরে কাচের গেলাস, দেশী মদের বোতল আর চুড়ির শব্দ প্রতি রাত্রে আত্মহারা হয়ে বাজে। অতীন রায়ের রক্তের ইতিহাস তৃপ্ত হয়।

—এ কি? আপনি বারান্দার কোণে এই একটা বিশ্রী চেয়ারে এভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন?

চমকে ধড়ফড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মঞ্জুলতা। ইন্দু এসেছে। ইন্দু যে আসবে, নিজের হাতে রেঁধে ইন্দুকে খাওয়াতে হবে, সে-কথা ভুলেই গিয়েছে মঞ্জু। সন্ধ্যার পর থেকে এতক্ষণ ধরে শুধু নিজের মনের জ্বালার সঙ্গে যেন যুদ্ধ করেছে মঞ্জু। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকায় মঞ্জু। কী সর্বনাশ, রাত যে প্রায় দশটা!

ইন্দু বলে—অতীন কোথায়?

মঞ্জু—বাইরে বের হয়েছেন।

ইন্দু—কখন ফিরবে?

মঞ্জু—জানি না।

অপ্রস্তুত হয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে ইন্দু। মঞ্জু বলে—আপনার ওপর বড় অন্যায় করে ফেলেছি।

ইন্দু আশ্চর্য হয়—অন্যায়?

মঞ্জু—হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছি যে আজ আপনাকে খেতে নেমন্তন্ন করেছি।

হো হো করে হেসে ওঠে ইন্দু—তাই বলুন। কিন্তু সেজন্য এত দুঃখ করবার কি আছে? আর একদিন এসে খেয়ে যাব।

মঞ্জু—কিন্তু আমার যে ভাবতে বড় লজ্জা করছে, বড় কষ্ট হচ্ছে ইন্দুবাবু!

ইন্দু—না, না, ওসব কিছু মনে করবেন না। আমাকে একেবারে আপনার জন বলে মনে করবেন। আমি অন্তত আপনার মতো মানুষের কোন দোষই ধরি না।

চলে গেল ইন্দু।

বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে ছটফট করে মঞ্জু। কাপ্তেনগঞ্জের এই বাড়ির এই রাতটাকে বড় ঘৃণ্য বলে মনে হচ্ছে। সহ্য করা যায় না। সহ্য করা উচিত নয়। ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে, আমড়াবাগানের অন্ধকারে লুকানো ঐ কেবিনঘরের কপাট ভেঙে ভিতরে ঢুকে একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে, বনেদী অভিশাপের নেশায় কেমন রঙীন হয়ে রয়েছে জমিদার অতীন চৌধুরী।

ছি-ছি, ওদিকে যেতেও যে ঘেন্না করে। কিন্তু কোনোদিকে তো যেতেই হবে। না গিয়ে উপায় নেই! সারা মনটা পাগল হয়ে বলছে, চলে যাও। যাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, তার কাছে যাও।

মনটা পাগল হয়েও সত্যি কথা বলছে। আর এক মুহূর্তও দেরি করে না মঞ্জু। চৌধুরী বাড়ির তিনতলা বিভীষিকার চেহারা পিছনে ফেলে রেখে একটা ছায়াশরীর যেন ছুটে বের হয়ে যায়।

হাতিদরজার গায়ে জোনাকি জ্বলে। তারই কাছে পাতলা দেয়ালের ছোট বাংলো, যেন লতা-পাতা আর ফুলের সাজ পরানো একটি শান্তির নীড়। ইন্দুর ঘরের দরজার কড়ায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্জু, থরথর করে কাঁপে সারা শরীর।

এ কি? ইন্দুর কাছে কেন? মঞ্জুর বুকের ভিতরটাই যেন নিজেকে চিনতে পেরে হঠাৎ

চমকে ওঠে। মঞ্জুর পায়ের শব্দ আবার ছটফটিয়ে বেজে ওঠে।

ইন্দু ডাকে--কে?

আলো হাতে নিয়ে বাইরে এসেই দেখতে পায় ইন্দু, কেউ নয়, বারান্দার থামের গা-জড়ানো লতাগুলি শুধু দুলছে।

চুলিয়া! চুলিয়া! কাপ্তেনগঞ্জের ঘাটের কাছে জলের উপর চুলিয়া ভেসে বেড়াচ্ছে। শেষ রাতের শেষ তারা নিভে যাবার আগেই শোরগোল আর হাঁকেডাকে সারা গ্রামের ঘুম ভেঙে গেল আর দলে দলে লোকজন ছুটে চলল ঘাটের দিকে।

নায়েব মশাই এসে কেবিনঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিতেই বের হয়ে আসে অতীন চৌধুরী। অতীনের রাইফেলটাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছেন নায়েব মশাই।

দফাদার বলে--ঘাটের খুব কাছে চুলিয়া ভেসে রয়েছে বাবু।

আর দেরি করে না অতীন। চোখভরা নেশা, আর বুকভরা মদের ঝাঁজ সঙ্গে নিয়েই রাইফেল হাতে ছুটে গিয়ে ঘাটের কাছে এসে দাঁড়ায়।

ঘুম-ভাঙা কাকের ডাক সবেমাত্র শুরু হয়েছে। পূবের আকাশ সবেমাত্র ভোরাল হয়েছে। দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় অতীন চৌধুরী আর গাঁয়ের শত শত মানুষের ভিড়, সত্যিই ভাদ্রের ভরা গঙ্গার ঢেউ-এর দোলানির সঙ্গে জলরাক্ষসের গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ভাসছে।

পূবের আকাশ যেন ফিক করে হেসে উঠেছে, প্রথম ভোরের আভা ছড়িয়ে পড়েছে জলের উপর। ঠাণ্ডা রাইফেলটাকে হঠাৎ দুহাতে বুকে আঁকড়ে কেঁপে ওঠে অতীন চৌধুরী। অপলক চোখে দেখতে থাকে অতীন চৌধুরী, জলরাক্ষসের চুল দেখতে বড় সুন্দর।

শুধু এলোমেলো একরাশ চুল নয়, লাল পাথর বসানো সোনার একটি হেয়ার পিনও ভাসছে। মাঝে মাঝে কপালটাও ভেসে উঠছে, সেই সঙ্গে একজোড়া ঘুমন্ত চোখ। বুটিদার ঢাকাই শাড়ির আঁচলটাও থেকে থেকে ভেসে ওঠে।

নিথর হয়ে বসে থাকে অতীন চৌধুরী। ঘাটের ভিড়ের নিঃশ্বাসগুলি যেন সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কোন শব্দ করে না। নায়েব মশাই এরই মধ্যে দুটো লগি আনিয়ে ফেলেছেন। দফাদারও লগিটা হাতে তুলে নিয়েছে।

অতীন চৌধুরীর হাত ধরে নায়েব মশাই ডুকরে ওঠেন—এ কী সর্বনাশ, কে জানে কখন এমন কাণ্ড হয়ে গেল বড়বাবু!

তেমনই নীরব নিথর হয়ে বসে থাকে অতীন। নায়েব মশাই আবার হাঁউমাউ করে ওঠেন--আমাদের কি করতে বলেন বড়বাবু?

অতীন—আমি কিছুই বলতে পারি না। ইন্দুকে একবার খবর দিন।

চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন নায়েব মশাই।—ইন্দুবাবুকে কেন?

লাল চোখ দুটো ছলছলিয়ে যেন বিকার রোগীর মতো প্রলাপ বকে অতীন—মানুষটা এভাবে শেষ হয়ে গেল, তার জন্য পৃথিবীর অন্তত একজনেরও তো কাঁদা উচিত, কিন্তু আমি যে কাঁদতে পারছি না নায়েব মশাই!

হিসাব মিলাতে

চন্দ্র-সূর্য কেন আলো দেয়? এরকম কঠোর একটা দার্শনিক প্রশ্নের সব উত্তাপ একদিন একটি কথায় একেবারে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল দিবাকর। কথায় কথায় বন্ধুদের মধ্যে ঘোর তর্কের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। পুরো তিন ঘণ্টার মুখরতার পর সেই তর্ক শান্ত হয়েছিল।

সেদিন বি এ পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। দিবাকরের সেই পাঁচ বন্ধুও পাস করেছে। পাসের আনন্দ উদ্‌যাপন করবার একটা পরিকল্পনা আগেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল। প্রবল রকমের কোন হুল্লোড়, ফূর্তি, পিকনিক অথবা ছুটোছুটির পরিকল্পনা নয়। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু বেলুড়ের গঙ্গার ঘাটে বসে থাকা, আর শুধু গল্প করা।

ছয় বন্ধুর মধ্যে দিবাকর ছাড়া আর সবাই, অর্থাৎ সেই পাঁচ বন্ধুই ছিল দার্শনিক ; সবাই ফিলজফিতে অনার্সও পেয়েছে, একমাত্র অদার্শনিক দিবাকর। তিনবার ম্যাট্রিকে ফেল করে. চার বারের বার পাস করে কলেজে ঢুকেছিল দিবাকর। ইকনমিকস্-এর একটা বইও কিনেছিল, কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল দিবাকর। কারণ, বই পড়ে ইকনমিকস্ শেখবার দরকার হয় না। দিবাকর বলেছিল, জগৎটাই ইকনমিকস্।

কিন্তু কি আশ্চর্য, অদার্শনিক দিবাকরই সেদিন সেই কঠোর দার্শনিক তর্কের মুখরতা ক্ষান্ত করে দিয়েছিল। দিবাকর বলেছিল, চন্দ্র-সূর্য আলো দিতে বাধ্য হয় বলেই আলো দেয়। এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই।

সত্যিই, পাঁচ দার্শনিক বন্ধু হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল। প্র্যাকটিক্যাল দিবাকর, ইকনমিকসের ভক্ত দিবাকর সামান্য কয়েকটা কথায় যা বলে দিল, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। আলো না দিয়ে থাকতে পারে না চন্দ্র-সূর্য, আলো দিতে বাধ্য, তাই আলো দেয়।

বেলুড়ের গঙ্গার ঘাটে বসে সেই তর্কের জীবন অনেকদিন হলো অতীত হয়ে গিয়েছে। পাঁচ বন্ধুর জীবন এখন কে জানে কোন নতুন প্রশ্নের প্রেরণায় বা তাড়নায় কোথায় চলে গিয়ে কি করছে, সে খবর জানে না দিবাকর। কিন্তু আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই পাঁচ বন্ধুর কথা। বেচারা ত্রিদিব, সঞ্জয়, হৃদয়, বনমালী আর রঞ্জন! যেখানেই থাকুক আর যা-ই করুক না কেন, আজ নিশ্চয় ওরা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছে যে, চন্দ্র-সূর্য যে আলো দিতে বাধ্য হয়, সেই তত্ত্বটা ফিলজফি নয়, একেবারে বিশুদ্ধ ইকনমিকস্! চন্দ্র-সূর্যের চরিত্রের রহস্য নিয়ে গবেষণা করবার সেই অদ্ভুত অকেজো শখ আজ ওদের আর নেই বোধহয়। নিজের নিজের ভাগ্যের রহস্য নিয়ে ভাবছে আর হয়রান হচ্ছে। হয়তো কারবারে ভাল প্রফিট করছে, কিংবা ভাল পোস্টের চাকরি নিয়ে ভাল মাইনে পাচ্ছে। আর তা যদি না হয়ে থাকে, তবে তো ছেঁড়া ছাতা হাতে নিয়ে দুবেলা দৌড়ে দৌড়ে তিন-চারটে ছেলে-পড়াবার গো-খাটুনি খেটে-খেটে আরও ভাল করে বুঝতে পারছে যে, মানুষের জীবন হলো ইকনমিকস্, মোটেই ফিলজফি নয়।

সেই পাঁচ বন্ধুর জীবনের পরিণাম কল্পনা করে নিজের নির্ভুল জীবনের গৌরব স্বীকার করে দিবাকর। নিজের জীবনের এই উন্নতিই দিবাকরকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়, এই উন্নতি হতোই, হতে বাধ্য, তাই হয়েছে। কর কোম্পানির এত বড় অফিসে চল্লিশ টাকা মাইনের ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক হয়ে ঢুকে এই চার বছরের মধ্যেই পাঁচশো দশ টাকা মাইনেতে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের পোস্টে নিজেকে ঠেলে ওঠাতে বাধ্য হয়েছে দিবাকর। ম্যানেজার রাখালবাবু এইবার রিটায়ার করতে কিংবা অতিষ্ঠ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন এবং শেষ পর্যন্ত দিবাকর ম্যানেজার হতে বাধ্য হবে।

জগৎটাই ইকনমিকস্। বুঝতে একটুও দেরি করেনি দিবাকর। নিজের উন্নতির জন্য যে-কোন কাজ করতে বাধ্য হওয়াই উন্নতির অর্থনীতি।

কর কোম্পানির বর্তমান মালিক, অর্থাৎ শ্রীসুপ্রকাশ দত্ত বয়সের দিক দিয়ে দিবাকরের চেয়েও বছর আট-দশ ছোটই হবে! দিবাকর যে বছর ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক হয়ে এই অফিসের একটা টেবিলের কাছে একটা টুলের উপর বসেছিল, সেই বছরেই বুড়ো দত্তবাবু মারা গেলেন আর নতুন মালিক হয়ে দেখা দিল বুড়ো দত্তবাবুর ছেলে এই সুপ্রকাশ।

ম্যানেজার থেকে শুরু করে দপ্তরী পর্যন্ত সকলেই নতুন মালিক সুপ্রকাশ দত্তের অফিস-ঘরে ঢুকে নমস্কার আদাব ও সেলাম জানিয়ে এসেছিল। কিন্তু দিবাকর? শুধু দিবাকর সুপ্রকাশ দত্তকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে বাধ্য হয়েছিল। সুপ্রকাশ দত্তও একটু আশ্চর্য হয়ে দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দিবাকরও দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। নতুন মালিক খুশি হতে বাধ্য হয়েছে।

সেই থেকে দিবাকরের জীবনের ইকনমিকস্ একের পর এক জয়ী হয়ে এগিয়ে গিয়েছে, আর উঠেছে। কোন বাধাই বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। এমন কি ঐ ম্যানেজার রাখালবাবুও দিবাকরের চেষ্টার সম্মুখে ছায়ার মতো অশরীরী হয়ে শেষ পর্যন্ত মিথ্যে হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

দিনে অন্তত একটিবার সুপ্রকাশ দত্তের অফিস-ঘরে ঢুকে বেশ একটু বিচলিত ও উত্তেজিতভাবে একটি বক্তব্য বলে যায় দিবাকর।—আমার অপরাধ মার্জনা করবেন স্যার।

সুপ্রকাশ দত্ত হাসে—অপরাধ?

দিবাকর—হ্যাঁ! ম্যানেজার রাখালবাবুর ভুল ধরিয়ে দিলে যদি অপরাধ হয়, তবে আমি অপরাধ করেছি।

সুপ্রকাশ দত্ত—তাই নাকি? কি ভুল করেছেন রাখালবাবু?

দিবাকর—কোম্পানির বেশ ক্ষতি হবে, এই রকম একটি কাণ্ড করে বসে আছেন।

সুপ্রকাশ দত্ত—হ্যাঁ! সে কি?

দিবাকর—হ্যাঁ স্যার। একটা ডীলার, যে বেটা আমাদের একটাও মেশিন আজ পর্যন্ত স্পর্শ করলো না, সেই বেটাকেই খাতির করে চা খাওয়াচ্ছেন আর মোটা ডিসকাউন্টের লোভ দেখিয়ে সাধছেন। নিজেকে এত ছোট করে ফেলবার কি কোন দরকার আছে!

সুপ্রকাশ দত্তের ভুরু কুঁচকে ওঠে।—না, কোন দরকার নেই!

দিবাকর—এই হলো আমার অপরাধ, আমি আপত্তি করেছি। রাখালবাবু আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

সুপ্রকাশ দত্ত চেঁচিয়ে ওঠে—এজন্য আপনার ওপর বিরক্ত হবার কি অধিকার আছে রাখালবাবুর?

দিবাকর—তা জানি না, তিনি হয়তো মনে করেন যে, তাঁর অধিকার আছে।...কিন্তু আপনি যা-ই মনে করুন স্যার, কোম্পানির স্বার্থের কোন ক্ষতি দেখলে আমি আপত্তি না করে থাকতে পারবো না।

সুপ্রকাশ দত্ত—একশো বার আপত্তি করবেন। আমি তো এটাই চাই। এবার থেকে ডীলারদের সঙ্গে আপনি কথা বলবেন। এসব ব্যাপারে রাখালবাবুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

এইভাবে, চার বছরের মধ্যেই দিবাকরের ভাগ্যটাও সেই টেবিলের পাশের ছোট টুলের উপর থেকে সরে গিয়ে একের পর এক অনেক চেয়ার পার হয়ে একেবারে মালিক সুপ্রকাশ দত্তের অফিস ঘরের পাশে একটি নতুন কেবিনে এসে মস্ত বড় টেবিলের কাছে একটি মস্ত বড় চেয়ারে আসীন হতে বাধ্য হয়েছে। কোম্পানির উন্নতির জন্য যা করার দরকার, তাই

করতে বাধ্য দিবাকর। যার নুন খায়, তার গুণ গাইতে বাধ্য দিবাকর। যে মালিক চার বছরের মধ্যে দিবাকরের মাইনে পঁয়তাল্লিশ টাকা থেকে পাঁচশো দশ টাকা করে দিয়েছে, তার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে বাধ্য দিবাকর।

কে না দিবাকরকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো? স্টোরবাবু ভয় পেয়ে চুপ করে গেলেন। অ্যাকাউন্টসের নিমাইবাবু আশ্চর্য হয়ে চুপ করে গেলেন। নতুন মালিক সুপ্রকাশ দত্তের হৃৎপিণ্ডটাকেই জয় করে ফেলেছে যে দিবাকর, তাকে বাধা দেবার ক্ষমতাই বা আছে কার? সুপ্রকাশ দত্ত বিশ্বাস করে, দিবাকরবাবু ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানে মালিকের প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞ বলতে আর একজনও নেই। আর সবাই শুধু চাকরি করে মাইনে পাওয়ার জন্য। একমাত্র দিবাকরবাবু প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কাজ করেন।

ইউরোপ থেকে নানারকম মেশিন আমদানি করা আর সেই সব মেশিন ভারতের নানা জায়গায় ডীলারদের মারফত বিক্রি করা—ত্রিশ বছর বয়সের কর-কোম্পানির এই কারবারের সুনাম এখনও একটুও কমে যায়নি। বুড়ো দত্তবাবু বলতেন, এই কোম্পানির একশো তের জন কর্মচারীর উৎসাহ হলো আমার কোম্পানির প্রাণ। কিন্তু সুপ্রকাশ দত্ত একদিন অফিসের প্রত্যেক ঘরে ঢুকে বেশ উত্তেজিতভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে গেল, আপনারা এই কোম্পানির উন্নতিকে পিষে মারবেন। ত্রিশ বছর ধরে কোম্পানির অনেক ক্ষতি করেছেন, কিন্তু আর নয়, এবার আমিও দেখবো। কোম্পানির উন্নতি না হলে এক পয়সা কারও মাইনে বাড়বে না।

হ্যাঁ, তার কয়েক দিন পরেই মাইনে বাড়াতে হলো কিন্তু শুধু একজনের। দিবাকরের মাইনে হলো ছ'শো দশ টাকা। অ্যাকাউন্টসের নিমাইবাবুকে মুখের উপর শুনিয়ে দিল সুপ্রকাশ দত্ত, দিবাকরবাবু ছাড়া আর কার মাইনে বাড়তে পারে, আপনিই বলুন? কোম্পানির জন্য ভাবছেন আর খাটছেন, দিবাকরবাবু ছাড়া এমন আর একজনও কি আছে?

কাজে ইস্তফা দিলেন ম্যানেজার রাখালবাবু।

সুপ্রকাশ দত্ত সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা স্বীকার করে নিয়ে বললো—খুব ভাল কথা। কোম্পানিরও নিউ ব্লাড দরকার।

সেদিন ম্যানেজারের চেয়ারে বসবার আগে দিবাকরও একবার বিচলিত হয়ে উঠলো। সুপ্রকাশ দত্তের ঘরে ঢুকে আর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে প্রতিজ্ঞা করলো নতুন ম্যানেজার দিবাকর—আপনি আমাকে যে দায়িত্ব দিলেন, সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি আমাকে মরে যেতেও হয়...অর্থাৎ আমি যে কোন স্যাকরিফাইসের জন্য প্রস্তুত আছি স্যার।

করুণা হাসে—এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন করলে আমি কিছু বলতে পারবো না।

দিবাকরের স্ত্রী করুণাও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। চার বছর আগের জীবনে, আর আজকের জীবনের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে একটি মাত্র সত্যকেই মনে-প্রাণে আরও নিবিড় বিশ্বাসে অভিষিক্ত করে নিয়ে বুঝতে পারে করুণা, চার বছর আগের সেই দীনতা আর রিক্ততা মরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

মনে পড়লে আজও লজ্জা পায় করুণা, দিবাকরের মতো মানুষের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে চার বছর আগে মনে মনে কত রাগই না সহ্য করতে হয়েছিল। বাবার উপর, কাকার উপর, বড় বউদির উপর রাগ হয়েছিল। কোথাকার এক কোম্পানির অফিসে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করে, এদিকে বিদ্যাবত্তার রকমও তথৈবচ, এমন মানুষের সঙ্গে বি-এ পড়া মেয়ের, এবং দেখতে বেশ সুন্দর এমন মেয়ের বিয়ে হবে, এই পরিণাম ভাবতেই যে গা সিরসির করে উঠেছিল। কিন্তু কে জানে কেন, সকলে মিলে যেন একটা গোঁ ধরে এই বিয়ের জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বাবার টাকা নেই, কাকার সাহায্যে বিয়ে হবে, বোধহয় এই একটি

কারণ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না, যার জন্য করুণার মতো মেয়ের সঙ্গে দিবাকরের মতো ছেলের বিয়ের কথা উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়েও গেল। স্বীকার করে করুণা, শেষ পর্যন্ত লজ্জা পেতে বাধ্য হয়েছে করুণা, দিবাকরের মতো স্বামী পেয়ে জীবনটা গর্বেও ভরে উঠেছে। নিজেকে ক্ষমা করতেও পেরেছে করুণা। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের কেরানিকে বিয়ে করতে মনটা যে বিমর্ষ হয়েছিল, সেটা কোন অপরাধ নয়। বিমর্ষ হতে বাধ্য। এবং আজ সন্ধ্যায় যখন অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে দিবাকর, আর সেই গাড়িতে চড়ে সারা সন্ধ্যাটা বকুলবাগানের মাসিমার বাড়ি থেকে শুরু করে হিতেনদার মেয়ে সুলেখার শ্বশুরবাড়ি পর্যন্ত একবার বেড়িয়ে আসবে করুণা, তখন মনে মনে স্বীকার করবে করুণা, আজ সুখী হতে বাধ্য হয়েছে করুণার জীবন। তাই হাসে করুণা এবং দিবাকর আবার জিজ্ঞাসা করে--বলতে পার, কেন তোমাকে আমি এত ভালোবাসি?

করুণা হাসে--জানি না।

দিবাকর হাসে--ভালোবাসতে বাধ্য, তাই।

দিবাকরের এই বিশ্বাসের উল্লাস মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েও যেন নিঃশ্বাসের ভিতরে একটা বেদনার ভার অনুভব করে করুণা। দিবাকরের কথার মধ্যে একটুও ভুল নেই। সেই চার বছর আগে, বিশ টাকা ভাড়ার একটা বিশ্রী ঘরের নিভৃতে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের একটা দীনতার সংসারে ঢুকে প্রথম যেদিন মুখভার করেছিল করুণা, সেদিনটার কথাই মনে পড়ে। সেদিন করুণার ঐ মুখভার দেখেও অসন্তুষ্ট হয়নি দিবাকর। সেদিন যে-ভাবে হেসেছিল দিবাকর, আজও সেইভাবে হাসে। আমি তোমাকে ভালোবাসতে বাধ্য, এই কথাটা সেদিনের সেই রিক্ত ঘরটারই কথা। আজ সে-কথা মনে পড়তে, নিজের উপর ঘৃণা হয় আর স্বামী দিবাকরের উপর শ্রদ্ধার আবেশে বিহ্বল হয়ে যায় করুণার মন।

কৃতী স্বামীকে শ্রদ্ধা না করে পারবে কেন করুণা? করুণার সুখের আকাঙ্ক্ষার কোন দাবিই যে অপূর্ণ থাকছে না। হিতেনদার বউ এসে করুণাকে হেসে হেসে আর আশ্চর্য হয়ে একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন--কার ভাগ্যের জোরে এমনটা হলো করুণা?

--কি হলো?

--চার বছরের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ টাকা থেকে একেবারে ছ'শো দশ?

করুণা হাসে--ওর ভাগ্যের জোর।

দিবাকর বলে--না বউদি, করুণার ভাগ্যের জোর।

শুনতে ভাল লাগে করুণার। করুণার ভাগ্যের জোর। করুণার দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

--কিন্তু কেমন করে হলো?

হিতেনদার স্ত্রীর মুখের এই প্রশ্নটাও একটা বিস্ময় হয়ে উঠেছে এবং কোন উত্তর খুঁজে পায়নি করুণা। দুর্ভাগ্যটা সৌভাগ্য হয়ে যেতে বাধ্য হয়, এ ছাড়া আর কোন্ কারণ থাকতে পারে? চেষ্টা করেও এমন উন্নতি আর এত সুখের উপহার চার বছরের মধ্যে কে-ই বা লাভ করতে পেরেছে? মণিমালার স্বামী আজ চার বছর ধরে কত খেটে পড়ছে আর একটা পরীক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু পাশ করতে পারছে না। এত চেষ্টা করেও আজ চার বছরের মধ্যে ইনস্পেক্টর হতে পারলো না মণিমালার স্বামী। কত দুঃখ করছিল মণিমালা।

দিবাকরই উত্তর দেয়।--আপনার প্রশ্নের উত্তর হয় না বউদি।

বউদি--কেন?

দিবাকর বলে--সূর্য-চন্দ্র কেন আলো দেয় বলতে পারেন?

বউদি--না।

দিবাকর হাসে--আলো দিতে বাধ্য, তাই আলো দেয়। আর কোন কারণ নেই।

বউদি হাসেন—হবে।

কিন্তু বিশ্বাস করে করুণা, এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই। দিবাকরের মতো কৃতী স্বামী জীবনে পাওয়ার ছিল, পেতে বাধ্য হয়েছে করুণা।

আজকালও যেদিন পটলডাঙ্গার বাপের বাড়িতে যায় করুণা, সেদিন মা সেই চার বছর আগের উপদেশ আবার নতুন করে শুনিয়ে দিতে ভুলে যান না। শুধু মা কেন, কাকিমাও বলেন। বকুলবাগানের মাসিমাও বলেন--কখ্‌খনো দিবাকরের অবাধ্য হবে না। যা বলবে, তাই শুনবে। ইচ্ছে না করলেও দিবাকরের সব ইচ্ছা মেনে নেবে।

বুঝতে পারে করুণা, এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও পায় ; আজও মা কাকিমা ও মাসিমার মনে সেই পুরনো ভয়ের রেশটুকু যেন লেগে আছে। বিয়েতে করুণার আপত্তির ভাব দেখে, বিয়ের পরেও কিছুদিন করুণার গম্ভীর মুখ দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন সবাই। করুণাকে উপদেশ দিয়ে দিয়ে সবাই যেন সেই ভয় ভাঙ্গবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। করুণা যেন দিবাকরের অবাধ্য না হয়।

সেদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মনের মধ্যে বিদ্রোহ রেখেও শুধু জোর করে হেসে হেসে যে উপদেশ মেনে নিয়েছিল করুণা, আজ সে উপদেশ স্মরণ করবারও প্রয়োজন হয় না। আজ করুণার জীবনটাই যেন শ্রদ্ধার আবেশে পরিপূর্ণ হয়ে দিবাকরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে বাধ্য হয়ে গিয়েছে। যেন অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে করুণা। ইচ্ছা না থাকলেও দিবাকরের কোন ইচ্ছাকে অসুখী করে রাখতে পারে না। দিনে অন্তত দশ কাপ চা খেত যে করুণা, সে করুণা দিবাকরের শুধু মুখের একটা কথার সামান্য অনুরোধেই সাবধান হয়ে গিয়ে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। দিবাকর চা খাওয়া পছন্দ করে না।

দিবাকর যদি বলে যে, আজ আর বকুলবাগানের মাসিমার বাড়ি যাবার দরকার নেই, সেই মুহূর্তে স্বীকার করে নেয় করুণা, না দরকার নেই। দিবাকর বলে, আজ শুধু ময়দানের চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে ঘুরে এসে গাড়িটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিও। করুণা বলে, হ্যাঁ, তাই ভাল, আজ আর খুব বেশি বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

পুজোর সময় পুরী গেলে কেমন হয়? করুণার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলেছিল দিবাকর। দিবাকর বলে—পুরীর সমুদ্র দেখতে সত্যিই কি তোমার মন ছটফট করছে? আমার তো ভাবতেই খারাপ লাগে।

করুণা বলে--আমারও। এমন কি আর অদ্ভুত জিনিস সমুদ্র, যে দেখতেই হবে।

পুরী যাওয়া হয় না। এবং যেতে না পেরে একটুও দুঃখিত হয় না করুণা। বরং ভেবে খুশি হয় যে, পুরী যাবার শখ ছেড়ে দিয়ে দিবাকরকে একটু সুখী করতে পেরেছে করুণা।

বাইরের ঘরে সকালবেলা যখন একা একা বসে অফিসের ফাইলগুলো দেখে দিবাকর, তখন ভিতরের ঘরে বসে নিজের হাতে বুরুশ তুলে নিয়ে দিবাকরের জুতো পালিশ করে করুণা। বাড়িতে চাকর আছে, তবু এই কাজটা নিজের হাতেই করতে ভাল লাগে করুণার। চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না করুণা, কেন এবং কিসের জন্য এ হেন কাজকেও এত ভাল লেগে গেল? ভাল লাগিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে করুণা।

শুনতে পায় করুণা, বাইরের ঘরে মানুষের নানারকম আবেদনের স্বর কাঁপছে, বাজছে আর ছটফট করছে। অফিসের লোকেরা আসছে। কারও দাবি পাঁচ টাকা মাইনে বৃদ্ধি। কারও দাবি একমাস ছুটি। কেউ চায় একশো টাকা ধার। দিবাকরের জীবন আজ এতগুলি মানুষের ভাগ্যের ভালমন্দের প্রভু হয়ে উঠেছে। এই মানুষকে চার বছর আগে কি ভেবেছিল করুণা? করুণার হাত দুটো যেন সেই ভুল-ভাবনার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ক্ষমা চাইবার আবেগে আরও উৎসাহের সঙ্গে দিবাকরের জুতোর উপর বুরুশ চালাতে থাকে।

সেদিনও ঠিক সকাল দশটায় অফিসের গাড়ি যখন এল, এবং মিররের সামনে দাঁড়িয়ে

দিবাকরের গলায় যখন নিজের হাতে টাই বেঁধে দিল করুণা। তখন হঠাৎ একটু নতুন রকমের বিস্ময় নিয়ে দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে করুণা। দিবাকর যেন একটু নতুন রকমের হাসি হাসছে।

করুণা বলে--কি হলো?

দিবাকর--ম্যানেজার রাখালবাবু কাল চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

করুণা--তারপর?

দিবাকর--তারপর আমিই ম্যানেজার হলাম। আমি ছাড়া সুপ্রকাশ দত্ত আর কাউকে মানুষ বলেই ভাবে না।

করুণা--কেন?

কথাটা যেন নিতান্ত একটা আনমনা চিন্তার ভুলে করুণার মুখ থেকে বের হয়ে গিয়েছে। কেন? এই কথাটাকেই জীবন থেকে বাতিল করে দিয়েছে করুণা। কেন বলে কোন প্রশ্ন নেই, সংসারের সব কিছু বাধ্য হয় বলেই হয়--এই সত্য মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেও উলটো কথা জিজ্ঞাসা করে ফেলেছে করুণা। ম্যানেজার রাখালবাবুকেও চেনে করুণা। করুণার টাইফয়েডের সময় রাখালবাবু রোজ দুবেলা এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছেন। সেই রাখালবাবু। তাঁর মতো এরকম একজন ভাল মানুষ চলে যেতে বাধ্য হলেন কেন? করুণার মনটা কি এই কথা ভেবে আশ্চর্য হয়েছে?

গাড়িতে উঠবার আগে দিবাকর বলে--চলে যেতে বাধ্য হলেন।

যেমন রোজ সন্ধ্যায়, তেমনই আজও সন্ধ্যায় আশা করে বসে থাকে করুণা, অফিস থেকে গাড়ি আসবে, এবং সেই গাড়িতে আজ বকুলবাগানের মাসিমার বাড়ি একবার যেতে হবে।

বাইরের ঘরটা খুব সুন্দর করে সাজানো। গত বছর এই ঘরের সব ফার্ণিচার কোম্পানির অফিস থেকেই এসেছে। তিন হাজার টাকারও বেশি খরচ পড়েছে ; সব খরচ দিয়েছে কোম্পানি। দিবাকরের কাছেই শুনেছে করুণা, সে বছর কর্মচারীদের বোনাস দেবার ঝঞ্চাট থেকে কোম্পানিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল দিবাকর, তাই মালিক সুপ্রকাশ দত্ত খুশি হয়ে দিবাকরকে এই উপহার দিয়েছেন।

দিবাকরের ফিরতে বেশির ভাগ দিনই রাত হয়ে যায়। কারণ, অফিস ছুটি হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ মালিকের কাছে থাকতে হয়। অনেক পরামর্শ দিতে হয়। দিবাকর কাছে না থাকলে বেচারা সুপ্রকাশ দত্ত নিজেকে বড় অসহায় বোধ করেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই কোম্পানির কোন না কোন উন্নতির একটা উপায় আবিষ্কার করে, এবং সেই উপায় অনুসারে একটা ব্যবস্থা না করে ঘরে ফেরে না দিবাকর।

মাঝে মাঝে এমন কথাও দিবাকরের মুখে শুনতে পায় করুণা, মালিক আমার মুঠোর মধ্যে। হেসে হেসে যেন জীবনের এক প্রচণ্ড সাফল্যের গৌরব ঘোষণা করে দিবাকর। অবিশ্বাস করে না করুণা।

গাড়ি আসতে দেরী হচ্ছে। অনেকক্ষণ হলো কাজ সেরে বসে আছে করুণা। অফিস যাবার আগে যে রঙ-এর শাড়ি পরতে বলে গিয়েছিল দিবাকর, সেই রঙ-এর শাড়ি পরেছে করুণা। ফিনফিনে কালো রঙ-এর ভয়েল। করুণার ফরসা চেহারার সঙ্গে কালো রঙ-এর শাড়ি মানায় ভাল, তবু কালো রঙ পছন্দ করে না করুণা। তা ছাড়া ফিনফিনে শাড়ি পরতেও বেশ অস্বস্তি হয়। কিন্তু নিজের রুচির এই সব আপত্তিকে মনের মধ্যে কোন প্রশ্রয়ই দেয় না করুণা। দিবাকর পছন্দ করে, এইটুকুই যথেষ্ট। দিবাকরের ইচ্ছা আর পছন্দের কাছে মাথা নীচু করতে ভালই লাগে করুণার। ফিনফিনে কালো ভয়েলে সাজানো করুণাকে দেখতে পেয়ে দিবাকরের চোখ দুটো খুশি-খুশি হয়ে হেসে উঠবে, ভাবতে ভাল লাগে করুণার।

না, আজ গাড়ি আসতে অনেক দেরি হবে বলে মনে হচ্ছে। হয়তো আসবেই না। বাইরের ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে ভিতরের ঘরে গিয়ে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে করুণা। আজ আর বাইরে বেড়াতে যাওয়া বোধহয় হবে না। নাই বা হলো। কিন্তু এখনই সাজ বদল করবার দরকার কি? যার ইচ্ছের সম্মান রাখবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিনফিনে কালো ভয়েল পরেছে করুণা, সেই মানুষের চোখের সামনে এই সাজে একটা ঘন্টা বসে থাকতেই তো হবে, থাকা উচিত। তাছাড়া বকুলবাগানের মাসিমার কাছে এমন কোন কাজের কথা বলবার নেই যে সেখানে আজ যেতেই হবে।

সত্যি কথা বলতে, কোনদিন কোন কাজের কথা বলবার জন্য বকুলবাগানে বা পটলডাঙ্গায় কিংবা টালিগঞ্জে যায় না করুণা। একটি মাত্র লোভের আকর্ষণে যেতে হয়। বকুলবাগানের মাসিমা কিংবা হিতেনদার স্ত্রী, অথবা আর কেউ, করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে দিবাকরের প্রশংসা করে যে-সব কথা বলে, শুনতে শুনতে করুণার বুকের ভিতরটাই যেন মিষ্টি হয়ে যায়। সত্যিই, দিবাকর যেন জাদুকরের মতো একটা কাণ্ড করে সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়েছে। এত অল্পদিনের মধ্যে এত উন্নতি করতে পেরেছে, অদৃষ্টকে একেবারে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে, এমন গুণ আর এমন প্রতিভা ক'জনের দেখা যায়? লাখে না মিলয়ে এক।

করুণার হাতের সোনার চুড়ি শব্দ করে বাজে, তার চেয়েও বেশি মিষ্টি শব্দের ঝংকার তুলে একটা গর্বের চঞ্চলতাও যেন করুণার মনের ভিতরে বাজতে থাকে।

হঠাৎ বাইরের রাস্তার উপর গাড়ির শব্দ শুনে যেন চমকে ওঠে করুণা। তাই তো, এত দেরী করে গাড়িটা এল আজ। কিন্তু এত দেরি করে এখন আর যে কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু অনুমান করতে পারে না করুণা, দিবাকরের ইচ্ছে আছে, করুণা যেন বেড়াতে যায়। নইলে এত দেরি করেও গাড়ি পাঠাবে কেন? তা ছাড়া, দিবাকরের ইচ্ছার আর একটা কারণও বুঝতে পারে করুণা। আজ যে বকুলবাগানের মাসিমার কাছে একটা নতুন গর্বের কথা বলবার আছে। কর কোম্পানির ম্যানেজার হয়েছে দিবাকর, এই নতুন সৌভাগ্যের কথাটা না বলে থাকতে পারবে কেন করুণা? এবং মাসিমার চোখের বিস্ময় আর মুখের প্রশংসা কত মুখর হয়ে ওঠে, তাই দেখে নতুন করে মুগ্ধ হতে ইচ্ছেও করে।

আর একটা কথা। দিবাকর যে আজ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে, আমার ম্যানেজার হবার খবর শুনে কি বললেন মাসিমা? দিবাকরের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, দিবাকরের সৌভাগ্যের ইতিহাস শুনে কে কত আশ্চর্য হয়েছে, তার সব বিবরণ শোনাতে হবে। তবে খুশি হবে দিবাকর। ঘাড়ে আর গলায় পাউডার ছড়িয়ে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হয় করুণা।

কিন্তু এ কি? ঘরের দরজার কাছে একজনের পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে করুণা

ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে ঢুকে করুণার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় দিবাকর। এবং ব্যস্তভাবে ফিসফিস করে—সুপ্রকাশ দত্ত এসেছে।

করুণাও আশ্চর্য হয়—কোম্পানির মালিক সুপ্রকাশ দত্ত?

দিবাকর—হ্যাঁ, নইলে এত ব্যস্ত হবার কোন দরকার হতো না।

করুণা—কেন? এত ব্যস্ত হবার...।

দিবাকর—আঃ, বুঝছো না, সুপ্রকাশ দত্ত নিজে ইচ্ছে করে আমার এখানে এসেছে। আমি বলিনি, তবু এসেছে। এটা একটা অদ্ভুত সৌভাগ্যের ব্যাপার নয় কি?

করুণা হাসে—চা তৈরি করি।

দিবাকর—চা তো আছেই। তা ছাড়া...।

করুণা—কি?

দিবাকর--তুমি নিজে একবার...।

করুণা--সেটুকু ভদ্রতা করব বৈকি! আমি নিজেই চা নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা ততক্ষণ একটু গল্প কর।

দিবাকর--তা তো করবই...তা ছাড়া।

করুণা--কী?

দিবাকর--প্রণাম করতে ভুলে যেও না যেন।

করুণা হাসে--প্রণাম?

দিবাকর--হ্যাঁ, আমি যদি ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারি তবে তুমিও বা কেন...।

করুণা হাসে--বেশ তো। এর জন্য তোমার এত ব্যস্ত হবার কি আছে? তুমি যাকে শ্রদ্ধা কর, আমি তাকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য।

ব্যস্তভাবে চলে যায় দিবাকর। বাইরের ঘরে গিয়ে সুপ্রকাশ দত্তের কাছে দাঁড়ায়।

একটা সোফার উপর বসে হেসে ওঠে সুপ্রকাশ দত্ত।--পাখাটা খুলে দিন দিবাকরবাবু!

--হ্যাঁ স্যার! বলতে বলতে ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে সুইচ টিপে পাখা খুলে দেয় দিবাকর।

গায়ের কোট খুলে নিয়ে দিবাকরের দিকে এগিয়ে দিয়ে সুপ্রকাশ দত্ত বলে--এটাকে কোথাও ঝুলিয়ে দিন তো।

ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে সুপ্রকাশ দত্তের গায়ের কোট হাতে তুলে নিয়ে দিবাকর দেয়ালের একটা হুকের সঙ্গে আটক করে ঝুলিয়ে দেয়।

--এইবার এক কাপ চা! সুপ্রকাশ দত্ত হাঁপ ছেড়ে হেসে উঠতেই দিবাকর হাসে--আসছে স্যার, একটুও দেরি হবে না।

না, দেরি হয়নি। চা-এর কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে করুণা।

--ধন্যবাদ। হঠাৎ এসে আপনাকে কষ্ট দিলাম। করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে সুপ্রকাশ দত্ত। এবং হেসে হেসে বেশ কিছুক্ষণ. যেন একটা বিস্ময়ের আবেশে, করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুপ্রকাশ দত্তের হাতের কাছে চা-এর কাপ এগিয়ে দিয়ে সত্যিই অপ্রস্তুতের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন ছটফট করতে থাকে করুণা। করুণার কল্পনাই যেন হঠাৎ বিব্রত হয়েছে। কর-কোম্পানির মালিক সুপ্রকাশ দত্ত বলতে এরকম একজন অল্প বয়সের মানুষ মনে হয়নি করুণার। বয়সে দিবাকরের চেয়ে অনেক ছোট না হলেও বেশ ছোট। এমন মানুষকে পা ছুঁয়ে প্রণাম না করলে অভদ্রতা হবে কেন? পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার দরকারই বা কি?

সুপ্রকাশ দত্তের প্রথম হর্ষের উত্তর দেবার ভদ্রতা ভুলে গিয়ে আনমনার মতো কি যেন ভাবতে থাকে করুণা। সত্যিই যে বিশ্বাস হয় না, দিবাকরকে অবিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে। এই একজন ছোকরা বয়সের মানুষকে দিবাকর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে, কী অদ্ভুত কথা! দিবাকরের মনের ভিতরে একটা সামান্য অহংকারও কি নেই? এত সহজে নীচু হয়ে যায় কেন?

সুপ্রকাশ দত্তকে প্রণাম করতে সত্যিই ভুলে যায় করুণা। ইচ্ছে করেই ভুলে যায় কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখতে পায়, দিবাকরের চোখ দুটো ক্ষুব্ধ হয়ে কটমট করে করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। করুণার অবাধ্যতার রকম দেখে যেন ভ্রূকুটি করছে দিবাকর।

করুণার নিঃশ্বাসের বাতাসও টলমল করে ওঠে। নিজেরই উপর রাগ হয়। বোধহয় আবার ভুল করে ফেলছে করুণার মন, সেই পাঁচ বছর আগের মতো ভুল। দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হয়ে ওঠে না করুণার চোখ। কোথা থেকে একটা কঠোর অবাধ্যতার আবেগ এসে করুণার চিন্তা এলোমেলো করে দিয়েছে।

কিন্তু দিবাকরের চোখের সেই কঠোর শাসনের চাহনি শান্ত না হয়ে বরং আরও প্রখর

হয়ে জ্বলতে থাকে। করুণাও কি হঠাৎ একটা ফিলজফির বাতিকে পড়ে মূর্খ হয়ে গিয়েছে? করুণা বোধহয় জানে না, বোঝে না, হিসেব করে চিন্তাও করতে পারে না যে, স্বার্থের জন্য মানুষ যা করতে বাধ্য, সেটা করে ফেলাই উচিত। জানে না করুণা, সুপ্রকাশ দত্তের কাছে আজই যে নতুন একটা অ্যালাওয়েন্স চেয়েছে দিবাকর। বাড়িভাড়া বাবদ মাসিক দুশো টাকা। করুণা যদি বুঝতে পারতো যে, সুপ্রকাশ দত্তকে প্রণাম করা সত্যিই প্রণাম করা নয়, ওটা মানুষের উন্নতির একটা ইকনমিকস্, একটা হিসাব, তা হলে এভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে উসখুস করতো না করুণা।

দিবাকরের চোখের ইঙ্গিত এবার আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। করুণার অবাধ্যতা দেখে রুষ্ট হয়ে দিবাকরের চোখ দুটো কাঁপছে। করুণার শরীরটাও যেন একটা অস্বস্তির জ্বালায় ছটফট করে কেঁপে ওঠে। তারপরেই এগিয়ে এসে সুপ্রকাশ দত্তের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে করুণা।

হাঁপ ছাড়ে, হেসে ওঠে দিবাকরের মুখ।

সুপ্রকাশ দত্তও খুশি হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে--আপনি ঠিকই বলেছিলেন দিবাকরবাবু। কর-কোম্পানির ম্যানেজারের পক্ষে এরকম একটা সাধারণ বাড়িতে থাকা কোম্পানিরই প্রেস্টিজের দিক দিয়ে..।

দিবাকর--আপনি বুঝে দেখুন স্যার। আমি কখনো আমার সুবিধা বা স্বার্থের জন্য কিছু দাবি করি না। কোম্পানিরই প্রেস্টিজের জন্য বাড়িভাড়া বাবদ সামান্য অ্যালাওয়েন্স চেয়েছি, যাতে একটা ভাল বাড়িতে উঠে যেতে পারি।

সুপ্রকাশ দত্ত হেসে ওঠেন--গ্র্যান্টেড!

করুণার মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে যেন কৃতার্থতার উল্লাস চেপে আস্তে আস্তে বলে দিবাকর--তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন করুণা?

সুপ্রকাশ দত্তও ব্যস্ত হয়ে ওঠে--তাই তো! আপনি বসুন করুণা দেবী।

চেয়ারের উপর বসে ফিনফিনে কালো ভয়েলের আঁচলটাকে যেন দু'হাতে খিমচে ধরে করুণা।

সুপ্রকাশ দত্ত বলে--এতদিনে যখন নিশ্চিন্ত হবার সুযোগ পেয়েছি দিবাকরবাবু, তখন অন্তত একটা মাসের জন্য বাইরে কোথাও গিয়ে থাকতে চাই!

দিবাকর--সিমলা আপনার মন্দ লাগবে না স্যার।

সুপ্রকাশ দত্ত--না, পাহাড়-টাহাড় আমার ভাল লাগবে না। সমুদ্রের কথা ভাবছি।

দিবাকর--তা হলে পুরী?

সুপ্রকাশ দত্ত--না, গোপালপুর-অন-সী। চমৎকার জায়গা। সেই ছেলেবেলায় একবার গিয়েছিলাম, আজও সমুদ্রের ধারে বেড়াবার আনন্দ মনে আছে।

দিবাকর--বেশ তো। গোপালপুরে গিয়ে একটা মাস থেকে আসুন।

সুপ্রকাশ দত্ত--হ্যাঁ, একটা মাস কিন্তু আপনাকে কোম্পানির সব ঝঞ্ঝাট সইতে হবে।

দিবাকর--নিশ্চয়। নইলে আমি আছি কিসের জন্য?

পকেট থেকে সিগারেট বের করে সুপ্রকাশ দত্ত। দিবাকর নিজের পকেট হাতড়ে ব্যস্তভাবে দেশলাই খোঁজে।

সিগারেট ধরিয়ে হেসে হেসে করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ওঠে সুপ্রকাশ দত্ত।--আপনি কি সমুদ্র দেখেছেন?

মাথা নাড়ে করুণা--না।

সুপ্রকাশ দত্ত--তাহলে চলুন না গোপালপুর?

সুপ্রকাশ দত্তের অনুরোধের ভাষা যেন ঘরের আলো বাতাসকে হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ময়ে চমকে দিয়েছে। ঘরটাই যেন হঠাৎ মূর্ছার আবেশে স্তব্ধ হয়ে যায়।

পা দুলিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আবার এই অনুরোধের উল্লাসে ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে সুপ্রকাশ দত্ত বলতে থাকে--একটা মাস দেখতে দেখতে পার হয়ে যাবে করুণা দেবী।

কালো ভয়েলের আঁচলটাকে আরও জোরে খিমচে ধরে করুণা, তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে দিবাকরের মুখের দিকে তাকায়।

এইবার দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সুপ্রকাশ দত্ত--আপনার নিশ্চয় কোন আপত্তি নেই দিবাকরবাবু?

সুপ্রকাশ দত্তের প্রশ্নটা যেন দিবাকরের ঘাড়ের উপর এসে আছড়ে পড়েছে। ঘাড় সোজা করতে, মুখ তুলে তাকাতে একটু দেরি করে ফেলে দিবাকর।

--কি বলেন দিবাকরবাবু? আবার প্রশ্ন করে সুপ্রকাশ দত্ত এবং আরও জোরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে করুণার মুখের দিকে তাকায় দিবাকর। সির সির করে কাঁপতে থাকে দিবাকরের চোখের তারা! কিন্তু সুপ্রকাশ দত্তের উচ্চকিত হাসির শব্দ শুনে সেই মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে দিবাকর--হ্যাঁ, স্যার, কি বললেন স্যার?

সুপ্রকাশ দত্ত--আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়?

দিবাকর বলে--আমার আপত্তি নেই স্যার। কিন্তু...।

সুপ্রকাশ দত্ত--কিন্তু কি?

উত্তর না দিয়ে করুণার মুখের দিকে তাকায় দিবাকর। দিবাকরের চোখের চাহনি অসহায় হয়ে করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে কি-যেন প্রার্থনা করছে। ভয় করছে করুণাকে, জীবনে কোনদিন করুণাকে এমন ভয় করেনি। দিবাকরের ইচ্ছার কাছে এই মুহূর্তে কি ভয়ানক মূর্খের মতো আর নিষ্ঠুরের মতো বাধ্য হয়ে যাবে করুণা। করুণার ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটা হাসির জ্বালা শিউরে উঠেছে।

চেঁচিয়ে হেসে করুণার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সুপ্রকাশ দত্ত।--আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়?

হেসে ফেলে করুণা। মাথা হেঁট করে। তারপরেই মাথা নাড়ে।

সুপ্রকাশ দত্ত--কি বললেন? আপত্তি আছে?

করুণা--হ্যাঁ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সুপ্রকাশ দত্ত।--তাই বলুন। আচ্ছা আমি এখন চলি।

দরজার দিকে এগিয়ে যায় সুপ্রকাশ দত্ত। ব্যস্তভাবে পিছু পিছু এগিয়ে যায় দিবাকর। সুপ্রকাশ দত্ত হেসে হেসে বলে--আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে দিবাকরবাবু!

--কিসের সন্দেহ স্যার?

--আপনি নিতান্ত ভালোমানুষ।

চলে যায় সুপ্রকাশ দত্ত। গাড়ির শব্দটা দূরে সরে যেতেই চেঁচিয়ে ওঠে করুণা--আমারও একটা সন্দেহ হচ্ছে।

চমকে ওঠে দিবাকর--কি?

করুণা--তুমি নিতান্তই কর কোম্পানির ম্যানেজার। মানুষ-টানুষ নও!

দিবাকর--তার মানে?

করুণা--তার মানে তোমার দিকে তাকাতেও আমার ভয় করছে।

দিবাকর--কেন?

করুণা--ভয় করতে বাধ্য।

লঘু আরণ্যক

তিনি নামেই প্রসাদবাবু ; কিন্তু সাজে-পোশাকে একেবারে সাহেব। গায়ের রংটাও সাহেব-সাহেব, অর্থাৎ বেশ একটু লালচে ফরসা।

অনেক সখের মতো শিকারও কোন কোন মানুষের একটা সখ। কিন্তু শিকার হলো প্রসাদবাবুর জীবন।

শিকারের সুবিধার জন্যে জঙ্গলের কাছাকাছি একটা পাথুরে মাঠের এক কোণে প্রায়-একটা স্থায়ী ডেরা করে ফেলেছেন প্রসাদবাবু। এই জঙ্গলটার নাম দানুয়া-ভালুয়া, তাই প্রসাদবাবুর ডেরার নাম দানুয়া-ভালুয়া ক্যাম্প। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড যেখানে গয়া জেলার সীমানার বড় বড় তাল গাছগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে আর একটি বেশ সুন্দর ম্যাকাডাম সড়ক দানুয়া-ভালুয়ার শাল খেজুর আর নিমের ঠাসা ভিড়ের বুক চিরে আরও ঘন ছায়াময় এক রহস্যের দিকে চলে গিয়েছে। এই সড়কের পাশে এক পাথুরে মাঠের উপর প্রসাদবাবুর দানুয়া-ভালুয়া ক্যাম্প।

অর্থাৎ তিনটি তাঁবু। একটি বড়, অন্য দুটি ছোট ছোট। ছোট দুটির একটিতে রান্নার কাজ হয়, আর একটিতে চাকরেরা ঘুমোয়। বড় তাঁবুকে থাকেন স্বয়ং প্রসাদবাবু। কখনো নেয়ারের খাটের উপর চিত হয়ে শুয়ে ঘি-এ ভাজা হাঁসের ঠ্যাং দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খান, আবার কখনো বা বনাতের আরাম-চেয়ারে আধ শোয়া হয়ে এক পাঁইট হুইস্কি আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে দেন। তার পরেই হাতের কাছে একটা রাইফেল টেনে নিয়ে রাইফেলটার পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করেন।

কখনো সকালে, কখনো দুপুরে, কখনো সন্ধ্যায়, এমন কি মাঝ রাতে এবং শেষ রাতেও জঙ্গলের বুক তল্লাস করতে বের হয়ে যান প্রসাদবাবু। চারজন চাকর মস্তবড় এক একটা ঝোলা কাঁধে নিয়ে, আর টর্চ টাঙ্গি বল্লম ও বন্দুক হাতে নিয়ে প্রসাদবাবুর দু পাশে আর পিছনে থেকে জঙ্গলের ভিতরের যত সরু সরু ও আঁকা-বাঁকা রেখাপথ ধরে কাঁটাঝোপের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলতে থাকে। মাথার উপরে ফুরুৎ করে ভীরু পাখী উড়ে পালিয়ে যায় ; বাঁ দিকে সুড়ৎ করে একটা খরগোস দৌড়ে যায়, আর ডানদিকে একটা বুড়ো খেজুর গাছের গলা থেকে হিস্ করে একটা রাগী গোখরো নীচের মাটির উপর হঠাৎ ঝরে পড়ে। এগিয়ে যেতে থাকেন প্রসাদবাবু।

অনেকগুলি উইটিপির ভিড় পার হবার পর যে জায়গায় আসা যায়, সেখানেও একটা ডেরা দেখা যায়। জঙ্গলটা এখানে একটু ফাঁকা, ছোট-ছোট দু-তিনটে ভুট্টার ক্ষেত। দুটো জলকুণ্ডও আছে। একটি ঘরও আছে এখানে। অর্থাৎ মাত্র এক ঘর খোঁজি এখানে থাকে।

কাঁকর আর মাটি মিশিয়ে তৈরি দেয়াল। চালা বলতে ঐ হলো চালা। কতগুলি কাঁচা কচি শালগাছের শরীর আড়াআড়ি শুইয়ে রাখা হয়েছে। তারই উপর দুটো জীর্ণ ধনুকের দেহ পড়ে রয়েছে।

জানোয়ারের ঠিকানা জানে যে, এবং ঘুমন্ত অথবা জাগন্ত জানোয়ারের ডেরার একেবারে কাছাকাছি পর্যন্ত এগিয়ে যাবার পথটি খুঁজে দিতে পারে যে, এই ঘর হলো সেই দক্ষ খোঁজি ভিখনের ঘর। কিন্তু ভিখন আজ আর নেই। আছে শুধু ভিখনের বউ মিঠি। মিঠিই আজকাল খোঁজির কাজ করে।

ঐ ছোট ছোট দুটি ভুট্টার ক্ষেত, আর এই খোলা জায়গাটুকু প্রসাদবাবুর দয়াতেই পেয়ে গিয়ে ভিখন খোঁজি এখানে ঘর বেঁধেছিল। চারটি বছর ধরে জঙ্গলের এই নিভৃতে বিচিত্র ও বিপুল এক শ্বাপদ-সংসারের প্রায় মাঝখানে খোঁজি ভিখনের সংসারও যেন এক নতুন

শ্বাপদের নীড়ের মতো গড়ে উঠেছে। ভিখন ছিল এক পাকা শিয়ালগীর। শিয়ালের ডাক ডেকে সন্ধ্যার জঙ্গলের কত শিয়ালের মন ভুলিয়ে দিয়েছে ভিখন। জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে মাঠের উপর এসে দাঁড়িয়েছে শিয়ালের দল। ভিখনের পোষা দুটো শিক্ষিত কুকুর সেই মুহূর্তে তাড়া করে বনের শিয়ালকে ঘিরে ধরে খোলা মাঠের ঘাসের উপর চিত করে ফেলে গলা ছিঁড়ে দিয়েছে। তারপর সেই রক্তমাখা নিষ্প্রাণ শিয়ালের চামড়া ছাড়িয়ে, ঝরনার জলে ধুয়ে নিয়ে ঘরে চলে গিয়েছে ভিখন। প্রতি রবিবারে চৌপারন বাজারে গিয়ে মুচিদের কাছে চামড়া বেচে চাল আর নুন নিয়ে ঘরে ফিরেছে।

মানুষটা ছিল সরকারি আইন অনুযায়ী ক্রিমিনাল ট্রাইবের মানুষ, যারা নাকি জন্ম থেকেই অপরাধ করবার স্বভাব নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। পুলিস ওকে এই জঙ্গলের কাছে এক মাসের জন্য থাকবার অনুমতি দিয়েছিল। একদিন কোথা থেকে ঐ মিঠি নামে কোন্ এক ঐ-রকম ক্রিমিনাল ট্রাইবের মেয়েকে যোগাড় করে নিয়ে এল ভিখন। এবং একদিন প্রসাদবাবুর ক্যাম্পের কাছে দুজনে এসে আবেদন জানালো--আপনার জমিদারীর ভিতর ঐ জঙ্গলটার এক কোণে থাকবার একটা হুকুমনামা দিন হুজুর ; নইলে পুলিস আমাদের তাড়িয়ে দেবে।

একবার ভিখনের দিকে, তারপর অনেক বার মিঠির দিকে তাকালেন প্রসাদবাবু। তারপর লাল চোখের নেশার রং একেবারে তরল করে দিয়ে বলেন--একটা ভালুকের সঙ্গে একটা হরিণী?

সত্যিই, ভিখনের চেহারাটা ভালুক-ভালুক আর মিঠির চেহারাটা হরিণী-হরিণী। ভিখনের মাথার বড় বড় রুক্ষ চুলের ঝাঁকড়াতে জটা ধরেনি, ফলে ফেঁপে রয়েছে চুলগুলি। ভালুকের গর্দানের রোঁয়া ঠিক এই রকমই ফেঁপে থাকে।

আর মিঠি সত্যিই হরিণী-হরিণী। কাপড়ের একটা টুকরো, যার বহর দেড় হাতের বেশি হবে না, লম্বায়ও পাঁচ হাতের বেশি নয়, শুধু কোমরবন্ধের মতো শক্ত করে বেঁধে রেখেছে মিঠি। যৌবনের উচ্ছলতা আর কোমল ছাঁদ বুনো লতা আর টুকরো কাপড়ের বাঁধনে যেন রাগ করে আরও দুরন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রসাদবাবুও মনে করেন, ঐ চেহারাতে জঙ্গলের যত কর্কশ স্নেহ দিয়ে পুষে রাখাই তো উচিত। নইলে বন্দী হয়ে পৃথিবীর কোন্ এক চিড়িয়াখানার গরাদের আড়ালে চলে যাবে।

ভিখন আর মিঠি প্রসাদবাবুরই প্রজা হয়ে গেল ; প্রসাদবাবুর হুকুমনামার গুণে ওরা চাষী হয়ে গেল। কাজেই পুলিসও আইন অনুযায়ী ওদের আর তাড়িয়ে না দিয়ে দানুয়া-ভালুয়ার এই হিংস্র নিভৃতে ভুট্টা ফলিয়ে বেঁচে থাকবার অনুমতি দিল। সত্যিকারের চাষীদের একটা গাঁ কাছেই আছে, সামান্য একটু দূরে।

সেই ভিখন আজ আর নেই। কিন্তু সেজন্য প্রসাদবাবুর মনে কোন উদ্বেগ নেই। মিঠিও ঠিক ভিখনের মতো পাকা খোঁজির কাজ করতে পারে--জানোয়ারের খোঁজ পাওয়া যাক আর না যাক, ক্যাম্পে ফিরে যাবার আগে প্রসাদবাবু মিঠিকে ভাল বকশিশ দিয়ে যান। কোনদিন চার আনা, কোনদিন ছয় আনা।

এক একদিন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন প্রসাদবাবু। খোঁজে যেতে আপত্তি করে মিঠি। তার কারণ হলো, মিঠির ছেলেটা। ভিখন মারা যাবার এক বছর আগে এই ছেলেটা জন্মেছে, এখন বয়স প্রায় তিন বছর। ছেলেটাকে একলা ঘরে রেখে কাজে বের হতে ভয় পায় মিঠি। ঐ সত্যিকারের চাষীদের গাঁয়ে যে আখের ক্ষেত মিঠির ঘরের একেবারে কাছাকাছি এসে শেষ হয়েছে, সেই আখের ক্ষেতে দিনের বেলাতে হিংস্র হুঁড়ার ঘুরে বেড়ায়। টাঙ্গি হাতে না নিয়ে ঐ জলকুণ্ডের কাছেও যাওয়া নিরাপদ নয়।

মিঠির আপত্তি গ্রাহ্য করেন না প্রসাদবাবু। এখুনি বের হতে হবে মিঠিকে, জঙ্গলের ভিতরে বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করতে হবে। আর, একেবারে মরির কাছাকাছি পর্যন্ত

নিয়ে যেতেই হবে। মিঠির হাতে একটা সিকি তুলে দেন প্রসাদবাবু। ছেলেটাকে কোন চাষীর বাড়ির খড়ের মাচানে বসিয়ে রেখে ফিরে আসে মিঠি। চকচকে টাঙ্গিটা হাতে তুলে নেয়। তার পরেই হেসে ফেলে সেই বুনো হরিণী--চলুন।

জঙ্গলের কোথায় সল্ট লিক আছে? জানতে চান প্রসাদবাবু।

মিঠি হাত তুলে দেখিয়ে দেয়--এই স্রোতের ওদিকে ঘাসের বনের কাছে আজকাল নোনা মাটি চাটতে আসে জানোয়ার।

ঠিক খোঁজ দিয়েছে মিঠি। একটুও মিথ্যে নয়। ঘাসের বনের কাছে এসে শত শত থাবার ছাপ দেখতে পান প্রসাদবাবু! টাটকা একটা ছাপ দেখে মনে হয়, মাত্র এক মিনিট আগে একটা বাঘ মাটি চেটে চলে গিয়েছে।

আজ কি কোথাও মরির খোঁজ পাওয়া যাবে? মিঠিকে প্রশ্ন করতেই হাতের চকচকে টাঙ্গির মতই একটি চকচকে হাসি চমকে ওঠে, এক টুকরো কাপড় পরা সেই বুনো হরিণীর গভীর কালো দুটি চোখে। মিঠি বলে--পাওয়া যাবে হুজুর।

খেজুরের ঘন ভিড় পাশে রেখে কাঁটাশিরীষের আর সোঁদালের জঙ্গল পার হয়ে প্রসাদবাবুর দল চলতে থাকে। আগে আগে পথ দেখায় মিঠি। সেঁয়াকুলের লতানো কাঁটা বড় বড় বহেড়া আর হরতকীর শরীর জড়িয়ে ধরেছে। গাছের পাতায় জলের ফোঁটা। ওগুলি কিন্তু শিশির নয়। গাছের ঘাম। মাছির দল গাছের সেই ঘাম শুঁকে শুঁকে গুনগুন করে।

হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে থমকে দাঁড়ায় মিঠি। বোধহয় পথ ভুল হয়েছে। প্রসাদবাবুর চাকরের দল ভয় পেয়ে আর রাগ করে মিঠিকে ধমক দেয়। তবু মিঠি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আসশেওড়ার একটা গাছ। সাদা সাদা ফুল মাটিতে ঘাসের উপর ছড়িয়ে রয়েছে। একটা সুগন্ধও থেকে থেকে হাওয়াতে ভেসে আসছে। দেখতে পান প্রসাদবাবু, মিঠির কোমর ছুঁয়ে দুলছে কতগুলি বনযোয়ানের মঞ্জরী।

চাকরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন প্রসাদবাবু। সেই মুহূর্তে অভিজ্ঞ চাকরও ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ব্যাগ থেকে একটা গেলাস বের করে আর হুইস্কি ঢেলে প্রসাদবাবুর হাতে ধরিয়ে দেয়। প্রসাদ বাবুর চোখেও রঙীন নেশা ধরে।

--কি দেখছো মিঠি? দেরি কিসের?--হাঁক দেন প্রসাদবাবু।

মিঠি বলে--গাঁজার গাছ।

হ্যাঁ, ভয়ানক নিভৃতেও বাজারের কোন্ বে-আইনি লোভের চক্রান্ত কখন এসে গাঁজার চাষ করে চলে গিয়েছে। বেশ লাভ হয় গাঁজার এই বে-আইনি চাষে। প্রসাদবাবুর চাকররা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে গাঁজার পাতা ছিঁড়ে ব্যাগ ভর্তি করে। মিঠিকে আশ্বাস দেয়--আবার যখন দেখা হবে, তখন তোকেও কিছু পয়সা দিয়ে যাব। অন্তত আনা তিন-চার তো নিশ্চয়ই দেবো।

এক গাল হেসে আবার উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যায় মিঠি। মিঠির পথচলার তালের সঙ্গে যেন শব্দ মিলিয়ে আশেপাশের ঝোপে পটপটে ফল ফট্‌ফট করে ফাটতে থাকে।

চিল উড়ছে উপরে। পথের পাশের লতাগুলি নেতিয়ে রয়েছে। মাটির উপর ঘাসগুলি যেন আঁচড়ানো। শুকনো পাতা এপাশে ওপাশে যেন ঝেঁটিয়ে সরোনো। মিঠি হাত তুলে দেখায়--ঐ যে।

হ্যাঁ, ঠিকই খোঁজ দিয়েছে মিঠি। একটা বাছুরের লাশ পড়ে রয়েছে। লাশের শুধু অর্ধেকটা খেয়ে চলে গিয়েছে জানোয়ার। মরির কাছে এগিয়ে এসে প্রসাদবাবু বলেন--লেপার্ডের কীর্তি। আজ তাহলে এখানেই মাচান বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হয়।

এই ভাবেই, ভিখন মরে যাবার পরেও প্রসাদবাবুর শিকারের প্রয়োজনে খোঁজির কাজ

করে আসছে মিঠি। প্রসাদবাবুও খুশি হয়ে মিঠিকে বকশিশ দেন। এবং হেসে হেসে বলেন, ভিখন ছিল একটা ভালুক, ভিখনের বউ হল একটা হরিণী, আর ভিখনের এই ছেলেটা একটা খরগোস।

হ্যাঁ, প্রসাদবাবু ঐ চেহারা আর ঐ বন্দুক দেখলেই তিন বছর বয়সের ছেলেটা যেন সুড়ুৎ করে এক দৌড়ে আড়ালে সরে গিয়ে আমলকির পাতার ঝোপে মুখ গুঁজে দিয়ে লুকিয়ে পড়ে।

দানুয়া-ভালুয়ার এই শ্বাপদময় সংসার থেকে কত সংহারের আনন্দে মত্ত হয়ে ফিরে গিয়েছেন প্রসাদবাবু। ক্যাম্পে বসে হেসে হেসে তাকিয়ে দেখেছেন, ঐ যে এখনো সামনে ঘাসের উপর পড়ে আছে তাঁরই ভোরের শিকারের মরা শরীরটা। একটা ভালুকী। মনে হয় যেন মুখ থুবড়ে আর মাটি কামড়ে নীরবে কাঁদছে ভালুকীটা। ভালুকীর পিঠের রোঁয়ার ভিতরে লুকিয়ে এখনো নড়ে-চড়ে উঁকি দিচ্ছে জ্যান্ত বাচ্চাটা। চাকরকে ডাক দিয়ে হাত এগিয়ে দেন প্রসাদবাবু। হাতে হুইস্কির গেলাস চলে আসে।

শালের আড়ালে লুকিয়ে থাকে লাজুক চৌ-শিঙ্গা। ঘাসের জঙ্গলকে সিরসিরিয়ে আর মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে হাঁটে ছোট্ট ছোট্ট পারা হরিণ, শুয়োরের মতো মাটি শোঁকা অভ্যাস। প্রসাদবাবুর রাইফেলের কাছে সবারই সমান আদর। শুধু বুলেট বাছতে যা দেরি! পর মুহূর্তে জঙ্গলের বুকে একটা আর্তশব্দ ঠিকরে ওঠে, জানোয়ারের ফুটো বুকের ভিতর থেকে তপ্ত রক্তের ঝলক উথলে উঠে জঙ্গলের মাটি রঙীন করে দেয়। চৌ-শিঙ্গা ও পারার লাশ টেনে নিয়ে আসে চাকরের দল।

নির্ভীক প্রসাদবাবু। প্রসাদবাবু জঙ্গলে ঢুকলে সারা জঙ্গলটাই যেন একটা ভয়ের শিহর চুপ করে সহ্য করতে থাকে। তক্ষক কাশে—খক্ খক্ খক্। হায়না হাসে—খাঃ, খাঃ, খাঃ। প্রসাদবাবুও মনে মনে হেসে কেশে অন্য পথে চলে যান। হায়না মেরে চারশো পঞ্চাশ ডবল ব্যারেলের অপমান করবার দরকার নেই। হায়নাগুলি হলো জঙ্গলের ছুঁচো। দাঁতালো শুয়োর, ডোরাকাটা বড় মামা, আর নীলগাই-এর সন্ধান পেতে চান প্রসাদবাবু।

যে ক'দিন শিকারে আসেন না প্রসাদবাবু সেই ক'দিন মিঠি নিজেই শিকার করে। মিঠির হাতে বার বোরের প্যারাডক্স নেই। বড় জোর একটা টাঙ্গি। কিন্তু এই টাঙ্গিও শিকারের জন্য নয়। নিজের প্রাণটাই বাঘ আর ভালুকের শিকার হয়ে যেতে পারে, যে কোন মুহূর্তে। তাই হাতের কাছে এই টাঙ্গিটা রাখে মিঠি।

জাল পারে আর ফাঁদ পাতে মিঠি। সন্ধ্যা হলে এক একদিন চাষীদের গাঁয়ের বুড়ো বটের মাথার সঙ্গে জাল ঝুলিয়ে দিয়ে রাত জাগে। বাদুড়ের ঝাঁক এক একদিন ধরাও পড়ে। বাজারের কবরেজের লোক এসে বাদুড় কিনে নিয়ে যায়! এক একটা বাদুড় দু' পয়সা। বাজারের পাখিওয়ালাও মাঝে মাঝে এসে দাদন দিয়ে যায়, আট আনা কিংবা দশ আনা। ফাঁদ পেতে পাখি ধরে মিঠি। টিয়া আর লটকন তোতা, কখনো বা একটা শিকরে বাজ, কখনো পাঁচ-সাতটা ঠুক ঠুকিয়া, কোন কোন দিন একটা দুটো পিউ কাঁহা। বটের আর তিতির কড়া করে ভেজে মদের সঙ্গে খেতে ভালবাসেন প্রসাদবাবু। অনেক বটেরও ধরে রাখে মিঠি। প্রসাদবাবুর চাকরেরা এসে নিয়ে যায়।

এক একদিন কোন কাজই করে না মিঠি। সকাল দুপুর ও সন্ধ্যা সত্যিই একেবারে বুনো হরিণীর মতো শরীরটাকে যেন ঘাসের উপর এলিয়ে দিয়ে কখনো পড়ে থাকে, কখনো গড়ায়। মাঝে মাঝে তিন বছর বয়সের ছেলেটাকে বুকের উপর চড়িয়ে জড়াজড়ি করে। সন্ধ্যার আবছায়া যদি থাকে, তবে দেখলে মনে হবে, সত্যিই একটা হরিণী একটা খরগোসকে বুকে নিয়ে খেলছে।

এই সময় জঙ্গলের গাছের আড়ালে কোন শব্দ হলেই ভয় পেয়ে চমকে ওঠে মিঠি।

বাঘের আর ভালুকের ভয়ে নয়। মানুষের ভয়ে। মনে হয়, সাহেব আসছেন বন্দুক হাতে নিয়ে এবং এখনই বুকের উপর খরগোস নিয়ে এই খেলার আনন্দ ছেড়ে দিয়ে খোঁজের কাজে বের হতে হবে। আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে আসেন প্রসাদবাবু। কারণ, ঐ আখের ক্ষেতের কাছেই মাচান বাঁধা হয়েছে। ভয়ানক এক বাঘিনীর উপদ্রব শুরু হয়েছে।

বাঘটাকে দশ দিন আগে প্রসাদবাবুই গুলি করে মেরেছেন। এই মাচানের উপর বসে একটি গভীর রাতের মুহূর্তে প্রসাদবাবুর আনন্দ বাঘের মতো গর্জন করে উঠেছিল। এক গুলিতে বাঘটাকে মেরে ফেলতে পেরেছিলেন। ধন্য হয়েছে তাঁর ৩৮৫ ম্যাগনাম রাইফেল আর ১৮০ গ্রেন সিলভারটিপ ডিলেড অ্যাকশন বুলেট। চৌপারন থানার আঙ্গিনাতে সেই বিরাট ডোরাকাটা রয়্যালের চেহারা দেখবার জন্য হাজার মানুষের ভিড় ভেঙে পড়েছিল।

কিন্তু বাঘিনীটা কই? বাঘিনীর খোঁজ পাওয়া যায় না। অথচ প্রতি দিন ও রাত বাঘিনী যেন চারদিকের দশটা গাঁয়ের প্রাণের উপর প্রতিশোধ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ডাকের রানার সেই বুড়ো মানুষটাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক মাইল দূরে এক পাহাড়ের কাছে চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে বাঘিনী। পুলিস শুধু রানারের নীল জামাটার এক টুকরো আর চিবনো হাড়গুলিকে তুলে নিয়ে এসেছে।

মহিষ আর গরুর সংখ্যা হবে মোট উনিশ, সবই বাঘিনীর পেটে গিয়েছে। গাঁয়ের চাষী দিন দুপুরেই ধান কাটার সময় বাঘিনীর থাবায় আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছে। এই হিংস্র বাঘিনীকে মারবার জন্য প্রসাদবাবুও হিংস্র হয়ে উঠেছেন। রাতের পর রাত জাগেন। মাচানের উপর বসে থাকেন। মাচানের নীচে একটা রোগা ছাগল গাছের সঙ্গে সারারাত বাঁধা থাকে। ছাগলটা সারারাত চেঁচিয়ে ডাকে।

কিন্তু আশ্চর্য! বাঘিনীর লোভের জন্য এমন সুন্দর একটা টোপ ফেলা হয়েছে ; টোপটা কি সুন্দর কাতরস্বরে ব্যা ব্যা করে সারারাত ধরে ডাকে—তবু সেই ধূর্তা বাঘিনী মাচানের কাছে আসে না।

ভোর হতেই মাচান থেকে নেমে রাত জাগা চোখ দুটোকে আরও মাতাল করে চেঁচিয়ে ডাক দেন প্রসাদবাবু—মিঠি!

মিঠি এসে বলে—হুজুর!

—বাঘিনী আসে না কেন?

—বাঘিনী এদিকে আসবে না হুজুর।

রাগ করেন প্রসাদবাবু।—রোজ এই এক কথা। আসবে না, আসবে না। তারপরেই বিড় বিড় করেন প্রসাদবাবু—তোর ছেলেটা যদি সত্যিই খরগোস হতো তবে ওটাকেই আমি মাচানের নীচে বাঁধতুম।

. একদিন, দুদিন, তিনদিন। তার পরেই এক সকালে মাচান থেকে নামতেই খোঁজ দিল মিঠি, বাঘিনী কাছেই আছে হুজুর।

প্রসাদবাবুও মিঠির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে স্বচক্ষে দেখলেন, জলকুণ্ডের কাছেই কাদার উপর বাঘিনীর পায়ের ছাপ আঁকা রয়েছে। কাল রাতেই তাহলে বাঘিনী এত কাছে চলে এসেছিল?

মিঠি জানে, শুকনো পাতার উপর বাঘের পায়ের শব্দ কেমন করে চোরের মতো ফিসফাস শব্দ করে। মিঠির চোখের মতো ওর কান দুটোও যে বুনো উল্লাসের সব রহস্য এক মুহূর্তে বুঝে নিতে পারে। প্রসাদবাবু কল্পনা করেন, মিঠিও যদি মাচানে থাকে, আর মিঠির হাতে টর্চ থাকে, তবে বাঘিনীর পায়ের শব্দ মাচানের কাছাকাছি আসতেই বাঘিনীর উপর টর্চের আলো সেই মুহূর্তে ফোকাস করতে পারবে না কি মিঠি?

সন্ধ্যা হবার আগেই ক্যাম্প থেকে মত্ত হয়ে একাই ছুটে আসেন প্রসাদবাবু। মিঠির হাতে

একটা টাকা বকশিশ ফেলে দেন। মিঠিকে টর্চ ফোকাস করবার কায়দা শিখিয়ে দেন প্রসাদবাবু। মিঠি খুশি হয় আর হেসে হেসে আকুল হয়।

সন্ধ্যা হতেই প্রসাদবাবু ও মিঠি মাচানে ওঠে। তিন বছর বয়সের ছেলেটাকেও সঙ্গে নেয় মিঠি। এবং সন্ধ্যা গভীর হবার আগেই ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

সন্ধ্যা গভীর হতে প্রসাদবাবুও তাঁর চোখে সংহারের নেশা আর একটু মত্ত করে নেন। ফ্লাস্ক থেকে চুমুক দিয়ে হুইস্কি খান এবং রুমাল দিয়ে মুখ মুছেই মিঠির দিকে তাকিয়ে হাঁক দেন--মুখ হাঁ কর মিঠি।

মুখ হাঁ করে মিঠি। প্রসাদবাবুর ফ্লাস্ক থেকে হুইস্কির ছোট একটি ঝরনা গ্রীষ্মের বুনো হরিণীর মতো পিপাসী মিঠির হাঁ-করা মুখের ভিতর ঝরে পড়ে।--খেতে বড় ভাল হুজুর। মুখ মুছে আস্তে আস্তে বলে মিঠি।

জঙ্গলের বুক নিঝুম। আকাশের তারাগুলি শুধু ঝিকমিক করে। মাঝরাত পার হয়ে গিয়েছে। কোটি কোটি কীট, শত শত শ্বাপদ আর লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদের প্রাণ যেন সমাহিত হয়ে গিয়েছে। একটা তক্ষকের কাশিও শব্দ করে ওঠে না।

তিন শো পঁচাত্তর ম্যাগনাম হাতে নিয়ে বাঘিনীর প্রাণকে কাছে পাওয়ার জন্য যেন তপস্যা করছে দুরন্ত সংহারনিপুণ প্রসাদবাবুর শিকারী জীবনের সবচেয়ে বড় আশা। এই বাঘিনীকে খুন করতে পারলে শিকারী প্রসাদবাবুর খ্যাতি শত শিকারীর মুখে মুখে একটি বিস্ময়ের গল্প হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

শেষ রাত। মিঠির মুখের দিকে তাকান প্রসাদবাবু। শুকনো পাতার উপরে চোরা পায়ের ফিসফাস কোন শব্দ কি শুনতে পায়নি মিঠি?

মিঠি মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানায়--না।

বাঘিনী আসেনি, আসবেও না বোধহয়। ভোর হতে আর কতক্ষণ? শিকারী প্রসাদবাবু যেন তাঁর দুই চোখে অদ্ভুত এক কৌতূহলের নেশা বিভোর করে দিয়ে বুনো হরিণীর মতো একটা শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকেন' চোখ ফেরান না প্রসাদবাবু। জঙ্গলের রাতজাগা জীবনের কোন সংহারের মুহূর্তে প্রসাদবাবুর চোখে এমন নিবিড় নেশা মত্ত হয়ে হয়ে ওঠেনি। ভাজা হাঁসের মাংস খেতে কত ভাল লাগে, সেই স্বাদের মতো একটা স্বাদের জন্য শিকারী প্রসাদবাবুর বুকের নিঃশ্বাসের মধ্যে দুঃসহ একটা লোভের ঝড় তপ্ত হয়ে উঠেছে।

পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করেন প্রসাদবাবু। মিঠির হাতে গুঁজে দেন নোট। মিঠি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বুনো হরিণীর চোখও এই বিপুল উপহারের বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে যেন আরও ঢলঢল হয়ে ওঠে।

পরমুহূর্তে বুনো হরিণীর সেই ঢলঢল চোখ রুষ্টা বাঘিনীর চোখের মতো ধক্ করে জ্বলে ওঠে।--কি হুজুর?

মিঠিকে দুহাতে কাছে টানেন প্রসাদবাবু। মিঠি বলে--এ কি হুজুর?

প্রসাদবাবু মিঠির পাঁচ হাত কাপড়ের দিকে আর লতা দিয়ে বাঁধা কোমরটার দিকে তাকান। তার পরেই...।

তারপরেই একটা চাপা আর্তনাদ। একটা যন্ত্রণাক্ত কাতরানির শব্দ। রাইফেলটাও হাতে তুলে নিতে পারলেন না প্রসাদবাবু। প্রসাদবাবুর গলাটাকে যেন এক ক্রুদ্ধা বাঘিনীর দাঁতের কামড় হিংস্র হয়ে চেপে ধরেছে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে প্রসাদবাবুর। গলা থেকে রক্তের ঝরনা ঝরে পড়ছে। ছটফট করছেন, গোঁ গোঁ করছেন প্রসাদবাবু। তবু বাঘিনী তার কামড় শিথিল করে দেয় না। প্রসাদবাবু অসহায়ভাবে মাচানে তক্তা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেন।

মাচানের উপর থেকে আস্তে আস্তে ভোরের প্রথম আলোর আভাস দিতেই নেমে আসে

মিঠি। গাছের গায়ে মুখ ঘষে মুখের রক্ত মুছে ফেলে। তারপর সেই ভুট্টার ক্ষেত মাড়িয়ে, নিমের আর খেজুরের ভিড় পার হয়ে, কে জানে এই অরণ্যের ভিতরে কোন শ্বাপদের গুহার ভিতরে নিরাপদে লুকিয়ে থাকবার জন্য চলে যায়। বুনো হরিণীর মতো এক নারী, তার কোলে খরগোসের মতো একটা ছেলে।

হাসপাতালের একটি ঘরে প্রসাদবাবুর অজ্ঞান ও রক্তাক্ত দেহ। হাসপাতালের ফটকের সম্মুখে, বাজারের দোকানে দোকানে, চাষীদের গাঁয়ে গাঁয়ে আর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সব ডাকবাংলোতে লোকের মুখে ঐ একই কথা--সাবাস প্রসাদবাবু। সেই হিংস্র বাঘিনীর সঙ্গে হাতে হাতে লড়াই করতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছেন প্রসাদবাবু।

জ্ঞান হয়েছে প্রসাদবাবুর। প্রসাদবাবুর গলার ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করবার সময় ডাক্তারের চোখে একটা প্রশ্ন শুধু একবার চমকে ওঠে--এ কেমন ক্ষত? কামড়ের রকমটা যে মানুষের দাঁতের কামড়ের মতো!

কিন্তু হাসপাতালের ফটকের জনতা বলাবলি করে--প্রসাদবাবু মাচা থেকে রাইফেল হাতে নিয়ে বাঘিনীর পিছনে ছুটেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেই তাঁর রাইফেলটা হাত থেকে পড়ে গেল। এবং, সেই মুহূর্তে ধূর্তা বাঘিনীটা প্রসাদবাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পুলিস অফিসার হেসে হেসে আর একটা আশার কথা বলতে থাকেন--আসছে বড়দিনে ভাইসরয়ের শিকার পার্টিতে প্রসাদবাবু নিমন্ত্রণ পাবেন, নিশ্চয়।

মনোবাসিতা

হারিয়ে গিয়েছে প্রতিভা সেনের সেই ছোট্ট হাতব্যাগ, রোজই অফিসে যাবার সময় আর অফিস থেকে ফেরবার সময় যে হাতব্যাগ প্রতিভা সেনের হাতে ঝুলতো, কিংবা কোলের উপর পড়ে থাকতো। রঙীন চামড়ার ছোট্ট হাল্‌কা হাতব্যাগ, তার উপর এমবস্ করা ছোট্ট একটি সাদা তাজমহল। এই তো মাত্র তিন মাস আগে লখনউ-এ বেড়াতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ কুটিরশিল্প প্রদর্শনীর একটা স্টল থেকে ব্যাগটাকে কিনেছিল প্রতিভা।

ছুটির পর অফিস থেকে বের হয়ে ডালহাউসি-বালিগঞ্জ ট্রামে ভিড় ঠেলে ওঠবার পরেও ব্যাগটা হাতেই ছিল। মনে পড়ে প্রতিভার, ট্রামটা মোড় ফিরে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর ভিতর দিয়ে যখন চলতে শুরু করলো, তখনও এই ব্যাগটা প্রতিভার কোলের উপর ছিল।

নতুন আংটিটা আঙুলে বড় বেশি ঢিলে হয়েছে ; তাই আঙুল থেকে প্রায় পড়-পড়ও হয়েছিল একবার। আংটিটাকে আঙুল থেকে খুলে নিয়ে ব্যাগের ভিতর কখন ভরেছিল প্রতিভা, তাও স্পষ্ট করে মনে পড়ে। ট্রামটা তখন ত্রিকোণ পার্ক পার হয়ে ছুটে চলেছে।

তারপর আর কিছু মনে নেই। গড়িয়াহাটার মোড়ে নামবার সময় ব্যাগটা হাতে ছিল বলে মনে পড়ছে না। মনে হয়, ভুল করে ট্রামের সীটের উপরেই ব্যাগটাকে রেখে ট্রাম থেকে নেমে পড়েছে প্রতিভা।

উদ্বিগ্ন হয়ে ট্রাম ডিপোতে একবার ফোনও করেছিল প্রতিভা। কিন্তু জানা গেল, কোন হারানো লেডিজ-ব্যাগ ডিপোতে জমা হয়নি।

তবে তো কোন সন্দেহই নেই যে, কেউ একজন ব্যাগটাকে পেয়েছে আর নিয়ে চলে গিয়েছে। ব্যাগের ভিতরে নতুন আংটিটা আছে। সৎ মানুষের হাতে পড়লে আংটিসুদ্ধ ব্যাগটাকে পাওয়া যাবে। আর, কোন অসতের হাতে পড়লে সবই যাবে। আংটিটা ফেরত আসবে না, ব্যাগটাও না।

আংটিটা ছাড়া ঐ ব্যাগের মধ্যে আর যে-সব বস্তু আছে, এই পৃথিবীর দুটি মানুষ ছাড়া আর কারও কাছে সে-সব বস্তুর কোন দাম নেই। দুটো চিঠি, আর একটা ফটো। প্রতিভার নামে অফিসের ঠিকানায় জয়ন্ত রায়ের যে চিঠিটা কাল এসেছে, সেই চিঠি। জয়ন্তর কাছে প্রতিভার লেখা যে চিঠিটা আজই পোস্ট করবে বলে ভেবে রেখেছিল, সেই চিঠি। আর, প্রতিভা সেনের নিজের একটি হাফ পোস্ট-কার্ড সাইজের ফটো।

কিন্তু সত্যিই ব্যাগটা কোন সৎ লোকের হাতে পড়েছে, এমন সৌভাগ্যও যে আশা করতে পারা যাচ্ছে না। যদি তাই হতো, তবে কি এই তিন দিনের মধ্যেও কোন ভদ্রলোক এসে ব্যাগটা ফেরত দিয়ে যেতেন না? অন্তত চিঠি দিয়ে তো জানাতেন যে, অমুক ঠিকানায় লোক পাঠিয়ে আপনার ব্যাগ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন! যার ব্যাগ, এবং যে অফিসে সে কাজ করে, তার পরিচয় তো ব্যাগের ভিতরের একটি চিঠির ঠিকানা দেখলেই বুঝে ফেলা যায়।

যারই হাতে পড়ুক ব্যাগটা, সে কিন্তু প্রতিভা সেনের জীবনের সবচেয়ে বেশি মায়াময় ও গোপন-করা একটা ঘটনার পরিচয় জেনে ফেলেছে। আশ্চর্য নয়, প্রতিভা সেনেরই পরিচিত কোন মানুষ, কিংবা কোন আত্মীয় মানুষের হাতে ব্যাগটা পড়েছে। কি বিশ্রী লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেল! হাওড়ার শিবপুরে থাকে, এবং অনেক টাকা হাতে নিয়ে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে নেমেছে যে জয়ন্ত রায়, তার সঙ্গে ডালহাউসি স্কোয়ারের মুর এণ্ড মরিসনের হেড অফিসের প্রতিভা সেনের অল্পদিনের চেনাশোনা ও মেলামেশার ইতিহাস ভালবাসার আবেগে মধুর হয়ে উঠেছে, এই ঘটনা যদি কোন পরিচিত বা আত্মীয় মানুষ জানতে পারেন. তবে? বিয়েটা হয়ে যাবার

পর জেনে ফেললে কিছু আসে যায় না, কিন্তু বিয়ের আগে জেনে ফেললে লজ্জারই ব্যাপার হয়ে যায়। যদি বিয়ে শেষ পর্যন্ত না হয়, তবে তো ঘটনাটা প্রতিভার জীবনের একটা বিদ্রূপের, একটা গ্লানির গল্প হয়ে আত্মীয়দের আর পরিচিতদের মুখে মুখে ঘুরবে। শুধু লজ্জা নয়, ভয়ও পায় প্রতিভা।

এই ডোভার লেনে কাকার যে বাড়িতে থাকে প্রতিভা, সে বাড়িতে মুখচোরা মেয়ে বলে প্রতিভার যে একটু দুর্নামগোছের সুনামও আছে। কাকিমা বিয়ের কথা বললেই প্রতিভা শুধু একটা লাজুক হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সত্যি বিয়ে করতে চায় কি না-চায় মেয়েটা, কাকিমা স্পষ্ট করে কিছু বুঝতেও পারেন না। কাউকে বিয়ে করবে বলে মনে মনে কোন অনুরাগের কাণ্ড করে বসে আছে কিনা, তাও বোঝা যায় না। সেই মেয়ে যদি হঠাৎ এভাবে ধরা পড়ে যায়, যদি কোন লোক বাড়িতে এসে কাকিমার হাতেই হারানো ব্যাগটাকে দিয়ে যায়, তবে বাড়ির লোকের বিস্ময় দেখে প্রতিভাকে বিব্রত হতে হবে বৈকি। কেউ কেউ হয়তো বিরক্ত হয়ে একটা মন্তব্য করে বসবেন, ভাল করে না বুঝে-সুঝে হঠাৎ কোথাকার কার সঙ্গে এসব কাণ্ড করে বসলো প্রতিভা?

অফিস কামাই করে তিনদিন ধরে এক অদ্ভুত প্রতীক্ষার আকুলতা নিয়ে বাড়িতেই বসে থাকে প্রতিভা সেন, যদি কেউ ব্যাগটা ফেরত দিতে আসে! কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা। কেউ আসে না। আর বুঝতে কিছু বাকিও থাকে না। কোন চেনা মানুষের হাতে নয়, কোন অপরিচিত সৎ মানুষেরও হাতে নয়, নিতান্ত এক অসৎ লোভী মানুষের হাতে পড়েছে ব্যাগটা ; এবং সেই অসৎ লোকটা এতক্ষণে প্রতিভা সেনের জীবনের প্রথম অনুরাগের অদৃষ্টলিপি, সেই দুই চিঠিকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে আবর্জনার মতো পথের ধুলোর উপর ফেলে দিয়েছে। আর, আংটিটাকে বাজারে বেচে দিয়ে টাকা গুনছে আর হাসছে।

ব্যাগ ফেরত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হয়। ধরা পড়ে যাবার যে ভয় করেছিল প্রতিভা, সে ভয় যখন আর নেই, তখন আর ক্ষতিই বা কিসের? আংটিটা গেল ; একশো দশ টাকার ক্ষতি মাত্র। কিন্তু জয়ন্ত রায় আর প্রতিভা সেনের জীবন যে ভালবাসার বন্ধন চিরকালের মতো স্বীকার করে নেবার জন্য তৈরী হয়েছে, সে ভালবাসা তো ঐ দুটি চিঠি মাত্র নয়। সে ভালবাসা যে প্রতিভা সেনের ভাবনায় নীরব কলরবের মতো বাজছে। সে ভালবাসা যে জয়ন্ত রায়ের জাগা চোখেও স্বপ্ন ধরিয়ে দিয়ে জয়ন্ত রায়কে আশ্চর্য করে দিয়েছে।

সেই কথাই তো ঐ চিঠিতে লিখেছিল জয়ন্ত রায়। আর দেরি করতে চায় না জয়ন্ত। জয়ন্তর ইচ্ছা, এই মাসেই যে-কোন একটি দিনে বিয়ে হয়ে যাক। এই ইচ্ছার কথাটুকু লিখতে গিয়ে জয়ন্তর কলম যেন একটা অভিমানের বিদ্রোহ ঢেলে দিয়েছে।--এখনও যদি তোমার মনে কোন সন্দেহ থেকে থাকে প্রতিভা, আমাকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হতে পারবে না, তবে স্পষ্ট করে সে-কথা জানিয়ে দিও!

কি অদ্ভুত সন্দেহ! উল্টো সন্দেহ। এতদিন যে প্রতিভা সেনের মনেই এই সন্দেহ ছিল ; পৃথিবীতে এত সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ে থাকতে জয়ন্ত রায়ের মতো মানুষ কেন প্রতিভা সেনের মতো মেয়েকে ভালবেসে ফেলে?

এই মুর এণ্ড মরিসনের অফিসেই ম্যানেজারের কেবিনে জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে একদিন প্রতিভা সেনের দেখা। একটা ফাইল নিয়ে ম্যানেজারের কেবিনে প্রতিভাকে সেদিন উপস্থিত হতে হয়েছিল। সেই যে দেখা, সেই দেখার বিস্ময় আর অনুভব আর ক'দিনের আলাপ ও পরিচয়ের পর যেদিন আরও নিবিড় হয়ে প্রতিভা সেনের আর জয়ন্ত রায়ের মুখ রঙীন করে দিল, সেদিনের পর আর কেউ কোনদিন কারও কাছে মনের ইচ্ছা গোপন রাখতে পারেনি।

মুখোমুখি দেখা কমই হয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায়? বরং মুখে যে-কথা বলতে গেলে নিঃশ্বাসটা লজ্জা পেয়ে বিচলিত হয়, সে-কথা চিঠির পাতায় অনায়াসে লিখে দিয়ে

জয়ন্তর ভালবাসার মন সুরভিত করে দিয়েছে প্রতিভা। জয়ন্তর চিঠির কথাগুলিও যেন ভালবাসার আবেদনময় ঝংকার।

এক বছরও হয়নি, কিন্তু আর কি-বা জানবার আছে? নিজের মনের অনুভবের সত্য তো আর অস্বীকার করতে পারা যায় না। তাই জয়ন্তর শেষ চিঠির উত্তরে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে প্রতিভা--বেশ তো, এই মাসের যেদিন তোমার ইচ্ছে, সেদিনেই বিয়ে হয়ে যাক্ ; আমার একটুও আপত্তি নেই।

কিন্তু, কি বিশ্রী ব্যাপার! এই চিঠিটাই হারানো ব্যাগের সঙ্গে হারিয়ে গেল? চিঠির উত্তর যেতে দেরি দেখে জয়ন্ত বোধহয় ভাবছে, প্রতিভা সেন নিশ্চয় জয়ন্তর ভালবাসার দাবি প্রত্যাখ্যান করতে চায়।

আজই অফিসের টিফিনের ছুটির সময় জয়ন্তর চিঠির উত্তর আবার নতুন করে লিখতে হবে। আর একটি দিনও দেরি করা উচিত নয়।

২

টিফিনের সময় হবার আগেই, অফিস ঘরে নিজের টেবিলের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে যখন মস্ত বড় বড় যোগ-বিয়োগ করছে প্রতিভা সেন, তখন ডাকপিয়ন এসে অতি ক্ষুদ্র একটি রেজিস্টার্ড পার্শেল প্রতিভা সেনের টেবিলের উপর রাখে। প্রতিভারই নামে এই পার্শেল এসেছে।

চলে যায় ডাকপিয়ন। এবং পার্শেলটা খুলতেই প্রতিভা সেনের নিবিড় কালো চোখ দুটো যেন একটা ভয়াতুর বিস্ময়ের ছোঁয়ায় চমকে কেঁপে ওঠে। সেই আংটিটা এসেছে। শুধু আংটিটা ; সেই সঙ্গে ছোট এক টুকরো কাগজে লেখা কয়েকটা কথা।--পার্শেলের উপর প্রেরকের নাম-ধাম সবই ভুয়ো জানবেন! আপনার আংটিটা ফেরত দেওয়া উচিত বলেই ফেরত দিলাম।

এই ছোট এক টুকরো কাগজে লেখা চিঠিতে লেখকের কোন ভুয়ো নামও নেই, শুধু একটা শূন্যতা।

কিছু বুঝতে পারে না প্রতিভা। একটা বিশ্রী রহস্য বলে মনে হয় বলেই ভয় পায়। এ কেমন অদ্ভুত ধরনের সৎ লোক? অগোচর রাজ্যের এই হিতাকাঙক্ষী? আংটিটা, যেটার দাম আছে, সেটাই ফেরত দিল, আর যেগুলির কোন দামই নেই, সেই চিঠি দুটো আর ফটোটা, সেগুলি ফেরত দিল না?

একটা নতুন উদ্বেগ ; নতুন অস্বস্তি! মনে হয়, ভয়ানক ধরনের কোন অসতের হাতে পড়েছে ব্যাগটা। প্রতিভা সেনের জীবনের ভালবাসার এই ঘটনাকে নিয়ে একটা জঘন্য কৌতুকের খেলা খেলতে চায় ; নইলে দুটি মানুষের ভালবাসার দুটি চিঠিকে, আর এক নারীর ফটোকে আটক করে হাতের কাছে কেন ধরে রাখলো লোকটা?

বিশ্রী একটা হিংসুক ছায়া চোখের উপর যেন কামড় দেবার জন্য বার বার কাছে ছুটে আসছে। মুখ কালো করে বুকের ভিতরে আর্ত নিঃশ্বাসের দুরু-দুরু শিহরণটা চাপতে চেষ্টা করে প্রতিভা। এবং, এই আতঙ্কের মধ্যেই আবার হঠাৎ শান্ত হয়ে গম্ভীর মুখে ভাবে, অন্তত এইটুকু বোঝা গেল, একশো দশ টাকা দামের একটা আংটির সোনার জন্য লোকটার মনে কোন লোভ নেই। অসৎ লোক না হতেও পারে।

ভাবতে গিয়ে বোধহয় প্রতিভা সেনের মনের যুক্তি-বুদ্ধির ছন্দও এলোমেলো হয়ে যায়। চুপ করে বসে এই রহস্যের ব্যাপারটা কল্পনা করতে চেষ্টা করে প্রতিভা। সত্যিই কোন হিতাকাঙক্ষী নয় তো?

টিফিনের সময় পার হয়ে যায় ; জয়ন্তর চিঠির উত্তরে নতুন করে চিঠি লেখা আর হয়

না। কি আশ্চর্য, এই রহস্যটা এসে প্রতিভা সেনের ভালবাসার জীবনের চরম ইচ্ছার ঘোষণাকে যেন বোবা করে রেখে দিল। কালও প্রতিভার চিঠি না পেয়ে জয়ন্ত রায় একটু বেশি আশ্চর্য হয়ে সন্দেহ করবে, প্রতিভা সেনের ভালবাসার মুখরতা হঠাৎ মুখ বন্ধ করলো কেন?

যাক্ গিয়ে, দু-চারটে দিন দেরি করে চিঠি দিলেও চলবে। শেষ পর্যন্ত সবই জানবে আর বুঝবে জয়ন্ত, কেন শেষ চিঠির উত্তর পেতে একটু দেরি হয়ে গেল।

৩

তিনটে দিন পার হয়ে গিয়েছে ; এবং মনেও আছে প্রতিভার, জয়ন্ত রায়ের চিঠির উত্তর দিতে একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অফিসের ঠিকানায় আবার একটা চিঠি এসে পৌঁছলো ; সেই অগোচর রাজ্যের এক অদ্ভুত হিতাকাঙ্ক্ষীর বেনামী চিঠি। বেশ বড় করে লেখা লেফাফাবন্ধ একটি চিঠি।

চিঠি পড়ে প্রতিভা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা সেনের নিবিড় কালো চোখের তারা থেকে যেন একটা দুঃসহ জ্বালার সাদা ছাই উড়তে থাকে। এই জ্বালা নিজের মনের উপর একটা তপ্ত ধিক্কারের জ্বালা। আর এই ধিক্কার যেন নিজেরই মনের একটা অন্ধতার উপর ধিক্কার। একি ভয়ানক বিদ্রূপের গান গাইছে হিতাকাঙ্ক্ষীর চিঠিটা!

...জয়ন্ত রায়ের কাছে লেখা আপনার চিঠিটা আমি নিজেই ডাকে দিতে গিয়ে শেষপর্যন্ত দিইনি। কেমন যেন মনে হলো! সন্দেহ হলো, আপনি ভুল করছেন না তো? তাই খোঁজ নিলাম, জয়ন্ত রায় কে, এবং কেমন মানুষ?

...খোঁজ নিয়েই বড় ভয় পেয়েছি। তাই বাধ্য হয়ে আপনাকে জানাচ্ছি। জয়ন্ত রায়কে বিয়ে করা আপনার উচিত নয়। জয়ন্ত রায় মোটেই সচ্ছল অবস্থার মানুষ নয়। অনেক টাকা নিয়ে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে নেমেছে জয়ন্ত রায়, একথা নিছক মিথ্যা কথা। জয়ন্ত রায় রেস খেলা ছাড়া আর কোন কাজই করে না।

...জয়ন্ত রায় এর আগে তিন বার বিয়ে করেছে এবং পত্নীত্যাগ করেছে। জয়ন্ত রায়ের নামে অনেক পাওনাদারের মামলা চলছে। শিবপুরে যে বাড়িতে থাকে জয়ন্ত, সে বাড়ি জয়ন্তর বাড়ি নয়। এবং ভদ্রলোকের থাকবার বাড়িও নয়। ওটা জুয়ার আড্ডা।

...আমার কথা যদি অবিশ্বাস করেন, তবে অন্তত একবার হাওড়া পুলিসের কাছে খোঁজ নেবেন। তখন বুঝতে পারবেন যে, আমি একটি কথাও মিথ্যা বলিনি, এবং বাড়িয়েও বলিনি।

বাড়ি ফিরে গিয়ে এই চিঠি হাতে নিয়ে কাকিমার কাছে কেঁদে পড়ে প্রতিভা। এবং পরদিনই হাওড়া পুলিসের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে এসে কাকা বললেন--খুব বেঁচে গিয়েছে প্রতিভা। জয়ন্ত রায় একটা অমানুষ।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে কাকাও একটা বিস্ময়ে বিচলিত হয়ে কাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন।--তবু ভাবতে ভাল লাগছে জয়া, এরকম সৎ নিঃস্বার্থ ও হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষও আছে।

কাকিমা--কার কথা বলছো?

কাকা--এই যে, চিঠি লিখেছেন অথচ নাম দেননি যে ভদ্রলোক!

কাকিমা--আংটিটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কাকা--আশ্চর্য মানুষ। দেখতে ইচ্ছে করে।

দুদিন পরে একলা ঘরে বসে নিজেরই মনের ভাবনার মধ্যে এই সত্য অনুভব করে আর ছটফট করে প্রতিভা। প্রতিভা সেনেরও যে দেখতে ইচ্ছে করে! এমন করে আড়ালে থেকে অকারণে প্রতিভা সেনের জীবনের এত বড় উপকার করে দিল যে, সে মানুষকে চোখে

দেখবার জন্য মনটা মাঝে মাঝে বড় বেশি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আরও আশ্চর্য, এই ব্যাকুলতার জন্য কোন লজ্জা পায় না প্রতিভা।

জয়ন্ত রায় একবার টেলিফোনে কথা বলেছিল। প্রতিভা সেন শুধু একটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করে দিয়েছে।--কোন কথা বলতে চাই না।

অফিসে বসে কাজ করতে করতেই আনমনা হয়ে যায় প্রতিভা। টেলিফোনে কি সেই মানুষটির গলার স্বর কোন দিন শুনতে পাওয়া যাবে না? কাছে এসে দেখা দিতে যদি বাধা থাকে, থাকুক। না আসুক। কিন্তু টেলিফোনে কথা বলতে কি বাধা থাকতে পারে? একবার শুধু বললেই তো হয়, আমি আপনার উপকার করেছি। সেই মুহূর্তে প্রতিভাও তার মনের সব ব্যাকুলতা গলার স্বরে ঢেলে দিয়ে বলে দিতে পারবে, আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু কে জানে, প্রতিভা সেনের কাছ থেকে একটা ধন্যবাদ নেবারও লোভ আছে কিনা ভদ্রলোকের মনে?

কিংবা, হয়তো প্রতিভা সেনের মতো মেয়েকে ঘৃণাই করেন ভদ্রলোক? ভালবাসতে গিয়ে সত্য-মিথ্যার বোধ হারিয়ে ফেলে, ভাল-মন্দ ঠাহর করতে পারে না যে মেয়ে, তাকে ঘৃণা করে আর ভয় না করে পারবেনই বা কেন?

কিন্তু ভদ্রলোকেরও কি আর একটা সত্য জানতে ইচ্ছে করে না? জানতে পারলে যে নিজেই সুখী হবেন, তাঁরই চিঠির পুণ্যে প্রতিভা সেনের জীবন একটা মরণ থেকে বেঁচে গিয়েছে। জয়ন্ত রায়কে বিয়ে করবার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পেয়েছে। ভদ্রলোকের চিঠির অনুরোধ জয়ী হয়েছে। প্রতিভা সেনের অন্ধতা ঘুচে গিয়েছে।

জানতে পেরেছেন নিশ্চয়। যিনি এত খোঁজ নিতে জানেন, তিনি কি আর এটুকু খোঁজ না করে আছেন? কিন্তু কই? এই সামান্য কথাটাও তো লিখলেন না যে, দেখে সুখী হলাম, জয়ন্ত রায় নামে দুর্ভাগ্যটা আপনার জীবনের ক্ষতি করতে পারলো না।

জানতে কি ইচ্ছে হয় না ভদ্রলোকের, প্রতিভা সেন আবার কোন ভুল করলো কিনা? সে মানুষের মনে ইচ্ছে দেখা দেবে না, হতেই পারে না। মনে হয়, আড়াল থেকে খোঁজ নিচ্ছেন। কিন্তু খোঁজ নিতে হলে যে প্রতিভা সেনকে দেখবারও দরকার হয়ে পড়ে ; সত্যিই কি, এই অদ্ভুত ভদ্রলোক আড়াল থেকে প্রতিভাকে দেখছেন?

প্রতিভার মনের একটা সন্দেহ, কিন্তু সন্দেহটা যেন প্রতিভার মুখের উপর আলো ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে থাকে। না, সন্দেহ কেন হবে? বিশ্বাস করতেই যে ইচ্ছে করে, প্রতিভার আসা-যাওয়ার উপর, প্রতিভার মুখের সব ভাবনাময় শিহরগুলির উপর নিয়ত চোখ রেখে আনাগোনা করেন ভদ্রলোক। প্রতিভার জীবনকে ভুলের ভয় থেকে আগলে রাখবার জন্য একটা মায়াময় শাসন, একটা সতর্ক উপকার প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ একটু দূরে দূরে থাকে বোধহয়। হয়তো মাঝে মাঝে খুব কাছাকাছি এসে প্রতিভার চোখের উপর দিয়েই চলে যায়। তার ছায়া এসে প্রতিভার গায়ের উপর পড়ে, তার নিশ্বাসের বাতাস প্রতিভার গায়ে লাগে ; কিন্তু তাকে চিনতে পারে না প্রতিভা। চেনবার উপায় নেই। কিন্তু কোনদিন কি চিনে ফেলতে পারা যাবে না?

যেমন অফিসের শত কাজের ব্যস্ততার মধ্যে, তেমনি বাড়িতে, ঘরের নিভৃতে চুপ করে থাকা অলস অব্যস্ততার মধ্যে, ভাবনাগুলি যেন প্রতিভা সেনের মনের ভিতরে ছটফট করতেই থাকে। দূর ছাই! নিজেরই উপর রাগ করে প্রতিভা। এটাও যে একটা নতুন আপদ হয়ে উঠলো। ভাবতে ভাবতে শেষে হিস্টিরিয়ায় না ধরে বসে!

আবোল-তাবোল চিন্তার গ্রাস থেকে রেহাই পেতে চায় প্রতিভা। কিন্তু বুঝতেই পারে না, কি চেষ্টা আর কেমন চেষ্টা করলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। নিজের উপর আরও রাগ হয়, যখন বুঝতে পারে যে মনটাই ভাবনাগুলিকে ছাড়তে চায় না। হিস্টিরিয়ার আর বাকি কি?

৪

সেদিন কাকিমাও হঠাৎ প্রতিভার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি-যেন ভাবনা করলেন বলে মনে হলো। কাকিমার চোখের রকম দেখে সন্দেহ করে অন্য ঘরে যাবার জন্য প্রতিভা এগিয়ে যেতেই কাকিমা গম্ভীর হয়ে বলেন--মিছিমিছি তোমার এত ভাবনা করা ভাল দেখায় না প্রতিভা। আবার কি যে ভাবছো, কে জানে?

না, ঠিক ভাবনা নয়। গুমরে রয়েছে প্রতিভা সেনের মন। হিতাকাঙক্ষীর তুচ্ছতা যেন প্রতিভার সুন্দর মুখটাকে অপমান করেছে। প্রতিভাব সুন্দর মুখেরও যে যথেষ্ট অহংকার আছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে, আর মিছিমিছি একটা বই হাতের কাছে টেনে নিয়ে, অলস ও উদাস হয়ে বসে থাকে প্রতিভা। সত্যিই তো, একেবারে মিছিমিছি! কাকিমার অভিযোগ একটুও মিথ্যে নয়। সেই হিতাকাঙক্ষীর বোধহয় শুধু আত্মাটাই আছে, অবয়ব নেই। তাকে দেখতে পাওয়া যাবে, তাকে চিনে ফেলবে আর ধরে ফেলবে প্রতিভা, এই আশা নিতান্ত অবাস্তব আশা।

রাগ হয় সেই ভদ্রলোকেরই উপর ; ভদ্রমহোদয় তাঁর উদারতার গর্বে নিজেকে একেবারে অদৃশ্য করে রেখেছেন বলেই না প্রতিভা সেনের ভাবনাকে বৃথা ভাবনা বলে মনে করেন কাকিমা ; আর প্রতিভার আশা প্রতিভার নিজেরই কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়।

অফিসে যাবার সময় হতে এখনো অনেক বাকি আছে ; তবু মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে তোয়ালে হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার মিররের কাছে একবার দাঁড়ায় প্রতিভা।

চমকে ওঠে, তারপর একেবারে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে প্রতিভা! ভিতরের ঘরে কাকার সঙ্গে কথা বলছেন কাকিমা--প্রতিভা যার কথা ভেবে উতলা হচ্ছে, সে দেখা দিতে আসবে বলে মনে হয় না।

কাকা--অ্যাঁ? কার কথা ভাবছে প্রতিভা?

কাকিমা--ঐ সেই তার কথা, যাকে চেনে না প্রতিভা, হারানো আংটিটা পাঠিয়েছে যে।

কাকা--কিন্তু তারও তো একবার এসে দেখা দেওয়া উচিত ছিল। এরকম একটা রহস্য হয়ে থাকবার দরকার ছিল না।

কাকিমা--বোধহয় প্রতিভাকে পছন্দই করে না।

কাকা--কি অদ্ভুত কথা বলছো? যাকে কোনদিন চোখে দেখলোই না, তাকে পছন্দ বা অপছন্দ করবে কেমন করে?

কাকিমা--আমার মনে হয়, প্রতিভাকে একবার না একবার দেখেছে।

কাকা--প্রতিভাকে দেখলে পছন্দ করবে না, এটাও যে বিশ্বাস হয় না। দেখে থাকলে পছন্দ হয়েছে। এবং পছন্দ হয়েও যে আসতে পারছে না, সেটা হলো লজ্জা, নয় তো ভয়।

আবার চমকে ওঠে প্রতিভা। ভয়ের চমক নয়, একটা উল্লাসময় আশার চমক। মিররের দিকে তাকিয়েও আশ্চর্য হয় প্রতিভা। মুখের চেহারা যে সব লজ্জার মাথা খেয়ে এক মুহূর্তেই বদলে গিয়ে হাসছে। যেন প্রতিভার হৃৎপিণ্ডটাই হাসছে। আর মনটাও একটা উতলা খুশির নিঃশ্বাসের সঙ্গে লুটোপুটি করছে। কোন সন্দেহ নেই, হিতাকাঙক্ষী মশাই প্রতিভা সেনের মুখটাকে আড়াল থেকে দেখে মুগ্ধ হন, এবং সরে যান।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আরও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেও প্রতিভা সেনের এই নতুন কল্পনার ছবিটা মনের ভিতর হেসে হেসে মাতামাতি করতে থাকে। অদৃশ্য হিতাকাঙক্ষীরও মনের একটা গোপন কীর্তিকে যেন এতদিনে ধরে ফেলতে পেরেছে প্রতিভা। আর চিনতে বাকি কি? একশো দশ টাকা দামের আংটিটা ফেরত দিতে পারে, কিন্তু ফটোটা ফেরত দিতে পারে না? ইস্, কী নির্লোভ মন!

কিন্তু, সে কি এই লজ্জা আর ভয়ের জন্য চিরকাল নিজেকে প্রতিভার কাছে অচেনা আর অধরা করে রাখবে? প্রতিভা সেনের জীবনটাকে ভাবিয়ে ভাবিয়ে চিরটা কাল শাস্তি দেবে? এই মানুষটার মনেও কি হিস্টিরিয়া আছে? প্রতিভার ফটোটা চিরকাল বুকের কাছে লুকিয়ে রাখবে আর চোখের কাছে তুলে দেখবে অথচ প্রতিভার জীবন্ত চোখের কাছে এসে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলবে না? অদ্ভুত লজ্জা আর অদ্ভুত ভয়।

টেবিলের উপর হাত পেতে, আর সেই হাতের উপর মাথা পেতে দিয়েও চোখ বন্ধ করে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর যখন ঘড়ির দিকে তাকায় প্রতিভা, তখন বুঝতে পারে প্রতিভা, ঘড়িটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কারণ চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে। শাস্তির পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোকের বোকা ভয় আর বোকা লজ্জার জন্যই এই শাস্তি।

কিন্তু...তাকে কি কোনদিন চিনে ফেলতে পারবে না প্রতিভা? কেন পারবে না? আবার মাথা ঝুঁকিয়ে, হাতের উপর মুখ গুঁজে দিয়ে যেন একটা প্রতিজ্ঞার জ্বালায় ছটফট করতে থাকে প্রতিভা। তাকে চিনতে হবেই। না চেনা দিয়ে যাবে কোথায়? প্রতিভা সেনের চোখও চারদিকের সব ছায়া, সব মুখ, সব দৃষ্টি আর সব নিঃশ্বাসের শব্দের উপর পাহারা রাখবে। দেখা যাক্, তাকে চিনতে পারা যায় কিনা?

অফিসে যাবার আগে আজ যেমন সাজে নিজেকে সাজায় প্রতিভা, মনে পড়ে না, তেমন সাজে সুষমার বিয়ের নিমন্ত্রণে যাবার দিনেও নিজেকে সাজিয়েছিল কিনা। মিররের দিকে তাকিয়েও মনে মনে স্বীকার করে প্রতিভা, প্রতিভার এই মুখের ছবিটা এর চেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে কোনদিন ফুটে ওঠেনি। ভাগ্যের লীলাকলার রকম দেখেও মনে মনে একটা দুঃখের হাসিও হেসে ফেলে প্রতিভা। ভাগ্যটা যেন প্রতিভাকে ঘাড়ে ধরে এক অদ্ভুত হয়রানির অভিসারে পৃথিবীর পথের উপর ছেড়ে দিচ্ছে।

ছোট্ট সাদা তাজমহল আঁকা সেই রঙীন চামড়ার ব্যাগ, যে ব্যাগটা প্রতিভা সেনের জীবনে এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়েছে, সেই ব্যাগটি তো আর নেই। প্ল্যাসটিকের নতুন একটি লেডিজ-ব্যাগ কিনেছে প্রতিভা। সেই ব্যাগ হাতে নিয়ে অফিস যাবার সময় রোজই যেমন, আজও তেমনই বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারটার উপর কিছুক্ষণ বসে থাকে প্রতিভা।

হঠাৎ শিউরে ওঠে প্রতিভা সেনের মুখ আর নিবিড়কালো চোখ। একটি মোটর গাড়ি মন্থর চালে চলতে চলতে রাস্তার ওপাশের গাছটার কাছে, এবাড়ির ওপরে ঠিক ওদিকে এসেই থেমে যায়। গাড়ি ড্রাইভ করছেন যে ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোক গাড়ির ভিতরেই চুপ করে বসে তাঁর চশমাপরা দুই চোখ একেবারে অপলক করে প্রতিভার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

চোখের সামনে মিরর নেই, তাই বুঝতে পারে না প্রতিভা, কি নিবিড় কৌতূহলের ভারে অলস হয়ে টলমল করছে প্রতিভার চোখ! মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাতে পারে না, প্রতিভা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকে। অচেনা কোন ভদ্রলোকের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকলে চোখ দুটো যে বেহায়া হয়ে যায়, এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও এই মুহূর্তে প্রতিভা সেনের চেতনা থেকেই যেন ঝরে পড়ে গিয়েছে।

মোটর গাড়িটা আবার মন্থর চালে চলতে চলতে তারপর যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে উধাও হয়ে যায়।

ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে মিররের সামনে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম স্পঞ্জ করে প্রতিভা। ধূর্ত হাসির শিহর চাপতে গিয়ে বার বার ছটফট করে ওঠে। পাউডারের পাফ চটপট দু'বার ঘাড়ে আর গলায় বুলিয়ে নিয়েই বের হয়ে যায়।

৫

সেদিনের পর মাত্র আর দুটি দিন পার হয়েছে, ট্রামের ভিড়ের মধ্যেই দেখতে পায়

প্রতিভা দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক ; আর, দু'চোখ অপলক করে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

যদিও ভদ্রলোকের সাজটা সেদিনের সাজের মতো নয় : সেদিন ভদ্রলোকের গলায় একটা নীল রং-এর টাই ঝুলছিল। আজ আদ্দির পাঞ্জাবি, গলাটা খোলা। কিন্তু মুখটা যাবে কোথায়? সেই সুশ্রী ঝকঝকে মুখ, আর সেই দু'চোখ অপলক করে তাকাবার অভ্যাস?

গড়িয়াহাটার মোড়ে ট্রাম থেকে নামবার সময় যখন সেই ঝকঝকে মুখটিকে দেখবার জন্য খোঁজ করে প্রতিভা সেনের চোখের প্রখর চাহনি, তখন প্রতিভার চোখ দুটোই হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে যায়। কে জানে কখন আর কোথায় নেমে গিয়েছেন ভদ্রলোক।

প্রতিভা সেনের চোখের এই বিষণ্ণতাই আবার, মাত্র দুটি দিন পার হয়ে যেতেই প্রসন্নতা হয়ে যায়। ফুটপাথ ধরে হেঁটে অফিসের প্রবেশ দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই দেখতে পায় প্রতিভা, ফুটপাথের গা ঘেঁষে রাস্তার উপর একটা অচলন্ত গাড়ির ভিতরে নীল রং-এর টাই ফুরফুর করে উড়ছে। সেই অপলক দৃষ্টি। প্রতিভা সেনের সারা মুখ জুড়ে প্রসন্নতার হাসি মিষ্টি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সে হাসিমুখ ঘুরিয়ে লুকিয়ে ফেলে অফিসের ভিতরে ঢুকে পড়ে প্রতিভা।

আরও কতবার ট্রামে দেখা হলো। সিনেমা হাউসের গেটের কাছেও দেখা হলো। লেক রোডে সুষমাদের বাড়িতে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল প্রতিভা। কি আশ্চর্য, সেখানেও : সুষমাদের বাড়ি থেকে বের হতেই দেখতে পায় প্রতিভা, বেশ একটু দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই কুচকুচে কালো গাড়িটা, তার ভিতরে সেই ঝকঝকে মুখ। দূর থেকেই প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ভদ্রলোক ; যেন মুগ্ধ হয়ে দূর স্বপ্নলোকের একটা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রতিভার চোখে একটা মৃদু ভ্রূকুটি যেন দুঃসহ অভিমানের শিহরের মতো কাঁপতে থাকে। প্রতিভা সেনের ফটো লুকিয়ে রাখতে ভয় নেই, লজ্জা নেই, যত ভয় কাছে এসে একটা কথা বলতে? ভদ্রলোকের ইচ্ছা, প্রতিভা আগে কথা বলুক। প্রতিভা আর কত বেহায়া হবে বলে আশা করছে এই অদ্ভুত হিতাকাঙ্ক্ষী? ছিঃ!

কিন্তু এরকম একটা অকারণ লুকোচুরির খেলাও যে অসহ্য হয়ে উঠছে।

তবু এই অসহ্য অবস্থাকেই অসহায়ের মতো আরও অনেকবার সহ্য করে প্রতিভা। সহ্য করতে বাধ্য হয়। ট্রামে আরও কতবার কাছাকাছি দেখা হয়েছে। সেই গাড়ি আরও কতবার ডোভার লেনের এই বাড়ির ছায়া পার হতে গিয়েই মন্থর হয়েছে, থেমেছে, আর চলে গিয়েছে। কথা বলবে বলে প্রতিভা নিজেই চেষ্টা করেছে ; কিন্তু পারেনি।

ঘরের নিভৃতে বসে চুপ করে ভাবতে গিয়ে প্রতিভার চোখের পাতা ভিজে যায় ; কাকিমাও দেখে ফেলেন এবং দুঃখিত স্বরে ধমক দেন--তোমার হলো কি প্রতিভা? মিছিমিছি, ছিঃ।

মুখে বলতে পারা যায় না ; কিন্তু লিখবেই বা কি করে? এই ঝকঝকে মুখের নাম-ধামের কোন পরিচয়ই যে জানে না প্রতিভা!

হেস্তনেস্ত করবার একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছটফট করতে করতে একটা অদ্ভুত চেষ্টার চেহারা প্রতিভার কল্পনায় ফুটে ওঠে। এই নতুন ব্যাগটাকেও একবার ইচ্ছে করে হারিয়ে ফেললে কেমন হয়? ব্যাগ আটক করে রাখবার লোভ আর অভ্যাস আছে যার, সে কি আবার এই হারিয়ে ফেলা ব্যাগটাও আটক করবে না? আর, লোভীর মতো ব্যস্ত হয়ে সেই ব্যাগ খুলে ভালবাসার চিঠি পড়ে ফেলবে না?

কাণ্ডটা হিস্টিরিয়ারই মতো একটা কাণ্ড। কিন্তু শেষপর্যন্ত একদিন এক কাণ্ড করেই ফেললো প্রতিভা।

ট্রামে প্রতিভার সীটের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ভয় আর লজ্জার সেই মানুষ ; সেই ঝকঝকে মুখ, সেই গলাখোলা আদ্দির পাঞ্জাবি!

ব্যাগটাকে সীটের উপরে ফেলে রেখে দিয়ে হঠাৎ ট্রাম থেকে নেমে যায় প্রতিভা সেন।

--আপনার ব্যাগ ফেলে যাচ্ছেন। ঝকঝকে মুখের এতদিনের বোবাপনা হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে।

কিন্তু শুনতেই পায় না প্রতিভা। চলন্ত ট্রামের জানালা দিয়ে ব্যাগটাকে বাইরে তুলে ধরে ডাকতে থাকেন হিতাকাঙক্ষী--আপনার ব্যাগ!

কিন্তু দেখতেই পায় না প্রতিভা।

অনেকক্ষণ পরে, এবং অনেকখানি পথ পায়ে হেঁটে পার হয়ে শ্রান্তভাবে পথের এক পাশে থমকে দাঁড়ায় প্রতিভা। একি কাণ্ড হয়ে গেল! প্রতিভার অভিমানের চিঠি এই হারিয়ে ফেলা ব্যাগের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এতক্ষণে নিশ্চয় পড়ে ফেলেছেন হিতাকাঙক্ষী।--আপনাকে চিনতে পেরেছি। বুঝতেও পেরেছি সব। কিন্তু বুঝতে পারি না, এত ভয়ই বা কেন আপনার আর এত লজ্জাই বা কেন? যদি আমাকে চিরকাল দেখবার ইচ্ছে থাকে, তবে অনায়াসে কাকার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করতে পারেন। তাতেও যদি লজ্জা লাগে, তবে আপনার বাড়ির মানুষকে বলুন। আমাকে আর শাস্তি দেবেন না, এই অনুরোধ।

এই চিঠি পাওয়ার পরেও যদি ঐ ঝকঝকে মুখ ঠাট্টা করে হেসে ওঠে? কিংবা প্রতিভা সেনের এই বেহায়া দুঃসাহসের কায়দা দেখে আরও ভয় পায় এবং অদৃশ্যই হয়ে যায়, তবে? প্রতিভা সেনের জীবন যে ব্যর্থ ভালবাসার একটা পঙ্কিল কবর হয়ে পৃথিবীতে পড়ে থাকবে।

বাড়ি ফিরে এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে একা ঘরের ভিতর বসে আর চোখ মুছে মুছে যেন বুকের ভিতরের একটা ভয় মুছে ফেলতে চেষ্টা করে প্রতিভা।

৬

ডোভার লেনের বাড়িতে ছোটখাট একটা ব্যস্ততার উৎসব। কাকা ব্যস্ত, এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে চেয়ারের উপরে চুপ করে বসে থাকে যে প্রতিভা সেন, তারও বুকের সব নিঃশ্বাস ব্যস্ত।

এরই মধ্যে কাকিমা একবার এসে প্রতিভাকে ধমকে দিয়ে হেসে গিয়েছেন--সৌম্যেন তোমাকে বিয়ে করতে চায় আর তুমিও চাও, এই সোজা কথাটা আমাকে বলতে তোমার কি বাধা ছিল প্রতিভা? এ তো একটা সুখবর, এর চেয়ে ভাল সুখবর হয় না।

ভবানীপুরের নরেশ এটর্নির ছেলে ডাক্তার সৌম্যেন, যে সৌম্যেন ভিয়েনা থেকে ফিরে এসে এখন নিজেই একটা ক্লিনিক করেছে এবং এরই মধ্যে বেশ ভাল পশারও করেছে, সেই সৌম্যেন এখন ডোভার লেনের এই বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে বসে কাকা আর কাকিমার সঙ্গে গল্প করছে। সৌম্যেনের মা-ও এসেছেন। কবে বিয়ে হবে, সেই দিনও স্থির করা হয়ে গিয়েছে।

ভয় ছিল প্রতিভার, একবার ঐ ভীতু আর লাজুক হিতাকাঙক্ষী নিশ্চয় প্রতিভার সঙ্গে একটা না একটা কথা বলতে আসবেই। হয়তো এই ঘরের ভিতরেই এসে দাঁড়াবে। কাকিমাকে যে-রকম খুশি দেখা গেল, তাতে সন্দেহ করতে হয়, কাকিমা নিজেই সৌম্যেনকে এই ঘরের দিকে নিয়ে এসে আর ফেলে রেখে চলে যাবে।

ভয় হয় প্রতিভার, ভীতু লোকের একবার ভয় ভাঙলে বড় বেশি দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। যাকগে, হোক না একটু দুঃসাহসী। তাতেই বা ভয় কিসের?

প্রতিভাকে ডাকতে এলেন কাকিমা।--সৌম্যেন ডাকছে।

--কোথায়?

--বাইরের বারান্দায়। তুমিই সৌম্যেনের চা নিয়ে যাও প্রতিভা।

চা নিয়ে যায় প্রতিভা। আর, প্রতিভার এত দিনের অভিমানও যেন সৌম্যেনের একটি আহ্বানে মুছে যায়। সৌম্যেনই আগে কথা বলে--এস।

সৌম্যেনের মুখের দিকে তাকাতে দিয়ে নিজেরই মুখের হাসির লজ্জায় আর নিবিড়-কালো চোখের ভীরু মুগ্ধতায় বিব্রত হয় প্রতিভা। আস্তে আস্তে বলে--আজ আর বেশিক্ষণ বসতে বলো না, বড় অস্বস্তি হচ্ছে।

সৌম্যেন হাসে--তা হলে এস ; হ্যাঁ, একটি কথা অন্তত শুনে যাও।

প্রতিভা--বলো।

সৌম্যেন--আমি সত্যিই যেন এতদিন পাগল হয়ে গিয়ে মনে মনে তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু বিশ্বাস করতেই পারিনি যে তুমিও...।

প্রতিভা--আমি তো তোমারও আগে, তোমাকে দেখবারও আগে...। আচ্ছা, এবার যাই।

ডোভার লেনের বাড়ির এই ব্যস্ততার উৎসব শেষ হয়ে যেতে আর বেশি দেরি হয়নি।

যাবার আগে সৌম্যেনের মা প্রতিভার হাত ধরে বলে গেলেন--এবার চাকরি ছাড়তে হবে প্রতিভা...।

দুপুর হয়, বই পড়তে বসে প্রতিভা সেনের চোখ ঠিক যখন একটা ঘুম-ঘুম আবেশে মজে আসতে থাকে তখন কাকিমা নিজেই এসে একটা চিঠি প্রতিভার হাতের কাছে রেখে দিয়ে চলে যান। একটা খামের চিঠি। ডাকে এসেছে চিঠিটা।

কার চিঠি? প্রতিভার চোখের ঘুম-ঘুম আবেশ যেন একটা কাঁটার খোঁচা খেয়ে ছিঁড়ে যায়। হাতের লেখাটা যে চেনা মনে হয়।

হিতাকাঙ্ক্ষীর চিঠি।--দেখে খুশি হলাম। নিশ্চিন্ত হয়েছি। এবার আপনি ভুল করেননি। আমি এবারও খোঁজ নিয়েছি। ডাক্তার সৌম্যেন মিত্র অতি সজ্জন, অতি চমৎকার চরিত্রের মানুষ। সৌম্যেন ডাক্তারের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে খুবই ভাল হয়। সৌম্যেন ডাক্তার যদি রাজি থাকেন, তবে আপনিও রাজি হবেন, এই অনুরোধ করি।

চিঠিটাকে আঁকড়ে ধরে, একটা ভয়ানক আর্তনাদ বুকের ভিতরেই চেপে রেখে, একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে প্রতিভা। কি ভয়ানক এই রক্তমাংসহীন অদৃশ্য অশরীরী হিতাকাঙ্ক্ষী! আড়াল থেকে প্রতিভা সেনের অভিসারের পথ-বিপথের উপর চোখ রাখছে, প্রতিভা সেনের নির্ভুল ভালবাসার উপর মঙ্গলবারি বর্ষণ করছে।

প্রতিভা সেন যে মনে মনে এই হিতাকাঙ্ক্ষীরই বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষী যেন প্রতিভাকে আদর করে তুলে নিয়ে সৌম্যেনের বুকের উপর রেখে দিল।

কিন্তু না। আবার পাগল হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। হিতাকাঙ্ক্ষীরই অনুরোধ মাথা পেতে বরণ করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সৌম্যেনও তো মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। আড়াল থেকে দেখে সুখী হোক হিতাকাঙ্ক্ষী।

মাত্র পাঁচটি দিনের অদেখার পালা শেষ হয়ে যাবার পর সৌম্যেনের সঙ্গে প্রতিভার আবার যেদিন দেখা হয়, সেই দিনটি হলো বিয়ের দিন। সময়টা সন্ধ্যা। আবার এই বাড়িতে একটা ব্যস্ততার উৎসব জেগে ওঠে।

হাতে হাত রাখা শুভ পরিণয়ের অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রার চলে যান। তারপরেও ঘরের ভিতরে সৌম্যেনের সঙ্গে নানা আত্মীয়জনের আলাপের কলরব বাড়তে থাকে। আর, প্রতিভা বোধহয় এই সন্ধ্যার নতুন মনটাকে নিয়ে একটু একলা হবার জন্য বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

বারান্দার উপর সেই বেতের চেয়ারে বসে রাস্তার ওপাশের গাছের ছায়াটার দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ে যায় প্রতিভার, ঐ তো, ঐ সেই গাছের ছায়া, যার দিকে তাকাতে গিয়ে সৌম্যেনের ঝকঝকে মুখ প্রথম চোখে পড়েছিল।

একটি লোক গেটের দিক থেকে এগিয়ে এসে বারান্দার উপরে ওঠে। রোগা-রোগা চেহারা, অথচ বেশ সুশ্রী এক ভদ্রলোক। বয়সও বেশি হবে না ; সৌম্যেনের চেয়ে কিছু কমই হবে বলে মনে হয়। ভদ্রলোকের সাজটা বেশ পরিচ্ছন্ন। কাকারই কাছে কোন মামলার কাজে এসেছেন বোধহয়।

চেয়ার থেকে উঠে ঘরের ভিতরে চলে যাবার জন্য প্রতিভা এগিয়ে যেতেই যুবক ভদ্রলোক বলে--আমি আপনারই কাছে এসেছি।

চমকে ওঠে প্রতিভা।--আমার কাছে?

খবরের কাগজ দিয়ে জড়ানো একটা বস্তু প্রতিভার হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক কুণ্ঠিতভাবে হাসে--এই নিন, আপনার ব্যাগ।

প্রতিভার চোখ থরথর করে কেঁপে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে প্রতিভা--আপনি?

--হ্যাঁ। এইবার ব্যাগটা ফেরত দেওয়া উচিত বলে মনে হলো, তাই দিয়ে গেলাম।

প্রতিভার গলার স্বর হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়--এতদিনের মধ্যে কেন ফিরিয়ে দিয়ে যাননি? কি অসুবিধা ছিল? এলেন না কেন? আসলেই তো পারতেন।

--আসা উচিত হতো না।

--কেন?

--আমি সামান্য মুহুরির চাকরি করি।

মাথা হেঁট করে প্রতিভা। প্রতিভার মুখের উপর যেন একটা বোবা কান্নার নির্মম জ্বালা লালচে হয়ে ফুটে উঠেছে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বিড় বিড় করে প্রতিভা--আসেননি, ভালই করেছেন।

ব্যাগটা খোলে প্রতিভা। হ্যাঁ, আছে, সেই ভয়ানক ভুলের চিঠি দুটো আছে। ফরফর করে চিঠি দুটো ছিঁড়ে দিয়ে ব্যাগের ভিতরে আবার কি-যেন খোঁজে প্রতিভা।--ফটোটা কই?

মুহুরি মানুষের চোখ দুটো হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে ওঠে।--ও হ্যাঁ, ভুল হয়েছে, মাপ করবেন। ফটোটা কালই ফেরত পাবেন। ডাকে পাঠিয়ে দেবো।

প্রতিভা--ফেরত দিতে চান আপনি?

--না।

ভেজা চোখ মুছতে মুছতে ছটফট করে বলে ওঠে প্রতিভা--তাহলে ফটোটা আপনারই কাছে থাক।

অদ্ভুত সমন্বয়। যেমন উপাধ্যায়. তেমনি তাঁর জমিদারী আর খামার, বিষ্ণুমন্দিরটাও তেমনি। সবই জরাজীর্ণ।

ষাটের ওপর বয়স হয়েছে উপাধ্যায়ের। গায়ের শিরাগুলি যজ্ঞসূত্রের জালের মতো কাঁধ বুক পিঠ ও পেটের ওপর ছড়িয়ে থাকে। এককালের সুগৌর লম্বা শরীর এখন বেঁকে কুঁজো হয়ে গেছে। একটা চোখে ছানি। গলার চামড়াগুলি গল-কম্বলের মতো ঝোলে। গরদের ধুতি শক্ত গেরো দিয়ে কোমরে বাঁধা, উঠতে-বসতে তাল থাকে না, কাছা কোঁচা খুলে যায়। লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ; দেখে মনে হয়, একটা নেড়া শ্বেতচন্দনের গাছ কাত হয়ে রয়েছে। একটু নড়ে উঠলেই ভুর ভুর করে সুগন্ধ ছড়ায়।

জমিদারী তথৈবচ। ছাব্বিশটা গ্রাম নিয়ে এত বড় কল্যাণঘাট মৌজা। এক-একদিন সূর্য ডোবে আর মুহুরী কালাচাঁদ খবর নিয়ে আসে, অমুক নম্বরের লাট নিলামে বিকিয়ে গেল বকেয়া খাজনার জন্য। তারপর আর একদিন আর এক নম্বরের।

খামারও তাই। মরাইয়ে এক কণা দানা নেই। গোলাঘরের মটকিগুলো চামচিকে আর ইঁদুরের বিষ্ঠায় ভরা। বাঁশের বিরাট বিরাট চাঙ্গারিগুলোতে মরা আরশুলা।

খেতের দশা আর বলা যায় না। এঁটেল মাটি বছরে সাত মাস জল খায় না। লাঙলের ভোর ফেরে না, মই ঢেলা ভাঙে না। পিলেপেটা বাউরী চাষী, হাই তুললে প্রাণবায়ু কাঁপে। জিরজিরে হাতে লাঙলের মুঠি ধরে, মুখ থুবড়ে পড়ে। নিড়েনে বসলে কোমর টাটায়।

বাথানে গোবর নেই। গরুগুলোর হাড় মোটা, পাছা সরু, সোজা শিং, পালান ছোট। খোল খড় জাউ পায় না। ক্ষিদের পেটে ওলের মুখী চিবোয়, শুয়ে শুয়ে ধোঁকে আর জাবর কাটে। বাছুরের গা চাটে না, গুঁতিয়ে মরিয়ে দেয়। বাঁটে দুধ নেই, জোরে টানলে শিরা ফাটে, রক্ত ছোটে!

জরাজীর্ণ শ্রীহীন কল্যাণঘাট মৌজা। মাঝে মাঝে নর তালগাছের বন, ফল হয় না, জটা ধরে। চাষীরা মাঠান ফসলের বীজ ছড়ায়, অর্ধেক বীজ ফলায় না। শিরকাঠি ভেঙে পড়ে। মাটিতে জো নেই, ভাদুই ফলে তো রবি ফলে না, আউশ হলে আমন নয়। ফলের গাছে গাছে ছাতা ধরে, গাছের পুষ্টি শোষে ছাগলনাদির দল।

জলাগুলিতে জল নেই, খোঁড়া মোষেরা কাদা মাখে। বিলভরা শুধু কচ্ছপ, শোল, থুকচেলী রাজকাঁকড়া, ল্যাঠা আর চাপাবেলে। মাছগুলির মাথা বড়, ধড় ছোট, বেঁড়ে বামন চেহারা।

লঙ্কা ক্ষেতে মড়ক লাগে। লাল সূর্যমণিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝরে পড়ে মরা ফড়িংয়ের মতো। শ্রাবণের জলে গাছ ষাঁড়িয়ে যায়, জ্যৈষ্ঠের খরানিতে নেতিয়ে পড়ে--অঙ্কুর চোখ কল পোয়া বোগ, সবই পুড়তে থাকে। কল্যাণঘাটের মাটিতেও ঘুণ ধরে গেছে।

সপ্তাবরণ বিষ্ণুমন্দিরের বিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপ। প্রাচীরগুলো ভেঙেচুরে গড়িয়ে গেছে প্রান্তরের ঢালু ধরে নদীর খাত পর্যন্ত। ভাঙা ইট-পাথরের স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় বেনমতীর জলে রোদ আর কুয়াশার খেলা। সব ভেঙেছে, আছে শুধু বিমান গৃহটি। তবে নামমাত্র থাকা, ফাটল ধরেছে অনেকদিন।

বিমান ঘর ছেড়ে এগিয়ে গেলেই মনে হবে যেন শ্মশানে নামা হল। ভগ্ন বিগলিত ও বিলুণ্ঠিত সব পাথরের মূর্তি। কেউ প্রোথিত পীঠচ্যুত, কেউ ধুলোয় ঢাকা। মাঝে মাঝে সেঁয়াকুল আর কামরাঙার বন। এক বিরাট দেবভূমির যত বিমানপাল, হবিরক্ষক আর কিন্নরমিথুনের জীর্ণ অস্থিমালা, পঞ্জর আর করোটি পিণ্ডীকৃত হয়ে রয়েছে। সে নিত্যাগ্নিকুণ্ড

এখন খুঁজলে এক টুকরো অঙ্গারও আর পাওয়া যায় না। হেমাস্থানে হবিচিহ্ন নেই--আছে বিছুটির ঝাড়। কত শত বৎসর ধরে কল্যাণঘাটের এই শ্মশানপ্রান্তরে পরিবার দেবতারা ঘুমোচ্ছে। এক অমোঘ পরিণামের ঝঞ্ঝাবাত দেবসংসারকে ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেছে। ক্ষয়ে গেছে ক্ষয়ে যাচ্ছে! রাত্রিতে শুধু বিমানঘরে একটি বাতি জ্বলে। প্রথম যাজকের বংশধর বুড়ো উপাধ্যায় জেগে আছেন বিনিদ্র শ্মশানপালের মতো।

কোন্ অভিশাপের রোষে জতুগৃহের মতো ছাই হয়ে গেল এই শিলাময় শিল্পবিভূতি? প্রদক্ষিণ-পথের ওপর শুধু ঠেসে জমে আছে কাদার পিণ্ড। দেবতাদের মাথার নাগছত্র আর দেবীদের প্রভামণ্ডল যুগ যুগ ধরে ভিজে শুকিয়ে ধুলো হয়ে উড়ে যাচ্ছে। রাকা, অনুমতি, জয়া, অম্বা, ক্ষমা, জয়ন্তী আত্মগোপন করেছে বুনো ফুলের ঝোঁপঝাঁপের আড়ালে-- অভিমানিনীর মতো মুখ লুকিয়ে আর এ অবহেলা সইতে পারে না। খঞ্জ, কবন্ধ ও ছিন্নবাহু আয়ুধপুরুষেরা প্রান্তরের কাঁটাবন আর কাঁকরের শয্যায় লুটিয়ে রয়েছে। কামিনী আর ব্যজনীদের সে অভঙ্গ ঠাম এখনও নষ্ট হয়নি, কিন্তু হাতের চামড় ছিঁড়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। প্রধান দ্বারী প্রচণ্ডের মূর্তিটা অনেককাল হলো গড়িয়ে উধাও হয়ে গেছে বেনোমতীর স্রোতে। সঙ্গহারা চণ্ড শুধু একা পড়ে আছে কাত হয়ে, ফাটল ধরে চৌচির হয়ে গেছে তার সমস্ত শরীর।

কোথায় সেই সুউচ্চ শুকনাসা শিখর আর বলয়িত আমলক! শুধু ভগ্নস্তূপ, উচ্ছন্ন এক দেবতার উপনিবেশ। বিচূর্ণিত স্তম্ভ, কলস, হর্মিকা, শৃঙ্গ। ভগ্ন ও স্খলিত শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, পরশু, অঙ্কুশ, বজ্র! এক ঋদ্ধ নাগর দেবায়নের চূর্ণাস্থি, শুধু মাঠ জুড়ে নুড়ির সমারোহ।

বিমানঘরে বাতি জ্বলে। কৃষ্ণশিলায় গড়া উত্তমদশতাল ধ্রুববের মূর্তি। বিদ্রুমখচিত আয়তস্র বেদীর ওপর ভোগশয়ান চতুর্ভুজ বিষ্ণু। ডানহাতে পদ্ম, বামহাতে কটকমুদ্রা। নীলোৎপল হাতে ভূমিদেবী বসে আছেন বাঁ পায়ের কাছে। একটু দূরে আদিশেষ নাগের বিষাক্ত নিশ্বাসে জর্জর মধু ও কৈটভ, হিংস্র ভ্রূকুটিকুটিল চোখের দৃষ্টি। দক্ষিণশীর্ষ জয়দ বিষ্ণু--গলায় বিলম্বিত বৈজয়ন্তী শোভা, বুকে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ। ব্যালোল কেয়ূরে মকরকুণ্ডলে ও করণ্ডমুকুটে শোভিত সৃষ্টিধর। এক বিরাট পাষাণের মহাকাব্য! মন্দিরগাত্রের চিত্রার্ধগুলি এখনও অক্ষত এক একটি ছন্দোবদ্ধ মহিম্ন স্তব যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কিছুক্ষণের জন্য।

আরও মানুষ আছে কল্যাণঘাটে। তারা কে যে কোন্ যুগের লোক বলা দুরূহ। তবু তারা বেঁচে আছে, আর বাঁচতেও চায়।

তারক মিশ্র কন্যাদায়ে পড়েছে। মিশ্রের বউ পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের কাছে দুঃখ করে, নিজেদের মন্দভাগ্যের কথা রটিয়ে বেড়ায়।--গরীবের ঘরে এমন অতি-বাড়ন্ত মেয়ে। দেখতে দেখতে ফেঁপে ফুলে একটা মাগী হয়ে পড়লো। কোন সম্বন্ধই ঘেঁষছে না, কি যে উপায় করি!

বনেদী দু'তিনটি মাত্র পাত্র ছিল। মিশ্র ঘটক লাগিয়ে অনেক সাধ্যসাধনা করেছে, কিন্তু ফল হয়নি কিছু।

আচার্যিদের কালীপদ, কাব্যতীর্থ পেয়েছে, টোল করে। ফর্সা রোগা রক্তশূন্য চেহারা, শূলব্যথায় কাতরায়। মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সে চায় এক, নীবারশূকবৎ তন্বী নীবার ধান্যের শীষের মত তন্বী, তার কবিমন আচ্ছন্ন করে আছে এই রকম একটি মূর্তি। এমন মূর্তি সে কখনও চোখে দেখেনি। তবু আশা ধরে আছে, একদিন হয়তো এ-ধ্যান সফল হবে।

ত্রিবেদীদের ছেলে জগদীশ। কালো বেঁটে চেহারা। জ্যোতিষ পড়েছে, ঠিকুজি লেখে।

কাঞ্চনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এক কথায় ফিরিয়ে দিয়েছে। কালীপদর সঙ্গে তর্ক করে জগদীশ তার পছন্দের নমুনা শোনায়। নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্দ্যুল্লেখের ভাস্বরা--নীলমেঘের মধ্যে বিদ্দ্যুল্লেখার মতো উজ্জ্বল। এই ধরনের কোন মেয়ে পেলে সে বিয়ে করতে পারে। কাঞ্চন নাম মুখে আনতেই সে হেসে ফেলে। বিষ্ণুমন্দিরের কালো পাথরের অতিকায় দ্বারপালাটার পাশেই ওকে মানাবে ভাল।

চক্রবর্তীদের নরহরি। ব্রাহ্মণ হয়েও কবরেজী করে। তবে সেটা তার বৃত্তি নয়, কারণ চিকিৎসার জন্য সে পয়সা নেয় না। শুধু দান নেয় আতপচাল ঘি তাম্রখণ্ড রৌপ্যখণ্ড। কাঞ্চনের চেহারাটা মনে পড়তেই মুখ কুঁচকে ওঠে।--ওকি মেয়েমানুষের চেহারা? মেয়েমানুষ হবে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

সময় পেলেই নরহরি বনবাদাড় ঢুঁড়ে বেড়ায়। মন্তর আউড়ে খুঁজতে থাকে আসল হস্তিকর্ণপলাশের গাছ, যার দুটি পাতা মধুসহ সেবন করলেই শত বৎসর পরমায়ু, মৃগেন্দ্রবিক্রম আর পদ্মরাগকান্তি। তারপর--অন্যাহত যৌবন এক লাস্যাধারা প্রমদা মূর্তি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আশ্চর্য, এরাও কল্যাণঘাটেরই মানুষ। এদের অতীত গেছে, ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমানও অলীক। কৃষ্টিভ্রষ্ট দুর্ভাগারা—না ঘাটের না ঘরের। তবু টিকে আছে। বিদ্‌ঘুটে বিশ্বাস আর কল্পনাকেলিতে বেশ মনের আরামে মজে আছে সব। জীবন সরে গেছে বহু দূরে, তার জন্যে কোন দুঃখ নেই।

সব আশা ছেড়ে দিয়ে উপাধ্যায়ও যেন কালস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে বসেছিলেন। এ ভাঙন আর থামবে না।

চোখে পড়লো, মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন চলেছে কাঁখের ওপর ভরা জলের কলসী চড়িয়ে। জীর্ণ শীর্ণ কল্যাণঘাটের বুকে যৌবনের চলৎ মূর্তি। এই কালো গেঁয়ো মেয়ে, গায়ে জামা নেই, খাটো শাড়িতে শরীর জড়ানো, টান করে খোঁপা বাঁধে। যেন প্রতিমালক্ষণ মিলিয়ে কেটে কুঁদে গড়া হয়েছে এই নিটোল উৎফুল্ল মূর্তি। কৃশমধ্যা সুগ্রীবা বিপুল-শ্রোণী চারুপীনপয়োধরা--হুবহু মিলে যায়। উপাধ্যায় আশ্চর্য হলেন। এই মেয়ের বিয়ের জন্য মিশ্রের এত দুশ্চিন্তা!

সকাল থেকে উপাধ্যায় আজ নিজের মধ্যে অদ্ভুত রকমের এক চঞ্চলতা অনুভব করছেন। উঠে দাঁড়াতে হবে। রক্ষা করতে হবে এই জমিদারী ক্ষেত-খামার-মন্দির। বসে বসে ভাঙন আর দেখলে চলবে না।

হাতের লাঠি ঘরের কোণে রেখে দিলেন উপাধ্যায়। স্নানের পর শুধু চন্দনচর্চা নয়, মালতী কুঁড়ির একটা মালাও গলায় পরলেন, গরদের ধুতি আর উড়ুনি একটু গুছিয়ে সাজ করে প'রে নিয়ে, সোজা টান হয়ে দাঁড়ালেন উপাধ্যায়।

মন্দির মণ্ডপের থাম ধরে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় তার দৃষ্টি মেলে দিলেন মধ্যাহ্নে উজ্জ্বল কল্যাণঘাটের প্রান্তর জনপদ ছাড়িয়ে, বেনমতীর বালুতট পার হয়ে দিগ্বলয় পর্যন্ত। উপাধ্যায়ের উষ্ণ নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ভাবনার প্রবাহ্ উঠছে আর নামছে। সৃষ্টির পথে যেন মূর্তিরা সব ভীড় করে আছে। সুযৌবনা সুরম্যাঙ্গী পীনোর্বী পীনগণ্ডা। উপাধ্যায়ের আরক্ত কর্ণমূলে বিকেলের রোদ এসে লাগলো। ক্রমে সন্ধ্যা, ছায়া নামলো ধ্বংসস্তূপের ওপর। পাখীর কূজন এল থেমে। আকাশে তারা, বেনমতীর জলরোল, ঝাউবনের উচ্ছ্বাস, অক্ষান্ত ঝিল্লীরব—সেই অদ্ভুত শব্দমায়াবৃত জীর্ণ পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় শুনলেন সৃষ্টির গুঞ্জরণ। জরা সরে গেছে, তাঁর মূর্তিময় ধ্যানলোকের এক সুললনা নেমে এসেছে মাটিতে--মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন!

সকালবেলা শয্যাশায়ী উপাধ্যায়ের পিঠে ও কোমরে কবরেজী তেল মালিশ করতে করতে চাকর রামু অনুযোগ করে বললো—এ বয়সে অনিয়ম করলে কি আর সহ্য হয়

কর্তাঠাকুর? কাল কি লাফালাফিটাই করলেন! শরীরের গাঁটে গাঁটে চোট লেগেছে খুব।

উপাধ্যায় আস্তে আস্তে বললেন--আমায় একটু তুলে ধরে বসিয়ে দে তো রামু।

উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে বসলেন উপাধ্যায়। চোখের কোলে চামড়ার ওপর লালচে ঘায়ের মতো দাগ পড়েছে। সমস্ত রাত না কাঁদলে এরকম কখনও হতে পারে না। কিন্তু সহজে হঠবেন না উপাধ্যায়। তাঁর প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়নি একটুকুও।--রামু, কালাচাঁদ মুহুরীকে এখুনি ডাকঘরে যেতে বল একবার। সোমনাথকে জরুরী তার করে দিক্--বাবা অসুস্থ, কাজ আছে, অবিলম্বে চলে এস।

একমাত্র ছেলে সোমনাথ থাকে কলকাতায়। পড়ে আর চাকরির চেষ্টা করে। উপাধ্যায় ভূভারতে একটি মাত্র ঘৃণ্য স্থানের পরিচয় জানেন--কলকাতা। কথায় কথায় বলেন--কলকাতা নয়, ওটা কালসূত্র নরক। জীবনে মাত্র একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন। সাতদিনের বেশী টিকতে পারেননি। ধুলো গোলমাল ভীড়, গাড়িঘোড়া--কোনটাই তার কারণ নয়। সে অন্য ব্যাপার।

কলকাতায় এসে প্রথম দিনেই উপাধ্যায়ের চোখে পড়লো শাড়ি পরিহিতা এক মেমসাহেব। দৃশ্যটা বিভীষিকার মতো উপাধ্যায়ের মনে ও মস্তিস্কে চেপে রইলো তিন দিন ধরে। তবুও সহ্য করে ছিলেন, কিন্তু ক'দিন পরেই আবার দেখলেন গাউন পরে এক বাঙালী মেয়ে। সেদিনই কলকাতা ছেড়ে কল্যাণঘাটে ফিরে চলে গেলেন উপাধ্যায়। আর কখনও এমুখো হননি।

এ হেন কলকাতায় সোমনাথকে লেখাপড়া শিখতে পাঠাবার সময় বুক কেঁপে উঠেছিল উপাধ্যায়ের। কল্যাণঘন বিষ্ণুর অভয়-মুদ্রার আশ্বাস স্মরণ করে সে দুঃসাহসিক কাজটাও করলেন। এতদিন পরে নিজেই আবার ছেলেকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিলেন। সোমনাথ তার পেয়ে চলে এল কল্যাণঘাটে।

—আমার তো হয়ে এল সোমনাথ। এইবার তোকে দাঁড়াতে হবে। এই জমিদারী ক্ষেত খামার মন্দির, এক কথায় তোর ভবিষ্যৎ। আর তো নষ্ট হতে দেওয়া চলে না।

প্রতিবাদ করলো সোমনাথ।—আমার পড়া আর চাকরির ভরসাটুকু নষ্ট করে, কলকাতা থেকে ডেকে আনিয়ে শেষে এইখানে আমার ভবিষ্যৎ দেখলেন আপনি? ঘটি ডোবে না, এই সব তালপুকুর নিয়ে আমার হবে কি?

--পুরুষের মতো কথা বলতে শেখ। উপাধ্যায়ের মেজাজ গরম হয়ে উঠলো।—কলকাতায় গিয়ে আর কিছু না হোক, মেরুদণ্ডটা হারিয়েছে। ঘটি ডোবে না, ওসব ফাজিল কথা মুখে এনো না কখনো।

প্রথম দিনেই বাপছেলের বার্তালাপে একটা মনোমালিন্যের বীজ বোনা হয়ে গেল। দু'জনের মাঝখানে আরও বড় সংশয়ের কুজ্ঝটিকা দু'জনকে আড়াল করে রাখলো। সোমনাথ একটু সতর্ক হয়ে গেল। সেই আশঙ্কাটাই হয়তো সত্য। উপাধ্যায়ও উৎকণ্ঠ হয়ে রইলেন। কলকাতায় গিয়ে সোমনাথের মতিগতি কিছু গোলমাল হয়ে যায়নি তো!

কিন্তু এরকমভাবে বেশীদিন চলে না। সোমনাথ একদিন দু'কান দিয়েই স্পষ্ট শুনলো। উপাধ্যায় বললেন—এইবার তোকে সংসারী হতে হবে। একবার বলবাহুর মতো তুই এই ভাঙা সংসারে দাঁড়া বাবা সোমনাথ। সবই তো রয়েছে, কিছুই যায়নি। শুধু দু'হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, যেন আর ভেঙে না পড়ে।

গলাটা একবার কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে উপাধ্যায় একটু বিশদ করেই বললেন--তারক মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন। দেবীর মতো সর্বসুলক্ষণা মূর্তি, তোর ঠিকুজি মিলিয়ে দেখছি। তারপর সুবিধে মতো একটা দিন স্থির করবো।

সোমনাথ প্রতিবাদ করে না, উত্তর দেয় না। শান্তভাবে সব শুনে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বসে। সোমনাথের নির্লিপ্ততা উপাধ্যায়কে আঘাত দেয় সবচেয়ে বেশী। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে কলকাতার ওপর।--ঐ কলকাতা তোমাদের মাথা খেয়েছে, জাত খেয়েছে। যে দেশে ফিরিঙ্গীতে সংস্কৃত পড়ায় আর ভটচার্যি শেখায় ইংরেজী, সেদেশে থাকলে মতিগতি উল্টে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি। কিন্তু ওসব চলবে না।

সোমনাথ বাপকে শ্রদ্ধা করতে আর পারছে না। উপাধ্যায়ের এই পিতৃত্বের স্পর্ধাটা একটা প্রেতের হুমকির মতো মনে হয়। পাথরের মূর্তিগুলোর মতই নির্বোধ-হৃদয়। ওর স্নেহটাও যেন একটা ব্যাধির আবদার।

রহিল তোমার কোদালী, বনে চলিল বনমালী--সোমনাথের মনে এই রকম একটা বিদ্রোহের ভাব মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু নিজেকে শান্ত করে আনে। উপাধ্যায়ের উপদ্রব সহ্য করে যাওয়াটাই শ্রেয়, বুড়ো হাতির নষ্টামি লোক যেমন সহ্য করে। শুধু বাকি কটা দিন কোন মতে পার করিয়ে দেওয়া--মরে গিয়েও কিছু হাড় দাঁত দিয়ে যাবে, যার দাম নেহাত নগণ্য নয়। সোমনাথের বাইরের সুবাধ্যতার পেছনে এইরকম কোন মনস্তত্ত্ব হয়তো আছে।

চূড়ান্ত আশঙ্কাটা যতদিন সত্যে পরিণত না হয়, ততদিন চুপ থাকাই ভাল। ভূতের ভয় করছে ক্ষতি নেই, শুধু ঘাড় মটকাবার আগে সরে পড়লেই তো হলো।

উপাধ্যায়ের ঘরের বারান্দায় দু'জন সাহেব আর একজন বাঙালী ভদ্রলোক এসে উঠলেন। সোমনাথ এগিয়ে এল। উপাধ্যায় ঘরের ভেতর থেকে সন্দিগ্ধ চোখে উঁকি দিয়ে এক একবার দেখতে লাগলেন।

সোমনাথ এসে জানালো—দু'জন ফরাসী আর একজন বাঙালী অধ্যাপক এসেছেন। মন্দিরের ভগ্নস্তূপ একটু ঘুরে ফিরে দেখবেন।

উপাধ্যায় অপ্রসন্নভাবেই বললেন--তা দেখুক, আমার আপত্তি নেই! তবে জুতো খুলে রাখতে বল। আর ফটো তুলতে পারবে না।

সোমনাথ একটু আপত্তি করলো--এই কাঁটা আর কাঁকর ঠেলে ঘুরতে হবে, জুতো থাকলে দোষ কি?

--না, থাকবে না। উপাধ্যায় চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন।

ফরাসী সাহেব দু'জন স্তূপ দেখতে বেরিয়ে গেলেন সোমনাথের সঙ্গে। বাঙালী ভদ্রলোক একা বসে রইলেন। উপাধ্যায় আর একবার সন্দিগ্ধ চোখে ভদ্রলোককে দেখে নিয়ে লাঠির ঠেলা দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। সোমনাথ আর সাহেবরা ফিরে এলে প্রশ্ন করলেন--ও ভদ্রলোক এখানে ঠায় বসে রইল কেন রে?

—উনি হলেন—! সোমনাথ বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—উনি কি?

--উনি অপৌত্তলিক।

—তার মানে?

—উনি মূর্তি-পূজা করেন না, ওসব পছন্দও করেন না।

—হুঁ। উপাধ্যায় হুঙ্কার চাপতে গিয়ে গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করলেন।

সকালের ট্রেনে এসে বিকেলের ট্রেনে ফিরতে হবে। অতিথিরা নিশ্চয় ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন খুব। সোমনাথ তিন থালা খাবার সাজালো।

উপাধ্যায় একটা থালা লাঠির খোঁচা দিয়ে উল্টে দিলেন। বাকী দুটো থালা সাহেব দু'জনকে পরিবেশন করে নিজে তাদের সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। সোমনাথ রাগে ও

লজ্জায় নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল।

--সর্বস্ব যে লুটে নিল! সোমনাথ ও সোমনাথ!

উপাধ্যায়ের বুকফাটা চিৎকারে সোমনাথ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। কালাচাঁদ মুহুরী খবর এনেছে, পশ্চিমের মাঠে একটা পাটল রঙের দু'ভাগ হয়ে পড়েছিল। আজ দেখা গেল, তার একটা খণ্ড গোবর্ধনের খিড়কির পুকুরে, কাঁচা ঘাটে পাতা রয়েছে। বাউরী মেয়েরা তার ওপর বসে বাসন মাজছে।

--ফৌজদারী করতে হবে সোমনাথ। আমার পাথর নিয়ে গেছে, আমি ওর মাথা নেব। উপাধ্যায় পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলেন।

সোমনাথ মনের বিরক্তি চেপে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।--হুঁঃ, ফৌজদারী করবে গোবর্ধনের সঙ্গে! ঢোঁড়ার তেজ দেখ। গোবর্ধন ইচ্ছে করলে যে তোমার মন্দিরের বিগ্রহটা কিনে নিতে পারে টাকার ওজনে।

উপাধ্যায়ের রাগ পড়লো গিয়ে সোমনাথের ওপর। কিছুক্ষণ কলকাতাকে গালাগালি দিয়ে তবে ক্ষান্ত হলেন।

মাঝে মাঝে পিতাপুত্রের অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা চলে। তখন মনে হয় মালিন্য যেন দূর হয়ে গেছে অনেকখানি। মিলনও অসম্ভব নয়।

উপাধ্যায় বলেন, শুনেছি সরকার থেকে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে, এইসব পুরাকীর্তি রক্ষার জন্য। তুই কিছু জানিস নাকি রে সোমনাথ?

--হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।

--তবে একটু চেষ্টা কর না বাবা। ওরা যদি একটু যত্ন নেয়, সাহায্য করে, তবে মন্দিরটা বাঁচে। মূর্তিগুলোর এ অবহেলা বড় বুকে বাজে, আর সহ্য হয় না! বড় অভিশাপ কুড়োচ্ছি সোমনাথ।

উপাধ্যায়ের গলার স্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায়। সোমনাথের মনের ভেতর যত উদ্ধত অশ্রদ্ধাপুঞ্জ মুহূর্তের জন্য একটা বেদনার স্পর্শে মমতায় অবনত হয়ে আসে।

গভীর বিশ্বাসে ভারি হয়ে আসে বুড়ো উপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর।--দেবভূমি কখনো নিশ্চিহ্ন হতে পারে না সোমনাথ। ইতিহাস তার সাক্ষী। তাক্‌লা মাকানের বালুর ঝড় স্তূপ বিহার চৈত্যগৃহকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। শোনগঙ্গার প্লাবনে ভাসিয়ে নিতে পারেনি বুদ্ধগয়ার মন্দির। যে অক্ষয় শিলাশিল্পে দেবতা আশ্রয় নিয়েছেন, তার বিনাশ নেই।

নিরুত্তর সোমনাথের দিকে তাকিয়ে উপাধ্যায় আবার মেজাজ হারাতে থাকেন। সোমনাথ যদি দু'চার কথায় আপত্তি প্রতিবাদও জানায়, তবে বুড়ো মনে মনে তবু খুশী হন ; হাত দিয়ে যেন একটা অবলম্বন, ভবিষ্যতের একটা স্পর্শ অনুভব করেন। নইলে সবই শূন্য, অসহনীয় হয়ে ওঠে। আর, সেই আশঙ্কাটাই সত্য বলে মনে হয়।

উপাধ্যায় বুঝিয়ে বলেন--কলকাতাকে এতটুকুও বিশ্বাস করিস না সোমনাথ! ওখানে সব ফাঁকি। কী দুর্ভাগ্য মানুষগুলোর। কলের জল খায়!

সবচেয়ে অপরাধ--কলকাতায় নাকি ভারতীয় শিল্পের চর্চা হয়। স্কুল ক'রে ছেলেদের ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়া শেখানো হয়।--আমি সে সব ছবি দেখেছি। মেমের কপালে টিপ এঁকে, কেয়ূর আর কুণ্ডল পরিয়ে দিয়ে যত খৃষ্টান পাদরীদের ঘুষখোর চর শিল্পাচার্য সেজেছে। কী ভয়ানক ব্যভিচার।

সোমনাথ মৃদু প্রতিবাদ জানায়।--আপনি যতটা সন্দেহ করছেন ততটা নয়। ভারতের শিল্পকে তাঁরাও বোঝেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁরাই বরং এতদিন পরে আমাদের লুপ্ত শিল্পকলাকে উদ্ধারের কাজে লেগেছেন।

উপাধ্যায় উত্তেজিত হয়ে ঠক্ ঠক্ করে লাঠি ফেলে দ্রুত পায়ে ঘরের ভেতর গিয়ে নিয়ে আসেন একটা পত্রিকা।--এই দেখ, কলকাতার ভাস্কর গড়েছেন এই রুদ্রমূর্তি। কি বস্তু এটা?

--কেন, রুদ্রই তো। খারাপ কি হয়েছে!

--রুদ্র? একবার চোখ মেলে তাকিয়ে বল। একটা বেহেড মাতাল সাহেব দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চুল উসকো-খুসকো করে দাঁড়িয়ে আছে। এই হলো রুদ্র? তোমার কলকেতে ভাস্করের হাত দুটো কেটে ফেলতাম কাছে পেলে।

অবসন্ন হয়ে উপাধ্যায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসেন। শুধু চিক-চিক করে চোখ দুটো, অসহ অন্তর্দাহের দুটো শিখা। আর একটু শান্ত হয়ে বলেন--মিছেই রাগ করি না সোমনাথ। সেদিন কাগজে পড়লাম, আধুনিক এক বর্মী ভাস্কর ভগবান বুদ্ধের মূর্তি গড়েছে। মূর্তির হাতে হাতঘড়ি আর চোখে চশমা পরিয়ে দিয়েছে। বল তো, কী সব অনাচার চলেছে?

সোমনাথ--না, এসব সত্যিই অন্যায়।

--এসব পাপ, এর প্রায়শ্চিত্ত নেই। আরও শুনলাম, কথাটা সত্য কিনা জানি না। কলকাতায় নাকি এক বিলেতফেরত ভদ্রলোক দেবতার মুখোস পরে অশ্লীল লম্ফ-ঝম্ফ করে আর ভারতীয় নৃত্য নাম দিয়ে টাকা কামায়?

সোমনাথ যেন উপাধ্যায়ের মনের গহনে ক্ষতটাকে দেখতে পায়। তাই অভিমতগুলি বড় রূঢ় হলেও সোজা অস্বীকার করার মতো যুক্তি হাতড়ে পায় না। তবু একটা প্রতিবাদ দাঁড় করায়।--শুধু প্রাচীন ভারত নিয়েই তো চলে না। আধুনিক ভারতের, আধুনিক যুগের রীতি মানিয়ে চলতে হবে তো।

আধুনিক! কথাটা শুনেই উপাধ্যায় আবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। বিকৃত স্বরে বলেন--তোমার কলকেতে-শিল্পীরা ভারতীয়ও নয়, আধুনিকও নয়। ভারতীয় হবার মতো নিষ্ঠা নেই, আধুনিক হবার মতো প্রতিভা নেই। ওরা কিছুই নয়। যেন সাহেবেরা বুঝতে পারে, এই ওদের লক্ষ্য। ছবি মূর্তি নাচ গান--সব। ভারতীয় হলে সাহেবরা বুঝতে পারবে না, এই ওদের ভয়।

নিশির ডাকে নয়, ঘুম এল না তাই। সোমনাথ ঘরের কপাট খুলে বেরিয়ে গেল। রাত্রির শেষ যাম, চাঁদ ডুবছে বেনমতীর উপর। জল আর বালিয়াড়ির গায়ে লেগেছে তামাটে জ্যোৎস্নার আভা। কোন উদ্দেশ্য নেই, সোমনাথ ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো মন্দিরের ভগ্নস্তূপের চারদিকে।

একটা ঢিবি থেকে নিচে নামতেই চোখে পড়লো, কেউ যেন কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু চোখের ধাঁধা মাত্র। বৃষ্টির কাদা-জল লেগে ঢাকা পড়েছে শায়িত মূর্তিটা। হাত দিয়ে ধুলো সরিয়ে দিতেই হেসে উঠলো একটি মুখ। ললিতাসনা এক সৌম্য দক্ষিণামূর্তি--বরদা মুদ্রা। কী স্পষ্ট হাসি, আয়ত চোখে কী গাঢ় উজ্জ্বল দৃষ্টি। সোমনাথের সমস্ত শরীর একবার শিউরে উঠলো। ভয় ভয় করছে। তার সমস্ত ঔদ্ধত্য আর অবজ্ঞাকে যদি মূর্তিটা প্রশ্ন করে বসে! সোমনাথ অন্য পথে সরে পড়লো।

ক্লান্ত হয়ে সোমনাথ ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো একটা অবলুণ্ঠিত ভাঙা তোরণের গায়ে। অদ্ভুত এক অনুভবের মোহ তার বিচারবুদ্ধিকে ঘিরে ধরেছে যেন। সময়ের ব্যবধান ভেঙে যাচ্ছে--এক সমুন্নত বিগত যুগের কোলে এসে পৌঁছে গেছে সোমনাথ। টিপ টিপ করছে পাথরের মূর্তির বুকগুলি। তারা বেঁচে আছে।

পাশে দাঁড়িয়ে কে? এক স্মেরমুখী নগ্না মূর্তি। সোমনাথ আচমকা দু'পা পিছিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। এ কে?

রভসে আকুল এক দিব্যাঙ্গনা অতিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে। গুরু নিতম্বে রত্নসূত্র, কঠিন কুচকলিকা আবেগে কোমল হয়ে রয়েছে। সুপুষ্ট বর্তুল দুটি হাতে তুলে ধরে আছে

পদ্মবীজের মালা, যেন গায়ে ছুঁড়ে মারবে। তার বুকের উত্তাপ লাগছে সোমনাথের গায়ে। চোখে মুখে উষ্ণ নিশ্বাসের তাপ। অজস্র স্বেদবিন্দু কপালে চক চক করে ফুটে উঠলো। সরে গিয়ে তোরণের অপরদিকে হিমে ভেজা একটা কুশের ঝাড়ের ওপর বসে পড়লো সোমনাথ।

এই মূর্তিলোকের রূপ ও হৃদয় সে আজ যেন বুকের কাছে অনুভব করছে। এই বিরাট সুরমন্দিরের প্রাঙ্গণে যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে এক উদ্দাম জয়জয়ন্তী রাগ। মূর্ছাহত হয়ে রয়েছে। এক প্রাচীন বৈভব। এই ন্যাগ্রোধ আর নাগরঙ্গবনে উৎসবের প্রদীপ যদি আর একবার ঝলসে ওঠে, দেখা দেবে শত শত জীবন্ত নরনারীর রূপ। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন, কপালে কাশ্মীরপত্রের লিখা--সুন্দর। ওর কুন্তলস্খলিত একটি ফুল কুড়িয়ে নিতে মন আকুল হয়ে ছুটবে।

কিন্তু এ নিশির ডাকের ঘোর আর কতক্ষণ? চাঁদ ডুবে গেল। দিনের আলোতে মাটি হয়ে দেখা দেবে এই রূপময় অতীত। কাঞ্চন বাতিল হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

উপাধ্যায় উঠে পড়ে লেগেছেন। প্রতিদিনের কাজের একটা ছক বেঁধে নিয়েছেন। সকালে উঠেই কালাচাঁদ মুন্সীকে একবার করে তাড়া দেন। প্রজাবাড়ি পাঠিয়ে দেন খাজনা উসুলের জন্য। দুপুরে বসে সোমনাথকে দিয়ে দরখাস্ত লেখার গভর্নমেন্টের দরবারে। বার শত বছরের পুরাতন কল্যাণঘাটের এই বিষ্ণুমন্দির। হিন্দু সংস্কৃতির এই কীর্তিকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন। এই অনাদৃত দেবভূমিকে আবার ঘষেমেজে লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।

তারপর বিকেলের দিকে আসেন তারক মিশ্র। কাঞ্চন আর সোমনাথের ঠিকুজি সুমুখে মেলে নিয়ে বসেন। বিয়ের কথা, দিনক্ষণের বিচার চলে। সোমনাথ বাইরে বেড়াতে চলে যায়।

মিশ্র চলে যায়। উপাধ্যায় আবার ফাঁপরে পড়েন। একটা শূন্যতা যেন তাঁকে গিলে খাবার জন্য আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন—সোমনাথ, সোমনাথ!

সোমনাথ নেই। উপাধ্যায় আস্তে আস্তে ওঠেন। যে আশঙ্কা তাঁর মনে অনেকদিন থেকেই পুষ্ট হচ্ছিল, সেটা সত্য হয়েছে। উপাধ্যায় কদিন আগে এ সত্য আবিষ্কার করেছেন।

উপাধ্যায় সোমনাথের ঘরে এসে ঢুকলেন। সেই বাক্সের ডালাটা খুলে একটা মোটা ইংরেজী বইয়ের ভেতর থেকে বার করলেন ফটোটা। এক অনাম্নী তরুণীর ছবি।

উপাধ্যায় বিভোর হয়ে দেখেন, মুগ্ধ হন, শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ঘর ভাঙানিয়া এ মূর্তির চোখে অদ্ভুত হাসি। সপ্তাবরণ এই দেবায়তনের কোন দেবিকার চোখে এমন হাসি নেই। চোখে হাসি, মহাকালের এও এক নতুন সৃষ্টি। কি নিষ্ঠুরভাবে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী! হাসিও ঠোঁট থেকে সরে যায়, চোখে আশ্রয় নেয়। উপাধ্যায় নিষ্পলক চোখে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। কর্পূর প্রদীপের আলো নাচতে থাকে বিগ্রহের সম্মুখে। বাইরের মণ্ডপে স্তম্ভে চত্বরে আলোছায়ার চামর দুলতে থাকে। সে আলোড়নে জেগে ওঠে সারি সারি স্থানক আসীন ও শয়ান দেবতার দল। উপাধ্যায় যেন নষ্ট সংবিৎ ফিরে পান। দ্রুত ফিরে এসে বিমান ঘরের একটা স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। অর্চনা শেষে পুরোহিত চলে যান। গন্ধ ধূমে আচ্ছন্ন বাতাস নিশ্বাসে গিয়ে আবেশ সৃষ্টি করে, সমস্ত চিন্তাজাল এলোমেলো হয়ে যায়। উপাধ্যায় ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। ক্ষুদ্রাঙ্ক নাটকের মতো এক একটা দিন উপাধ্যায় এইভাবে পার করে দিচ্ছেন।

এমনিভাবে একদিন তীব্র এক অনুশোচনায় উপাধ্যায় অস্থির হয়ে উঠলেন। নিজেকে ধিক্কার দিলেন নিজেরই দুর্বলতার জন্য। সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি আর কানে পৌঁছয়নি সেদিন

উপাধ্যায় দু' চোখের পিপাসা ঢেলে দেখছিলেন ফটো। এ কেমন মেয়ে--বেণী নেই, ফাঁপানো চুলের ভার কোমর পর্যন্ত নেমেছে। এই লোল রুক্ষ অলক ডাকিনীদের মাথাতেই শোভা পায়। কিন্তু তবু কি সুন্দর! গায়ে জামা, একটা শাড়ি লতার মতো রোগা মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরেছে। হাতে দু'গাছি সরু চুড়ি, কানে হালকা ধরনের মাকড়ির মতো অলঙ্কার। পায়ে মঞ্জীর নেই, চামড়ার জুতো। কচি কচি মুখ, অনেকটা গৌরী কুমারিকারূপা। কিংবা তার চেয়েও ঢলঢল। চোখে সেই হাসি।

আরতির শেষে শঙ্খের ফুকার উপাধ্যায়ের কানে এসে আচমকা বাজলো। কোন মতে বিগ্রহের সম্মুখে একটা প্রণাম সেরে উপাধ্যায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সমস্ত রাত ছটফট করলেন একটা অশুচি জ্বালায়।

উপাধ্যায় ঘরের বারান্দায় মসৃণ মেজের ওপর একটা থামে ঠেস দিয়ে বসলেন। সামনে একটা পঞ্জিকা।

--সোমনাথ!

সোমনাথ এসে সামনে দাঁড়ালো। উপাধ্যায়ের গলার স্বর দৃপ্ত আদেশের মতো।--দিন স্থির ক'রে ফেলেছি, আসছে মঙ্গলবার। শুভ কাজে আর বেশি দেরি করা উচিত নয়। মিশ্রকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছি।

সোমনাথ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সামনে বুড়ো উপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে। দু' চোখের দৃষ্টিতে হিংস্র স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়তে লাগলো।

--ওকি সোমনাথ! অমন করে তাকাচ্ছিস কেন। কি হয়েছে তোর? উপাধ্যায়ের গলার স্বর সন্ত্রাসে থরথর করে উঠলো। সংহার জ্বালায় আকুল ত্রিপুরান্তক শিবমূর্তির চোখে এই দৃষ্টি উপাধ্যায়কে দেখেছেন!

--এই সংসারকে দাঁড় করাতে হবে। লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভাঙতে দিলে চলবে না। এই পবিত্র কর্তব্যের দায় তুই ছাড়া আর নেবার কে আছে?

লাঠিতে ভর দিয়ে উপাধ্যায় উঠলেন। বোধহয় সোমনাথের হাত দুটো সানুরোধে ধরতে যাচ্ছিলেন। একটা গরুর গাড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে এসে থামলো সামনের পথে। ফাইল বগলে এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল।

আরও অনেক জিনিস নামলো। দশ বস্তা সিমেন্ট, আলকাতরা পাঁচ টিন, লোহার ছড় দু' বোঝা, দু'বস্তা জমাট পিচের টুকরো। খুরপি হাতে এক ছোকরা ওস্তাগরও নেমে এল।

সোমনাথ নিজের ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলো। হতভম্ব উপাধ্যায় আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন—একি ব্যাপার?

কালাচাঁদ মুহুরী বুঝিয়ে দিল।—সরকারের লোক, ভাঙা মন্দির মূর্তি সব মেরামত করে দিতে এসেছেন। আপনি যে দরখাস্ত করেছিলেন, তা গ্রাহ্য হয়েছে।

--সোমনাথ! সোমনাথ! ছোট ছেলের মতো ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলেন উপাধ্যায়। ছানি-পড়া চোখ ফেটে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়লো।

—সোমনাথ, কি সব এসেছে দেখ। কি চায় এরা?

একটা পচা পাঁক আর পুরীষের গাদা যেন সামনে রাখা হয়েছে, দেবতাদের গায়ে ছুঁড়ে মারবার জন্য। সপ্তাবরণ দেবনিকেতনের সংস্কার করবে এরা? এই সব মালমশলা? স্থবির উপাধ্যায়ের কাতর চিৎকার আবার বেজে উঠলো--সোমনাথ, শীগ্‌গির আয়!

সোমনাথ এল কিন্তু সামনে এসে আর থামলো না। হাতে একটা সুটকেশ। বারান্দা থেকে নেমে পড়লো পথে। তারপর আর দেখা গেল না।

আগন্তুক ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। সবাই চুপচাপ। কল্যাণঘাটের এক বিকলাঙ্গ বিগ্রহের মতো থামের গায়ে কাত হয়ে বসে রইলেন উপাধ্যায়।

নির্বোধের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন স্টেশনের পথের দিকে।

মুহুরী কালাচাঁদ ধিক্কার দিয়ে উঠলো।--ছি ছি, যাবার সময় বাপকে একটা প্রণাম করে গেল না।

উপাধ্যায় আর গলা খুলে বলতে পারলেন না।--না, ও প্রণাম করতে পারে না।

কল্যাণঘাট যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে। শ্বেত কৃষ্ণ ধূম্র পাটল বহ্নিবর্ণসন্নিভ কঠিন প্রস্তরের শত শত মূর্তি কীর্তি ও বিগ্রহ গলে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্তর্ধ্যানের স্রোতে। মজ্জমান উপাধ্যায় যেন শেষ দৃষ্টি মেলে দেখছেন--তীর সরে গেছে বহুদূরে। শুধু দিক্‌প্রান্তে জেগে রয়েছে অনাম্নী সুতনুকা এক মূর্তির ছলনা। চোখে অদ্ভুত হাসি।

কতটুকু ক্ষতি

আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেন হন্তদন্ত হয়ে স্বাক্ষর পত্রিকার অফিসে ঢুকলো। শ্রীমন্তের মুখের দিকে তাকিয়েই সম্পাদক অক্ষয়বাবু বুঝলেন--পর্বতো বহ্নিমান্। এই রুচিবান শিল্পীর নিষ্ঠার পর্বতে কোন্ বহ্নির স্পর্শ দাবানল সৃষ্টি করেছে, অভিজ্ঞ সম্পাদক অক্ষয়বাবুর কাছে সে রহস্য অজানা ছিল না। আর্টিস্ট শ্রীমন্তকে তিনি আজ চার বছর ধরে এই মূর্তিতেই দেখে আসছেন। মিষ্টি কথার বর্ষা নামিয়ে এই উত্তপ্ত মূর্তিকে কিভাবে ঠাণ্ডা করে দিতে পারা যায়, সেই কৌশল তাঁর কাছে চার বছরের নিয়মিত চর্চায় এখন নিছক একটা অবলীলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট যতই রাগে গর্জন করুক, ভয় দেখাক অনুরোধ করুক--সম্পাদক অক্ষয়বাবু বিচলিত হন না কিছুতেই। কিন্তু আর্টিস্ট শ্রীমন্ত এত বিচলিত হন কেন? কেন আজ চার বছর ধরে একটা বিক্ষোভের ঝড়ে তার মনের শান্তি বিপর্যস্ত হয়ে আছে?

শ্রীমন্ত আর্টিস্টের বিদ্রোহী মূর্তিটা একটা চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়েই সম্পাদক অক্ষয়বাবুকে যেন চ্যালেঞ্জ করলো।--আবার আপনি ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্তের তোলা একটা লক্কড় ফটো ছেপেছেন! বিজয় ফটোগ্রাফারের এলবামটাকে যদি আপনি একটি রত্নদীপ মনে করে থাকেন. তবে তাই করুন ; কিন্তু আমাদের বাদ দিন। প্রতি মাসে ঐ এলবাম থেকে এক একটি ঘুঁটে পোড়ানো রত্ন দিয়ে আপনার স্বাক্ষরকে সাজিয়ে বার করুন। আর্টিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিন। ব্যস্--স্বাক্ষরকে যদি রাখতে হয়, তবে এক নৌকায় পা দিতে শিখুন। তেলে জলে মেশাবার চেষ্টা করবেন না। হয় আর্টিস্ট নয় ফটোগ্রাফার--এর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। বলুন।

উত্তরে সম্পাদক অক্ষয়বাবু মৃদু হেসে যথাসৌজন্যে শুধু সিগারেটের ডিবেটা শ্রীমন্তের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন।--আসুন।

একটা সিগারেট অবশ্য তুলে নিল শ্রীমন্ত, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে প্রসঙ্গ থেকে সহজে রেহাই দিল না।--না অক্ষয়বাবু, আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই আপনার উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য? অক্ষয়বাবু তাঁর সম্পাদকীয় জীবনে এই প্রথম একটা অদ্ভুত কথা শুনলেন। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট যেন একটা প্রচণ্ড ছেলেমানুষী আরম্ভ করেছে। উদ্দেশ্য? সম্পাদকের উদ্দেশ্য? পত্রিকার উদ্দেশ্য? আজ চার বছর ধরে স্বাক্ষরের মতো বাংলা পত্রিকার অন্তর্লোকে আনাগোনা করেও যে-মানুষ এখনো পত্রিকার উদ্দেশ্য জানবার কৌতূহল রাখে, তার জন্য কার না দুঃখ হয়? সত্যি, শ্রীমন্তের জন্য বড় দুঃখে হাসছিলেন অক্ষয়বাবু।

শ্রীমন্ত বললো--সমাজ সাহিত্য ও শিল্প প্রচারের পবিত্র দায়িত্ব নিয়েছেন, অথচ একটা নীতি, একটা লক্ষ্য, একটা রুচি...।

একটা সমবেদনার উচ্ছ্বাসেই বাধা দিয়ে অক্ষয়বাবু বললেন--আছে আছে, সব আছে শ্রীমন্তবাবু।

শ্রীমন্ত--ফটোর নীচে আবার লিখে দিয়েছেন--ফটোশিল্পী বিজয় গুপ্ত। ছি ছি, কী ভাল্‌গারিজম মশাই। ফটোগ্রাফার হলো শিল্পী। আরশুলা হলো পক্ষী? কুত্তার নাম বাঘা? কানার নাম পদ্মলোচন। মোষের নাম মহাশয়?

অক্ষয়বাবু--চা খাবেন? তার সঙ্গে টোস্ট? মরিচ দিয়ে? কেমন?

বহ্নিমান শ্রীমন্ত একটু স্তিমিত হয়ে এল। অনুযোগের সুরে বললো--না, এসব বড় অন্যায় করছেন অক্ষয়বাবু। না দেখছেন পত্রিকার প্রেস্টিজ, না দেখছেন আমাদের মানসম্মান। কী পদার্থ আছে ঐ ফটোতে? বিজয় গুপ্তের তোলা ফটো, তার নাম আবার--'ফাগুন লেগেছে বনে বনে।' হাসালেন অক্ষয়বাবু!

অক্ষয়বাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন--অবশ্য আপনাকে জানাতে বাধা নেই, ঐ ফটোটার খুব demand হয়েছে। নিউ-ইয়র্কের একটা পত্রিকার প্রতিনিধি আজই এসে ফটোগ্রাফারের ঠিকানা নিয়ে গেছে--ওবাও ফটোটা ছাপাতে চায়।

শ্রীমন্ত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে উল্লসিত হয়ে উঠলো--এই তো! এইখানেই চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেল। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের দেশের যা-কিছু বিদঘুটে, বিদেশীদের কাছে তারই আদর বেশি। আজগুবি না হলে ওরা পছন্দই করবে না। নইলে ধরুন, 'বন্যমার্জারির প্রেমাবেশ' নামে মিস্ তরুলতা মজুমদারের এমন উঁচুদরের নৃত্যটা বিদেশীদের কাছে কোন আদরই পেল না। অথচ; জংলী সাঁওতালী নাচ দেখে ওরা মগ্ন হয়ে যায়। বিদেশী রুচির কথা আর বলবেন না। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। ওরাই বিজয় গুপ্তকে চিনেছে।

অক্ষয়বাবু কিছু একটা বলবার জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছিলেন। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট আবার প্রশ্ন করলো--একটা ফটোর জন্য কত দক্ষিণা দেন বিজয় গুপ্তকে?

অক্ষয়বাবু--সাড়ে চার টাকা।

শ্রীমন্ত বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকালো।--সাড়ে চার টাকা! লোকে তিন আনা পয়সা খরচ করে ষোল নম্বর বাসে চড়ে গড়িয়া পৌঁছে একটা খালের ধারে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকালেই স্পষ্ট দেখতে পাবে--ফাগুন লেগেছে বনে বনে। তার জন্য সাড়ে চার টাকা? অপব্যয়।

ফটোর মূল্য সাড়ে চার টাকা শুনে মনে মনে একটু খুশি হয়ে উঠছিল শ্রীমন্ত। অক্ষয়বাবু কিন্তু মনে মনে ঠিকই জানছিলেন এবং দুঃখ করছিলেন--বিজয় গুপ্তকে গুণে গুণে দশটি টাকা দিতে হয়। কিন্তু সম্পাদকীয় স্ট্র্যাটেজি নামে একটি মনস্তাত্ত্বিক কৌশল আছে। দক্ষিণার ব্যাপারে তিনি দ্বন্দ্বী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের আগ্রহের ওপর প্যাঁচ দিয়ে একটি তত্ত্বকে সফল করে তুলতে জানেন অর্থাৎ অল্পে সুখমস্তি।

সুতরাং অক্ষয়বাবু আবার আরম্ভ করলেন--আপনার আঁকা ছবিটার মর্ম কিন্তু কেউ বুঝতে পারলো না শ্রীমন্তবাবু। অবশ্য পিওর আর্ট বোঝবার মতো লোক এই পোড়া বাংলা দেশে...।

শ্রীমন্ত বাধা দিল--কী বলছেন অক্ষয়বাবু? পৃথিবীতে যাঁকে একমাত্র সত্যিকারের আর্ট-সমালোচক বলে জানি, সেই অধ্যাপক ত্রিদিব ভট্চাজ এই ছবি সম্বন্ধে কী লিখেছেন জানেন? তিনি লিখেছেন--'এই ছবির মধ্যে যে অব্যয়ীভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সর্বদেশের ও সর্বযুগের রস। সৃষ্টি একদিন মুছিয়া যাইবে, কিন্তু শিল্পী শ্রীমন্ত সেনের আঁকা এই অত্যাশ্চর্য ছবিটির আত্মার কখনো বিনাশ হইবে না।'

উৎসাহিত হয়ে অক্ষয়বাবু বললেন--ঠিক কথা। খাঁটি কথা। এতক্ষণে জিনিসটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আগে এতটা বুঝতে পারিনি। ছবির নাম দিয়েছেন--'স্বর্গীয় মদের ফেনা', অথচ আকাশে একটা ভাঁড়ের মতো জিনিস উপুড় হয়ে রয়েছে।

শ্রীমন্ত--হ্যাঁ, ওটা হলো চাঁদ।

অক্ষয়বাবু--আর ভাঁড়ের মুখ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা উথলে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে কেন?

শ্রীমন্ত--হ্যাঁ, ওটা হলো জ্যোৎস্না।

অক্ষয়বাবু--আশ্চর্য, আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি শ্রীমন্তবাবু। কী যে বলবো, শুধু বলতে ইচ্ছে করছে--আশ্চর্য। হ্যাঁ, আপনার প্রাপ্য দক্ষিণাটা নিয়ে যান। এই নিন--আট টাকা দিলাম আপনাকে।

শ্রীমন্ত অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ প্রতিবাদ করার মতো কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না।--আট টাকা? বেশ তাই দিন। একটু ইতস্তত করে টাকা কয়টা পকেটে পুরে সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে বের হয়ে এল শ্রীমন্ত।

ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন অক্ষয়বাবু। ঘরে ঢুকলো ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্ত। দ্বিতীয় কিস্তি একটা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন অক্ষয়বাবু।

বিজয় গুপ্ত বললো--আবার আপনি জলছবি ছাপতে আরম্ভ করেছেন! স্বাক্ষরের সুনাম আর রইল না। আপনার পত্রিকা উঠে যাবে, অবধারিত।

অক্ষয়বাবু বিস্ময়ের ভান করে প্রশ্ন করলেন--জলছবি?

বিজয় গুপ্ত--হ্যাঁ স্যার, শ্রীমন্ত আর্টিস্টের আঁকা ছবি। কী হয়েছে ওটা? স্বাক্ষরের মতো কাগজে যদি ঐসব রঙীন রাবিশ ছাপান, তবে আমাদের বাদ দিন। আর্টিস্টদেরই মাথার মণি করে রাখুন আপনি।

অক্ষয়বাবু লজ্জায় জিভ কাটলেন।--ছিঃ, ওরকম করে বলবেন না বিজয়বাবু। বিদেশের গুণী আর রসিকেরা শ্রীমন্ত সেনের ছবির কদর জানে। আজই নিউ ইয়র্কের একটা পত্রিকার প্রতিনিধি এসে 'স্বর্গীয় মদের ফেনা' ছাপবার জন্য তিনশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে শ্রীমন্ত সেনের অনুমতি নিয়ে গেছে। অথচ আমরা ঐ ছবির কতটুকু মূল্য দিতে পেরেছি, পাঁচটি টাকা মাত্র। এই তো?

বিজয় গুপ্তের উত্তেজনা হঠাৎ কেমন মিইয়ে এল। নেহাত অজ্ঞাতসারেই একটা সমবেদনার আভাস যেন তার কথার মধ্যে ফুটে উঠলো--মাত্র পাঁচ টাকা, সে কী অক্ষয়বাবু?

অক্ষয়বাবু--হ্যাঁ বিজয়বাবু, এমন একজন আর্টিস্টের আঁকা ছবির মূল্য পাঁচ টাকার বেশি দেবার সামর্থ্য নেই আমাদের। আর ধরুন, সত্যি কথা বলতে গেলে, আপনারা অর্থাৎ ফটোগ্রাফারেরা যা করেন, তার মধ্যে আর্ট বলে জিনিসের বালাই নেই। ভাল ক্যামেরা, ভাল ফটো--ব্যস্, আপনাদের কাজ হলো যন্ত্রের কাজ। তবু আপনার দক্ষিণা...।

বিজয় গুপ্তের সারা মুখে একটা রক্তাভ উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সে সব সহ্য করতে পারে কিন্তু ফটোগ্রাফীর নিন্দা বরদাস্ত করা তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। বিজয় গুপ্তকে তাঁর ফটোগ্রাফার গুরু শিখিয়ে দিয়েছেন--ফটোগ্রাফী যন্ত্রের খেলা নয়, ফটোশিল্পীরাও শিল্পী, বরং তারাই নতুন যুগের শিল্পী। গুরুদত্ত সেই বাণীকে সম্পাদক অক্ষয়বাবু নিন্দে করে ভয়ানক ভুল করছেন। ফটোগ্রাফীর নিন্দা--এখানে কারও কাছে হার মেনে কোন আপস করতে রাজী নয় বিজয় গুপ্ত। নেহাত সহ্য করতে না পেরেই বিজয় গুপ্ত বললো--কথাগুলি সংযত করুন অক্ষয়বাবু।

অক্ষয়বাবু--বেশ বেশ, মাপ করবেন। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম আর্টিস্ট যেমন কল্পনাকে রূপ দিতে পারে...

বিজয় গুপ্ত--ফটোশিল্পী বাস্তবের রূপ ধরে দিতে পারে।

অক্ষয়বাবু--আর্টিস্টের তুলিতে যেন একটা অতীন্দ্রিয় রোমান্স আছে।

বিজয় গুপ্ত--ক্যামেরার সেলুলয়েডের চোখে সত্যের রোমান্স আছে।

অক্ষয়বাবু--আর্টিস্টরা

বিজয় গুপ্ত বাধা দিয়ে বললো--আর্টিস্টরা বস্তুর ওপর মিথ্যার রূপ দেয়। ওটা রঙের ছলনা।

অক্ষয়বাবু--তাহলে ফটোগ্রাফারেরা...।

বিজয় গুপ্ত--ফটোগ্রাফারেরা মিথ্যার আবরণ সরিয়ে দিয়ে বস্তুর রূপ খুলে দেয়।

অক্ষয়বাবু আবেগভরে বলে উঠলেন--আশ্চর্য, আপনি আমাকে আশ্চর্য করে দিলেন বিজয়বাবু। এভাবে আমি কোনদিন ভেবে দেখিনি। আপনার কথায় বুঝলাম সত্যিই আপনারা --কী বলবো: আপনারা হলেন--আর্টিস্টরূপী শশক-জম্বুক সঙ্কুলিত মানব অরণ্যের শিল্পীকেশরী।

বিজয় গুপ্ত শান্ত হয়ে বললো--আজকের মতো উঠি।

সিগারেটের ডিবেটা এগিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে সম্পাদক অক্ষয়বাবু বললেন--আসুন। সেই প্রতিযোগিতার কথা স্মরণে রেখেছেন তো? উঠে পড়ে লাগুন এইবার, আর যে সময় নেই।

চলে আসবার আগে বিজয় গুপ্ত উৎসাহিত ভাবেই উত্তর দিল--নিশ্চয় মনে আছে। আসি, নমস্কার।

কোনো একটি দেশকল্যাণ সমিতি থেকে একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে আর্টিস্ট এবং ফটোগ্রাফারদের কাছ থেকে।--'অনশন ও বুভুক্ষার ফলে মানবতার চরম ক্ষতি কি হইতে পারে, এই বিষয়ে যে শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র অথবা তোলা ফটো সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে, সেই শিল্পীকে মাতৃমঙ্গল সমিতি পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবেন।'

স্বাক্ষর পত্রিকার তরফে সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী অক্ষয়বাবু অতিরিক্ত আরও একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। প্রতিযোগী শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং তোলা ফোটো--সবই আগামী সংখ্যা স্বাক্ষরের কলেবর অলংকৃত করে প্রকাশিত হবে।

আর্টিস্ট বনাম ফটোগ্রাফার--প্রতিযোগিতাই শেষাশেষি একটা শ্রেণীদ্বন্দ্বের মতো হয়ে দাঁড়ালো। বহু আর্টিস্ট যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সবচেয়ে বড় ভরসা শ্রীমন্ত সেন। শ্রীমন্তের হাতের তুলি দুর্বল নয়, তার কল্পনা অনুজ্জ্বল নয়। তার রঙে কত ব্যঞ্জনা, রেখায় কত দ্যোতনা ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীমন্ত আর্টিস্ট চুপ করে বসে নেই। তার সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাকে সংহত করে স্টুডিওর নিরালায় বসে এক রকম ধ্যানস্থ হয়ে আছে শ্রীমন্ত। রাত জাগতে হচ্ছে--স্নানাহার করতে ভুলে যাচ্ছে। আর্টিস্ট সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব শ্রীমন্ত সেনের ওপর পড়েছে।

ফটোগ্রাফারেরাও কম উতলা হয়নি। ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গেছে তারা। নিজের নিজের জয়-পরাজয়ের কথা তারা ভাবে না। তারা শুধু কায়মনে প্রার্থনা করে ফটোগ্রাফার সম্প্রদায়ের জয় হোক। অর্থাৎ বিজয় গুপ্তের জয় হোক। বিজয় গুপ্তকে তারা শতভাবে প্রেরণা দিয়ে বলেছে--আমাদের মান সম্মান আপনার হাতে বিজয়বাবু। জলছবিওয়ালাদের কাছে যদি হেরে যাই, তবে এ জীবনে ক্যামেরা আর স্পর্শ করবো না।

বিজয়কে তারা রোজই দেখছে। সকাল হতেই কাঁধেই ক্যামেরা ঝুলিয়ে পথে বের হয়ে পড়ে বিজয় গুপ্ত। কোন ত্রুটি করছে না সে। খোলা আকাশ, প্রভাতের সূর্যালোক, সন্ধ্যার রক্তিম মেঘ, কলকাতার উত্তপ্ত পথের রৌদ্রজ্বালা--এই তার স্টুডিও। ফুটপাতে, গাছতলায়, বস্তির অন্তরে--পথে প্রান্তরে মানবতার সেই চরম ক্ষতির দুর্লক্ষ্য চিহ্ন আবিষ্কার যাত্রায় বের হয়েছে বিজয় গুপ্ত। ক্ষান্তি নেই, বিশ্রাম নেই।

স্বাক্ষর পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। একটা তীব্র ঔৎসুক্যের স্পন্দন শত শত গ্রাহক পাঠক ও উৎসাহীর মনের অনুভব ছেয়ে রেখেছে ঠিক এই মুহূর্তটিকে। সদ্য প্রকাশিত স্বাক্ষরের পাতা উল্টিয়ে দেখছেন সমালোচকেরা। গ্রাহকেরা দেখছেন সাগ্রহে। মেসে বোর্ডিংয়ের ছাত্র হোটেলে লাইব্রেরীতে কৌতূহলী পাঠকের মাথার ভীড় স্বাক্ষর পত্রিকার ওপর ঠোকাঠুকি করছে। পরীক্ষকেরা প্রতিযোগী শিল্পীদের নামের তালিকা হাতে নিয়ে নম্বর দিচ্ছেন একে একে--ঠিক এই মুহূর্তটিতে।

প্রথম পৃষ্ঠা খুলতেই দর্শকের চোখের ওপর একটা বিচিত্র বর্ণরাগের আলিঙ্গন ঝক্‌ঝক করে ওঠে। আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেনের আঁকা ছবি। দর্শকদের মনের গহন থেকে আপনা-আপনি একটা করুণতম আক্ষেপধ্বনি উৎসারিত হয়--আহা! যাঁরা একটু আবেগপ্রবণ তাঁদের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কী করুণ এই ছবি!

--পথের পাশে একটি গাছের ছায়ায় এক ক্ষুধাজীর্ণ ভিখারিণী বসে আছে। তার কোলে

একটি মুমূর্ষু শিশু। শিশুটির অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। অস্থিসার ভিখারিণী মাতার বুকে শিশুপ্রাণের পানীয় সেই জীবতুষ্টির ধারা শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুমূর্ষু শিশুর তৃষ্ণার্ত অধর শুধু শেষ বিদায়ের আক্ষেপে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। আর ভিখারী মাতার চোখ থেকে একটি দুটি করে তপ্ত মুক্তার মতো জলের ফোঁটা ঝরে পড়েছে শিশুটির অধরে।

ব্যর্থ মাতৃত্বের একটি সুকরুণ দৃশ্য। সার্থক ছবি। কোন সন্দেহ থাকে না, আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেনের জয়মাল্যের পুরস্কার অবধারিত।

পরীক্ষকেরা পাতা উল্টিয়ে যান। পর পর কত ছবি, কত ফটো বিচিত্র পটক্ষেপের মতো পাঠক ও দর্শকদের চোখের উপর দিয়ে চকিতে পার হয়ে যায়। কোন ছবি, কোন ফটো মনে ধরে না পরীক্ষকদের। শ্রীমন্ত সেনের আঁকা ছবির তুলনায় সবই নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে পরীক্ষকেরা কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্তের তোলা ফোটো। শুধু পরীক্ষকেরা নয়, ঠিক এই মুহূর্তটিতে গ্রাহক পাঠক ও উৎসাহীর দল ঠিক এমনিভাবে ফটোর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকে। যুগ যুগান্তরের প্রত্যয়ে লালিত একটি মোহ রূঢ় আঘাতে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রূপকথা নয়, কল্পনা নয়, কিংবদন্তী নয়, কলকাতার পথের ওপর কুড়িয়ে পাওয়া একটি নিরলঙ্কার ছবি।

—এক শিশু সেবা-প্রতিষ্ঠানের দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের সামনে গাছের তলায় এক ভিখারী মাতা বসে আছে। তার কোলের ওরপ মুমূর্ষু শিশু সন্তান। শিশুটির বুকের পাঁজরা থরথর করে কাঁপছে, বিস্ফারিত ঠোঁটদুটিতে বিদায়ী প্রাণবায়ুর শেষ সাড়া ফুটে উঠেছে। আর ভিখারিণী মাতা পরম প্রসন্নমনে এক মগ-ভর্তি দুধ ঢকঢক করে খেয়ে চলেছে।

শোকাহতের মতো পরীক্ষকেরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। লুপ্ত মাতৃত্বের একটি নিষ্ঠুর ছবি। মানবতার চরম ক্ষতি। শ্রেষ্ঠ ছবি।

পরীক্ষকেরা নম্বর দিলেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী—ফটোগ্রাফার বিজয় গুপ্ত। পুরস্কার ঘোষণা করলেন পরীক্ষকেরা।

ঠিক এই মুহূর্তটিতে আর্টিস্ট শ্রীমন্ত সেন স্বাক্ষর পত্রিকাটিকে ভাঁজ করে বন্ধ করে তুলে রাখলো। একটা মূর্ছাভঙ্গের পর যেন হঠাৎ সে জেগে উঠেছে। রঙের তুলিগুলি একে একে ধুয়ে দেরাজে বন্ধ করলো। তারপর কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখলো।—আমার অভিনন্দন জানবেন বিজয়বাবু।

উচলে চড়িনু

তেঁতুলিয়া মাঠের ঘাসের রঙ বার মাস সবুজ। অনেক দিন আগে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই দিনেশ বড় সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেছিল। তেঁতুলিয়া মাঠে লাল কৃষ্ণচূড়ার ভাঙা ভাঙা ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল কোথা থেকে। আজ আবার ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে--তেঁতুলিয়া মাঠের সবুজে হঠাৎ কোন উত্তুরে হাওয়ায় রক্তিম তুষারের ফুল কতকগুলি এসে ছড়িয়ে পড়েছে। একদল ইরানী বেদের মেয়ের--মাঠের এককোণে পড়েছে তাদের তাঁবু।

পরনে খাট খাট লাল ঘাগরা, হাঁটবার সময় কেঁপে দুলতে থাকে। মনে হয় ওটা বুঝি ওদের গায়ের পালক। নিটোল খালি পা--গোলাপী মোমের প্রলেপ দেওয়া। রুক্ষ বেণীগুলি কোমর পর্যন্ত ঝুলে। গায়ে বেগুণী রঙের জামা, চুড়িদার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত। মাথায় কপাল চেপে রুমালের ফেট আর তার নীচে লালচে মুখ, টিকালো নাক আর তার দু'পাশে জোড়া জোড়া চোখ যেন কাস্পিয়ান নীলিমায় টলমল।

মাঠের অন্যদিকে হল্লা আর হর্‌রা চলেছে খুব। বেদিয়া যুবকেরা ছোট ছোট জুয়ার বৈঠক বসিয়েছে। বাজারের বহু উৎসাহী জুয়াড়ী সেই ব্রাহ্মমুহূর্তেই এসে ভীড় করেছে গন্ধে গন্ধে--ভাগ্যের সঙ্গে প্যাঁচ কষে নিচ্ছে এক হাত। অথবা রাত্রেই শুরু হয়েছিল--হারজিতের টানাপোড়েনে মাত করে আর মার খেয়ে দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেছে।

সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দত্ত কোম্পানীর আফিসে এতক্ষণ ধর্ণা দিয়ে ঘরে ফিরেছে দিনেশ। মাত্র পাঁচটা টাকা এ্যাডভান্স, তাও চেয়ে পাওয়া যায়নি। তবে শুধু খালি হাতে ফিরতে হয়নি।

পথে ফিরতে বিলাসী কোত্থেকে এসে তার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে কয়েকটা টাকা--'ধারই দিলাম বাবু। যখন পার শোধ করে দিও।'

খনির মজুরণী বিলাসী, এ বয়সেই পাঁচবার সাঙ্গা তালাক করেছে। নামকরা নেশাড়ী সুপেশল কালো কঠিন চেহারা। মুখ ও বুকের ছাঁদে নারীত্বের কোমলতাটুকু অটুট আছে। গতরভাঙা পরিশ্রমে পুরুষ মজুর ওর কাছে হার মানে।

বিমর্ষ দিনেশ ঘরের বাইরে দাওয়ার ওপর বসে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে হিস্টিরিয়ার মতো শরীরে একটা তীব্র কম্পন আর অবসাদ নেমে আসে। কিসের বিরুদ্ধে যেন তার একটা অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

বছর দু'এক আগের কথা, কলেজের বার্ষিক উৎসবে দিনেশ তার রোমান রিংয়ের খেলা দেখিয়েছে। বাঘের চামড়ায় আঁটসাট জাঙ্গিয়া, খোলা গা। দোলায়মান রিংয়ের ওপর কসরত। লীলায়িত পেশীপুঞ্জের রক্তরাগে ফুটে ওঠে প্রাণের সম্মানলিখা। করতালির বরষা আর শত শত দর্শকের বিমুগ্ধ দৃষ্টির আশীর্বাদ। গ্যালারি থেকে কনভেন্টের মেয়েদের রুমালের উৎক্ষেপ আর হর্ষের কাকলি। কোথায় মিলিয়ে গেল সে ছবি!

বাঙালী সমাজে কানা খোঁড়ার জীবনেও বিয়ের ফুল ফোটে। ভবিষ্যপুরুষের ধমনীতে তারা সঁপে দিয়ে যায় শুধু কতকগুলি পঙ্গু বীজাণুর প্রবাহ। তাতেও দোষ নেই। যত বিচার আর ব্যতিক্রম শুধু দিনেশের অদৃষ্টে। বিয়ের সম্বন্ধ আসে আর ভেঙে যায়। পাত্রের যা রোজগার--এক সপ্তাহের পেটের খোরাক যোগাতেই নিঃশেষ। কন্যাপক্ষ আতঙ্কে পিছিয়ে যায়।

এদিকে দত্ত কোম্পানী আবার মাইনে কাটে। দিবারাত্রি দু'দফা সিফট চলে। খনি হাতড়ে মাল ওঠে না। এটাও যেন তারই অপরাধ। এর চেয়ে সাত সাগর ছেঁচে মুক্তো আনাও

বোধহয় সহজ।

দিনেশের অন্তরাত্মা হিংস্র হয়ে ওঠে। তার চেয়ে ভাল ফ্যাকাসে তোবড়া একটা মুখের ভেতর দু'পাটি পোকাপড়া দাঁত--সোনা দিয়ে বাঁধানো। অস্থিসার একটা নড়বড়ে শরীরে অজীর্ণ আর অম্লশূল--কাশ্মীরী শালে ঢাকা। যে কোন ঘটক দেখলেই খুসিতে আটখানা হয়ে যাবে। যেন ঐ সোনা আর শালের ঔরসে জন্ম নেবে জাতিধর আর বংশধরের দল।

আরো মুশকিল হয়েছে ভদ্রলোক হয়ে লেখাপড়া শিখে। জীবনের দুর্ধর আবেগ টেনে নিয়ে যায় পাতালের দিকে। বিলাসীকে নিয়ে যে জনরব গড়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে সেটা সত্য হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু রুচিতে বাধে। পদে পদে ভদ্রয়ানার নিষেধভীরুতা। অভাবে স্বভাব নষ্ট হবে, এ হতে পারে না।

আবার মনে হয় সমাজ সংসাব মিছে সব। এই জঙ্গল আর পাথরের চটান। চুনা পাথরের ধস নেমে গেছে নদীর গড়খাই পর্যন্ত--অগণ্যাকোটি কীটের চূর্ণাস্থি। এই সেই গণ্ডোয়ানা ভূমি যেখানে গলিত প্রস্তরের নিশ্বাস শূন্যে মিলিয়েছে একদিন। যে পরমাণুর যজ্ঞে সৃষ্টি হলো হীরা, পান্না, পোখরাজ, নীলা, পদ্মরাগ। প্রথমে প্রেমে মরণাহত কত অতিকায় গোধিকার চুম্বন আঁকা আছে এই পাষাণে পাষাণে। দিনেশের ইচ্ছে হয়, অর্বাচীন বিংশ শতাব্দীর এই সংকুচিত জীবনের জঞ্জাল ঠেলে দিয়ে বিলাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আত্মনাশের আনন্দ।

কিন্তু তা হয় না।

ঘরে চোর ঢুকেছে। দিনেশের ঘুম ভেঙ্গে গেল। খুট্‌খাট্‌ শব্দ।

বড় ভুল করেছে চোর। দিনেশ ভাবতে গিয়ে নিজেই লজ্জিত হলো। এ ঘরে চুরি করার মতো কিছু নেই। কি নেবে চোর? পাশের ঘরে আছে একটা রুটি সেঁকার তাওয়া, বেলুন, চাকি, খুন্তি আর এলুমিনিয়ামের ডেকচি। বারান্দায় আছে এঁটো থালা আর গেলাসটা। উঠোনে একটা পায়খানা যাবার পেতলের গাড়ু। পশ্চিমের ঘরে শুধু একটা এনামেলের গামলা--ছোলা ভেজান আছে। এর মধ্যে কোন্‌ জিনিসটি চোরের পক্ষে লোভনীয় হতে পারে?

একটু দূরেই তো ছিল দত্ত কোম্পানীর অভ্রের স্টোর। হাঁপানী রুগী কুঁজো মুকুটধারী সিং বন্দুক ঘাড়ে পাহারায় রয়েছে। চোর যদি তার সামনে গিয়ে একটু জোরে কাশে তবে বন্দুক খসে পড়বে হাত থেকে নির্ঘাত! তারপর কাঠের বাক্সগুলি ভেঙে ফেললেই হলো--হাজার পাঁচ তো পাবেই। কিন্তু গবেট চোরগুলোর চোখে সোজা রাস্তায় তো পড়ে না। এসেছে ওভারম্যান দিনেশের ঘরে।

আরও ভুল করেছে চোর। সে জানে না এখানে থাকে দিনেশ চৌধুরী--যে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, পুরো দম টানলে যার বুকের বেড় বেলুনের মতো ফুলে আটচল্লিশ ইঞ্চি হয়, আধ ইঞ্চি পুরু ও আড়াই ইঞ্চি চওড়া লোহার পাত যে চিটেগুড়েব মতো দুমড়ে মুচড়ে দেয়। দৈবাৎ যদি চোরের হাত দিনেশের ঐ লোহার পাঞ্জায় ধরা পড়ে, কি হবে পরিণাম? একটি হ্যাঁচকা টানে কাঁধ থেকে ছিঁড়ে খুলে আসবে না কি?

সত্যি চোর ঢুকেছে, এ ব্যাপার জেনেও দিনেশ আবার গায়ে চাদরটা টেনে নিল। ঘুমের আরামটুকু নষ্ট করে লাভ নেই। চোরের যা সাধ্যি থাকে করুক।

কিন্তু মনে পড়লো বড় আয়নাটা, রূপোর ফ্রেমে বাঁধা ; ঘরের দেয়ালে টাঙ্গান আছে। কমিশনার সাহেবের মেম কসরৎ দেখে খুশি হয়ে এটি উপহার দিয়েছিলেন। পঁচিশজন গুরুভার মানুষে বোঝাই একটা গরুর গাড়ির চাকা ঘাড়ের ওপর দিয়ে পার করেছিল দিনেশ, যার জন্যে আজও একটা ঘাড়ের রগ মাঝে মাঝে টনটন করে।

এখন মাসের শেষ। একটা গামছা দিয়ে ঢাকা আছে আয়নাটা। খোরাকের কমতি পড়েছে এখন, তাই ডন বৈঠক মেহন্নতও বাদ পড়েছে। এখন চলেছে শুধু ঝিঙের তরকারি আর

ভাত। এই খোরাকে এক্সারসাইজ করলে ক্ষতি হয় শরীরের--দম ঢিলে হয়ে আসে, পেশিগুলো রুক্ষ হয়ে কুঁচকে যায়। একটুতে ক্লান্তি বোধ হয়।

পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। তবু মাসের প্রথম ক'টা দিন প্রতি নিঃশ্বাসে, মাংসপেশীর প্রতিটি লীলায়িত নৃত্যের মধ্যে দিনেশ প্রাণের আস্বাদ পায়। পেট ভরে রুটি-তরকারি, একপো ঘিয়ের ফোঁড়ন দেওয়া অড়হরের ডাল, একটু সুরুয়াদার মাংসের কারি, সকালের দিকে মোষের দুধ, বিকেলে বাদামের সরবত। ডনবৈঠক আর বারবেল ভাঁজার পর তেলে মাজা শরীরে স্নান সেরে দিনেশ এই আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়, আয়নার বুকে সেই অপার স্বাস্থ্য মহিমার প্রতিচ্ছায়ার পায়ে তার মন অনুরাগের আবেশে নুয়ে পড়ে।

আয়নাটা গেলে ক্ষতি হবে। দিনেশ বিছানা ছেড়ে উঠলো।

দিনেশের পায়ের শব্দে একটা চোরের ছায়ামূর্তি ঘরের ভেতর থেকে ছিট্‌কে বারান্দায় এসে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো দিনেশের লোহার মতো দুটি বাহুর পাকে। মুহূর্তের মধ্যে চোরের শরীর নরম নতুন বালিশের মতো চেপ্টে যেন এতটুকু হয়ে গেল।

দুড় দুড় আওয়াজ। আরও ক'জন চোর উঠোনের পাঁচিল ডিঙিয়ে খিড়কির দোর খুলে পালিয়ে গেল।

বন্দী চোর হাঁপাচ্ছে। দিনেশের কানের কাছে চোরের কাতর স্বর বেজে উঠলো, অতি করুণ এক আবেদন--'উঃ, গায়ে ফোড়া আছে, বড় লাগছে।'

আচম্‌কা শিথিল হয়ে পড়লো দিনেশের বাহুবন্ধন। দ্বার খোলা পিঞ্জরের পাখীর উল্লাসের মতো চোর একবার মরীয়া হয়ে ছটফটিয়ে উঠলো মুক্তির জন্যে। কিন্তু দিনেশ তার ভুল বুঝে সামলে নিল।

আর একবার কেঁপে উঠলো দিনেশ। চোর তার বুকের ওপর বসিয়ে দিয়েছে হিংস্র কামড়--নির্বিষ সাপের ছোবলের মতো একটু চিন্‌ চিন্‌ করে উঠলো শুধু। স্প্রিংয়ের মতো পেশিতে দাঁত বসাতে পারে না--চামড়াটা শুধু ছড়ে যায় সামান্য। দিনেশ আর একবার কষে দিলে তার নিদারুণ আলিঙ্গন গ্রন্থি। নিপিষ্ট চোরের দম ফেটে এক পরম হতাশার আক্ষেপ ফুঁপিয়ে বেজে উঠলো।

কিন্তু ধীরে শিথিল হয়ে আসছে দিনেশের হাত অলস অবসাদে। রেশমের মতো নরম চুলেভরা চোরের মাথা দিনেশের চিবুকে ঘষা খেল একবার। ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিতেই চোরের মাথার বেণীটা চাবুকের মতো দিনেশের কাঁধের ওপর সাপটে পড়লো। তার ওপর মিঠে ফুলের গন্ধ, বেণীতে গোঁজা ফুল, টাটকা সুলতান চাঁপা।

একটা স্বেদাক্ত মসৃণ মুখ মাছরাঙা পাখীর মতো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছে দিনেশের মুখের ওপর। জেলির মতো কোমল দুটি অদৃশ্য অধরের বিহ্বল চুম্বন। অগোচরের এই স্পর্শ তিলে তিলে গ্রাস করে নিচ্ছে তার পরিচয়। শরীরের প্রতি কণিকা যেন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কাঠিন্য হারিয়ে।

বাইরের অন্ধকার থেকে মৃদু ঝড়ের স্রোতে ভেসে আসছে অতি করুণ একটা শব্দের কম্পন--ফাটা বাঁশির আওয়াজের মতো। শত শত সাপ যেন ফনা তুলে শিষ দিয়ে ডাকছে সঙ্গিনীকে। দিনেশের হাত দুটি ঝুলে পড়লো।

এক মিনিট মাত্র। অবসাদের ঘোর কাটিয়ে উঠেই দিনেশ দেশলাই জ্বালালো। হাতে চকচকে ছুরি--একটি ইরানী বেদে মেয়ে--হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুঁজছে। এরাই এসেছে তেঁতুলিয়া মাঠে।

বাইরে আর একবার সাপের শিষের ঝড় শিউরে উঠলো একসঙ্গে। চোর খিড়কির দরজা দিয়ে চকিতে পার হয়ে চলে গেল।

দত্ত কোম্পানীর অভ্রের খনি। ওভারম্যান দিনেশ ডিউটি দিতে নেমে চললো সুড়ঙ্গের পথে। হাতে টর্চ আর বেঁটে একটা লাঠি। চওড়া ঢালু পথ নেমে গেছে--গাছের ডাল দিয়ে সিঁড়ি করা, পা ঠেকা দেবার জন্যে। মাথার ওপরটা যেন এক বিরাট পাষাণের চন্দ্রাতপ--গাঁইতার মারে চেঁচেছুলে খিলান করে দেওয়া হয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে ফাটল--ভূভারের আক্রোশ যেন ভ্রূকুটি করে রয়েছে। কাঁচা গাছের তক্তা দিয়ে খিলানটা এক প্রস্থ তালি মারা হয়েছে--পচে ছিঁড়ে গেছে আর্ধেক কাঠ। তারই ফাঁকে চুঁয়ে পড়ছে ভুস্‌কো মাটি, কাদাজল আর কাঁকর। একটা শিমূলের শেকড় সাপের লেজের মতো ঝুলছে। ঢালু সিঁড়িটা শেষ হয়েছে যেখানে--ছাতটা সেখানে পাকা ফোড়ার মতো ফুলে উঠেছে। এক ভয়ংকর পরিণামের আশঙ্কায় টনটন করছে জায়গাটা। দুর্বল আশ্বাসের মতো কয়েকটা কাঠের খুঁটি দিয়ে ঠেকা দেওয়া হয়েছে।

নামতে নামতে দিনেশ এসে দাঁড়ালো ঢালুর শেষে--জায়গাটা প্রায় সমতল। দ্বধে মাটির কাদায় পা ডুবে যায়। দুপাশে স্তরে স্তরে কেওলিন গলে রয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে আর কিছু দেখা যায় না। শুধু একটা খাড়া চানকের মুখ মাথার অনেক ওপরে, বহিঃপৃথিবীর আলোয় রাঙা দিনমানের একটি বুদ্বুদের মতো ভেসে রয়েছে।

এখান থেকে তিন দিকে তিনটে সুঁদ চলে গেছে। দু'পায়ে গুঁড়ি মেরে আর দু'থাবার হেঁটে দিনেশ চললো--টর্চের আংটাটা দাঁতে কামড়ে। ধারালো কোয়ার্টসের নুড়িতে হাঁটু ছড়ে যায়। ঘাড় টাটিয়ে উঠলেও মাথা তোলা যায় না। মাথার ওপরে এবড়ো খেবড়ো পাথর--পাতাল দানবেরা দাঁত মেলে পড়ে আছে। বেসামাল হলেই মাথার খুলি ঠুকে যায়, ভেঙে যেতেও পারে। সরীসৃপের মতো পাকিয়ে পাকিয়ে বুকে হেঁটে দিনেশ চলেছে ডিউটি দিতে--পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরি।

নুড়ি ভরা পথটা শেষ হয়েছে। তারপর হঠাৎ একটা ঢালু। দিনেশ ঝুপ করে পড়ে গেল।

যেন একটা স্প্রিংয়ের গদি। একটা রামার গাদি। খনিকরের উপেক্ষিত কালো অভ্র রামা। রামা কালো বলেই অকেজো, কেউ ছোঁয় না। এ জায়গাটা তবু একটু সুপরিসর--চারটে দিক ঠাহর করা যায়। নইলে সুঁদের পথে একবার মনে হয়--এ জগৎ যেন আয়তনতত্ত্বের বাইরে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ--উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু অশরীরী একটা প্রাণ অচরিষ্ণু পাথরের স্তর দীর্ণ করে এগিয়ে চলে--চাকরি করতে।

দিনেশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পাগুলো একবার টেনে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেন মেরুদণ্ডের আশ্রয়ে বসিয়ে দিল। সুঁদের পথ এবার আরও গভীরে ডানদিকে ঘুরে খাড়া নেমে গেছে। গুমোট বড় বেশি--কাছে কোন চানক নেই। টর্চ জ্বাললেও পথ পরিষ্কার দেখা যায় না। কোটি কোটি অভ্ররেণু স্তব্ধ ঝড়ের মতো পথ জুড়ে রয়েছে।

অনেকটা ঝুলে ঝুলে নামতে হয়। একটা দড়ি খুঁটোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, গতির বেগে দেহের ভার যেন আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়। পাশে একটা চওড়া খুপরি। রেড়ির তেলের একটা পিদিম নিভে রয়েছে। একটা শূন্যগর্ভ তাড়ির ভাঁড়--কয়েকটা ভাঙ্গা গালার চুড়ি। নামার পথে দিনেশ এখানে রোজই একবার জিরিয়ে নেয়।

এই খুপরিটা যেন পাতালপুরীর একটা পান্থশালা। শুধু মুনাফা শিকারী ব্যবসায়ী মানুষের নখরের আঁচড় নয়--প্রাণময় মানুষের কামনার শিলালিপিও লেখা রয়েছে এখানে।

দড়ি ধরে ধরে দিনেশ নীচে নেমে চললো। এই ধূলি ধাতু ও পাষাণের সংসারে সেও যেন পরমাণুর মতো লঘু হয়ে আসছে। মর্ত্যলোকের যত পাপ পুণ্যের সংস্কার এই অতল অন্ধকারের শাসনে খসে পড়েছে একে একে। মৃত্যু এখানে কত ঘনিষ্ঠ--তাকে প্রাণের মতই এখানেই অনুভব করা যায়।

গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধ। দিনেশের চাকুরির আস্তানা এগিয়ে আসছে। সুঁদের একটা সংকীর্ণ

বাঁক--একটা কুঁয়োর মতো গর্তের মুখে এসে শেষ হয়েছে। হুম হুম হুম--একটানা একঘেয়ে একটা শব্দের গমক। পাষাণের হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন অন্ধকারের নিঃশ্বাস ছাড়ছে। আবার মনে হয়, লক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাসের একটা ঘূর্ণি পাথরের পেটে বন্দী হয়ে আছে--ক্ষেপে ফেটে পড়তে চায়।

কুঁয়োর মুখে এসে ঝুঁকে তাকাতেই এই শব্দ তাণ্ডবের যেন একটা ছন্দোবদ্ধ অর্থ পাওয়া গেল। খনিমজুর বানিয়াতিদের গান। মেয়েকুলি ধারিদের কলহাস্য। খান হাতুরির আছাড়ের গুরু গুরু ধ্বনি। নুড়ির স্তূপের ওপর ছপ ছপ করে বেলচার টান পড়ছে। একেবারে নীচে একটা পিদিম--একটা আলোদানার চক্ষু যেন নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দিনেশ অন্ধ অজগরের মতো লাফিয়ে পড়লো হাত তিনেক নীচে--সাত নম্বর দরজা, দিনেশের ডিউটিস্থল।

বানিয়াতিদের গান আর খান ছেনির উদ্দাম সংঘর্ষ বন্ধ হলো। পিদিমে আরও খানিকটা তেল ঢেলে সলতে উস্কে দেওয়া হলো। জেলেকনাইটের ধোঁয়া ধূলা আর ঘোলা আলোর সেই নীহারিকার মধ্যে দিনেশের চোখে প্রথম ধরা দিল একটা হাসি হাসি মুখ--প্রতীক্ষমান এক জোড়া চোখের সার্থক দীপ্তি--বিলাসী।

বিলাসী একটা বেলচা কোলের কাছে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।--'আজ বড় দেরি হলো বাবু?'

বিলাসীর দিকে একবার তাকালো দিনেশ--হ্যাঁ, পাতালপুরীর মেয়েই বটে। ধূলায় রুক্ষ চুলের ওপর অজস্র অভ্রের কুচি চিক্‌চিক্ করছে--যেন একটা চুমকির জালি দিয়ে ঘেরা। নোংরা শতচ্ছিন্ন কালো রঙে ছোপানো একটা ধূলিকীর্ণ শাড়ি--রসাতলের এক তপস্বিনীর মূর্তি! ওরা হাড় দিয়ে পাথর ভাঙে। মর্ত্যলোকের নারীর মতো ওদের দেহ লালিত্যে লতিয়ে ওঠেনি। ধরিত্রীর এই তমসাবৃত জঠরলোকে ওদের অয়স্কান্তির কঠিন লাবণ্য কত নয়নাভিরাম তা এখানে না এলে কেউ বুঝবে না। এই পাষাণের ছন্দে ওদের যৌবন বাঁধা। যে কোন ক্লিওপেট্রাকে এখানে কুৎসিত প্রেতিনীর মতো মনে হবে!

কিন্তু দিনেশের মন আজ ছন্দ হারিয়েছে। বিলাসীর কথার উত্তর না দিয়ে কাজের হিসেব নিতে মন দিল।

দুটো মেয়ে ধারি বেলচায় মাথা রেখে ধুমোচ্ছে আর ঘুমের ঘোরেই থুথু ফেলছে মাঝে মাঝে। মেয়ে দুটোর কণ্ঠনালি রবারের থলির মতো এক-একবার ফুলে উঠছে--বমির তোড় আটকাচ্ছে দাঁতে দাঁত দিয়ে।

বীভৎস! দিনেশ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বিলাসী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। দিনেশ সরে গেল।

বানিয়াতি লোটন বললো, 'ওদের আজ হুঁস নাই বাবু। মানা করলাম তবুও শুনলো না। নেশা করেছে।'

দিনেশের মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠলো, 'আর কে কে? নাম বল তো।'

'--আর চমন। একবার ঐদিক তাকিয়ে দেখ বাবু।' লোটন হেসে ফেললে।

চমন পাথরের গায়ে একটা খুপরির মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে রেখে চোখ বুঁজে ধীর স্থির হয়ে বসে আছে। পাতালপুরীর কোন ভাস্কর যেন এক অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্তি রেখেছে খোদাই করে।

তিনজনের হাজরি কেটে দিয়ে দিনেশ আবার কাজের কথাই পাড়লো, 'একি? এতখানি ছাড় রেখে বিঁধ দিয়েছিস কেন?'

লোটন মুচকে হেসে বললো, 'বাবু, আর একজনের হাজরি কাটতে হয় তা হলে।'

দিনেশ--'আর কে?'

বিলাসীর মাথাটা নেশায় দুলছিল। দিনেশের মেজাজী গলার স্বর শুনে, মুখে আঁচল চাপা দিল ভয়ে। লোটন তেমনি মুচকে হেসে কাজের কথার উত্তর দিল, 'ওটা বাজা পাথর বাবু।

গ্রিঁধে কিছু হবে না। মিছা বারুদ নষ্ট হবে।'

টর্চের আলো ফেলে দিনেশ চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। কোন দিকে কোন ভরসার চিহ্ন নেই। আজ সাত দিন ধরে কাজ হচ্ছে, দশ সের মালও ওঠেনি। জেলেকনাইটের করাল বিস্ফোরণে এই অন্ধ পাথরের বুক ফেটে এক-আধটু ধুলো চাপড়া ঝড়ে পড়েছে শুধু। মালিকের পয়সা নষ্ট হচ্ছে, এর পরিণাম কি হবে তা সেই জানে। এই পাতাল ঘেঁটে তাকে বার করতে হবে কোথায় অভ্রের রেতি--রত্নকায় সরীসৃপের মতো কোয়ার্টসের বুকে লুকিয়ে আছে। নইলে মাইনে ও মজুরী মুন্সীজীর খাতায় কালির আখরেই লেখা থাকবে, হাতে আর আসবে না।

দিনেশের মেজাজ ধারি ও বানিয়াতিদের কাছে আজ একটু অন্যরকম লাগলো। হুমকি হুকুমবাজি তো এখানে অচল। তা ছাড়া দিনেশবাবু অতি দিলদার লোক। ধারি বানিয়াতি আর ওভারম্যানের ধর্ম এখানে একই সঙ্গে সমাহিত ছিল পাতালিক প্রীতি বন্ধনে। আজ এই ব্যতিক্রম কেন?

আর বিলাসী? সে তো বেশ ভাল ফাক্‌নিক কাজ জানে, কারখানায় বসে অভ্র কাটলে রোজগার অনেক বেশি হতে পারে। তবু ধারি হয়ে ঝুড়ি ও বেলচা নিয়ে নেমেছে এই মৃত্যুময় অভ্রমরীচিকার গহনে। যে সিফ্‌টে যত নম্বর দরজায় ওভারম্যান দিনেশের ডিউটি থাকে, বিলাসীও সেখানে থাকবে। খনিমহলে কথাটা আরও অবিদিত নেই। প্রত্যেক শ্রমিক ও শ্রমিকার কাছে ঐ দুজনের গল্প অনেকটা রূপকথার মতো, আলোচনা করতে বেশ মজাই লাগে। এর মধ্যে কিছুই অশোভন, কিছুই অসুন্দর নেই।

সেই দিনেশবাবু আজ কেমন যেন বিসদৃশ হয়েছে। বিলাসীর সঙ্গে একটা কথাও হলো না। লাঠি ও টর্চ হাতে দিনেশ আবার সিঁড়ির তলায় এসে দাঁড়ালো। '—তোরা আবার একটা বিঁধ দিয়ে আওয়াজ কর। দেখ, কপালে যদি কিছু থাকে। আমি ওপাশের ছোট গাড়াটা একবার দেখে আসি।'

সিঁড়ি ধরে একটু ওপরে উঠে আসতেই দিনেশ পেছনে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। বিলাসী।

'—একি? তুই আসছিস কোথায়?'

'—তোমার সঙ্গে।'

'—না, নিজের কাজে যাও।'

বিলাসী সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল নিথর অভিমানের শিলীভূত মূর্তির মতো।

'—তালা নেবে। খুব সস্তা ; খুব মজবুত। চোরে ভাঙতে পারে না, বউ পালাতে পারে না।'

দিনেশ চম্‌কে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলো--একটা ইরানী বেদে মেয়ে, যাদের তাঁবু পড়েছে তেঁতুলিয়া মাঠে। একটা বড় চামড়ার পেটি ঝুলছে কাঁখের ওপর--রকমারি পণ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

'—দেখছো কি? তালা নেবে কি না বল?' মেয়েটা সরাসরি দাওয়ায় উঠে একেবারে দরজার মুখে এসে দাঁড়ালো।

দিনেশ তাকিয়েছিল। হ্যাঁ, এই সেই মেয়ে। সেই রেশমী চুলের বেণী—মাথায় সুলতান চাঁপা গোঁজা। হতভম্ব হয়ে ধরা গলায় দিনেশ আস্তে আস্তে বললো, 'কত দাম?'

মেয়েটা এদিক ওদিক দু'বার তাকালো। ভুরু কুঁচকে কি ভাবলো। ছোট একটা পেতলের তালা তুলে ধরে বললো, 'দাম দশ টাকা।'

ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দিনেশ আর কোন কথা না বলে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে থেকে মেয়েটা আর একবার চেঁচিয়ে বললো, 'আচ্ছা, পাঁচ টাকা। না হয়,

দু'টাকা। জিনিস চেন না বেকুব?'

দিনেশের কানে কোন কথাই পৌঁছল না।

দুপুরের রোদ মাথার ওপর তেতে উঠেছে। দিনেশ তবু দাওয়ায় বসে আছে। আজকাল রোজই এইরকম হয়। বসে বসে দেখে তেঁতুলিয়া মাঠের চারদিকে তাতারসি কাঁপে--তৃষ্ণার ছবির মতো। বেদে মেয়েটা হন্তদন্ত হয়ে রোজই এ পথে তাঁবুতে ফেরে।—'পেলে টাকা?' যাবার সময় জিজ্ঞাসা করে যায়।

দিনেশের ইচ্ছে হয় একবার ডেকে প্রশ্ন করে নামধামগোত্র। কেমন এই পথিক মানুষের দল, মেরুমরালের পাখার মতো পথের প্রেমে যাদের স্নায়ু শিরা সতত চঞ্চল। মহাদেশের গিরিদরিবন ধরে যায় আর আসে। ভাষা গান উৎসব সবই পথ থেকে কুড়িয়ে নেয়। যেখানে পায় তুলে নেয় নতুন পাপপুণ্য, নতুন রক্ত, নতুন ব্যাধি। দিনেশের জানতে ইচ্ছে হয়, ওরা কাঁদতে জানে কিনা। না শুধু হাসির ফুৎকারে জীবন উড়িয়ে নিয়ে যায় আয়ুর সীমানায়, ডাকতে সাহস হয় না দিনেশের।

'—আচ্ছা, এক টাকা। সস্তা করে দিলাম। এইবার রাজি হয়ে যাও।' নির্লিপ্তভাবে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে মেয়েটা চলে যায়। দিনেশও আর বড় বিচলিত হয় না। যাযাবরীর এই নিত্য চতুরালি গা সহা হয়ে আসছিল।

গলায় চুনীর মালা আর ঘাগরার শব্দে দিনেশকে সচকিত করে মেয়েটা এক দিন সামনে এসে ভালমানুষের মতো চুপ করে বসলো। মুখ ঘুরিয়ে নিল দিনেশ। শীগগির চলে গেলে হয়। এ সব অপ্রাকৃতিক জীব—ঘনিষ্ঠ না হওয়াই ভাল। কিন্তু বড় সুন্দর।

'—কি? তাকাতে ভয় পাচ্ছ বুঝি? কোন ভয় নেই, যত খুশি তাকাও।'

কথার মধ্যে কোন আবেগ নেই, তবু মোহ এসে পড়ে। দিনেশ তাকালো লজ্জা সত্ত্বেও।

'—একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পার মেহেরবান!' মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

ক্লান্ত হবার কথা। দু'পায়ে পুরু ধূলোর ঢাকা পড়েছে। এই রৌদ্রে কতদূর ঘুরে এসেছে কে জানে। দিনেশ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো জলের জন্য। এক দুরন্ত বনহরিণী দোরে এসে তৃষ্ণার জল চাইছে তার কাছে।

গেলাসে জল নিয়ে বাইরে আসতেই দিনেশ দেখলো মেয়েটা নেই। রাস্তা ধরে নিজের মনে চলে যাচ্ছে। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েই খিলখিল করে হেসে উঠল।

দিনেশ সেদিন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে আজ ডেকে ওর পরিচয় নেবেই। রবিঅভ্রের মতো অমন সুন্দর চেহারা। ওর মধ্যে মানুষীর হৃদয় থাকবে না, এ কি করে হয়?

'—এই শোন, কাজের কথা আছে।' দিনেশ সহজস্বরে ডাকলো।

নকল ত্রাসে চোখদুটো বড় বড় করে মেয়েটা বললো, 'ওরে বাবা, যাব না। জুলুম করবে।'

দিনেশের প্রতিজ্ঞাটা যেন কিসের সংকোচে এলোমেলো হয়ে গেল, কিন্তু প্রত্যুত্তর তৈরী হবার আগেই মেয়েটা সটান চলে এল। বললো, 'আমার নাম সারা, তুমি একটাও তালা কিনলে না। কত করে বললাম।'

হাসি মুখেই দিনেশ বললে, 'তোমার তালা কিনবার মতো লিয়াকৎ আমার নেই। আমি গরীব।'

সারার উদ্ধত দৃষ্টি যেন নরম হয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি কর? রোজগার কর না?'

'--অভ্রের খাদে কাজ করি।'

'—খাদে? ভেতরে নাম তুমি?'

'—হ্যাঁ, রোজই।'

'—তুমি আদমি নও। তুমি সাপ, নইলে গর্তে ঢোক কি করে?'

সত্যি এদের কথাবার্তার চালচুলো নেই। দিনেশ একটু বিরক্ত হয়েই চুপ করে গেল।

কতক্ষণ আনমনা হয়েছিল দিনেশ জানে না। হঠাৎ চোখে পড়লো সারা একাগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখছে—দুটি শান্ত মেয়েলী চোখের দৃষ্টি। দিনেশ খুশি হলো। সারার কণ্ঠস্বরে সত্যই মমতার আমেজও ফুটে ওঠে। বললো—'তোমার বিবি নেই?'

'—না।'

—'এমন নওজোয়ান তুমি। বিবি নেই? আজব তোমার কাণ্ড!'

দিনেশের সাহস বেড়েছে, 'তুমি বিবি হবে!'

'—হব। বুড়া হলে কিন্তু পালিয়ে যাব।'

'—আর তুমি বুড়ি হবে না বুঝি?'

সারা ততক্ষণ উঠে ঝোলাঝুলি পিঠে তুলে তর্‌তর্‌ করে নেমে গেছে দাওয়া থেকে। ভুরু কুঁচকে মুচকি হেসে বলে গেল,—'এত দিল্‌লগী ভাল নয়। সাপ কাঁহাকা।'

আর একদিন সারা বললো—'তোমার সঙ্গে বসে বসে শুধু গল্প আর গল্প। আর পারবো না। আমার রোজগার খারাপ হয়ে গেছে। মালিক আমায় জবাই করে ছাড়বে, যদি জানে...।'

দিনেশ—'কি?'

সারা—'যদি জানে তোমার সঙ্গে মোহব্বৎ হয়েছে।'

দিনেশ চমকে উঠলো।—এ কি কথা বলে? মোহব্বতের কথা যাযাবরীর মুখে? হিমনদের মতো নিরাবেগ যাদের জীবনে হাসি কান্না উষ্মা অভিমান। পথে তুলে নেওয়া আর পথে ফেলে যাওয়া যাদের আনন্দ?

সারা—হ্যাঁ, মালিকদের কানে পৌঁছে গেছে। আমাকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছে। এ বেইমানীর সাজা কি জান তো? নেড়া করে তাড়িয়ে দেবে দল থেকে। বলবে—'যা তোর মাশুকের কাছে যা!' ওকে তো চেনো না, একটা কুর্দকসাই।'

সারার চোখ ছলছল করছে। হিমনদের গহনে অন্তঃশীল প্রবাহের কলক্রন্দন। সারা মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সারাই কথা বললো। গলাটা যেন একটু ধরে এসেছে। ওদের ভাষায় মিনতি নেই, চোখে দেখে বুঝে নিতে হয়।—'তুমি চল।'

'—কোথায়?'

'—আমার কাছে, আমার তাঁবুতে।'

'—তারপর?'

'—তারপর আর কি? থাকবে, ঢোলক বাজাবে।'

প্রস্তাব শুনে দিনেশ হেসে চুপ করলো। সারা বিস্ময়ের সুরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ কি হাসছো? জবাব নেই?'

দিনেশ তেমনি একটা ভারিক্কি হাসি হেসে বললো, 'আচ্ছা সে হবে হবে।' যেন কোন দোজবরে বাঙ্গালী স্বামী তার দ্বিতীয় পক্ষের একটা ছেলেমানুষী বায়না মিষ্টি কথায় ঠাণ্ডা করছে।

সারার দৃষ্টিও প্রখর হয়ে এল। আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'কি, জবাব দিলে না?'

আবার সেই ল্যাদারে ভালমানুষী হাসি। দিনেশ শুধু বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় জবাব দেব।'

সারা মাঠের পথে নেমে পড়লো।

সারা ভালবেসেছে। এতদিন পরে সত্যিকারের ট্রফি লাভ হয়েছে দিনেশের। জীবনের সবচেয়ে বড় বঞ্চনার ক্ষতে এতদিনে যেন একটু জ্বালাহর প্রলেপ পড়লো। তার পৌরুষের তোরণে এসে ইরাণী যাযাবরীর চিত্ত সকল উদ্‌ভ্রান্তি ঘুচিয়ে শান্ত হয়ে গেছে। নতুন করে যেন মধ্য এশিয়া জয় করলো সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।

মনে পড়লো বিলাসীর কথা। ওর ওপর মমতা হয়। দু'দিকেই দুই আহ্বান। বিলাসী ডাকে মৃত্যুর গহনে, আর সারা ডাকছে জীবনের খরস্রোতে। সারার নীল চোখের দিকে তাকিয়ে এক স্বর্গঙ্গার কলরোল শুনতে পায় দিনেশ, শুধু ভেসে চলে যাবার আহ্বান। কিন্তু বিলাসীর কালো চোখ তাকিয়ে আছে নিঃসঙ্গ ভোগবতীর অতল থেকে, যেন ডুব দিয়ে তলিয়ে যেতে ডাকছে বার বার।

সারা এসে বিষণ্ণভাবে বললো, 'কেমন আছ? আমাদের দিন ফুরিয়ে এল। এবার তাঁবু উঠবে। আর কি? এবার একদিন এসে শেষ সেলাম জানিয়ে যাব।'

দিনেশের বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে সারা কোন মতে হাসি চেপে রাখলো।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দিনেশ সেদিনের মতো ঘরোয়া কথা পাড়লো, যার ঘর নেই তার সঙ্গে। '—তোমার বাড়ি কোথাও একটা ছিল তো? সে কোথায়? ইরাণ?'

'—আমি ইরাণী নই। আমি জহান-কি-রানী।' খিলখিল করে হেসে উঠলো সারা।

তারপর সহজভাবে ভাটের ছড়ার মতো নিরর্গল কথার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চললো দিনেশকে। 'আমি তাজিকের মেয়ে, বাবা আমাকে বেচে দেয় এক খোরাসানী সদাগরের কাছে। হিন্দুস্থানে আসতে আজাদ এলাকার তোচিখেল বদমাসেরা আমাদের লুট করে। বড় বেইজ্জত হয় আমার। আমাকে তারা ধরে নিয়ে যায়। তারপর পেশোয়ার বাজার।'

সারার চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গেছে। ঘাঘরার ধুলোর মতো সমস্ত স্মৃতিভার সে যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে কথা বলে বলে।

—পেশোয়ারে বাজারে আমাকে তারা বেচে দিলে পাঁচ আফগানীর বদলে—মিয়াঁওয়ালী বেদিয়াদের কাছে। তারপর কানপুর। অসুখে ভুগে খোঁড়া হয়ে গেলাম। মিয়াঁওয়ালীরা বেচে দিল কঞ্চরহাটিদের কাছে—একটা মুর্গীর দামও তারা পায়নি। রোগা শুকনো খোঁড়া মেয়েমানুষ, কিই বা তার দাম হতে পারে? সেই থেকে আমি এই কঞ্চরহাটির তাঁবুতে। তারা নাচিয়ে নাচিয়ে আমার খোঁড়ামি ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। আর ভাল লাগে না, তবে বেইমানি করে চলে যেতেও পারি না। ভাল লোক যদি কেউ আবার কিনে নিত!'

একটা আপসোসের শব্দ করে সারা চুপ হলো।

'—তুমি আমায় কিনে নাও। যতদিনের জন্য ইচ্ছে কিনে নাও। যেদিন খুশি ছেড়ে দিও। কিছু টাকা দিলে মালিককে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসি।' উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠলো সারার মুখ।

এ প্রখর অনুরোধের আঘাতে দিনেশের নিরেট ভালমানুষী ভীরুতা একটু নাড়া খেল যেন। অধৈর্যে কাতর সারার গলার স্বর।—'তবু তুমি ভাবছো? না হয় পরে আমায় আবার বেচে দিও। এমন নওজোয়ান মরদ, টাকা যোগাড় করতে পার না? ইচ্ছে করলে এক রাত্রে তুমি হাজার টাকা আনতে পার। আমি চললাম। সেলাম।'

সারা উঠতেই দিনেশ তাকে ধরে বসাতে গেল। সারা দু'পা পিছিয়ে বললো—'ব্যস, ছুঁয়ো না। আমাকে ছোঁবার কোন হক্ নেই তোমার।'

দিনেশ—'এই তোমার মোহব্বত?'

সারার গলার স্বর যেন কাতরতায় আকুল হয়ে উঠলো—'তুমি বোঝ না অন্ধ। এই মোহব্বতের জন্য আমায় সাজা পেতে হবে। প্রাণ যেতেও পারে। রোজগার নষ্ট করে তোমার

সঙ্গে দোস্তি করেছি। মালিক সব কথা জানে। আমায় বাঁচাও।'

'--ভয় নেই সারা। আমি টাকা আনছি দু'তিন দিনের মধ্যেই। পাকা কথা দিলাম।'

'--জিতা রহো মাশুক মেরা! আমায় উদ্ধার করো। মালিকের দেনা শোধ করে দিয়ে আমি চলে আসি তোমার কাছে।'

সারার মুখ কৃতার্থতার হাসিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আজ বিদায় নেবার সময় দিনেশকে একটা ছোট সলজ্জ আদাব জানিয়ে গেল। পথে নেমে চামড়ার ঝোলা থেকে বার করলো একটা নাসপাতি। গুন গুন করে চাপা গলায় গান ধরে, নাসপাতি খেতে খেতে তেঁতুলিয়া মাঠের পথে হেলেদুলে চলে গেল।

টাকা চাই। কন্যাপণ। এই পরম নির্বন্ধের জন্যই দিনেশের নির্বাসিত যৌবন অপেক্ষায় বসে ছিল শুধু। বরপণের দেশে তাইতো সে পুরুষের মর্যাদা পায়নি।

ভালই হয়েছে। বীর্যশুল্কা যাযাবরীর চিত্তজয়ের আমন্ত্রণ এসেছে তারই কাছে। মধ্যযুগের ক্ষত্রপ প্রেমিকের মতো আত্মপ্রসাদে দিনেশ যেন অস্থির হয়ে ওঠে।

বিলাসী এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। সেদিনের আচরণের কথা স্মরণ করে দিনেশ অনুতপ্ত।

'—আয় বিলাসী, তোকে ছাড়া কাজ চলবে না আমার। একটা শক্ত কাজ আছে।'

এই আহ্বানের জন্যই বিলাসীর অন্তরাত্মা উদগ্রীব হয়ে থাকে। অনেকদিন আগেই এ আহ্বান শোনার দাবী ছিল তার। যার সঙ্গে ছায়া হয়ে মিশে থাকতে চায় সে, তারই কাছে। আর কারও কাছে নয়। যার হাত ধরার জন্য রোজগার, কুলমান, কুটীরসুখ, ও আলো-বাতাসের মায়া ছেড়ে নেমে এসেছে এই অতলতার অমারাজ্যে, যেখান মরণ ও মিলন মিশে আছে একাকার হয়ে।

যে সিঁড়ির কাছে সেদিন বিলাসীকে থামিয়ে দিয়েছিল দিনেশ, সেখান থেকেই আজ আবার শুরু হলো যাত্রা। কোথায় কোন্ লক্ষ্যে, বিলাসী তা জানে না। তার জানবার প্রয়োজন নেই।

দিনেশের প্ল্যান ঠিক ছিল। বেলচা, শাবল, গুললা টোপি আর রেড়ির তেলের পিদিম নিয়ে তারা অগ্রসর হলো।

ছোট বড় নানা সুঁদের বাঁক ঘুরে ঘুরে একটা ছোট খাদের কাছে এসে দিনেশ ও বিলাসী দাঁড়ালো। টর্চের আলো ফেলে ধীরে ধীরে চারদিকে দেখে নিল। বিলাসীর বেলচা দিয়ে দিনেশ ক'বার আঘাত দিতেই একটা ফাটল ধরা পাথরের চাপ খসে পড়লো ঝুপ করে।

উৎকট উল্লাসে দিনেশ চেঁচিয়ে উঠলো—'দেখছিস বিলাসী?'

—'হ্যাঁ'

বিলাসী দিনেশের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। ওর চোখের তারা দুটো তারই দিকে স্থির নিবদ্ধ, লুব্ধক জ্যোতি জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

'—এই দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। খুব সাবধান বিলাসী। কেউ যেন না জানে। মাত্র তিনটে বিঁধে খসে পড়বে হাজার টাকার মাল। পশ্চিমের চানক দিয়ে তুই মাল পার করে দিবি। ওপরের জঙ্গলে খদ্দের দাঁড়িয়ে থাকবে। উপায় নেই বিলাসী, করতেই হবে, আমার টাকা দরকার।'

সারি সারি গোরিয়া পাথর যেন ভরসার স্তরের মতো এখানে এসে পৌঁছেছে। দেখা যাচ্ছে কাজরা পাথরের চাপ—তিল-চিহ্নখচিত সুলক্ষণা গোরী ললনার গালের মতো। তারপর এই যোগিনিয়া পাথরের তিলকূট—রাঙা পাষাণীর কটাক্ষে রত্নলোকের ইসারা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে।'—এই নে গুললা টোপি। বিঁধে ফেল্ বিলাসী।' দিনেশ পকেট থেকে জেলেকনাইটের মোড়কটা নামালো।

শাবল দিয়ে একটা জায়গা বিঁধে আওয়াজ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ফিউজের বাতিটা ধীরে ধীরে পুড়ে ক্ষয় হচ্ছে। একটা ভূমিকম্পের বীজ যেন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে

মহাপরিণামের দিকে।

দিনেশ ডাকলো, 'আমার কাছে সরে আয় বিলাসী। এবার আওয়াজ হবে।'

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আর্ত প্রস্তরপুঞ্জের শিহর আর ধোঁয়ার উৎপাত থামলো। দশটা মিনিট দিনেশ আর বিলাসীর কাটলো মুহ্যমান অবস্থায়। দিনেশ উঠে দাঁড়াতেই তার হাতটায় টান পড়লো। বিলাসী ধরে আছে।

আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে নিয়ে দিনেশ বিঁধের দিকে তাকালো--দুই চোখে তীব্র ঔৎসুক্যের জ্বালা। দিনেশের গলা থেকে আর একটা উন্মাদ আনন্দের বিস্ফোরণ ফেটে পড়লো। 'ঐ দেখ্ বিলাসী।'

কাজরা পাথরের একটা চাপ খুলে গিয়ে অভ্রের টিকরি ঝক্ ঝক্ করছে--প্রাক্ পুরাণিক কোন কুবেরের রত্নীভূত পাঁজর সাজানো রয়েছে স্তরে স্তরে।

'—চললাম বিলাসী। আজ সন্ধ্যেয় চানকের মুখে খদ্দের দাঁড়িয়ে থাকবে। তুই অন্তত দুটো বোঝা পার করে দিস। আমি বন্দোবস্ত করতে চললাম।'

বিলাসী দাঁড়িয়ে রইলো নির্বোধের মতো। দিনেশ সত্যিই চলে যায় দেখে ডাকলো, 'বাবু!'

'—কি? না আর দেরি করিসনি।'

'—ও চানক পার হব কি করে বাবু!'

'—খুব পরিষ্কার রাস্তা। খাড়া উঠে যাবি।'

দিনেশের টর্চের আলো সুঁদের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'—ও চানকে গ্যাস আছে বাবু।' কিন্তু বিলাসীর এই আর্তস্বরের আবেদন দিনেশের কানে পৌঁছল না।

টাকার তোড়াটা তোরঙ্গে রেখে দিনেশ ঘরের বাইরে একবার পায়চারি করে গেল। তেঁতুলিয়া মাঠে ঢোলকের বাজনা মেতে উঠেছে। লণ্ঠনগুলোতে ঝড়ের আঁচ লেগে দপ দপ করছে, যেন কতগুলি আগুনের কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছ।

বিলাসী গ্যাস লেগে জখম হয়েছে খুব। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। হয়তো এই শেষ, আর চোখ মেলে তাকাবে না বিলাসী। এ খবর শুনেছে দিনেশ, খুব সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। এটা যেন অবধারিত সত্য ছিল।

দুঃখ পেয়ে গেল বিলাসী নিজের দোষে। ওর অন্ত্যজ অনুরাগের মধ্যে যেন একটা সহমরণের তৃষ্ণা লুকিয়ে ছিল। বিংশ শতাব্দীর রুচিমান দিনেশ চৌধুরী অত নীচে নামতে পারে না। নিশ্চিহ্ন হতে পারে না। বিলাসীর জন্যে দুঃখ হয়, অন্য সময় হলে বোধ হয় কান্নাও আসতো।

কিন্তু সব দুঃখ ছাপিয়ে নেশার মতো একটা সুখাবেশ স্নায়ুজালে জড়িয়ে ধরেছে আজ। বাহিরের মৃদুঝড়ে বাসক রাত্রি উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সারার আসবার সময় হলো। মুক্তির মুহূর্ত আসছে এগিয়ে। প্রতি দণ্ড পল অনুপল গুণছে দিনেশ।

খুটখাট শব্দ। চোর এসেছে। ঘস্ ঘস্ ঘাঘরার শব্দ। চুণীর মালাটা বেজে উঠছে ঘুমন্ত পাখীর কলালাপের মতো। দিনেশের কায় মন প্রাণ সার্থক হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিছানার ওপর নিস্পন্দ হয়ে বসে তাকিয়ে রইল দরজার দিকে--নিষ্পলক চোখে।

চোরের আবছায়া মূর্তিটা ঘরে ঢুকলো—মার্জারীর মতো পদশব্দহীন। তোরঙ্গের ডালাটা কঁকিয়ে উঠলো একবার। কচ্‌কচ্ করে উঠলো টাকার তোড়াটা। দিনেশ চোখ দুটো একবার রগড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে অনেকগুলি সাপের শিষের সংকেত তীব্র শব্দের শিহর তুলে বেজে উঠলো একসঙ্গে। চোরের আবছায়া মিলিয়ে গেল ধোঁয়া হয়ে।

বহুরূপী

হরিদার কাছে আমরাই গল্প করে বললাম, শুনেছেন, হরিদা, কী কাণ্ড হয়েছে?

উনানের মুখে ফুঁ দিয়ে আর অনেক ধোঁয়া উড়িয়ে নিয়ে হরিদা এইবার আমাদের কথার জবাব দিলেন--না, কিছুই শুনিনি।

--জগদীশবাবু যে কী কাণ্ড করেছেন, শোনেনি হরিদা?

হরিদা--না রে ভাই, বড় মানুষের কাণ্ডের খবর আমি কেমন করে শুনবো? আমাকে বলবেই বা কে?

--সাতদিন হল এক সন্ন্যাসী এসে জগদীশবাবুর বাড়িতে ছিলেন। খুব উঁচু দরের সন্ন্যাসী। হিমালয়ের গুহাতে থাকেন। সারা বছরে শুধু একটি হরীতকী খান ; এ ছাড়া আর কিছুই খান না। সন্ন্যাসীর বয়সও হাজার বছরের বেশি বলে অনেকেই মনে করেন।

হরিদা--সন্ন্যাসী কি এখনও আছেন?

--না, চলে গিয়েছেন।

আক্ষেপ করেন হরিদা--থাকলে একবার গিয়ে পায়ের ধুলো নিতাম।

--তা পেতেন না হরিদা। সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস। শুধু ওই একা জগদীশবাবু ছাড়া আর কাউকে পায়ের ধুলো নিতে দেননি সন্ন্যাসী।

হরিদা--কেন?

--জগদীশবাবু একজোড়া কাঠের খড়মে সোনার বোল লাগিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে ধরলেন। তখন বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসী পা এগিয়ে দিলেন, নতুন খড়ম পরলেন আর সেই ফাঁকে জগদীশবাবু পায়ের ধুলো নিয়েছিলেন।

হরিদা--বাঃ, এ তো বেশ মজার ব্যাপার!

--হ্যাঁ, তা ছাড়া সন্ন্যাসীকে বিদায় দেবার সময় জগদীশবাবু এক'শো টাকার একটা নোট জোর করে সন্ন্যাসীর ঝোলার ভেতরে ফেলে দিলেন। সন্ন্যাসী হাসলেন আর চলে গেলেন।

গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমরা কী বলছি বা না বলছি, সেদিকে হরিদার কোন কান নেই।

হরিদার উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। আমাদের চায়ের জন্য এক হাঁড়ি ফুটন্ত জল নামিয়ে দিয়েই হরিদা তাঁর ভাতের হাঁড়িটাকে উনানে চড়ালেন।

শহরের সবচেয়ে সরু এই গলিটার ভিতরে এই ছোট্ট ঘরটাই হরিদার জীবনের ঘর ; আর আমাদের চারজনের সকাল-সন্ধ্যার আড্ডার ঘর। চা চিনি আর দুধ আমরাই নিয়ে আসি। হরিদা শুধু তাঁর উনানের আগুনের আঁচে জল ফুটিয়ে দেন।

খুবই গরীব মানুষ হরিদা। কিন্তু কাজ করতে হরিদার প্রাণের মধ্যেই যেন একটা বাধা আছে। ইচ্ছে করলে কোন অফিসের কাজ, কিংবা কোন দোকানের বিক্রীওয়ালার কাজ পেয়ে যেতে পারেন হরিদা ; কিন্তু ওই ধরনের কাজ হরিদার জীবনের পছন্দই নয়। একেবারে ঘড়ির কাটার সামনে সময় বেঁধে দিয়ে আর নিয়ম করে নিয়ে রোজই একটা চাকরির কাজ করে যাওয়া হরিদার পক্ষে সম্ভব নয়। হরিদার উনানের হাঁড়িতে অনেক সময় শুধু জল ফোটে ভাত ফোটে না। এই একঘেয়ে অভাবটাকে সহ্য করতে হরিদার আপত্তি নেই, কিন্তু একঘেঁয়ে কাজ করতে ভয়ানক আপত্তি।

হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে। আর, সেটাই যে হরিদার জীবনের পেশা। হরিদার মাঝে-মাঝে বহুরূপী সেজে যেটুকু রোজগার করেন, তাতেই তাঁর ভাতের হাঁড়ির দাবি মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে সত্যিই উপোস করেন হরিদা। তারপর

একদিন হঠাৎ আবার এক সকালে কিংবা সন্ধ্যায় বিচিত্র ছদ্মবেশে অপরূপ হয়ে পথে বের হয়ে পড়েন। কেউ চিনতে পারে না। যারা চিনতে পারে এক-আনা দু-আনা বকশিশ দেয়। যারা চিনতে পারে না, তারা হয় কিছুই দেয় না, কিংবা বিরক্ত হয়ে দুটো-একটা পয়সা দিয়ে দেয়।

একদিন চকের বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে ঠিক দুপুরবেলাতে একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল। একটা উন্মাদ পাগল ; তার মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ছে, চোখ দুটো কটকটে লাল। তার কোমরে একটা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো, গলায় টিনের কৌটার একটা মালা। পাগলটা একটা থান ইট হাতে তুলে নিয়ে বাসের উপরে বসা যাত্রীদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠছে যাত্রীরা, দুটো একটা পয়সা ফেলেও দিচ্ছে।

একটু পরেই বাসের ড্রাইভার কাশীনাথ ধমক দেয়।--খুব হয়েছে হরি, এই বার সরে পড়। অন্যদিকে যাও।

অ্যাঁ? ওটা কি একটা বহুরূপী? বাসের যাত্রীরা কেউ হাসে, কেউ বা বেশ বিরক্ত হয় ; কেউ আবার বেশ বিস্মিত। সত্যিই, খুব চমৎকার পাগল সাজতে পেরেছে তো লোকটা।

হরিদার জীবন এইরকম বহু রূপের খেলা দেখিয়েই একরকম চলে যাচ্ছে। এই শহরের জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করেন বহুরূপী হরিদা। সন্ধ্যার আলো সবেমাত্র জ্বলেছে, দোকানে দোকানে লোকজনের ব্যস্ততা আর মুখরতাও জমে উঠেছে। হঠাৎ পথের উপর দিয়ে ঘুঙুরের মিষ্টি শব্দ রুমঝুম করে বেজে-বেজে চলে যেতে থাকে। এক রূপসী বাঈজী প্রায় নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। শহরে যারা নতুন এসেছে, তারা দুই চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু দোকানদার হেসে ফেলে--হরির কাণ্ড!

অ্যাঁ? এটা একটা বহুরূপী নাকি? কারও কারও মুগ্ধ চোখের মোহভঙ্গ হয়, আর যেন বেশ একটু হতাশস্বরে প্রশ্ন করে ওঠে।

বাঈজীর ছদ্মবেশে সেদিন হরিদার রোজগার মন্দ হয়নি। মোট আট টাকা দশ আনা পেয়েছিলেন। আমরাও দেখেছিলাম, এক-একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই রূপসী বাঈজী, মুচকি হেসে আর চোখ টিপে একটা ফুলসাজি এগিয়ে দিচ্ছে। দোকানদারও হেসে ফেলে আর একটা সিকি তুলে নিয়ে বাঈজীর হাতের ফুলসাজির উপর ফেলে দেয়।

কোনদিন বাউল, কোনদিন কাপালিক। কখনও বোঁচকা কাঁধে বুড়ো কাবুলীওয়ালা, কখনও হ্যাট-কোট-পেন্টলুন-পরা ফিরিঙ্গি কেরামিন সাহেব। একবার পুলিস সেজে দয়ালবাবুর লিচু বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়েছিলেন হরিদা ; স্কুলের চারটে ছেলেকে ধরেছিলেন। ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল ছেলেগুলো ; আর স্কুলের মাস্টার এসে সেই নকল পুলিসের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন--এবারের মতো মাপ করে দিন ওদের। কিন্তু আটআনা ঘুষ নিয়ে তারপর মাস্টারের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সেই নকল-পুলিস হরিদা।

পরদিন অবশ্য স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের জানতে বাকি থাকেনি, কাকে তিনি আটআনা ঘুষ দিয়েছেন। কিন্তু মাস্টারমশাই একটুও রাগ করেননি। বরং একটু তারিফই করলেন--বা, সত্যি, খুব চমৎকার পুলিস সেজেছিল হরি!

আজ এখন কিন্তু আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, হরিদা এত গম্ভীর হয়ে কী ভাবছেন। সন্ন্যাসীর গল্পটা শুনে কী হরিদার মাথার মধ্যে নতুন কোন মতলব ছটফট করে উঠেছে?

ঠিকই, আমাদের সন্দেহ মিথ্যে নয়। হরিদা বললেন--আজ তোমাদের একটা জবর খেলা দেখাবো।

--আমাদের দেখিয়ে আপনার লাভ কি হরিদা? আমাদের কাছ থেকে একটা সিগারেটের চেয়ে বেশি কিছু তো পাবেন না।

হরিদা--না, ঠিক তোমাদের দেখাবো না। আমি বলছি তোমরা সেখানে থেকো। তাহলে

দেখতে পাবে...।

--কোথায়?

হরিদা--আজ সন্ধ্যায় জগদীশবাবুর বাড়িতে।

--হঠাৎ জগদীশবাবুর বাড়িতে খেলা দেখাবার জন্যে আপনার এত উৎসাহ জেগে উঠলো কেন?

হরিদা হাসেন--মোটা মতন কিছু আদায় করে নেব। বুঝতেই তো পারছো, পুরো দিনটা রূপ ধরে ঘুরে বেড়িয়েও দু-তিন টাকার বেশি হয় না। একবার বাঈজী সেজে অবিশ্যি কিছু বেশি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ওতেই বা কি হবে?

ঠিকই বলেছেন হরিদা। সপ্তাহে বড়জোর একটা দিন বহুরূপী সেজে পথে বের হন হরিদা। কিন্তু তাতে সাতদিনের পেট চলবার মতো রোজগার হয় না।

হরিদা বলেন--নাঃ, এবার আর কাঙালের মতো হাত পেতে বকশিস নেওয়া নয়। এবার মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার। একবারেই যা ঝেলে নেব তাতে আমার সারা বছর চলে যাবে।

কিন্তু সে কী করে সম্ভব? জগদীশবাবু ধনী মানুষ বটেন, কিন্তু বেশ কৃপণ মানুষ। হরিদাকে একটা যোগী সন্ন্যাসী কিংবা বৈরাগী সাজতে দেখে কত আর খুশি হবেন জগদীশবাবু? আর খুশি হলেই বা কত আনা বকশিস দেবেন। পাঁচ আনার বেশি তো নয়।

হরিদা বলেন--তোমরা যদি দেখতে চাও, তবে আজ ঠিক সন্ধ্যাতে জগদীশবাবুর বাড়িতে থেকো।

আমরা বললাম--থাকবো ; আমাদের স্পোর্টের চাঁদা নেবার জন্যে আজ ঠিক সন্ধ্যাতেই জগদীশবাবুর কাছে যাব!

২

বড় চমৎকার আজকের এই সন্ধ্যার চেহারা। আমাদের শহরের গায়ে কতদিন তো চাঁদের আলো পড়েছে, কিন্তু কোনদিন তো আজকের মতো এমন একটা স্নিগ্ধ ও শান্ত উজ্জ্বলতা কখনও চারদিকে এমন সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেনি।

ফুরফুর করে বাতাস বইছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বাগানের সব গাছের পাতাও ঝিরিঝিরি শব্দ করে কী যেন বলতে চাইছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বারান্দাতে মস্ত বড় একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোর কাছে একটা চেয়ারের উপর বসে আছেন জগদীশবাবু। সাদা মাথা, সাদা দাড়ি, সৌম্য শান্ত ও জ্ঞানী মানুষ জগদীশবাবু। আমরা আমাদের স্পোর্টের চাঁদার খাতাটিকে জগদীশবাবুর হাতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

চমকে উঠলেন জগদীশবাবু। বারান্দার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে জগদীশবাবুর দুই বিস্মিত চোখ অপলক হয়ে গেল।

আমরাও চমকে উঠেছি বইকি। আশ্চর্য হয়েছি, একটু ভয়ও পেয়েছি। কারণ, সত্যিই যে বিশ্বাস করতে পারছি না, সিঁড়ির কাছে এসে যে দাঁড়িয়েছে, সে কি সত্যিই হরিদা? ও চেহারা কি সত্যিই কোন বহুরূপীর হতে পারে?

জটাজূটধারী কোন সন্ন্যাসী নয়। হাতে কমণ্ডলু নেই, চিমটে নেই। মৃগচর্মের আসনও সঙ্গে নেই। গৈরিক সাজও নেই।

আদুড় গা, তার উপর একটি ধবধবে সাদা উত্তরীয়। পরনে ছোট বহরের একটি সাদা থান।

মাথায় ফুরফুর করে উড়ছে শুকনো সাদা চুল। ধুলো মাখা পা, হাতে একটা ঝোলা, সে ঝোলার ভিতরে শুধু একটা বই, গীতা। গীতা বের করে কি-যেন দেখলেন এই আগন্তুক। তারপর নিজের মনেই হাসলেন।

আগন্তুক এই মানুষটি যেন এই জগতের সীমার ওপার থেকে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছেন। শীর্ণ শরীরটাকে প্রায় অশরীরী একটা চেহারা বলে মনে হয়। কী অদ্ভুত উদাত্ত শান্ত ও উজ্জ্বল একটা দৃষ্টি এই আগন্তুকের চোখ থেকে ঝরে পড়ছে!

উঠে দাঁড়ালেন জগদীশবাবু--আসুন।

আগন্তুক হাসেন--আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়?

জগদীশবাবু কিছু ভেবে বলেন--কেন? কেন? আপনি একথা কেন বলছেন মহারাজ?

আমি মহারাজ নই, আমি এই সৃষ্টির মধ্যে এককণা ধূলি।--কিন্তু আপনি বোধহয় এগার লক্ষ টাকার সম্পত্তির অহংকারে নিজেকে ভগবানের চেয়েও বড় বলে মনে করেন। তাই ওখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, নেমে আসতে পারছেন না।

সেই মুহূর্তে সিঁড়ি ধরে নেমে যান জগদীশবাবু।--আমার অপরাধ হয়েছে। আপনি রাগ করবেন না।

আগন্তুক আবার হাসেন--আমি বিরাগী, রাগ নামে কোন রিপু আমার নেই। ছিল একদিন, সেটা পূর্বজন্মের কথা।

জগদীশবাবু--বলুন, এখন আপনাকে কিভাবে সেবা করবো?

বিরাগী বলেন--ঠাণ্ডা জল চাই, আর কিছু চাই না।

ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে হাঁপ ছাড়েন বিরাগী। এদিকে ভবতোষ আমার কানের কাছে ফিসফিস করে।--না না, হরিদা নয়।' হতেই পারে না। অসম্ভব! হরিদার গলার স্বর এরকমেরই নয়।

বিরাগী বলেন--পরম সুখ কাকে বলে জানেন? সব সুখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া!

ভবতোষের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে অনাদি বলে--শুনছো তো? এসব ভাষা কি হরিদার মুখের ভাষা হতে পারে?

জগদীশবাবু ততক্ষণে সিঁড়ির উপরে বসে পড়েছেন। বোধহয় বিরাগীর পা স্পর্শ করবার জন্যে তাঁর হাত দুটো ছটফট করতে শুরু করেছে। জগদীশবাবু বলেন--আমার এখানে কয়েকটা দিন থাকুন বিরাগীজী। আপনার কাছে এটা আমার প্রাণের অনুরোধ। দুই হাত জোড় করে বিরাগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জগদীশবাবু।

বিরাগী হাসেন--বাইরে খোলা আকাশ থাকতে আর ধরিত্রীর মাটিতে স্থান থাকতে, আমি এক বিষয়ীর দালান বাড়ির ঘরে থাকবো কেন, বলতে পারেন?

--বিরাগীজী! জগদীশবাবুর গলার স্বরের আবেদন করুণ হয়ে ছলছল করে।

বিরাগী বলেন--না, আপনার এখানে জল খেয়েছি, এই যথেষ্ট। পরমাত্মা আপনার কল্যাণ করুন। কিন্তু আপনার এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জগদীশবাবু--তবে অন্তত একটু কিছু আজ্ঞা করুন, যদি আপনাকে কোন...।

বিরাগী--না না, আমি যার কাছে পড়ে আছি, তিনি আপনার চেয়ে কিছু কম নয়। কাজেই আপনার কাছে আমার তো কিছু চাইবার দরকার হয় না।

জগদীশবাবু--তবে কিছু উপদেশ শুনিয়ে যান বিরাগীজী, নইলে আমি শান্তি পাবো না।

বিরাগী--ধন জন যৌবন কিছুই নয় জগদীশবাবু। ওসব হলো সুন্দর সুন্দর এক-একটি বঞ্চনা। মন-প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শুধু সেই একজনের আপন হতে চেষ্টা করুন, যাঁকে পেলে এই সৃষ্টির সব ঐশ্বর্য পাওয়া হয়ে যায়।...আচ্ছা আমি চলি।

জগদীশবাবু বলেন--আপনি একটা মিনিট থাকুন বিরাগীজী।

সিঁড়ির উপরে অচঞ্চল হয়ে একটা মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন বিরাগী। আজকের চাঁদের আলোর চেয়েও স্নিগ্ধ হয়ে অদ্ভুত এক জ্যোৎস্না যেন বিরাগীর চোখ থেকে ঝরে পড়ছে। ভবতোষ ফিসফিস করে--না না, ওই চোখ কী হরিদার চোখ হতে পারে? অসম্ভব!

জগদীশবাবুর হাতে একটা থলি। থলির ভিতরে নোটের তাড়া। বিরাগীর পায়ের কাছে থলিটাকে রেখে দিয়ে ব্যাকুল স্বরে প্রার্থনা করেন জগদীশবাবু--এই প্রণামী, এই সামান্য একশো এক টাকা গ্রহণ করে আমাকে শান্তি দান করুন বিরাগীজী। আপনার তীর্থ ভ্রমণের জন্য এই টাকা আমি দিলাম।

বিবাগী হাসেন--আমার বুকের ভিতরেই যে সব তীর্থ। ভ্রমণ করে দেখবার তো কোন দরকার হয় না।

জগদীশবাবু--আমার অনুরোধ বিরাগীজী...।

বিরাগী বলেন--আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মাড়িয়ে চলে যেতে পারি, তেমনই অনায়াসে সোনাও মাড়িয়ে চলে যেতে পারি।

বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন বিরাগী। একশো এক টাকার থলিটা সিঁড়ির উপরেই পড়ে রইল। সেদিকে ভুলেও একবার তাকালেন না বিরাগী।

৩

--কি করছেন হরিদা? কি হলো? কই? আজ যে বলেছিলেন জবর খেলা দেখাবেন, সে-কথা কি ভুলেই গেলেন। আজকের সন্ধ্যাটা ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলেন কেন?

বলতে বলতে আমরা সবাই হরিদার ঘরের ভিতরে ঢুকলাম।

হরিদার উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। উনানের উপর হাঁড়িতে চাল ফুটছে। আর, একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হরিদা চুপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই লজ্জিতভাবে হাসলেন।

--কি আশ্চর্য! চমকে ওঠে ভবতোষ।--হরিদা, আপনি তাহলে সত্যিই বের হয়েছিলেন! আপনিই বিরাগী?

হরিদা হাসেন--হ্যাঁ রে ভাই।

ওই তো সেই সাদা উত্তরীয়টা পড়ে রয়েছে মাদুরের উপর, আর সেই ঝোলাটা আর সেই গীতা।

অনাদি বলে--এটা কি কাণ্ড করলেন, হরিদা? জগদীশবাবু তো পাঁচশো টাকা সাধলেন, অথচ আপনি একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মতো সব তুচ্ছ করে সরে পড়লেন?

হরিদা--কি করবো বল? ইচ্ছেই হলো না। শত হোক্...।

ভবতোষ--কি?

হরিদা--শত হোক্, একজন বিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে টাকা-ফাকা কি করে স্পর্শ করি বল? তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।

কী অদ্ভুত কথা বললেন হরিদা! হরিদার একথার সঙ্গে তর্ক চলে না। আর, বুঝতে অসুবিধে নেই, হরিদার জীবনের ভাতের হাঁড়ি মাঝে মাঝে শুধু জল ফুটিয়েই সারা হবে। অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।

অনাদি বলে--কিন্তু আপনি কি জগদীশবাবুর কাছে গিয়ে আর কখনও...।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন হরিদা--যাবই তো। না গিয়ে উপায় কি? গিয়ে অন্তত বকশিশটা তো দাবি করতে হবে?

--বকশিশ? চেঁচিয়ে ওঠে ভবতোষ। সেটা তো বড়জোর আট আনা কিংবা দশ আনা।

হরিদা বিড়ি মুখে দিয়ে লজ্জিতভাবে হাসেন--কি আর করা যাবে বলো? খাঁটি মানুষ তো নয়, এই বহুরূপীর জীবন এর চেয়ে বেশি কি আশা করতে পারে?

গুহামানব

শতাব্দীর সভ্য জীবনের এই রাজপথের এক প্রান্তে, তার মানে, দমদম এয়ারপোর্টের এলাকা ছাড়িয়ে ওদিকে মাত্র আধমাইল এগিয়ে যেতে হবে, যশোর রোডের একপাশে, যে জায়গাটার নাম রায়বাগান, যেখানে মস্ত বড় এক শীট মেটাল কারখানার টিনের শেড রূপোলী পেন্টের প্রলেপ নিয়ে ঝকঝক করে সেখানে একজন আদিমকালীন গুহামানবের ঘর দেখতে পাওয়া যায়। একথা চেঁচিয়ে বললেও অনেকে নিশ্চয় বিশ্বাস করবে না। কিন্তু রায়বাগানের অনেকেই বিশ্বাস করে। ওই মেটাল কারখানার স্টোরের সেকেণ্ড ক্লার্ক শ্রীকালীপদ দত্তের বাড়িটাকেই বলা হয়—একটা গুহামানবের বাড়ি। হেসে হেসে নয়, ঠাট্টা করেও নয়, খুবই রাগ করে আর উত্তেজিতভাবে কথাটা রায়বাগানের অনেক ভদ্রলোকের মুখে কঠোর ধিক্কারের জ্বালা হয়ে বেজে ওঠে। কথাটা সবার আগে বলেছিল, হর্ষবাবুর বড়ছেলে সেই শিশির, যে আজ দু'বছর হলো এম-এ পাস করবার পর সমাজবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছে।

কে জানে, সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার শিশির রায়বাগানের এই কালীপদ দত্তকে কেন গুহামানব বলে মনে করেছিল? রায়বাগানের ভদ্রলোকেরা কিন্তু ধরেই নিয়েছেন যে, আদিমকালের সেই গুহামানব নিশ্চয় এই কালীপদ দত্তের মতো মানুষ ছিল। বাইরের জীবনের চেহারাটা মানুষ-মানুষ কিন্তু ভিতরের জীবনটা পশু-পশু। ঘরের বাইরে কালীপদ দত্তকে দেখলে মেটাল কারখানার স্টোরের সেকেণ্ড ক্লার্ক বলেই মনে হবে, যদিও খুব কম কথা বলেন, এদিক-ওদিক কোন দিকে চোখ তুলে তাকাতেই চান না ; আর কাজের ছুটি হলে হাতের ছাতাটিকে খুলে মুখটাকে লোকের চোখের দৃষ্টি থেকে প্রায় আড়াল করে রেখে ও ব্যস্তভাবে পা চালিয়ে চলে যান।

রায়বাগানের এপাড়া আর ওপাড়ার জীবনে মাঝে মাঝে উৎসবের মতো ঘটনা দেখা দিয়ে থাকে। মেয়ের বিয়ে, ছেলের বউভাত, অন্নপ্রাশন আর শ্রাদ্ধ। কিন্তু এসব সামাজিক উৎসব আর অনুষ্ঠানে কালীপদ দত্তের নিমন্ত্রণ থাকে না। পাড়ার হয়েও কালী দত্ত সত্যিই একটি ভয়াবহ অস্তিত্ব। প্রায় সকলেই মনেপ্রাণে কামনা করে, কালী দত্ত এই রায়বাগান ছেড়ে পৃথিবীর অন্য কোথাও, কিংবা যে-কোন রসাতলে চলে যাক।

পাড়ার মধ্যে নয়, পাড়ার একদিকে, একটু তফাতে, বেশ ময়লা আর দীনহীন চেহারার ছোট্ট একটা বাড়ি যেন গাছের ছায়ার আড়ালে মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে। এটাই কালীপদ দত্তের বাড়ি। এ বাড়ির সব জানালা সব সময় বন্ধ থাকে। এ বাড়ির সামনের দরজার কপাট কখনও একটুও ফাঁক হয় না! সন্ধ্যায় কিংবা রাতে এ বাড়ির কাছে দাঁড়িয়েও কেউ বুঝতে পারবে না যে, ভিতরে কোন আলো জ্বলছে কিনা। কান পেতে থাকলেও এ বাড়ির ভিতরের কোন শব্দ শোনা যাবে না। যেন মূক ও বধির জীবনের একটা গুহা।

কিন্তু সকলেই জানে, এহেন গুহাঘরের মধ্যে কালী দত্ত একা থাকেন না। কালী দত্তের স্ত্রীও থাকেন। রায়বাগানের এপাড়া আর ওপাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ পিছনের দুয়ার দিয়ে হঠাৎ এবাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে বলেই জানতে পারা যায়, একা নন কালী দত্ত, কালী দত্তের স্ত্রীও আছেন। আর জানতে পারা যায় সেদিন, মেটাল কারখানার চাপরাশি সনাতন এসে হঠাৎ হরিসাধনবাবুর বাড়ির বারান্দায় উঠে যেদিন চেঁচিয়ে ওঠে—কালীবাবুর স্ত্রী মারা গেছেন।

অগত্যা হরিসাধনবাবুকে একটু বিচলিত আর ব্যস্ত হতেই হয়। পাড়ার মহিলারা খবর শুনে চমকে ওঠেন। পরিতোষ রাগ করে চেঁচিয়ে ওঠে—লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। ক্ষোভ ধিক্কার আতঙ্ক ও আক্ষেপের এই শোরগোলের মধ্যেই পাড়ার কয়েকজন ছেলে

কোমরে গামছা বেঁধে আর বাঁশের খাটিয়া নিয়ে কালী দত্তের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। সেদিন সেই সময় কালী দত্তের এই গুহা ঘরের সামনে দরজার কপাট কিছুক্ষণের মতো খোলা হয়ে পড়ে থাকে।

কেউ জানে না, কী হয়েছিল কালী দত্তের স্ত্রীর ; কারখানার অফিসেরও কেউ আগে শোনেনি, জানতেও পারেনি, কবে থেকে কিসের অসুখে ভুগছিলেন কালী দত্তের স্ত্রী। শুধু পরিতোষের রুক্ষ গলার স্বর যখন প্রায় ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তখন আস্তে আস্তে বিড়-বিড় করে জবাব দেন কালী দত্ত, জ্বর হয়েছিল, প্রায় একমাসের জ্বর, নাগের বাজারের কবরেজের কাছ থেকে ওষুধ আনা হয়েছিল। মাঝে দু'দিন শ্যামবাজারের ডাক্তার বসুও এসে দেখে গিয়েছিলেন, ত্রিশটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। কিন্তু...।

আর কথা বলেন না কালী দত্ত। কালী দত্তের কৈফিয়তের কথাগুলিকে এরা কেউই বিশ্বাস করেন না। মিথ্যে কথা। শ্যামবাজারের ডাক্তার বসুর মতো এত বড় ডাক্তার রায়বাগানের এপাড়াতে এসে থাকলে সে-ঘটনা কি কারও অদেখা হয়ে থাকতে পারতো?

কালী দত্তের শুকনো খটখটে চোখে একবিন্দুও সজলতা নেই। খাটের বিছানার উপর এক নিষ্প্রাণ নারীর স্তব্ধ শরীর চাদর ঢাকা হয়ে পড়ে আছে ; শুধু মুখের উপর কোন ঢাকা নেই। তাই দেখতে পাওয়া যায়, কেউ যেন বেশ যত্ন করে আর পরিপাটি করে সেই নারীর এলোমেলো চুলের গুচ্ছগুলিকে খোঁপা করে বেঁধে দিয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুরও আছে, টাটকা সিঁদুর বলেই তো মনে হয়। আর কী আশ্চর্য, পায়েও টাটকা আলতার দাগ।

শুনতে পাওয়া যায়, রুগ্ণ বিড়ালের মতো করুণ মিউ মিউ স্বরে কথা বলে বলে কে যেন কাঁদছে। কে? কে আপনি? পাশের ঘরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে পরিতোষ। কিন্তু তখুনি চিনে ফেলতেও পারে, কাঁদছে ভানুর মা, সেই প্রায়-অন্ধ বুড়িটা, মাঝে মাঝে পাড়ার এবাড়ি সেবাড়ি ঘুরে ঝি-এর কাজ খোঁজ করে যে বুড়ি।

ভানুর মা কাঁদে—গীতাদিদি গো, তুমি এমন করে চলে গেলে কেন গো।

পরিতোষ বলে—থামো, ভানুর মা। তোমার গীতাদিদিকে সাজিয়ে দেবার কাজ আরও কিছু বাকি আছে নাকি?

ভানুর মা বলে—তোমরা বুঝে নাও গো বাবা! আমি যে অন্ধ মানুষ বাবা, আমি আর কত করবো বলো?

কোমরে গামছা-বাঁধা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে পরিতোষ বলে—ওঠাও, আর দেরি করার কোন মানে হয় না।

কালী দত্ত এগিয়ে আসেন। গায়ের কামিজের পকেট থেকে কৌটা বের করে এক টিপ নস্যি তুলে নেন। নস্যির টিপ নাকে গুঁজে দিয়ে কত জোরে দুটো টান দিলেন কালী দত্ত। কড়া নস্যির ঝাঁঝালো গন্ধে ঘরের বাতাস যেন শিউরে উঠেছে। কিন্তু এমন কড়া নস্যির ঝাঁঝে কালী দত্তের চোখ ছলছল করে না। শবযাত্রার এই ছোট্ট মিছিলের পিছনে যেন নির্লিপ্ত এক পথচারীর মতো চুপ করে চলতে থাকেন কালী দত্ত।

আজ জানতে পারা গেল, কালী দত্তের এই স্ত্রীর নাম গীতা। এর আগে এই এগার বছরের মধ্যে রায়বাগানের ছেলেরা কালী দত্তের এই গুহাঘর থেকে একজন নীহারকণা, একজন শান্তিলতা, আর একজন পারুলবালাকে মোট তিনবার তিনজনকে খাটের উপর থেকে তুলে নিয়ে শ্মশানে পৌঁছে দিয়ে এসেছে! গীতা হলো কালী দত্তের স্ত্রীদের মধ্যে চতুর্থী ; ঠিক গীতারই মতো কালী দত্তের ওই তিন স্ত্রীর নামও কেউ আগে শুনতে বা জানতে পারে নি। জানতে পারা গিয়েছে ঠিক এইভাবে, হঠাৎ যেদিন খবর পাওয়া গেল যে, কালীদত্তের বউ মরেছে, আর শচীন ডাক্তারের কাছ থেকে মৃত্যুর সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে!

হরিসাধনবাবুর স্ত্রী ঠিক কথাই বলেন—এ পোড়া বাংলা দেশে পান চুন থেকে শুরু করে

চোদ্দ ক্যারেট সোনা পর্যন্ত সবই মাগগি, শুধু মেয়ে সস্তা। তা না হলে কালী দত্তের মতো মানুষও পটপট করে যখন খুশি তখন বিয়ে করতে পারবে কেন?

রতনবাবুর স্ত্রী বলেন--পাঁটিবেচা বাপেরও মনে দরদ আছে। যার-তার হাতে মেয়েকে সঁপে দেয় না। কিন্তু ভেবে দেখুন দেখি, গীতা নামে এই মেয়েটার বাপ কত বড় হতচ্ছাড়া পাষাণ বাপ!

দোজবরে তেজবরেও নয়, একেবারে চারবরে একটা মানুষ, বয়স তো নিশ্চয় পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে, আর রোজগার তো ওই সামান্য একটা কেরানীগিরি মাত্র দেড়শটি টঙ্কা! এহেন কালী দত্ত এই তিন বছর আগে একমাসের ছুটি নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল আর বিয়ে করে ফিরে এল। গীতার পাষাণ বাপ বোধহয় সেদিন একটু খোঁজ করে দেখবারও দরকার মনে করেনি যে, মেয়েটাকে সত্যিই কোন অভিশাপের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো কিনা।

কালী দত্তের স্বভাবের নিয়মটাও রায়বাগানের সবাই বুঝে নিয়েছেন। প্রত্যেক বারই দেখা গেল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর কয়েকটা মাস সত্যিই একলা থাকেন কালী দত্ত। কিন্তু বড়জোর ছ'মাস বা সাতমাস। তারপরেই একমাসের ছুটি নেন। রায়বাগানের মানুষের মন সন্দেহ আর আতঙ্কে ভরে যায়, আবার বুঝি বিয়ে করবেন কালী দত্ত। কিন্তু মিথ্যে সন্দেহ নয়, মিথ্যে আতঙ্কও নয়। ছুটির এক মাস রায়বাগান থেকে অদৃশ্য হয়ে তারপর একেবারে সস্ত্রীক হয়ে রায়বাগানে ফিরে আসেন।

পাড়ার মহিলারা কালী দত্তের নতুন বউকে দেখবার জন্যে আর একটুও উৎসাহিত হন না।

যেমন নীহারকণা, তেমনি শান্তিলতাও পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করতে বা পরিচিত হতে চায়নি। একদিন আরতির মা সাহস করে কালী দত্তের বাড়ির খিড়কির দুয়ারের কড়া নেড়েছিলেন। কিন্তু খিড়কির দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে শুধু একটা কথা বলেছিল নীহারকণা—অনেক বেলা হয়েছে। শান্তিলতাও অনুরূপ বলেছিল--সন্ধে তো হয়ে এল!

নীহারকণা মারা গেল, শান্তিলতাও মারা গেল তারপর ; একমাসের ছুটির মধ্যে কবে নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে, তার মানে পারুলবালাকে সঙ্গে নিয়ে কালী দত্ত তাঁর এই বাসাবাড়ির খিড়কির দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালেন, সেটাও কেউ জানতে পারেনি। কানুর ঠাকুরমা শুধু একবার বলেছিলেন, কাল অনেক রাত্তিরে মনে হলো, একটা রিক্সা এসে কালী দত্তের বাড়ির খিড়কির দোরের কাছে দাঁড়িয়েছে।

তার মানে আর-একটা নারীর প্রাণবলির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। হিমাদ্রিবাবু আক্ষেপ করেন —ছি ছি। পরিতোষ রাগ করে—আমাদেরও দোষ আছে ; আমরা এসব সহ্য করছি বলেই লোকটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

হিমাদ্রিবাবু বলে—আমি ভাবছি কালী দত্তের বউগুলোই বা কেমন! ওরা কেন এরকম ভয়ানক একটা শাস্তির জীবন চুপ করে সহ্য করে?

এটাও একটা প্রশ্ন বটে। যদি সত্যিই কালী দত্তের কোন বউ একদিন ওই গুহাঘরের কঠিন শাসনের মাথায় বাড়ি দিয়ে, কিংবা চেঁচিয়ে কেঁদে ছুটে পালিয়ে এসে হরিসাধনবাবুর স্ত্রীর কাছে বলে দিত, রক্ষা করুন মাসীমা, এই কালীয় নাগের বিষের জ্বালা থেকে আমাকে বাঁচান, তবে রায়বাগানের ভদ্রলোকেরা আর ভদ্রমহিলারা একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে পারতেন।

একবার একটা ঝড়ের রাতে সত্যিই কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল। কালী দত্তের গুহাঘরের ভিতরে কেউ যেন গলার স্বর চেপে চেপে কাঁদছে। সে-সময় পারুলবালা ছিল কালী দত্তের স্ত্রী। পরিতোষ ও রতনবাবু সে-রাতে লাঠি আর লণ্ঠন হাতে নিয়ে বের হয়েই পড়েছিলেন। কালী দত্তের বাড়ির কাছেও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু হলো, না. কালী দত্তের ঘরের ভিতরে

কেউ তো কাঁদছে না। মেটাল কারখানার পাশে ফাঁপা বাঁশের একটা গাদার মধ্যে ঝড়ের বাতাসটা যেন কান্নার বাঁশির মতো কঁকিয়ে কঁকিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ ছাড়ছে।

কালী দত্ত কি তুকতাক জানে? তা না হলে কালী দত্তের এই গুহাঘরের এক একটি বন্দিনী নারীর দুঃখী প্রাণের অভিযোগ কেন শব্দ করে বেজে ওঠে না? এক বছর, দু'বছর বা তিন বছর, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন এক-আধমাসের জ্বরের জ্বালায় ধড়ফড়িয়ে মরে যেতে হবে, এই তো কালী দত্ত নামে অদ্ভুত লোকটার স্ত্রী হবার অবধারিত পরিণাম। সব জেনে-শুনেও কালী দত্তকে বিয়ে করতে রাজী হয়, কেমন মেয়ে ওরা? সন্দেহ হতে পারে, মেয়ে আর মেয়ের বাপ-মা, কেউই বোধহয় আগে জানতে পারে না যে, কালী দত্ত একজন ভয়ানক বিপত্নীক।

কিন্তু রতনবাবুর সঙ্গে একদিন কালীঘাটের এক বাড়িতে কালী দত্তের চতুর্থা স্ত্রী গীতার এক কাকার হঠাৎ দেখা হয়েছিল, আলাপও হয়েছিল। গীতার কাকা বলেছিলেন--জানি জানি, সবই জানি।

--কবে জানলেন? বিয়ের আগে?

—আজ্ঞে না। বিয়ের পরে।

—তারপর?

তারপর আর কি? এখন মেয়ের অদৃষ্ট, যা হবার তাই হবে।

--কি আশ্চর্য, জেনেও আপনাদের একটু ভয় হয় না?

—না, মশাই না। গীতার কাকা বেশ চেঁচিয়ে জবাব দিয়েছিলেন।

বাঃ, কালী দত্ত তাহলে কি তুকতাক করে মেয়ের কাকা-বাবা-দাদাগুলোর বুদ্ধি নাশ করে দেয়?

হিমাদ্রিবাবু একবার তাঁর অফিসের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায় কথায় কালী দত্তের তৃতীয়া স্ত্রী পারুলবালার মামার বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিলেন। পারুলবালার মামাকে চিঠি লিখেছিলেন হিমাদ্রিবাবু, যদি আপনাদের মেয়ের জীবনের জন্য বিন্দুমাত্রও মায়া আপনাদের থেকে থাকে, তবে একবার এখানে এসে নিজের চোখে সব ব্যাপার দেখে যান। আপনারা ভুল করে মেয়েকে একটা রাক্ষুসে অদৃষ্টের ঘরে বিয়ে দিয়েছেন।

পারুলবালার মামা অনাথবাবু পত্রপাঠ ব্যস্ত হয়ে আর খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রায়বাগানে এসেছিলেন। কালী দত্তের ওই ভয়ানক গুহাঘরের ভিতরে ঢুকবার আগে অনাথবাবু বুদ্ধি করে হিমাদ্রিবাবুরই বাড়িতে এসেছিলেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন অনাথবাবু।

হিমাদ্রিবাবুও একেবারে স্পষ্ট ভাষায় কালী দত্তের জীবনের ভয়ানক ইতিবৃত্ত শুনিয়ে দিয়েছিলেন।—ওটা তো মানুষের বাড়ি নয় অনাথবাবু ; ওটা হলো...পরিতোষ যাকে বলে, একটা ভয়ানক গুহামানবের বাড়ি। কালী দত্তের বউ বাঁচে না, বাঁচা সম্ভব নয় ; কিন্তু তবু দেখুন, কী জঘন্য মনোবৃত্তি। বউ মরলেই ছয়-সাত মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করে।

অনাথবাবুর জলভরা চোখেও যেন আগুন জ্বলতে থাকে—কিন্তু বউগুলো মরে কেন বলতে পারেন? মারধর করে বুঝি?

—কিছু জানি না মশাই। এ এক ভয়ানক রহস্য, কালী দত্তের ঘরের ভেতরের খবর বোধহয় ভগবানও জানতে পারেন না।

হন হন করে হেঁটে কালী দত্তের বাড়ির দিকে চলে গেলেন অনাথবাবু। দেখে মনে হলো, ওই গুহাঘরের ভিতর ঢুকেই কালী দত্তের গলা টিপে ধরবেন অনাথবাবু।

কিন্তু বৃথা আশা করেছিলেন হিমাদ্রিবাবু। পরের দিন সকালবেলা যখন কালী দত্তের বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় সড়কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন অনাথবাবু, ঠিক তখন হিমাদ্রিবাবুর মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। হিমাদ্রিবাবুকে দেখেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন অনাথবাবু ;

ভাব দেখালেন, যেন হিমাদ্রিবাবুকে দেখতেই পাননি। বেশ নিশ্চিন্ত, অনাথবাবু সত্যিই আকাশের দিকে তাকিয়ে সিগারেট খেতে খেতে চলে গেলেন। হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে একটা কথাও বললেন না।

হেডক্লার্ক নিশানাথবাবু কতবার কত ভাল কথা বলে কালী দত্তকে বুঝিয়েছেন, আপনি মশাই খামকা বিয়ে করেন। আপনার স্ত্রী অল্পায়ু হবেন আর হঠাৎ মারা যাবেন, এটা যখন আপনার বিধিলিপি, তখন আর এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যান কেন? এবার ক্ষান্তি দিন মশাই।

কিন্তু বৃথা অনুরোধ। কালী দত্ত তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী শান্তিলতার হঠাৎ-মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত এরকমের অনুরোধের কথা অন্তত ত্রিশবার শুনেছেন। কিন্তু তবু তো দেখা গেল, আরও দু'বার বিয়ে করলেন কালী দত্ত। আরও দুটি নারীর প্রাণ কালী দত্তের অন্তরাত্মার আড়ালে গোপন করা এক নিষ্ঠুর পুরুষবাতিকের কাছে বলি হলো। পারুলবালা গেল, তারপর আজ গীতাও গেল।

হর্ষবাবু বলেন--কালী দত্তের বিয়ের বাতিক বন্ধ করতে পারে, এমন কোন আইনও তো নেই।

কিন্তু এত নিন্দা ধিক্কার ও ভর্ৎসনার কোন দরকার হতো না, যদি কালী দত্ত এখান থেকে চলে যেতেন, কিংবা বিয়ে করবার বাতিক চাপা দিয়ে রেখে একলামানুষ হয়ে যেতেন। তবে নারীবলির মতো এই ভয়ানক কাণ্ড চোখে দেখতে হতো না। তবে নিশ্চিন্ত হতো রায়বাগানের এগার বছরের উদ্বিগ্ন আর ক্ষুব্ধ মন।

রায়বাগানের ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাদের আর-একটা আক্ষেপের কথা এই যে, সত্যিই একমাত্র মানুষ, যিনি ইচ্ছে করলে একটা উপায় করতে পারেন, তিনি বোধহয় কিছু করতে চান না। তিনি ইচ্ছে করলে কালী দত্তকে এই স্টোরকেরানী চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। তিনি অন্তত একটু শক্ত করে কথা বললে বা ভয় দেখালে কালী দত্ত নিশ্চয় ভয় পেতে বাধ্য হবেন। হিমাদ্রিবাবু আর রতনবাবু, তাছাড়া আরও তিন ভদ্রলোক প্রায় ডেপুটেশনের মতো একটা চেষ্টার কাণ্ড করেছেন ; একবার নয়, তিন-চার বার। কিন্তু যাঁর কাছে ডেপুটেশন, তিনি ভদ্রলোকদের সঙ্গে প্রথমে কথা বলতেই চাননি। শেষে শুধু একটি কথা বলেছিলেন—আমি তো পারিই, কিন্তু সেটা কি আপনাদের পক্ষে খুব সম্মানের ব্যাপার হবে?

ডেপুটেশনের ভদ্রলোকদের কারও মুখের দিকে তাকিয়ে নয়, তিনি তাঁর হাতের বইয়ের খোলা পাতার লেখাগুলির দিকে তাকিয়ে আর খুব গম্ভীর স্বরে এই কথা বলেছিলেন। তিনি রায়বাগানের এই গোটা পাঁচেক ভদ্রলোককেও যেন সত্যিকারের মানুষ বলে গ্রাহ্য করতে পারছিলেন না।

যেমন আজ কালী দত্তের চতুর্থা স্ত্রী গীতার মৃত্যুর বিকেল বেলায় খুব বৃষ্টি হয়ে গেল, সেবারও ঠিক তেমনি কালী দত্তের দ্বিতীয়া স্ত্রী শান্তিলতার মৃত্যুর রাত্রিবেলাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। শুধু কি বৃষ্টি? যেমন বৃষ্টি, তেমনই ঝড়, আর তেমনই বিদ্যুতের চমকের সঙ্গে রাগী মেঘের গরগরে ডাক। সত্যিই সে রাতে খুব ভয় পেয়ে রায়বাগানের মানুষের বুকও কেঁপে উঠেছিল। রাতটা যেন শান্তিলতার চিতার ছাই বৃষ্টির জলে ধুয়ে দিয়েও রায়বাগানকে ক্ষমা করতে পারছে না। কালী দত্তের মতো একটা পাপের কালীয় নাগকে পুষে রেখেছে যে রায়বাগান, তাকে ক্ষমা করতে না পেরে গরগর করছে নিকষ কালো আকাশের মেঘ।

সে-রাতে বৃষ্টি থামতেই হিমাদ্রিবাবু ও রতনবাবু দু'জনে টর্চ হাতে নিয়ে, আর প্রায় আধ মাইল পথ জলের উপর দিয়ে ছপছপ করে হেঁটে এই মানুষটিরই কাছে এসে অভিযোগ করেছিলেন—আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, এটা মৃত্যু নয়, এটা একটা হত্যা।

যাঁর কাছে অভিযোগ, তাঁর চমৎকার সুন্দর মুখের ফরসা রঙ সেই মুহূর্তে যেন লাল হয়ে

জ্বলে উঠেছিল। কুঁচকে গিয়েছিল তাঁর দুই চোখের বড়-বড় দুটি বাঁকা ভুরু ; যেন দুঃসহ একটা ঘৃণা শিউরে উঠেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর তিনি বলেছিলেন--এটা আপনাদেরই পক্ষে লজ্জার কথা।

আপনি কিন্তু ইচ্ছে করলে...।

--আমি তো পারিই ; কিন্তু আপনারা কেন পারছেন না? ছিঃ!

হিমাদ্রিবাবু আর রতনবাবু সে-রাতে এইরকম একটা পাল্টা অভিযোগের ভাষার কাছে প্রায় ধিক্কৃত হয়ে ফিরে এসেছিলেন ও হতাশ হয়েছিলেন। আর, কালী দত্তের নিষ্ঠুর পাপের সৌভাগ্যটা দেখে আশ্চর্য বোধ করেছিলেন। যিনি আজ ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে কালী দত্তের এরকমের একটা গুহায়িত নির্মম রহস্যের জীবনকে ভয় পাইয়ে দিয়ে শায়েস্তা করতে পারেন, তিনিও কেমন যেন একটা ঘৃণার বাতিকে চুপ করে থাকতে চান।

কালী দত্তের তৃতীয়া স্ত্রী পারুলবালার মৃত্যুর পরে শুধু একা হরিসাধনবাবু গিয়ে এঁরই কাছে সব কাহিনী শুনিয়েছিলেন। শুনে তাঁর সুন্দর মুখের চেহারা অদ্ভুত রকমের করুণ হয়ে গিয়েছিল। আর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর একটা অদ্ভুত কথাও বলেছিলেন--আমি কিন্তু একটা কথার কোন মানে বুঝতে পারি না, কাকাবাবু। ওরা সময় থাকতে সরে যায় না কেন?

তার মানে, কালী দত্তের স্ত্রী হয়ে এই যে তিন-তিনটে মেয়ে এসে এই ভয়ানক গুহাঘরে ঢুকেছিল, তারা কালী দত্ত নামে একটা রাক্ষুসে পুরুষ-চরিত্রকে তুচ্ছ করে আর ঘৃণা করে পালিয়ে গেল না কেন? ঠিকই তো, মাঝরাতে কালী দত্ত যখন ঘুমিয়ে পড়ে থাকে, তখন খিড়কির দরজার কপাট নিঃশব্দে খুলে ফেলতে কতটুকু সময় লাগে? কালী দত্ত যখন মাঝ-দুপুরে কারখানার স্টোরের ঘরে বসে সীসার ওজনের হিসেব লেখে, তখন ওই বাড়ির সামনের দরজার কপাট খুলে পথে বের হয়ে আর একটা রিকশা ডাকতে অসুবিধা কোথায়?

এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন হরিসাধনবাবু। তিনি, আর রায়বাগানের প্রায় সকলেই জানেন যে, না, ওরা পারে না, পারেওনি। কালী দত্তের ঘরের নারী যে সাপের ফণার সম্মুখে অচেতন হয়ে পড়ে যাওয়া এক-একটা ধড়ফড়ানো মুমূর্ষু পাখির প্রাণ। কিন্তু ইনি, যাঁকে হরিসাধনবাবু এসব কথাও কয়েকবার বলেছেন, তিনি কথাগুলিকে বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই বেশ একটু রুক্ষ-রুষ্ট স্বরে বলেছিলেন--আপনি যা-ই বলুন, কাকাবাবু, বউগুলোরও দোষ আছে। দোষ না হোক, ভুল।

হরিসাধনবাবু--যা-ই হোক, এখন তুমি যদি একটু...।

--আমি তো ইচ্ছে করলে একটা ব্যবস্থা করতে পারিই, কিন্তু বুঝতে পারি না, কেন করবো!

আজ, গীতার মৃত্যুর এই বিকেল বেলার বৃষ্টিটা থেমে যাবার পরেও রায়বাগানের এ-বাড়ি আর সে-বাড়ির ঘরে ঘরে শুধু এই অক্ষম ক্ষোভের গুঞ্জন বাজতে থাকে। না, কিছুই করা গেল না, কিছু করাও যাবে না।

ঘাটের কাজ সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে পরিতোষ। কিন্তু রোজ মাঝরাতে যেমন, আজকের এই রাতেও তেমনই বুঝতে পারা যায়, গুহামানব কালী দত্ত অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির বাইরের পাতকোর কাছে স্নান করছেন। কালী দত্তের হাতের ঘটি আর বালটি শব্দ করছে। ছরছর করে ঢালা জলের শব্দ আছড়ে পড়ছে।

এই শব্দটাও রায়বাগানের রাতের জীবনে যেন বারোমেসে ঘেন্না আর আতঙ্কের শব্দ। শীত গ্রীষ্ম বর্ষার কোন রাতও বাদ যায় না, যে-রাতে এইভাবে অন্ধকারের এই পাতকোর কাছে স্নান না করেন কালী দত্ত। পরিতোষ বলতে পারে, এটা আদিমকালের গুহামানবের স্বভাব কি না।

কালী দত্তের বুকে পিঠে বড় বড় কর্কশ রোঁয়া গিজগিজ করছে কি না, সেটা কারও জানবার কথা নয়। কিন্তু এটুকু সবাই জানে যে, লোকটা দাঁত দিয়ে কাঠ কাটে না, আর নখ দিয়ে গাছের ছালও ছাড়ায় না। কালী দত্তের বাড়ির সামনে কাঁচা-খাওয়া খরগোসের ছাল আর ভেড়ার শিং-ও পড়ে থাকে না।

কিন্তু গায়ের ফরসা রঙ তামাটে হয়ে গিয়েছে, কবজির চওড়া হাড়ের উপর নীল-নীল রগ ফুলে রয়েছে, কালী দত্তের এই চেহারা পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়েও যেন একটা হট্টা-কট্টা কঠোরতা। মাঘ মাসের রাতে আদুড় গায়ে পাতকোর কাছের জঙ্গল কাটছেন কালী দত্ত, এ-দৃশ্যও কারও কারও চোখে পড়েছে। কিন্তু কোন মুহূর্তেও কালী দত্তের সামান্য একটা হাঁচি-কাশির শব্দ কেউ শুনতে পায়নি। পরিতোষ মাঝে-মাঝে বলে--ওই শক্ত চোয়ালের অদ্ভুত গড়ন দেখেই বোঝা যায়, ওটা আধুনিক কালের মানুষের পক্ষে বেশ একটু অস্বাভাবিক।

বুড়ো মানুষ হরিসাধনবাবু, এমনিতেই ঘুম ভাল হয় না। তার উপর এত রাতে কালী দত্তের এই স্নানের জল-ঢালার ছরছর শব্দ ; হরিসাধনবাবুর ঘুম আর সম্ভব নয়। এই অবস্থায়, শুধু সেই পুরনো দুর্ভাবনাটাই মনের ভিতর ছমছম করে। কালী দত্ত কি সত্যিই আবার বিয়ে করবে?

২

এই কারখানার মালিক যিনি, তাঁর নাম এম সামন্ত। এখানে তাঁর বিপুল কর্মজীবনের ইতিহাসের সব কথা অনেকেই জানে না। রায়বাগানের হরিসাধনবাবু কিন্তু অনেককিছু জানেন, কারণ তিনিও এককালে হাজারিবাগের জঙ্গলে ঢুকে ভাগ্যের পরীক্ষা করবার জন্য অভ্রের খাদের লীজ নিয়েছিলেন। হরিসাধনবাবুর অভ্রের খাদ থেকে শুধু কাঁকর মেশানো দুধে মাটি উঠেছিল, অভ্রের ছিটেফোঁটাও সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু এম সামন্ত যখনই যে খাদের বুকের সামান্য গভীরে বারুদ ফুটিয়েছেন, তখনই সে খাদের পাথুরে পাঁজর থেকে রুবি অভ্রের স্তবক ঝরে পড়েছে। এক বছরেই লক্ষপতি হয়েছিলেন এম সামন্ত।

সেই এম সামন্ত আজ অবশ্য আশি বছরের কাছাকছি বয়সের এক বৃদ্ধ। কিন্তু সেজন্য তাঁর কারবারী আকাঙক্ষাটাও বুড়িয়ে যায়নি। প্রায় বারো বছর হলো এই মেটাল কারখানা চালু করেছেন, এখানেই মস্ত বড় এক বাড়ি করেছেন। সন্তান বলতে একটি মাত্র মেয়ে, সে মেয়ে এখনও এম সামন্তের এই বাড়িরই মানুষ। বিয়ে করেননি তরুলতা সামন্ত, যদিও বয়স কবেই চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে।

উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ের কাছে এক জমিদার তাঁর বিদুষী মায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্যে একটি মেয়ে-কলেজ করেছেন—রানী লীলাবতী কলেজ। তরুলতা সেই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কাজেই, বছরের বারো মাস একটানা এখানে এই রায়বাগানে থাকেন না তরুলতা ; কলেজের ছুটিতে এখানে আসেন, ছুটি ফুরোলেই আবার চলে যান।

রানী লীলাবতীর মেয়ে দময়ন্তী আর এম সামন্তের মেয়ে তরুলতা, দু'জনে এককালে লখনউ-এর একই কলেজের দুই সহপাঠিনী বান্ধবী ছিলেন। একদিন দুই বান্ধবীর জীবনের শেষ একটা জেদ প্রায় একটা প্রতিজ্ঞা হয়ে উঠেছিল।

লখনউ-এর সেই মেয়ে-কলেজের হোস্টেলের দিদি চারুমতী নিগম একদিন সন্দেহ করে ।। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ছি ছি, তোমরা দু'জনেই এত মন দিয়ে এসব বাজে বই পড়ছো ন? তোমরা কি সত্যিই বিয়ে করতে চাও না?

সন্দেহ না করে পারবেন কেন দিদি চারুমতী? পড়বার মতো এত কাব্য নাটক পৃথিবীতে কতে, এই দুই ছাত্রী গাদা গাদা এমন বই পড়ছে, যেগুলি বলতে গেলে মেয়েলী সন্দেহের টা বিদ্রোহের শাস্ত্র।

সে প্রতিজ্ঞা যে নিতান্ত একটা খেয়ালী শখের প্রতিজ্ঞা ছিল না, সেটা স্বীকার করতেই হয়। দময়ন্তীও বিয়ে করেননি। মিস দময়ন্তী সিন্‌হা শুধু ছবি এঁকে জীবনের দিনগুলি পার করে দিচ্ছেন। সেই সব ছবিতে জগতের সব রূপেরই কিছু না কিছু থাকে ; রামধনু মরুকুঞ্জ আর বর্ষার নদী ; পাখি ফুল আর হরিণ, স্নানঘাটের মেয়ে আর মেষপালিকা গুজর তরুণী। কিন্তু পুরুষ-চেহারার সামান্য ছায়াও সেসব ছবির কোন ছবিতে নেই।

এ তো আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা, তরুলতা সামন্ত যখন মাত্র আঠার বছর বয়সের আর খুবই শান্ত স্বভাবের এক ছাত্রী। সেই তরুলতা আজও যখন রায়বাগানের এই বাড়ির একটি ঘরের ভিতরে কোচের উপর বসে সোনার চশমা চোখে দিয়ে কারখানার ম্যানেজারের অফিস থেকে পাঠানো ফাইলগুলিকে পড়তে থাকেন, তখন আর তাঁকে নিশ্চয় ছাত্রী বলে মনে হয় না। তখন তাঁকে সত্যিই এই মেটাল কারখানার সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান আর ভাল-মন্দের এক বুদ্ধিময়ী কর্ত্রী বলে মনে হয়। কলেজের ছুটির যে-সময়ে রায়বাগানের এই বাড়িতে থাকেন মিস তরুলতা সামন্ত, সে সময়টা কারখানার ম্যানেজার চক্রবর্তীর জীবনটাও উদ্বেগে উতলা হয়ে থাকে। সব সময় সতর্ক থাকেন চক্রবর্তী, কে জানে কখন মিস সামন্তের কাছ থেকে কড়া ভাষার নোট হাজির হবে। হয়তো রোজের ক্যাশবুকের হিসাবের অঙ্কগুলিকে লাল পেন্সিলের দাগে দাগে ভরে দিয়ে, আর মন্তব্যের ঘরে মস্ত বড় একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন এঁকে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।

এম সামন্তের পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনা দেখেছেন আর অনেক ঘটনার কথা শুনেছেন বলেই বুড়ো হরিসাধনবাবু তরুলতাকেও কিছুটা বুঝতে পারেন। পনের বছর আগে, এম সামন্ত যখন কানপুরে, তখন তাঁর একটা চিঠি পেয়ে এই হরিসাধন পাটনা থেকে কানপুরে গিয়েছিলেন। এম সামন্ত বললেন, এ বিয়ের চেষ্টাও ব্যর্থ হলো, হরিসাধনবাবু ; তরু রাজি হলো না।

এত বড় পদস্থ এঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট বলেও বেশ সুনাম আছে, বয়সে স্বাস্থ্যে চেহারাতে সুশ্রীতার কোন অভাব নেই, এমন মানুষকেও বিয়ে করতে রাজী হলো না তরু, এ যে সত্যিই ভয়ানক এক অহংকারের অসম্মতি। এই নিয়ে মোট দশটি ভাল-ভাল বিয়ের প্রস্তাব তরুলতার আপত্তি আর তুচ্ছতায় মিথ্যে হয়ে গেল। এম সামন্ত সেদিন হরিসাধনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খুবই ছটফট করেছিলেন ; যেন চরম আশাভঙ্গের কষ্টটাই ছটফট করেছিল।

হরিসাধনবাবুও দেখেছিলেন, এঞ্জিনিয়ার ছেলে সেই ধীরাজ মিত্র যখন অনেক আশার ব্যস্ততার মতো সেদিন সন্ধ্যাবেলাতে এম সামন্তের কানপুরের বাড়িতে দেখা দিলেন, তরুলতা তখন ধীরাজের দিকে হাত তুলে একটা শুকনো সৌজন্যের ভঙ্গীও না করে ঘরের ভিতর সরে গেল। আশ্চর্য হয়েছিলেন হরিসাধনবাবু, ধীরাজের মতো ছেলেকেও এভাবে তুচ্ছ করতে পারে কোনো মেয়ে? সে মেয়ে যতই সুন্দরী আর শিক্ষিতা হোক না কেন?

শুধু আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেননি হরিসাধনবাবু। তাই এম সামন্তকে তিনিও শুধু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিলেন—কি আর করবেন বলুন? তরুর মনে যদি কোন আগ্রহ না থাকে, তবে আমাদের চেষ্টা করবার মানে হয় না।

সেই তরুলতার নিজের নিঃশ্বাসের বাতাসও কোনদিনও চেষ্টা করেনি। মেয়ে-কলেজের টিচারের চাকরি নিয়েছেন, দিন মাস আর বছর পার হয়েছে। তারই মধ্যে একদিন সেই মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপ্যালও হয়ে গিয়েছেন তরুলতা সামন্ত।

কলেজের ছুটির সময়ে রায়বাগানে এসে বাপের সম্পত্তি, এই কারখানার হিসাব-পত্রের খাতা পরীক্ষা করাও তরুলতার একলাসুখী প্রাণের কালহরণ ছাড়া আর কিছু নয়। জলের ধারার মতো বয়সের ধারাও যেন শুকনো বালুর উপর দিয়ে অনেক দূর গড়িয়ে এসেছে, এইবার নিশ্চয় শুকিয়ে যাবে আর ফুরিয়েও যাবে। কিন্তু সেজন্য তরুলতা সামন্তের মনে

কোন আক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না।

কারখানার হিসাবের খাতা আর চিঠির ফাইলের দিকে তাকিয়ে তরুলতা যখন তাঁর হাতের কলমটিকে আস্তে আস্তে দোলাতে থাকেন, তখন তাঁর কপালের কাছে আর কানের উপরে কালো চুলের ছোট্ট দুটি স্তবক আংটির মতো দুটি বৃত্ত হয়ে দুলতে থাকে ; তার সঙ্গে দু'চারটে সাদা চুলের রেখাও জড়াজড়ি হয়ে কাঁপতে থাকে। সোনার ফ্রেমের চশমার কাচের উপর বাগানের শিমুলের মাথার রঙীন ছায়াটাও যেন ছোট্ট একটা রক্তচন্দনের ফোঁটার মতো ফুটে ওঠে। টিকালো নাক, টানা-টানা চোখ, সুডোল চিবুক ; তরুলতা যেন মূর্তিমতী মেধা। হিসেবের একটা স্টেটমেন্টের দিকে একবার তাকিয়েই তিনটে ভুল ধরে ফেলতে পারে, এমনই চকচকে আর উজ্জ্বল তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি।

রতনবাবু তাই একদিন হরিসাধনবাবুর কাছে না বলে পারেননি--সত্যি হরিদা, মিস সামন্ত সত্যিই একটা অদ্ভুত পার্সোনিলিটি। আমার মনে হয়, এই জন্যেই...।

এই জন্যেই বোধহয় মিস তরুলতা সামন্ত বিয়ে করতে পারলেন না। রতনবাবুর ধারণা. মেয়েদের মধ্যে এরকমের প্রখর ব্যক্তিত্বময় চেহারা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।--সত্যি কথা হরিদা, মিস সামন্তের চোখের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এরকম পার্সোনিলিটির পুরুষ আই সি এস-দের মধ্যেই বা ক'জন পাওয়া যাবে?

বুড়ো হরিসাধনবাবু অবশ্য দু'বার কেশেছিলেন, আর কুণ্ঠিত স্বরে একটা কথা বলেছিলেন --হতে পারে।

মিস তরুলতা সামন্ত ; ইনিই সেই পার্সোনিলিটি, যার কাছে রায়বাগানের যতো অনুরোধ আর আবেদনের ডেপুটেশন এসেছে আর হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে। সকলেই দেখতে পেয়েছেন, সমস্যার কথাটা শুনেই তরুলতার চোখমুখে যেন ঘেন্নায় ভরা একটা অস্বস্তির ভাব ছটফট করে উঠেছে। কিন্তু প্রতিকারের জন্য তিনি সামান্য একটু চেষ্টা করতেও রাজি হননি। পথের উপর মরা ইঁদুর পড়ে আছে দেখলে লোকের চোখের চাহনিটা যেমন ঘেন্না পেয়ে শিউরে ওঠে, নাক কুঁচকে যায়, অথচ একটা লাঠির খোঁচা দিয়ে ঘৃণার বস্তুটাকে সরিয়ে দিতেও ঘেন্না হয়, তরুলতার মনের ঘৃণাও প্রায় সেই রকমের একটা ঘৃণা।

কালী দত্তের রাক্ষুসে গুহাঘরের নারীবলির সেই চতুর্থ ঘটনার পর, তার মানে গীতার মৃত্যুর পর শুধু ঐ একটি প্রশ্ন ছাড়া রায়বাগানের প্রাণে আর কোন উদ্বেগ ছিল না—কালী দত্ত সত্যিই কি আবারও বিয়ে করবে?

দিন যায় মাস যায়। সাত আটটা মাস ফুরিয়েও যায়। রায়বাগানের দুশ্চিন্তা একটু একটু করে থিতিয়ে আসতেও থাকে। কিন্তু বৃথা স্বস্তি ; রায়বাগানের কারও আর জানতে বাকি রইল না, এক মাসের ছুটি নিয়েছেন কালী দত্ত।

সত্যিই বৃথা স্বস্তি। একদিন বৃষ্টি থামতেই আকাশ জুড়ে একটা রামধনু ফুটে উঠেছিল কিন্তু মাথার উপরে এত সুলক্ষণে একটা আকাশে থাকতেও রায়বাগানের পক্ষে আর নিরাতঙ্ক হওয়া সম্ভব নয়। কালী দত্তের নতুন বউ এসেছে। সে বউ এখন ওই গুহাঘরের ভিতরেই আছে। দুর্ভাগ্যের বলি, সেই নারীর চেহারা এই পাড়ার মানুষের চোখে চকিত ছবির মতো একবার দেখাও দিয়েছে। কালী দত্তের বাড়ির একটা জানালা যেন বাতাসের হঠাৎ-আঘাতে একবার খুলে গিয়েছিল ; তাই দেখতে পাওয়া গিয়েছে, রঙীন শাড়ি পরা একটি মূর্তি ঘরের ভিতরে ঘুর ঘুর করছে।

ঠিক সেইদিনই একটা চিঠি পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, শেষে কেঁদেই ফেললেন ভবানীর মাসি। রায়বেরিলি থেকে চিঠি লিখেছেন ভবানীর মাসির মাসতুতো দিদি—আমার তমালীর বিয়ে হয়েছে তোমাদেরই রায়বাগানের কালী দত্তের সঙ্গে ; তমালীর খোঁজখবর একটু নিও।

বেশি দেরি করেননি ভবানীর মাসি। রায়বেরিলির সেই চিঠি হাতে নিয়ে বের হয়ে

গেলেন। একরকম ছুটে ছুটেই হেঁটে গেলেন। যিনি ইচ্ছা করলেই একটা প্রতিকার করতে পারেন, এ ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁরই কাছে এসে ফুঁপিয়ে উঠলেন ভবানীর মাসি--রক্ষে করুন দিদি। আমার তমালীর সর্বনাশ করেছেন আপনার অফিসের কালী দত্ত।

--কে? তমালী? কথাটা তরুলতা সামন্তের ওই শান্ত ঠোঁট দুটোকে যেন থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে বেজে উঠলো।

তরুলতার কাছে তমালী যে সত্যিই একটা চেনা নাম। তমালী মেয়েটার সেই চেহারাও যে স্পষ্ট মনে পড়ে। তরুলতার ছাত্রী সেই তমালী ; কতবার রাগ করে আর শক্ত ভাষায় ধমক দিয়ে তমালীর হাসি থামিয়েছেন তরুলতা। ক্লাসের পড়ার মধ্যেই হেসে হেসে হুটোপুটি করতো তমালী ; কবিরাজ গোবিন্দবাবুর মেয়ে সেই তমালীকেই কি বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছে রাক্ষুসে পুরুষ ওই কালী দত্ত?

ভবানীর মাসি বলেন--হ্যাঁ, আমারই গোবিন্দ মেসোর মেয়ে তমালী।

তমালী মাত্র তিনটে মাস ওই রানী লীলাবতী কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসে পড়েছিল। তারপর আর আসেনি তমালী। তমালীর নাম কেটে দেবার অনেক দিন পরে জানতে পেরেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল তরুলতা, গোবিন্দ কবিরাজ এখন আর প্রতাপগড়ে নেই, কে জানে কোথায় চলে গিয়েছেন। প্রায় দশ বছর আগের কথা, তবু এখনও সবই মনে করতে পারেন তরুলতা। তমালীকে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না তরুলতার, কালো মেয়ের চেহারাও এত চমৎকার হয়। তমালীর ডানচোখের কোলের উপর মস্ত বড় একটা তিল ছিল। ওই তিলটারই জন্যে কী ভযানক দুষ্টু আর চালাক দেখাতো মেয়েটাকে। হিসেব করলেই বুঝতে পারা যায়, সেই তমালীর বয়স আজ তিরিশের বেশি ছাড়া কম হবে না। কিন্তু দুষ্টুমি আর চালাকির ওই তিল থেকেও কী লাভ হলো? তমালীর ভাগ্যটা যে একেবারে নিরেট আহম্মক হয়ে একটা জহ্লাদ পুরুষ-বাতিকের কুৎসিত ঘরে এসে ঢুকেছে।

ভবানীর মাসি বলেন--তমালী বাঁচবে না, দিদি, যদি একটা ব্যবস্থা...।

তরুলতা সামন্তের দুই চোখ শক্ত হয়ে যেন একটা কঠিন কল্পনার দিকে তাকিয়ে থাকে। বোধহয়, তরুলতাও বিশ্বাস করেছেন, ঠিকই বাঁচবে না তমালী, যদি না তমালীকে...।

তরুলতা বলেন--কিন্তু লোকটাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিলে আপনাদের তমালীর কি সুবিধে হবে? কালী দত্ত কি তমালীকে সঙ্গে নিয়েই আবার অন্য কোথাও একটা গুহাঘরে...।

ভবানীর মাসি--তাহলে আর তমালীর বাঁচা হবে কেমন করে? আপনি তমালীকে বাঁচান।

তরুলতা বলেন--একটু ভাবতে দিন। দেখি কি করতে পারি।

শুধু ভবানীর মাসি নয় ; এতদিনে রায়বাগানের প্রাণ আশ্বস্ত হবার মতো একটা আশার ভাষা শুনতে পেল, স্বস্তিই পেল।

কিন্তু বৃথা স্বস্তি। দিনের পর দিন, আর মাসের পর মাস পার হয়ে গেল। তরুলতা সামন্ত তাঁর কলেজ করতে সেই কোন্ দূরের এক প্রতাপগড়ে চলেও গেলেন। তিনটি মাস পরে ফিরেও এলেন। কিন্তু তমালীর মুক্তি কোথায়? তরুলতা সামন্তের মতো মূর্তিমতী মেধা, ক্ষমতা আর পার্সোনিলিটিও যেন ভেবে ভেবে শুধু হয়রান হয়ে যাচ্ছেন, কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না।

তবে কি তমালীও মরবে!

৩

শিমূলের মাথা ক'দিন হলো আরও লাল হয়ে টুকটুক করছে। বাড়ির বাইরের বারান্দার চেয়ারে বসে আর হেসে হেসে যার সঙ্গে কথা বলছেন তরুলতা সামন্ত, তার হাসির শব্দে শিমূল গাছের কাকও চমকে গিয়ে উড়ে যাচ্ছে। খুড়তুতো ভাই বিকাশের সঙ্গে কথা বলছেন

তরুলতা।--তুই টোকিও থেকে ফিরে এসেছিস, জানি। কিন্তু কোথায় আছিস এখন?

--মুঙ্গেরের টোবাকো ফ্যাক্টরীতে আছি।

--বিয়ে করবি?

--করবো বইকি! সবারই তো আর তোমার মতো একলা তপস্বিনী হয়ে থাকবার মতো মনের জোর...।

--চুপ কর। আমি যদি মেয়ে পছন্দ করে দিই, তবে অপছন্দ করবি না তো?

বিকাশ--কখ্‌খনো না। কিন্তু সে'ও আমাকে পছন্দ করবে তো?

তরুলতা--নিশ্চয় পছন্দ করবে।

বিকাশ--বাস্‌, তবে আর কুছ-পরোয়া নেই। তুমি চেষ্টা কর।...আচ্ছা, আজ তবে আসি।

তরুলতা বলেন--আজই সন্ধ্যাবেলা একবার আসতে পারবি?

--পারবো। মুখভরা চুরুটের ধোঁয়া উগরে দিয়ে চলে যায় বিকাশ।

তরুলতা কিন্তু আর চুপ করে বসে থাকেন না।--গাড়ি বের কর, পরেশ! ব্যস্তস্বরে ডাক দিলেন তরুলতা। তরুলতার মনের গভীরে যেন একটা প্রতিজ্ঞা উতলা হয়ে উঠেছে। টানা টানা চোখের কালো তারা দুটোও হাসছে। এটাও নিশ্চয় একটা উতলা আশার হাসি।

ঠিক যখন বিকেলের রোদ লালচে হয়ে রায়বাগানের বাঁশের ঝাড়ের মাথার উপর এলিয়ে পড়েছে, তখন রায়বাগানের এপাড়ার সব ঘরের মানুষ হঠাৎ মোটর গাড়ির হর্নের শব্দ শুনে চমকে ওঠে। শব্দ তো নয়, যেন নিয়তির তূর্যনাদ। তরুলতা সামন্তের গাড়ি এসে গুহামানব কালী দত্তের বাড়ির সামনে থেমেছে।

গাড়ি থেকে নামলেন তরুলতা। সিল্কের শাড়ির দোলানো আঁচলটাকে টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিলেন। তরুলতার চশমার সোনার ফ্রেম যেন আগুনের রঙ নিয়ে জ্বলছে। কালী দত্তের বাড়ির সামনের দরজার কড়া নাড়লেন তরুলতা। কী অদ্ভুত শব্দ করে বেজে উঠলো কালী দত্তের বাড়ির ওই দরজার মরচেধরা কড়া।

পাড়ার ভদ্রলোকেরা নিজের নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে উসখুস করেন। মহিলারা জানালার গরাদের উপর মাথা রেখে আর চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন। এবার একটা হেস্তনেস্ত হয়েই যাবে।

--তমালী! ডাক দিলেন তরুলতা। সে ডাকও যেন নিয়তির আহ্বান। খুব মৃদু স্বরে কথা বলা যাঁর অভ্যাস, তাঁরই গলার স্বরে কী অদ্ভুত একটা আক্রোশের ঝঙ্কার! তরুলতার কানের হীরার ফুলও ঝিকঝিক করে যেন একটা জ্বালা ঠিকরে দিয়ে কাঁপছে। দেখে মনে হয়, ভয়ানক এক ঘৃণায় জ্বালার দুটো বিদ্যুতের ফুলকি ঝরে পড়ছে।

তরুলতার এক ডাকেই কালী দত্তের বাড়ির সেই বন্ধ দরজার কপাট খুলে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো যে মূর্তি, সেটা তমালীর মূর্তি নয়। বের হয়েছেন কালী দত্ত। নেমন্তন্ন-বাড়িতে ব্যস্ত কাজের মানুষের সাজ যে-রকমের হয়, কালী দত্তের সেই মূর্তির সাজও প্রায় সে-রকমের ; গায়ে গেঞ্জি, ধুতিটা ছোট করে আর আঁটসাট করে পরা, হাতে একটা তোয়ালে।

তরুলতা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বললেন--আপনি সরে যান, আপনাকে ডাকিনি।

সেই মুহূর্তে সরে গেলেন কালী দত্ত ; আবার ঘরের ভিতরেই চলে গেলেন। আর হঠাৎ-ঝড়ের বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার রঙীন গুচ্ছ যেমন ছিটকে এসে লুটিয়ে পড়ে, রঙীন সাজের এক তরুণী নারীর চেহারাও তেমনি ঘরের ভিতর থেকে যেন ছিটকে এসে তরুলতার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো। তরুলতার একটা হাত ধরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো তমালী--তরুদি! আপনি!

তরুদি--হ্যাঁ, আমি সেই তরুদি।

তমালীর প্রাণটাই যেন একটা বিস্ময় হয়ে ছটফট করছে। তরুলতার হাত ধরে টান দেয় তমালী--ভেতরে চলুন তরুদি।

--না। তুমি এখনই আমার সঙ্গে চল।

--কোথায়?

--আমার বাড়িতে। চা খাবে।

--চলুন। বলতে গিয়ে তরুলতার গায়ের উপর আবার লুটিয়ে পড়তে চায় তমালী। তমালীর নির্বাসিত ভাগ্যটাই বোধহয় মুক্তির সুখে নরম হয়ে গলে পড়তে চাইছে।

--চল। গাড়িটার দিকে একবার তাকালেন তরুলতা ; তারপর তমালীর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

কিন্তু চলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তরুলতা। ঘরের ভিতরটার দিকে আর একবার তাকালেন।--ওখানে ওটা আবার কি?

তমালী শুধু মাথা হেঁট করে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর তরুলতাও কোন প্রশ্ন না করে আস্তে আস্তে, এক-পা দু-পা করে এগিয়ে, কী আশ্চর্য, কালী দত্তের সেই ভয়ানক গুহাঘরের ভিতরেই ঢুকলেন।

ঘরের ভিতরের দেয়ালে টানানো একটা ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তরুলতা। তমালীরই ছবি। খোঁপাতে সাদা ফুলের মালা জড়ানো, তমালীর চেহারার একটা অয়েল পেন্টিং।

তরুলতা ডাকেন—কোথায় গেলেন আপনি? কী যেন আপনার নাম!

—আজ্ঞে। সাড়া দিয়ে ভিতরের বারান্দার দিক থেকে এগিয়ে এসে ঘরের ভিতরে দাঁড়ালেন কালী দত্ত।

তরুলতা—এ ছবি কোথায় পেলেন আপনি?

কালী দত্ত হাসেন--তমালী ওর একটা ফটো দিয়েছিল, সেটাকে কলকাতাতে পাঠিয়ে এই ছবি করিয়ে আনা হয়েছে।

কালী দত্তের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে নিয়েই ঘরের চারিদিকের চেহারার দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকেন তরুলতা।

টেবিলের উপর এক গাদা গল্পের বই। তরুলতার চোখের শক্ত ভ্রূকুটি যেন আরও বিরক্ত হয়ে কুঁচকে যায়।—আপনি আবার বই-টই...।

—আজ্ঞে না, আমি না। এগুলো তমালীরই শখ।

তরুলতা—তমালীর বাবার নামটা যেন কী?...হ্যাঁ, গোবিন্দ কবিরাজ। তিনি এখন কোথায়?

—তিনি নেই। তমালীর মা অবিশ্যি বেঁচে আছেন। কিন্তু টি-বিতে ভুগছেন। কাজেই...।

তরুলতার কানের ফুলের হীরা ঝিকঝিক করে জ্বলে ওঠে।--কাজেই মানে কি? কি বলতে চান আপনি?

—কাজেই তমালীর শখের বই-টই সবই তো এখন আমি ছাড়া আর কেউ...

তরুলতার চোখ দুটি এইবার সত্যিই জ্বলতে থাকে।—আপনার এ ঘরের দেয়ালে তো আরও চারটে মেয়ের ছবি থাকবার কথা।

—ছিল। সে-সব ছবিকে বাক্সে তুলে রাখতে হয়েছে। আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমার ভাগ্যটা যে অদ্ভুত একটা...।

তরুলতা—কি বললেন?

--একটা সাংঘাতিক পরীক্ষা!

তরুলতা--তার মানে?

--সবাই এক-এক করে চলে যাবে, অথচ যাবার আগে দিব্যি দিয়ে বলে যাবে, একা থেকো না।

তরুলতা--কিন্তু চলে যায় কেন?

--আপনিই বলুন, কেন চলে যায়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।

তরুলতা--কিন্তু আপনি কেন একলা থাকতে চান না?

--একলা থাকতে পারি না।

তরুলতার গলার স্বর যেন দুঃসহ একটা ঘৃণার জ্বালায় পুড়ে পুড়ে কাঁপতে থাকে।--কেন পারেন না?

কালী দত্তেরও গলার এতক্ষণের মৃদু মিনমিনে আওয়াজ যেন ছোট্ট একটা বিস্ফোরণের মতো গুমরে ওঠে।--একলা থাকতে ভাল লাগে না, তাই একলা থাকতে পারি না।

তরুলতা--খুব কুৎসিত আর ভয়ানক আপনার বাতিক।

--সেজন্যে তো আপনার কিংবা আর কারও কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

তরুলতা--কিন্তু চার-চারটে মেয়েকে মরতে হয়েছে।

--কিন্তু সেজন্য তো আপনাকে কিংবা আর কাউকে কাঁদতে হয়নি।

তরুলতা--আপনি কেঁদেছিলেন?

কালী দত্ত এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন।--আপনি...আপনি সত্যিই ভয়ানক অদ্ভুত কথা বলছেন।

--আপনি তো আমাদের মেটাল কারখানার স্টোরে কাজ করেন।

--আজ্ঞে হ্যাঁ।

--ওরকম চেঁচিয়ে হাসবেন না।

কালী দত্ত কিন্তু হাসতেই থাকেন, আরও উচ্চকিত হাসি--আপনি বরং তমালীর সঙ্গে কথা বলুন।

ঠিকই, শুধু তমালীর সঙ্গেই কথা বলা উচিত ছিল। কালী দত্ত নামে এই অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে একটা কথাও বলা উচিত হয়নি। তরুলতার চোখের ভ্রূকুটি হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়।

কিন্তু না, তমালীর সঙ্গেও এখানে দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবার দরকার নেই। তমালীকে এই অভিশাপের ঘর থেকে সরিয়ে একটা মুক্তির আঙিনাতে নিয়ে গিয়ে নতুন আলোর মুখ দেখিয়ে দিতে হবে। বিকেল তো প্রায় শেষ হতেই চলেছে। বিকাশ বোধহয় এতক্ষণে এসেই গিয়েছে, ড্রইংরুমে বসে আছে।

কিন্তু তমালীকে যে সত্যিই একটি তাজা রঙীন অয়েল পেন্টিং ছবির মতো দেখাচ্ছে। এই গুহাঘরের ভিতরে বন্ধ হয়ে পড়ে থেকেও কেমন করে ওরকম একটা ফুল্লতার ছবি হয়ে উঠলো তমালী? তমালী কি হাঁড়ি ঠেলে না? উনানের আঁচের ধারে-কাছেও যায় না? সামান্য কাজটাজও করে কি? না, সব সময় ওরকম সাজেশ্বরী হয়ে শুধু বসে থাকে?

চোখে পড়ছে তরুলতার, ঘরের ভিতরে একটা টেবিলের উপর চাদর পেতে তার উপর রেশমী সুতোর লেসের একটা ব্লাউজকে কে-যেন খুব যত্ন করে অর্ধেক ইস্তিরি করে রেখে দিয়েছে। ওদিকে মেজের উপরে জুতোর কালি আর একটা ব্রাশ পড়ে রয়েছে। দু'পাটি জুতোর শুধু একটা পাটিকে পালিশ করা হয়েছে, আর একটা পাটির পালিশ বাকি। কিন্তু...সত্যিই যে দু'পাটি মেয়েলী জুতো। বিছানার কাছে একটা কাঠের টুলের উপর একটা গেলাস, সরবতের গেলাস। সরবতের অর্ধেকটা খাওয়া হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কে খাচ্ছিল এই সরবত?

জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা ছিল না, তবু কথাটা যেন তরুলতার এই রুক্ষ গম্ভীর দাঁতচাপা মুখের ভিতর থেকে নিজের জোরেই ছুটে বের হয়ে এল।--কে খাচ্ছিল এই সরবত?

--আমি নয়। হাসতে থাকেন কালী দত্ত।

তরুলতা--আপনার তো ঝি-চাকর নেই, কিন্তু এই সব কাজ, এত নানারকমের কাজ কে করে?

--আমিই করি।

তরুলতা--তমালী করে না?

--করতে চায়, কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বলি, কী দরকার ; যতদিন বেঁচে আছ ততদিন একটু আয়েস করে নাও। কোন ঠিক তো নেই, হঠাৎ কবে একদিন এই খাঁচা ছেড়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে যাবে।

হেসে ফেলেন তরুলতা।--শুনে তমালী কী বলে?

--সবাই যা বলেছে, তমালীও তাই বলে, ওই একই কথা।

তরুলতা--কি কথা?

--বলে, তাই তো চাই। তার চেয়ে সুখের মরণ আর কি হতে পারে?

তরুলতা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন। তারপর, তাঁর মৃদু গলার স্বর আরও মৃদু হয়ে, যেন চাপা ভয়ের ভাষার মতো বিড়বিড় করে--কিন্তু তমালীকে আপনি বাইরে যেতে দেন না কেন? সব সময় একটা কয়েদীর মতো ওকে ঘরের ভিতরে আটক করে রাখা, এটা কি...।

বাধা দিয়ে হেসে ওঠেন কালী দত্ত--ছি-ছি, আমি আটক করে রাখবো কেন? এই তো, আপনার সঙ্গে এখনই যাচ্ছে তমালী, আমি কি কোন আপত্তি করেছি? তমালী নিজেই বাইরে যেতে চায় না।

তরুলতা--কেন?

--বাইরে বের হলেই তো ওই একই কথা, আমার নামে যত ভয়ানক নিন্দের কথা শুনতে হবে। কিন্তু আসল সত্যি কথাটা কি জানেন?

তরুলতা--কি?

--বাইরের মেলামেশা ডাকাডাকি আর নেমন্তন্নকে দূরছাই করতেই ভালবাসে তমালী। বলে, ঘরেই সবকিছু থাকতে বাইরে যাব কেন? আপনিই বলুন, এটা একটু বেশি অহংকারের কথা নয় কি?...কিন্তু আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। একটা চেয়ারকে টেনে নিয়ে তরুলতার কাছে এগিয়ে দিলেন কালী দত্ত।

চেয়ারে বসেন তরুলতা। সত্যি, ঘরের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা। ফাল্গুন মাসের বিকালে রায়বাগানের কোন পাখাওয়ালা ঘরের ভিতরটা বোধহয় এত স্নিগ্ধ হয় না।

কালী দত্ত বলেন--বসলেনই যখন, তখন একটু চা খেয়ে যান।

রুমাল দিয়ে কপালের একটা ঘামের ফোঁটা মুছে নিয়ে কালী দত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন তরুলতা। তরুলতার গলার স্বর আরও মৃদু হতে গিয়ে একেবারে নিবিড় হয়ে যায়।--না না, আপনি এরকম অনুরোধ করে আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

বিপদ? কিসের বিপদ? তরুলতা কি ঘুমের ঘোরে কোন স্বপ্নের সঙ্গে কথা বলছেন? নইলে একথার যে কোন মানেই হয় না।

কোন মানে হয় না, এমন একটা কথার কি মানে বুঝলেন কালী দত্ত, তা তিনিই জানেন। চা তৈরি করতেই বারান্দার দিকে চলে গেলেন কালী দত্ত।

তরুলতা সামন্ত বোধহয় একটু ক্লান্ত হয়েছেন: তাই এই ধরনের ঠাণ্ডার মধ্যে গম্ভীর এক স্বস্তির স্বাদ পেয়েছেন। তা না হলে চোখ দুটো বন্ধ করে এই চেয়ারের উপর ওভাবে

একেবারে নীরব হয়ে বসে থাকবেন কেন?

তবু নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন তরুলতা, ভিতরের বারান্দায় দিক থেকে কাপ-ডিশ আর চামচের ঠুং-ঠাং শব্দ ভেসে আসছে। তরুলতা সামন্তের তেষ্টার প্রাণ একটা সান্ত্বনার শব্দ শুনছে।

চোখ মেলে দরজার বাইরের দিকে তাকালেন তরুলতা। ওঃ, তমালী বেচারা যে অনেকক্ষণ ধরে ওখানে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তমালীকে বলে দিলেই তো হয়, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না তমালী, তুমি বরং আর দেরি না করে এখনই আমার বাড়িতে চলে যাও : আমি আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকি।

--কালীবাবু! শুনছেন? হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর প্রায় একটা চাপা চিৎকারের মতো শব্দ করে ডাক দিলেন তরুলতা।

কালী দত্ত আসতেই হাসতে চেষ্টা করেন তরুলতা--না কালীবাবু, প্লীজ, আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমি চা খাব না।

ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন তরুলতা। আর, তমালীর কাছে এসে একটা হাত ধরে তমালীকে ঘরের ভিতরে যেন ঠেলেই দিলেন।--তোমার আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই তমালী। তুমি ঘরেই থাকো।

রায়বাগানের পাড়ার মানুষ শুধু আশ্চর্য হয়ে আর হতাশ হয়ে দেখতে থাকে, তমালী সেই গুহাঘরের ভিতরেই ঢুকে পড়লো, আর তরুলতা সামন্তকে নিয়ে সেই মস্ত গাড়িটা ছুটে চলে গেল। হর্নের শব্দ নেই, শুধু ধূলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে গাড়িটা।

কি হলো, কিছুই বোঝা গেল না। শুধু জানতে পারা গেল, সন্ধ্যা হবার আগেই তরুলতা সামন্ত ট্রেন ধরবার জন্যে দমদম চলে গিয়েছেন। ছুটি এখনও ফুরোয়নি, প্রতাপগড়ের মেয়ে-কলেজ এখনও খোলেনি, তবু চলে গেলেন? কী আশ্চর্য, কিছুই যে বোঝা যায় না।

জীবনে তোমার পরিচয়

এই ট্রেনের কামরার কোন সীটে বসবার মতো খালি জায়গা আর নেই। কিন্তু সুধাকর আর একটু পরেই যখন নেমে যাবে, তখন রজতের পাশেই একজনের মতো একটি জায়গা খালি হয়ে যাবে।

রজত আর সুধাকর, দুই বন্ধু এই ট্রেনেই টাটানগর থেকে আসছে। ট্রেন এখন ঘাটশিলা স্টেশনে থেমে রয়েছে। ট্রেন ছাড়তে আর দেরি নেই। বড়জোর আর মিনিট দুই-তিন সময় বাকি আছে।

রজত যাচ্ছে কলকাতা ; সুধাকর এই ঘাটশিলাতেই নামবে, মাত্র একদিনের জন্য ঘাটশিলাতে থেকে কয়েকটা দোকানকে পাওনা টাকার জন্য তাগিদ দিয়ে তারপর আবার টাটানগর ফিরে যাবে।

সুধাকরের সঙ্গে কোন বিড়ম্বনার বোঝা নেই, একটা হাতব্যাগও না। হাতে শুধু সিগারেটের একটা টিন। কাজেই নেমে যাবার জন্য সুধাকরের তাড়াহুড়ো নেই। ট্রেন যদি হঠাৎ চলতেও শুরু করে, তবু কোন অসুবিধে নেই। টুপ করে নেমে পড়তে পারবে সুধাকর। আর, এইভাবে যতটুকু সময় পাওয়া যায়, ততটুকু সময় বন্ধু রজতের সঙ্গে বরং একটু গল্প করে নেওয়াই ভাল।

গার্ডের হুইসিল বাজেনি, ট্রেনও চলতে শুরু করেনি, তবু সুধাকরকে নেমে পড়তে হলো। কারণ, এক তরুণী ব্যস্তভাবে এই কামরাতেই উঠেছেন। তরুণীর সঙ্গে আরও যে দুই ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁরাও ব্যস্তভাবে বলেন, শুধু একজনের বসবার মতো জায়গা পেলেই তো হতো ; এই যে দেখছি...!

বুঝতে অসুবিধে নেই, এই দুই ভদ্রলোক এই ট্রেনের যাত্রী হতে আসেননি। এঁরা শুধু এই তরুণী যাত্রিণীকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন। কাজেই, এরপর সুধাকরের পক্ষে মিছিমিছি একটা জায়গা দখল করে বসে থাকা আর সম্ভব নয়। উঠে দাঁড়ায় সুধাকর।—আমি নেমে যাচ্ছি। আপনি এখানে বসতে পারেন।

বসতে তো হবেই। একটা জায়গা যে পাওয়া গেল, এটাই একটা ভাগ্যের কথা। যাত্রিণী তরুণী বেশ খুশি হয়েই বসে পড়লেন। আর, তাঁর সঙ্গের দুই ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে ও হাঁপ ছেড়ে কামরা থেকে নেমে গেলেন।

সুধাকরও নেমে যায়। প্লাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে কামরার জানালার দিকে তাকিয়ে হাসে আর কথা বলে—এইবার ট্রেন ছাড়ছে। আমি চললাম, যথাসময়ে কলকাতায় পৌঁছে যাব।

চলতে শুরু করেছে ট্রেন। তরুণীর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, সেই দুই ভদ্রলোকও কামরার জানালার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন—কলকাতায় পৌঁছেই কিন্তু চিঠি দিও। ভুলে যেও না।

ঘাটশিলার স্টেশন আর দেখা যায় না। অনেক দূর চলে এসেছে ট্রেন। ট্রেনেব এই কামরার পশাপাশি দুটি জানালা দিয়ে দুটি মুখ উঁকি দিয়ে শুধু মাঠ বন আর পাহাড়ের চেহারা দেখতে থাকে।

দু'জনের কাছে ট্রেনের এই কামরার ভিতরটাই বরং একটা অপরিচিত জগৎ। একটি মুখও চেনামুখ নয়। এই সীটের এখানে পাশাপাশি যে দুজন বসে আছে, তারও কেউ কারও পরিচিত নয়।

এই তরুণী, যার নাম মলয়া, সেও কলকাতাতেই যাচ্ছে। রজত আর মলয়া, দু'জনে যেন দুটি নির্বিকার ও অবান্তর অস্তিত্ব হয়ে পাশাপাশি বসে থাকে, যদিও ট্রেনটা ভয়ানক ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। কামরার ভিতরে একটা ঘটি গড়িয়ে গড়িয়ে ওদিকে চলে গেল।

একটা বাক্সের উপর থেকে ছোট একটা ঝুড়ি ধুপ করে পড়ে গেল। উল্টে পড়ে গেল এক যাত্রীর টিফিন কেরিয়ার। কিন্তু এরা দু'জন একটুও বিচলিত নয়। কেউ কারও সঙ্গে সামান্য দু'একটা মুখের কথায় একটু আলাপ করতেও চায় না। ইচ্ছেই হয় না।

ট্রেনের দুরন্ত দোলা আর ঝাঁকুনিতে কামরার ভিতরে যা-কিছু যেভাবে যত এলোমেলো হয়ে যাক না কেন, রজত আর মলয়ার মনের কামরার কোন জিনিস এলেমেলো হয়ে যায় না। শাড়ির আঁচলটাকে এক হাতে টেনে নিয়ে বেশ শক্ত হয়ে বসে আছে মলয়া। আর রজতও একটি শান্ত-সুস্থির মূর্তি নিয়ে যেন নিজেরই কল্পনার জগতের একটি ঠাঁই নিয়ে অবিচল হয়ে বসে আছে।

রজতের মনের প্রতিক্ষণের কল্পনা আসন্ন একটি উৎসবের ছবি দেখছে। সেই উৎসবের দিন-ক্ষণ সবই ঠিক হয়ে গিয়েছে। কাকা লিখেছেন, তুমি অন্তত এক মাসের ছুটি নেবে রজত। আর বিয়ের তারিখের অন্তত সাতদিন আগে কলকাতায় পৌঁছে যাবে।

রজতের জীবনের সঙ্গিনী হবার জন্য যে-মেয়ে আজ এই আসন্ন উৎসবের নেপথ্যে এখন দাঁড়িয়ে আছে, সে-মেয়ে রজতের চোখের অচেনা হলেও অজানা নয়। বড়দি লিখেছেন, রুণুর মতো সুন্দর চেহারার মেয়ে, হাজারেও একটা চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ। কাকিমা লিখেছেন, আমরা ঠিক যেমন মেয়ে চেয়েছিলাম, ঠিক তেমন মেয়েরেই খোঁজ পেয়েছি। সব দিকে ভাল। অচেনা অজানা ঘরের মেয়ে নয়, রুণু হলো আমারই সেজকাকার বড়মেয়ে সুচারুর মেয়ে।

শুধু কি বড়দির চিঠি আর কাকিমার চিঠি? তাও কি আবার দুই-তিনটি চিঠি? বোধহয় এই ছ'মাসের মধ্যে তিরিশটি চিঠি পেয়েছে রজত, আর সে-সব চিঠিকে দু-তিনবার করে পড়তেও হয়েছে। সব চিঠিই যেন রুণুর জীবনের যত রূপকথার কলরবে মুখর হয়ে রজতের বুকের ভিতরে অদ্ভুত এক মধুরতার গুঞ্জন ভরে দিয়েছে। এক-একদিন সত্যিই মনে হয়েছে রজতের, রুণুকে যেন চোখের কাছেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুই চোখে নিবিড় এক বিস্ময়ের আবেদন নিয়ে রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রুণু। হঠাৎ লজ্জা পেয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল রুণু, আর মাথাটাকে একটু ঝুঁকিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রুণুর খোঁপাতে সাদা ফুলের একটা স্তবক দেখতে পাওয়া যায়।

কাকিমা লিখেছেন,আমরা জানি, খুব শিক্ষিতা মেয়ে না হলে তোমার মতো ছেলের সঙ্গে একটুও মানাবে না। তাই রুণুকে আমাদের আরও পছন্দ হয়েছে। তোমাকে তো আগের চিঠিতেই জানিয়েছি যে...।

হ্যাঁ, আগের আরও তিনটি চিঠিতে জানিয়েছেন কাকিমা, রুণু হিস্ট্রিতে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়ে এম-এ পাশ করেছে। রুণু খুব ভাল গান গাইতে পারে। রুণুর হাতের বাটিকের কাজ তিনবার এগজিবিশন কমিটির সার্টিফিকেট পেয়েছে।

রুণু যে একটুও যেমন-তেমন স্বভাবের মেয়ে নয়, এই সত্যটাকেও নানাকথায় একেবারে স্পষ্ট করে আর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন বড়দি।--আমি তো সবই জানি, আমি রুণুকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। আগে সিঁথিতে আমাদেরই পাশের বাড়িতে রুণুরা থাকতো। এখন অবশ্য রুণুর বাবা পার্কসার্কাসে মস্ত বড় বাড়ি করেছেন। রুণু এত লেখাপড়া শিখেছে, বয়সও ছাব্বিশ পার হয়ে সাতাশে পড়েছে কিন্তু বিয়ের কথা শুনলে আঁচল তুলে মুখ ঢাকা দেয়, রুণু হলো এইরকম স্বভাবের মেয়ে। বলতে গেলে, বেশ একটু ভীরু স্বভাবের মেয়ে। খুব মনখোলা মেয়ে। কোন পছন্দ-অপছন্দ গোপন করে রাখবার মতো মেয়ে নয়। রুণুর বিয়ের জন্যে বিয়ের সম্বন্ধে খোঁজ এই প্রথম ; তোমারই সঙ্গে বিয়ের কথা উঠলো, আর সবাই তখনি রাজি হয়ে গেল। আর সবচেয়ে যেটা ভাল কথা, সেটাও তোমাকে বলেই দিচ্ছি। রুণুও খুব খুশি। এটা শোনা কথা নয়, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আর নিজের কানে শুনেছি। রুণু শেষ পর্যন্ত কোন লজ্জা না করে আর হেসে হেসে বলেই দিয়েছে, আমি তো

শাঁখের শব্দ শোনার জন্যে কান পেতেই রয়েছি, আপনারা বাজাতে এত দেরি করে দিচ্ছেন কেন বউদি?

ট্রেন এখনও ঝাড়গ্রাম পৌঁছয়নি। খুব জোরে ছুটে চলেছে ট্রেন। কামরার জানালা দিয়ে বাতাসের এক-একটা ঝাপটা ঢুকে রজতের জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনে মুখটা দপদপ করে বাড়িয়ে দিচ্ছে। রঙীন হয়ে যাচ্ছে রজতের মুখটাও। মনে পড়েছে রজতের, সেদিন বড়দির এই চিঠির কথাগুলি রজতের নিঃশ্বাসের বাতাসে যেন রঙীন আবীর ছিটিয়ে দিয়েছিল। কল্পনা করে দেখতে গিয়েই যেন চোখে দেখতে পেয়েছিল রজত, রুণুর মুখের হাসিটা যেন দুর্বার এক অভিমানে রঙীন হয়ে রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে--এর পরেও তুমি দেরী করবে? কোনোদিন দুই চোখে দেখনি বলেই কি ভালবাসতে পারছো না!

বড়দিকে আর কাকিমাকে চিঠি দিতে আর দেরি করেনি রজত--আমি একমাসের ছুটির দরখাস্ত করে দিয়েছি। তোমরা দিন ঠিক করতে আর দেরি করো না।

২

শাড়ির আঁচলটাকে এত শক্ত করে ধরে, আর এত স্তব্ধ হয়ে বসে কী ভাবছে মলয়া?

মামলার তারিখ পড়েছে। আজই সন্ধ্যার ট্রেনে ঘাটশিলা থেকে চাইবাসা রওনা হবেন বড়মামা আর ছোটমামা। তা না হলে আজ মলয়াকে ট্রেনেতে শুধু তুলে দিয়েই দু'জন চলে যেতেন না, অন্তত ছোটমামা নিশ্চয় মলয়ার সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত আসতেন।

ছোট মামী নিজেই বেশ একটু রাগ করে বলেছেন, তোমাদের মামলা কবে মিটবে না মিটবে, সেজন্যে কি মেয়েটা এখনও এখানে পড়ে থাকবে? ওর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখন ওকে নিয়েই তো যতো কাজ। ওর বাড়ির মনও যে কত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সেটাও কি বুঝতে পার না? তা ছাড়া, মলয়ার নিজের মন বলেও তো কিছু আছে। ওর এখন আর এখানে থাকতে ভাল লাগবে কেন?

কাজেই শেষ পর্যন্ত মলয়াকে একাই পাঠাতে হলো। এতে আর দুশ্চিন্তা করবার কি আছে? এই ট্রেনই তো সোজা গিয়ে হাওড়াতে থামবে। টেলিগ্রাম করেই দেওয়া হয়েছে। মলয়াদের বাড়ির গাড়ি হাওড়া স্টেশনে এসে অপেক্ষায় থাকবে। মলয়ার পক্ষে একা কলকাতা ফিরে যাওয়া তো এমন কিছু সমস্যার ব্যাপার নয়।

পুরো একটা মাস ঘাটশিলাতে কাটিয়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়া, ঘাটশিলার মহুয়ার ছায়ার জন্য মলয়ার মনে একটু আকুলতা আজ জেগে উঠতো বই কি, যদি সে আকুলতার ঠাঁই হবার মতো একটু খালি জায়গা মনের এক কোণেও থাকতো। আজ মলয়ার মনের সব ঠাঁই জুড়ে শুধু একটি কল্পনার ছবি হাসছে। এই ছবিও একটি আসন্ন উৎসবের ছবি। সে উৎসবের আঙিনাতে মলয়ার পাশে এমনি একটি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে, যাকে মন-প্রাণ দিয়ে আপন করে নিতে আর একটুও লজ্জা করতে ইচ্ছে করে না। চোখের চেনা নয়, তবু মনে হয় কত দিনের চেনা। মেজবউদির চিঠির ভাষার তো কোন মাত্রা নেই। কলমের মুখে যা এসেছে তাই লিখে দিয়ে বসে আছেন মেজবউদি। লিখেছেন, তুমি যা চাও, তাই পেতে চলেছো। তোমাকে যার সঙ্গে চমৎকার মানায়, তারই সঙ্গে তোমার জীবনের গাঁটছাড়া পড়তে চলেছে। এতদিন যে তোমার ওপর কারও চোখ পড়েনি, আর, কারও ওপর তোমারও চোখ পড়েনি, সে আক্ষেপ তুমি এবার পুষিয়ে নিতে পারবে। টুলুবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালে তোমার ওই ভীরু চোখ দুটিও দু'মিনিট ধরে তাকিয়ে থাকবে।

কিন্তু আবার এরকম একটা চিঠি লিখে মলয়াকে অশান্ত করবার কোন দরকার ছিল না মেজবউদির। মেজবউদিও তো শুনেছেন, সেদিন আলিপুরের উমাদিকে কী কথা একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল মলয়া। মলয়া তো তৈরি হয়েই আছে, রাজি হয়েই আছে। মলয়া

শুধু চায় যে, আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ কি? টুলুবাবুর নামে সেই মানুষটি যখন রূপে গুণে আর স্বভাবে এতই সুন্দর তখন মলয়াকে তো আর কোন কথা বলবার দরকার হয় না।

জার্মানী থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এব ডিগ্রী নিয়ে, তারপর দু'বছরের ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরেছে আর রাউরকেলার স্টীল-প্ল্যান্টে ভাল কাজ পেয়েছে যে, সে মানুষের বিদ্যে বুদ্ধি আর শিক্ষা-দীক্ষার কথা নিয়ে প্রশ্ন করবার তো কিছু নেই। দেখতে খুবই ভাল, বিশেষ করে মেজবউদির মতো মানুষের চোখ যেটা স্বীকার করছে, তখন তো সে ভদ্রলোকের রূপের এত বিবরণ শোনবার কোন দরকার হয় না। মেজবউদির চোখ ভয়ানক খুঁত ধরবার অভ্যেসের চোখ। একজন বেশ সুশ্রী মানুষকে দেখা মাত্রই বলে দেন মেজবউদি, ভদ্রলোকের কপালটা কেমন যেন চাপা, একটু বাঁকা। এহেন মেজবউদি যখন বলতে পেরেছেন, টুলুবাবু দেখতে চমৎকার, তখন আর বেশি চমৎকারিতা দাবি করবার কোন মানে হয় না। মলয়ার কল্পনাতে খুব বড় কোন দাবিও ছিল না। ভাল লাগবে, ভালবাসতে কোন বাধা হবে না, শুধু এইটুকু রূপ-গুণ স্বভাব থাকলেই হলো! কোনদিনও এর চেয়ে বেশি আশা করতে চায়নি মলয়া।

তাই ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগে বইকি। যার জীবনের সঙ্গে মলয়ার জীবন মিলিয়ে দেবার জন্যে একটি লগ্ন আর একটি রাখীডোর অপেক্ষায় রয়েছে, সে যে মলয়ার কাছে আশার দাবির চেয়েও বড় একটি প্রাপ্তি। তাকে এখনই একবার দেখতে ইচ্ছে করে। কি আশ্চর্য, মেজবউদি তো বুদ্ধি করে একটা ফটো পাঠিয়ে দিতে পারতেন। চেষ্টা করলে কি ভদ্রলোকের একটা ফটো যোগাড় করা বাড়ির এতগুলো মানুষের মধ্যে কারও পক্ষে সম্ভব হতো না? মা একদিন অবশ্য হেসে-হেসে একটা ফটো দেখিয়েছিলেন, হাজারিবাগের একটা পাহাড়ের কাছে তোলা একটা গ্রুপ ফটো। সেই গ্রুপ ফটোর মধ্যে বারো বছর বয়সের একটা ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন মা, এই, এই হলো টুলু।

একরকম ভালই হয়েছে ; রাউরকেলার ইঞ্জিনিয়ার টুলুকে একদিনও দেখবার সুযোগ হয়নি। এই অদেখার সব ফাঁকি একদিন একটি পরমক্ষণের চরম দেখার মধ্যেই পূর্ণ হয়ে যাবে। সে দিনটাও তো এসেই পড়েছে। আর মনটাকে এত ছটফট করিয়ে লাভ কি?

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কল্পনা মলয়ার মনের এই ভাবনাটাকে যেন একটা ঠাট্টা করে হাসিয়ে দেয়। এই যে পাশে বসে আছেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক, ঠিক এইরকমই সেই ভদ্রলোকও যদি এখানে এই ট্রেনের কামরাতে দেখা দিতেন? তবে, মলয়া নিশ্চয় একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আর দেখে নিয়েই বুঝে ফেলতো ইনি কে। চিনতে আর জানতে একটুও ভুল হতো না মলয়ার।

আরও একবার মনে মনে হেসে ফেলে মলয়া, কি আশ্চর্য, সে ভদ্রলোক কিন্তু এখন স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না যে, মলয়া এখন তারই কথা ভাবছে আর তাকেই দেখবার জন্য ছটফট করছে।

ঝাড়গ্রাম। ট্রেন এখানে যে আর কতক্ষণ থেমে থাকবে কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে না। লাইন খারাপ হয়েছে নাকি!

ট্রেনের যাত্রীরাও অদ্ভুত। ট্রেনের প্রায় অর্ধেকটা খালি করে দিয়ে যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে নেমেছে ; ঘুরছে, বেড়াচ্ছে আর গল্প করছে। মনে হচ্ছে ট্রেন ছাড়বার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিংবা আরও অনেক দেরিতে ট্রেন ছাড়বে।

তবে তো হাওড়া পৌঁছুতে মাঝরাতও পার হয়ে যাবে। ড্রাইভার রামলালও শেষে ধৈর্য হারিয়ে আর শূন্য গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে না তো? তাহলে তো একটা বিপদেই পড়তে হবে। কাউকে একটু জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলে হতো. ট্রেন এখানে এতক্ষণ ধরে থেমে আছে কেন? কিন্তু কা'কে জিজ্ঞাসা করা যায়? পাশে বসে আছেন যে ভদ্রলোক, তিনি কি

কিছু বুঝেছেন? ভদ্রলোক তো কামরা থেকে নামলেনও না, শুধু চুপ করে আর একেবারে সুস্থির হয়ে সিগারেট খেয়ে চলেছেন।

মলয়া যেন প্ল্যাটফর্মের একটা আলোর দিকে তাকিয়ে আব বেশ একটু উদ্বিগ্ন স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলে--কিছু যে বুঝতে পারছি না! এখানেই এত রাত হয়ে গেল.. ।

রজত বলে--আপনি কোথায় যাবেন? কলকাতা?

মলয়া--হ্যাঁ।

রজত--হাওড়া পৌঁছতে কিন্তু বেশ রাত হয়ে যাবে।

চমকে ওঠে মলয়া--তাহলে তো খুবই অসুবিধেয় পড়তে হবে।

রজত--কেন বলুন তো?

মলয়া--বাড়ির গাড়ির যদি আর অপেক্ষা না করে চলেই যায় তবে...?

রজত হাসে--না, চলে যাবে কেন? খোঁজ নিয়ে জানতে পারবে যে, ট্রেন কত ঘণ্টা লেট হয়ে পৌঁছচ্ছে। তা ছাড়া, আপনার চিন্তা করবার কিছু নেই। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে...।

মলয়া--কি করে হবে?

রজত--হাওড়া স্টেশন থেকেই বাড়িতে ফোন করবেন। একটু অপেক্ষা করবেন। তারপর আপনার বাড়ির গাড়ি চলে আসবে।

মলয়া হাসে--ধন্যবাদ, আপনি একটা উপায় বলে দিলেন। আমি কিন্তু ভাবতেই পারছিলাম না।...কিন্তু ট্রেন এখানে থেমে আছে কেন?

রজত--ওই যে শুনলেন, টিকিট চেকার বলে গেল।

মলয়া--কই? কখন বললেন? আমি কিছুই শুনতে পাইনি তো।

রজত--মিলিটারীর দুটো স্পেশাল ট্রেন আসছে। সেগুলি আগে পাস করবে, তারপর আমাদের ট্রেন ছাড়বে।

মলয়া--কিন্তু কখন পাস করবে?

হেসে ফেলে রজত--সেটা জানা থাকলে তো বলাই যেত আমাদের ট্রেন কখন ছাড়বে।

মলয়া--তার মানে, কত দেরি হবে তার কোন ঠিক নেই।

রজত--তাই তো।

চুপ করে মলয়া। কিন্তু চুপ করে থাকলেই মনের অস্বস্তিটা যেন আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে। একটা অনিশ্চয় মুহূর্তের অপেক্ষায় এভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেও ভয়-ভয় করে। প্ল্যাটফর্মের আলোও যেন হিমেল বাতাসের ছোঁয়া লেগে নেতিয়ে পড়েছে। মাসটা তো মাঘ মাস। এত রাতের বাতাসে এমন একটা হিমেল ভাব জেগে উঠবেই বা না কেন?

জানে না মলয়া, কতক্ষণ এভাবে শুধু প্ল্যাটফর্মের একটা আলোর দিকে চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে। হঠাৎ চমকে ওঠে মলয়া, পাশের ভদ্রলোক কি যেন বললেন।

মলয়া--আপনি কি আমাকে কিছু বললেন?

রজত--হ্যাঁ। আপনি চা খেতে চান তো বলুন, চা-ওয়ালাকে ডেকে দিচ্ছি।

বেশ কুণ্ঠিতভাবে হাসতে থাকে মলয়া--আপনি ডেকে দিলে অবিশ্যি...না থাক...চা আর নাই বা খেলাম।

রজতও হাসে--আপনি তো আপনার সঙ্গের খাবার-টাবারও খেলেন না। আর খাবেন কখন?

মলয়ার মনে পড়েছে, রজতও দেখতে পেয়েছে যে ছোট্ট একটা খাবারের বাস্কেট মলয়ার পাশে সীটের উপরে রয়েছে।

মলয়া--আপনি তো আমাকে বলছেন, কিন্তু আপনিও তো...।

রজত--আমি ট্রেনে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ কিছু খেতেই পারি না। অসম্ভব। ইচ্ছেই করে না। শত খিদে লাগলেও না।

মলয়া--তা হয় না।

রজত--কি বললেন?

মলয়া হাসে--আমার বেশ খিদে পেয়েছে। না খেয়ে পারবোও না। কিন্তু...

বাস্কেট খুলে সন্দেশ হাতে তুলে নিয়েই রজতের হাতের কাছে বাস্কেট এগিয়ে দেয় মলয়া--আপনি খান।

রজত--মাপ করবেন। কিছু মনে করবেন না। আমাকে দেবেন না।

কিন্তু হাত সরিয়ে নেয় না মলয়া। খাবারের বাস্কেটটাকে রজতের হাতের কাছে তুলে ধরেই রাখে। তারপর বিড়বিড় করে বলেই ফেলে--আপনি এরকম করছেন কেন?

রজত তবু কুণ্ঠিত। হঠাৎ আনমনার মতো হয়ে আর পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করে রজত।

মলয়া--ও কি, আবার সিগারেট ধরাচ্ছেন কেন? আগে খেয়ে নিন।

যেন শুনতে পায়নি রজত। আনমনার মতই প্রশ্ন করে--কি বললেন?

মলয়া--আপনি বুঝছেন না কেন, আপনি না খেলে আমারও...।

--সে কি? না না, আপনি খাবেন না কেন? চেঁচিয়ে ওঠে রজত।

হেসে ফেলে মলয়া--একটু চক্ষুলজ্জা থাকতে খাব কি করে?

মলয়ার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই আর দ্বিধা করে না রজত। বাস্কেটটাকে হাতে নিয়ে কয়েকটা মিষ্টি তুলে নেয় আর খেতেও থাকে। তখুনি কামরা থেকে নেমে যায় রজত।--যাই, একটা চা-ওয়ালাকে ডেকে নিয়ে আসি।

চা-ওয়ালা আসে। কিন্তু চা-ওয়ালার হাত থেকে গরম চায়ের পেয়ালা নিজেই তুলে নিয়ে মলয়ার হাতের কাছে এগিয়ে দেয় রজত। মলয়া হাসে--আপনি খান।

রজতও হেসে ফেলে--দাই নেসেসিটি ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।

মলয়া--এখন তো এটা বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু এই একটু আগে আমি যখন আপনার হাতের কাছে খাবার এগিয়ে দিলাম, তখন তো আপনার মনে হয়নি যে, আমিও একথাটা বলতে পারি।

রজত--আপনার কি তাই মনে হয়েছিল?

মলয়া--মনে হলেই বা কি? আপনি তো বুঝতে পারেননি। যাক্ গে, মিলিটারির স্পেশালটা কি কোথাও ঘুমিয়ে পড়লো?

রজত--আর বেশি দেরি হবে না মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না।

মলয়া--সত্যি ঠাণ্ডা লেগেছে। কিন্তু আপনার এ সন্দেহ কেমন করে হলো?

রজত--সন্দেহ হয়? চোখেই দেখতে পাচ্ছি, আপনার চোখ কেমন ছলছল করছে। আপনার গরম কোট এইবার গায়ে দিয়ে ফেলুন।

মলয়া--তা তো দিতেই হবে। এত ঠাণ্ডা সত্যিই আমার সহ্য হয় না।

রজত--আমার খুব সহ্য হয়।

মলয়া--এটা একটা চালাকির কথা বললেন।

চমকে ওঠে রজত--আপনি হঠাৎ এরকম একটা কথা...।

মলয়া--আপনার সঙ্গে গরম আলোয়ান নেই তাই, যেন আমি আপনার কোন ভুল না ধরতে পারি, তাই আগেভাবে একটা কৈফিয়ৎ শুনিয়ে রেখে দিলেন।

রজত--ঠিকই, ভুল হয়ে গিয়েছে। আলোয়ানটাকে টাটানগরে আমার বন্ধু সুধাকরের বাড়িতে ফেলে রেখে এসেছি।

মলয়া—আপনি আর ওখানে প্ল্যাটফর্মের ওপরে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ভেতরে এসে বসুন।

কামরাতে ঢুকে আবার নিজের সীটের উপর বসে রজত। কিন্তু আর তো নিজেকে একটা একলা মানুষ বলে মনে হয় না। পাশে বসে আছে এক অপিরিচিতা সঙ্গিনী, যার জীবনের কোন পরিচয় জানা নেই, তারই সম্পর্কে মনের ভিতরের একটা বিস্ময় যেন হঠাৎ চমকে চমকে উঠছে, এই মেয়েকে যে হঠাৎ-পাওয়া একটি আপনজন বলে মনে হয়। গরম আলোয়ান সঙ্গে নেই বলে ধমক দেয়। রজত খাবার না খেলে নিজে খেতে পারে না। বাঃ, বেশ একটা কাণ্ড করে বসে রইল এই অপরিচিতা।

মলয়া বলে—এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কোন কথাবার্তা হয়নি, ভালই হয়েছিল। এখন কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না।

রজত—কেন?

মলয়া—এই যে বললাম ; আপনি ঠাণ্ডাতে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আমার কিছুই করবার উপায় নেই। আমার সঙ্গেও কোন আলোয়ান কিংবা চাদর নেই যে..।

রজত—এটা আপনি একটু বেশি বাড়িয়ে ভাবছেন। বাইরে অবশ্য ঠাণ্ডা আছে, কিন্তু এই কামরার ভিতরে তেমন কিছু ঠাণ্ডা নেই।

মলয়া—ট্রেন চলতে শুরু করলেই বুঝবেন, কেমন ঠাণ্ডা।

রজত—এসব কথা এখন বাদ দিন তো। গল্প করতে হলে অন্য কথা বলা যায়।

মলয়া হাসে—হ্যাঁ, গল্পই তো। আপনি কি ভাবছেন যে, আমি খুব সিরিয়াসলি বলছি!

রজত—না না, আমাকে সিরিয়াসলি কিছু বলবার তো কথা নেই! আপনি বলবেনই বা কেন? অনেক দিন আগে আমি একবার এই লাইনে নাগপুর গিয়েছিলাম। সে-সময় দেখেছিলাম, এই ঝাড়গ্রামে ঝুড়ি ভর্তি করে চাঁপা ফুল বিক্রি হচ্ছে।

মলয়া—ফুল কিনেছিলেন?

রজত—না।

মলয়া—কেন?

রজত হাসে—তখন দরকার ছিল না!

মলয়াও হাসে—এখন দরকার আছে বোধহয়!

রজত—না, এখনও দরকার হয়নি।

মলয়া—ভাল কথা! আমি অবশ্যি এই লাইনে আগে আর কখনও যাইনি। এই প্রথম ঘাটশিলাতে গিয়ে একমাস ছিলাম। সত্যি ঘাটশিলা খুব সুন্দর জায়গা, যদিও এখনও মহুয়া ফুল ফোটেনি।

রজত—কিন্তু তাতে মহুয়াবনে বেড়াতে তো কোন অসুবিধে নেই।

মলয়া—না, খুব বেড়িয়েছি। একা একাই বেড়িয়েছি। একা বেড়াতেই ভাল লাগে আমার।

রজত—একা একা ট্রেনে যেতেও ভাল লাগে নিশ্চয়?

মলয়া—না, সেটা ঠিক নয়। মামার সময় হলো না বলেই আমাকে একা একা যেতে হচ্ছে। কিন্তু...

রজত—কি?

মলয়া—আপনি আজ না থাকলে সত্যিই আমার এখানে এভাবে একা বসে থাকতে বেশ ভয় করতো।

রজত—ভয় কিসের? কামরাতে এত মানুষ রয়েছে। মহিলারাও আছেন। আপনার ভয়-ভয় করবার কোন মানে হতো না।

মলয়া—তবু। আপনাকে তো ঠিক ওদের মতো মনে হচ্ছে না।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছে মলয়া, বোধহয় নিজের মুখের কথারই শব্দটাকে শুনে আশ্চর্য হয়েছে। নিবিড় হয়ে গিয়েছে মলয়ার দুই চোখের কালো তারা দুটো। আর, চমকে উঠেছে রজতের বুকের ভিতরটা ; হঠাৎ এ কি-কথা বলে ফেলেছে এই অপরিচিতা মহিলা! এই ট্রেনের কামরার ভিড়ের মধ্যে বেছে বেছে শুধু একজন মানুষকেই সত্যি করে কাছের মানুষ বলে মনে করে ফেলেছে, ক্ষণকালের একটা মায়ার কাছে মনের কথা মুখ খুলে বলে ফেলেছে।

রজত বলে—আমারও তো তাই মনে হতে পারে।

রজতের চোখের চাহনিটাকে ভয় পায় না মলয়া। আর রজতের মুখের এই কথা শুনেও মুখ ফিরিয়ে নেয় না। মলয়া যেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করে।—তা তো মনে হতেই পারে। মনে হলেই বা আপনাকে দোষ দিচ্ছে কে?

চলতে শুরু করেছে ট্রেন। রজত বলে—না, আপনি আর জোর করে জেগে থাকতে চেষ্টা করবেন না। আপনি চোখ বন্ধ করে যতটুকু পারেন ঘুমিয়ে নিন।

মলয়া যেন রাগ করে কথা বলে—আপনি বললেই আমার ঘুম এসে যাবে, না?

উত্তর দেয় না রজত। ঝাড়গ্রাম পার হয়ে রাতের অন্ধকারে, যেন দূর আকাশের তারার দিকে লক্ষ্য করে ট্রেন তখন ছুটে চলেছে।

চুপ করে জেগেই বসে আছে দু'জনে, রজত আর মলয়া। ক্ষণকালের এই সান্নিধ্যের ভয়ানক এক বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে আবার একলা হয়ে যাবার জন্য দু'জনের নিঃশ্বাসের ভিতরে যেন একটা সংগ্রাম চলেছে। ট্রেনের দোলানির সঙ্গে আর দুলতে চায় না মলয়ার মাথার খোঁপাটা, আর ট্রেনের ঝাঁকুনিতে চমকে উঠতে চায় না রজতের হাতের সিগারেট। শুধু কয়েকবার, বোধহয় তিনবার হঠাৎ দু'জনের মুখের দিকে দু'জনে তাকিয়ে ফেলেছে। সেই মুহূর্তে দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

হাওড়া স্টেশন। অনেক রাতে ট্রেন থেমেছে। কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই হেসে ফেলে মলয়া।—ওই যে, ড্রাইভার রামলাল দাঁড়িয়ে আছে।

উঠে দাঁড়ায় রজত। হাসতে চেষ্টা করে বলে—তাহলে আমি আসি। আপনিও যান।

মলয়া—হ্যাঁ। কিন্তু...

রজত—বলুন।

মলয়ার মুখটা খুবই গম্ভীর।—সত্যিই ভাল লাগছে না।

রজত—সত্যি কথা বলছেন?

মলয়া—হ্যাঁ।

রজত—কিন্তু আর কি কখনও...।

মলয়া—না, আর দেখা হবে না। দেখা হলেই বা কি হবে?

রজত—আমিও এই কথা ভাবছিলাম। তবে...।

মলয়া—বলুন।

রজত—কি বলবো, বুঝতে পারছি না। ভুলে যাবেন না যেন।

মলয়া—না, ভুলবো না। কিন্তু থাক, আর কিছু বলবেন না। বলে লাভ নেই।

বিদায় নিয়ে চলে গেল মলযা। রজতও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর চলতে থাকে।

৩

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে, অনেক রাতের একটি মুহূর্তে, যখন মলয়া ওর একলা ঘরের নিভৃতে একটা স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে চেয়ারের উপর বসেছে, আর টেবিল ল্যাম্পের ঢাকাটা আর একটু টেনে নামিয়ে দিয়েছে, তখন মেজবউদি এসে ঘরে ঢোকেন, আর হেসে-হেসে মলয়ার

কানের কাছে ফিসফিস করেন--আশীর্বাদের দিন ঠিক হয়েছে, আসছে মঙ্গলবার। কিন্তু তার আগেই, পরশুদিন টুলুবাবুকে চা খেতে নেমন্তন্ন করা হবে, যদি অবিশ্যি টুলুবাবু আজ কি বা কালকের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে গিয়ে থাকেন।

মলয়া হাসে--একথাটা তো আমাকে কাল সকালেও বললে চলতো। সে জন্যে তোমার এত রাতে উঠে আসবার কোন দরকার ছিল না। অদ্ভুত!

মেজবউদি--বলতে এলাম এই জন্যে যে, তোমার ভাল ঘুম হবে।

মলয়া--ভাল ঘুম হবে না ছাই হবে!

মেজবউদি--কেন?

মলয়া--ট্রেনে যা বিশ্রী ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হলো, তার জের মিটতে বেশ ক'দিন লাগবে।

ঘাটশিলা থেকে হাওড়া, সেই দুঃসহ ট্রেনযাত্রার ক্লান্তিটা শরীরে আর নেই, কিন্তু মনের ভিতরে যেন আছে। তাই দুটো দিন পার হয়ে গেলেও আর বেশ ভাল ঘুম হলেও মলয়ার মনের ভিতরে যেন একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস বার বার ছটফট করে ওঠে।

কিন্তু সে অস্বস্তির নিঃশ্বাস যে এমন একটা চকিত বিস্ময়ের দখিনা বাতাসে ভরে যাবে, সেটা মলয়ার স্বপ্নেরও অগোচর একটা বাস্তব সত্য।

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আজকের সকালবেলাটা যার আগমনের অপেক্ষা করে করে এতক্ষণে একটা বিপুল কলরব তুলে হেসে উঠেছে, সে এসেছে। বাইরে ঘরে বসে আছে। মলয়ার মা এসে বলে গেলেন--টুলু এসেছে।

মেজবউদি এসে বললেন--তুমিই টুলুবাবুকে চা দেবে। আমি অবিশ্যি তোমার সঙ্গেই থাকবো।

মলয়া--আমাকে দিয়ে এ কাণ্ডটা না করালেই কি ভাল ছিল না!

মেজবউদি--তবে কেন বলেছিলে যে, একবার দেখতে পেলে ভাল ছিল।

আর মুখ লুকোতে চাইলে হবে কি? একথা সত্যিই যে মেজবউদির কাছে একদিন বলে ফেলেছিল মলয়া। কাজেই, জীবনের আগ্রহ যখন একটা অঙ্গীকার হয়েই গিয়েছে, তখন আর এত কুণ্ঠা করবার দরকার কি?

মেজবউদির সঙ্গেই এগিয়ে যায় মলয়া। বাইরের ঘরের ভিতরে ঢুকেই কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। মেজবউদির একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। তারপর মেজবউদিরই পিঠের আড়ালে মুখ লুকোতে চেষ্টা করে। মলয়ার সুন্দর মুখ থেকে যেন একটা স্বপ্নলোকের বিস্ময়ের ফুলঝুরি ঝরে পড়ছে। হাসতে গিয়ে মলয়ার সারা মুখে যেন একটা ভোরবেলার লালচে আকাশের আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

রজত চমকে ওঠে, আর হাসতেও থাকে--এ কী ব্যাপার! এ যে দেখছি, আরব্য উপন্যাসের মতো কাণ্ড!

মেজবউদি--কি হলো!

রজত--আমরা যে দুজনে এক সঙ্গে একই ট্রেনে একই কামরাতে বসে সেদিন হাওড়াতে পৌঁছলাম।

মেজবউদির মুখের হাসিটা উতলা হয়ে ওঠে। --তাহলে তো...ট্রেনেই দু'জনের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

রজত--হ্যাঁ, হয়েছে।

মেজবউদি--তা হলে আমি আর এখানে কেন থাকি? হাসতে হাসতে আর ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন মেজবউদি। আর, পার্ক সার্কাসের বাড়ির সব মানুষের মনে আর মুখে এই হাসির ছোঁয়া ছড়িয়ে দিল একটি অদ্ভুত ঘটনার খবর, ট্রেনেতেই টুলুর সঙ্গে রুণুর দেখা হয়েছে।

ট্রেনের কামরা নয়। পার্ক সার্কাসের একটি বাড়ির বাইরের ঘর, যে ঘরে কল্পনার একটি মেয়েকে দেখতে এসে রজত এখন এক পরিচিতা মেয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছে।

মলয়া যাকে দেখছে, সে একজন অদেখা অচেনা কল্পনার মানুষ নয়।

মলয়া বলে--আমার কিন্তু এখন আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব...।

রজত হাসে--লজ্জা করছে?

মলয়া--হ্যাঁ।

রজত--আমারও কেমন যেন লাগছে। মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হতো।

মলয়া--কেন বলুন তো?

রজত হাসতে চেষ্টা করে--তা তো বলতে পারছি না। এত তাড়াতাড়ি কি বলতেও পারা যায়?

মলয়া হাসে।--আপনি নিশ্চয়ই এখানে রুণুকে দেখতে এসেছেন।

রজত--তাই তো জানি।

মলয়ার চোখ কাঁপে--কিন্তু সেটা কি উচিত হলো?

রজতও গম্ভীর হয়--আপনিই বা রজতের সঙ্গে দেখা করতে এখানে এলেন কেন? আপনারও কি এটা উচিত হয়েছে?

মলয়া--না।

রজত--আমি তাহলে উঠি।

মলয়া--কিছু মনে করবেন না।

রজত হাসে--মনে করবার কি আছে? কেউ কাউকে ঠকাতে পারলাম না, এটাই তো ভাল হল। নয় কি?

মলয়া--হ্যাঁ।

কালপুরুষ

যাঁর নাম তিনকড়ি দত্ত তাঁরই নাম কালপুরুষ।

জীবনবাবু বলেন--শুনেছ হে তিনকড়ি, ছেলেরা তোমার যে নতুন একটা নাম দিয়েছে?

--কি?

--কালপুরুষ।

তিনকড়ি দত্তের গম্ভীর মুখের উপর যেন একটা সূক্ষ্ম হাসির শিহর সিরসির করে ওঠে। আস্তে আস্তে মুখ তুলে জীবনবাবুর মুখের দিকে তাকান তিনকড়ি দত্ত। তারপরেই মুখ নামিয়ে নিয়ে আবার কাজ করতে থাকেন। এবং হেঁট মুখেই যেন আনমনার মতো বিড়বিড় করেন--তা একরকম ঠিকই বলেছে।

নিকেলের ফ্রেমের চশমা। পুরু কাচ। ঘাড় ঝুঁকিয়ে যখন কাজ করেন তিনকড়ি, তখন চশমা আলগা হয়ে চোখের কাছে ছোট ছোট একটা দূরবীনের মতো ঝুলতে থাকে। মাঝে মাঝে ঘাড় টান করে যখন পথের দিকে তাকান, তখন তিনকড়ি দত্তের চোখদুটোকে ড্যাবা-ড্যাবা দুটো কাচের ঢেলার মতো দেখায়।

তিনকড়ি দত্তের এই ঘড়ির দোকানকেই ছেলেরা কালপুরুষের দোকান বলে। তিনকড়ি দত্তের চেহারা, তাঁর এই দোকানের চেহারা এবং তাঁর গম্ভীর মুখের ভাষার মধ্যেও এমন কিছু আছে, যে জন্য মনে হয়, হ্যাঁ, ছেলেরা ঠিকই বলেছে, কিছু বেমানান হয়নি। লোকটা কালপুরুষই বটে।

ঘড়ির দোকানের চেহারাটা এই ত্রিশ বছরের মধ্যে বলতে গেলে একটুও বদলায়নি। সেই একটি টুল, তার সামনে কাঠের ছোট একটা ডেস্ক। তিন তাকের একটা ছোট আলমারি আর দেয়ালের গায়ে গোটা দশেক ক্লকের খোলস। টেবিলের উপর ঘাড় ঝুঁকিয়ে ছোট ছোট কাঁটা আর চিমটে নিয়ে ঘড়ি মেরামত করেন তিনকড়ি দত্ত। মাঝে মাঝে নিকেল-ফ্রেমের চশমার পুরু কাচ একেবারে ঘড়ির ধড়ের উপর ঠেকিয়ে দিয়ে ঘড়ির ব্যাধি সন্ধান করেন।

ঘড়ি মেরামত করতে এসেছেন যে ভদ্রলোক, তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে একটা হাঁফ ছাড়েন তিনকড়ি।

--কালচক্র! এর মরজি ঠাহর করা চারটিখানি কথা নয় মশাই!

ঘড়ির ধড়ের উপর আবার সেই ড্যাবা-ড্যাবা চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মাথা নাড়েন তিনকড়ি দত্ত।--হুঁ, এই ব্যাপার!

--কি? আগন্তুক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন।

তিনকড়ি বলেন--ব্যালেন্স স্টাফ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। চার্জ পড়বে তিন টাকা দু-আনা।

কোন মক্কেল তিন টাকা দু-আনা দিতে রাজি হয়, অনেকেই আবার রাজি হয় না। কেউ কেউ দর কমাবার চেষ্টা করে ; কিন্তু তিনকড়ি দত্ত এককথার মানুষ। বেশ ভদ্রভাবে এবং শান্ত স্বরে, সেই ড্যাব-ড্যাবা কাচের গোলকের মতো দুটি চোখ তুলে একই কথা বলেন--এ তো হেলাফেলা করে সেরে দেবার মতো নিতান্ত একটা কারিগরী কাজ নয় মশাই। এসব হলো কালের ব্যাপার। এক চুল এদিক-ওদিক হলে কত অঘটন ঘটে যেতে পারে।

লোকে বলে টাইম, সময়! তিনকড়ি বলেন কাল! যখন ঘড়ির টাইম টিউন করেন তিনকড়ি, তখন তাঁর গম্ভীর মুখের রকম-সকম দেখলে মনে হয়, যেন নিগূঢ় কালের মহিমা কিংবা রহস্যের সঙ্গে একটা জানাজানি কানাকানি আর ধরাছোঁয়ার খেলা খেলছেন তিনকড়ি।

সন্ধ্যাবেলা যাঁরা তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানে এসে বসেন, তাঁদের কারও ঘড়ি নেই। ঘড়ি মেরামতের কোন দরকার বা তাগিদও তাঁদের নেই। সন্ধ্যার সময়টা শুধু সংসারের সুখ-

দুঃখের কথা বলে পার করে দিতে হয় ; তিনকড়ির দোকানটা এরকম সান্ধ্য আসরের জায়গা হিসাবে মন্দ নয়। খরিদ্দারের ভিড় নেই। ক্বচিৎ ও কদাচিৎ দু-একজন মেরামতের মক্কেল আসে। আর আসে তারা, যাদের সংসারে একটা শুভ ঘটনার লগ্ন আসন্ন হয়েছে। শুভ বিবাহের, শুভ যাত্রার অথবা শুভকর্মের ঘটনা।

--টাইম ঠিক করে দিন তিনকড়িদা।

ছোট-বড় ও মাঝারি, নানা আকারের হাতঘড়ি, কিংবা বড় দেয়ালঘড়িও কেউ কেউ নিয়ে আসে। ঘড়িটার ধড় খুলে একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে, ঘড়ির গায়ে দু-একটা টোকা দিয়ে, এবং কখনও বা কাচের কভার খুলে ডায়ালের উপর ফুঁ দিয়ে, ঘড়ির চাবি ঘুরিয়ে দম পুরো করে দেন তিনকড়ি। তারপর আলমারির ভিতরে রাখা একটা মলিন চেহারার টাইম-পীসের দিকে তাকান। টিক-টিক করে সময় বাজিয়ে চলেছে তিনকড়িদার ত্রিশ বছরের পুরনো টাইম-পীস। এই টাইম-পীসের সময়ের সঙ্গে সময় মিলিয়ে নিয়ে হাতের ঘড়িটাকে একবার কানের কাছে তোলেন, তারপরেই আগন্তুকের হাতে ফিরিয়ে দেন। সকলেই জানে, এর জন্য মাত্র আট আনা চার্জ করেন তিনকড়িদা।

•

তিনকড়ি দত্তের ঐ ত্রিশ বছরের পুরনো টাইম-পীসের একটা সুনাম আছে, যেটা তিনকড়ি দত্তেরই কারিগরী জীবনের একটা সুনাম। তিনকড়ি দত্তের হাতে টাইমের টিউনিং একেবারে নিখুঁত হয় বলে অনেকেরই বিশ্বাস আছে। তিনকড়ি দত্তের হাত বড় পয়া। ডাকঘরের ঘড়ির সঙ্গে দু-তিন মিনিট যদি অমিলও হয়ে যায়, কিবা আসে যায়? অনেকেই বিশ্বাস করে, তিনকড়ি দত্তের ঐ টাইম-পীসই ঠিক টাইম রাখে। শুভলগ্নগুলিকে একেবারে ঠিকঠিক কাঁটায় কাঁটায় ধরে ফেলে তিনকড়ি দত্তের হাতে টিউন করা ঘড়ি।

জীবনবাবু বলেন--ঠিকই, সত্যেনবাবুর জামাই বেচারা সেদিন যদি ওর নিজের ঘড়িকে বিশ্বাস করে রওনা হতো, তবে বেচারার প্রাণ শেষ হয়ে যেত।

অনাথবাবু--কি ব্যাপার?

জীবনবাবু--পঞ্জিকামতে যাত্রা শুভ ছিল আটটা একান্নতে। জামাই বেচারা ওর নিজের ঘড়ির আটটা একান্নতেই রওনা হবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু বাধা দিলেন সত্যেনবাবু। আমাদের তিনকড়ির ঘড়ির মতে সত্যেনবাবুর ঘড়িতে তখন আটটা আটচল্লিশ। কাজেই জামাই বাবাজীকে আরও তিন মিনিট অপেক্ষা করে রওনা হতে হলো। প্রাণে বেঁচে গেলেন বাবাজী।

অনাথবাবু--তার মানে?

জীবনবাবু--প্রথম বাসটা ধরতেই পারলেন না বাবাজী। চকে পৌঁছবার এক মিনিট আগেই বাসটা চলে গিয়েছিল। কাজেই পাঁচ মিনিট পর দ্বিতীয় বাসটিতে জায়গা নিতে হয়েছিল।

অনাথবাবু--কিন্তু শেষ পর্যন্ত...কি...ব্যাপারটা কি দাঁড়াল?

জীবনবাবু--প্রথম বাসটা এক মাইল পর্যন্ত গিয়েই আর একটা বাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়েছিল, আর তিনজন যাত্রী প্রাণে মারাও গিয়েছিল।

জীবনবাবুর গল্পটা থামতেই আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকান তিনকড়ি দত্ত। সেই গম্ভীর মুখের উপর একটা সূক্ষ্ম প্রসন্নতার শিহর।

তিনকড়ি বলেন--সবই কালের খেলা।

সবই কালের বিধান। কালের নিয়ম। কালের নির্দেশ। কাল পূর্ণ হলে হয়, না হলে হয় না, শুভ কিংবা অশুভ। তিনকড়ি দত্তের গম্ভীর মুখে এই ধরনের গম্ভীর কথাগুলি যখন গম্ভীর স্বরে আস্তে আস্তে বাজে, তখন আর একবার মনে হয়, এবং বিশ্বাসও হয়, ঠিকই বলেছে ছেলেরা, লোকটা কালপুরুষই বটে।

তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানের এহেন সান্ধ্য আসরে বসে গল্প করতে করতে জীবনবাবু একদিন হেসেই ফেললেন—কি ব্যাপার তিনকড়ি?

—কি?

—মনে হচ্ছে, কাল জয় করবার চেষ্টা করছ!

—বুঝলাম না জীবনবাবু।

—তোমার বয়স কত?

—আপনার চেয়ে কিছু কমই হবে।

—তা জানি, কিন্তু কত কম?

—বছর সাত-আট।

—তার মানে, তোমার বয়স এখন তিপান্ন-চুয়ান্ন!

—তা হবে।

—মাথার চুল সাদা হবার বয়স।

—হ্যাঁ।

—ক'দিন আগেও তো তোমার মাথায় বেশ সাদার ঘটা দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

—তা দেখেছেন বৈকি।

—কিন্তু আজ এতো কালো কেন? কলপ দিয়ে কাল জয় করছ বোধহয়।

মাথা হেঁট করেন তিনকড়ি দত্ত। আর নিকেল ফ্রেমের চশমা ঝুঁকিয়ে একমনে কাজ করতে থাকেন।

এবং, তার কিছুদিন পরে আর এক সন্ধ্যায় তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানের এই ছোট বারান্দায় একটি চৌকির উপরে মাত্র মিনিট দশেক বসেই চলে গেলেন জীবনবাবু আর অনাথবাবু।

জীবনবাবু বিরক্তভাবে বললেন—না, তুমি একটা কাণ্ডই করলে তিনকড়ি।

বিয়ে করেছেন তিনকড়ি দত্ত। এটা হলো তৃতীয় বিয়ে। ত্রিশ বছর আগে প্রথম বিয়ের পর এক বছর যেতে না যেতেই স্ত্রীর মৃত্যু হলো। তার দশ বছর পরে দ্বিতীয় বিয়ে। সে স্ত্রীও তিন বছরের বেশি রইল না। দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর ষোলটা বছর একলা জীবন পার করে দিতে পেরেছে যে মানুষ, সে মানুষ কালের কোন নির্দেশে আবার বিয়ে করে? তিনকড়ি দত্তকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছিল জীবনবাবুর কিন্তু একটু বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে, এবং বোধহয় বেশ একটু ঘৃণাবোধ করেছিলেন বলেই রূঢ় প্রশ্নটা আর মুখ খুলে উচ্চারণ করতে পারেননি। মোট কথা, তিনকড়ি দত্তের ঘড়ির দোকানের সান্ধ্য গল্পের প্রৌঢ় আসরটাই ভেঙে গেল।

এইতো, সরু গলির মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ চেহারার ছোট একটা বাড়ি। ভিতরে দুটো ঘর, আর বাইরে একটা বারান্দা। বারান্দাটার একপাশে দোকান, আর এক পাশে একটা চৌকি। বড় একটা ঝাঁপ নামিয়ে দিলেই দোকানটা বন্ধ হয়ে যায়, আর বারান্দাটা বন্ধ হয় একটা দরজা বন্ধ করে দিলে।

রোজগার বলতে ঐ তো রোজগার। একটা একলা পেট চলে যায়, এইমাত্র। সে মানুষ বিয়ে করলো কোন্ সাহসে আর কোন্ লজ্জায়?

এমন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়েই বা দিল কে? আর মেয়েটাই বা কেমন?

তিনকড়ি দত্তের বিয়ের পর অনাথবাবু আর জীবনবাবু যতখানি রাগ করে সান্ধ্য আসরটা ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন, তার চেয়ে বেশি রাগ করলেন, যখন শুনতে পেলেন যে, তিনকড়ি দত্তের বউ সত্যিই যা-তা একটা মেয়ে নয়। খেঁদি-পেঁচি নয়, বুড়ি-ধাড়িও নয়। জীবনবাবুর স্ত্রী

আর অনাথবাবুর স্ত্রী, দুজনেই তিনকড়ি দত্তের নতুন বউকে দেখে এসে আশ্চর্য হয়ে আক্ষেপ করলেন--আহা, মেয়েটা দেখতে সত্যিই বড় সুন্দর। বয়স একটু বেশি হলেও তেমন কিছু বেশি নয়। বউটা নিজের মুখেই যখন বললে যে ত্রিশ বছর বয়স, তখন সত্যি করে বত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি হতেই পারে না।

কার মেয়ে--কোথাকার মেয়ে--সে-সব তথ্যও কিছু কিছু জেনে নিয়েছেন জীবনবাবুর স্ত্রী আর অনাথবাবুর স্ত্রী। খুব গরিবের মেয়ে নয়। বাপ আছে, মা আছে। বাপের একটা কাপড়ের দোকান আছে। দোকানের আয়ও কম নয়।

জীবনবাবু বলেন--তবে তো তিনকড়ির কথাই মেনে নিতে হয়। সবই কালের নির্দেশ: কালের ইচ্ছা।

অনাথবাবু বলেন--রেখে দিন মশাই। খোঁজ নিয়ে দেখুন, কি-না-কি ধাপ্পা দিয়ে মেয়ের বাপকে ভুলিয়েছে তিনকড়ি। অনেক টাকা পয়সা আছে বলে একটা বড়াই দেখিয়ে, ভাঁওতা দিয়ে...।

জীবনবাবু--কিংবা এ-ও হতে পারে যে, মেয়ের বাপটাই একটা বেহদ্দ কৃপণ। টাকা-পয়সা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি ছিল না।

অনাথবাবু--তাই হবে বোধহয়। নইলে মেয়েটারই বা বিয়ে হতে এত দেরি হবে কেন?

এমন বিয়ের পরিণাম কি হতে পারে? রোজই সন্ধ্যার আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে পথের এক কিনারা ধরে বেড়াতে বেড়াতে যখন আলোচনা করেন জীবনবাবু আর অনাথবাবু, তখন তাঁরাও কল্পনা করতে পারেন না যে, এই প্রশ্নটা তিনকড়ি দত্তের ঘরের ভিতরেও একটা কঠোর বিস্ময়ের স্বরে কেঁপে কেঁপে বাজতে থাকে। নিয়তি হঠাৎ বলে ওঠে--আশ্চর্য!

তিনকড়ি--কি?

নিয়তি--বুঝে দেখ।

তিনকড়ি--সত্যি বুঝতে পারছি না নিয়তি।

নিয়তি--এ বিয়ে কেন হলো?

তিনকড়ি--হ্যাঁ, সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। আমি ভাবতেও পারিনি যে, যে মানুষের দু দুবার বিয়ে হয়েছে আর স্ত্রী মারা গিয়েছে. সে মানুষের আবার এই বয়সে নতুন করে একটা বিয়ে হয়ে গেল কেন?

নিয়তি হাসে--বাঃ।

তিনকড়ি--কি?

নিয়তি--তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কেউ যেন তোমাকে জোর করে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে।

তিনকড়ি হাসেন--কতকটা সে-রকমই ব্যাপার নিয়তি। কালের ইচ্ছেয়...

মুখ ফিরিয়ে নেয়, সরে যায় নিয়তি। আয়নার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাঁধা বিনুনীটা খুলতে থাকে, আর বোধহয় দু-চোখের ভ্রূকুটি চাপতে চেষ্টা করে। তারপরেই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

--কি হলো নিয়তি? আমার কথা শুনে হাসছো?

--না, আমি ভাবছি আমার কথা।

--কি?

--ভাবছি, এই বিয়ে হবে বলেই কি আমিও কালের ইচ্ছায় এতদিন ধাড়ি হয়ে বাড়িতে বসেছিলাম?

তিনকড়ি বলেন--তুমি ঠিকই ভেবেছ নিয়তি।

নিয়তির চোখের বিস্ময় এইবার যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলতে থাকে। একটা ভয়ের বিস্ময়

বোধহয় একটা ঘৃণারও বিস্ময়। মানুষটার মনে একটা সন্দেহও নেই যে, বিয়ে করে ভুল করেছে। মনের ভিতরে একটা আক্ষেপও নেই যে, এই বয়স আর এই রকম একটা ঘড়ির দোকানের রোজগার নিয়ে একটা মেয়েকে বিয়ে করলে শুধু বিয়ে করাই হয়, সে মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যায় না। নিয়তির জীবনকে ঠকাতে গিয়ে ওর নিজেরও জীবন ঠকেছে, এই বোধও কি নেই মানুষটার?

যেন একটা দুঃসহ অভিযোগের জ্বালা চাপতে চেষ্টা করে নিয়তি।--এমন বিয়ে যেন কারও না হয়।

তিনকড়ির চোখে-মুখ যেন একটা নির্বোধ ও বেহায়া প্রসন্নতার মৃদু হাসি থমথম করে।--কালের কৃপা না হলে হতে পারে না নিয়তি। আমার মতো মানুষের ঘরে তোমার মতো মানুষ আসবে, এ তো চারটিখানি সৌভাগ্যের কথা নয়।

মাথা হেঁট করে নিয়তি। আস্তে আস্তে, যেন একটা করুণ অলসতার ভারে অবশ হয়ে মেজের উপর বসে পড়ে, তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে নিয়তি।

—ছিঃ, ছটফট করে কাছে এগিয়ে আসেন তিনকড়ি। তিনকড়ির চোখ দুটো যেন বেদনার ভারে এই মুহূর্তে ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত ঝরাবে। একটা পাখা হাতে নিয়ে নিয়তির মাথার উপর বাতাস দিতে থাকেন।

অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে তাকায় নিয়তি। নিয়তির চোখ দুটো যেন ঘুম-ঘুম ক্লান্তির ভারে ছোট হয়ে গিয়েছে। তিনকড়ির হাত থেকে পাখাটাকে কেড়ে নিয়ে নিয়তি বলে--যাও।

--কোথায়?

—শুনতে পাচ্ছ না, খদ্দের হাঁকডাক করছে?

হ্যাঁ, কে একজন দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছে--কোথায় গেলে তিনকড়িদা, ঘড়ির টাইমটা একটু ঠিক করে দাও।

ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়ে আবার দোকানের সেই ছোট টুলের উপর বসেন তিনকড়ি, আর চোখের উপর নিকেল-ফ্রেমের মোটা চশমাটাকে চাপতে থাকেন।

—তোমার কি একটুও ভয় নেই? পিছনে না তাকিয়ে, শুধু পিছনের একটা ছায়ার স্পর্শে যেন ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করে নিয়তি, আর, ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে খোলা চুলের বোঝা নেড়ে-চেড়ে খোঁপা বাঁধতে থাকে।

--কিসের ভয়? আশ্চর্য হয়ে পালটা প্রশ্ন করেন তিনকড়ি।

—হঠাৎ এই যে একটা বিয়ে করে ফেললে, যে বিয়ের ফল ভালো হতে পারে না।

—কাল শুভ হলে বিয়ের ফল ভালো হবে না কেন নিয়তি?

--তার মানে?

--খুব শুভলগ্নে আমাদের বিয়ে হয়েছে।

কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে যেন ছুটে বের হয়ে যায় নিয়তি। উঠোনের উপর এসে দাঁড়িয়ে একটা হাঁপ ছাড়ে। যেন প্রচণ্ড একটা ঠাট্টার সাপ নিয়তির হৃৎপিণ্ডের উপর ছোবল দেবার জন ফণা তুলে হিসহিস করে উঠেছে।

উঠোনের ওপারে একটা ছোট ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যায় নিয়তি। কপাটের শিকলটাকে ঝনঝন করে বাজিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।--রান্না ঘরের ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে যাবে?

--অ্যাঁ? কি হয়েছে? কি বলছো নিয়তি? বলতে বলতে এগিয়ে আসেন তিনকড়ি।

কপাটটা একটা ধাক্কা দিয়ে খুলে দেয় নিয়তি।--শুধু চাল আছে, আর কিছু নেই। কি রাঁধবো বলে যাও।

এগিয়ে এসে নিয়তির একটা হাত ধরে সান্ত্বনা দেন তিনকড়ি।—এই কথা!...বেশ

তো...এর জন্যে চিন্তা কি?...আমি এখনি আসছি!

ঘরের ভিতরের তাকের উপর থেকে একটা কৌটো তুলে নিয়ে কৌটোর ঢাকনি খোলেন আর টাকা বের করেন তিনকড়ি। পাঁচ-টাকার পাঁচটা নোট।

নিয়তি বলে--তুমিই না বললে, ও টাকাটা করালীবাবুর দেনা শোধের জন্য রেখেছ?

তিনকড়ি--হাঁ, সেই জন্যেই রেখেছিলাম। যাক্‌গে, এখন তো কাজে লাগিয়ে দিই। আগে ভাত-কাপড়ের খরচ, তারপর...নয় কি নিয়তি?

বাজার করতে বের হয়ে যাবার আগে নিয়তির কাছে এগিয়ে এসে নিয়তির মাথায় হাত বোলাতে থাকে তিনকড়ি।--তুমি আসবার পর থেকে আমার সাহস বেড়ে গেছে নিয়তি।

--কি বললে? নিয়তির চোখদুটো কটকট করে জ্বলে।

--আগে হলে দিনটা উপোস করেই কাটিয়ে দিতাম, দেনা শোধের টাকা দিয়ে বাজার করবার সাহসই হতো না।

কেঁপে ওঠে নিয়তির চোখ। এবং শরীরটাও হঠাৎ অবশ হয়ে যায়। দরজার কপাট ধরে কপাটের আড়ালে মুখ লুকোয় নিয়তি।

চলে যান তিনকড়ি। গলাবন্ধ কোট গায়ে, এবং গলার দু-পাশে এলিয়ে দেওয়া পাকানো চাদরের দুটি ঝুল। তাই আর দেখতে পেলেন না তিনকড়ি, নিয়তি তখন কপাটের উপর কপাল ঠেকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে আর চোখ মুছছে।

এমনই শুভলগ্নে বিয়ে হয়েছে যে, দেনাশোধের টাকা খরচ করে উপোসের অভিশাপ থেকে প্রাণটাকে বাঁচাবার খোরাক যোগাড় করতে হচ্ছে। কালের ইচ্ছার ইঙ্গিতটা কি এখনও দেখতে পাচ্ছে না মানুষটা?

কি অদ্ভুত শুভলক্ষণ! এবং কি তার মহিমা! যেন একটা শীতল ও শান্ত অভিশাপের ঘরে এসে বন্দী হয়েছে নিয়তির ভাগ্যটা। মানুষটার মুখের দিকে জ্বালাভরা চোখ নিয়ে তাকালেও মানুষটা প্রসন্নভাবে হাসে। একটুও ভয় নেই, সন্দেহও নেই যে, নিয়তির মতো নারী ওর মতো পুরুষকে ভালবাসতে পারে না। শুভক্ষণের কীর্তি এরই মধ্যে কত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে কিন্তু দেখেও দেখতে পাচ্ছে না মানুষটা। মানুষটার চোখ দুটো প্রচণ্ড একটা অন্ধতায় খুশি হয়ে রয়েছে।

এই তিন মাসের মধ্যে ভুলেও কোন মুহূর্তে তিনকড়ির গা ছোঁয়নি নিয়তি। রোজই খেয়ে উঠে যখন পান চেয়ে হাত বাড়িয়ে দেন তিনকড়ি, তখন পানের ডিবেটাকে তিনকড়ির হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে সরে যায় নিয়তি। নিজের হাতে তিনকড়ির হাতে পান তুলে দেয় না। তিনকড়ির ঐ স্পর্শলোভাতুর হাতের ছোঁয়া পেতে যেন ভয় করে নিয়তির, এবং বুঝতে পারে নিয়তি ঘৃণাও করে। কিন্তু কি আশ্চর্য, নিয়তির সেই সতর্ক কুণ্ঠা আর প্রত্যাখ্যানের আঘাতে একটুও ব্যথিত হয় না তিনকড়ির হাতটা। ব্যস্তভাবে, আর মুখের উপর তেমনই শান্ত হাসি টেনে নিয়ে ডিবের পান তুলে মুখে দেন তিনকড়ি।

দেনাশোধের টাকা নিয়ে বাজার করতে চলে গিয়েছে মানুষটা। আর কিছুক্ষণ পরেই হাসতে হাসতে চাল ডাল ঘি তেল মশলার বোঝা নিজের হাতেই বয়ে নিয়ে ফিরে আসবে। সেই চাল ডাল আর মশলার দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করবে না নিয়তির। তবু ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে, আর রাঁধতে হবে। অদৃষ্টের একটা ক্ষুধিত ঘৃণাকে ভাত খাইয়ে তোয়াজ করতে হবে। কেন? কিসের জন্য? এই প্রশ্নের জ্বালা আর সহ্য করতে পারে না নিয়তি। ছটফট করে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে, আর একটা বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকে। নিয়তির প্রাণটাই যেন একটা ঘুম ঘুম অবসাদের আবেশে নিঝুম হয়ে যায়।

--নিয়তি!

ডাক শুনতে পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসে নিয়তি। কে জানে কখন ফিরে এসেছে মানুষটা। বাজার নিয়ে ফিরে এসেছে। এখনই রান্না করতে হবে। কি ভয়ানক শাস্তি! ছিঃ, এমন রান্না না রাঁধলে আর এমন খাওয়া না খেলে কি নিয়তির অদৃষ্টটা শুকিয়ে মরে যেত?

তিনকড়ির মুখের দিকে না তাকিয়ে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে শিথিল খোঁপাটাকে ভেঙে নিয়ে বাঁধতে বাঁধতে নিয়তি যেন একটা ঘুমভাঙা আক্রোশের সুরে আস্তে চেঁচিয়ে ওঠে।--পারবো না।

তিনকড়ি হাসেন--কি?

নিয়তি--রাঁধতে পারবো না।

তিনকড়ি--রান্না হয়ে গিয়েছে। খাবে চল।

কেঁপে ওঠে নিয়তির চোখ দুটো। তিনকড়ি বলেন--বাটা মাছের ঝোল রেঁধেছি।

--কি বললে? যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নিয়তি।

তিনকড়ি বলেন--খবরটা তোমার মার কাছেই শুনেছি নিয়তি, তুমি বাটা মাছের ঝোল খেতে ভালবাসো।

ঘরের দেয়ালের কোণের কাছে মুখটাকে লুকিয়ে ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিয়তি। আঁচল তুলে চোখ ঢাকা দেয়। তিনকড়ি বিচলিতভাবে ডাকেন--কি হল নিয়তি?

নিয়তি ফুঁপিয়ে ওঠে--যাও, তুমি খেয়ে নাও। আমার যখন ইচ্ছে হয় খাব।

নিকেল-ফ্রেমের চশমা নাকের কাছে ঝুলছে। টুলের উপর বসে কাজ করছেন তিনকড়ি আর ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক করে দেখতে থাকে নিয়তি। নিয়তির জীবনের একটা নির্মম পরিহাস কেমন নিশ্চিন্ত মনের আরামে স্বচ্ছন্দে কাজ করে চলেছে।

--ইমপালস্ পিন বদলাতে হবে, দু-টাকা পাঁচ আনা চার্জ পড়বে। বলুন।

আস্তে আস্তে কথা বলেন তিনকড়ি।

আগন্তুক বলে--না দরকার নেই। অত বড় ওয়াচ ডিলার আর মেকার মুখার্জী ব্রাদার্স দেড় টাকায় সারিয়ে দেবে বলেছে।

চলে যায় আগন্তুক। আর একজন আসে। আগন্তুকের হাতে ছোট একটা ঘড়ি তুলে দিয়ে তিনকড়ি বলেন--স্প্রিং বদলে দিয়েছি, আর প্যালেট ও লিভারটাতে যে গোলমাল ছিল, তাও ঠিক করে দিয়েছি। এইবার আপনার ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে কোন শুভক্ষণের একচুল এদিক-ওদিক হবে না। কবে আপনার বাস্তু প্রতিষ্ঠা!

--কাল সকাল আটটা আটান্নতে।

--ঠিক আছে। আগন্তুকের হাতে ঘড়িটা তুলে দিয়ে চার টাকা চার আনা আদায় করেন তিনকড়ি।।

পিছনের দরজার ফাঁকটা যেন ছোট্ট একটা হাসি হেসে তারপরে খট্ করে একটা তুচ্ছতার শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। নিকেল-ফ্রেমের চশমা নাকের উপর চেপে ধরে আর মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকান তিনকড়ি। তারপরেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করেন।

আবার দরজা খুলে যায়। নিয়তি এগিয়ে এসে দোকানের সেই জীর্ণ চেহারার দিকে তাকিয়ে যেন হাসতে থাকে।

তিনকড়িও হাসেন--তুমি তো জানো না নিয়তি, পাড়ার ছেলেরা আমার কি নাম দিয়েছে!

--কি নাম?

--কালপুরুষ।

মুখ কুঁচকে হাসি চাপে নিয়তি।--বাঃ, বেশ ভালো নাম।

আলমারির দিকে হাত তুলে মলিন চেহারার সেই টাইম-পীসটাকে দেখিয়ে দিয়ে তিনকড়ি যেন অদ্ভুত এক অহংকারের আবেগে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে--দেখছো নিয়তি?

--কি?

--ঐ টাইম-পীস।

--হ্যাঁ।

--এই ঘড়িটার ভুল হয় না।

--তার মানে?

--শুভক্ষণ ধরিয়ে দিতে একটুও ভুল করে না। এই ঘড়ির সময় দেখে যারা শুভক্ষণ ধরেছে, তাদেরই শুভ হয়েছে। আশ্চর্য! ত্রিশ বছর ধরে এই আশ্চর্য দেখে আসছি। এমন কি...।

--কি?

--তোমার বাবার সঙ্গে হঠাৎ যেদিন এখানেই দেখা হয়ে গেল, সেদিন এই ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলাম যে, একটা শুভ ব্যাপার হবেই হবে। তোমার বাবার সঙ্গে সন্ধ্যা সাতটা পঁয়ত্রিশে দেখা হয়েছিল। পাঁজি খুলে দেখলাম, এগারই বৈশাখ সন্ধ্যা সাতটা পঁয়ত্রিশের চেয়ে ভালো শুভক্ষণ খুবই কমই হয়।...তার পরের আষাঢ়েই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে।

নিয়তির মুখের দিকে তাকিয়ে যেন মুগ্ধ হয়ে হাসতে থাকেন তিনকড়ি।

--এইবার বুঝতে পারছো নিয়তি, কেন এই বিয়ে হলো। একেই বলে কালের ইচ্ছা...নয় কি নিয়তি?

নিয়তি বলে--হ্যাঁ।...কিন্তু আজ আর কিছুক্ষণ পরেই ছোটকাকা আসবেন।

--কেন?

--আমি আজ যাব।

--কোথায়?

--কোথায় যাব বুঝতে পাব না? তাও বলতে হবে?

--কাশীপুরে? বাবার কাছে?

--হ্যাঁ। বাবার চিঠি এসেছে। আজই চলে যেতে লিখেছেন।

--কেন নিয়তি? তিনকড়ির মুখের হাসি যেন মুমূর্ষু মানুষের মুখের করুণ যন্ত্রণার মতো কাতরে কাতরে কাঁপতে থাকে। নিয়তি চলে যাবে, কালের ইচ্ছাতেও এমন অঘটন ঘটতে পারে বলে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনকড়ি।

নিয়তির চোখে একটা কঠোর সংকল্পের উল্লাস ঝিকঝিক করে হাসে। কালের ইচ্ছার রকম দেখে এতদিনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন এক সখের কালপুরুষ! বিয়ে করবার কোন দরকার ছিল না এবং বিয়ে করা উচিত ছিল না যার, একটা নারীর জীবনকে কোন সুখে সুখী করবার শক্তি নেই যার, সে মানুষ, কে জানে কেন, একটা নিষ্ঠুরতার নেশায় পাগল হয়ে নিয়তির মতো মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এল? কালের ইচ্ছার অজুহাত দেখিয়ে একটা মেয়ের ত্রিশ বছর বয়সের স্বপ্ন আর পিপাসাকে খুন করেছে যে, সেই মানুষের চোখের এই আতঙ্ক দেখলে আরও ঘৃণা হয়। কি আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত নিয়তির মনের এই ঘৃণাকে দেখতেই পায়নি মানুষটা। নিয়তির মনের ঘৃণা যখন এক-এক বার হঠাৎ ভয়ে দুর্বল হয়ে কেঁদে ফেলেছে, তখনও বুঝতে পারেনি যে এটা অভিমানের কান্না নয়, এটা একটা ত্রিশ বছর বয়সের মেয়ের জীবনের বিদ্রোহ।

কাশীপুরের বাড়িতে পর পর চিঠি দিয়েছে নিয়তি--আর সহ্য করা সম্ভব নয়। কাশীপুরের বাড়িও শেষ পর্যন্ত চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, না, আর সহ্য করার দরকার নেই। চলে এস।

তিনকড়ির হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়তির সেই কঠোর চোখের সংকল্প একটুও হতভম্ব হয় না। নিয়তি বলে--চলে যাচ্ছি, যাওয়া উচিত। এ ছাড়া আর কি বলবো তোমাকে বললে বুঝবেই বা কি?

--তুমি কি আমাকে ঘেন্না করে চিরকালের মতো...।

তিনকড়ির করুণ প্রলাপ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কারণ দরজার বাইরের কড়া নেড়ে কে যেন হাঁক দিয়েছে--নিয়তি, আমি ছোটকাকা এসেছি।

ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনকড়ি। চমকে ওঠে নিয়তি। কেঁপে ওঠে নিয়তির হাতটা। নিয়তির মুক্তির লগ্নটাকে বাধা দিয়ে একটা অন্ধ আবদার ডুকরে উঠেছে। আঁচল দিয়ে তিনকড়ির মুখটাকে চেপে ধরে ভ্রূকুটি করে নিয়তি। এই প্রথম তিনকড়ির জীবনের উপর নিয়তির স্পর্শের স্বাদ লুটিয়ে পড়েছে। নিয়তি বলে--চুপ কর।

হেসে ওঠে তিনকড়ির মুখ। আলমারির টাইম-পীসের দিকে তাকায়। তারপরেই পঞ্জিকা খুলে চেঁচিয়ে ওঠে।--সাতটা এগার। চমৎকার শুভক্ষণ। দেখছো নিয়তি, আমার টাইম-পীসও কাঁটায় কাঁটায় বলছে, সাতটা এগার। খুব শুভক্ষণে তুমি যাত্রা করলে নিয়তি।

টাইম-পীসের দিকে দু-চোখের একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ে নিয়তি বলে--এই বিশ্বাস নিয়েই বসে থাকো, খুব হাসতে থাকো, আমি যাই।

তিনকড়ি--সত্যি নিয়তি। তুমি ফিরে এসে নিশ্চয় দেখতে পাবে, আমি হাসছি। আমার আর কোন দুঃখ নেই। আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বড়ই শুভক্ষণ। এস...এস।

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নিয়তি--হ্যাঁ, চলুন ছোটকাকা, আমি তৈরি।

নিকেল-ফ্রেমের চশমা নাকের কাছে ঝুলতে থাকে, কাজ করেন তিনকড়ি। মাঝে মাঝে খরিদ্দার আসে। কেউ কেউ হেসে প্রশ্ন করে--এত রোগা হয়ে গেলেন কেন কালপুরুষদা?

তিনকড়ি হাসেন--কালের ইচ্ছা।

ঘড়ির দোকানের সান্ধ্য আসর আবার জমে উঠেছে। জীবনবাবু আসেন, অনাথবাবু আসেন, এবং আরও অনেকে আসে। সকলেই সন্দেহ করেন, যদিও সেই সন্দেহ নিয়ে কেউ আলোচনা করেন না, তিনকড়ির স্ত্রী বোধহয় আর আসবে না। আসবার হলে কি এই এক বছরের মধ্যে অন্তত একবারও আসতো না?

কিন্তু তিনকড়ির মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, ওরই মনে কোন সন্দেহ নেই। বেশ নিশ্চিন্ত মনে, সেই গম্ভীর মুখ, আর মাঝে মাঝে মুখের উপর সেই শান্ত হাসি টেনে নিয়ে কথা বলেন তিনকড়ি।

শুধু দিন দিন রোগা হয়ে যেতে থাকেন তিনকড়ি। কোন অসুখ নেই, তবু গাছের ভাঙা ডালের মতো শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। কলপ ক্ষয়ে গিয়ে লাল হয়ে গিয়েছে তিনকড়ির যে মাথার চুল, সেই মাথার চুল এইবার যেন দিনে দিনে ফিকে হয়ে শেষে একেবারে সাদা হয়ে যায়। পাড়ার ছেলেরা আড়ালে আড়ালে বলে--এইবার সত্যিই মানিয়েছে তিনকড়িদাকে, একেবারে খাঁটি কালপুরুষ।

জীবনবাবু জানেন, তিনকড়ির শ্বশুরবাড়ি কাশীপুরে। তবু এই এক বছরের মধ্যে, টালিগঞ্জের এই বাড়ি আর দোকানের ঝাঁপ একটি দিনের মতো বন্ধ রেখে একবারও কাশীপুর ঘুরে এল না তিনকড়ি। অনাথবাবু বলেন--কিন্তু প্রতি মাসে ত্রিশ-চল্লিশটা টাকা কাশীপুরে স্ত্রীর কাছে ঠিক পাঠিয়ে দেয় তিনকড়ি, সে খবর জানেন তো?

--জানি। একটু বিস্ময় প্রকাশ করেন জীবনবাবু।

টালিগঞ্জের গলির ভিতর দিয়ে শীতের হাওয়া বয়ে যায়। বৈশাখের জ্বালাও লাগে। আর বর্ষার জলে গলির কাদা পিছল হয়ে যায়। তিনকড়ির নিকেল-ফ্রেমের চশমা তেমনই নাকের কাছে ঝুলতে থাকে, কাজ করেন তিনকড়ি। ত্রিশ বছর বয়সের টাইম-পীসে ঠিক নিয়মমত দম দিয়ে এবং কানের কাছে তুলে নিয়ে শব্দ শোনেন, টিক-টিক-টিক, কালের ইচ্ছায় কত শুভক্ষণ আসছে আর যাচ্ছে, শুনতে পান তিনকড়ি।

তিনকড়িকে একদিন হাঁসফাঁস করে হাঁপাতে দেখে প্রশ্ন করেন সান্ধ্য বৈঠকের জীবনবাবু--

এ কি হলো তিনকড়ি?

তিনকড়ি হাসেন--কালের ইচ্ছায় যা হয়, তাই হয়েছে জীবনবাবু।

একদিন মুখ খুলে বলেই ফেলেন অনাথবাবু--কাশীপুরের ব্যাপার কি তিনকড়িবাবু? উনি আসবেন কবে?

কাচের গোলকের মতো দুটো চোখ তুলে আস্তে আস্তে হাসেন তিনকড়ি।--কাল সহায় হলেই আসবেন।

আবার ঘাড় ঝুঁকিয়ে খুটখাট করে কাজ করেন তিনকড়ি। এবং নিজের মনেই বিড়বিড় করেন--কাল পূর্ণ না হলে কেউ আসে না, যায়ও না!

জীবনবাবু আর অনাথবাবু ওঠেন। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তাকান তিনকড়ি।--আমিও যাব।

অনাথবাবু হেসে ওঠেন--কোথায়? কাশীপুর?

তিনকড়িও যেন গম্ভীর মুখের একটা শীর্ণ হাসি চেপে চেপে বললেন--ভোর পাঁচটা তিন মিনিটটা খুব শুভক্ষণ।--এত ভোরে ট্রাম পাওয়া যাবে তো অনাথবাবু?

জীবনবাবু বলেন--বাস পাবেন।

রাত দশটাও পার হয়নি। জীবনবাবু ছুটে এসে তিনকড়ি দত্তের দোকানের দরজার কাছে দাঁড়ালেন। অনাথবাবুও আসতে দেরি করলেন না। দুজনেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। চন্দ্র ডাক্তারের চাকরটাই খবর দিয়েছিল।

--কখন মারা গেলেন কালপুরুষদা? ঘড়ির দোকানের সামনে পাড়ার ছেলেদের ভিড় আলোচনা করে। চন্দ্র ডাক্তার বললেন, পাশের দোকানদার খবর দিয়েছিল। আমি এসেই দেখি, হয়ে গিয়েছে। একটা ঘড়ির ওপর কান পেতে পড়ে আছেন। হার্ট ফেলিওর!

বারান্দায় নিয়ে এসে মাদুরের উপর তিনকড়িকে এরই মধ্যে কারা যেন শুইয়ে দিয়েছে। বোধহয় চন্দ্র ডাক্তারের চাকর আর পাশের দোকানদার।

তারপর? একটা ব্যবস্থা করতে হয়। জীবনবাবুর নির্দেশে পাড়ার ছেলেরা সব ব্যবস্থা করে ফেলে। শবযাত্রার সব আয়োজন।

কিন্তু তারপর? আর দেরি কেন? পাড়ার ছেলেরা প্রশ্ন করে, এবার ঘাটে রওনা হলেই তো হয়।

জীবনবাবু বলেন--একটু অপেক্ষা কর!

অনাথবাবু বলেন--কাশীপুরে লোক পাঠিয়েছি। তিনকড়িবাবুর স্ত্রী একবার আসুক, শেষ দেখা দেখে নিক। তারপর--

কাশীপুর থেকে আসতে এত দেরি হবার কথা নয়। সত্যিই তিনকড়ির স্ত্রী আসবেন কি? জীবনবাবু আর অনাথবাবু আড়ালে দাঁড়িয়ে আলোচনা করেন।

ভোর হয়ে এসেছে। তিনকড়ির স্ত্রী আসবেন কিনা সন্দেহ হচ্ছে। ছেলেদের ভিড়ের সঙ্গে কারা যেন আলোচনা করে, এবং হেসে ওঠে ছেলেরা।--আপনি কি পাওনা টাকা আদায় করতে এসেছেন তারকবাবু?

তারকবাবু হাসেন--লোকটাই যখন চলে গেল, তখন আমার তিনশো টাকাও যাবেই। দুঃখ করে লাভ নেই।

পরমেশবাবু বলেন--আমার একটা দামী ঘড়ি সারতে দিয়েছিলাম। কে জানে, সেটা আর ফেরত পাওয়া যাবে কি না?

হেসে ওঠে ছেলেরা। এবং একটি ট্যাক্সি এসে থামে। তিনকড়ির স্ত্রী এসেছে।

--তোমরা একটু সরে যাও। সবাইকে অনুরোধ করেন জীবনবাবু।

তিনকড়ির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল নিয়তি। নিয়তির চোখ

দুটো যেন দুটো পাথরের চোখ। চোখের উপর থরথর করছে একটা ভ্রূকুটি।

--চল এবার। ডাক দেন জীবনবাবু।

তিনকড়িকে খাটের উপর তোলবার জন্য এগিয়ে আসে ছেলেরা। কিন্তু একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ের চমক লেগে সকলেই থমকে যায়। কেউ দু-পা পিছিয়ে যায়, কেউ হাত সরিয়ে নেয়, কেউ কেঁপে ওঠে। তিনকড়ির টাইম-পীসের অ্যালার্ম বেজে উঠেছে।

পাঁচটা তিন মিনিট।

একটা ছেলে ভয়ে ভয়ে বিড়বিড় করে--কালপুরুষদা, কালপুরুষদার টাইম-পীস, কি সাংঘাতিক, একবারে একদম কাঁটায় কাঁটায়...।

জীবনবাবু বলেন--কি আশ্চর্য!

অনাথবাবু বলেন--তাই তো।

আর, নিয়তি যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে এসে ঘড়িটাকে আঁকড়ে ধরে। শাড়ির আঁচল মুঠো করে ঘড়িটাকে চেপে চেপে সেই শব্দের ঝংকার বন্ধ করতে চেষ্টা করে। যেন কারও মুখ বন্ধ করতে চাইছে নিয়তি।

--মাগো! ফুঁপিয়ে ওঠে নিয়তি।

এক ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে কাছে এগিয়ে গিয়ে ভীতস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন--ওকি? ওকি? কি করছিস নিয়তি?

নিযতি বলে---মানুষটা যে খিল খিল করে হাসছে ছোটকাকা।

ভৃগু ও পুলোমা

মহর্ষি ভৃগু ডাকলেন--পুলোমা!

স্বামী ডাকছেন, মহাতপা আর্য ভৃগু, পুলোমার স্বামী।

--আদেশ করুন আর্য।

পুলোমা ব্যস্ত হয়ে, অন্য কাজ ফেলে রেখে ভৃগুর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। স্বামীর আহ্বানে এমন ক'রে সাড়া দেওয়াই ধর্মপত্নীর কর্তব্য। আর্যের সংসারে বিবাহিতা নারীর এই রীতি।

ভৃগুর সংসারে কর্তব্যই সবচেয়ে বড় বিধান। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পুলোমার জীবন ভৃগুর জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই সংসারে দুজনের কেউ কখনও কর্তব্য বিস্মৃত হয় না। ভৃগু তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্তব্যে পুলোমাকে স্মরণ করেন, পুলোমাও ভৃগুর প্রতিটি অনুরোধ ও আহ্বানে সাড়া দেয়।

শুধু পুত্রার্থে ভার্যা গ্রহণ করেছেন ভৃগু। তাঁর সেই সংস্কার সফলও হতে চলেছে, কারণ পুলোমা এখন অন্তর্বত্নী। পুলোমার জীবনে মাতৃত্বের আবির্ভাব আসন্ন হয়ে উঠেছে।

পুলোমাও তার জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করে। সমাজে ভৃগুজায়ারূপে পুলোমা যে গৌরব অনুভব করে, ভৃগুসন্তানের মাতারূপে তার সেই গৌরব এইবার আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যিনি আর্য ঋষির ধর্মপত্নী, তাঁর পক্ষে জীবনে এই তো ধন্য হওয়ার মত ঘটনা।

পুলোমা কাছে এসে দাঁড়াতেই ভৃগু বলেন--আমি স্নানে চললাম পুলোমা।

পুলোমা বলে--আসুন।

ভৃগু চলে যাবার পর, ঠিক পূর্বের মত আবার গৃহকর্মে মন দিতে পারে না পুলোমা। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনা হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু আজ নয়, এবং স্বামীর এই ক্ষণকালের অন্তর্ধানের জন্যও নয়, মাঝে মাঝে কে জানে কিসের জন্য হঠাৎ এই রকম অন্যমনা হয়ে যায় পুলোমা। পুলোমা নিজেও তার এই বৈচিত্র্যের অর্থ বুঝতে পারে না।

পুলোমার এই আকস্মিক অন্যমনা আবেশ লক্ষ্য করেন একজন, বৃদ্ধ হুতাশন। ভৃগুর কুটীরে গৃহরক্ষকরূপে রয়েছেন হুতাশন। পুলোমার শিশুকাল থেকেই পুলোমাকে তিনি জানেন। পিতার আলয়ে যতদিন যেভাবে কুমারী-জীবন যাপন করেছে পুলোমা, তার সকল ইতিহাস জানেন হুতাশন। আজ স্বামিগৃহে ঋষিবধূ হয়ে যেভাবে জীবনযাপন করছে পুলোমা, তা'ও প্রত্যক্ষ করেন হুতাশন। তাই, আর কেউ নয়, শুধু বৃদ্ধ হুতাশন লক্ষ্য করেন, পুলোমা মাঝে মাঝে অন্যমনা হয়ে যায়।

--পুলোমা!

চমকে ওঠে ভৃগুপত্নী পুলোমা। নাম ধ'রে কে যেন ডাকছে মনে হয়। কিন্তু এই কণ্ঠস্বর ধর্মপতি ভৃগুর কণ্ঠস্বর নয়, গৃহগুরু বৃদ্ধ হুতাশনেরও নয়। তবু মনে হয়, যেন এক পরিচিত কণ্ঠস্বর। অতীতের এক বিস্মৃত স্বপ্নলোক থেকে যেন এই আহ্বান ভেসে এসে পুলোমার চেতনার দ্বারে আঘাত করছে। সমাজ সংস্কার ও কর্তব্যের বাইরে থেকে বুকভরা আকুলতা নিয়ে এক তৃষ্ণাতুর অনিয়ম যেন পুলোমাকে সারা জগতে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এতদিনে সে এসে পৌঁছেছে।

বুঝতে পারে পুলোমা, হ্যাঁ, সে-ই এসেছে। ভৃগুপত্নী পুলোমার সেই কৈশোরের নর্ম-সহচর, প্রথম যৌবনের প্রণয়াস্পদ এক অনার্য তরুণ, তারও নাম পুলোমা। সনাম সখা অনার্য

পুলোমা তার প্রথম প্রেমের অধিকার নিয়ে আজ পুলোমার পতিব্রত জীবনের দ্বারে এসে কঠিন পরীক্ষার মূর্তি ধ'রে দাঁড়িয়েছে।

তরুণী পুলোমার অনুভবের জগতে যেন বহুদিনের বন্ধনে আবদ্ধ এক ঝঞ্ঝাসমীর হঠাৎ পথ খোলা পেয়ে আবার উদ্বেল হয়ে ওঠে। ঋষির সংসারে কর্তব্যচারিণী নারীর মূর্তিকে যেন এক নির্বাসিত বসন্ত দিনের সৌরভ এসে জড়িয়ে ধরেছে। সুন্দরী পুলোমার দেহ ব্যাকুলা মাধবী বল্লরীর মত সেই স্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

অনার্য পুলোমা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার প্রথম প্রণয়ভাগিনী ও জীবনবাঞ্ছিতা পুলোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

অনার্য পুলোমা প্রসন্ন স্বরে আহ্বান জানায়--এস পুলোমা।

আর্যা পুলোমা সন্ত্রস্তভাবে বলে--কোথায়?

অনার্য পুলোমা--আমার সঙ্গে, আমার জীবনে।

আর্যা পুলোমা তার হৃদয়ের চাঞ্চল্য সংযত ক'রে বলে--কোন্ অধিকারে তুমি আজ এই ভয়ংকর আহ্বান নিয়ে ঋষিবধূর কুটীরের কাছে এসেছ অনার্য?

অনার্য পুলোমা বলে--তোমাকে ভালবেসেছি, এই অধিকারে।

আর্যা পুলোমা--কিন্তু আমি কোন্ অধিকারে তোমার কাছে যাব?

অনার্য পুলোমা--প্রেমিকা হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকারে।

অনার্য পুলোমার ক্লান্ত মুখচ্ছবি যেন দুঃসহ এক জ্বালাময় আবেগে তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলোমার আরও কাছে এগিয়ে এসে স্পষ্টতর ভাষায় বলে--আমি ঋষি নই, আর্য নই, তপস্বীও নই। আমি শুধু প্রেমিক। আমি পুত্রার্থে তোমাকে চাই না পুলোমা, তোমারই জন্য তোমাকে চাই।

যেন ভক্তের স্তবসঙ্গীতের মত ধ্বনিত হয়েছে এই অভিনব ভালবাসার তত্ত্ব, এই ভয়ানক আবেদন। অনার্য প্রেমিক যেন অদ্ভুত এক অহেতুক প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে শুধু অহমিকাময়ী পুলোমাকে মহীয়সীর সম্মান দান করছে। যেন জগতের জন্য পুলোমা নয়, পুলোমার জন্যই এই জগৎ। কন্যা নয়, বধূ নয়, মাতা নয়, শুধু নারীরূপে তরুণী পুলোমার ভিন্ন একটি সত্তা যেন আছে এবং সেই সত্তা উপেক্ষায় অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। অনার্য পুলোমা আজ নারীর সেই সত্তার কাছেই অনন্ত সমাদরের উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই আবেদনের দুর্বার এক শক্তি আছে।

অনার্য পুলোমা বলে--আমার আকাঙক্ষা তোমার মধ্যেই সম্পূর্ণ, তোমার বাইরে নয়, তোমার অতিরিক্ত নয়। আমার সমাজ সংসার জগৎ, সবই তুমি। তুমি আমার প্রেমের প্রথমা, তুমি আমার প্রেমের অন্তিমা।

আর্যা পুলোমার মনে হয়, এই ঋষির কুটীরে যেন তার আত্মা বন্দিনী হয়ে আছে। মাত্র পুত্রার্থে গৃহীত ভার্যার সম্মান নিয়ে, নিতান্ত এক প্রয়োজনের উপচাররূপে এই ঋষিকুটীরে সে স্থান লাভ করেছে। তার বেশি কোন গৌরব এখানে নেই। এই জীবন শাস্ত্রসম্মত ও সমাজসম্মত, কিন্তু হৃদয়সম্মত নয়।

আর্যা তরুণীর, ঋষিবধূ পুলোমার সব প্রতিবাদের শক্তি যেন ঐ অনার্য আবেদনের টানে দূরান্তরে ভেসে যায়। তবু শেষবারের মত নিজেকে সংযত করে পুলোমা। ভীতা অথচ প্রলুব্ধা বিহঙ্গীর মত যেন আকাশভরা অবাধ পবনের ঝঞ্ঝার দিকে তাকিয়ে বলে--না পুলোমা, আমাকে ধর্মের বাইরে যেতে বলো না।

অনার্য পুলোমা বিস্মিত হয়--ধর্ম কি?

আর্যা পুলোমা--এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই।

অনার্য পুলোমা--কিন্তু আমি আজ এই প্রশ্নের উত্তর জেনে যাব পুলোমা, ধর্ম কি?

আর্যা পুলোমা বিব্রতভাবে বলে—আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। গৃহগুরু বৃদ্ধ হুতাশন রয়েছেন, তাঁরই কাছে গিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর শুনে নাও।

অনার্য পুলোমা—বেশ, চল সংসারের সব ইতিহাসের সাক্ষী হুতাশনের সম্মুখে গিয়ে তুমি আমার পাশে একবার দাঁড়াও। তারপর আমি তাঁকে প্রশ্ন করব।

বৃদ্ধ হুতাশনের সম্মুখে গিয়ে দু'জনে দাঁড়ায়। অনার্য পুলোমা প্রশ্ন করে—ভগবান হুতাশন, আপনি একদিন আমাদের দু'জনকে দেখেছেন, জীবনের প্রভাতবেলায় আমরা দু'জনে যখন দু'জনের খেলার সাথী হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম।

হুতাশন শান্তস্বরে বলেন—হ্যাঁ।

অনার্য পুলোমা—আজ আবার অনেকদিন পরে আমরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছি। আপনি বলুন, এর মধ্যে বিসদৃশ কিছু দেখেছেন কি? এর মধ্যে অন্যায় কোথায়? আপনি বলুন, ধর্ম কি?

হুতাশন—যা সত্য, তাই ধর্ম।

অনার্য পুলোমা—সত্য কি?

হুতাশন—ঘটনাই একমাত্র সত্য।

অনার্য পুলোমা—তবে বলুন, আপনার সম্মুখে এই যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দুটি জীবনের মূর্তি, এর মধ্যে কি কোন সত্য নেই? প্রথম ভালবাসার অধিকার কি মিথ্যা? যাকে চিরজীবন ধ'রে অন্বেষণ ক'রে বেড়াই, তাকে জীবনের কাছে পাওয়ার দাবি কি মিথ্যা?

হুতাশন—না, মিথ্যা নয়।

আর্যা পুলোমা বিস্মিতভাবে হুতাশনের মুখের দিকে তাকায়। এবং মুগ্ধভাবে তার কৈশোরের সখা অনার্য তরুণ পুলোমার মুখের দিকে তাকায়।

অনার্য পুলোমা আর্যা পুলোমার হাত ধ'রে বলে—এস পুলোমা!

হুতাশনের সান্নিধ্য থেকে দু'জনে ধীরে ধীরে চলে এসে ঋষিকুটীরের নিস্তব্ধ আঙ্গিনায় একবার দাঁড়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়। অন্তঃসত্ত্বা ধর্মপত্নীর মূর্তি যেন মুহূর্তের মধ্যে এই সংসারের আঙ্গিনা হতে মুছে গিয়েছে। যেন তরুণী পুলোমার স্বপ্নলোক থেকে হঠাৎ জাগরিতা এক প্রেমকেলিকামিনীর পিপাসিত বাসনার মূর্তি অনার্য পুলোমার হাত ধ'রে সংস্কার ও সমাজের বাইরে চলে যায়।

বনোপ্রান্তের এক কুটীরে প্রবেশ ক'রে অনার্য তরুণের সহচরী আর্যা পুলোমা অনুভব করে, ধন্য এই প্রেমিকতার জীবন।

অরণ্যপুষ্পের সৌগন্ধ্য বাতাসে ছুটাছুটি করে, কিন্তু কি আশ্চর্য, তরুণী পুলোমা যেন আরণ্য কণ্টকে বিক্ষতদেহা হরিণীর মত বেদনাতুর দৃষ্টি তুলে আকাশপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রেমিকেরই শত সাগ্রহ প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না তরুণী পুলোমা। কোথা থেকে যেন বাস্তব সংসারের এক সংশয় এসে তরুণী পুলোমার অবাধ প্রেমিকতার জীবনে কঠিন প্রশ্নরূপে দেখা দিয়েছে।

অনার্য পুলোমার প্রশ্নে বিব্রত হয়ে আর্যা পুলোমা একদিন বলে—তুমি কি জান যে, আমি অন্তঃসত্ত্বা?

অনার্য পুলোমা—জানি।

আর্যা পুলোমা—ভৃগু ঋষিরই সন্তানকে আমি ধারণ করছি, তা'ও নিশ্চয় জান?

অনার্য পুলোমা—জানি।

আর্যা পুলোমা—কিন্তু সেই সন্তানের জীবনে তার পিতৃপরিচয় চিরকাল অজানা হয়েই থাকবে।

অনার্য পুলোমা সান্ত্বনার সুরে বলে—কিন্তু পিতৃস্নেহ তার কাছে অজানা হয়ে থাকবে না পুলোমা। তাকে লালন করবার জন্য আমি আছি, কোন দুঃখ করো না পুলোমা।

আর্যা পুলোমার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ রূঢ় হয়ে ওঠে—দুঃখ না ক'রে পারি না। ঋষির সন্তান পৃথিবীতে অনার্য পুলোমার সন্তানরূপে পরিচয় বহন করবে, আমি আমার সন্তানকে এতটা মিথ্যা ক'রে দিতে পারব না।

অনার্য পুলোমার উদ্বিগ্ন বক্ষের অস্থিনিচয় যেন বেদনায় দীর্ণ হয়ে যায়। ব্যথিত স্বরে বলে—এ কি বলছ পুলোমা?

আর্যা পুলোমা—পারব না, এত ভয়ংকর ধর্মহীন হতে পারব না। সন্তানের পরিচয় মিথ্যা ক'রে দিতে পারব না। সংসারের ভার্গবকে পৌলমেয় ক'রে দিতে পারব না।

অসহ এক অপমান যে আকস্মিক বজ্রপাতের মত অনার্য পুলোমার সব প্রেমিকতার গর্ব গৌরব ও প্রসন্নতাকে চূর্ণ ক'রে দেয়। অনার্য! অনার্য! অনার্য! আর্যা পুলোমার কাছে সে আজ হীনশোণিত এক প্রাণী ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেমিকের অন্তরের চেয়ে জাতিশোণিতের উত্তাপকেই বেশি পূজনীয় বলে আজ উপলব্ধি করতে পেরেছে এক আর্যা নারীর মন। অনার্য পুলোমা নিঃশব্দে মাথা হেঁট ক'রে বসে থাকে।

হঠাৎ বিচলিত হয় অনার্য পুলোমার দুই চক্ষুর কৌতূহল। দেখতে পায় অনার্য পুলোমা, আর্যা পুলোমার সারা দেহ মন্থিত ক'রে এক অভিনব বেদনার ঝড় আকুল হয়ে উঠছে। সে বেদনায় আর্যা তরুণীর কমনীয় দেহ ভূতলে লুটিয়ে পড়ে।

—ভয় নেই পুলোমা, আমি কাছে আছি পুলোমা। অনার্য পুলোমা ব্যগ্রভাবে আর্যা পুলোমার একটি হাত ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

যেন আর্যা পুলোমার জীবনের এক পবিত্র মুহূর্তে অশুচি এক স্পর্শ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর্তনাদ করে আর্যা পুলোমা—দয়া ক'রে দূরে সরে যাও অনার্য। ভৃগু ঋষির সন্তান আসছে, জন্মলগ্নের প্রথম মুহূর্তে তাকে আমি অপিতার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে পারব না।

শান্ত দৃষ্টি তুলে অনার্য পুলোমা তারই প্রণয়াস্পদা নারীর এই কঠোর ধিক্কার শুনতে থাকে। না, আর কোন সন্দেহ নেই ; আর্যা পুলোমা তার জীবনের সকল আগ্রহ দিয়ে আবার তার সমাজ ও সংস্কারকে ফিরে পেতে চাইছে। ভৃগুপত্নী পুলোমার সম্মুখে অনার্য প্রেমিক পুলোমার অস্তিত্ব একেবারে অর্থহীন।

দূরে সরে যায় অনার্য পুলোমা।

সূর্য অস্ত যাবার আগেই এক রক্তিম মুহূর্তে আর্যা পুলোমার সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু শিশু ভার্গবের ক্রন্দনধ্বনি ছাড়া সেই কুটীরের বাতাসে আর কোন শব্দের চাঞ্চল্য জাগে না। সদ্যোজাত আর্য শিশুর প্রথম কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কুটীরোপান্তের তরুতলের ছায়ায় এক অনার্যের শেষ নিঃশ্বাস শেষ আর্তস্বর উৎসারিত ক'রে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। মৃত্যু বরণ করেছে অনার্য পুলোমা।

তরুণী পুলোমা এক নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ ক'রে ভৃগুর আশ্রমের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়েছিল। আর দাঁড়িয়েছিলেন ভৃগু, সেই প্রবেশপথে অটল নিষেধের প্রতিমূর্তির মত। এবং দাঁড়িয়েছিলেন বৃদ্ধ হুতাশন, যেন ঘটনার আর এক সত্য দেখবার জন্য।

শ্লেষবিহসিত স্বরে প্রশ্ন করেন ভৃগু—আবার কোন্ স্বপ্নের দুঃসাহসে উৎসাহিত হয়ে আর্য ঋষির সংসারের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ পুলোমা?

পুলোমা বলে—আমার স্বপ্নে আর কোন দুঃসাহস নেই ঋষি। আমি আপনারই পিতার সান্ত্বনায় উৎসাহিত হয়েছি।

ভৃগু—কি বললে পুলোমা?

পুলোমা--লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে আমাকে আশ্বাস করেছেন। তিনি আশা করেন, তাঁর পুত্রও তাঁরই মত করুণাপরবশ হয়ে তাঁর পুত্রবধ বেদনাকে বুঝতে পারবেন।

ভৃগু--পিতা ব্রহ্মা তোমার মত স্বাভিলাষ-প্রগল্‌ভা উদ্‌ভ্রান্তার প্রতি করুণাপরবশ কে হবেন পুলোমা?

পুলোমা--উদ্‌ভ্রান্তার জীবনের বেদনাকে তিনি দেখতে পেয়েছেন ঋষি। দেখেছে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, আমার জীবনের বেদনা অশ্রুনদী হয়ে আমাকে অনুসরণ করছে। আপ জানেন না ঋষি, ঐ বনলোকের মৃত্তিকায় এখনও আমার অশ্রুনদীর সিক্ত চিহ্নরেখা র রয়েছে।

ভৃগু--শুনে বিস্মিত হলাম পুলোমা। কিন্তু আমার আর একটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করো না পুলোমা।

পুলোমা--বলুন ঋষি ; কি আপনার প্রশ্ন?

ভৃগু--কোন্ প্রসন্নতার আশায় এবং কিসের জন্য তুমি আবার এই ঋষিকুটীরের বন্দি হতে চাইছ পুলোমা?

পুলোমা তার ক্রোড়ের শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়--এরই জন্য ঋষি।

ভৃগু--এই কথার অর্থ?

পুলোমা--আপনার সন্তানের পরিচয় আর জন্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য। ঋষি ছেলেকে তাই ঋষির ঘরে নিয়ে এসেছি।

ভৃগু--ঋষির ছেলেকে ঋষির ঘরে রেখে দাও, তার স্থান এখানে আছে। কিন্তু তোম স্থান নেই পুলোমা।

পুলোমা আতঙ্কিতের মত আর্তনাদ করে--ঋষি, এত বড় শাস্তি আমাকে দেবেন না।

ভৃগু--শাস্তি নয়, তোমার কর্তব্য তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। স্বেচ্ছায় ঋষিপত্নীর ধ বর্জন ক'রে তুমি চলে গিয়েছিলে, তেমনি স্বেচ্ছায় ঋষিমাতার ধর্ম বর্জন ক'রে চলে যাও।

পুলোমা অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত জীবনে স্বেচ্ছায় সে অনেক বি করেছে। প্রথম যৌবনে স্বেচ্ছায় এক অনার্য তরুণকে ভালবেসেছে, স্বেচ্ছায় বিবাহিত জীবনে সংস্কারকে তুচ্ছ ক'রে প্রেমিকের আহ্বানে চলে যেতে পেরেছে। স্বেচ্ছাচারের শক্তি আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে, এই শিশু পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে আজ প্রথম উপলব্ধি ক পুলোমা, স্বেচ্ছাচারের শক্তি তার আর নেই। ঋষিমাতা হওয়ার সম্মান সৌভাগ্য ও সুযো হেলায় তুচ্ছ ক'রে চলে যাবার শক্তি তার নেই।

না, যেতে পারবে না পুলোমা, চলে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। সব অভিশাপ স্বীক ক'রে, তার জীবনে ঋষিমাতা আর্যনারীর পরিচয় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুধু পুত্রার্থে, অ কিছুর জন্য নয়।

পুলোমা বলে--সেই অনার্য আপনার পুলোমাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। আ ভুল, আমি তাকে বাধা দিতে পারিনি ঋষি।

ভৃগু বিস্মিত হন--হুতাশন ঘরে থাকতে তোমাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যেতে পা কোন্ দুরাত্মার এমনি শক্তি আছে?

পুলোমা--হুতাশনের সম্মতি ছিল ঋষি।

ভৃগুর বিস্ময় ক্ষমাহীন ক্রোধ হয়ে জ্বলে ওঠে--হুতাশনের সম্মতি ছিল?

পুলোমা--হ্যাঁ।

বৃদ্ধ হুতাশনের মুখের দিকে তাকিয়ে রূঢ় ও ক্রোধাক্ত স্বরে ভৃগু বলেন--আ বিশ্বাসহন্তা ও অধর্মচারী?

হুতাশন শান্তভাবে উত্তর দেন--না।

ভৃগু--আমি পুলোমার ধর্মপতি, পুলোমা আমার ধর্মপত্নী ; এই সত্য কি আপনি জানেন না?

ভৃগু ও পুলোমা, দুজনের মুখের দিকে বৃদ্ধ হুতাশন একবার তাকিয়ে দেখেন, তারপর বলেন--হ্যাঁ সত্য।

ভৃগু--তবে আপনি কেন দুরাত্মা অনার্যকে ঋষিপত্নী অপহরণে সম্মতি দিলেন?

হুতাশন--তা'ও সত্যের জন্য।

ভৃগু ভ্রূকুটি করেন--সত্যের জন্য?

হুতাশন--হ্যাঁ, প্রেমের সত্য।

পুলোমার মাথা হেঁট হয়ে পড়ে, তার দুই চক্ষুর দৃষ্টি যেন শুষ্ক ধূলির আড়ালে লুকিয়ে পড়বার পথ খুঁজছে।

হুতাশন বলেন--জীবনের প্রথম প্রণয়, জীবনব্যাপী এক প্রেমিকতার তৃষ্ণা পুলোমাকে অপহরণ করেছিল ঋষি। সে ইতিহাস আমি জানি, আমি তার সাক্ষী, তা'কে নিতান্ত মিথ্যা মনে করতে পারি না। আমি আপনাদের মত শিক্ষাগুরু নই, আপনাদের তত্ত্ব দিয়ে সত্য-মিথ্যার বিচারও আমি করি না। আমার কাছে ঘটনাই একমাত্র সত্য। ঘটনাকে আমি বাধা দিই না। যারা যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল আর প্রস্তুত হয়েছিল, তাদের আমি যেতে দিয়েছি। যারা সম্মত হয়েই ছিল, তাদেরই কাজে আমি সম্মতি দিয়েছি। আমি যেমন প্রেরণা দিই না, উপদেশ দিই না ও প্ররোচিত করি না, তেমনি বাধাও দিই না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন হুতাশন। তারপর রূঢ়ভাবে একেবারে স্পষ্ট ক'রেই বলেন--আপনি পুত্রার্থে পুলোমাকে চেয়েছেন, আর সেই অনার্য প্রেমিক পুলোমার জন্যই পুলোমাকে চেয়েছে। এই দুই চাওয়ার দ্বন্দ্বে তিনটি জীবনের জয়পরাজয়ের পরীক্ষা হয়ে গেল। সংসারে তারও সাক্ষী হয়ে রইলাম আমি।

হুতাশন চুপ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দেখতে পেলেন, ভৃগু ঋষি রুষ্টভাবে প্রখর দৃষ্টি তুলে যেন তাঁকে বাচালতা সংবরণ করার জন্য সাবধান ক'রে দিচ্ছেন।

আরও মুখর হয়ে ওঠেন হুতাশন।--আপনি শুধুই শাস্ত্র, এই তরুণী পুলোমা শুধুই অহমিকা, আর সেই অনার্য শুধুই প্রেমিকতা। আপনি হৃদয়ের ধর্ম বুঝতে পারেননি, তরুণী পুলোমা সমাজের ধর্ম বুঝতে পারেনি, আর সেই অনার্য নারীত্বের ধর্ম বুঝতে পারেনি। আপনারা জীবনে এক একটি ভ্রান্তিকে ভালবেসেছেন, ঘটনা তারই প্রতিশোধ নিয়েছে। আমি ঘটনার সাক্ষী মাত্র, যা দেখি তাই বলি। যা দেখেছি তাই বলে দিলাম, এর জন্য আমার এতটুকুও দুঃখ নেই।

পাষাণীভূত বৃক্ষের মত স্তব্ধ ও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ভৃগু। সকল রহস্য ভেদ ক'রে সমস্ত ঘটনার স্বরূপ যেন এতক্ষণে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, নিষ্পলক নয়নে তাই দেখছেন ভৃগু।

হঠাৎ, যেন এক ঝঞ্ঝাহত কাননের উৎক্ষিপ্ত পুষ্পের মত ভৃগুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তরুণী পুলোমা। বিচলিত হন ভৃগু। শান্ত স্বরে বলেন--কি বলতে চাও পুলোমা?

পুলোমা--আপনার এই আশ্রমের এক কোণে ঠাঁই পেতে চাই।

ভৃগু--কেন পুলোমা?

পুলোমা--ভার্গবের মাতা হবার গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই, আর কিছু চাই না।

ভৃগুর দুই চক্ষুর বেদনাও যেন স্নিগ্ধ হাস্যে সুস্মিত হয়ে ওঠে।--শুধু পুত্রার্থে?

পুলোমা--হ্যাঁ ঋষি।

ভৃগু--আর কোন গৌরব আশা কর না পুলোমা?

পুলোমার কণ্ঠস্বরে যেন এক কুণ্ঠাহত অভিমান উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।—আশা করবার সাহ
হয় না ঋষি।

নিবিড় দৃষ্টি তুলে পুলোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভৃগু। যেন পুলোমাকে নূত
ক'রে চেনবার চেষ্টা করছেন, চিনতে পারছেন। সুন্দর বিম্বাধরে ও ভ্রূলতায় রচিত এ
মুখচ্ছবি, যৌবনে ললিত অঙ্গ, সদ্যোমাতৃত্বে কমনীয় দেহ, ভার্গবের জন্মদাত্রী, ভৃগুগৃহে
গৌরবে গরবিনী পুলোমা। পুলোমাকে বুঝতে কোথায় যেন একটু ভুল থেকে গিয়েছি
আজ ঘুচে গেল সেই ভুল। পুলোমাকে চেনা যেন এত দিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। ভৃগুর মনে হ
এই পুলোমা অপহৃত হয়নি। অপহৃত হয়েছিল পুলোমার এক অভিমান।

ভৃগু বলেন—কিন্তু আমি যদি বলি, শুধু ভৃগুবধূ হয়ে নয়, ভৃগুপ্রিয়া হয়ে তুমি আমা
জীবনে নূতন গৌরব এনে দাও? যদি বলি, আজ আমি শুধু পুত্রার্থে নয়, তোমারও জ
তোমাকে চাই পুলোমা?

—স্বামী? অকস্মাৎ যেন এক তৃপ্ত স্বপ্নের উল্লাসে বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় পুলোমা।

হৃদয়ের সকল আগ্রহ নিয়ে একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভৃগু ঋষি পুলোমার হাত ধরলেন-
হ্যাঁ, তুমিই আমার প্রিয়া ধর্মপত্নী।

বৃদ্ধ হুতাশনের দৃষ্টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কৃতার্থভাবে বলেন—আপনার শাস্ত্রসঙ্গ
সংসারে এই হৃদয়সঙ্গত দৃশ্য দেখবার জন্যই বোধ হয় আপনার কুটীরে এতদিন ছিলাম ঋষি
আমার সে আশা সফল হলো। এখানে আমার কাজ ফুরিয়েছে, এইবার আমাকে বিদায় দি
ঋষি।

হুতাশনের কথা শুনে কি যেন চিন্তা করেন ভৃগু। তারপর বললেন—আপনি সংসারে
সাক্ষী, সত্য কথা শুনিয়ে দেন, আপনার এই মহত্ত্ব স্বীকার করি হুতাশন। কিন্তু আপনি
একটি ভুল করেছেন।

হুতাশন—কি?

ভৃগু—আপনি আমার গৃহের রক্ষক ছিলেন, গৃহের আলোকরূপে আপনাকে আমি স্থ
দিয়েছিলাম ; কিন্তু আপনি গৃহদাহকের কাজ করেছেন। আপনার এই ভুলের জ্বালা আপন
জীবনে লাগবেই। লোকে আপনাকে গৃহদাহকরূপে ভয় পাবে আর ঘৃণা করবে, সম্ম
কখনও করবে না।

হুতাশন—আপনাকেও অভিশাপ দিতে পারি ঋষি।

হুতাশনের হঠাৎ চোখে পড়ে, পুলোমা তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে। পুলোমার সুন্
মূর্তির মধ্যে শুধু দুই বেদনার্ত চক্ষুর দৃষ্টি যেন নীরবে আবেদন করছে।

কি বলতে চায় পুলোমা? পুলোমার সেই আবেদনমেদুর নয়নের দিকে তাকিয়ে মনে হ
হুতাশনের, পুলোমা আজ তার স্বামীর জীবনের আনন্দকে সব অভিশাপের আঘাত হতে র
ক'রে সুখী হতে চায়। ভৃগুবধূ পুলোমা। পতিপ্রেমিকা আর্যা পুলোমা। সত্যই স্বামী ভৃগ
ইচ্ছায় ইচ্ছায়িতা হয়ে যেন হুতাশনকে গৃহদাহক বলে মনে করছে আর ভয় করছে পুলোমা

হুতাশনের ওষ্ঠপ্রান্তে বিচিত্র এক বিস্ময়ের হাস্য দীপ্ত হয়ে ওঠে। ভৃগুর ক্ষোভদিগ্ধ মুখে
দিকে শান্ত দৃষ্টি তুলে হুতাশন বলেন—কিন্তু আমি আপনাকে অভিশাপ দেব না ঋষি।

ভৃগুবধূ পুলোমার সুন্দর আননে মেঘমুক্ত শশিলেখার মত স্মিতদ্যুতিময় প্রসন্নতা ফু
ওঠে। যেন এতক্ষণে সংসারের সব ভ্রূকুটির ভয় হতে মুক্ত হয়েছে পুলোমার প্রাণ। সুস্মি
হয়ে উঠেছে পুলোমার জীবনেরই রূপ।

হুতাশনের নেত্রে সেই বিচিত্র বিস্ময়ের প্রশ্ন আরও প্রখর হয়ে ফুটে ওঠে। এই কি ঘটন
শেষ? এই কি শেষ সত্য? এবং এই কি সব সত্য? পুলোমার নারী-হৃদয় কি সত্যই এইব
সর্ববেদনাবিমুক্ত এক সুখস্বর্গের আশ্রয় লাভ ক'রে ধন্য হয়েছে?

--আপনি এখন বিদায় গ্রহণ করুন হুতাশন।

অকস্মাৎ ঋষি ভৃগুর রূঢ়ভাষিত অনুরোধ ধ্বনিত হয়। হুতাশনের কৌতূহলাভিভূত শান্ত মূর্তিকে বিচলিত ক'রে আশ্রমের অভ্যন্তরে চলে গেলেন ভৃগু। বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হন হুতাশন। এবং, পুলোমার সুস্মিত ও প্রসন্ন মুখচ্ছবির দিকে সেই বিস্ময়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্নিগ্ধস্বরে বলেন হুতাশন--বিদায় নিলাম পুলোমা।

পুলোমা এগিয়ে এসে হুতাশনের চরণে প্রণাম নিবেদন করে।

হঠাৎ চমকে উঠলেন হুতাশন, যেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ পেয়ে গিয়ে চমকে উঠেছে তাঁর মনের এতক্ষণের বিস্ময়। ব্যথাহত লতিকার মত হঠাৎ শিউরে উঠেছে পুলোমার ললিত-নমিত দেহ। দেখতে পেলেন হুতাশন, দেখে বিস্মিত হন, এবং উৎকর্ণ হয়ে শুনতেও থাকেন, যেন দূরান্তের এক বনস্থলীর বক্ষ হতে উত্থিত এক আর্তনাদের ভাষা বায়ুতাড়িত ঝটিকার বিলাপের মত ছুটে এসে তপোবনস্থলীর তরুপুঞ্জের উপর পড়ে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে! হুতাশনের চরণে প্রণামাবনতা পুলোমা যেন এক স্বপ্নের কপাটে কান পেতে শুনছে সেই বিলাপের ভাষা। দুঃসহ এক ক্রন্দনের শব্দহারা উচ্ছ্বাস পুলোমার সুখী ও নিশ্চিন্ত বক্ষের নিঃশ্বাসবায়ুকে হঠাৎ আঘাতে আহত করেছে। পুলোমার দুই চক্ষু যেন নীরব বেদনার দুটি উৎস ; অশ্রুসলিল ধারা হয়ে ঝরে পড়ছে।

হুতাশন বলেন--এ কি পুলোমা?

পুলোমা বলে--পুলোমার অশ্রুধারা, ভগবান হুতাশন। এই অশ্রুধারার নাম বধূসরা।

বিস্মিত হন হুতাশন--তোমার অশ্রুধারাকে এই নাম কে দিয়েছে পুলোমা?

পুলোমা--লোকপিতামহ ব্রহ্মা। সেদিন ঠিকই দেখেছিলেন তিনি, আমার অশ্রু নদী হয়ে আমাকে অনুসরণ করছে।

হুতাশন--কিন্তু কেন, কার জন্য এবং কিসের জন্য, বুঝতে পেরেছ কি পুলোমা?

পুলোমা--বুঝতে পেরেছি ভগবান হুতাশন।

এতক্ষণে সত্যসাক্ষী হুতাশনের সব কৌতূহলের অবসান হয়। আর বিস্মিত হবার কারণ নেই। হুতাশন বলেন--আমি যাই পুলোমা।

পুলোমা বলে--বলে যান ভগবান হুতাশন, দূর বনস্থলীর এক আর্তনাদের স্মৃতি, আমারই ঘৃণায় অবমানিত এক প্রেমিকের শেষ নিঃশ্বাসের বেদনা কি চিরকাল আমার জীবনের শান্তি এইভাবে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুসিক্ত ক'রে তুলবে?

হুতাশন--হ্যাঁ পুলোমা।

আর্তনাদ করে পুলোমা--কেন, ভগবান হুতাশন?

হুতাশন--জীবনে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যে জীবনের সত্য।

ত্রাসবিকম্পিত হস্তে দুই ব্যথিত নয়ন আচ্ছাদিত করে পুলোমা। তবু করতল প্লাবিত ক'রে অবিরল অশ্রুধারা ঝরে পড়তে থাকে।

হুতাশন শুধু ভাবেন, পুলোমার এই নয়নবারিকে বধূসরা নাম দিলেন কেন ব্রহ্মা? ভুল করেছিলেন আর্য ভৃগু, ভুল করেছিল অনার্য পুলোমা, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভুল করেছে বোধহয় ঋষিবধূ পুলোমা। তাই কি?

চলে গেলেন সত্যসাক্ষী হুতাশন।

অনল ও ভাস্বতী

মাহিষ্মতী নগরী। দূর হতে দেখে মনে হয়, যেন স্বর্ণপ্রাচীরে পরিবৃত শরৎ-মেঘের স্তবক। নিকটে এসে দাঁড়ালে দেখা যায়, কুসুমাকীর্ণ অরণ্যবলয়ে বেষ্টিত শঙ্খধবল ও শিল্পরুচিরম্য সৌধাবলী, পদ্ম স্বস্তিক ও বর্ধমান। এই মাহিষ্মতী নগরীর এক পুষ্পকাননের নিভৃতে মনঃশিলাময় পাষাণের অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে আছে এক কলস্বনা স্রোতস্বিনী। এইখানে এসে প্রতি অপরাহ্ণে একবার দাঁড়িয়ে থাকেন অনল এবং দেখে বিস্মিত হন, তাঁরই আসা-যাওয়ার পথের মাঝখানে কে যেন নানা মাঙ্গল্য উপচার সাজিয়ে প্রত্যহের এক ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে চলে গিয়েছে। সিতচন্দনে সিক্ত সহকার-কিশলয়ের একটি গুচ্ছ ও একটি দীপ। যূথিকার কোরক নয়, কিন্তু দেখতে সুশ্বেত যূথিকারই কোরকের মত, কা'র হৃদয়ের নিবেদিত শ্রদ্ধার লাজাঞ্জলি যেন পথের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে। এই কাননিভৃতের ক্ষিতিসৌরভ উশীরবাসিত সলিলে আরও সুবাসিত ক'রে দিয়ে কা'র ভৃঙ্গার যেন এখনই চলে গিয়েছে।

প্রতি অপরাহ্ণের মত আজও আবার বিস্মিত হয়েছেন অনল। কা'র পূজা এমন ক'রে তাঁরই আসা-যাওয়ার পথের উপর পড়ে থাকে? বুঝতে পারেন না এবং আজ পর্যন্ত জানতেও পারেননি, এই পূজা কিসের পূজা! মাহিষ্মতীর একটি দীপ কা'র নীরাজনের জন্য প্রতিদিন এই নিভৃতে আসে আর চলে যায়?

জানতে পারেন না, কিন্তু জানতে ইচ্ছা করেন, তাই আজও এই মাহিষ্মতী নগরী ছেড়ে চলে যেতে পারছেন না অনল।

অকস্মাৎ বিপুল স্ফূর্জথুর মত প্রবল নিনাদের আঘাতে মাহিষ্মতীর অরণ্যবলয় যেন শিহরিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে নিনাদ মেঘারাব নয়, অরণ্যের মদমত্ত মাতঙ্গযূথের বৃংহিতও নয়। শুনতে পেলেন অনল, চতুরঙ্গবলোপেত দিগ্বিজয়ীর ভীমল রণোল্লাস এসে মাহিষ্মতী নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অনুমানও করতে পারেন অনল, কে এই দিগ্বিজয়ী। রণামোদে চঞ্চল যে বীরবাহিনীর করধৃত পতাকার প্রোৎফুল্ল কিঙ্কিণীজাল মাহিষ্মতীর প্রাসাদকেতনের গর্ব হরণ করবার সংকল্পে নিক্কণমুখর হয়ে উঠেছে, তার পরিচয় জানেন অনল।

এসেছেন দিগ্বিজয়প্রয়াসী পাণ্ডব সহদেব। নর্মদা অতিক্রম ক'রে রাজ্যের পর রাজ্য জয় ক'রে মহাশূর সহদেবের অভিষেণনাভিলাষী সৈন্য প্রভঞ্জনের বেগে ধাবিত হয়ে এসেছে। পরাজয় স্বীকার করেছেন অবন্তিরাজ। পরাভূত হয়েছে ভীষ্মকের ভোজ-কটকপুর। বিপর্যস্ত হয়েছে নিষাদভূমি। উৎসাদিত হয়েছে পুলিন্দ দেশ। এইবার মাহিষ্মতী। পাণ্ডবের গজযূথের কর্ণতালশব্দ পটহধ্বনির মত বাজে ; সেই ধ্বনির আঘাতে মাহিষ্মতীর নগরদ্বারের লৌহকপাট কেঁপে উঠেছে। মনে হয়, পাণ্ডববাহিনীর নিক্ষিপ্ত শরজালে আচ্ছন্ন মাহিষ্মতীর আকাশের নিবিড়ধবল বলাহক যেন ভীতু বলাকার মত আর্তনাদ ক'রে উঠেছে।

কিন্তু জানেন না পাণ্ডব সহদেব, এই মাহিষ্মতীব একটি দীপের দিকে এখন করুণাভিভূত নেত্রে তাকিয়ে আছেন জ্বলদর্চিতনু কৃশানু, যাঁর খরনেত্রের বিচ্ছুরিত ক্রোধ এই মুহূর্তে লক্ষ প্রজ্বলন্ত উল্কার জ্বালা নিয়ে পাণ্ডবের চতুরঙ্গবাহিনীকে দগ্ধ ক'রে ফেলতে পারে।

আতঙ্কিত মাহিষ্মতী নগরীকে দিগ্বিজয়ী সহদেবের আঘাত হতে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন অনল। পুষ্পকাননের নিভৃত হতে অগ্রসর হয়ে নগরীর উপান্তে এসে দাঁড়ালেন। প্রচণ্ড জ্বালাময় স্বরূপ প্রকট ক'রে দিলেন অনল। করালধূম জ্বালাবাষ্প আর উল্কাবৎ লক্ষ জ্বলদ্‌বহ্নিশিখা পাণ্ডব অনীকিনীর উপর যেন এক ভয়ংকর আক্রোশের উৎসবে মত্ত হয়ে ওঠে। ভস্মীভূত হয় পাণ্ডবের রণরথ, নির্জিত হয় গজ অশ্ব ও পদাতিক। সহসা এই জ্বালালীলার উৎপাতে ভীত হয়ে অস্ত্রসংবরণ করেন সহদেব। বুঝতে পেরেছেন সহদেব, এ

নিশ্চয় অনলদেবের লীলা। অনলের পরাক্রমে ও প্রসন্নতায় সুরক্ষিত মাহিষ্মতীকে অস্ত্রবলে নির্জিত করবার অভিলাষ বর্জন করেন সহদেব। স্তব্ধ হয় পাণ্ডকটকের ধনু প্রাস ও ভল্ল, অঙ্কুশ পট্টিশ ও তোমর। অনলের অনুকম্পা প্রার্থনা ক'রে দূত প্রেরণ করেন দিগ্বিজয়ী সহদেব।

দূত এসে নিবেদন করে--দিগ্বিজয়প্রয়াসী পাণ্ডব আপনার সহায়তা প্রার্থনা করে, হে বায়ুসখা বৈশ্বানর। মাহিষ্মতী নগরীর অধিপতি নীল শুধু পাণ্ডবের বশ্যতা সুবিনীতচিত্তে ঘোষণা ক'রে ক্ষণকালের জন্য কিরীট অবনত করুক, এইমাত্র অভিলাষ। আপনি বাধা না দিলে পাণ্ডবের এই অভিলাষ অবশ্যই সিদ্ধ হবে। হে হিমারাতি হব্যবাহন, জানি না, যজ্ঞপ্রিয় পাণ্ডবের প্রতি আপনি কেন পরাঙ্মুখ হয়েছেন, আর আপনার সৌহার্দ্য লাভ ক'রে অপরাজেয় হয়েছে মাহিষ্মতীর অযাজ্ঞিক নরপতি নীল!

মাহিষ্মতীর শঙ্খধবল পাষাণের প্রাসাদে নৃপতি নীলের ঈষৎ প্রসন্ন ও ঈষৎ বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে নীলতনয়া ভাস্বতী--তবুও আপনি বিষণ্ণ কেন পিতা? প্রসন্ন হয়েছেন অনল, প্রচণ্ড সহদেবের বিকট সমরস্পর্ধার আঘাত হতে মাহিষ্মতীর সম্মান রক্ষা করেছেন অনল। আর দুশ্চিন্তা কেন পিতা?

নীল বলেন--এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না তনয়া। অনলের অনুকম্পা প্রার্থনা ক'রে অনলের কাছে প্রচুর পূজোপচার আর রত্নরথ প্রেরণ করেছেন মাদ্রীসুত সহদেব। ভয় হয় কন্যা, তোমার শ্রদ্ধার ঐ সচন্দন সহকারকিশলয় ও দীপ ও লাজাঞ্জলির দিকে আর বেশিক্ষণ করুণাভিভূত নেত্রে তাকিয়ে থাকতে পারবেন না বহ্নিদেব অনল। সহদেবের অভিবাদনে বন্দিত অনল যদি এই মাহিষ্মতীর প্রতি তাঁর এতদিনের কৃপা প্রত্যাহার ক'রে পাণ্ডবশিবিরে চলে যান, তবে এই মাহিষ্মতীকে আর কে রক্ষা করবে?

ভাস্বতী--আমার বিশ্বাস হয় না পিতা। হিরণ্যকৃৎ অনল কি পাণ্ডব প্রেরিত রত্নরথের ঔজ্জ্বল্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন, আর ভুলে যাবেন মাহিষ্মতীর অন্তরের এতদিনের পূজা?

নীল--কিন্তু অনল কি কখনও তোমার পূজার উপচার দেখে মুগ্ধ হয়েছেন?

ভাস্বতী--জানি না পিতা।

নীল--তুমি কি কখনও অনলকে দেখেছ?

ভাস্বতী--না।

নীল--অনল তোমাকে কোনদিন দেখেছেন?

ভাস্বতী--না।

নৃপতি নীলের নয়নে আরও গভীর বিষাদের ছায়া পড়ে।--তাই তো নিশ্চিন্ত হতে পারছি না কন্যা।

পিতা নীলের কথা শুনে হঠাৎ ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে ভাস্বতীর সুভঙ্গিম ভ্রূরেখা--আপনার কথার অর্থ কি পিতা?

নীল--যদি চিত্রিতা কেতকীর মত নয়নাভিরামা এই পূজাচারিণীকে, মাহিষ্মতীর অন্তরের জ্যোতির্লেখার মত নীলতনয়া এই ভাস্বতীকে কোন শুভ মুহূর্তে দেখতে পেতেন অনল এবং দেখে মুগ্ধ হতেন, তবে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হতে পারত মাহিষ্মতী। অনলপ্রিয়া ভাস্বতীর মাহিষ্মতীকে স্পর্শ করবার দুঃসাহস কোন দিগ্বিজয়ীর মনে আর দেখা দিত না। পাণ্ডব সহদেবের শত স্তুতিবাদ পূজোপচার আর উজ্জ্বল রত্নরথনেমির হর্ষ অনলের প্রত্যাখ্যানে বিফল হয়ে ফিরে চলে যেত চিরকালের মত।

ভাস্বতী বলে--আশীর্বাদ কর পিতা, যেন আমার ব্রত সফল হয়।

নীল--কিসের ব্রত কন্যা?

সলজ্জ স্বরে ভাস্বতী বলে—আমারই জীবনের এক নূতন ব্রত।

প্রসন্নস্বরে পিতা নীল তাঁর অন্তরের আশা অভিব্যক্ত করেন—বুঝেছি কন্যা ; আশীর্বাদ করি, তোমার এই ব্রত সফল হোক, অনলের ভার্যা হোক মাহিষ্মতীর কুমারী ভাস্বতী।

অপরাহ্ণের আলোকে আলিম্পিত হয়ে আছে মাহিষ্মতীর পুষ্পকানন। মনঃশিলাময় পাষাণের ক্রোড়সঞ্চারিণী স্রোতস্বিনী, যেন তরলিত রক্তাভার প্রবাহ ; যেন চুম্বনরসে ক্লান্ত গীর্বাণগণিকার দল নিশাবসানে নির্ঝরমূলে এসে অধররাগ ধৌত ক'রে চলে গিয়েছে, তাই শোণিম হয়ে গিয়েছে সলিল। নক্তমালের পল্লবভার আতপতাপিত তৃণভূমির উপরে ছায়া বিস্তার করে। অনলের আসা-যাওয়ার পথের মাঝখানে প্রতিদিনের মত আজও একটি পূজাদীপের শিখা জ্বলে। আর, দাঁড়িয়ে থাকে নীলতনয়া ভাস্বতী।

জীবনে স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করেনি ভাস্বতী, এইভাবে অভিসারিকার মত উৎকণ্ঠা নিয়ে এক পুরুষের আসা-যাওয়ার পথের উপর এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু এ কেমন অভিসার! জীবনে কোন মুহূর্তেও যার মূর্তি নয়নগোচর হয়নি, তারই দর্শনলাভের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা। নিদ্রা ও জাগরণের কোন ক্ষণে যার জন্য মনের কোন ভাবনা অনুরাগে চঞ্চলিত হয়ে ওঠেনি, তারই জন্য বিচলিতচিত্তে পথ চেয়ে থাকা। অদ্ভুত এই পরীক্ষা স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছে ভাস্বতী।

মাহিষ্মতী নগরীর গর্ব ও সম্মানকে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবের কাছে বশ্যতা স্বীকারের অভিশাপ হতে রক্ষা করতে পারেন যে, এমনই এক পরম পরাক্রান্তের করুণা ও সহায়তা আহ্বান ক'রে এতদিন এক বন্দনাব্রত উদ্‌যাপন ক'রে এসেছে ভাস্বতী। এতদিন ছিল শুধু এক শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্রত। শক্তিমানের কাছে প্রপন্নের আবেদনের ব্রত। কিন্তু আজ সেই পূজাস্থলীর কাছে প্রণয়াভিলাষিণী নায়িকার মত দাঁড়িয়ে আছে অবিদিতপ্রণয়া কুমারী ভাস্বতী। আসবেন অনল এবং নীলতোয়দলালিতা তড়িল্লেখার মত তন্বী নীলতনয়ার তনুরুচি মুগ্ধনেত্রসম্পাতে অভিষিক্ত ক'রে আহ্বান করবেন—এস চিত্রভানুর চিত্তবিমোহিনী ভাস্বতী।

নিজেরই কল্পনার ভাষা শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে ভাস্বতী। ক্লান্ত দ্রুমোৎপলের নিঃশ্বাসপরিমল হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়। শিহরিত হয় বনবায়ু। শিহরিত হয় ভাস্বতীর ভ্রূলতা। নবপরিণয়লজ্জাবিধুরা ও বাসকশয়নভীরু বধূর মত ভাস্বতীর আরক্তিম কপোলে স্বেদাঙ্কুরকণা ফুটে ওঠে। আজ এই পুষ্পবনের নিভৃতে এসে ভাস্বতীর জীবন যেন উদ্ভিন্ন শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠতে চায়। যেন নিখিলমধুরিমার উৎসেক লাভ ক'রে পুষ্পিত হতে চায় যৌবনবেদনা। হ্যাঁ, বুঝতে পারে ভাস্বতী, সে আজ এক প্রেমিকের দুই মুগ্ধ চক্ষুর দৃষ্টি বরণ করবার ব্রত উদ্‌যাপনের আশায় কলস্বনা এই স্রোতস্বিনীর তটে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কে তুমি কুমারী?

দীপ্ততনু এক পুরুষ-সত্তম এসে নীলতনয়া ভাস্বতীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন।

ভাস্বতী বলে—আমি নীলতনয়া ভাস্বতী। আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি ধীমান্।

মৃদুহাস্যে অধর শিহরিত ক'রে ভাস্বতীর উৎসুক নয়নের দিকে তাকিয়ে দীপ্ততনু আগন্তুক বলেন—আমি অনল।

ভাস্বতী—মাহিষ্মতীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন অনলদেব।

অনল—শ্রদ্ধা কেন?

ভাস্বতী—আপনারই লীলা-পরাক্রমে বিপন্মুক্ত হয়েছে মাহিষ্মতী। আপনি সহায় থাকলে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডব মাহিষ্মতীর প্রাসাদকেতন অবনমিত করবার আশা বর্জন ক'রে ফিরে যাবে।

অনল—আমার সহায়তা হতে বঞ্চিত হতে পারে মাহিষ্মতী, এমন সংশয়ের কোন হেতু কি দেখতে পেয়েছ নীলতনয়া?

ভাস্বতী--না অনলদেব, তবু পিতা শুনে নিশ্চিন্ত হতে চান, মাহিষ্মতীর পূজা গ্রহণ ক'রে আপনি তৃপ্ত হয়েছেন।

অনল--তৃপ্ত হয়েছি কুমারী।

ভাস্বতী--কিন্তু আপনার আসা-যাওয়ার পথের মাঝখানে এই পুষ্পকাননের নিভৃতে প্রতি প্রভাতে এসে পূজার উপচার সাজিয়ে রেখে গিয়েছে যে পূজাচারিণী, তাকে আপনি কোনদিন দেখতে পাননি।

অনল--পাইনি। আশা আছে মনে, একদিন তাকে দেখতে পাব আর দেখে মুগ্ধ হব।

ভাস্বতী--আজ তাকে দেখতে পেয়েছেন অনলদেব।

বিস্মিত অনল বলেন--তুমি?

ভাস্বতী বলে--হ্যাঁ, আমি। আমারই সুবর্ণভৃঙ্গার উশীরবাসিত সলিল ঢেলে আপনারই পদস্পর্শপূত পথের মৃত্তিকা নিত্য সুরভিত করেছে।

অনল বলেন--মাহিষ্মতীর প্রিয়কারিণী কন্যা, তোমার শ্রদ্ধায় তৃপ্ত হয়েছি আমি, আর বিস্মিত হয়েছি তোমাকে দেখে, কিন্তু...।

ভাস্বতী--বলুন অনলদেব।

অনল--কিন্তু মুগ্ধ হতে পারিনি।

ভাস্বতীর নয়নদ্যুতি বাত্যাহত দীপশিখার মত ব্যথিত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে ভাস্বতী, মিথ্যা বলেন নি অনল। নীলতনয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন অনল, যেন কৌতুকামোদে কুতূহলী এক দহনদাতা এক মৃৎপ্রদীপের দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ দৃষ্টি প্রেমবিবশ পুরুষের মুগ্ধ চক্ষুর দৃষ্টি নয়।

অনল প্রশ্ন করেন--ব্যথিত হলে কেন নীলরাজতনয়া?

ভাস্বতী--আশা ছিন্ন হলে, স্বপ্ন চূর্ণ হলে আর কল্পনা দগ্ধ হয়ে গেলে কে না ব্যথিত হয় অনল?

অনল--কি বলতে চাও নীলতনয়া? তবে তুমি কি মাহিষ্মতীর রক্ষাকারী অনলের অনুরাগিণী?

ভাস্বতী--না অনলদেব।

অনল--তবে?

ভাস্বতী--আমি দুটি মুগ্ধ পুরুষনয়নের অনুরাগিণী। মন চায়, তারই কণ্ঠে বরমাল্য দান করি, যে এই নীলতনয়া ভাস্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

অনল--সুন্দর তোমার আকাঙ্ক্ষা! আশীর্বাদ করি, তোমার এই আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে উঠুক। তারপর একদিন সত্য হবে অনলের আকাঙ্ক্ষা।

ভাস্বতী--কি আশীর্বাদ করলেন, বুঝতে পারছি না অনলদেব।

অনল--পরানুরাগিণী নীলতনয়ার সেই বরমাল্য জয় ক'রে নিয়ে আর কণ্ঠে ধারণ ক'রে একদিন তৃপ্ত হবে অনল।

আর্তনাদ ক'রে ওঠে ভাস্বতী--নিষ্ঠুর কৌতুকের অধীশ্বর, হে বৈশ্বানর!

অনল--বল নীলতনয়া ভাস্বতী!

ভাস্বতী--আমার প্রেম কামনা করবেন যিনি, আমি শুধু তাঁকেই প্রেম দান করব।

অনল--করো।

ভাস্বতী--আমাকে দেখে মুগ্ধ হবেন যিনি, আমি শুধু তাঁরই কণ্ঠে বরমাল্য দেব।

অনল--দিও।

ভাস্বতী--প্রেমিকের কাছে সমর্পিতপ্রাণ ভাস্বতীর হাতের সেই বরমাল্য কেড়ে নিতে পারে, এমন শক্তি ত্রিলোকে কারও নেই হুতবহ অগ্নি, আপনারও নেই।

অনল বলেন--কিন্তু, যদি এই মুহূর্তে তোমারই প্রণয়বাসনায় চঞ্চল হয়ে তোমাকে আহ্বান করি ভাস্বতী, তবে? যদি পুষ্পাসবপিপাসী মধুপের মত লুব্ধ হয়ে তোমার ঐ সুন্দর মুখকমলের কাছে এগিয়ে যায় অনলের বক্ষের তৃষ্ণা, তবে?

ভাস্বতী--তবে এই মুহূর্তে অনলের কণ্ঠে বরমাল্য দান ক'রে ধন্য হবে নীলরাজতনয়া ভাস্বতী।

কৌতুকভরে, পুনরায় হাস্য উচ্ছ্বসিত ক'রে অনল বলেন--বিদায় দাও ভাস্বতী।

ভাস্বতী--বিদায় গ্রহণ করুন বৈশ্বানর।

চলে গেলেন অনল। আর, পুষ্পকাননের নিভৃতে দাঁড়িয়ে সুরভিশ্বাসী দ্রুমোৎপলের দিকে তাকাতে গিয়ে বুঝতে পারে ভাস্বতী, তার দুই চক্ষুর উদ্গত অশ্রুবাষ্পও যেন ঐ চূর্ণ মনঃশিলার মত তার আহত মনের ছায়াসম্পাতে রক্তিম হয়ে উঠেছে।

কি অদ্ভুত এই অনলের কামনা! রজনীহাস শেফালিকার মত অতাপস্পর্শিতা কুমারীর স্ফুটযৌবনের শুচিসুধার জন্য তাপদহনবিলাসী অনলের হৃদয়ে কোন তৃষ্ণা নেই। তাই নীলতনয়া ভাস্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলো না অনলের চক্ষু। প্রেম দান ক'রে অবিদিতপ্রণয়া নারীর হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করতে জানে না, চায়ও না, লীলাপরাক্রমের আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত ঐ পাবকের হৃদয়। চিরজীবনের সঙ্গিনী হবার জন্য যে নারী বরমাল্য হাতে নিয়ে কাছে এগিয়ে যেতে চায়, তার আশা বিফল ক'রে দিয়ে সুখী হয় এই বিচিত্র জ্বালাস্বপ্নচারী বৈশ্বানর। অপরের প্রেমবন্দিতা নারীর কামনামধুর অন্তরের নিষ্ঠা লুণ্ঠন করবার জন্য কৌতুকরঙ্গে চঞ্চল হয়ে রয়েছে জ্বলদর্চিপ্রভায় অর্চিততনু অনল।

চলে গিয়েছেন অনল, কিন্তু মনে হয় ভাস্বতীর, যেন এক হৃদয়হীন কৌতুকীর দৃষ্টি তার দেহ রূপ আর যৌবনের উপর অপমানের জ্বালা নিক্ষেপ ক'রে চলে গিয়েছে। নীলতনয়া ভাস্বতী কি সত্যই এত অমধুরা যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতে পারে না জগতের কোন পুরুষের চক্ষু?

কণ্টকবিদ্ধা মৃগবধূর মত পুষ্পকাননের নিভৃতে সুচ্ছায় নক্তমালতলে বসে থাকে ভাস্বতী। অপরাহ্ণের আলোক ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে। স্নিগ্ধতর হয় নক্তমালের ছায়া। রাগময়ী সন্ধ্যার প্রথম দ্যুতি এসে ভাস্বতীর কপোল স্পর্শ করে। অকস্মাৎ এক আগন্তুকের পদধ্বনি শুনে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে নীলতনয়া ভাস্বতী।

স্নিগ্ধদর্শন এক ব্রাহ্মণকুমার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সন্ধ্যার বিষাদলীনা জলকমলিনীর মত অশ্রুমায়াময়ী ভাস্বতীর মুখের দিকে মুগ্ধ ও অপলক চক্ষুর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকে। বিস্মিত হয় ভাস্বতী, যেন তারই অন্তরবেদনার ভাষা শুনতে পেয়ে অন্তরীক্ষ হতে এক অনিন্দ্যসুন্দর প্রেমিকের হৃদয় ছুটে এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ঐ দুই চক্ষুর দৃষ্টি-পীযূষধারার উৎসেক পেয়ে যেন জেগে উঠেছে ভাস্বতীর যৌবনময় প্রাণের কামনা, হিমকরদীধিতির স্পর্শে যেমন জেগে ওঠে তন্দ্রাভিভূত বনমল্লিকার কোরক। মনে হয়, এই পুষ্পকাননের আর এক নিভৃতে জেগে উঠেছেন নিখিলকামনার অধীশ্বর অতনু কুসুমেষু। জীবনের প্রথম অনুরাগের আবেগে স্মিতহাস্যজ্যোতি অধরে স্ফুরিত ক'রে ভাস্বতী প্রশ্ন করে--কে আপনি?

- আমি ব্রাহ্মণকুমার সুবর্চা। পুষ্পকাননচারিণী জ্যোতির্লেখার মত কে তুমি কুমারী?

--আমি নীলতনায় ভাস্বতী।

--কা'র পদধ্বনির উপাসনার জন্য এই কাননভূমিতে বসে আছ রাজতনয়া ভাস্বতী?

--আপনি কা'র পদধ্বনি অন্বেষণের আশায় এই কাননের নিভৃতে এসেছেন কুমার?

--কোন আশা নিয়ে আসিনি। আমার আশার অতীত প্রিয়দর্শিনী এক নারীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে আমার জীবন আজ ধন্য হলো। ঐ মুখচ্ছবি আমার জীবনের চিরকালের স্বপ্ন হয়ে থাকবে। অনাহত সঙ্গীতের মত তোমার ঐ মঞ্জীরিত চরণের ধ্বনি আমার সকল কল্পনার

অন্তরে চিরকাল বাজবে। বরবর্ণিনী ভাস্বতী, তোমার হাতের বরমাল্যের দিকে তাকিয়ে শুধু ব্যর্থ পিপাসার বেদনা নিয়ে চলে যাবে সুবর্চা।

--নীলতনয়া ভাস্বতীর হাতের বরমাল্যের প্রতি এত মোহ কেন প্রকাশ করছেন কুমার?

--সত্যই কি বুঝতে পার না নীলতনয়া?

--না।

--মন চায়, আমার জীবনের সকল মুহূর্তের কামনায় বন্দিত হও তুমি। হও চিরপ্রেয়সী। হও আমার সকল স্বপ্ন সুপ্তি তন্দ্রা ও কল্পনার তৃপ্তি। হও সুবর্চার সুখদুঃখভাগিনী গেহিনী!

ভাস্বতী বলে--তাই সত্য হোক প্রিয় সুবর্চা।

সুবর্চা—তবে দাও তোমার বরমাল্য। আমার প্রণয় সফল কর নীলতনয়া ভাস্বতী।

ভাস্বতী—একটি অনুরোধ আছে।

সুবর্চা--বল।

ভাস্বতী—পিতা নীলের স্নেহাভিষিক্ত হৃদয়ের আশীর্বাদ লাভ ক'রে যেদিন তুমি গ্রহণ করবে ভাস্বতীর এই হাত...।

সুবর্চা—সেদিন কবে আসবে ভাস্বতী?

ভাস্বতী—প্রার্থনা কর, সেই শুভদিন যেন অচিরাসন্ন হয়। সেই দিন, এক উৎসবমধুর সন্ধ্যার এক পুণ্যক্ষণে এই পুষ্পকাননের স্রোতস্বিনীর তটে এসে, তোমার কণ্ঠে তোমারই প্রিয়ার প্রেমব্যাকুল হাতের বরমাল্য নিও।

—ভাস্বতী!

রবরোষিত কেশরীর মত পিতা নীলের ক্রোধকম্পিত আহ্বান শুনে চমকে ওঠে ভাস্বতী।

মাহিষ্মতীর প্রাসাদের এক কক্ষের নিভৃতে পিতা নীলের সম্মুখে এসে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে ভাস্বতী।

—মাহিষ্মতীর সর্বনাশ চাও কন্যা?

—এই সন্দেহ কেন পিতা?

—সন্দেহ নয় ; সবই দেখেছি কন্যা। তুমি ব্রতভঙ্গকারিণী, তুমি এক কামতস্করের সঙ্গিনী। তোমার আচরণে কুপিত হয়ে অনল অদৃশ্য হয়েছেন। মাহিষ্মতীর রক্ষাকারী অনলের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা প্রেমে পরিণত হবে, তুমি হবে অনলভার্যা ভাস্বতী, আমার এই আশা তুমিই চূর্ণ ক'রে দিলে উদ্‌ভ্রান্তা কন্যা!

—আমি আমার প্রেমিকের কাছে হৃদয় দান করেছি পিতা।

—ঐ বনচারী ব্রাহ্মণ তোমার প্রেমিক?

—হ্যাঁ পিতা।

—অনলের প্রেমলাভের জন্য তোমার মনে কোন আকাঙ্ক্ষা নেই?

—না।

--কেন?

--অপ্রেমিক অনলের মনে আপনার কন্যা ভাস্বতীর জন্য কোন প্রেম নেই।

--কিন্তু সেই কারণেই তো ব্রতচারিণী হবে তুমি। মাহিষ্মতীর বিপদবারণ লোকপ্রবীর অনলের প্রেমাভিলাষে তুমি তপস্বিনী হবে। বিশ্বাস ছিল, সেই তপস্যা একদিন সফলও হবে। কিন্তু সামান্য এই প্রতীক্ষার ধর্মও বর্জন ক'রে তুমি কোন্ এক বনচারী ছলপ্রণয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে আর মুগ্ধ হয়ে বরমাল্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ দুরাচারিণী কন্যা। কিন্তু তোমার এই দুরাশা সফল হবে না।

--পিতা! আর্তনাদ ক'রে পিতা নীলের মুখের দিকে তাকিয়ে বাষ্পায়িত নয়নে হৃদয়ের

বেদনা নিবেদন করে ভাস্বতী--এমন অভিশাপ দেবেন না পিতা।

নীল--অভিশাপ শান্তচিত্তে সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হও কন্যা।

চিৎকার ক'রে ওঠে ভাস্বতী--স্পষ্ট ক'রে বলুন পিতা, কোথায় আছেন সুবর্চা।

নীল--এই প্রাসাদেরই এক লৌহকক্ষে কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ সুবর্চা এখন তার দুঃসাহসের শাস্তি সহ্য করছে।

--পিতা!

--আর্তনাদ স্তব্ধ কর কন্যা।

কিন্তু কি বিস্ময়ের বিষয়! নীলতনয়া ভাস্বতীর সেই আর্তনাদের প্রতিধ্বনি যেন লক্ষ অগ্নিশিখা হয়ে প্রাসাদের চতুর্দিকে জেগে উঠল। যেন অন্তরীক্ষ হতে এক প্রজ্বলিত দাবানল অকস্মাৎ মাহিষ্মতীর শঙ্খধবল পাষাণে রচিত প্রাসাদের শিরে লুটিয়ে পড়েছে। আতঙ্কিত হয়ে আর বিস্মিত হয়ে এই করাল ধূমপুঞ্জ ও অগ্নিজ্বালার বিভীষিকার লীলা দেখতে থাকেন মাহিষ্মতীর অধিপতি নীল। এ যে অনলেরই আক্রোশের মত এক করাল জ্বালালীলা।

কে এই ব্রাহ্মণবেশী সুবর্চা। অকস্মাৎ, যেন তাঁর অন্তরের ভিতরে এক দাবদগ্ধ বিস্ময় আর কৌতূহলের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দ্রুত ছুটে চলে যান নীল, এবং লৌহকক্ষের নিকটে এসেই হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। হ্যাঁ, সত্য হয়েছে তাঁর অনুমান। ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে লৌহকক্ষ, আর সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছেন সেই স্নিগ্ধতনু ব্রাহ্মণকুমার সুবর্চা।

কাতরস্বরে প্রশ্ন করেন নীল--আপনার পরিচয় প্রদান করুন ব্রাহ্মণকুমার। দৈব পরাক্রমে বলী, কে আপনি ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ?

মৃদুহাস্য স্ফুরিত ক'রে সুবর্চা বলেন--আমি অনল।

অদৃশ্য হলো অগ্নিজ্বালার বিভীষিকা। সান্ধ্য বায়ুর মৃদু শীতসঞ্চারে আবার শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে মাহিষ্মতীর প্রাসাদ। কৃতাঞ্জলি করে এবং প্রসন্ন হাস্যে হৃদয়ের আনন্দ নিবেদন করেন নীল।--ধন্য হলো মাহিষ্মতী! ধন্য হলো মাহিষ্মতীর অধিপতি নীল ও নীলতনয়া ভাস্বতী! আপনার কৃপালীলায় আমার সকল আশা সফল হলো দেব বীতিহোত্র।

অনল বলেন--নিশ্চিন্ত হোন নৃপতি নীল, আমার নির্দেশে দিগ্বিজয়ী পাণ্ডব শুধু আপনার দান গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত হয়ে চলে যাবে।

নীল--মাহিষ্মতীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন দেব বৈশ্বানর।

অনল বলেন--আর, আমারই বাঞ্ছিতা ভাস্বতীকে আমার কাছে সম্প্রদান করুন ভাস্বতীপিতা নীল।

--ভাস্বতী! স্নেহাভিভূত কণ্ঠে আহ্বান করেন নীল।

অনল--একটি প্রস্তাব আছে নৃপতি নীল। ভাস্বতীর কাছে আমার পরিচয় এখনই প্রকাশ ক'রে দেবেন না।

নীল--তথাস্তু অনলদেব।

নৃপতি নীল পুনরায় আহ্বান করেন--ভাস্বতী!

ভাস্বতী এসে সম্মুখে দাঁড়ায়। মৃদু হাস্যে কৃতার্থ হৃদয়ের আনন্দ উদ্ভাসিত ক'রে নীল বলেন--এস কন্যা, এই দেখ, তোমার প্রেমধন্য জীবনের সহচর সুবর্চা তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

মন্ত্র পাঠ ক'রে তনয়া ভাস্বতীকে সুবর্চার কাছে সম্প্রদান ক'রে চলে গেলেন নৃপতি নীল। ভাস্বতীর পাণি গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ সুবর্চা সাকাঙক্ষ স্বরে প্রশ্ন করেন--বরমাল্য কই প্রিয়া ভাস্বতী?

স্নিগ্ধহাসিনী বনমল্লিকার মত সুষমা বিকশিত ক'রে স্মিতাধরা ভাস্বতী বলে--আছে।

--কোথায়?

—পুষ্পকাননের নিভৃতে, সেই নক্তমালের ছায়ায়, সেই মনঃশিলার অলক্তকে রঞ্জিত স্রোতস্বিনীর তটে।

সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হয়ে আছে নক্তমালের ছায়া। উৎপল-পরিমলে বিহ্বল হয়েছে বনবায়ু। পুষ্প চয়ন করেছে ভাস্বতী, এবং মাল্য রচনাও সমাপ্ত হয়েছে। নিকটে এসে দাঁড়ায় ভাস্বতীর প্রেমিক সুবর্চা, ভাস্বতীর স্বামী সুবর্চা।

প্রণাম করে ভাস্বতী, এবং তার পরেই দুই হাতে বরমাল্য উত্তোলন ক'রে সুবর্চার মুখের দিকে তাকায়—প্রিয় সুবর্চা!

কিন্তু একি? এ কা'র মূর্তি? সেই মুহূর্তে যেন এক দুঃসহ শাস্তির আঘাতে ব্যথিত হয়ে যন্ত্রণাক্ত স্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে ভাস্বতী—কে তুমি?

—আমি তোমারই প্রিয় প্রেমিক ও পতি সুবর্চা।

—মিথ্যা কথা! তুমি অনল, তুমি শুধু অনল, জ্বালালীলাবিলাসী অনল। তুমি সুবর্চা নও।

—সুবর্চার ছদ্মরূপ ধারণ ক'রে আমিই তোমার প্রেম কামনা করেছি ভাস্বতী। যে অনলের মুগ্ধ চক্ষুর দৃষ্টি বরণ করবার আশায় পুষ্পকাননের এই নিভৃতে সেদিন দাঁড়িয়েছিলে তুমি, সেই অনলই সুবর্চা হয়ে তোমাকে মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বরণ করেছিল ভাস্বতী।

ভাস্বতী—নিষ্ঠুর কৌতুকের অধীশ্বর হে বৈশ্বানর!

বিস্মিত হন অনল—নিষ্ঠুর বলছ কেন ভাস্বতী? আমিই তো তোমার সুবর্চা।

ভাস্বতী—না, আমার সুবর্চা তুমি নও।

অনল—তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না ভাস্বতী।

ভাস্বতী—কেন পারছেন না অনলদেব? পরপুরুষের কণ্ঠে মাল্য দান করতে পারে না সুবর্চার ভার্যা ও প্রেমিকা ভাস্বতী।

—পরপুরুষ?

—হ্যাঁ, আমার আশার স্বপ্ন উদ্ভাসিত করেছে যে, আমার কামনার আশা উদ্দীপিত করেছে যে, আমার অন্তরের স্তরে স্তরে মুদ্রিত হয়ে আছে যার মূর্তি, সে হলো সুবর্চা। আমার কাছে আপনি পরপুরুষ মাত্র। অপরের প্রেমবন্দিতা নারীর হাতের বরমাল্য জয় করবার দুর্বাসনা বর্জন করুন অনলদেব।

—ভাস্বতী! উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অনলের কণ্ঠস্বর।—জানেন নৃপতি নীল, সুবর্চার ছদ্মরূপে আমি অনল তাঁর তনয়া ভাস্বতীর প্রেম কামনা করেছি। তোমার পিতা নৃপতি নীল আমার কাছেই তাঁর দুহিতা ভাস্বতীকে সম্প্রদান করেছেন। তুমি তোমার পিতার মন্ত্রোচ্চারিত সম্প্রদান ব্যর্থ করতে পার না। সে অধিকার তোমার নেই।

ভাস্বতী—তুমি সুবর্চার রূপ ধারণ ক'রে পিতা নীলের সম্মুখে ভাস্বতীর যে হাত গ্রহণ করেছ, আজ এই সন্ধ্যারাগে অরুণিত পুষ্পকাননের নিভৃতের উৎসবে সুবর্চারই রূপ ধারণ ক'রে প্রেয়সী ভাস্বতীর হাতের সেই বরমাল্য গ্রহণ কর।

সকল জ্বালালীলার অধীশ্বর অনলের অন্তরে যেন এক অপমানের জ্বালা লাগে। বিষণ্নস্বরে বলেন—তোমার কাছে আমি চিরকাল সুবর্চার রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকি, এই কি তোমার ইচ্ছা?

ভাস্বতী—হ্যাঁ অনল। তুমি সুবর্চা হও।

অনল—না।

ভাস্বতী—এস অনল, আমার জীবনের একমাত্র প্রেমিক সেই সুবর্চার রূপ নিয়ে আমার জীবনের চিরসঙ্গী হয়ে থাক।

অনল—না, এই দুরাশা বর্জন কর নীলকন্যা।

ভাস্বতী—তবে সুবর্চার প্রিয়া ভাস্বতীর বরমাল্য লাভের আশা বর্জন করুন অনলদেব।

সেই মুহূর্তে বরমাল্য ছিন্ন ক'রে বিস্রস্ত কুসুমদাম স্রোতস্বিনীর সলিলে নিক্ষেপ করে ভাস্বতী।

বিদ্রূপ কুটিল ভ্রূভঙ্গি ও কৌতুকতরল হাস্য শিহরিত ক'রে তাকিয়ে থাকেন অনল। আর স্থির চিত্রলেখার মত দাঁড়িয়ে স্রোতস্বিনীর অস্থির সলিলের দিকে তাকিয়ে থাকে ভাস্বতী।

অনল বলেন--তোমার সকল প্রলাপ ক্ষমা করলাম ভাস্বতী।

উত্তর দেয় না ভাস্বতী।

অনল--সুন্দরাননা ভাস্বতী, তোমার ঐ চিবুক ও অধর, ঐ পীনবক্ষ ও ক্ষীণকটি, ঐ সুগ্রীবাভঙ্গী আর গুরুশ্রোণিভার, সকলই আমার অধিকার।

প্রাণহীনা ও ভাষাহীনা পাষাণের পুত্তলিকার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভাস্বতী।

অনল বলেন--অনলের বক্ষোলগ্ন হও মাহিষ্মতীর দীপশিখা।

সাড়া দেয় না ভাস্বতী!

নিবিড় আলিঙ্গনে ভাস্বতীর অচঞ্চল মূর্তি বক্ষোলগ্ন করেন অনল। পুষ্পকাননের নিভৃতে সন্ধ্যারাগে অভিভূত নক্তমালের ছায়া অনলের বাসনাবাসিত উৎসবের মুহূর্তগুলিকে নীরবে সহ্য করতে থাকে।

--অনলের তৃষ্ণার তৃপ্তি নীলতনয়া ভাস্বতী!

তৃপ্তপ্রাণ অনলের আহ্বানে যেন মূর্ছা ভেঙ্গে জেগে ওঠে ভাস্বতী। বিশ্লথ করবীভার কম্প্রহস্তে বিন্যস্ত ক'রে অনলের মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু চমকে ওঠেন অনল এবং আর্তস্বরে বলেন--এ কি ভাস্বতী, তোমার নয়ন অশ্রুসিক্ত কেন?

ভাস্বতী--অন্যপূর্বা নারীকে বক্ষোলগ্ন করেছেন আপনি, আপনার সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে আপনার লীলা-পরাক্রমে উপকৃত মাহিষ্মতীর একটি কৃতজ্ঞতার দেহকে আপনি শুধু আপনার অধিকারের উল্লাসে উপভোগ করেছেন। তৃপ্ত হয়েছেন আপনি, কিন্তু আমার তৃপ্তি সুবর্চার সন্ধানে স্রোতস্বিনীর জলে ভেসে গিয়েছে।

আহত কণ্ঠস্বরে চিৎকার করেন অনল।--কি বললে ভাস্বতী?

ভাস্বতী--যা শুনলেন তাই বলেছি অনলদেব। আমার বরমাল্য, আমার মঞ্জীরধ্বনি, আমার নিঃশ্বাস আর অতৃপ্ত অধর অনন্তকাল আমার সুবর্চাকেই খুঁজে বেড়াবে।

অনল--তবে বৃথা কেন অনলের এই প্রণয়োৎসুক বাহুর আলিঙ্গন বরণ করলে নীলতনয়া?

ভাস্বতী--বরণ করেছে নীলতনয়া ভাস্বতীর অসহায় দেহ। ভাস্বতীর মন আপনাকে বরণ করেনি অনলদেব।

অনল--ভাস্বতী!

ভাস্বতী--বলুন অনলদেব।

অনল--এহেন কৃত্রিম জীবনই কি তোমার কাম্য?

ভাস্বতী--হ্যাঁ অনলদেব, ভাস্বতীর মন কখনও আপনার বক্ষের নিকটে যাবে না। আপনার কামনার জ্বালা চিরকাল নীরবে সহ্য করবে ভাস্বতীর দেহ, কিন্তু ভাস্বতীর মন চিরকাল তার স্বপ্নচারী প্রেমিক সুবর্চার বুকে লুটিয়ে থাকবে।

অনলের চক্ষু অকস্মাৎ খরবহ্নিশিখার মত জ্বলে ওঠে।--এ যে অভিশাপ, অশুচি স্বৈরিণীর জীবন!

হেসে ওঠে ভাস্বতী--হ্যাঁ, আপনারই আশীর্বাদ, আপনারই কৌতুকের দান, হে সর্বশুচি বৈশ্বানর।

সবিতার দাসী সাবিত্রী

লাল মাটির মল্লভূমিতে আজও শালবনের সবুজ বর্ষশেষের বাতাসে নতুন হয়ে ওঠে। সেই প্রাচীন অরণ্য আর নেই, তবু তার সুনিবিড় ছায়া আর শ্যামলতার লেশটুকু আজও এই শালবনের গায়ে লেগে রয়েছে। আজও এখানে অন্ধকার নামে, কিন্তু সে অন্ধকারে আর সেই ভয়াল অতীতের ভ্রূকুটি নেই। আধুনিক মল্লভূমির শালবন তার সেই প্রাচীন বন্যতা হারিয়েছে অনেকদিন।

আর হারিয়ে গিয়েছে সেই প্রাচীন বালুকার প্রান্তর, যে প্রান্তর একদিন এক রূপবতী নারীকে আপন বক্ষের গভীরে লুকিয়ে ফেলেছিল।

লাল মাটির প্রলেপে আর শালবনের ছায়ায় সেই বালুকার প্রান্তর কবে ঢাকা পড়ে গেল, তার দিনক্ষণের হিসাবও কেউ রাখে না। কিন্তু সেই ঘটনার মায়া মধুরতা ও করুণতা ঢাকা পড়েনি। সেই কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আজও দাঁড়িয়ে আছে এক মন্দির। ঝাড়গ্রাম গড়ের সাবিত্রী দেবীর মন্দির।

সেই অতীতে এক দস্যুর প্রতাপে একদিন শিউরে উঠেছিল মল্লভূমির এই বনপ্রদেশ। কত বণিকের সম্ভার আর তীর্থযাত্রীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছিল সেই দস্যু। কিন্তু এই লুণ্ঠনকুশল দস্যুরও লুণ্ঠনে একদিন মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেল।

নীলাচল অভিমুখে চলেছিলেন এক দম্পতি, সঙ্গে শিশুকন্যা। তীর্থযাত্রী দম্পতি সেদিন বিশ্রামের জন্য এই বনপ্রদেশের এক তরুতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

আর দস্যুও অন্তরাল হতে তার লুব্ধ চোখের দৃষ্টি প্রখর ক'রে দেখতে থাকে, লুণ্ঠন করার মত কি বস্তু আছে এই দম্পতির সঙ্গে।

ছিল অনেক বস্তু। ধাতুময় একটি পেটিকাও ছিল। কোন সন্দেহ নেই, স্বর্ণমুদ্রায় ও রত্নে পূর্ণ হয়ে রয়েছে ঐ পেটিকা। আর দেখা যায়, শাল ফুলের পাপড়ির মত কোমল একটি শিশুমুখ। ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে কী নিবিড় ও মায়াগভীর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রয়েছে আর আলাপ করছে সেই তীর্থপূর্ণপ্রয়াসী পিতা ও মাতা! যেন দেবতার দেওয়া অথবা স্বপ্নে পাওয়া একটি উপহার। কী প্রসন্নতায় ধন্য রয়েছে দম্পতির অন্তর!

দস্যুর অন্তরের সব ভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। মুদ্রা ও রত্নে পরিপূর্ণ পেটিকার দিকে নয়, ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দস্যুর শুষ্ক চক্ষু অদ্ভুত এক বেদনায় বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে। বার বার মনে পড়ে, কন্যা নেই তার। পুত্র আছে কিন্তু কন্যা নেই। দস্যু তার স্নেহের ঘরের এই অভাবটিকে এতদিন ভুলে থাকলেও আজ আর ভুলে থাকতে পারে না।

আর দ্বিধা করেনি দস্যু। সূর্য অস্তমিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে নীলাচলযাত্রী দম্পতির সেই শিশুকন্যাকে বুকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল দস্যু।

দস্যুর ঘরে এবং দস্যু পিতারই স্নেহে পালিত হলো এবং বড় হয়ে উঠলো এই কন্যা। পূর্ণ যৌবনের সঞ্চার হতেই রূপে ও লাবণ্যে গঠিত অনুপমা এক প্রতিমার মত রূপসী হয়ে উঠলো। সবচেয়ে সুন্দর হলো তার অলকস্তবক, কালো মেঘের স্তবকের মত স্নিগ্ধ ও কোমল। কিন্তু চোখে তার তাপসিকার দৃষ্টি।

দস্যু পিতা একদিন দেখে বিস্মিত হলো, দীর্ঘিকার প্রান্তে এক নিভৃতে দাঁড়িয়ে আকাশের সূর্যকে প্রণাম করছে মেয়ে। আর ভাষাহীন নীরব একটি স্তব যেন তার ওষ্ঠে কম্পিত হচ্ছে।

—এ কী? প্রশ্ন করে দস্যু পিতা।

কন্যা উত্তর দেয়--আমি সবিতার দাসী সাবিত্রী।

অশ্রুসজল হয়ে ওঠে দস্যু পিতার চক্ষু। বলে--হ্যাঁ, তুমিই সাবিত্রী, সবিতার সেবিকা সাবিত্রী। নির্মম স্নেহের এই দস্যুকে ক্ষমা করো।

সরোবরের তীরে এক মন্দির রচনা ক'রে দিলেন দস্যুপিতা। সাবিত্রী সেই মন্দিরেই থাকে এবং সূর্যের উপাসনায় জীবন কেটে যায়।

কিন্তু সাবিত্রীর জীবনে একদিন দেখা দিলো আর এক লুব্ধের আক্রমণ। সাবিত্রীর যৌবনবিধুর দেহের দিকে তাকিয়ে দস্যুর পুত্র মুগ্ধ হলো একদিন। তাপসিকা সাবিত্রীকে চিনতে বুঝতে ও সম্মান দিতে শেখেনি দস্যুর পুত্র।

সূর্য অস্তমিত হতেই সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারে সাবিত্রীর উপাসনা-মন্দিরের নিভৃত কামাতুর শ্বাপদের মত সেই দস্যু-যুবকের পদশব্দে শিউরে উঠলো। সবিতার দাসী সাবিত্রী চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন, দস্যুপুত্র লালসাপূর্ণ চক্ষে এগিয়ে আসছে তার দেহস্পর্শ করার জন্য। অকস্মাৎ সেই অন্ধকারে বিদ্যুতের মত দীপ্তি স্ফুরিত ক'রে সুশাণিত একটি খড়গ সবিতার দাসী সাবিত্রীর সম্মুখে এসে পড়লো। খড়গ হাতে তুলে নিলেন সাবিত্রী। সন্ত্রস্ত দস্যুপুত্র পালিয়ে গেল।

এই বনপ্রদেশে দস্যুর প্রতাপও একদিন শেষ হয়ে গেল। দস্যুশক্তিকে পরাভূত ক'রে আর এই বনপ্রদেশের অধিকার হরণ ক'রে এক যুবক সামন্ত এখানে তাঁর রাজ্য স্থাপন করলেন। দস্যুশাসিত বনপ্রদেশের আতংক দূর হয়ে গেল।

নবীন রাজা বিস্মিত হয়ে আর মুগ্ধ হয়ে দেখলেন দস্যুর আলয়ে পালিতা সাবিত্রীকে, স্তবকিত মেঘমালার মত কমনীয় যার কান্তি।

নবীন রাজা তাঁর দিবসের কল্পনায় আর নিশীথের স্বপ্নে সাবিত্রীর মূর্তিই শুধু দেখতে পান। ভুলতে চেষ্টা ক'রেও ভুলতে পারেন না। বুঝতে পারেন রাজা, সাবিত্রী তাঁর জীবনসঙ্গিনী না হলে তাঁর জীবনে একটা শূন্যতার বেদনা চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। সাবিত্রীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন নবীন রাজা।

আপত্তি করলেন সাবিত্রী।—আমি সবিতার দাসী সাবিত্রী। বিবাহিত জীবনের জন্য আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।

সাবিত্রীর প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারেন না নবীন রাজা।—তুমিই আমার জীবনের প্রথম প্রেমের পাত্রী। তুমিই আমার একমাত্র দয়িতা। পুণ্যময় তোমার জীবন, তার চেয়ে বেশি পুণ্যময় তোমার প্রেম। আমি তোমার সেই প্রেমের উপহারে পুণ্যবান হতে চাই। বার বার আবেদন করেন নবীন রাজা। সাবিত্রীও বার বার আপত্তি প্রকাশ করেন।

একদিন পূর্ব আকাশে সূর্য দেখা দেবার প্রাক্-মুহূর্তে, ঊষাভাসের ঈষৎ আলোকে সাবিত্রীর উপাসনা-মন্দিরের সোপানে এসে দাঁড়ালো এক প্রেমিকের আবেদনকরুণ মূর্তি। নবীন রাজার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত হয়ে উঠলো সাবিত্রীর মন। বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হলেন সাবিত্রী।

তারপর একটি সন্ধ্যা। উৎসব জেগেছে শত শত দীপের আলোকে, বাঁশির মধুর নাদে, ধূপের সৌরভে, আর পুষ্পসজ্জার সমারোহে। বিবাহের লগ্ন এগিয়ে আসছে। উপাসনার মন্দিরে নয়, নানা অলংকারে আর মাল্যে চন্দনে ও তিলকে আরও সুন্দর হয়ে সাবিত্রী বসে আছেন এক কক্ষের আলিম্পিত ভূমির উপর স্থাপিত একটি সোনার পিঁড়ির উপর। পুরোহিত প্রস্তুত হয়ে আছেন। বরবেশে আসছেন নবীন রাজা। লগ্ন আসন্ন।

নবীন রাজা প্রস্তুত হয়েছেন। বরযাত্রায় বের হবার সময়ও হয়ে এসেছে। এমন সময়ে সংবাদ শুনলেন রাজা, সাবিত্রী নেই। সাবিত্রী তাঁর দেহের সকল অলংকার খুলে রেখে আর ঘর ছেড়ে দূরের শালবনের দিকে ছুটে চলে গিয়েছেন।

ছুটে চললেন প্রেমিক রাজা তাঁর দয়িতার অন্বেষণে। দেখতে পেলেন, এক নারী র ছায়ামূর্তি সন্ধ্যার অন্ধকারকে বিচলিত ক'রে ছুটে চলেছে।

পিছনের সকল উৎসবকে নিষ্প্রভ ক'রে আর কাঁদিয়ে দিয়ে এভাবে কেন পালিয়ে চললেন সাবিত্রী? বুঝতে পারেন না রাজা। সাবিত্রীর অনুসরণ ক'রে দ্রুতপদে ছুটে চললেন রাজা।--যেও না সাবিত্রী, যেও না।

কিন্তু রাজার কাতর কণ্ঠের আবেদন যেন শুনতে পান না সাবিত্রী।

কিসের বেদনা সাবিত্রীকে এই শুভ-লগ্নে এমন ক'রে বিদ্রোহিণী ক'রে তুলেছে? জানতে চান রাজা। ডাক দেন রাজা--একবার শুধু বলে যাও সাবিত্রী।

শালবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন সাবিত্রী। রাজাও অনুসরণ করেন।

শালবনের পথও ফুরিয়ে যায়। সাবিত্রী এসে দাঁড়ালেন বালুকাময় এক প্রান্তরের উপকণ্ঠে।

অদ্ভুত এই বালুকার প্রান্তর। যেন এতদিন ধরে সাবিত্রীর পদধ্বনি শুনবার প্রতীক্ষায় ছিল। সাবিত্রী এসে কাছে দাঁড়াতেই টলমল ক'রে উঠলো বালুকার প্রান্তর।

নদীজলে বিসর্জিত প্রতিমার মত ধীরে ধীরে সেই বালুকাপুঞ্জের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলেন সাবিত্রী। রাশি রাশি বালুকা এসে সুন্দরী সাবিত্রীর দেহ ঢেকে ফেলতে লাগলো। আর্তনাদ ক'রে ছুটে আসতে থাকেন রাজা।

ততক্ষণে বালুকারাশির মধ্যে সাবিত্রীর সারা শরীর নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে, শুধু বাকি রয়েছে কালো মেঘের স্তবকের মত তাঁর কেশরাশি।

সেই নির্মম বালুকাপুঞ্জের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজা। দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সাবিত্রীর অলকগুচ্ছ।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা, বালুকাপ্রান্তরের পিপাসী বক্ষের গভীরে অন্তর্হিত হলেন সাবিত্রী। নবীন রাজাও সেই সঙ্গে বালুকার গ্রাসে অন্তর্হিত হতে চলেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুচরেরা ততক্ষণে এসে তাঁকে ধরে ফেলে আর দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ফিরে গেলেন রাজা। প্রান্তরের ক্ষুব্ধ বালুকাপুঞ্জও শান্ত হয়ে গেল। রাজা দেখলেন, কালো মেঘের স্তবকের মত অলকরাশির একটি গুচ্ছ তাঁর দু'বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে বুকে লেগে রয়েছে।

একটি মন্দির নির্মাণ করলেন রাজা। সাবিত্রীর সেই কেশগুচ্ছ একটি পেটিকায় সুরক্ষিত ক'রে এই মন্দিরে স্থাপিত করলেন।

আজও রয়েছে সেই মন্দির, পেটিকায় সুরক্ষিত সেই কেশগুচ্ছও আছে। আর আছে সেই দৈবী খড়গ, যে খড়গ সবিতার দাসী সাবিত্রীকে পাপীর লালসার আক্রমণ হতে রক্ষা করেছিল।

পেটিকায় রক্ষিত কেশগুচ্ছ আর এই খড়গ আজও পূজিত হয়। মানবী হয়েও সবিতার দাসী সাবিত্রী মানুষের শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে দেবী হয়ে গিয়েছেন। এক প্রেমিক রাজার হৃদয়ের বেদনা ও নিষ্ঠাকে নিদর্শনীয় ক'রে রেখেছে এই মন্দির।

বালুকাপ্রান্তরের সেই পিপাসার রহস্য কল্পনা ক'রেও ঠিক বোঝা যায় না। কে জানে, অন্তরের কোন্ ভাবনার দ্বন্দ্বে রাজার প্রেমের আহ্বান হতে এমনভাবে চরম দূরে চলে গিয়েছিলেন সাবিত্রী। আজও এই মন্দিরে আরতির দীপ জ্বলে, আর শুক্লপক্ষের সান্ধ্য চাঁদ দূর ও নিকটের শালবনে আলো ছড়ায়। জ্যোৎস্নার রাতে ঝাড়গ্রামের শালবন আজও কেমন অদ্ভুত হয়ে ওঠে। মনে হয়, অতীতের অসমাপ্ত এক উৎসবের ব্যথা যেন শালবনের আলোছায়ার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

ভক্ত মর্তুজা

ভক্তি তত্ত্বের চক্রবর্তী বিশ্বানাথের আনন্দ 'চন্দ্রিকা' আর 'উজ্জ্বল নীলমণিকিরণ'-এর স্পর্শে তখন আর একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গৌড়জনের মনের আকাশ। আর, মনের মাটি সিক্ত ক'রে তুলেছে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু'। 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' মিটিয়ে দিচ্ছে জীবনের সকল তত্ত্বকঠিন ভাবনার পিপাসা। বলদেবের গোবিন্দভাষ্যে গৌড়ীয় ভক্তের প্রাণ নতুন ক'রে ভাষা লাভ করেছে। সেই সময়।

সেই সময় এই বঙ্গভূমিরই এক তন্ত্রসাধক তাঁর মনের এক প্রবল প্রশ্নের টানে ভাগীরথীর তটে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতেন কলস্বরা ভাগীরথীর জললহরীর দিকে। কখনো অশান্ত হয়ে উঠতো এবং কখনো বা উদাস হয়ে যেত তাঁর মন। তারপর, যেন তাঁর অন্তরের সেই প্রশ্নকেই ধ্বনিত ক'রে গেয়ে উঠতেন গান--না জানি পাগলের মনডিঙা কোন ঘাটে লাগাবি রে!

জীবননদীর কূলে ঘাট আছে অনেক। কিন্তু ঠিক কোন্ ঘাটে ডিঙা লাগালে জীবনের পরমাশ্রয় পাওয়া যাবে, এই প্রশ্নেই যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল সেই ব্যাকুলের মন।

সেই তন্ত্রসাধকের নাম সৈয়দ মর্তুজা। লোকে তাঁকে বলতো মর্তুজা হিন্দ। আজ থেকে প্রায় তিন শত বছর আগে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের নিকটে বালিঘাটায় ভাগীরথীর কূলেই সৈয়দ মর্তুজার শৈশব অতিবাহিত হয়। সেই বালিঘাটা আজও আছে এবং নদীতটে অতিবৃদ্ধ বটের ছায়ায় বসে আজও গ্রামের রাখাল বাঁশি বাজায়। লোকে বলে, মহাকবি বাল্মীকি একদিন এখানেই এসে ভাগীরথীর জলে স্নান করেছিলেন। তাই তো এই স্থানের নাম বালিঘাটা।

পিতা সৈয়দ হোসেন কাদরী ফকিরী গ্রহণ করেছিলেন এবং পুত্র মর্তুজাও যুবা বয়সেই একদিন ফকিরী গ্রহণ ক'রে এবং পত্নী-পুত্র-কন্যার মায়ায় অভিভূত সংসারের সকল টান পিছনে ফেলে রেখে ভাগীরথীকূলেই এক নিরালায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কে জানে, কেন পারিবারিক জীবনের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল মর্তুজার? হয়তো সমাজের দাবি ছিল তাই, কিংবা তাঁর নিজেরই মনের দাবি। সাধনপথের কোন গণ্ডী স্বীকার করতেন না মর্তুজা। মন্দির ও মসজিদের ভেদ মানতেন না। তাই কেউ বলতো পাগল, কেউ বলতো উদ্‌ভ্রান্ত। আত্মীয়েরা বলতেন, এমন মানুষের পক্ষে সমাজ আর সংসার থেকে দূরে থাকাই ভালো।

মর্তুজা হাসতেন মনে মনে। কারণ, তিনি তাঁর গুরু আউলিয়া রজাক সাহেবের কাছে গিয়ে প্রশ্ন ক'রে তাঁর মনের দ্বন্দ্বের মীমাংসাও ক'রে নিয়েছিলেন।

--আমার মনে আর আচরণে আপনি কি কোন ভুল দেখতে পাচ্ছেন? গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন মর্তুজা।

গুরু প্রশ্ন করেন--কি করেছ তুমি?

মর্তুজা বলেন--আমি মুসলমান হয়েও আর ফকীর হয়েও সাধনপথের ভেদ মানি না, নিয়মের বাঁধন মানি না, মন্দিরে মসজিদে পার্থক্য করি না।

বৃদ্ধ আউলিয়া রজাক সহাস্যে বলেন--আমি তোমাকে এক ভক্ত সুফী মহাজনের উপদেশ শুনিয়ে দিতে পারি।

--বলুন।

গুরু বলেন--সুফী মহাজন রুমী বলছেন :

মিল্লতে ইশ্‌ক অয হমী মিল্লত জুদাস্ত
আশিকাঁ রা মজহবো মিল্লত খুদাস্ত।

--ভক্তির পথ সম্প্রদায়ের ভেদ মেনে চলে না। স্বয়ং ভগবানই হলেন ভক্তের পথ ও সম্প্রদায়।

মর্তুজা বলেন--আমার মনের সব সন্দেহ মিটে গেল গুরু।

ভাগীরথীর কূলে এক নিরালায় এসে ঠাঁই নিলেন মর্তুজা। আজ যেখানে খিদিরপুর হল্ট নামে ছোট একটি রেলস্টেশন দেখা যায়, তারই পূর্বদিকে অল্পদূরে সূতী নামে এক গ্রামের কাছে এসে গঙ্গার প্রধান ধারা থেকে ছিন্ন হয়ে ভাগীরথীর শাখাস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সূচীর পাশে ছাপঘাটি গ্রাম এবং এই গ্রামেই এক বটের ছায়ায় এসে আস্তানা স্থাপন করলেন মর্তুজা।

সাধনপথের ভেদ স্বীকার করেন না মর্তুজা। অনুভব করেন, তাঁর অন্তরের গভীরে যেন এক আকুলতার পদ্মকোরক আলোকের স্পর্শ লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। অনুভব করেন, ঐ আকাশলোকের আলোকে কোন ধর্মভেদ নেই। এই জীবনই অঞ্জলি হয়ে গ্রহণ করবে ঐ আলোক, আর সেই আলোকের ধারায় ধুইয়ে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে হৃদয়ের পদ্মকোরক।

একদিন এক তন্ত্রাচারী সাধুর সঙ্গলাভ ক'রে মুগ্ধ হলেন মর্তুজা। শুনলেন উপদেশ। এবং শুরু হল মর্তুজার জীবনের আর এক সাধনার অধ্যায়।

দিন মাস ও বৎসর অতিক্রান্ত হয়। তান্ত্রিক মর্তুজা সাধনায় তৎপর হয়ে থাকেন। এক একদিন সূর্য অস্তমিত হবার আগে যখন ভাগীরথীর জল রঙীন হয়ে ওঠে, তখন নদীতটে এসে এক নিভৃতে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর যেন তাঁরই মনের গভীরে নিহিত একটি কঠিন প্রশ্ন তাঁর ক্ষণিক ঔদাসীন্যের সুযোগ পেয়ে হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে। গান গেয়ে প্রশ্ন করেন মর্তুজা, মনডিঙা কোন্ ঘাটে লাগাবি রে পাগল?

তবে কি এখনো ঘাট খুঁজে পাচ্ছে না ব্যাকুলের মনডিঙা? নিজের গানে নিজেই চমকে ওঠেন মর্তুজা। সব ঘাটই তো ঘাট, তবে কেন তৃপ্ত হচ্ছে না জীবন? প্রশ্ন জাগে মনে, তবে কি সাধনার কোন ত্রুটি হচ্ছে?

সেদিনও আর একবার ভাগীরথীর তটের নিভৃতে গান বন্ধ ক'রেই চমকে উঠলেন মর্তুজা। কিন্তু নিজের মনের প্রশ্ন শুনে নয়, একটি মানুষের মূর্তি দেখে।

অদূরে নদীতটের কিনারায় জলের উপর ছায়া ফেলে মৃদু ঝড়ে দুলছে যে বকুল গাছ, তারই নিকটে এসে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবতী। অপলক চোখে জলের ঢেউ-এর দিকে তাকিয়ে কি জানি ভাবছে সেই নারী। মর্তুজার সঙ্গীতের স্বর কানে পৌঁছতেই যুবতীও যেন চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। দেখতে পেলেন মর্তুজা, নারীর মুখে বেদনা আর চোখে জল।

সন্দেহ হয় মর্তুজার, তবে কি সংসারের কোন শোকদুঃখতাপিতা অভাগিনী ভাগীরথীর জলে জীবন ভাসিয়ে দেবার জন্য ঐ নিভৃতে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে?

নারীর নিকটে এসে দাঁড়ালেন মর্তুজা।--কে তুমি? আর, এইভাবে চোখে জল নিয়ে নদীর জলের দিকেই বা কেন তাকিয়েছিলে?

নারী বলে--আমি ব্রাহ্মণের কন্যা।

মর্তুজা--তোমার নাম?

নারী--আনন্দময়ী।

মর্তুজা হাসেন--কিন্তু এত নিরানন্দ কেন তোমার চোখ আর মুখ?

নারী বলে--এই জীবন ধারণের কোন অর্থ খুঁজে পাই না। না ঈশ্বর, না বিষয়ের সংসার, কাউকেই আপন ক'রে নিতে পারলাম না। তবে আর এই নিরর্থক জীবনের বোঝা বহন ক'রে লাভ কি?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মর্তুজা বলেন--বিষয়ের সংসারকে আপন করতে পারনি, তার জন্য দুঃখ কেন? ঈশ্বরকে আপন ক'রে নাও, তবেই সুখী হবে।

নারী বলে--ঈশ্বরকে আপন ক'রে নেবো কেমন ক'রে, তাও যে বুঝতে পারি না।

কোন উত্তর দেন না মর্তুজা। নীরবে অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মর্তুজা।

অপরিচিতা নারীর বিচলিত মন যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। নীরবে তাকিয়ে থাকে মর্তুজার মুখের দিকে। তপস্বী সাধকের মতই শান্ত ও সৌম্য কে এই মহাশয়?

নারী প্রশ্ন করে--আপনি কি গৃহী?

মর্তুজা--না।

নারী--আপনি কি সাধক?

মর্তুজা--হ্যাঁ।

নারী--তবে আপনিই আমাকে উপদেশ দান করুন।

মর্তুজা--অনুরোধ করি, তুমি সাধিকা হও, ঈশ্বরের ভজনায় জীবন উৎসর্গ করো।

নারী--আপনি আশ্রয় দান করুন এবং সাধনার পথ বলে দিন।

সহসা উত্তর দিতে পারেন না মর্তুজা।

নারীই বলে--আপনি কি তন্ত্রসাধক?

--হ্যাঁ।

তবে আমি তো আপনার সাধনসহচরী হতে পারি।

মর্তুজা বলেন--তোমার আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু অনুরোধ করি, আর একবার ভেবে দেখো, এই পথ বড় কঠিন পথ।

নারী বলে--হোক কঠিন, আপনি আপনার মনের দ্বিধা দূর করুন।

মর্তুজা আবার হেসে ফেলেন--আমার মনের পরিচয় আমি জানি। তুমি তোমার মনের দিকে তাকিয়ে বলো, এই কঠিন সাধনার পথই কি তুমি বেছে নিতে চাও?

নারী বলে--হ্যাঁ।

কে জানে, হয়তো সত্যই নিজের মনের দিকে তাকিয়ে সেদিন এক তন্ত্রসাধকের সাধনসহচরী হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন আনন্দময়ী নামে সেই পরমার্থাভিলাষিণী নারী

মর্তুজা বলেন--তবে এসো।

ছাপঘাটির বটের ছায়ায় এক কুটীরে তন্ত্রসাধক মর্তুজার সাধনসঙ্গিনী সেই নারী তাঁর সংকল্পের নিষ্ঠাকে মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হতে দেন না। বিশ্বাস করেন আনন্দময়ী, এই পথ বড় কঠিন পথ। জানেন আনন্দময়ী, ঐ সৌম্য শান্ত ও সুন্দর সাধকের মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হবার অধিকার তাঁর নেই। মুগ্ধ হ'লে ভুল হবে, ভয়ংকর ভুল। তিনি এক সাধকের সাধনপথের সহচরী মাত্র, এ ছাড়া আর কোন সম্পর্কের মায়া এখানে ঠাঁই পেতে পারে না।

কিন্তু একদিন আবার শান্ত তন্ত্রসাধক মর্তুজার মনের শান্তি চমকে দিয়ে আনন্দময়ীর চোখে চিকচিক ক'রে ফুটে উঠলো দুটি উত্তপ্ত অশ্রুর বিন্দু।

মর্তুজা বিস্মিত হন--এ কি?

আনন্দময়ী বলেন--ক্ষমা করুন, আর বিদায় দিন আমাকে।

--কেন?

--নইলে ক্ষতি হবে আপনার।

--আমার ক্ষতি?

--হ্যাঁ, আপনার সাধনার ক্ষতি।

--এতদিন পরে এই সন্দেহ কেন দেখা দিলো তোমার মনে?

--এতদিন পরে দেখতে পেয়েছি নিজের মনকে।

--এই কথার অর্থ?

--বুঝতে পেরেছি, এই তন্ত্রমন্ত্রকে শুধু বোঝার মত সহ্য করছি আমি। দেখতে পেয়েছি, আমার মনের কল্পনায় দেবতা আসা-যাওয়া করছেন একটি মানুষের মূর্তি ধ'রে। সে মূর্তি হলো আপনারই মূর্তি।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন মর্তুজা।

আনন্দময়ী বলেন--আপনি হয়তো ঘৃণা করতে পারবেন, কিন্তু আমি যে ঘৃণা করতে পারছি না আমার এই মনকে।

কোন কথা বলেন না মর্তুজা।

আনন্দময়ী বলেন--আমার মনের অনুরাগ আর আকুলতাকে আপনি হয়তো সাধনপথের কাঁটা বলে মনে করতে পারবেন, কিন্তু আমি মনে করি পূজার ফুল।

মর্তুজাকে প্রণাম ক'রে বেদনাহতের মত বিচলিতভাবে কেঁদে ফেলেন আনন্দময়ী--কিন্তু এই ফুল নিবেদন করার রীতি জানি না। তাই ভয় হয়, আপনার ক্ষতি হবে। যেদিন ঈশ্বরই এই ফুল গ্রহণ ক'রে আমাকে নির্ভয় ক'রে দেবেন, সেই দিন ফিরে এসে আবার আপনার সম্মুখে দাঁড়াবো।

চলে গেলেন আনন্দময়ী এবং একদিন ভাগীরথীতটের নিভৃতে এসে দাঁড়িয়ে গান গাইতে গিয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন মর্তুজা। কারণ, নিজের মনের ভিতরেই দুটি অশ্রুবিন্দু দেখতে পেয়েছেন মর্তুজা। এ কোন্ অনুরাগের বেদনাবিন্দু? কার জন্য এবং কিসের জন্য? তবে কি তন্ত্রসাধকের অন্তরের এক কোণে একটি মায়াময় ফাঁকি অলক্ষ্যে এসে ঠাঁই নিয়ে ফেলেছে? ভুল হয়েছে? ঘাট খুঁজে পাচ্ছে না পাগলের মনডিঙা?

শুক্লারাতের দ্বিতীয় প্রহরে যখন গঙ্গাকূলের বিটপীবনে মৃদু বাতাসের স্পর্শে পল্লবমর্মর জেগে ওঠে, তখন কুটীরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন মর্তুজা। মনে হয়, এই জীবনকে যেন জোর ক'রে আগল দিয়ে এক অন্ধকারের মধ্যে ফেলে রেখেছেন তিনি। মনের ভিতর হতে দুটি অশ্রুবিন্দু যেন সঙ্গীত হয়ে ফুটে উঠতে চাইছে। যেন বলছে ঐ আলোকস্মিত আকাশ, এই সঙ্গীত উপহার দাও আমাকে।

এইভাবেই একদিন কুটীরদ্বারে দাঁড়িয়ে এক সন্ধ্যায় শুনতে পেলেন মর্তুজা, প্রান্তরের ওপারে ঐ গ্রামের বুক থেকে সত্যই অদ্ভুত এক সঙ্গীতের সুস্বর ভেসে আসছে। ঘরে আর থাকতে পারলেন না মর্তুজা। বের হয়ে গেলেন।

সেই গ্রামে ভাগবত পাঠ করছিলেন বলদেব বিদ্যাভূষণ। গ্রামের সভাজনতার নিকটে এসে যখন দাঁড়ালেন মর্তুজা, তখন স্বচক্ষেই দেখতে পেলেন, ভক্ত গায়কের কণ্ঠ হতে উৎসারিত পদামৃতলহরী যেন সভাজনতার হৃদয় প্লাবিত ক'রে নিয়ে চলেছে কোন্ এক পরম পরিতৃপ্তির জগতের দিকে।

গ্রামের সেই সভাজনতার মধ্যে এসে বসলেন মর্তুজা এবং শুনলেন মধুর এক সাধনপথের বাণী। এই মানুষী জীবনেরই সব অশ্রু অনুরাগ আর আকুলতার উপহার নিয়ে গোপীহৃদয়ের আকাঙক্ষা কৃষ্ণপ্রেমে লীন হবার জন্য ছুটে চলে গিয়েছিল যে-পথে।

যখন কুটীরে ফিরে এলেন মর্তুজা, তখন মধ্যরাতের চাঁদের আলো পড়েছে তাঁর কুটীরের দুয়ারে। মনের সব দ্বন্দ্ব ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে গিয়েছে। আর কোন সংশয় নেই মনে। বুঝতে পারেন মর্তুজা, এইবার এবং এতদিনে পাগলের মনডিঙা ঘাট খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু কে দাঁড়িয়ে আছে কুটীরদ্বারের ঐ আলোছায়ার কাছে?

এসে দাঁড়িয়েছিলেন আনন্দময়ী, হাতে একটি একতারা। মর্তুজাকে দেখতে পেয়েই সুস্মিত মুখে বলেন--এসেছি আমি।

মর্তুজা বলেন--এসো।

এই আহ্বানে সেদিন আর কোন সমস্যা ছিল না। উভয়েই নিজ নিজ হৃদয়ের অনুরাগের দুটি অশ্রুবিন্দুকে পূজার ফুলে আর সঙ্গীতে পরিণত ক'রে কৃষ্ণপদে নিবেদনের পথ পেয়েছিলেন এবং পেয়ে ধন্য হয়েছিল উভয়েরই জীবন।

--শ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি! পথের মানুষ ভক্ত মর্তুজার সেই সঙ্গীতমুখর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ছাপঘাটির বটের ছায়ায় ক্ষুদ্র কুটীরের দুয়ারে এসে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াতো।

--কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে, পাসরিতে নারি আমি! আনন্দময়ীর কণ্ঠে যেন দুই জীবনের অনুরাগের ইতিহাস সুস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠতো।

আজ আর কোন ক্ষতির ভয় নেই। সেই অনুরাগের ইতিহাস কৃষ্ণপদে সমর্পণ ক'রে দিতে পেরেছেন মর্তুজা আর আনন্দময়ী। দু'জনের মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীতে ধ্বনিত হতো জীবনের একমাত্র কামনা--মোরে কর দয়া, দেহ পদছায়া, শুনহ পরাণ কানু।

'পরাণ-কানুর পদছায়া' কামনা ক'রেই একদিন চোখ বন্ধ ক'রে চিরকালের মত বিদায় নিলেন আনন্দময়ী। কিন্তু ছাপঘাটির বটের ছায়া তবুও সঙ্গীতহীন হয়ে যায়নি। আনন্দময়ীর সমাধির পাশেই একতারা হাতে নিয়ে বসতেন ভক্ত মর্তুজা এবং গ্রামের লোক মুগ্ধ হয়ে শুনতো, গান গেয়ে কানুর চরণেই জীবনের একমাত্র তৃপ্তি নিবেদন করছেন মর্তুজা--'সকল ছাড়িয়া, রহিনু তুয়া পায়ে জীবনমরণ ভরি।'

ছাপঘাটি গ্রামের সেই বটের ছায়া আজ আর নেই। কিন্তু আজও একই সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছেন ভক্ত মর্তুজা ও তাঁর আনন্দময়ী। পাশাপাশি দুটি সমাধি এবং এই সমাধি দুটিকে আজও হিন্দু আর মুসলমান উভয়েই ফুল-বাতাসা নিবেদন ক'রে অভ্যর্থনা জানায়। মেলা হয় রজব মাসে। ফকীর ও সন্ন্যাসী, উভয়েরই ভিড় হয়। সৈয়দ মর্তুজা আর আনন্দময়ী, যেন দুটি অনুরাগের সঙ্গীত দুই সমাধির ভিতর ঘুমিয়ে রয়েছে।

গনগনির মাঠ

ঐ সেই শিলাবতী নদী, আর নদীর তীরে ঐ মাঠের নাম গনগনির মাঠ। আজও বর্ষার দিনে গিরিমাটি-ধোওয়া গেরুয়া রঙের ঢল নামে শিলাবতীর বুকে। প্লাবনের জলে গলে যায় শালবনের মাটি। ভেসে যায় কত শালতরুর মৃতদেহ। কে জানে কত হাজার বছর ধ'রে উত্তর মেদিনীপুরের অরণ্য তার জীবনের হর্ষ ও বেদনা শিলাবতীর জলে এইভাবে ভাসিয়ে দিয়ে আসছে।

গনগনির মাঠ যেন অতি অতীতের এক উদ্ভিদ্‌রাজ্যের সমাধিভূমির স্মৃতি আজও ধারণ ক'রে রয়েছে। মানুষের পথচলার চিহ্ন তখনো জেগে ওঠেনি যে বনের মাটিতে, সেই বনের উদ্ভিদ বন্যাস্রোতে ভেসে গিয়ে পুঞ্জীভূত হয়েছিল আর পঞ্চভূতেরই রহস্যের স্পর্শে হাজার হাজার বছর ধ'রে অভিভূত হয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিল। সেই বিস্ময়ের একটি প্রাচীন আশ্রয় এই গনগনির মাঠ। খড়গপুর হতে বিশ ক্রোশ দূরে বগড়ি-কৃষ্ণনগরের প্রান্তে এসে দাঁড়ালে দেখা যাবে, গনগনির মাঠে আজও পাথর হয়ে পড়ে রয়েছে প্রাচীন বনস্পতির দেহ।

গ্রামের মানুষ বলে, এই পাথর ঠিক পাথর নয়। জতুগৃহ পুড়ে যাবার পর মাতা কুন্তীর সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডব এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন যে অরণ্যে, এখানেই ছিল সেই অরণ্য। এবং এই গনগনির মাঠেই একদিন দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম বকরাক্ষসের প্রাণ সংহার করেছিলেন। পাথর নয়, সেই নিহত বকরাক্ষসেরই কতগুলি অস্থি পড়ে রয়েছে গনগনির মাঠে। ঐ তো সেই

ভিকনগর গ্রাম, ভিক্ষাজীবী বনবাসী পঞ্চ পাণ্ডব থাকতেন যেখানে।

বগড়ি-কৃষ্ণনগরের কাল্পনিক ইতিহাস গনগনির মাঠে বকরাক্ষসের অস্থি হয়ে পড়ে রয়েছে, আর সত্যিকারের ইতিহাসের পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণরায়জীর মন্দির। বগড়ির প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর রায় এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। আর, রাজা রঘুনাথ সিংহ একদিন ঐ কৃষ্ণমূর্তির পার্শ্বে স্থাপন করলেন শ্রীরাধার মূর্তি। আরণ্য অঞ্চলের এক ক্ষুদ্রজনপদের জীবনে ঐ যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠায় যে আনন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার পরিচয় আজও বর্ষে বর্ষে সহর্ষে জেগে ওঠে প্রতি দোলপূর্ণিমার মন-দোলানো দিনে। মেলা বসে যায় মন্দিরের চারদিকে, আর সমাগত বহু মানুষের কলরবে প্রাচীন বগড়ির একটি আনন্দমুখরিত ইতিহাসের নীরব স্মৃতি যেন কিছুক্ষণের জন্য আবার মুখর হয়ে ওঠে।

কিন্তু গনগনির মাঠের সান্ধ্য অন্ধকার যেন এই উৎসব হতে দূরেই সরে থাকে। এই মাঠ যেন সত্য সত্যই নীরবে একটি প্রস্তরীভূত বেদনাকে সহ্য করছে। বগড়ি কৃষ্ণনগরের বাস্তব ইতিহাসেরই একটি ঘটনার বেদনা।

ইংরাজের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখন বঙ্গভূমির ভূমিস্বত্বের রীতি-নীতি উলট-পালট ক'রে দিয়ে নতুন এক বন্দোবস্তের অভিযান চালিয়েছেন। বগড়ি-কৃষ্ণনগরের রাজা ছত্র সিংহ শুনলেন, আর রাজত্ব করা চলবে না। কোম্পানি জানিয়ে দিয়েছেন, ঐ গড়ের দখল ছেড়ে দিতে হবে। পাইক লস্কর আর সৈন্য নিয়ে নিজের ইচ্ছামত তাঁর এই বিশ পুরুষের রাজ্য শাসন করার অধিকার তাঁর আর নেই। কর দিতে হবে ইংরাজের কোম্পানিকে। প্রজাদের মধ্যে যারা পুরুষানুক্রমে নিষ্কর ভূমি ভোগ দখল ক'রে আসছে, তাদেরও নতুন বন্দোবস্ত মেনে নিতে হবে। সে-সব নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে খাস ক'রে নেবেন কোম্পানি।

আপত্তি জানিয়েছিলেন রাজা ছত্র সিংহ এবং কোম্পানির এই নতুন বন্দোবস্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন। কিন্তু এক মাস পরেই এক প্রভাতে ঘুম থেকে চমকে জেগে উঠলেন। শুনলেন, শিলাবতীর অপর পারে অরণ্যের অন্তরালে ইংরাজের একটি তোপ গর্জন ক'রে উঠলো। কেঁপে উঠলো ক্ষুদ্র বগড়ির গড়ের প্রাচীর।

প্রতিবাদ দমন করার জন্য এগিয়ে এসেছে কোম্পানির সশস্ত্র বাহু। বিচলিত হলেন রাজা ছত্র সিংহ। ঐ গর্জনের কাছেই এখন আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর কোন উপায় নেই। ভীত ও বিষণ্ণ রাজা ছত্র সিংহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে দাঁড়ালেন এসে তাঁর গড়েরই দুয়ারের কাছে। তাকিয়ে রইলেন শিলাবতীর অপর পারে ঘন অরণ্যের দিকে। বর্ষার ঢল নেমেছে শিলাবতীর বুকে, দু'কূল ছাপিয়ে ছুটে চলেছে গেরুয়া রঙের স্রোত। বুঝতে পারেন ছত্র সিংহ, এই ঢল ফুরিয়ে গিয়ে শিলাবতী শান্ত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানির ফৌজ নদী পার হয়ে ছুটে আসবে এই গড়ের দুয়ার চূর্ণ করার জন্য।

রাজা ছত্র সিংহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন এক যুবক, সঙ্গে কতিপয় নায়েক প্রজা। যুবকের ভ্রূরেখার মধ্যে যেন প্রচণ্ড এক বিদ্রোহ থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। বন্য স্বাধীনতায় লালিত নায়েক প্রজাদেরও চোখে আর মুখে যেন এক দুরন্ত সংকল্পের ছায়া ফুটে উঠেছে।

রাজা ছত্র সিংহ বিষণ্ণভাবে বলেন—বিদায় দাও অচল সিংহ।

যুবক বলেন—কোথায় যাবেন আপনি?

ছত্র সিংহ—যাবো নদীর ওপারে, ইংরাজের শিবিরে।

যুবক—কেন?

ছত্র সিংহ—ক্ষমা চাইতে, আত্মসমর্পণ করতে।

অচল সিংহের দুই চক্ষু জ্বলে ওঠে—কেন?

ছত্র সিংহ বলেন—এ ছাড়া আর কি উপায় আছে? কে বাঁচাবে আমাকে? রাজত্বের

অধিকার আর এই গড়ের দুয়ার রক্ষা করবার শক্তি কই আমার?

অচল সিংহ বলেন--আমাকে আদেশ দান করুন, কোম্পানির অহংকারকে চূর্ণ করবার ভার দিন আমাকে। আপনি সগর্বে এই বগড়ি রাজ্যের রাজা হয়ে থাকুন।

বিষণ্ণভাবেই হাসতে থাকেন রাজা ছত্র সিংহ--কোম্পানির সঙ্গে কিসের জোরে লড়াই করবে অচল সিংহ?

অচল সিংহ--আমার এই তরবারির জোরে।

নায়েক প্রজারা চিৎকার ক'রে ওঠে--আর আমাদের এই বিষাক্ত তীরের জোরে। আদেশ করুন মহারাজ।

আদেশ দিলেন রাজা ছত্র সিংহ।

আজ থেকে দেড়শত বছর আগে উত্তর মেদিনীপুরের এই ক্ষুদ্র বনাঞ্চল ইংরাজের তোপের ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে তীরের গোছা নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সর্দার অচল সিংহ এই বিদ্রোহের নায়ক। নায়েক প্রজা দলে দলে এসে যোগদান ক'রে অচল সিংহের সে বিদ্রোহকে দিন দিন আরও প্রবল ক'রে তোলে। অরণ্য ভেদ ক'রে, প্রান্তর পার হয়ে কোম্পানির পল্টন ছুটে যায় বগড়ির গড় অধিকার করবার জন্য। কিন্তু নেতা অচল সিংহের দুঃসাহসে ও উৎসাহে জীবন-মরণ তুচ্ছ ক'রে নায়েক প্রজার বিষাক্ত তীর ইংরাজ পল্টনকে পদে পদে বিপর্যস্ত করে। দেখা যায় না, ধরা যায় না, যেন অরণ্যচারী কতগুলি দেহহীন প্রেত বিষাক্ত তীর বর্ষণ ক'রে কোম্পানির সৈন্যের উপর অকস্মাৎ মৃত্যু হেনে পালিয়ে যায়।

নতুন ফৌজ পাঠায় কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়ম। কামানের গর্জনে শিলাবতীর জল কাঁপে। নায়েক প্রজার কুটীর এবং গ্রাম ভস্মীভূত করে কোম্পানির সৈনিক। কিন্তু ক্ষান্ত হয় না বিদ্রোহ।

বগড়ির গড়ের দুয়ারও একদিন চূর্ণ হলো ইংরাজের তোপের আঘাতে। পালিয়ে গেলেন রাজা ছত্র সিংহ এবং দূর অরণ্যের নিভৃতে এক পল্লীর কুটীরে এসে আশ্রয় নিলেন।

অচল সিংহ আসেন। রাজা ছত্র সিংহ প্রশ্ন করেন--এভাবে আর কতদিন চলতে পারবে অচল সিংহ?

অচল সিংহ বলেন--চিরকাল চলবে। আপনার গড় অধিকার করেছে ইংরাজ, কিন্তু আপনার প্রজার মন অধিকার করতে পারবে না কখনো। কোম্পানির বন্দোবস্ত কেউ স্বীকার করবে না। গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে ছাই পেতে পারে ইংরাজ,--কিন্তু খাজনা পাবে না।

আবার অদৃশ্য হয়ে যান অচল সিংহ। কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করে যে গ্রাম, কোম্পানির ফৌজকে খাদ্য দান করে আর বিদ্রোহীদের অবস্থানের সংবাদ জানিয়ে দেয় যে গ্রামের মানুষ, সেই গ্রামের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন অচল সিংহ। কোম্পানিকে কর দেয় যারা, দুরন্ত বিদ্রোহী অচল সিংহ অকস্মাৎ একদিন ঝঞ্ঝার মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাদের উপর আর সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে চলে যান। বগড়িরাজ রাজা ছত্র সিংহের প্রজা হয়েও যারা কোম্পানিকে কর দেয়, তাদের হাত দুটোকেও ক্ষমা করে না অচল সিংহের তরবারি।

মাঝে মাঝে ইংরাজের তোপের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে মত্ত হয়ে ওঠেন অচল সিংহ। বহু নায়েক বিদ্রোহীর প্রাণ ছিন্নভিন্ন হয়, বহু বিদ্রোহী ইংরাজের বন্দী হয়। আহত হন অচল সিংহ। কিন্তু তবু ধরা পড়েন না, আহত ব্যাঘ্রের মত অরণ্যের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যান অচল সিংহ।

বগড়ি রাজ্যের গ্রামে গ্রামে কোম্পানির চর ঘুরে বেড়ায়। অচল সিংহের সন্ধান দিলে হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে, কোম্পানির সৈনিক ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা ক'রে বেড়ায় গ্রামের পথে পথে। কিন্তু ধরা পড়েন না অচল সিংহ, প্রাণ হারায় শুধু কোম্পানির চর।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে মাঝে মাঝে যেন মনের এক অসহ বেদনার জ্বালায় অরণ্যের

গোপন আবাস ছেড়ে ছুটে বের হয়ে আসেন অচল সিংহ। শিলাবতীর কিনারায় দাঁড়িয়ে অদূরের গড়ের দীপস্তম্ভের শীর্ষের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কোম্পানির গর্বের আলোক জ্বলছে গড়ের মাথার উপরে। চোখ জ্বলে অচল সিংহের, এবং প্রতিজ্ঞা করেন, প্রাণ যাক আর থাক, পাঁচ হাজার মশালের আগুন নিয়ে ঘিরে ধরতে হবে ঐ গড়ের ভিতর সুখসুপ্ত এক বিজাতীয় দর্পকে, পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দিতে হবে।

প্রস্তুত হতে বেশি দেরি করেন নি অচল সিংহ। এক অপরাহ্ণে অরণ্যের নিভৃতে গোপন শিবিরে সর্দার অচল সিংহ ও তাঁর অনুচর নায়েক প্রজার দল হাজার হাজার মশাল তৈরি ক'রে আর তীরের ফলকে বিষ মাখিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল যখন, তখন এক ব্যক্তি হাতে একটি পত্র নিয়ে অচল সিংহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

--কার পত্র?

আগন্তুক বলে--রাজা ছত্র সিংহের পত্র।

বিশেষ প্রয়োজনে পরামর্শের জন্য আহ্বান করেছেন রাজা ছত্র সিংহ। জানিয়েছেন রাজা ছত্র সিংহ--রাজ্যলাভের কোন কামনা আমার নেই। আমি সন্ন্যাস অবলম্বনের সংকল্প করেছি। চলে যাবার আগে একান্তভাবে তোমারই কাছে কয়েকটি কথা বলে দিয়ে যেতে চাই।

পত্র পাঠ ক'রে হঠাৎ সিক্ত হয়ে ওঠে অচল সিংহের চক্ষু। অনুমান করেন, কি দুঃখে ব্যথিত হয়ে রাজ্যের মায়া ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন কোমলচিত্ত রাজা ছত্র সিংহ!

সেই সন্ধ্যায় নায়েক বিদ্রোহীদের হাতে হাতে মশাল আর জ্বলে উঠলো না। চললেন সর্দার অচল সিংহ। পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো ছত্র সিংহের দূত। শেষ হলো অরণ্যপথ, শিলাবতীর কিনারা ধ'রে অন্ধকার ভেদ ক'রে হেঁটে চললেন অচল সিংহ, যেখানে তাঁরই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ব্যথিত ও হতাশ রাজা ছত্র সিংহ।

গনগনির মাঠ। মাঠের উপর অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি বৃক্ষ। আর তরুশ্রেণীর নিকট দাঁড়িয়ে আছেন রাজা ছত্র সিংহ।

--অচল সিংহ এসেছো?

--এসেছি মহারাজ, আদেশ করুন।

রাজা ছত্র সিংহের ছায়ামূর্তির দিকে তাকিয়ে শির নত ক'রে অভিবাদন জানালেন অচল সিংহ। কিন্তু দেখতে পাননি অচল সিংহ, রাজা ছত্র সিংহের ঐ ছায়ামূর্তির ওষ্ঠে কি বীভৎস এক কুটিল হাসি তখন ফুটে উঠেছে।

ছত্র সিংহ বলেন--আদেশ করবার আর কিছু নেই অচল সিংহ। শুধু তোমাকে কয়েকটি কথা শুনিয়ে দিতে চাই।

--বলুন।

--তুমি তোমার ঐ তরবারি আর বিষাক্ত তীরের জোরে আমাকে রাজা ক'রে তুলতে পারলে না, পারবেও না নিশ্চয়।

--এ কথার অর্থ কি মহারাজ?

--কিন্তু কোম্পানিই আমাকে রাজা ক'রে দিতে পারে যদি আমি...।

নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে রাজা ছত্র সিংহের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের রহস্য বুঝবার চেষ্টা করছিল অচল সিংহ। কিন্তু হঠাৎ বীভৎস এক হাস্যের উল্লাসে চমকে উঠলেন অচল সিংহ। যেন একটা প্রেতের শরীর হঠাৎ দুই হিংস্র বাহুর বন্ধনে জড়িয়ে ধরেছে অচল সিংহকে। রাজা ছত্র সিংহ দুই হাতে খল ভল্লুকের মত আঁকড়ে ধরেছেন অচল সিংহের শরীর।

ছত্র সিংহ বলেন--যদি আমি তোমাকে বন্দী ক'রে কোম্পানির হাতে সমর্পণ করি, তবে

আমি আমার রাজ্য ফিরে পাবো অচল সিংহ। এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কোম্পানি।

ছত্র সিংহের দুই বাহুর পেষণ হতে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে আর কোমরের তরবারি ধরবার জন্য চেষ্টা করেন অচল সিংহ। কিন্তু গনগনির মাঠের অন্ধকার যেন আর একবার বিদ্রূপ ক'রে হেসে ওঠে। হেসে ওঠেন রাজা ছত্র সিংহ।--বৃথা চেষ্টা অচল সিংহ!

সেই মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেলেন অচল সিংহ। হ্যাঁ, বৃথা চেষ্টাই বটে। তরুশ্রেণীর আড়াল হতে যেন কতগুলি ছায়াময় শরীর বন্দুক তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নিকটে। ইংরাজ সৈনিকের বন্দুকের নল এসে স্পর্শ করলো অচল সিংহের বুক। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অচল সিংহ।

ইংরাজ সৈনিকও আর দেরি করেনি। গনগনির মাঠের সেই তরুশ্রেণীর একটি তরুর শাখায় দড়ি ঝোলানো হলো এবং শান্ত ও নীরব বিদ্রোহী অচল সিংহ সেই রজ্জুর গ্রন্থিতে কণ্ঠ সমর্পণ ক'রে দিয়ে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করলেন।

এই গনগনির মাঠে রাত্রির অন্ধকারে আজও বকরাক্ষসের অস্থি যেন ভয়ে ভয়ে চুপ ক'রে ঘুমিয়ে থাকে। এবং রাত্রির পথিকও এই পথে যেতে হঠাৎ ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। সন্দেহ জাগে মনে, এগুলি সত্যই কি বকরাক্ষসের অস্থি? অনেকেই মনে করেন, এক লোভী বিশ্বাসহন্তার চতুরতায় ইংরাজের হাতে বন্দী হয়ে বিদ্রোহী অচল সিংহ প্রাণদণ্ড বরণ করেছিল যে ফাঁসির রজ্জুতে কণ্ঠ সঁপে দিয়ে, সেই রজ্জুকে ধারণ করার বেদনা সহ্য করতে না পেরে পাথর হয়ে গিয়েছিল গনগনির মাঠের গাছ।

হঠাৎ-রাজার মণিঘর

মনে মনে বড়ই অসুখী ছিলেন সেই ভূস্বামী। দক্ষিণ বঙ্গের এক বনময় প্রদেশের অতি ক্ষুদ্র এক ভূখণ্ডের প্রভু। কিন্তু দৈবাৎ তাঁর ঐ ক্ষুদ্রত্ব ঘুচে গিয়েছিল একদিন। অতি বৃহৎ হয়ে উঠেছিল তাঁর ঐশ্বর্য এবং ঐশ্বর্যের প্রভু সেই ভূস্বামীর পরিণামের স্মৃতিচিহ্ন আজও দেখা যায়। কিন্তু এই স্মৃতিচিহ্নের দিকে তাকিয়ে সেই প্রশ্নটিই আজও দর্শকের মনে ধ্বনিত হয়, শেষ পর্যন্ত সত্যই সুখী হতে পেরেছিলেন কি সেই ভূস্বামী?

ভূস্বামী ধনী রায় আর তাঁর পত্নী মণিমালা। ধনী রায়কে রাজা বলেই ডাকতো প্রজার দল। কিন্তু তাতে সুখী হতে পারেন নি ধনী রায়। বরং রাজা নামের সেই সম্বোধন তাঁর কানে বিদ্রূপের মতই শোনাতো। দুঃখ, অতি দুঃসহ এক দুঃখে সর্বদা অশান্ত ও বিষণ্ণ হয়ে থাকতো ধনী রায়ের মন। রাজা নন তিনি, এমন কি ধনীও নন। তাঁর নামটাও যেন একটা নিষ্ঠুর পরিহাস।

ধনী রায় জানেন, অতি অতীতে তাঁর পিতৃপুরুষেরা ছিলেন রাজা। সে রাজত্ব যেন জলের দাগের মত মুছে গিয়েছে এই মাটির বুক থেকে। সেই রাজত্বের আর সেই ঐশ্বর্যের শুধু কতগুলি কাহিনীর উত্তরাধিকার লাভ করেছেন ধনী রায়। যেন রাশি রাশি সোনা দিয়ে গড়া এক একটা কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনীগুলিকেও সহ্য করতে পারেন না ধনী রায়। মনে হয়, এই কাহিনীগুলিও যেন কতগুলি পুঞ্জীভূত বিদ্রূপ। একবারে মিথ্যা হয়ে গিয়েছে কাহিনীর সোনাগুলি, আর সত্য হয়ে রয়েছে কতগুলি ছাই। কিন্তু এই ছাইগুলির মধ্যে যেন একটা জ্বালা লুকিয়ে রয়েছে। পূর্বপুরুষের ঐশ্বর্যের গল্পগুলি মনে পড়লেই জ্বালা লাগে ভূস্বামী ধনী রায়ের মনে।

পত্নীর নাম মণিমালা। এবং লোকে বলে, ধনী রায়ের ঘরনী মণিমালার রূপ ও লাবণ্য

দেখলে সত্যিকারের রত্নমণিও হিংসায় মরে যাবে। কিন্তু ভূস্বামী ধনী রায় মনে করেন, এই নামটাও যেন তাঁর জীবনের আর এক বিদ্রূপ। সত্যিই তো, সত্যিকারের কোন মণির মালা দোলে না মণিমালার গলায়। সুন্দরী মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনে এক মুহূর্তের জন্য মুগ্ধ হতে পারেন নি ধনী রায়। মালতী কুঁড়ির মালা গলায় দিয়ে মণিমালা যখন হাসিমুখে ধনী রায়ের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন হেসে উঠতে পারে না ধনী রায়ের চক্ষু। মনে হয় তাঁর, সুন্দর একটা মাটির পুতুল তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখতে সুন্দর বটে, কিন্তু সোনায় গড়া একটিও অলংকার নেই এই রূপের অঙ্গে। সুতোর তাগা আর সাদা শাঁখা দিয়ে সাজানো সেই দুই বাহুকে মূল্যহীন বলেই মনে হয় ধনী রায়ের।

যেমন ঘরে, তেমনি ঘরের বাইরে কোন সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের মতও সুখী হতে পারেন না ভূস্বামী ধনী রায়। সন্ধ্যা হয়ে আসে, আর অস্তাচলের আভা এসে লুটিয়ে পড়ে ক্ষেত আর মাঠের বুকে। এই আভাও যে স্বর্ণবরণ, শস্যের মঞ্জরীগুলিও যে সোনায় গড়া মঞ্জরীর মত দেখতে। কিন্তু কি ভয়ানক এক ছলনা! সত্যিকারের এক বিন্দুও সোনা নেই এই আলোর আভা আর শস্যমঞ্জরীর বর্ণের মধ্যে। যেন নির্ধন ধনী রায়ের চোখের দৃষ্টিকে বিদ্রূপে দগ্ধ করার জন্যই কৃত্রিম সোনার রং জ্বলছে চারদিকে। বিষণ্ণ হয়ে আর বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকেন ধনী রায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন এক জলাশয়ের কিনারায় একাকী নিভৃতে।

বিরাট এক বিল। বিলের জলে প্রাক্‌সন্ধ্যার আলোক নাচে, যেন অজস্র গলিত স্বর্ণের উল্লাসে প্লাবিত হয়ে রয়েছে বিলের জল। কাহিনী মনে পড়ে ধনী রায়ের। একদিন এই বিলের জলে তাঁরই পিতৃপুরুষের ফুর্তির নৌকা ভেসে যেতো এই রকমই এক একটি অপরাহ্ণ বেলায়, আর সেই নৌকার পালদণ্ডের শীর্ষে একটি সোনার তৈরি সূর্য হেসে উঠতো ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে। এই বিলের তটেই ছিল তাঁর পিতৃপুরুষের প্রাসাদ আর গড়। সে বৈভবের একটুকু গুঁড়োও আর খুঁজে পাওয়া যায় না এই বিলের মাটিমাখা কিনারার কোন স্থানে। যেখানে ছিল প্রাসাদ, সেখানে আজ কাশের বন। সির সির করছে কাশের বন, ক্ষুধার্ত শিয়াল মেঠো তিতিরের গোপন বাসা খুঁজে বেড়ায়।

সন্ধ্যা হয়, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় চারদিক। অদ্ভুত এক সাজে সেজে ওঠেন ধনী রায়। দস্যুর সাজ। অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রস্তুত হন, তারপরেই বিলের জলে তাঁর ছোট ডিঙি ভাসিয়ে যেন সেই দিশাহারা অন্ধকারে সাঁতার দিয়ে হিংস্র এক লক্ষ্যের দিকে চলে যান।

শেষে দস্যুবৃত্তিই গ্রহণ করেছিলেন ভূস্বামী ধনী রায়। জীবনের এই মিথ্যা ধনিত্বকে আর সহ্য করতে পারেন না। কাশবনের শৃগালের ক্ষুধার চেয়েও কঠোর এক ক্ষুধা অশান্ত ক'রে তুলেছে ধনী রায়ের ভাবনা। ধনী হতে হবে। চাই সোনা, সত্যিকারের সোনা! রাজা হতে হবে, সত্যিকারের রাজা। আর এই বিলের জলেই নৌকা ভাসিয়ে সোনার পাটাতনের উপর বসে অস্তাচলের সূর্যের দিকে একদিন তাকাতে হবে। তবে সুখী হতে পারবেন ধনী রায়।

পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে রাত্রি-শেষের আগেই ঘরে ফিরে আসেন রাত্রির দস্যু আর দিনের ভূস্বামী ধনী রায়। কিন্তু লুণ্ঠিত সামগ্রীর দিকে তাকিয়ে আরও উগ্র হয়ে ওঠে তাঁর চোখের দৃষ্টি। অতি তুচ্ছ কতগুলি মূল্যহীন সামগ্রী, এক বিন্দু সোনা নেই তার মধ্যে। সে সামগ্রীর মূল্যে নৌকার পাটাতন সোনা ক'রে দেওয়া যায় না। সুন্দর মাটির পুতুলের মত ঐ সুন্দরী মণিমালার সুতোর তাগাকেও সোনা ক'রে দেওয়া যায় না।

সেদিন ঘরে ফেরার আগেই পথে ভোর হয়ে গেল রাত্রি। সেদিন পরস্ব লুণ্ঠনের কোন সুযোগ পান নি দস্যু ভূস্বামী ধনী রায়। এক দেবমন্দিরের দ্বারও ভেঙেছিলেন। আর, ব্যর্থ হিংসার বেদনায় বিচলিত হয়ে দেখেছিলেন, এক বিন্দু সোনার চিহ্নও নেই সেই দেব-বিগ্রহের কপালে। শিলাময় বিগ্রহ যেন একটা কঠোর আবর্জনা। ঘৃণাভরে তাকিয়ে আর নিজের

অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়ে ফিরে এসেছিলেন, বিলের কিনারায় ডিঙি লাগিয়ে আর পাটাতনের আড়ালে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে ক্লান্ত হয়ে বসেছিলেন। ভাবছিলেন, তাঁর সোনার স্বপ্ন এই জীবনে আর সফল হবে না।

এক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন ধনী রায়ের কাছে।--ওপারের গ্রামে যেতে চাই। দয়া ক'রে সন্ন্যাসীকে এই বিল পার ক'রে দিতে পারবে?

ধনী রায় বলেন--পয়সা দিতে পারবেন তো?

সন্ন্যাসী--না।

ধনী রায়--তবে কি দিতে পারবেন?

সন্ন্যাসী--আশীর্বাদ।

ধনী রায়--কি আশীর্বাদ?

সন্ন্যাসী--কি আশীর্বাদ চাও?

ধনী রায়--আমি ধনী হতে চাই।

সন্ন্যাসী--ধনী হবে তুমি।

ডিঙিতে ওঠেন সন্ন্যাসী। দরিদ্র ধীবরের মত বেশ, রাত্রির দস্যু ধনী রায় উৎসাহিতভাবেই ডিঙি বেয়ে চলেছেন। সোনার মত রং, ভোরের আলো ছল ছল করছে বিলের জলে। হঠাৎ চমকে উঠলেন ধনী রায়। মিথ্যা সোনার রং নয়, সত্যিকারের সোনা দেখতে পেয়েই চমকে উঠেছে ধনী রায়ের ক্ষুধার্ত চক্ষু। বিস্মিত হয়ে দেখলেন ধনী রায়, তাঁর ডিঙির একটি লোহার পাটা সোনা হয়ে গিয়েছে।

--একি? এ কেমন ক'রে সম্ভব?

ধনী রায়ের চিৎকার শুনে মৃদু হাস্য করেন সন্ন্যাসী। বলেন--সন্ন্যাসীর এই ঝুলির স্পর্শে তোমার ডিঙির লোহা সোনা হয়ে গিয়েছে।

--কি আছে আপনার ঝুলিতে?

সন্ন্যাসী বলেন--পরশ পাথর।

পরশ পাথর! পরশ পাথর! দুটি শব্দ যেন ধনী রায়ের হৃৎপিণ্ডের শোণিত মত্ত ক'রে তোলে। পরশ পাথর, যার স্পর্শে তুচ্ছ লোহা সোনা হয়ে যায়। নিষ্পলক চক্ষে আর রাত্রির শ্বাপদের মত হিংস্র ও জ্বলন্ত দৃষ্টি তুলে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ধনী রায়। তাঁর জীবনের স্বর্ণময় স্বপ্নের সব সফলতা যেন লুকিয়ে রয়েছে সন্ন্যাসীর ঐ জীর্ণ ঝুলির মধ্যে। হাতের বৈঠা ফেলে রেখে সন্ন্যাসীর উপর লুব্ধ শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন ধনী রায়। সন্নাসীর হাত থেকে ঝুলি কেড়ে নিয়ে, একটি নির্মম আঘাত হেনে সন্ন্যাসীকে বিলের জলে নিক্ষেপ করলেন। বিলের জলের গভীরে তলিয়ে গেলেন অসহায় সন্ন্যাসী, ক্ষণিকের মত ভেসেও আর উঠলেন না।

সন্ন্যাসীর শেষ দৃষ্টিতে কোন অভিশাপ ছিল কি না কে জানে! কিন্তু সত্য হয়ে উঠলো সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ। পরশ পাথরের অধিকারী ধনী রায় ধনী হয়ে উঠলেন।

নামে মাত্র রাজা ছিলেন যে ধনী রায়, যে মিথ্যা নামের মধ্যে শুধু বিদ্রূপেরই জ্বালা ছিল, সেই নাম আর সেই মিথ্যাই সত্য হয়ে উঠলো। হঠাৎ রাজা হয়ে গেলেন ধনী রায়, সত্যিকারের রাজা। বহু ভূসম্পত্তি ক্রয় করলেন, বিরাট প্রাসাদ আর গড় নির্মাণ করলেন। ধনী রায়ের ভবনের কক্ষে কক্ষে সত্যিকারের সোনার প্রদীপ জ্বলে। নতুন একটা সোনার কাহিনীও রটে গেল, রটিয়ে দিলেন স্বয়ং ধনী রায়। স্বপ্নে লক্ষ্মীদেবীর নির্দেশ পেয়ে বিলের জলে এক জায়গায় জাল ফেলে তাঁরই পিতৃপুরুষ রাজাদের সঞ্চিত রত্নে পরিপূর্ণ দশটি কলস পেয়েছেন ধনী রায়।

পরশ পাথরের গুণে সোনা হয়ে যাচ্ছে ধনী রায়ের লোহার স্তূপ। ভবনের অভ্যন্তরে

মৃত্তিকার গভীরে এক গুপ্তগৃহ নির্মাণ করলেন ধনী রায়। সোনায় ভরে উঠলো গুপ্তগৃহ। নাম রাখলেন—মণিঘর।

সেদিন মণিঘরে সোনা সাজাচ্ছিলেন ধনী রায়। আব মণিমালা দাঁড়িয়েছিলেন মণিঘরের দুয়ারের কাছে।

ধনী রায় ডাকলেন--ভেতরে এস রাণী মণিমালা।

মণিমালা--না।

বিস্মিত হয়ে মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে আরও বিস্মিত হন ধনী রায়। আজও সেই মূল্যহীন মালতী কুঁড়ির মালা গলায় প'রে দাঁড়িয়ে আছে মণিমালা। সেই সুতোর তাগা আর সাদা শাঁখার মণিমালা।

—এ কি? তোমার স্বর্ণালঙ্কার কোথায়?

—সোনার সিন্দুকে।

—কেন?

কোন উত্তর দেন না মণিমালা।

রাজা ধনী রায় কঠোরস্বরে প্রশ্ন করেন--আমার সোনাকে এত অবজ্ঞা কেন মণিমালা?

মণিমালা বলেন—আমি তো কোনোদিন সোনা চাইনি।

--মনে মনেও কি চাওনি?

—না। মনে মনে যা চেয়েছিলাম, তা আজ পর্যন্ত পাইনি।

—কি চেয়েছিলে?

--চেয়েছিলাম, তুমি ভালোবাসবে আমার এই মালতী কুঁড়ির মালাকে। চেয়েছিলাম, আমার এই সুতোর তাগা আর সাদা শাঁখার দিকে তাকিয়েই খুশি হয়ে উঠবে তোমার মন।

—এ কথার অর্থ কি মণিমালা?

যেন এক ঝলক অভিমান আর লজ্জার রক্তাভ ছায়া ছড়িয়ে পড়ে মণিমালার মুখে। মণিমালা বলেন—চেয়েছিলাম বিনা সোনার এই মণিমালারই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকুক তোমার ভালোবাসার চোখ। চেয়েছিলাম, মণিমালার এই কাঁকনহীন হাত বুকের উপর টেনে নেবার জন্য লুব্ধ হয়ে উঠুক তোমার হাত। চেয়েছিলাম, মণিমালার মুখের হাসিকেই সোনা মনে ক'রে খুশি হবে মণিমালার স্বামী। কিন্তু তোমার মন এই রূপের মণিমালাকে চায়নি কোনদিন। চেয়েছে এক সোনার মণিমালাকে।

--হ্যাঁ, তাই তো চেয়েছি। তোমাকে সোনা দিয়ে সাজাতে চেয়েছি।

—না, তুমি সোনাকে মণিমালা দিয়ে সাজাতে চেয়েছো।

রাজা ধনী রায় ভ্রূকুটি ক'রে বলেন--তাই চেয়েছি। এর মধ্যে অন্যায় কি দেখলে মণিমালা?

চুপ ক'রে থাকেন মণিমালা। তারপর বলেন—একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

—বলো।

—এই ঘরের নাম মণিঘর রাখলে কেন?

—এই তো আমার সত্যিকারের মণিঘর। সোনার স্তূপ দিয়ে সাজানো ঘরের নাম তো মণিঘরই হবে।

মণিমালার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। বলেন—আমি ভুল বুঝেছিলাম রাজা।

--কি বুঝেছিলে?

মনে হয়েছিল, রাজা বোধ হয় তাঁর প্রিয়া ঘরনীর নামেই তাঁর প্রিয় ঘরের নামটি রেখেছেন।

চলে যাচ্ছিলেন মণিমালা। রাজা ধনী রায় ডাকেন—তুমি কি এই ঘরে প্রবেশ করবে না?

--না।

--তুমি কি আমার দেওয়া সোনার কাঁকন আর সাত-নরী হার পরবে না?

--না।

--তবে?

রাজা ধনী রায়ের উগ্রচক্ষুর দৃষ্টির সম্মুখেও বিচলিত হন না মণিমালা। শান্তভাবেই বলেন --এই মণিঘরে সোনার মণিমালাকেই সাজে, আমাকে সাজে না।

রাজা ধনী রায় ক্রুদ্ধস্বরে বলেন--তাই হবে। তুমি মাটির পুতুল হয়েই থাকো চিরদিন, এই ঘরে সোনার মণিমালার মূর্তিই হবে আমার জীবনের সঙ্গিনী।

তাই করলেন রাজা ধনী রায়। শিল্পীকে ডেকে এনে প্রচুর অর্থ দিলেন ধনী রায়। মণিমালারই এক সোনার মূর্তি নির্মাণ করলেন শিল্পী। সেই মূর্তিকে মণিঘরের ভিতরে গোপন এক সোনার সংসারে স্থাপিত করলেন ধনী রায়। ধন্য শিল্পীর হাতের দক্ষতা। দেখলে মূর্তি বলে মনে হয় না। মনে হয় মণিমালারই জীবন্ত শরীর হঠাৎ এক পরশ পাথরের ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে গিয়েছে। সেই গ্রীবাভঙ্গী, সেই অধররেখা, সেই চিবুক। মূর্তির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন রাজা ধনী রায়।

সোনার স্বপ্ন সফল আর সম্পূর্ণ হয়েছে এতদিনে। নৌকার সোনার পাটাতনের উপর একদিন বসে অস্তাচলের সূর্যের দিকেও তাকিয়েছেন রাজা ধনী রায় এবং তাকিয়ে থেকে আনন্দে হেসেও ফেলেছেন।

কিন্তু এই হাসির গর্ব এক নতুন আতঙ্কে শিউরে উঠলো একদিন। নবাবসদন থেকে আহ্বান এসেছে। এসেছেন নবাবের দূত। হঠাৎ রাজার ঐশ্বর্যের কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়েছেন নবাব। নবাবের দরবারে গিয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হবে ধনী রায়কে, কেমন ক'রে আর কোথা থেকে এত বৈভব কুড়িয়ে পেলেন রাজা ধনী রায়? হিসাবও দিতে হবে, কত সোনা আর রত্ন জমেছে তাঁর ভাণ্ডারে?

রাজা ধনী রায়ের আতঙ্কিত চোখের উপর মুহূর্তের মধ্যে যেন এক অসহায় সন্ন্যাসীর মুখের ছবি ভেসে ওঠে। কি বলছে ঐ নীরব চক্ষু? সন্ন্যাসীর ঐ দুই চক্ষু যেন তার নিজেরই মুখের আশীর্বাদ ছিন্নভিন্ন করবার জন্য শেষ দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে। ধনী হয়েছেন ধনী রায় ; সোনা জমেছে ধনী রায়ের ঘরে। কিন্তু তারপর?

কিন্তু উপায় নেই। ভীত ও সন্ত্রস্ত ধনী রায় রওনা হলেন নবাব দরবারের উদ্দেশে। যাবার সময় তাঁর মণিঘরে গিয়ে সোনার মণিমালার কাছেই একবার দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন না, দেখবার জন্য কোনও চেষ্টা করলেন না সেই মণিমালাকে, সাদা শাঁখা, সুতোর তাগা আর মালতী কুঁড়ির যে মণিমালা কক্ষের নিভৃতে তখন মঙ্গলঘটের কাছে মাথা নত ক'রে স্বামীর শুভযাত্রার কামনা নিবেদন করছে।

সফল হয়েছিল, শাদা-শাঁখার মণিমালারই কামনা। রুষ্ট নবাব তুষ্ট হলেন। প্রচুর স্বর্ণ-রত্ন উপঢৌকন দেবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে নবাবের অনুগ্রহ অর্জন করতে পারলেন হঠাৎ-রাজা ধনী রায়। হৃষ্ট মনে আবার ঘরে ফিরবার পথে এগিয়ে চললেন রাজা ধনী রায়।

রাজারই মত ভঙ্গীতে ঘোড়ার পিঠে বসে আর ভৃত্যের দল সঙ্গে নিয়ে ফিরে চলেছেন ধনী রায়। দশ দিনের পথ সমাপ্ত হয়েছে। আর বেশি দূর নয়। নিকট হয়ে এসেছে তাঁর গড়ভবন। দিগ্বলয়ে আঁকা ছবির মত দেখা যায় সেই সুদৃশ গড়ভবন, যার ভিতরে এক নিভৃতে মাটির গোপন গভীরে জ্বলজ্বল করছে তাঁর মণিঘরের সোনাব সংসার। বিশ্রাম লাভের জন্য সেই বিলের কিনারায় একস্থানে থামলেন রাজা ধনী রায়।

বিস্মিত হলেন রাজা ধনী রায়। এই তো সেই স্থান, যেখানে একদিন ডিঙি লাগিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসেছিলেন দরিদ্র ধনী রায়, আর, এক সন্ন্যাসী এসে আশীর্বাদ ক'রে তাঁর নৌকায়

উঠেছিলেন।

বিলের জলের দিকে নিঃশব্দে ও অপলক চোখে তাকিয়েছিলেন রাজা ধনী রায়। হ া২ চিৎকার ক'রে উঠলো ভৃত্যের দল। রাজা ধনী রায়ের সংকেত পারাবত খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে অবাধে আকাশে ডানা মেলে উড়ে চলে যাচ্ছে।

ভুল, ভয়ানক ভুল। এই পারাবত হলো বিপদ আর মৃত্যুর বার্তাজ্ঞাপক দূত। নিরাপদ ধনী রায়ের মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ হয়ে তাঁর গড়ভবনের দিকে উড়ে চলেছে পারাবত।

বিশ্রাম করা আর হলো না। দ্রুত অশ্বচালনা ক'রে ছুটে চলেন রাজা ধনী রায়। কিন্তু কেন? কিসের আশঙ্কায়? কার কথা মনে ক'রে?

মণিঘরের কথাই মনে ক'রে। তাঁর মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদে অভিভূত গড়ভবনের অদৃষ্টে কোন্ বিপদ দেখা দিতে পারে, কল্পনা করছিলেন রাজা ধনী রায়। সংকেত পারাবতকে দেখে তাঁর মৃত্যুর সংবাদকে সত্যই বিশ্বাস করবে সকলে ; দুঃসাহসী গোপন শত্রুর লোভে লুণ্ঠিত হবে গড়ভবন? মণিঘরের সন্ধান পেয়ে যাবে কোন চক্রান্তের সরীসৃপ?

বেশিক্ষণ সহ্য করতে হয়নি এই আতঙ্ক। গড়ভবনে পৌঁছেই দেখলেন ধনী রায়, ঠিকই আছে তাঁর গড়ভবন এবং ঠিকই আছে তাঁর মণিঘর। শুধু অদ্ভুত এক ক্রন্দনের রোল শোনা যায় গড়ভবনের দীর্ঘিকার তটে। কাঁদছিল দাসীর দল।

আর, পড়েছিল একটি মালতী কুঁড়ির মালা, দীর্ঘিকার কিনারায়। দাসীরা কপালে করাঘাত ক'রে জানিয়ে দেয় সংকেত পারাবত এসে ডাক দিতেই আর্তনাদ ক'রে উঠেছিলেন রাণী মণিমালা। তার পরেই ছুটে দীঘির জলে ঝাঁপ দিয়েছেন, আর ওঠেননি।

বুঝলেন রাজা ধনী রায়, বিদায় নিয়েছে সাদা শাঁখার মণিমালা। ধনী রায়ের সোনাকে অবজ্ঞা ক'রে দূরে সরেই গিয়েছিল যে মণিমালা, সেই মণিমালা সরে গেল চরম দূরে, আর চিরকালেরই মত। স্বামীর মৃত্যুসংবাদের সংকেত এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারেনি মণিমালা।

আক্ষেপ বেজে উঠেছিল ধনী রায়ের মনে। সংকেত পারাবতের ভুল আগমনের ভুলে প্রাণ হারালো এক সুন্দর মাটির পুতুল। যে নারী ঘৃণা করেছিল রাজা ধনী রায়ের সোনাকে, ভুল গরবের পুত্তলিকা সেই মণিমালা বিদায় নিয়েছে।

আছে শুধু সোনার মণিমালা, রাজা ধনী রায়ের মণিঘরে।

ধীরে ধীরে মণিঘরের অভ্যন্তরে এসে দাঁড়ালেন রাজা ধনী রায়। তাকিয়ে আছে সোনার মণিমালা। তাকিয়ে দেখতে থাকেন রাজা ধনী রায়।

সন্ধ্যা শেষ হয়। ঝড় জাগে আকাশে। বিলের জলে বিদ্যুতের ছায়া ছটফট করে, আর বজ্রনাদে চূর্ণ হয় রাত্রির মেঘ আর অন্ধকার। সোনার মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন রাজা ধনী রায়।

সেই গ্রীবাভঙ্গী, সেই অধররেখা, আর সেই চিবুক। ঝড়ের শব্দ শুনে কি ভয় পাচ্ছে না এই মণিমালা?—কাছে এসো! ঐ সোনার অধর কি কেঁপে কেঁপে এই ছোট্ট দুটি মায়াময় কথা বলতে পারে না, মালতী কুঁড়ির মণিমালা যেমন ঝড়ের রাতে ভয় পেয়ে এই কথা ব'লে কাছে ডাকতো তার স্বামীকে?

নীরব ও নিথর সোনার দুটি অধর। হাসি নেই, অভিমান নেই, আবেদন নেই—দুটি কঠিন অধর। ধনী রায়ের মণিঘরের সোনার সংসারে নিত্য সহচরী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোনায় গড়া মণিমালা।

হঠাৎ ভয় পান রাজা ধনী রায়। ভয়ানক এক পরশ পাথরের ছোঁয়ায় যেন কঠিন সোনার স্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছে তাঁর জীবনের সব স্পন্দন। শত আবেদনেও কথা বলবে না এই সোনা। একটুও চোখের জল ফেলবে না, ভালোবাসার শত আহ্বানেও কোন লজ্জারাগ ফুটে উঠবে না ঐ সোনার চিবুকে।

--কথা বল মণিমালা। প্রলাপী পাগলের মত চেঁচিয়ে ওঠেন রাজা ধনী রায়। কিন্তু মূক ও বধির সেই সোনার মণিমালার অধর কাঁপে না।

মণিঘর থেকে ছুটে বের হলেন রাজা ধনী রায়। দাঁড়ালেন এসে দীর্ঘিকার কিনারায়। কোথায় পড়ে আছে সাদা-শাঁখার সেই মণিমালার মালতী কুঁড়ির মালা? এই মালা যদি তুলে নিয়ে গিয়ে ঐ মূর্তির গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়, তবুও কি কথা বলে উঠবে না সোনার মণিমালা?

পাগল হয়ে গিয়েছিলেন রাজা ধনী রায়। লোকে বলে, সন্ন্যাসীর প্রাণঘাতক, পরশ পাথরের অপহারক আর মণিমালার মৃত্যুর কারণ সেই ধনী রায় পাগলই হয়ে গিয়েছিলেন। মালতী কুঁড়ির মালা হাতে তুলে নিয়ে ধনী রায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণ। তার পরেই ঝাঁপ দিয়েছিলেন দীর্ঘিকার জলে।

আর ওঠেননি রাজা ধনী রায়। পরশ পাথর পিছনে ফেলে রেখে, আর ভাষাহীন সোনার স্তূপ সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এক মালতী কুঁড়ির মালা আঁকড়ে ধরে চিরবিদায় নিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছিলেন রাজা ধনী রায়। হঠাৎ-রাজার সেই গড়ভবনের ধ্বংসাবশেষ কিন্তু আজও নিশ্চিহ্ন হয়নি।

অনেক দূরে কপোতাক্ষী, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা থেকে মাত্র ছয় ক্রোশ দূরে যে গ্রামটির নাম নওপাড়া-মণিঘর, সেই গ্রামের মানুষ আজও বিস্মিত হয় এবং একটু ভয়ের চক্ষেই তাকিয়ে থাকে সেই ধ্বংসাবশিষ্ট গড়ের দিকে। শুধু বিবরবিলাসী সরীসৃপেরাই জানে, কোথায় কত গভীরে প্রোথিত রয়েছে সেই মণিঘর। সোনার মণিমালাও নিশ্চয় মাটি হয়ে গিয়েছে এত দিনে। কিন্তু সাদা-শাঁখার সেই মণিমালার নামটিই বোধ হয় জেগে রয়েছে এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। ভাঙা ময়লা ইট-ছড়ানো নিতান্তই এক ধ্বংসাবশেষ, তবু তারই নাম দানা-মণিঘর।

প্রবন্ধ

বিনে স্বদেশী ভাষা

বিনে স্বদেশী ভাষা আশা পুরে না, কবি রামনিধি গুপ্তের এই অভিমত-এর সত্যতা সম্বন্ধে কারও মনে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। স্বাভাবিক সহজ ও সরল একটি সত্যের ঘোষণা রয়েছে কবি রামনিধি গুপ্তের সরল উক্তির মধ্যে। কিন্তু স্বদেশী ভাষাকেই শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে মনে করতে হবে এমন কোন কথা কি বলেছিলেন স্বভাষাপ্রেমিক কবি রামনিধি গুপ্ত? অন্য কোন ভাষাকে ক্ষুদ্র ও হীন মনে করবারও কি কোন প্রয়োজন আছে? অন্য কোন ভাষা শিখলে মাতৃভাষায় ভাষণের অথবা ভাব প্রকাশের যোগ্যতা কমে যায়, এমন আশঙ্কারও কি ভিত্তি আছে?

এসব প্রশ্ন নতুন প্রশ্ন নয়, আর এসব প্রশ্নের উত্তরও অনেকের জানা আছে। আমার স্বদেশী ভাষা আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ এইমাত্র, পৃথিবীর সকলের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নয়। পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে শক্তির ও ঐশ্বর্যের তারতম্য আছে, কিন্তু কোন ভাষাই হীন নয়। যেমন, পৃথিবীর সব ফুলে বর্ণ বৈচিত্র্যে ও সৌরভমাধুর্যে সমান না হলেও কেউ হীন নয়। সাংস্কৃতিক যে কোন সৃষ্টির মধ্যে প্রকারভেদ থাকতে পারে এবং শক্তিতে ও চমৎকারিতায় দীন হলেও কোন দেশের বা জাতির কোন সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকে হীন বলা যায় না। ভাষাও মানবজীবনের এক সাংস্কৃতিক সৃষ্টি। মনের ভাবনাকে ধ্বনিগত রূপদান করেই প্রথম শিল্পী হয়েছে মানুষ। বলতে গেলে ভাষাই মানুষের প্রতিভাজাত প্রথম আর্ট। ভয় বিস্ময় হর্ষ ও বেদনাকে ধ্বনির দ্বারা সঙ্কেতিত করে নিজেকে প্রকাশ করার যে আর্ট সৃষ্টি করেছে মানুষ, সেই আর্টই হলো ভাষা।

আর একটি ঐতিহাসিক সত্য এই যে, পৃথিবীর ভাষাগুলি পরস্পরের হত্যার প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠেনি। পরস্পরের সংস্রব লাভ করে, সমন্বয় ও আহরণের যুগব্যাপী প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই গড়ে উঠেছে। এমন ঘটনাও দেখা গিয়েছে যে, বিশেষ একটি ভাষিক জাতি পৃথিবীর থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার ভাষার রেশ বেঁচে রয়েছে অন্য এক জাতির ভাষার মধ্যে।

ভাষা নামে মানুষের সাংস্কৃতিক সৃষ্টি মানুষের দ্বন্দ্বের ও সংঘর্ষের বিষয় হতে পারে না। কারণ কোন ভাষাকে অন্য কোন ভাষার পক্ষে ভয় করার কিছুই নেই। যে জাতি যত বেশি অন্য ভাষার সংস্রবে এসেছে, সেই জাতিই নিজের জাতীয় ভাষাকে তত বেশি সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। আধুনিক কালের ইংরাজী ভাষার মতো একটি ভাষার সমৃদ্ধ অবস্থা ও কোন আদিম জাতীয়ের ভাষার দীন অবস্থা তুলনা করলেই বোঝা যায়, ভাষার সমৃদ্ধি কোন্ নিয়মে চালিত হয়। ইংরাজেরা বহু ভিন্ন জাতির জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, এটা তাদের চিন্তা ও কল্পনাকে শক্তি দান করেছে ঠিকই, কিন্তু অন্য জাতির ভাষার সংস্রবও তারা সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। ফলে কতগুলি নতুন শব্দের সম্ভার শুধু নয়, অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করারও নতুন শক্তি ইংরাজী ভাষায় সঞ্চারিত হয়েছে। অথচ দেখা যায় যে, ছয় শত বৎসর আগেও পৃথিবীর যে ভাষা ইংরাজের ভাষার তুলনায় অনেক উন্নত ও শক্তিশালী ছিল, সেই ভাষা শুধু পরভাষার সংস্রব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার ফলেই দীনতর হয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে ভাষা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথম হলো, সারা ভারতের জন্য একটি রাষ্ট্রভাষা গঠন-এর প্রশ্ন। দ্বিতীয়, শিক্ষার মাধ্যম হবে কোন ভাষা, তৃতীয়, আঞ্চলিক ভাষা অনুসারে এক-একটি রাজ্য গঠনের প্রশ্ন।

রাষ্ট্রভাষা কি হবে, সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দী। কিন্তু বর্তমানে হিন্দী নামে যে ভাষা প্রচলিত রয়েছে, ঠিক সেই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্য বলে মনে করা হয়নি। সংবিধানেই (৩৫১ ধারা) স্বীকৃত হয়েছে যে, নতুন পরিভাষা সৃষ্টি

করে, অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা হতে সমুচিত ও প্রয়োজনীয় শব্দ আহরণ করে এব ব্যাকরণের সংস্কার করে বর্তমান হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হবার উপযোগিতা দান করতে হবে তাহলে মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, যথার্থ রাষ্ট্রভাষার অস্তিত্ব নেই, রাষ্ট্রভাষা তৈরি করবা প্রচেষ্টা শুধু রয়েছে, এইমাত্র। সিদ্ধান্ত শুধু এই হয়েছে যে, বর্তমানের হিন্দী ভাষাে রাষ্ট্রভাষার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হলো।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, অনেকের মুখে এই দাবি শোনা যায় যে, সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভা করা হোক। এই দাবির পিছনে যুক্তি নেই, আছে শুধু মনোবৃত্তি। কি উদ্দেশ্যে এবং কো প্রয়োজনে একটি রাষ্ট্রভাষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, সেটা বিস্মৃত না হলে সংস্কৃ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার মতো উদ্ভট দাবি কেউ করতে পারে না। স্টক এক্সচেঞ্জের ভিড়ে মধ্যে দাঁড়িয়ে মারোয়াড়ী ভাটিয়া বাঙালী মাদ্রাজী পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীরা সংস্কৃত ভাষা হাঁকডাক করে আধুনিক বাণিজ্য রহস্যের উত্তেজনা সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করছেন, আ সংস্কৃত ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে ভাব ও তথ্য বিনিময় করছেন, এটা কি কল্পনা করা যায় ভারতের সীমান্তরক্ষী সৈন্য যখন হাউ-হটজার মর্টার ও ব্রেনগান নিয়ে শত্রুকে চার্জ করবে তখন রণক্ষেত্রের প্রতিটি সামরিক অ্যাকশন পরিচালনার অর্ডার ও সংকেত কি সংস্কৃত ভাষা অভিব্যক্ত হতে পারে? রাষ্ট্রের ও সমাজের কর্মক্ষেত্র ও কর্তব্যক্ষেত্রকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধরূপে কল্পনা করা হয় বলেই সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা ওঠে। মহারাজা শিবাজী হি ছিলেন এবং সংস্কৃতভক্ত হিন্দুই ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কার্যে সংস্কৃত ভাষার উপযোগিত তিনিও উপলব্ধি করতে পারেননি। রাষ্ট্রীয় কার্যে তিনি এবং পরবর্তী মারাঠা রাজশক্তিগুলি মারাঠী ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন, সে ভাষায় ফার্সি শব্দের অবাধ স্থান ছিল।

রাষ্ট্রভাষা হবার যোগ্যতা এবং শিক্ষার মাধ্যম হবার যোগ্যতাও সংস্কৃত ভাষার নেই যদিও সংস্কৃত ভাষা শব্দগৌরবে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান ভাষা। আধুনিক বিজ্ঞান টেকনোলজি সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সংস্কৃত ভাষার কথা থাক। প্রশ্ন হলে হিন্দী ভাষার ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রভাষা গড়ে তোলবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এবং চেষ্টা ক হচ্ছে, সেই রাষ্ট্রভাষায় কি আধুনিক বিজ্ঞান এবং টেকনোলজির পরিচয় ও ব্যাখ্যা প্রকা সম্ভব হতে পারে?

হতে পারে বৈকি। পৃথিবীতে এরকম প্রচেষ্টা আরও সফল হয়েছে। শুধু রাষ্ট্রভাষায় কে ভারতের চোদ্দটি প্রধান আঞ্চলিক ভাষার যে কোন ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনোলজি তত্ত্ব প্রকাশ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তার জন্য বিপুল প্রয়াস প্রয়োজন। ভাষার স্বাভাবি গঠনধর্ম ও প্রকাশ-পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য রেখে শুধু উদারভাবে পারিভাষিক শব্দ চয়ন আহর ও উদ্ভাবন করে নিলে বাংলা, মারাঠী ও তামিলের মতো ভারতের এক-একটি প্রধা আঞ্চলিক ভাষাকেও ইংরাজীরই অনুরূপ প্রকাশকুশল করে তুলতে পারা যায়। কিন্তু এদি দিয়ে এযাবৎ যে প্রচেষ্টা হয়েছে, তার ফল দেখে অনেক সময় ভয় পেতে হয়। প্রশাসনিক রাজনৈতিক পরিভাষা রচনায় সংস্কৃত ভাষা হতে শব্দ এর মূল আহরণ করার তবু বি যৌক্তিকতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও টেকনোলজির উপযোগী পরিভাষাকে সংস্কৃতে মণ্ডিত ক এক ভয়াবহ ব্যাপার। মিশরে এইভাবে মূল আরবী শব্দের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচ করার প্রয়াস পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়েছে। বিশ বৎসর ধরে ঐ পরিভাষা প্রচলনের জন্য সরকা প্রচেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও ঐ পরিভাষা প্রচলিত হতে পারেনি।

সংবিধানেরই নির্দেশ আছে যে, বেশির ভাগ সংস্কৃত শব্দের ভিতর থেকেই পরিভাষ মূল আহরণ করতে হবে। উত্তর প্রদেশ সরকারের উদ্যোগে এবং রাহুলজী ও ডাঃ রঘুবীরে মতো উৎসাহী ও যোগ্য লোকের প্রচেষ্টাতেও সংস্কৃত থেকে মূল আহরণ করে যে-স পারিভাষিক শব্দ রচিত হচ্ছে, সেগুলির সার্থকতা এখনো অপরীক্ষিত অবস্থাতে আে

শব্দগুলির ভাষার গদ্যরীতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে দেহীভূত হতে পারবে কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর উদ্যোগে রচিত পরিভাষাগুলি সম্বন্ধেও একথা খাটে। শব্দগুলির অভিনবত্ব আদৌ কোন বাধা বা সমস্যা নয়, আজ যা অভিনব, কালক্রমে এবং ব্যবহারক্রমে সেটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়। পারিভাষিক শব্দগুলির বিভিন্ন শব্দরূপ প্রয়োগ করতে গেলেই অসুবিধায় পড়তে হয়। এক কথায় বলা যায়, পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে বিশেষ একটি জড়তা আছে, যার জন্য বাক্যের মধ্যে শব্দগুলি সহজে খেলতে চায় না। এমন কোন পারিভাষিক শব্দ রচিত হওয়া উচিত নয়, যাকে বিশেষ্য থেকে সহজে বিশেষণ করা যায় না। প্রয়োজনমতো বিভক্তি যোগ করা, বহুবচনে প্রয়োগ করা এবং কালবাচক ক্রিয়া পদ দান করা যদি অসম্ভব হয়, তবে সেই সব পারিভাষিক শব্দ বক্তব্য প্রকাশে সার্থক হবে কি করে?

ভারতের জনজীবনে ইংরাজী ভাষার কি স্থান থাকবে? ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে নিছক বিদ্বেষজাত আপত্তি তুলবার কোন যুক্তি নেই, যেমন তুলে থাকেন শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, শেঠ গোবিন্দদাস প্রমুখ। কিন্তু ইংরাজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আবার এক শ্রেণীর অভিমত অধুনা যেরকম মাত্রাধিকভাবে শ্রদ্ধামুখর হয়ে উঠেছে, সেটাও ভালো লক্ষণ নয়। ইংরাজী ভাষার সাহায্য এক কথা এবং ইংরাজী ভাষার আধিপত্য আর এক কথা। শিক্ষার ক্ষেত্রে, সমাজজীবনে এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রিক আদানপ্রদানে ইংরাজী ভাষাকে চিরকালীন সম্রাটরূপে যাঁরা স্থাপিত রাখতে চান তাঁরাও ট্যাণ্ডনজী ও শেঠজীরই অনুরূপ গোঁড়ামীর আর এক দিক পালন করছেন। একটা যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে, ইংরাজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলেই ভারতীয় সাহিত্যে নব অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছে। ঠিক কথা, ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় রক্ষা করা জাতীয় সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু শুধু পরিচয় রক্ষাই প্রয়োজন, আধিপত্য স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের উপর ইংরাজীর আধিপত্য ছিল না, তাই মাতৃভাষাকে নবসমৃদ্ধি ও শক্তিতে তিনি উন্নত করার উপযোগী প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন, ইংরাজীর আধিপত্য স্বীকার না করেও ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায়। আধিপত্য থাকবে শুধু মাতৃভাষার। ইংরাজী ভাষার আধিপত্য রক্ষার ক্ষেত্রে প্রবর্তিত থাকায় জাতির ভাষায় চিন্তা ও প্রতিভার উপর কি ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে অভিযোগ ও আক্ষেপ আর কেউ করেননি, যদিও তার মতো ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতে খুবই কম ছিল ও আছে। ভারতীয় সাহিত্যে নবোন্মেষ ইংরাজী ভাষার ও সাহিত্যের আধিপত্য-এর ফলে সাধিত হয়নি, ঐ আধিপত্যের কুপ্রভাব ও ক্ষতি সত্ত্বেও ভারতীয় সাহিত্যিকের জাতীয় ভাষা প্রীতির জন্য ভারতের জাতীয় সাহিত্যের উন্নয়ন হয়েছে। কল্যাণী কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত নেহরুর ভাষণে আধুনিক ভারতীয়ের প্রতিভাজাত সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে একটি অর্থপূর্ণ মন্তব্য ছিল। আধুনিক ভারতীয়ের রচিত সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে মহনীয়, বরণীয় কীর্তিকর ও অভিনব অনেক কিছু সৃষ্টির নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে এমন একটি অস্বাভাবিকতার স্পর্শ আছে যার জন্য আধুনিকের রচিত এই সাহিত্য ও শিল্পকলা ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে দূরের জিনিস বলেই অনুভূত হয়। এই ক্ষতিটি হয়েছে ইংরাজী ভাষার আধিপত্যের ফলে, ইংরাজী ভাষার অনুকরণের ফলে এবং ইংরাজী রচনার প্রতি মাত্রাধিক ভক্তিভাবের ফলে। অতীতে ভারতের কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীর সঙ্গে জনমনের বিচ্ছেদ এতটা ব্যাপক হয়নি, কারণ তাঁরা পরভাষার আধিপত্যের ভিতর দিয়ে শিক্ষিত হয়নি।

দেশের মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়-এর উচ্চশিক্ষা চিরকাল ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে লাভ করবে, এই কল্পনা অথবা পরিকল্পনা বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দানেরই পরিকল্পনা। আন্তর্জাতিক ভাবজীবনের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্য ইংরাজী ভাষা শিক্ষার

প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষালয়ে থাকাই উচিত। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলায় মহারাষ্ট্রে মারাঠী ভাষা ও মাদ্রাজে তামিল ভাষা। তা না হলে স্বদেশী ভাষা কখনোই স্বদেশীয় ভাবজীবনের আশা মিটাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

প্রশ্ন উঠবে, রাষ্ট্রভাষাকেই ভারতের সকল অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করা যায় কি না? প্রথম উত্তর হলো--করার কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়—রাষ্ট্রভাষাকেও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করলে আঞ্চলিক মাতৃভাষার হানি কিছু না কিছু হবেই ; যদিও ভারতের রাষ্ট্রভাষা ইংরাজীর মতো বৈদেশিক ভাষা নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজনীতির ও প্রশাসনিক বিষয়ের পরিভাষাগুলি এক হলেই যথেষ্ট। রাষ্ট্রভাষা একটি বিষয়রূপে উচ্চশিক্ষালয়ে পঠিত হলে যে-কোন অঞ্চলের শিক্ষার্থী সহজেই রাষ্ট্রভাষার যে কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় লিখতে ও বলতে পারবে, যদি পরিভাষাগুলি এক থাকে।

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি দুঃখের বিষয় এই যে, ভাষার উন্নয়নের জন্য গঠন ও উদ্ভাবনের প্রধান কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে তেমন কোন উৎসাহ দেখা যায় না। উৎসাহ দেখা গিয়েছে অন্য কোন অঞ্চলের ভাষার বা অন্যের ভাষার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশে। উর্দু ভারতেরই একটি স্বদেশী ভাষা এবং উর্দু সাহিত্য ভারতেরই সাংস্কৃতিক সম্পদ। অথচ হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন ও উত্তর প্রদেশের এক শ্রেণীর কংগ্রেসী উর্দুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত শোচনীয় রকমের যুক্তিহীন বিরুদ্ধতার আন্দোলন করে চলেছেন। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন মনে করেন, হিন্দীভাষা থেকে আরবী ফারসী শব্দ বহিষ্কার করে দিলে আর প্রচুর সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করলে হিন্দীভাষা শুদ্ধ হবে। শুদ্ধতা সম্বন্ধে এহেন মতাবলম্বীদের হয়তো একটা আদর্শ আছে এবং সে আদর্শ ধর্মীয় গোঁড়ামির মতোই ব্যাপার। আরবী ফারসী শব্দ বাদ দিয়ে আর সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্যে যে শুদ্ধ হিন্দীভাষা রূপ গ্রহণ করবে, সে হিন্দীভাষা হবে প্রাণহীন এবং সুন্দর তো নয়ই। যে সংস্কৃত শব্দ দিয়ে ভাষা ভরে ফেলবার জন্য হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন এত উৎসাহী, সেই হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনকেই প্রশ্ন করতে পারি, আজ পর্যন্ত মাইকেলের সংস্কৃতবহুল বাংলায় লিখিত মেঘনাদ বধ কাব্যকে হিন্দীতে সুষ্ঠুভাবে অনুবাদ করা সম্ভব হলো না কেন? আসল সত্য এই যে সংস্কৃত শব্দগুলিকে আত্মস্থ করার স্বাভাবিক শক্তি হিন্দীভাষার ততটা নয়, যতটা বাংলা ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষার আছে। হিন্দীতে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য ঘটলেই সেই হিন্দী নিতান্তই অস্বাভাবিক ও প্রাণহীন বলে মনে হয়। ট্যাণ্ডনজী মনে করলে ভালো করবেন যে, আজ অবধি সবাক ছায়াচিত্রগুলির কাহিনীতে ট্যাণ্ডনজীর সংস্কৃত শব্দবহুল সংলাপ ব্যবহার করা হয়, তবে তার উত্তর প্রদেশের জনসাধারণই সেই সংলাপ শুনে হেসে ফেলবে এবং সেই ছবি আর চলবে না।

বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা? কবি রামনিধি গুপ্তের এই প্রশ্নেরই আর এক রূপ হলো, বিনে কথিত ভাষা পুরে কি আশা? কবীর বলেছেন, “সংস্কৃত কূপোদক, ভাষা বহতা নীর” কূপোদক শব্দটি নিন্দার্থে ব্যবহার করেননি কবীর। সংস্কৃতে ভাষার বৈশিষ্ট্যই ঐ কথাতে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষের মুখে মুখে প্রতিদিন উচ্চারিত হয়ে মানুষের জীবনের আশা ব্যাকুলতা হর্ষ ও বিস্ময় প্রকাশিত করছে যে কথিত ভাষা, সেই ভাষা বহতা নীর বটেই তো। গতিধর্মে প্রাণবান এই ভাষা। একদিন বাংলাদেশেও পণ্ডিতের গোঁড়ামি বাংলাভাষাকেই অভিশাপ দিয়েছিল—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য
চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবা শ্রুত্বা রৌরবং
নরকং ব্রজেৎ

অষ্টাদশ পুরাণ ও রামচরিত বাংলাভাষায় শুনলে রৌরব নরকে যেতে হবে, এই অভিশাপ যে মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভুত, প্রায় সেই রকমই মনোবৃত্তি কথিত ভাষাকে অসাধু ভাষা বলে ধিক্কার দেয়, আর জনজীবনে প্রতিদিনের ব্যবহারে জীবন্ত শব্দগুলিকেও পরিহার করতে চায়। কিন্তু এই মনোবৃত্তি ইতিহাসের হাতেই পরাভূত হয়েছে। কথিত ভাষাই হলো প্রকৃত স্বদেশী ভাষা।

তথাকথিত বিশুদ্ধ হিন্দী নয়, গান্ধীজী যাকে হিন্দুস্থানী বলেছেন, সেই ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান গ্রহণ করতে পারে। যে-কোন আরবী ও ফারসী শব্দ ভারতীয় জনসাধারণের মুখের ভাষায় স্থান লাভ করেছে, সেই সব শব্দকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা ভাষার দিক দিয়ে আত্মঘাতী হবারই চেষ্টা।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েই ভারতের এক অখণ্ড ও সুসমন্বিত 'কম্পোজিট' কালচারের কথা সংবিধানেও উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং যে রাষ্ট্রভাষা তৈরি করা হচ্ছে, সেই ভাষাকে ভারতের এই 'কম্পোজিট' কালচারের ধারক ও বাহক হবার উপযোগী হতে হবে। আন্তর্জার্তিক ভাবে স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, সুপ্রচলিত ও সাংস্কৃতিক ভাবজ্ঞাপক আরবী ফারসী শব্দ এবং বিভিন্ন প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষা থেকে আহৃত উপযোগী অর্থনৈতিক শব্দ রাষ্ট্রভাষাতে স্থান লাভ না করলে সে রাষ্ট্রভাষা ঠিক ভারতের "কম্পোজিট" কালচারের বাহক হবার যোগ্যতা লাভ করতে পারবে না।

যে কোন ভারতীয় ভাষায় এবং রাষ্ট্রভাষাতেও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব কখনো অস্বীকাব করা যাবে না। সংস্কৃত ভাষা থেকে অজস্র শব্দ ও শব্দমূল আহরণের প্রয়োজনই আছে। কিন্তু এর জন্য প্রচলিত দেশজ ও বৈদেশিক শব্দগুলিকে বিতাড়ন করার কোন প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রভাষা সৃষ্টি করার অর্থ বিশেষ একটি ভাষাকে শুধু রূপসজ্জা দান করা নহে, আসল কর্তব্য হলো প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। ভারতের রাষ্ট্রভষাকে প্রাণবান ভাষা হতে হলে তথাকথিত শুদ্ধ হিন্দীর আধিপত্য অস্বীকার করতে হবে।

পরিভাষা রচনার কমিটিগুলির পক্ষে একটি সত্য স্মরণ রাখা কর্তব্য। সংস্কৃত শব্দ থেকে মূল আহরণ করে তাঁরা যে সব পারিভাষিক শব্দ তৈরি করেছেন, সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহারের জন্য নয়। রাষ্ট্রভাষার এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এই সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হবে, লক্ষ লক্ষ লোকের মুখের কথায় আর লেখায় ব্যবহৃত হবে। সুতরাং পারিভাষিক শব্দগুলির গঠনভঙ্গির মধ্যে সেই সাবলীলতা থাকা চাই, যার জন্য ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও রাষ্ট্রভাষার বাক্যভঙ্গির সঙ্গে পারিভাষিক শব্দগুলি সহজে মিশে যেতে পারে। এক্ষেত্রে শুধু অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিভাষা রচনা করা, অর্থাৎ শুদ্ধার্থক শব্দ তৈরি করাই একমাত্র নীতি হতে পারে না। নানারূপে ব্যবহারযোগ্য হবার উপযোগী গঠনভঙ্গি পরিভাষার থাকা চাই।

অনেকের মনে এই প্রশ্ন দেখা যায়, রাষ্ট্রভাষা কি শুধু ভারতের রাজকার্যের ভাষা হয়েই থাকবে? ঐ ভাষা কি কখনো সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী ভাষা হয়ে উঠতে পারবে? এই প্রশ্ন, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রশ্ন। সুতরাং বলা যায় যে, এমন সম্ভাবনা অস্বীকার করারই বা কি যুক্তি আছে। উর্দুও একদিন রাজকার্যের প্রয়োজনে ভাষারূপে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই উর্দুভাষা সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টিতেও সার্থকতা লাভ করেছে।

পূর্ববঙ্গে কিছুদিন থেকে বাংলাভাষার মর্যাদা দাবি করে আন্দোলন হয়ে আসছে। শুনেছি পূর্ববঙ্গে রাজভাষা হিসাবে বাংলাকে অর্থাৎ রাজ্যের রাজকার্যে বাংলাকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়নি, এই জন্য জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। রাজ্যভাষা হিসাবে যদি বাংলাকে যথোচিত মর্যাদা না দেওয়া হয়ে থাকে, তবে অবশ্য জনসাধারণের ক্ষুব্ধ হবারই কথা। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বাংলাভাষার প্রতি জনসাধারণের পক্ষে নিষ্ঠা ও প্রীতির ভাব রক্ষা করতে হলে উর্দুর প্রতি বিদ্বেষভাব অবলম্বনের কোনই দরকার হয় না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুকে

শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ আর শিক্ষা করলে পূর্ববঙ্গীয়ের বাংলাভাষার হানি হবে, এমন আশঙ্কা অমূলক। কারণ দ্বিতীয় কোন ভাষা শিক্ষা করলে মাতৃভাষার উন্নতিই হয়ে থাকে, হানি কখনো হয় না। তবে এক্ষেত্রেও সেই সঙ্গেও সরল ঐতিহাসিক সত্যটি স্বীকৃত হওয়া উচিত মাতৃভাষার উপর অথবা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে অন্য কোন ভাষার আধিপত্য থাকলে সাংস্কৃতিক ক্ষতিই সাধন করে থাকে। আধিপত্য নয়, থাকবে সাহচর্য।

বর্ধমানে প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলনে শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও আসামের জন্য বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। রাষ্ট্রভাষা বলতে শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া কি বোঝেন জানি না। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী হিন্দুস্থানী ভাষাকে আর ভারতীয় সংবিধান নতুন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন। এই ধরনের প্রস্তাব ভারতের একরাষ্ট্রিক সংহতিকে ভিত্তিহীন করারই প্রস্তাব। ন্যাশানাল ল্যাঙ্গুয়েজ দুটি বা তিনটি হতে পারে না, কারণ ভারতকে দুই তিন বা চার জাতির দেশ হিসাবে গড়ে তুলবার সঙ্কল্প সংবিধানে ঘোষিত হয়নি। শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়ার প্রস্তাব অনুসারে বাংলাভাষা যদি পূর্বভারতে রাষ্ট্রভাষা হয় তবে পূর্বভারতের সঙ্গে পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রিক আদান-প্রদান হবে কোন ভাষাতে? ইংরাজী ভাষাতে? এই প্রস্তাব রাষ্ট্রীয়তা ও জাতীয়তা সম্বন্ধে খণ্ডিত দৃষ্টির পরিচায়ক।

স্বদেশী ভাষা হলো জীবনের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা। কিন্তু স্বদেশী ভাষার উন্নতির জন্য পরদেশী ভাষার উন্নতি বিরূপ মনোভাবের উপর নির্ভর করে না। বরং পরদেশী ভাষার উপর শ্রদ্ধার উপরেই স্বদেশী ভাষার উন্নতি সাধনের শক্তি ও যোগ্যতা নির্ভর করে। ধর্ম নিয়ে যে সব জাতি গোঁড়ামি করেছে, তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক হানি ঘটিয়েছে। তেমনি ভাষার স্বদেশীয়ানার বা প্রাদেশিকতার গর্ব ও গোঁড়ামি করতে গেলেও সাংস্কৃতিক হানিতে ভুগতে হবে। বর্তমানে দেশের কোন ঘটনায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, ভাষাবিদ্বেষকে অনেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছেন এবং এক অঞ্চলের জনসাধারণের মনে অন্য অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধে ভয় ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করছেন। এই মনোভব জাতির বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আত্মবিকাশের একটি প্রধান বিঘ্ন হয়ে উঠছে।

আদিবাসী সাংস্কৃতিক সমস্যা

ভারতের আদিবাসী সমাজের ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন আদিবাসীদের ভাষার স্থায়িত্ব, উন্নতি ও উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে তার সমাধানের উপায় বা কি?

আদিবাসীদের ভাষা সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করা যায়—এদের ভাষা হলো শুধু কথিত ভাষা লিখিত ভাষা নয়, অর্থাৎ ভাষাকে লিপিবদ্ধ করে রূপ দেবার মতো কোন অক্ষর আবিষ্কৃত হয়নি। উপজাতীয় ভাষা আছে, কিন্তু উপজাতীয় অক্ষর বা লিপি নেই।

খৃস্টান মিশনারিরা প্রথম উপজাতীয় আদিবাসীদের ভাষাকে লিখিতভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তাঁরা রোম্যান অক্ষরকেই গ্রহণ করেছেন। কোন কোন উপজাতীয় ভাষার একটা ব্যাকরণ রচনার প্রয়াসও মিশনারি সম্প্রদায় করেছেন। বাইবেল প্রচার করার জন্যই প্রধানত মিশনারি সম্প্রদায় উপজাতীয় ভাষার জন্য এই উৎকর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু ১৮৬৬ সালেই স্যার রিচার্ড টেম্পল এই অভিমত প্রকাশ করে গেছেন যে, আদিবাসীদের ভাষার জন্য দেবনাগরী অক্ষরই প্রকাশভঙ্গির শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তিনি বলেছেন, রোম্যান অক্ষরে গন্দি ও অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হলেও দেবনাগরী অক্ষর এ বিষয়ে বেশি উপযুক্ত।১

আর একটা কথা। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে আদিবাসীরা প্রধানত দ্বি-ভাষী (Bilingual)। একটি তাদের নিজস্ব উপজাতীয় ভাষা, পারিবারিক জীবনে উপজাতীয় ভাষা তারা ব্যবহার করে। কিন্তু বর্তমান বৈষয়িক জীবনে বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হওয়ায় আদিবাসীরা আর একটা সমতল প্রদেশের ভাষায় (হিন্দী, তেলেগু, বাঙলা ইত্যাদি) সমান দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে শিখেছে। এই অবস্থায় আদিবাসীরা যদি লেখাপড়ার ব্যাপারে রোম্যান অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত থাকে, তবে হিন্দী, তেলেগু এবং বাঙলা ইত্যাদি উন্নত সাহিত্য তাদের কাছে পর হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ যদি নিজস্ব উপজাতীয় ভাষার জন্যই দেবনাগরী বা আঞ্চলিক উন্নত ভাষার (বাঙলা, তেলেগু ইত্যাদি) অক্ষর তারা গ্রহণ করে, তবে একই সঙ্গে দু'টি উপকার তাদের কাছে সুলভ হয়ে উঠতে পারে। নিজস্ব উপজাতীয় ভাষাকে লিপিবদ্ধ করতে পারবে এবং আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেও প্রবেশ সহজ হবে। আদিবাসীদের মতো সঙ্গতিহীন সমাজের পক্ষে এক সঙ্গে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অক্ষরপ্রণালী শেখবার চেষ্টা বস্তুত আদিবাসীকে বিড়ম্বিত করা। সাধারণ ভারতবাসীর ছেলে তার মাতৃভাষায় একটিমাত্র অক্ষরপ্রণালীর সাহায্যে বিদ্যারম্ভ করে। কিন্তু আদিবাসী ছেলেকে দুই ধরনের অক্ষরপ্রণালীর দ্বারা অত্যাচার করা কি উচিত?

খৃস্টান মিশনারিরা বলবেন, একটিমাত্র অক্ষরপ্রণালীই হোক্, কিন্তু সেটা হবে রোম্যান অক্ষর। কিন্তু এর ফলে আদিবাসী মানুষ তার হিন্দী, বাঙলা, তেলেগু প্রভৃতি একটি আঞ্চলিক ভাষার দক্ষতা সত্ত্বেও সেই ভাষার সাহিত্য হতে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ একটা উন্নত ভাষা আয়ত্ত করেও সেই ভাষার সাংস্কৃতিক শক্তি তার কাছে অনায়ত্ত হয়ে থাকবে, পড়তে না পারার জন্য। অথচ এই আঞ্চলিক ভাষা তার জীবনের প্রতি পদে প্রয়োজন। হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাজারে, আদালতে, সভামঞ্চে, আইন পরিষদে—সর্বত্র আদিবাসীকে তার বক্তব্য ও ভাব প্রকাশের জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে হয়। এই আঞ্চলিক ভাষাকে মুখে মুখে ও মনে মনে শিখেও, শুধু অক্ষর পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়ে কেন সে তার শিক্ষাকে অপূর্ণ করে রাখবে?

চিরকাল ইংরেজ শাসন, ফরাসী শাসন বা জার্মান শাসন যদি ভারতবর্ষে থাকে, তবে ইংরেজী, ফরাসী বা জার্মান ভাষা অবশ্য সরকারী ব্যাপারে প্রধান ভাষা হয়ে থাকবে এবং সেক্ষেত্রে রোম্যান অক্ষরে পরিচিত হবার একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু সেরকম বৈদেশিক শাসন তো কোন দেশের পক্ষে সনাতন রীতি নয় এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য ঘুচে যাবে তা ছাড়া ইংরেজী ভাষা শিখে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবার সম্ভাবনা ক'জন আদিবাসীর ছিল? খুব অল্পসংখ্যক? সুতরাং অল্পসংখ্যক ভাবী সরকারী কর্মচারীর জন্য সমগ্র জনশিক্ষার বিষয় ইংরেজী অক্ষরে (অর্থাৎ রোম্যান অক্ষরে) পরিচালনা করার কোন অর্থ হতে পারে না। আদিবাসীর জনসাধারণের পক্ষে হাটে বাজারে ভারতীয় ভাষা প্রয়োজন। সুতরাং আদিবাসীদের জন্য কোন ভারতীয় ভাষার অক্ষরই গ্রহণ করার বস্তু। ভারতীয় ভাষার অক্ষর গ্রহণ করলে, যেমন উপজাতীয় ভাষার সাহিত্যরচনা লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত করা সহজসাধ্য হবে, তেমনি আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেও দখল সহজতর হবে। এর ফলে উভয়ের উন্নতি। আদিবাসীদের নিজস্ব উপজাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও

১. Aboriginal Tribes of the Central Provinces–Hislop.

উৎকর্ষ এবং ভারতীয় সাহিত্যে আদিবাসী লেখক ও চিন্তাশীলের দান সম্ভব হবে।

আদিবাসী সমাজের প্রত্যেক উপজাতীয় ভাষা এক একটা সমৃদ্ধ ব্যঞ্জনাপ্রবণ ভাষা নয়। অধিকাংশ ভাষাই শত শত অপভ্রংশে পরিণত। একই গন্দি বা সাঁওতালী ভাষা জেলায়-জেলায় জঙ্গলে-জঙ্গলে উপত্যকায়-উপত্যকায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিকৃতি অনুসারে পরস্পর থেকে অল্পবিস্তর পৃথক। সিংভূম জেলায় আদিবাসীদের মধ্যে নয়টি উপভাষা (dialect) প্রচলিত। আদিবাসী সমাজের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তাদের ভাষাগত বিপর্যয়ের বহু ঘটনা হয়ে গেছে। কোন কোন গোষ্ঠী তার আদি ভাষাটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বা বর্জন করে নতুন একটি উপজাতীয় বা ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করেছে। ভাষায় ভাষায় সংমিশ্রণ হয়ে বহু সঙ্কর ভাষার উদ্ভব হয়েছে। আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত এই সঙ্কর ভাষাগুলি নিতান্ত দুর্বল ভাষা। এই দুর্বলতার কারণ প্রধানত হলো, ভাষীদের সংখ্যাল্পতা, অল্প সংখক মানুষের মুখে কথিত হয়ে কোন ভাষা বড় হয়ে উঠতে পারে না। বরং দিন দিন সে ভাষার শক্তি ও ভাবপ্রকাশের সামর্থ্য কমে আসতে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে ভাষা জিনিসটা দুর্মর। এই দুর্বল অপভ্রংশবহুল উপভাষাগুলি লুপ্ত হতে বহু সময় নেয়। অকেজো হয়েও এই দুর্বল উপভাষাগুলি টিকে আছে। মাত্র সাঁওতালী, গন্দি প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতীয় ভাষা-ভাষীদের সংখ্যাগুরুত্বের জন্য ভালোভাবেই বেঁচে আছে। ১৯২১ সালের সেন্সাস কমিশনার মিঃ ট্যালেন্টস আরও স্পষ্ট করে এই মন্তব্য করেছেন যে—"এই সব অপরিণত স্বতঃসৃষ্ট কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে এমন কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই যা সংরক্ষণ করে রাখার যোগ্য। সমতল প্রদেশের বেশি ঐশ্বর্যপূর্ণ সাধারণ ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে এই সব উপজাতীয় ভাষা মিশে লুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য এবং সেজন্য দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই।[২]

মিঃ গ্রীগসন বলেন—"উপজাতীয়েরা নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেললে এই একটা লাভ অবশ্যই হয় যে, তাদের লেখাপড়া শেখবার সমস্যাটি সহজে সমাধান করা সম্ভব হয়।[৩]

মিঃ সিমিংটন ভীলদের শিক্ষা সমস্যা আলোচনা করে এই মন্তব্য করেছেন যে, ভীলি অথবা অন্য কোন উপভাষায় তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করাই উচিত। মিঃ সিমিংটন কোন ভারতীয় ভাষাতেই ভীলদের শিক্ষা বিধানের সার্থকতা সমর্থন করেন। কারণ উপভাষাগুলির দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা সম্বন্ধে মিঃ সিমিংটন যথেষ্ট সচেতন। এক তালুক থেকে কিছু দূরে আর একটি তালুকে গেলেই উপভাষাগুলির পরস্পরের মধ্যে মাত্রাহীন পার্থক্যের রূপটা উপলব্ধি করা যায়। এখানে একরকম ওখানে আর একরকম। এ ভাষাগুলি বস্তুত ভাষাই নয়। বলতে গেলে বলা যায়, কতগুলি 'বাক্যের বিকৃতি।'[৪]

তবে মিঃ সিমিংটন প্রস্তাব করেছেন যে, যে-সব শিক্ষক আদিবাসী সমাজের ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করবেন, তাঁরা যেন স্থানীয় আদিবাসীর উপজাতীয় ভাষা বা উপভাষা সম্বন্ধে পারদর্শী থাকেন। ওড়িশার আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল সম্বন্ধে তদন্ত কমিটির যে রিপোর্ট

২."There is nothing that is worth preserving in these rudimentary indigenous tongues, and their inevitable absorption in the more copious lingua franca of the plains is not at all to be regretted"—Tallents. (Census of India, 1921].

৩. Notes on the Aboriginal Problems in the Mandla District.

৪. "These dialects besides varying from taluka to taluka, are so far as I can ascertain, merely corruptions of good speech."–D. Symington. [Report on the Aboriginal & Hill tribes of the partially Excluded Areas in the Province of Bombay, 1940]

প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও মন্তব্য করা হয়েছে যে—"খন্দমাল, গঞ্জাম, কোরাপুট প্রভৃতি আদিবাসী অঞ্চলে স্কুলের শিক্ষকেরা অবশ্য ওড়িয়া ভাষাতেই আদিবাসীকে শিক্ষাদান করেন, কিন্তু শিক্ষকদেরও স্থানীয় আদিবাসীর ভাষা সম্বন্ধে সম্যকভাবে পারদর্শী হতে হবে।"

আদিবাসীদের উপজাতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য, গুণ ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনেকে প্রশংসার উচ্ছ্বাস দেখিয়ে থাকেন। যেমন, মিঃ এলুইন। গন্দি ভাষায় কতগুলি লোকসঙ্গীত ও গাঁথা অবশ্য আছে, সাঁওতালী ভাষায় অনেক ছড়া, গান, রূপকথা ও উপকথা আছে। সবই সত্যি। কিন্তু বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের তুলনায় এই সব উপজাতীয় ভাষার ঐশ্বর্য কতটুকু? শুনতে অনেকের খারাপ লাগলেও সত্য কথা হলো, এই সব উপজাতীয় ভাষা সাহিত্যগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে তেমন কিছুই নয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, বর্তমান যুগের উপযোগী নয়। এসব উপভাষা কয়েক হাজার বছর আগেকার অরণ্য জীবনের উপযোগী ভাষা। ভাষার যাদুঘর হিসেবে এই সব ভাষাকে সাজিয়ে রাখতে অনেকে ইচ্ছে করেন, কিন্তু সেটা হলো যাদুঘর দরদীর মনোবৃত্তি, আদিবাসী দরদীর মনোবৃত্তি নয়। আদিবাসীকে উন্নত করতে হলে, তাকে উন্নত ভাষার সুযোগ ও দীক্ষা দিতেই হবে।

"সিংভূমের আদিবাসী হো সমাজকে হিন্দী ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা হয়েছে। অন্য বিষয়ে অনুন্নত হয়েও এই আদিবাসী সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করেছে।"[৫]

এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর এমন অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন যে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করলে আদিবাসীর ক্ষতি হবে। হিন্দী ভাষা শিখে হো সমাজের কোন ক্ষতি হয়নি।

সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, ভাষা জীবনের কোন একটা লক্ষ্য নয়। একটা লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়, একটা পদ্ধতি। দেখতে হবে, আদিবাসীর জীবনকে উন্নতি করার জন্যই পদ্ধতি হিসাবে ভাষা ঠিকভাবে কাজ করেছে কিনা। হিন্দী ভাষা শেখানো অর্থ হিন্দু সংস্কৃতিকে দীক্ষা দেওয়া নয়, অথবা আদিবাসী সংস্কৃতিতে লুপ্ত করে দেওয়া নয়। হিন্দী ভাষাকে আদিবাসীর সংস্কৃতিগত জীবনের বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্যগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই অথবা আরও উন্নত করার জন্যই নিয়োজিত করা যায়। যাঁরা পরিবর্তন বিরোধী, একমাত্র তাঁরাই উল্টো কথা বলেন। কিন্তু আদিবাসী সমাজকে যাঁরা আধুনিক যুগের সমাজে পরিণত হতে দেখতে চান, তাঁরা অবশ্যই আদিবাসীদের জন্য যুগোপযোগী ভাষার সুপারিশ করবেন। হিন্দী ভাষার সাহায্যেই সুন্দর ও বিরাট 'সাঁওতালী সাহিত্য' রচিত হতে পারে। বাঙলা ভাষার সাহায্যেই বিশেষ একটি 'পাহাড়িয়া সাহিত্য' সৃষ্টি হতে পারে।

আদিবাসীর পক্ষে ভারতীয় ভাষা গ্রহণের প্রস্তাব একটা রাজনৈতিক অভিমত নয়। এর মধ্যে ভারতীয়করণের কোন আক্রমণমূলক নীতি নেই। এটা নিছক নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের অভিমত। একজন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক এ সম্বন্ধে কী অভিমত পোষণ করেন দেখা যাক ঃ

ডাঃ ম্যারেট তাঁর নৃতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে ভাষা অধ্যায়ে বলেছেন যে, উপজাতীয়দের সংস্কৃতিগত বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাকে যখন সভ্য প্রভুরা পরিবর্তন করতে চান, তখন তাঁদের পক্ষে একটু সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। আদিবাসীদের সংস্কৃতিগত বা সমাজগত বৈশিষ্ট্যের সবই বদলে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। যে সব উপজাতীয় ব্যবস্থা তাদের জীবনের উন্নতির পক্ষে হানিকর সেগুলিকে মাত্র অপসারিত করবার প্রয়াস আবশ্যক। হঠাৎ অথবা সব কিছু একদিনে বদলে দেবার চেষ্টা করলে আদিবাসীদের মানসিক গঠনের সর্বনাশ করা হবে। কিন্তু সংস্কৃতিগত এই সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে কথা সত্য, ভাষার ব্যাপারে সেটা সত্য নয়।

৫. A Tribe in Transition–D.N. Majumder.

উপজাতীয় ভাষা বদলে দিয়ে নতুন উন্নত ভাষা প্রচলিত করলে কোন ক্ষতি হবে না।[১]

লাঙল দিয়ে যে সাঁওতাল ক্ষেত চাষ ও শস্য উৎপাদন করে সেও কৃষক। আবার একজন রাজপুত বা ভূমিহার ব্রাহ্মণ যখন ক্ষেত চাষ করে, সেও কৃষক। কিন্তু সাঁওতাল কৃষক ও রাজপুত কৃষকের মধ্যে মনস্তত্ত্বগত প্রভেদ অনেকখানি। হিন্দীভাষী রাজপুত কৃষক যে মনের অধিকারী, সাঁওতাল কৃষক সে ধরনের মনের অধিকারী নয়। একজন ভাষায় উন্নত, আর একজন ভাষায় অবনত। এক্ষেত্রে উভয়ের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবগ্রহণ ক্ষমতা ও জীবনে উন্নত হবার শক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য। এর প্রধান কারণ—ভাষাগত শক্তির তারতম্য।

আদিবাসী উপজাতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যই এবং বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক জীবনের পরীক্ষায় যোগ্য হবার জন্যই তাদের পক্ষে একটি উন্নত ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করা উচিত। ভারতীয় ভাষা আদিবাসীর পক্ষে নিতান্ত বৈদেশিক ভাষা নয়। কারণ, ভারতীয় ভাষা যে সংস্কৃতির বাহন সেই সংস্কৃতি আদিবাসীর পক্ষে বৈদেশিক সংস্কৃতি নয়। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতি, উভয়ের ভিত্তি দূর অতীতের এক ঐতিহাসিক সম্পর্কে যুক্ত। আদিবাসী সংস্কৃতিকে প্রায়-হিন্দু (Proto-Hindu) সংস্কৃতি বলা হয়েছে। সংস্কৃতিগত ঐতিহাসিক বনিয়াদ এক আছে বলেই, বর্তমানে ভাষাগত বনিয়াদ এক করে দিলে কোন হানি হবে না।

উপজাতীয়-সমাজ-সংহতি

উপজাতীয় আদিবাসী সমাজের সংহতি আগের তুলনায় কোথাও ভেঙে পড়েছে, কোথাও ভেঙে যাচ্ছে। সামাজিক সংহতি ভেঙে পড়বার ব্যাপারে প্রথম দু'টি কারণ হলো—(১) হিন্দু সমাজভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ; (২) খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করা।

এই দু'টি ব্যাপারকে ঠিক আক্রমণমূলক ঘটনা বলা যায় না। কোন আইনের জোরে নয়, বাধ্যতামূলক নির্দেশ বা রেগুলেশনের জোরে নয়, আদিবাসী সমাজের বহু গোষ্ঠী বা দল স্বাভাবিক ঐতিহাসিক কারণেই সংস্কৃতিগত টানে হিন্দুসমাজে স্থান গ্রহণ করেছে, হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে নীচ জাতের ঠাঁই গ্রহণ করেছে। কিন্তু হিন্দু সমাজভুক্ত হওয়ার দরুন তারা আর্থিক বিষয়ে বা শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে আগের তুলনায় দীন হয়েছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হয়ে থাকলে অন্য কারণে হয়েছে, হিন্দু সমাজভুক্তির জন্যে নয়।

ঠিক তেমনি যে সব আদিবাসী খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করেছে, তারাও আর্থিক বা অন্যান্য বিষয়ে হীনতর হয়নি। ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে তারা একটা ভিন্ন সমাজে পরিণত হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে, কোন হানি হয়নি।

উল্লিখিত এই দু'টি সমাজান্তরের প্রক্রিয়া একটা গর্হিত ব্যাপার অবশ্যই নয়। কিন্তু এর ফলে উপজাতীয় সমাজের ভাঙন সম্ভব হয়েছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসে উন্নত হবার মতো ব্যাপার। যারা চলে এল, তারা 'উন্নত' হলো ঠিকই ; কিন্তু গ্রাম অবনত ও দীনতর হয়ে

১. "Whereas it is the duty of the civilized overlords of primitive folk to leave them to their old institutions so far as they are not directly prejuudicial to their gradual advancement in culture, since to lose touch with one's homeworld is for the savage to lose heart altogether and die ; yet this consideration hardly applies at all to the native language. If the tongue of advanced peoples can be substituted, it is the good of all concered."–Dr. R.R. Marett ['Anthropology'].

রইল। সুতরাং এই দু'টি প্রক্রিয়াকে বলতে পারা যায়, ব্যক্তিগত উন্নতির ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। বহু আদিবাসী নিজ উপজাতীয় সমাজ ছেড়ে দিয়ে হিন্দু বা খৃস্টানরূপে 'উন্নত' হয়েছে, তার ফলে উপজাতীয় সমাজের সংহতি ও শক্তি অনেকখানি অবনত হয়েছে।

কিন্তু আসল হানিকর ব্যাপার হলো ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি। উপজাতীয় সমাজের সংহতিকে যদি সত্যি সত্যি কেউ বিনষ্ট করে থাকে, তবে সেটা করেছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট। ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি উপজাতীয় সংসারে নিছক ভাঙনের নীতি নিয়েই প্রবেশ করেছিল। কিছু গড়ে তোলবার, উন্নত করবার, এমন কি, পরিবর্তন করবারও কোন নীতি ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতিতে ছিল না। তাই ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া আদিবাসীর সমাজ-জীবনে শুধু পুরাতন উপজাতীয় ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়েই এসেছে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার যে সব ক্রিয়াকলাপ আদিবাসীর উপজাতীয় সমাজব্যবস্থার ওপর আঘাত দিয়েছে সেগুলি হলো--

(১) ব্রিটিশের কর সংগ্রহের পদ্ধতি

(২) ব্রিটিশের পুলিসী পদ্ধতি

(৩) ব্রিটিশের বিচার পদ্ধতি।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উক্ত তিনটি পদ্ধতিই হলো কেন্দ্রীভূত পদ্ধতি। দূর শহরে বা রাজধানীতে এই সব ব্যাপারের শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত। আইন ও এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা এই কেন্দ্র থেকে চালিত হয়ে উপজাতীয় সমাজের ওপর কর্তৃত্ব করছে। কেন্দ্রীভূত এই সব শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যটা কি? উপজাতীয় সমাজকে সাহায্য করা বা উন্নত করা নিশ্চয় নয়। উপজাতীয়দের রুচি ও মনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব ব্যবস্থা করা হয়নি। এটা বাইরে থেকে চাপানো, বাইরের মানুষের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং বাইরের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিকল্পিত একটা শাসনব্যস্থা। উপজাতীয়কে সাহায্য করার জন্য নয়, উপজাতীয়েরা যাতে এই শাসনব্যবস্থাকে সাহায্য করে, তারই জন্য সমস্ত বিধানগুলি রচিত। সুতরাং উপজাতীয় সমাজ নিজে ভেঙে যেতে বাধ্য হয়েছে। নিজে ভেঙে গিয়ে বাইরের থেকে চাপানো একটা ব্যবস্থাকে তারা অটুট রেখে চলেছে। আদিবাসীর গোষ্ঠী পঞ্চায়েত শক্তিহীন হয়ে গেল, গোষ্ঠী সর্দার তুচ্ছ হয়ে গেল। শ্রদ্ধাস্পদ গোষ্ঠী সর্দারের চেয়ে উর্দিপরা ও পাঁচ টাকা মাইনের চৌকিদার আদিবাসীর ওপর ঢের বেশি প্রভুত্বের অধিকারী হলো। এল দারোগা ও তহশীলদার, আদিবাসীর সমাজের ওপর অগাধ প্রভুত্বের সুযোগ নিয়ে। পঞ্চায়েতের অধিকার লুপ্ত হয়ে গেল, সামান্য একটা মুর্গী নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করতে আদিবাসী বাদী ও বিবাদীকে শহরে এসে উকীলবাবুর আর আদালতের শরণ নিতে হলো।

এর মধ্যে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার যোগ্য। ব্রিটিশ শাসনে উপজাতীয়ের গোষ্ঠী পঞ্চায়েত যেমন নষ্ট হয়েছে, তেমনি সাধারণ ভারতবাসীর গ্রাম পঞ্চায়েতও নষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা এবং বৈদেশিক উগ্রতার ফলে সাধারণ ভারতবাসী এবং আদিবাসী উভয়েরই স্বয়ংচালিত আত্ম-শাসনের 'সাধারণতন্ত্র' নষ্ট হয়েছে। উপজাতীয় সমাজের সংহতি বিনষ্ট হওয়া, উপজাতীয়দেরই বিশেষ দুঃখ নয়। এটা সাধারণ গ্রামীণ ভারতের দুঃখ। সুতরাং আদিবাসীর এই সমাজ-সংহতির সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই। এটাও নিখিল ভারতীয় সমস্যা এবং সারা ভারতবর্ষের গ্রামীণ মানুষের পঞ্চায়েত প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য যে ব্যবস্থা করতে হবে, আদিবাসী সমাজের সমস্যারও সেই সঙ্গে সমাধান হয়ে যাবে।

জঙ্গল সমস্যার কথাই ধরা যাক্। আদিবাসীরা অরণ্য অঞ্চলে থাকে ; সুতরাং জঙ্গলের ওপর তাদের অধিকার এবং জঙ্গলের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে আদিবাসীর উন্নতি বা অবনতির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, এই জঙ্গল সমস্যা নিছক আদিবাসীর সমস্যা নয়, এটা ভারতের গ্রামবাসী সকল মানুষের সমস্যা। ব্রিটিশ বন-নীতি ও আইনের

জন্য যেমন অরণ্যবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সাধারণ গ্রামবাসী ভারতীয়ও ঠিক সেই পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছে।

সমস্যাটির আর একটি দিক আছে। আদিবাসীদের দাবি মেনে নিয়ে এবং তাদেরই ভালোর জন্য যদি বন-নীতি স্থির করা হয়, তাহলেই ন্যায় বিচার হয় না। এমন আদিবাসী গোষ্ঠী আছে যারা বনকে অল্পদিনে উচ্ছেদ করে, বেপরোয়া বনের পশু সংহার করে অথবা বন পুড়িয়ে ঝুম চাষ করে জীবন নির্বাহ করতে চায়। কিন্তু এই বনের পাশেই হয়তো কৃষিপ্রবণ সাধারণ ভারতবাসীর গ্রাম আছে, বনের ভালো-মন্দর ওপর তাদের ভালোমন্দ নির্ভর করে। এক্ষেত্রে বনকে উচেছদ করার সুযোগ দিয়ে আদিবাসীর মঙ্গল করতে গিয়ে ভারতীয় গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষতি করা কি উচিত? এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষক ভারতবাসী ও অ-কৃষক আদিবাসীর স্বার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সুতরাং প্রশ্ন, এক্ষেত্রে কার স্বার্থ দেখতে হবে?

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট জঙ্গল সংরক্ষণের (Reserve) নীতি যেভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে আদিবাসী ও সাধারণ ভারতবাসী উভয়েরই ক্ষতি হয়েছে। আদিবাসী যেমন জঙ্গলে ইচ্ছামতো শিকার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তেমনি গ্রামের ভারতীয় কৃষকও জঙ্গলে গরু চরাবার সুযোগ, শুকনো পাতা কুড়োবার সুযোগ থেকে বঞ্চিতও হয়েছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের শাসন ব্যবস্থার সমস্ত নীতির মতো বন-নীতির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য আছে—নিষেধমূলক নীতি। বনকে সংরক্ষণ করে বনবাসী এবং গ্রামবাসী উভয়ের অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হলো। কিন্তু গ্রামবাসী বা আদিবাসীর ওপর বন সৃষ্টি বা উন্নত করার কোন কর্তব্য দেওয়া হলো না। গঠনমূলক কোন নীতি—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মস্তিষ্কের মধ্যে স্থান লাভ করেনি। তাঁরা শুধু নিষিদ্ধ করতে জানতেন। বনের ওপর জনসাধারণের যেমন ভোগ করবার অধিকার থাকবে, তেমনি বনকে সংরক্ষণ ও উন্নত করবার দায়িত্বও জনসাধারণের ওপর থাকবে—গভর্নমেণ্টের নীতি এইভাবে নির্দিষ্ট ও পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গভর্নমেণ্ট শুধু নিষিদ্ধ করতেই জানেন। বনের ওপর জনসাধারণের ভোগের অধিকার নিষিদ্ধ করা হলো কিন্তু সংরক্ষণের ব্যাপারে জনসাধারণকে কোন কর্তব্যে উৎসাহিত করা হলো না। গভর্নমেণ্টের বন-নীতির ত্রুটি রাজকীয় কৃষি কমিশনের মন্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। "গ্রামের পাশে বনকে গ্রামের লোকের স্বার্থের জন্য গ্রামের লোকদের দ্বারাই তত্ত্বাবধান করালে তার দ্বারা এত রকম ভালো কাজ হতে পারে যে, এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করার জন্য সরল রকম চেষ্টা করা উচিত।"[১]

বন সম্পর্কে যে সমস্যার কথা বিবৃত করা হলো, তার মধ্যে এই ক'টি বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বন-নীতি সাধারণ গ্রামবাসী ভারতীয় ও উপজাতীয় আদিবাসী উভয়েরই অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছে। এই দিক দিয়ে উভয়ের সমস্যা একই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, বন সম্পর্কে গোঁড়া উপজাতীয় দাবি এবং ভারতীয় কৃষক গ্রামবাসীর দাবি, ঠিক এক নয়, বরং পরস্পরবিরুদ্ধ।

এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের পরিষ্কার পথটি হলো—বনের ও বনজসম্পদের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে প্রধান লক্ষ্য রেখে, বন-নীতি নির্ধারিত করা। বিশেষ কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর অ-কৃষকোচিত সংস্কারকে তুষ্ট করতে গিয়ে বন নষ্ট করার সুযোগ দেওয়া যায় না। আদিবাসীকে কৃষিতে উৎসাহিত করা, এবং বন সংরক্ষণে ও পরিচালনায় ভারতীয় ও আদিবাসী কৃষকসমাজের ওপর দায়িত্ব নির্দেশ করা—বন-নীতির মধ্যে এই দু'টি ব্যবস্থা

১. "The management by the people, for the people, of the forests close to their village, possess so many desirable feature that every effort should be made to be ensure its success"–Royal Commission on Agriculture in India, Report.

আবশ্যক। কোন জমিদার, ঠিকাদার, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থের জন্য নয়, বনসম্পদকে সমগ্র ভারতের জাতীয় ঐশ্বর্যরূপে স্বীকার করে নিয়ে বনশাসনের ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত। বনের উন্নতি আদিবাসী সমাজেরই উন্নতি।

মজুরি সমস্যার বিভিন্ন দিক

পূর্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমানে মজুরিগিরিও জীবিকা হিসেবে স্থান লাভ করেছে। নানা শ্রেণীর মজুররূপে আদিবাসীকে দেখা যায়। টাটানগরের ইস্পাত কারখানায়, কয়লার খনিতে, চা-বাগানে এবং পাবলিক ওয়ার্কসের সড়ক তৈরির জন্য পাথর বিছানোর কাজে এদের সমস্যা সাধারণ সমজীবিকাসম্পন্ন ভারতীয় মজুরের সমস্যার মতোই।

তাছাড়া আদিবাসীদের মধ্যে খেতমজুরও আছে। এই খেতমজুর প্রথা আজকের দিনের নতুন প্রথা নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু অতীত থেকেই খেতমজুরের আবির্ভাব হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বেও এরা ছিল এবং এখনও আছে। মজুরির বিনিময়ে স্বেচ্ছায় কাজ করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মজুরগিরি করতে বাধ্য করা একটা অসঙ্গত প্রথা নিশ্চয়। ভারতবর্ষে দূর অতীত থেকে বাধ্যতামূলক মজুরগিরির (Compulsory Labour)[২] প্রথা চলে আসছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক বলেই যে ব্যাপারটি সমূহভাবে নিন্দনীয় তা নয়। দেখতে হবে, কি উদ্দেশ্যে এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ছিল। জনপদের সকলের জন্য ইস্টাপূর্তের কাজে যদি সকলকে কিছু কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেটা ঠিক অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বলে ধরা যায় না। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বাপী, কূপ, তড়াগ ও পথ নির্মাণে প্রাচীন ভারতের গ্রামপঞ্চায়েত সকলকে কাজ করতে বাধ্য করত। এটা হওয়াই উচিত, এটাকে সেবাকার্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা বলা যেতে পারে।

কিন্তু জনমঙ্গলের ব্যাপার ছাড়া যেটা নিতান্ত ব্যক্তিস্বার্থের ব্যাপার সেখানে বাধ্যতামূলক মজুরিগিরির প্রথা নিশ্চয় নিন্দার্হ। প্রাচীনকালেও ভারতের ভূস্বামীবর্গ যে তাঁদের প্রজাদের এইভাবে জোর করে খাটাতে বাধ্য করতেন না, একথা বলা যায় না। এটাই গর্হিত ব্যাপার এবং এই ব্যাপার আজও চলে আসছে। এই বাধ্যতামূলক মজুরিগিরির প্রথাই বেগার, বেথি ইত্যাদি নামে পরিচিত। বর্তমানের জমিদার থেকে আরম্ভ করে সরকারী কর্মচারিবৃন্দ আদিবাসী প্রজাকে এইভাবে জোর করে খাটতে বাধ্য করে থাকেন। আইনে এই প্রথা নিষিদ্ধ থাকলেও কার্যত এবং প্রথা হিসাবে এটা চলে আসছে। বোম্বাই প্রদেশের আদিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করে মিঃ সিমিংটন যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে তিনি আদিবাসীকে জোর করে কাজ করাবার গর্হিত প্রথাটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। জোর করে কাজ করানো, কাজ না করলে মারধর করা এবং মজুরি দৈনিক এক আনা মাত্র।[৩] মিঃ সিমিংটন আরও অভিযোগ করেছেন যে, জমিদারেরা শুধু আদিবাসী প্রজাকে মজুরিগিরি করতে বাধ্য করেই

২." Compulsory Labour in the interest of the village community has been in existence, in some form or other, in nearly every part of india."–John Matthai [Village Government in India].

৩. "All Jungle tract tenants are liable to be called upon to work for their landlords. This forced labour is demanded for as many days as are necessary for the landlord's requirements. If they refuse or procastinate they are liable to assault or beatings...The maximum remuneration of forced labour is one anna perdeiem. More Often rice is given, barely sufficient for one man for one meal."

ক্ষান্ত হয় না, তাদের কাম-লালসা চরিতার্থ করতে আদিবাসী নারীকেও বাধ্য করে।

জোর করে কাজ করবার যে উদাহরণ দেওয়া হলো, সেটা কিন্তু একমাত্র আদিবাসী প্রজারই দুঃখ নয়। এটা ভারতের গরিব প্রজাসাধারণের দুঃখ। ভারতের বহু অঞ্চলে ভারতীয় প্রজাকে জমিদার বা সরকারী কর্মচারীর স্বার্থের জন্য কাজ করতে বাধ্য করানো হয়। গতর খেটে জমিদারের খাজনা শোধ করে দেবার প্রথাও আছে। দেখা যাচ্ছে যে, এখানেও গরিব ভারতীয় প্রজা এবং আদিবাসী উভয়ের সমস্যা এক। উভয়েই একই শোষণপ্রথার বলি। সুতরাং আদিবাসী সমাজের এই সমস্যা ভারতীয় সমস্যারই একটি অংশ।

আদিবাসীদের মধ্যে আর এক ধরনের মজুরগিরি আছে—চুক্তিবদ্ধ শ্রম (Bonded Labour)। চলতি কথায় এর নানারকম নাম আছে। ছোটনাগপুরে বলে কামিয়ৌতি, ওড়িশায় বলে গোঠি ইত্যাদি। এই প্রথা বস্তুত ক্রীতদাস প্রথা। জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে গরিব প্রজা বা খাতক খেটে শোধ করার জন্য প্রতিশ্রুত থাকে। কিন্তু ঋণের হিসেবে এমনই জুয়াচুরির খেলা চলতে থাকে, বছরের পর বছর খেটে গেলেও খাতকের ঋণ শোধ হয় না। এই কামিয়া বা খাতক মরে গেলে তার ছেলে এই ঋণ শোধ করার জন্য দায়ী হয়। পুরুষানুক্রমে এই দাসমজুরিগিরি চলতে থাকে।

এই কামিয়ৌতি বা গোঠী প্রথাও নিছক আদিবাসী সমাজের দুঃখ নয়। গরিব ভারতীয় প্রজাও অভাবে পড়ে জমিদার ও মহাজনের কাছে এইভাবে আত্মবিক্রিত হয়। সাধারণত নিম্নজাতের হিন্দু বিয়ে করার জন্য কন্যাপণ সংগ্রহের চেষ্টায় বা অন্য কোন সামাজিক কাজের জন্য থেকে টাকার অভাব অনুভব করে থাকে, এবং সেই সময় ধার করতে বাধ্য হয়। ভারতীয় কৃষি কমিশনে (Royal Commission on Agriculture in India) মন্তব্য করেছেন যে, এই দাসমজুরেরা আইন সম্বন্ধে অজ্ঞ বলেই এত দুর্ভোগে ভুগে থাকে। কমিশনের মন্তব্যের মধ্যে ভুল আছে। দাসমজুর খুব ভালো করেই জানে যে, সরকারী আইনে এই ধরনের শোষণের প্রশ্রয় নেই। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? দাসমজুর জানে, এই আইনের সাহায্য নিয়ে তার আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। আদালতে মামলা করার মতো তার সামর্থ্য নেই এবং জমিদার বা মহাজনের শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা করারও তার সামর্থ্য নেই। প্রতিবাদ করলে কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। আত্মরক্ষার জন্য থানা পুলিস উকীল আদালত—এসব ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হলে যে পরিমাণ পয়সা খরচ করতে হয়, সে সঙ্গতি তার নেই। এই জন্যেই সে নিষ্ক্রিয়, আদৌ অজ্ঞতার জন্যে নয়।

কিন্তু আদিবাসী দাসমজুরের সম্বন্ধে রাজকীয় কৃষি কমিশনের মন্তব্য অনেকখানি সত্য। আদিবাসীরা সত্যিই আইন সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ। সুতরাং তারা আরও বেশি শোষিত এবং অত্যাচারিত হয়।

জমিদার, মহাজন এবং সরকারী কর্মচারী—এই তিনের উদ্যোগেই দাসমজুর প্রথা চলছে। এর বিরুদ্ধে আইন কাগজে-কলমে থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োগ নেই। বরং একটি বীভৎস ঐতিহ্যরূপে এই প্রথাটি উদাসীন গভর্নমেন্টের নিষ্ক্রিয়তার সমর্থনে চলে আসছে।

আদিবাসী সমস্যা ও বিশেষজ্ঞের অভিমত

উপজাতীয় সমাজ-সংহতি অর্থাৎ আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত সামাজিক জীবনের ভিত্তি প্রধানত যে কারণে ভাঙতে আরম্ভ করেছে, সে সম্বন্ধে পূর্বপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এর প্রধান কারণ হলো ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন। শুধু আইন নয়, এই সব আইন যে ভাবে প্রয়োগ

করা হয়ে থাকে সেটাও গর্হিত। আংশিক বা সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলে সরকারী কর্মচারীদের ওপর এত বেশি ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় যে, সেটা প্রায় অপব্যবহারের ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। একজন অফিসারের হাতেই শাসন ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। আদিবাসী অঞ্চলে এই অফিসারেরাই ইউনিয়ন বোর্ড বা তালুক বোর্ড বা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে থাকেন। এভাবে আদিবাসী অঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নীতিসমূহ ব্যর্থ করা হয়েছে।

এমন অনেক ব্যাপার আছে যেটা উপজাতীয় সমাজনীতি অনুসারে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। দৃষ্টান্ত--জোর করে কোন মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা কিন্তু ব্রিটিশ আইনে এটা অপরাধ। এবং, ব্রিটিশ আইনের মহিমায় দীক্ষিত ভারতীয় হাকিম সুদূর শহরে ও সদরে বসে যখন এই ধরনের কোন মামলার বিচার করেন, তখন তাঁর পক্ষে সমস্ত ঘটনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করা সম্ভব হয় না। বিচারটা একপেশে ও গোঁড়া বিচার হয়ে থাকে। আদিবাসীর পক্ষে ব্রিটিশ আদালতের ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণা করাও সম্ভব নয়। ব্রিটিশ আদালতের বিচারে শাস্তিলাভ করে আদিবাসী অনেক সময় এই মনোবেদনাই লাভ করে থাকে যে, বিনা অপরাধে তার শাস্তি হলো।

শ্রীশরৎচন্দ্র রায় লিখেছেন ঃ "ব্রিটিশ পদ্ধতির আইন ও শাসন উপজাতীয় সংহতি আরও বিনষ্ট করেছে এবং তাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিজস্ব 'পঞ্চের' অর্থাৎ নিজস্ব সামাজিক কর্তৃত্বকে খর্ব করে দিয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে উপজাতীয় সামাজিক প্রথাগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে গভর্নমেন্টে যে সব নির্দেশ দিতেন, আদালত আবার সেগুলিকে অস্বীকার করত। দৃষ্টান্ত--পিতৃ সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার। এই উপজাতীয় প্রথাকে অস্বীকার করে আদালত ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রথা অনুসারে দায়াধিকার আইনের (Succession Act) বলে মামলার বিচার করত, যেটা উপজাতীয়দের সামাজিক জীবনের মৌলিক ব্যবস্থা ও আত্মীয়তার নীতির বিরোধী।"

আদিবাসীদের জমি ধীরে ধীরে মহাজন, জমিদার প্রভৃতি লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে। এইভাবে ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়ে আদিবাসীরা তাদের সমাজ সংহতিও হারিয়েছে। এই অধঃপতনের মূল কারণও হলো ব্রিটিশ পদ্ধতির ভূমি আইন। অবশ্য, এই অধঃপতন একমাত্র আদিবাসী চাষীর দুর্ভাগ্য নয়, ভারতের সর্বত্র সাধারণ চাষীকেও এই দুর্ভাগ্যে ভুগতে হচ্ছে।

ভূমির ওপর থেকে চাষীর অর্থনৈতিক মূল উচ্ছিন্ন হলে তার সামাজিক মনোবলের ভিত্তিও থাকে না। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। ভারতের বর্তমান দুরবস্থাগ্রস্ত আদিবাসী সমাজের 'মনোবল হানি'র যে কথা বহু নৃতাত্ত্বিক উল্লেখ করেছেন, তার প্রধান কারণ হলো, ভূমি থেকে অধিকারচ্যুত হওয়া। এবং এই 'মনোবল হানি' সৃষ্টির ব্যাপারে ব্রিটিশ পদ্ধতির আইন সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে।

"জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে চাষীকে, বিশেষ করে রায়তী অঞ্চলের চাষীকে ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুসারে অবাধ অধিকার দিয়েছে। চাষী ইচ্ছে করলেই তার জমিকে পরের হাতে তুলে দিতে পারে, তার এই অধিকারকে বাধা দেবার কোন নীতি ব্রিটিশ পদ্ধতিতে ছিল না। তারপর, ব্রিটিশ আইন অনুসারে যে ধরনের বিচারপদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তার ফলে ঋণদাতা মহাজন তার খাতকের ওপর বড় বেশি ক্ষমতা লাভ করে। এছাড়া, আবার তামাদি আইনের ফলে খাতক তার ঋণপত্রকে নির্দিষ্ট অল্পমেয়াদী কালের মধ্যেই নতুন করে তৈরি করিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে খাতকের অবস্থা আরও খারাপ হয়। একজন চাষী প্রয়োজনে পড়ে ঋণ গ্রহণ করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক এবং এর মধ্যে বিশেষ রকমের দুর্ভাগ্য আশঙ্কা করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু এইসব ব্রিটিশ পদ্ধতির অন্যান্য ব্যাপারগুলি সব মিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাতক চাষীকে বস্তুত ক্রীতদাসে পরিণত করেছে...আদালতের সাহায্যে

খাতকের কাছ থেকে এত সহজে প্রাপ্য টাকা উদ্ধার হয় বলেই মহাজনেরা বেশি করে ঋণ দেবার জন্যে উৎসাহিত হয়েছিল। চাষীর আর্থিক অবস্থা যখন ভালো ছিল, তখন এইভাবে মহাজনের ঋণ দেওয়া ও আদায় করার প্রক্রিয়া ভালোভাবেই সম্পন্ন হতে পেরেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন চাষীর অবস্থা খারাপ হয়ে এল, তখনি মহাজনের পক্ষে ঋণ আদায়ের ভরসাও সঙ্কুচিত হলো। এবং মহাজনও চাষীর কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায়ের ভরসা কম দেখে টাকার বদলে চাষীর 'জমি' আদায় করে নেবার পথ ধরলো। এইবার চাষী বুঝতে পারল, কোন্ অবস্থায় সে পৌঁছেছে।[১]

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ও ভারতবর্ষে মহাজনী প্রথা ছিল, মহাজন চাষীকে ঋণ দিয়ে সুদশুদ্ধ আদায় করত। কিন্তু এই প্রাক্-ব্রিটিশ প্রথা ও বর্তমান ব্রিটিশ প্রথার মধ্যে একটা মৌলিক তারতম্য দেখা যায়। এ সম্পর্কে বি. এ. কলিন্স (B. A. Collins) নামক জনৈক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধৃত করা গেল ঃ

"ব্রিটিশ প্রবর্তিত সাধারণ সিভিল শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থাগুলি চাষীকে তার কৃষিজাত সামগ্রীর লভ্যাংশ এবং তার জমি থেকে তাকে বঞ্চিত করার যন্ত্রস্বরূপ কাজ করে থাকে। অতীতে (ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে) নিরক্ষর খাতক এবং সামান্য সাক্ষর মহাজনের মধ্যে শুধু মৌখিক চুক্তি অনুসারে লেনদেন হতো। কিন্তু সেই মৌখিক চুক্তির প্রথা উঠে গিয়ে একটা কেতাদুরস্ত লিখিত-পড়িত চুক্তির প্রথা স্থানলাভ করেছে। এই প্রথা একপেশে হিসাবের দিকটা একমাত্র মহাজনই বুঝতে পারে এবং তার হাতেই থাকে, কারণ সে বর্তমানে চাষীর মতো নিরক্ষর নয়। এর ফলে চাষী অসহায়ভাবে মহাজনের কাছে ক্রীতদাসের অবস্থায় বাঁধা পড়তে থাকে।"[২]

নিরক্ষর আদিবাসী চাষী তো মহাজনের তমসুকটিতে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যায়। কিন্তু তমসুকে কি লেখা আছে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণা তার নেই, অথচ আদালতের কাছে এই তথাকথিত আইনসম্মত রচিত তমসুকখানাই একমাত্র প্রামাণ্য এবং বিশ্বাস্য বস্তু। আদালত মহাজনের পক্ষে ডিগ্রী দেবার সময় আর অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না।

ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য অনেক দেশেও কোন না কোন প্রকার জমিদার প্রথা আছে কিন্তু এক্ষেত্রে একটা পার্থক্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের জমিদার নামে ভূস্বামী খাজনা আদায়কারী ব্যক্তিমাত্র এবং তার প্রজাপত্তনী জমিতে কৃষিকাজের ব্যাপারের সঙ্গে সে কোন সম্পর্ক রাখে না। অন্য দেশের ভূস্বামী এরকম নয়। তাদের জমিতে অন্য চাষী যে সব কৃষিকাজ করে থাকে সেই কৃষিকাজের সঙ্গে লাভালাভ নিয়ে সে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

তাছাড়া ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে জমিদারী ও মহাজনী ব্যাপারে আর একটা বৈশিষ্ট আছে। জমিদার এবং মহাজন অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন অঞ্চলের লোক হয়ে থাকেন। চাষীরা এব সমাজের লোক এবং জমিদার বা মহাজন আর এক সমাজের লোক। বিশেষভাবে আদিবাসী অঞ্চলে এই ব্যাপার সবচেয়ে বেশি সত্য। ভারতের রাজকীয় কৃষি কমিশনের রিপোর্টে এই মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

"জমিদার এবং মহাজনেরা প্রায়ই স্থানীয় আঞ্চলের লোক নয় তারা ভিন্ন সমাজের লোক। এই কারণে তার জমিদারী অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে তার মনে কোন স্বাভাবিক ব ঐতিহাসিক সম্পর্কবোধ নেই। সে তার অধিকারযুক্ত জমিদারীকে একটা সম্পত্তি মনে করে শুধু শোষণ করার জন্যেই উৎসাহিত।"

ভূমিঋণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ আইন ও ব্যবস্থা ভারতের চাষী সমাজকে কিভাবে বিপর্যস্

১. Industrial Evolution of india–Prof. D. R. Gadgil.

২.The Economic Development of India–Dr. V. Anstey.

করেছে, তার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া গেল। এই সম্পর্কে শুধু আর একটা মন্তব্য করা যায় যে, উক্ত আইন ও ব্যবস্থায় আদিবাসীরাই সমাজের সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত ও শোষিত হয়েছে, কারণ আদিবাসীরাই বিশেষভাবে অজ্ঞ, নিরক্ষর এবং দরিদ্র একটি সমাজ।

ব্রিটিশ শাসন আমলে প্রজা ও চাষীর স্বার্থ রক্ষার জন্য যে কোন আইন করা হয়নি তা নয়। ভূমি ও ঋণসংক্রান্ত বিষয়ে এই ব্রিটিশ আইন ও নীতির বিবর্তনের তিনটি ধাপ দেখা যায়।

(১) প্রথম অধ্যায় ঃ জমিদার ও মহাজনের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন প্রবর্তন।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ চাষী, প্রজা ও খাতকের স্বার্থের জন্য জমি সম্বন্ধে হস্তান্তরবিরোধী ও রক্ষামূলক আইন প্রবর্তন।

(৩) তৃতীয় অধ্যায় ঃ শোষিত চাষী, প্রজা ও খাতকের বোঝা লাঘব করার জন্য মকুবমূলক আইন পরিবর্তন।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রিটিশ নীতি দ্বারা প্রজা শোষণের ব্যবস্থাটি কায়েম করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শোষণের কুক্রিয়ার কিছুটা গতিরোধ করার চেষ্টা হয় কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। অগত্যা, তৃতীয় অধ্যায়ে, ঋণ মকুব প্রভৃতি রিলিফ বা প্রত্যক্ষ সাহায্যমূলক উদ্যোগ কিছুটা করা হয়।[১]

কিন্তু আইনঘটিত এইসব উদ্যোগ দ্বারা চাষীপ্রজার আংশিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্ভব হলেও তার যথার্থ অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব হয়নি। সহজে জমি হস্তান্তর করার সুযোগ থাকলে, গরিব চাষীপ্রজা অর্থাভাবে জমি হস্তান্তর করবেই। সুতরাং এ বিষয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবন্ধক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধান হলো, যাতে চাষীপ্রজা অর্থাভাবে না পড়ে এবং সেটা সম্ভব করার জন্য রাষ্ট্রীয় বিধানে আরও কিছু গঠনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন, যথা চাষীপ্রজাকে কৃষিকার্যের জন্য মূলধন যোগান দেওয়া, বিনা সুদে বা অল্পসুদে সরকারী ঋণ পাইয়ে দেওয়া, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভারতের সাধারণ চাষীপ্রজার যে সব সমস্যার কথা এবং তার সমাধানের কথা বলা হলো, তার প্রত্যেকটি আদিবাসী সমাজের সম্বন্ধে খাটে। আর সামাজিক অবনতির কথা ধরলে, আদিবাসীর সে সমস্যাও হরিজন সমাজের সমস্যার মতো। হরিজনদের সামাজিক উন্নতির জন্য যে পদ্ধতির উদ্যোগ প্রয়োজন, আদিবাসীর সামাজিক উন্নতির জন্যেও সেই পদ্ধতি প্রযোজ্য।

শুধু একটি বিষয়ে আদিবাসীদের সম্পর্কে বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন। আদিবাসীদের সামাজিক জীবনে এখনো গোষ্ঠীবদ্ধ গঠন রয়েছে, আদিবাসীদের রুচি অনুসারে তাদের কতগুলি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এই দিক দিয়ে তাদের সমস্যা অন্য সাধারণ চাষীপ্রজার সমস্যা থেকে পৃথক।

সুতরাং আদিবাসী সমাজের এই বিশেষ সমস্যাগুলি স্বরূপ উপলব্ধি করে, বিশেষভাবে

১. প্রথম অধ্যায়ের আইনগুলি হলো, যথা ঃ

Court of Wards Acts–Talukdar Acts–Encumbered Estates Acts, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আইনগুলি হলো, যথা ঃ

Tenancy Acts–Land Alienation Acts–Redemption of Martgages Acts, ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আইনগুলি হলো, যথা ঃ

Agriculturists Relief Acts–Usurious Loans Acts–Debtor"s Relief Acts–Money Lenders Acts–Debts concilia–

তার সমাধানের চেষ্টাই আদিবাসী সেবার প্রকৃত নীতি হওয়া উচিত। তাছাড়া সমস্ত বিষয় ধরলেও, দেখা যায় যে, আদিবাসীরা অন্যান্য অনুন্নত সমাজের (হরিজন ইত্যাদি) তুলনায় একটু বেশি দরিদ্র, একটু বেশি নিরক্ষর, একটু বেশি অবহেলিত। সেই কারণে মিঃ গ্রীগসনের অভিমত সমর্থন করেই বলা যায় যে, আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য একটু বেশি উদ্যোগ এবং একটা বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন।[১]

ভারতের আদিবাসী সমাজের সমস্যা কি, তার সমাধানের পদ্ধতি কি? বহু বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনেক বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন, অনেক বিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ এবং অনেক বিষয়ে অবিসংবাদিতভাবে এক ভারতের আদিবাসীদের সম্বন্ধে যে সব বিশেষজ্ঞের অভিমত আমরা পেয়ে থাকি, তাঁরাও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পণ্ডিত। প্রধানত তিন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের অভিমত আমরা পেয়ে থাকি—(১) নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ, (২) সরকারী অফিসার বিশেষজ্ঞ এবং (৩) সমাজ-সংস্কারক বিশেষজ্ঞ।

আরও জটিল ব্যাপার হলো, আদিবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে এক নৃতাত্ত্বিক ও আর এক নৃতাত্ত্বিকের মধ্যে, এক অভিজ্ঞ অফিসার ও আর এক অভিজ্ঞ অফিসারের মধ্যে এবং এক সমাজ-সংস্কারক ও আর এক সমাজসংস্কারের মধ্যে মতবৈষম্য আছে। পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই এই মত-পার্থক্যের প্রধান কারণ। নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, গভর্নমেণ্টের পক্ষে আদিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকের পরামর্শকেই গ্রাহ্য করা উচিত। অভিজ্ঞ সরকারী অফিসারও তাঁর অভিমতকেই প্রামাণ্যরূপে গৃহীত করার দাবি করেন। সমাজ-সংস্কারক তাঁর আদর্শগত নীতিকেই বা অগ্রাহ্য হতে দেবেন কেন? তিনিও সমভাবে তাঁর অভিমতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে জোর দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

সম্পূর্ণ সত্য না হলেও এটা কিছুটা সত্য যে, নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞেরা আদিবাসী সমাজকে তাঁর ল্যাবরেটরী উপাদান বলেই মনে করেন এবং তাঁদের দৃষ্টিটাও নিছক গবেষকের দৃষ্টি, আগ্রহটা নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

অভিজ্ঞ সরকারী অফিসারের দৃষ্টিতে প্রায়ই একটা ভ্রান্ত ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা শাসকের চক্ষু নিয়ে আদিবাসীকে নিছক শান্ত ও সুবাধ্য প্রজা হিসেবেই দেখতে চান এবং সেইজন্য তাঁদের অভিমতগুলি প্রায়ই একটা আইনবিলাসের তত্ত্ব হয়ে ওঠে।

সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনেক ক্ষেত্রে একপেশে গোঁড়ামি দেখা যায়। হয় ধর্মীয় গোঁড়ামি, নয় একটা পলিটিক্যাল গোঁড়ামি। আদিবাসী সমাজকে উন্নত করতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় আদিবাসীকে খাঁটি হিন্দু আর খাঁটি খৃস্টানে পরিণত করবার দাবি করে থাকেন।

এই জটিল মতারণ্যের মধ্যে বেচারা আদিবাসীকে কোন মতে পথ করে দিতে হবে, সেটাই প্রশ্ন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হবে না, যদি না তার আগে একটি নীতি নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ আদিবাসীর উন্নয়নের ব্যাপারে গভর্নমেণ্ট বা কোন সেবক প্রতিষ্ঠান কোন্ নীতিকে তাঁদের কর্মপন্থার নিয়ামক বলে গ্রহণ করবেন?

উত্তর হিসাবে বলতে পারা যায়—জাতীয়তার নীতি। আদিবাসী সমাজকে ভারতের

১. "Nearly everything that I Advocate fot the Gond, the Korku, the Baiga and the Bhil is necessary, if not always in the same degree, for all the castes and tribes of the backward areas, save in so far as, because of greater backwardness, inferior economic conditions or linguistic difficulties, there are problems peculiar to the aboriginals"–Grigson [The Aboriginal Problem in the Balaghat District]

জাতিদেহের অঙ্গীভূত করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, আদিবাসী তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সাধারণ বাঙালী, বিহারী, ওড়িয়া, মারাঠীর মতো হয়ে যায়, কারণ, এই রকম একরূপ হয়ে যাওয়া ভারতীয় জাতীয়তার ধর্মই নয়। বহু বৈচিত্র্য সমন্বিত হয়ে থাকাই ভারতীয় জাতীয়তার নীতি, এক কথায় বলা যায় ভারতের সামাজিক-ঐতিহাসিক নীতি। বর্তমানের দুঃখী দুর্বল অনুন্নত সাঁওতাল উন্নত সাঁওতাল হয়েই ভারতীয় সমাজজীবনে অন্য সকল সমাজের মতো দায়িত্বে, নেতৃত্বে ও সেবকত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। এক দেহে লীন করে দেবার প্রোগ্রাম গ্রহণ করলে সেটা বস্তুত সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজম হয়ে উঠবে। কোন নৃতাত্ত্বিক বা গভর্নমেন্টের অফিসার বা সমাজসংস্কারক যদি জাতীয়তার অর্থ 'এক দেহে লীন' করে দেওয়া মনে করেন, তাহলে ভুল করবেন। পোলট্রি-বিশারদদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি দিয়ে মানুষের সমাজতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানের কল্পনা গর্হিত মূঢ়তা মাত্র। ভারতের অন্যান্য সমাজের সঙ্গে আদিবাসীর বংশ সংমিশ্রণ এক বিরাট সমাজবিপ্লবের ব্যাপার। এত বিরাট একটা পরিবর্তন ঐতিহাসিক নিয়তির হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। উন্নতির একটা বিশেষ ছাঁচ কল্পনা করে নিয়ে সব আদিবাসীকে সেই ছাঁচে একসঙ্গে ঢালাই করে গোড়ে তোলা সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ মাত্র। তা না করে যাতে আদিবাসীদের ছাঁচটাই উন্নত ও যুগোচিত হয়ে গড়ে ওঠে, তার ব্যবস্থাই একমাত্র সভ্যতাসঙ্গত পদ্ধতি। বলা যায়—আত্মবিকাশের (Self Development) পদ্ধতি এবং এটাই হলো ঐতিহাসিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অনগ্রসর হলেই বরং অদূর বা দূর ভবিষ্যতে একদেহে লীন হওয়া অর্থাৎ শোণিত সমন্বয় হওয়া স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধ হবে। স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় একদেহে লীন হওয়া অর্থে এই বোঝায় যে, আদিবাসী সমাজ তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সমগ্র ভারতীয় জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত করে দিয়ে, স্বয়ং ভারতের সকল সমাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে ও সামাজিকতায় এক হয়ে গেল। কিন্তু এত বড় একটা ভবিষ্যতের পরিণামকে সম্ভব করার জন্য কোন পণ্ডিত তাঁর বর্তমান বুদ্ধির সামর্থ্য দিয়ে আজই কোন পরিকল্পনা করতে পারেন না। কাজেই বর্তমানের আদিবাসী সমাজের সমস্যা সমাধানে আত্মবিকাশের নীতিকেই একমাত্র নীতি বলে গ্রহণ করা কর্তব্য।

পূর্ব প্রসঙ্গে, আদিবাসীসমাজ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বহু অভিমত উদ্ধৃত করা হয়েছে। পরস্পরের অভিমত সম্পর্কে একটা তুলনামূলক ধারণা যাতে সম্ভব হতে পারে, তারই জন্য এই প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বিশেষজ্ঞদের অভিমত পরিবেশন করা হলো।

ডাঃ হাটন—ব্রিটিশ আগমনের বহু আগে থেকেই আদিবাসী সমাজের পরিবর্তন হয়ে আসছিল, কিন্তু সে পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত মন্দগতি। সেই কারণে আদিবাসীরা পরিবর্তনের সঙ্গে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিতে পারত, কিন্তু ব্রিটিশ আসবার পর রেল ও রাস্তা বেশি করে তৈরি হবার সঙ্গে বাইরের সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে পরিবর্তনের গতি হঠাৎ এত বেশি দ্রুত হয়ে গেছে যে, তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার সামর্থ্য আদিবাসীদের নেই। জঙ্গল সংরক্ষণ, আদিবাসী অঞ্চলে খনির কাজের প্রসার, ঘরে-তৈরি হাঁড়িয়া বা পচাই মদ বন্ধ করে আবগারী স্পিরিট মেশানো নম্বরী মদের প্রচার, জমি সম্পর্কে আইন ও ভূমিকর প্রথার প্রবর্তন, ঋণ সম্পর্কে আইন, আদিবাসী অঞ্চলে ভিন্ন অঞ্চলের লোকের বসতি বিস্তার, এই সব কারণে আদিবাসীদের সামাজিক জীবন ভেঙে যাচ্ছে।

এই অবস্থা চলতে থাকলে আদিবাসী সমাজ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মতো 'দৈহিক অবনতি ও মানসিক উৎসাহহীনতার' ('Physical decline and physical apathy') কারণে একটা দুর্বল উপজাতীয় জীবন বহন করে চলবে।

"সমস্যা সমাধানের উপায় হলো—আত্মশাসনব্যবস্থা সম্বলিত এক একটি উপজাতীয় অঞ্চল সৃষ্টি করা, যেখানে আদিবাসীরা পার্শ্ববর্তী বা চারিদিকে অবস্থিত প্রদেশগুলির অধীন না

থেকে স্বাধীনভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।"[১] আদিবাসীকে 'বিশেষভাবে রক্ষা' করার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে সব বহির্ভূত অঞ্চল (Excluded Area) সৃষ্টি করেছেন, তাতে আদিবাসীদের ভালো হয়েছে।

মিঃ শুবার্ট—মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই ধারণা হয় যে, বাইরের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আদিবাসীদের জীবনে কোন বিপর্যয় হয়নি। সম্ভবত, দূর অতীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি এখানে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে এবং বহু শতাব্দী ধরে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি পাশাপাশি চলে আসছে। বাইরের সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এই প্রদেশের আদিবাসীরা অন্য দেশের আদিবাসীর মতো লুপ্ত হয়ে যাওয়া দূরে থাক, বরং সবচেয়ে বেশি বংশ বৃদ্ধি করেছে।[২]

"বাইরের ব্যবসায়ী ও মিশনারিদের কার্যকলাপের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও অন্যান্য অনেক দেশের আদিবাসীদের জীবনে ধ্বংস ডেকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভারতের মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রয়োগ করা যায় না। এই প্রদেশের আদিবাসীদের অবস্থা আর অন্য কোন দেশের ধ্বংসশীল আদিবাসীদের অবস্থা, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আরোপ করা সঙ্গত হবে না।"[৩]

অবশ্য কতগুলি ব্যবস্থা আদিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। হাঁড়িয়ার বদলে আবগারী মদ পান করতে বাধ্য হওয়া—গাঁজা, আফিম প্রভৃতি মাদকের ব্যবহার বৃদ্ধি—কাপড়ের সংস্থান করার ক্ষমতা নেই, তবু কাপড় পরার অভ্যাস। নরবলি, ডাইনী পোড়ানো ইত্যাদি বীভৎস প্রথা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, তবে আদিবাসী সমাজে জোর করে ধরে নিয়ে কোন মেয়েকে বিয়ে করার প্রথা বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে না। ঝুম চাষও রহিত করা ঠিক নয়।

কিন্তু উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজের যতটা 'ক্ষতি' হয়েছে, তার তুলনায় 'লাভ' হয়েছে অনেক বেশি। গোষ্ঠী সর্দারদের স্বৈরচারী প্রভুত্বের তুলনায় একটা আইনবদ্ধ গভর্নমেন্টের শাসন ঢের ভালো ব্যবস্থা।

প্রতিবেশী সভ্যতর অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে চললে আদিবাসীদের উন্নতি হবে।

শরৎচন্দ্র রায়—দেখা গেছে সমতলবাসী ভুঁইয়া সমাজ ভিন্ন সমাজের সভ্যতর প্রতিবেশীর সংস্পর্শে এসে উন্নত হয়েছে, যদিও এর ফলে তাদের আদিম তেজস্বিতা ('Primitive Virility') কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পাহাড়ী ভুঁইয়া সমাজের তুলনায় সমতলবাসী ভুঁইয়া উন্নত। সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে ভুঁইয়াদের মধ্যে কোন সামাজিক অসুবিধা অথবা মনের দিক দিয়ে কোন নৈরাশ্যবাদ (Pessimism) দেখা দেয়নি।[৪]

খাড়িয়া সমাজের মধ্যে দুধ-খাড়িয়া গোষ্ঠী হিন্দু ও খৃস্টান সমাজ এবং সভ্যতার খুব

১. "The solution of problem would appear to be to create self-Governing tribal areas with free power of self-determination in regard to surrounding or adjacent provincial units."–Dr. Hutton [Census of India Report,1931.]

২. "So far from the race dying out as has happended to the aborigines in other parts of the world, it has continued to form the most fecund element in the provinces"–Shoobert [Census of India, C.P.& Berar Report, 1931.]

৩. শুবার্ট—উক্ত রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

৪. The Hill Bhuiyas of Orissa–S.C. Roy.

ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু এর ফলে এই দুধ-খাড়িয়া সমাজের উপজাতীয় সংস্কৃতি লুপ্ত হয়নি। বরং তারা হিন্দু সংস্কৃতি থেকে এমন সব প্রথা এবং উপাদান গ্রহণ করেছে, যা তাদেরই উপজাতীয় সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানরূপে একাঙ্গীভূত হয়েছে।[৫]

মিশনারিদের উদ্যোগে প্রচারিত খৃস্টধর্মের সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজের মোটের ওপব ভালোই হয়েছে। ব্রিটিশ আইনের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের জীবনে তার প্রতিক্রিয়ার ফল খারাপ হয়েছে। কতগুলি কুপ্রথা দূর হয়েছে ঠিকই কিন্তু আদিবাসীরা তাদের জমি হারিয়েছে এবং তাদের অনেক ঐতিহ্যপুষ্ট অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ডাঃ ডি. এন. মজুমদার--কোল্হান অঞ্চলের হো সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, তারা পূর্ব-পুরুষদের তুলনায় অল্পায়ু ও দুর্বল দেহ হয়েছে. যদিও বংশবৃদ্ধির হার আগের তুলনায় বেশি। ঔদাসীন্য, উৎসাহহীনতা, নৈরাশ্যবাদ প্রভৃতি মনোবলহীনতার যে সব লক্ষণ আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেগুলি অবশ্য বেশি শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছায়নি। নতুন পরিপার্শ্ব ও পরিবর্তন বরণ করে নিয়ে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হো সমাজ শিখেছে।[৬]

আদিবাসীদের দুরবস্থার কারণ ঃ

(১) আবগারি আইন, চোলাই প্রথার (Outstill System) ফলে আদিবাসীদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস বেড়েছে।

(২) আদিবাসীদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের কর্তব্যচ্যুত করে সরকারী শাসন কর্মচারী নিয়োগ গোষ্ঠীগত জীবনের সংহতি নষ্ট করেছে।

(৩) যে সব জমিতে আদিবাসীরা ঝুম চাষ করত সে সব জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

(৪) আদিবাসী অঞ্চলের জমির নিচে খনিজ পদার্থ থাকলেও, আদিবাসীরা মোটা টাকা জমা দিয়ে লাইসেন্স না নিলে সে সব খনিজ তুলতে পারে না।

(৫) ঝুম চাষের পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, লাঙ্গল চাষ পদ্ধতিতে আদিবাসীরা অভ্যস্ত নয়।

(৬) ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে জোর করে মেয়ে ধরে নিয়ে বিয়ে করা ('Marriage by capture') নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৭]

(৭) বর্তমান হাট, বাজার ও মেলা প্রভৃতি ব্যাপারে আকৃষ্ট হবার ফলে আদিবাসীদের আর্থিক ধ্বংস হয়ে চলেছে।

(৮) যে ধরনের শিক্ষা (Education) বর্তমানে আদিবাসীদের দেওয়া হচ্ছে, তাতে ভালোর বদলে ক্ষতি বেশি হচ্ছে।

(৯) সরকারী বিচার বিভাগের রাজকর্মচারীরা আদিবাসীদের সামাজিক প্রথা, ভাষা এবং মানসিক গঠন সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে আদিবাসীদের বাদবিবাদে ন্যায়সঙ্গত বিচার করতে পারেন না।

(১০) মিশনারিদের কার্যকলাপের ফলে আদিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে।

(১১) সভ্য সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে আদিবাসীদের মধ্যে নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব হয়েছে। এই সব রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে তাদের ঐতিহ্যগত ভেষজ-বিধির মধ্যেও কোন ব্যবস্থা নেই।[৮]

৫. The Kharias–S.C.Roy & R. C. Roy.

৬. A tribe in Transition–D.N. Majumder.

৮. Primitive Society & Its Discomforts–D.N.Majumder. (নিখিল ভারত জনসংখ্যা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

এই সব কারণে ভারতের আদিবাসী সমাজের বংশাবনতি এবং জনসংখ্যা হ্রাসের লক্ষণ ('tendency to decline') দেখা দিয়েছে।

ভাই অমৃতলাল ঠক্কর--আদিবাসী সমাজ প্রায় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার পর্যায়ে রয়েছে। এদের সমস্যা হলো ঃ (১) দারিদ্র্য, (২) নিরক্ষরতা, (৩) স্বাস্থ্যহীনতা, (৪) আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের দুর্গম্যতা, (৫) শাসনব্যবস্থার ত্রুটি, (৬) নেতৃত্বের অভাব।

আদিবাসীরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির, তার ওপর ঝুম চাষ, মদ্যপান, বেগারপ্রথা ইত্যাদির জন্য নিতান্ত দরিদ্র সমাজে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে ম্যালেরিয়া এবং যৌনরোগের প্রাবল্য দেখা যায়।

সভ্য সমাজের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত। আদিবাসী অঞ্চলে পথঘাটের প্রসার, শিল্প ও বাণিজ্যের পত্তন ও শিক্ষাবিস্তার হওয়া উচিত। গোষ্ঠীগত পঞ্চায়েতগুলিকে পুনর্জীবিত করতে হবে। প্রাদেশিক আইন সভায় আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বের জন্য আসনসংখ্যা আরও বেশি সংরক্ষিত করতে হবে। আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সাধারণ শাসন কর্তৃত্বের বহির্ভূত করে রাখার নীতি আদৌ সমর্থন করতে পারা যায় না। অ-খৃস্টান আদিবাসী সমাজে এমন শিক্ষিত ও যোগ্য লোকের সংখ্যা কম, যাঁরা তাঁদের সমাজের নেতৃত্ব করতে পারেন, সেই কারণে অন্য সমাজের সেবকমনোভাবাপন্ন যোগ্য কর্মীদেরই আদিবাসী সমাজের নেতৃত্ব নিতে হবে, যতদিন না আদিবাসী সমাজ থেকেই যোগ্য নেতৃদলের আবির্ভাব সম্ভব হয়।

আদিবাসী সমাজকে ভারতের অন্যান্য সমাজ থেকে স্বতন্ত্র করে রাখা চলতে পারে না। "আদিবাসী সমাজকে দুর্গম পাহাড় ও অরণ্য অঞ্চলে স্বতন্ত্র করে ও আবদ্ধ করে রাখার অর্থ বলতে গেলে কতগুলি নৃতত্ত্ববিলাসী পণ্ডিতের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য আদিবাসীকে তত্ত্ব পরীক্ষার উপাদানের মতো কাঁচের পাত্রে আবদ্ধ করে রাখার ব্যাপার।"[৯]

আদিবাসী সমাজকে আমাদের দেশেরই সভ্য সমাজের একটি অংশরূপে পরিণত করতে হবে। দেশের কোন একটা প্রচলিত ধর্মের অবলম্বী সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্যে নয়, দেশের সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অন্য সকল অনগ্রসর সমাজের সঙ্গে তাঁদেরও সমান সুযোগ এবং অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আদিবাসীকে স্বতন্ত্র করে রাখার থিওরি একটা ক্ষতিকর থিওরি। এ থিওরি আমাদের জাতীয় সংহতির মূলে গিয়ে আঘাত করছে।[১০]

মিঃ ভেরিয়েব এলুইন ঃ আদিবাসী সমাজকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে তিনটি শ্রেণী ভাগ করা যায়।

প্রথম, জমিদার ভূস্বামী ও সর্দার শ্রেণীর আদিবাসী যারা হিন্দু সমাজে মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করে একটা অভিজাত সমাজে পরিণত হতে পেরেছে এবং যাদের আর্থিক অবস্থাও ভালো।

দ্বিতীয়, যারা হিন্দু সমাজের সান্নিধ্যের ফলে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেই সব শ্রেণীর আদিবাসী।

তৃতীয়, যারা পাহাড় ও জঙ্গল অঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত জীবনযাপন করছে।

---

৯. The problem of Aborigines-A.V. Thakkar.

১০. The aborigines should from part of the civilized communities of our country not for the purpose of swelling the figures of this religion or that, but to share with the advanced communities the privileges and duties on equal terms in the general social and political life of the country-A. V. [The problem of Aborigines].

উক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিবাসীদেরই মনোবলহীনতা বা স্নায়বিক হানি (Loss of nerve) হয়েছে, তাদের মন একটা ব্যর্থতাবোধ দ্বারা পীড়িত। এর কারণ হলো (১) আবাদ জমি হাতছাড়া হাওয়া, (২) জঙ্গলের সামগ্রী আহরণের অবাধ অধিকার বিনষ্ট হওয়া, (৩) অর্থনৈতিক শোষণ, (৪) উপজাতীয় শিল্পকর্ম বিনষ্ট হওয়া এবং সৃষ্টি করার আগ্রহের ব্যর্থতা, (৫) আইনের প্রকোপে পড়ায় নৈতিক ও স্নায়বিক অবসাদ, (৬) ধর্মীয় শিকার-উৎসবের প্রথা লুপ্ত হওয়া, (৭) ঘরে মদ তৈরির পুরাতন পদ্ধতিকে উচ্ছেদ করে দেওয়া, (৮) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন, (৯) অন্য ধর্মের সঙ্গে আদিবাসীর উপজাতীয় ধর্মের সংস্পর্শে এবং (১০) আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন বাইরের সঙ্ঘের উদ্যোগে সংস্কারমূলক আন্দোলন।[১]

প্রথম শ্রেণীর আদিবাসী অর্থাৎ অভিজাত সমাজ সংখ্যায় খুবই কম। এদের ওপর অপরের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ জয়লাভ করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দুত্ব প্রভাবিত মনোবলহীন আদিবাসী সমাজের জনসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, সংখ্যায় প্রায় দুই কোটি। তৃতীয় শ্রেণীর আদিবাসী সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে দূরান্তরিত, এই বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত সমাজের আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ।

প্রথম শ্রেণী সম্পর্কে কোন সমস্যা নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর সমস্যা হলো প্রকৃত আদিবাসী সমস্যা। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সমস্যার রূপও পরস্পর থেকে বিভিন্ন, সুতরাং, সমাধানের পদ্ধতিও বিভিন্ন হওয়া উচিত।

"যে দু' কোটি আদিবাসী (অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিবাসী) কোনরকম সভ্যতার সংস্পর্শে ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে, তারা নিকট ভবিষ্যতে সেই সংস্কৃতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হবে। সুতরাং এই শ্রেণীর আদিবাসীর সমস্যা ভারতের অন্যান্য চাষীসমাজের সমস্যা থেকে খুব বেশি পৃথক নয়।...এটা ভারতের সাধারণ পল্লী উন্নয়নের সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।...এই দু' কোটি অর্ধ-সভ্যতাসম্পন্ন আদিবাসীকে ভারতের সাধারণ জনসমাজের সঙ্গেই স্থান গ্রহণ করতে হবে।"[২]

প্রকৃত সমস্যা হলো তৃতীয় শ্রেণীর আদিবাসীকে নিয়ে। এদের সভ্য করা বা 'উন্নয়ন' করার চেষ্টা ভ্রান্ত পথ, সেটা করলে এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এদের সমস্যা সমাধানের পথ হলো 'ন্যাশনাল পার্ক প্রতিষ্ঠা'। এই ৫০ লক্ষ বন্য আদিবাসীর জীবনে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ না করে তাদের বিষয় সম্পূর্ণভাবে তাদেরই হাতে ছেড়ে দিতে হবে। গভর্নমেণ্ট শুধু এক একটি বন্য অঞ্চলকে 'সম্পূর্ণ আদিবাসী এলাকা' রূপে নির্দিষ্ট করে দেবেন, যেখানে আদিবাসীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের খাঁটি উপজাতীয় সংস্কার ও প্রথা নিয়ে অবাধভাবে জীবনযাপন করতে পারবে।

ডাঃ এস. জি. ঘুর্য্যে ঃ আদিবাসী সমাজ ঐতিহাসিক সত্য অনুসারে ভারতীয় সমাজ। ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুসারে আদিবাসীরা হলো প্রায়-হিন্দু সংস্কৃতির মানুষ। বর্তমানের অশিক্ষিত, দরিদ্র ও নিপীড়িত আদিবাসীসমাজ ভারতের কোটি কোটি দুঃস্থ কৃষকসমাজের মতোই ; জমিদার, মহাজন, সরকারী কর্মচারী ও আইন দ্বারা শোষিত আদিবাসী সমাজকে 'অবনত হিন্দু'ই (Backward Hindu) বলা যেতে পারে। আদিবাসীদের প্রত্যেকটি সমস্যা বিচার করলে দেখা যায় যে, এঁদের অর্থনৈতিক সমস্যা হলো সাধারণ ভারতীয় কৃষকের অথবা

১. Loss of nerve–Elwin.

২. The Aboriginals–ElWin.

গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা হলো হিন্দু সংস্কৃতির সমস্যা।[৩]

'বহির্ভূত এলাকা' সৃষ্টি করে অথবা 'ন্যাশনাল পার্ক' সৃষ্টি করে কৃত্রিম উপায়ে আদিবাসীর সমস্যা সমাধান করা যায় না। ভারতের সাধারণ সমস্যার অংশ হিসেবেই আদিবাসীর সমস্যার সমাধান করলে সেটাই সর্বোত্তম সমাধান হবে।[৪]

কয়েকজন বিশেষজ্ঞের যে অভিমত উল্লিখিত হলো, তা থেকে আদিবাসীদের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে প্রধানত দু'রকমের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। একদল বিশেষজ্ঞকে বলা যায়--স্বাতন্ত্র্যবাদী (Isolationist)। এঁরা মনে করেন, ভারতের সভ্যসমাজের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের ক্ষতি হয়েছে, সুতরাং আদিবাসী সমাজকে স্বতন্ত্রভাবে থাকবার একটা ব্যবস্থা করা বিধেয়। বিশেষ করে ইংরেজ অফিসার বিশেষজ্ঞ এবং কতিপয় ইংরেজ নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের এই অভিমত।

আর একদল বিশেষজ্ঞকে বলা যায়--সংমিশ্রণবাদী (assimilationist)। এঁরা মনে করেন, সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের উন্নতি হয়েছে এবং যাতে আদিবাসী এই সভ্য সমাজের সজীব অঙ্গ হিসাবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি লাভ করে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে, তারই ব্যবস্থা করা উচিত। বিশেষ করে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক, সমাজ সংস্কারক ও কংগ্রেসের জাতীয় নীতি এই অভিমতের সমর্থক।

বহির্ভূত অঞ্চলের ইতিহাস

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন (অর্থাৎ Indian Statutory Commission) ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা তদন্ত করে নতুন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারতে আসেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট নিজ নিজ প্রদেশের শাসনব্যবস্থার ইতিহাস, পূর্ব-প্রচলিত শাসন-সংস্কারের পরিণাম ও কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সম্বন্ধে কমিশনের নিকট মেমোরাণ্ডাম বা স্মারকলিপি দাখিল করেন। আশ্চর্যের বিষয়, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেণ্টের মেমোরাণ্ডামে আদিবাসীদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। এই তিন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের প্রদত্ত বিবরণ পড়ে মনে হবে যে, তাঁদের প্রদেশে আদিবাসী সমস্যা বলে কোন ব্যাপারই নেই। অথচ ঐসব প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় আদিবাসী তো আছেই, তাছাড়া কতগুলি তফসিলভুক্ত অঞ্চলও ছিল। বাঙলা ও মাদ্রাজ গভর্নমেণ্টের মেমোরাণ্ডামে আদিবাসীদের সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করা হয়। একমাত্র বিহার গভর্নমেণ্টের মেমোরাণ্ডামে আদিবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিবরণ দেওয়া ও আলোচনা করা হয়। বিহার গভর্নমেণ্ট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আদিবাসীদের জন্য বিশেষ রক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। কিন্তু রক্ষামূলক ব্যবস্থার সীমা এবং প্রসার কতটা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মন্ত্রিসভার সঙ্গে গভর্নর একমত হননি। সাইমন

৩. The main problem of the aborigines, therefore, is very similar to the problems of non-aboriginal agriculturists–Ghurye [The Aborigines–'so-called'–And their Future.]

৪. It is, therefore, best tried to be solved along with the general problems. The obvious method of artificially segregating the so-called aborigines may prove to be a retrograde step rather than a solution affording scope for progress–Ghurye.

কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী অনগ্রসর অঞ্চল (Backward Tract) কথাটা বদলে দিয়ে 'বহির্ভূত অঞ্চল' (Excluded Area) আখ্যা দেওয়া হয়।

কমিশন আদিবাসীদের সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য, প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেগুলি বলতে গেলে সাম্রাজ্যবাদী নীতির একেবারে নিরাবরণ আত্মপ্রকাশ।

কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া যায় ঃ অনগ্রসর অঞ্চলগুলির মধ্যে দু'-একটি আঞ্চল বাদ দিয়ে বাকি সবগুলিকেই সাধারণ শাসনতন্ত্রের বাইরে রাখা উচিত। অনগ্রসর অঞ্চলের আদিবাসীরা যোগ্যতার ক্ষেত্রে যে স্তরে পৌঁছতে পেরেছে, তাতে তারা সাধারণ শাসনতন্ত্রের মধ্যে থাকবার যোগ্য নয় বলেই কমিশন মনে করেন। আদিবাসীকে তার পূর্বপুরুষের অনুসৃত পদ্ধতিতে জীবনযাপন করবার (Traditional methods of livelihood) স্বাধীনতা দিতে হবে এবং জমির স্বত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিতে হবে।

কমিশন আরও বলেন ঃ "দ্রুত রাজনৈতিক উন্নতির ওপর আদিবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে না। অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সাহায্যে দরদের সঙ্গে তাদের ওপর নজর দিলেই তারা সুখী হতে পারবে। আদিবাসীদের সুখী করবার আর একটা উপায় হলো তাকে তার প্রতিবেশীর কাছে অর্থনৈতিক অধীনতা থেকে রক্ষা করা।"

কমিশন সুপারিশ করেন—সম্পূর্ণভাবে বহির্ভূত অঞ্চলগুলি (Wholly Excluded Areas) সপরিষদ গভর্নর-জেনারেলের অধীনে তাঁর এজেন্টদের (অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্নরদের) মারফৎ শাসিত হবে। কিন্তু আংশিকভাবে বহির্ভূত অঞ্চলগুলি (Partially Excluded Areas) প্রাদেশিক আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করবে এবং প্রাদেশিক গভর্নর সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট হিসাবে 'মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করবেন।' আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল থেকে লব্ধ সমস্ত রাজস্ব ঐ অঞ্চলে ব্যয় করা হবে, উপরন্তু কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কাছ থেকেও অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হবে।

দেখা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ বহির্ভূত ও আংশিক বহির্ভূত—এই দুই অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক নীতির মধ্যে পার্থক্য খুবই সংকীর্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই চরম ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের এজেন্ট গভর্নরদের হাতে। আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে গভর্নর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করবার সৌজন্যটুকু মাত্র দেখাবেন, পরামর্শ গ্রহণ করা বা না-করা তাঁরই ইচ্ছা ও অধিকার।

কমিশনের মন্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে অভিসন্ধিপূর্ণ বলে যা মনে হয়, সেটা হলো আদিবাসীকে সস্নেহে পূর্বপুরুষের অনুসৃত জীবনযাত্রার প্রাচীন পদ্ধতির কোলে বসিয়ে চির-শিশু করে রাখবার সঙ্কল্প। এই পলিসিকেই সাম্রাজ্যবাদী পলিসির চরম বলে মনে করবার কারণ আছে, প্রসঙ্গক্রমে তারই বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম অধ্যায়েও এই নীতি ছিল, কিন্তু কমিশনের মন্তব্য থেকে মনে হয়, সেই নীতিকে আরও ভালো করে সফল করবার জন্যেই ১৯২৯ সালে আর একটা নতুন উদ্যোগের সঙ্কল্প করা হয়। কমিশনের মন্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আদিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর হলো প্রতিবেশী হিন্দু সংস্পর্শ। হিন্দুরাই আদিবাসীকে অর্থনৈতিক পরাধীনতায় চেপে রেখেছে, হিন্দুর দ্বারাই আদিবাসীর ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে ইত্যাদি। সুতরাং ব্রিটিশের কূটনৈতিক অভিপ্রায়টি অতি সহজেই ধরা পড়ে যায়, আদিবাসী অঞ্চলকে 'বহির্ভূত' করার উদ্দেশ্য বস্তুত হিন্দু সমাজের প্রভাব থেকে বহির্ভূত করার উদ্দেশ্য। কমিশন নিজেই নির্লজ্জভাবে বলেছেন যে, রাজনৈতিক উন্নতির ওপর আদিবাসীদের সুখ-সন্তোষ নির্ভর করে না। সুতরাম বহির্ভূত করার উদ্দেশ্য বস্তুত রাজনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্র থেকেই বহির্ভূত করার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কি হতে পারে? কমিশনের মানসিক রহস্য বিশ্লেষণ করে এই তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে যে, হিন্দু প্রভাব থেকে বহির্ভূত করা আর রাজনৈতিক উন্নতি থেকে বহির্ভূত করা

একই কথা এবং বলা বাহুল্য, এটাই বিশেষভাবে সত্য।

কমিশনের রিপোর্ট ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট দাখিল হওয়ার পরে নতুন ভারত গভর্নমেণ্ট বিল আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়। এই বিলের ৯১ নং ধারার সঙ্গে বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা দেওয়া হয়। তালিকাটি এই—

(ক) সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল—(১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (সদিয়া, বলিপাড়া ও লখিমপুর) অঞ্চল ; (২) নাগা পাহাড় জেলা ; (৩) লুসাই পাহাড় ; (৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম।

(খ) আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল—(১) উত্তর কাছাড় পাহাড় ; (২) গারো পাহাড় জেলা ; (৩) মিকির পাহাড় (নওগাঁ এবং শিবসাগর জেলায় অবস্থিত অংশ) ; (৪) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ব্রিটিশ অংশ (শিলং ক্যান্টনমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা বাদে) ; (৫) অঙ্গুল জেলা ; (৬) ছোটনাগপুর বিভাগ ; (৭) সম্বলপুর জেলা ; (৮) সাঁওতাল পরগণা জেলা ; (৯) দার্জিলিং জেলা ; (১০) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ (মিনিকয় সমেত) ; (১১) গঞ্জাম, ভিজগাপাট্টম ও গোদাবরী এজেন্সি।

উল্লিখিত তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পূর্ব-প্রচলিত 'অনগ্রসর অঞ্চলের' তালিকা থেকে কয়েকটা অঞ্চলের নাম বাদ দিয়ে এই নতুন বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা করা হয়েছে। স্পিতি ও লাহৌরেলর নাম এই তালিকায় নেই, এই দুই অঞ্চলকে সাধারণ শাসিত অঞ্চলের মধ্যে বদলি করে দেওয়া হয়েছে।

ভারত গভর্নমেণ্ট বিলের সঙ্গে সংযুক্ত বহির্ভূত অঞ্চলের এই তালিকা সম্পর্কে কমন্স সভার কমিটিতে যে আলোচনা হয়, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জি. এস. ঘুর্য়োর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হলো।[১] বক্তাদের অভিমতগুলি বস্তুত বহু সাম্রাজ্যবাদী রহস্যের পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছে।

কর্ণেল ওয়েজউডের অভিমত ঃ কোন কোন হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতে আদিবাসীদের সংখ্যা ৪ কোটি ৩০ লক্ষ। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট বিলে যে বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৩০ লক্ষ। এই ব্যবস্থা ভালো নয়। আরও বেশি সংখ্যায় আদিবাসীকে রক্ষিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে। শিক্ষিত ভারতীয়েরা চাইছে যে, আদিবাসীদের ওপর শাসনব্যবস্থা ভারতীয়ের দ্বারাই পরিচালিত হোক। আদিবাসীকে সস্তায় মজুর করার জন্যই শিক্ষিত ভারতীয়েরা এই মতলব করেছে। অনগ্রসর আদিবাসীর উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে ভরসার আশ্রয় হলো খৃস্টান মিশনারি সমাজ। আদিবাসীদের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তাকে রক্ষা করা এবং উন্নত করাই যাঁদের একমাত্র কাম্য, সেই সব নৃতত্ত্ববিদ এবং আর যাঁরা আছেন, তাঁদের দিয়ে (ইংরাজ অফিসার ও খৃস্টান মিশনারী?) আরও বিশ-ত্রিশ বছর আদিবাসীদের ওপর শাসন চালাতে হবে। যে সভ্যতার আক্রমণে আদিবাসীরা ধ্বংস হতে চলেছে, সেই সভ্যতার (হিন্দু?) আক্রমণ থেকে তাদের বাঁচাতে হবে। প্রাদেশিক গভর্নরদের দিয়েও বহির্ভূত অঞ্চল শাসন করানো উচিত নয়, কারণ তার ফলে প্রাদেশিক প্রভাবে বহির্ভূত অঞ্চলগুলি ভারতের সাধারণ অঞ্চলগুলির মতন অবস্থায় এসে পড়বে। আমি চাই, অনগ্রসর আদিবাসীকে খাস ব্রিটিশ পরিচালনায় রাখার ব্যবস্থা করা হোক্।

ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ঃ গভর্নমেণ্ট জানেন যে, ভারতের সভ্য সম্প্রদায়ের জন্য রচিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধানগুলি অনগ্রসর আদিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দিলে বিপদ আছে।

কমিশনের সদস্য মিঃ এডওয়ার্ড ক্যাডোগান (Mr. Edward Cadogan) বহির্ভূত অঞ্চলের একটি সংশোধিত তালিকা উত্থাপিত করেন। এই তালিকাটি বৃহৎ। মিঃ ক্যাডোগান

১. The Aborigines and their Future–G. S. Ghurye.

তালিকা নির্দিষ্ট অনেকগুলি আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকার সঙ্গে যুক্ত করেন। তাছাড়া প্রদেশের সাধারণ শাসিত অঞ্চল থেকে কতগুলি নতুন অংশকেও সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকাভূক্ত করেন। আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের যে সংশোধিত তালিকা মিঃ ক্যাডোগান প্রস্তুত করেন, সেটা সবই সাধারণ অঞ্চলের অংশ নিয়ে তৈরি এবং সংখ্যায় অনেক। মিঃ ক্যাডোগান যে সব অঞ্চলকে আংশিক বহির্ভূত বলে তালিকাভূক্ত করতে চাইলেন, সেগুলি পূর্বে কোনকালে অনগ্রসর অঞ্চল বলে অথবা তফসিলভূক্ত অঞ্চল বলে ঘোষিত হয়নি। মেজর অ্যাটলি (ইনিও কমিশনের সদস্য ছিলেন) এই বৃহৎ সংশোধিত তালিকা সমর্থন করেন ঃ

"যদি আমাদের কোন ভুল করতে চায়, তবে যত বেশি সম্ভব অঞ্চলকে তালিকাভূক্ত করেই সে ভুল হোক, কিন্তু তালিকা থেকে অঞ্চলের নাম বাদ দিয়ে বা কমিয়ে দিয়ে যেন সে ভুল না করি।"

উইং কম্যাণ্ডার জেমস্ সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন—"ভারতের সাধারণ অধিবাসীদের থেকে আদিবাসীরা বিশিষ্টভাবে ভিন্ন একটি জাতি। যত বেশি সংখ্যায় আদিবাসীকে বহির্ভূত অঞ্চলের গণ্ডির মধ্যে আনতে পারা যায়, ততই ভালো। এই সব অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে হয় ইউরোপীয়ানদের দ্বারাই শাসন করাতে হবে, অথবা ইউরোপীয়ানদের পরিচালনাধীনে ভারতীয়ের দ্বারা।"

এইবার আর একদল বিশেষজ্ঞের অভিমত বিবৃত করা যাক্, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদী হয়েও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান না হারিয়ে ঐতিহাসিক সত্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই মন্তব্য পেশ করেন।

স্যার রেজিনাল্ড ক্রাডক (Sir Reginald Craddock)—"সম্বলপুরের মতো ছোট একটা জেলাকে বহির্ভূত অঞ্চলে যুক্ত করার কোন অর্থ হয় না।"

লর্ড পার্সি (Lord Percy) ঃ এই সব অনগ্রসর অঞ্চল বা বহির্ভূত অঞ্চলগুলি বস্তুত এক-একটা উপেক্ষিত উদ্যানের মতো। যে সব অঞ্চলগুলিতে ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে, সেই অঞ্চলের কোন অংশকে বহির্ভূত অঞ্চলে যুক্ত করা উচিত নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, এমন কতগুলি অঞ্চলকে 'আংশিক বহির্ভূত' অঞ্চলে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে শতকরা পঁচিশ থেকে আরম্ভ করে শতকরা ষাট পর্যন্ত সাধারণ আদিবাসী রয়েছে, যারা আদিবাসী নয়। সমস্যাটা খুবই কঠিন আপনাদের পরিষ্কারভাবে নীতি ঠিক করে নিতে হবে। আদিবাসী সমাজকে পুরাতন কাসুন্দির (Cold Storage) মতো পরিবর্তনহীন করে রাখা, অথবা চারিদিকের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সমন্বিত (Assimilation) হবার জন্য পথ দেখিয়ে দেওয়া—এই দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন্‌টা কতখানি আপনারা করতে চান?"

মিঃ বাটলার (Mr. Butler, Under Secretary of State for India) ঃ

"যদি এই সময়ে আমরা বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখার নীতি (Ring Fence Policy) গ্রহণ করি এবং বেশি করে নতুন নতুন অঞ্চলকে 'বহির্ভূত অঞ্চলে' সরিয়ে নিয়ে আসি, তাহলে ফল ভালো হবে না। ভবিষ্যৎ ভারতের সাধারণ রাষ্ট্রতন্ত্রে আদিবাসীদের পক্ষে অন্য সকলের সঙ্গে সমভাবে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা দূরে সরে যাবে। আদিবাসীকে ব্যাপকভাবে সরিয়ে রাখার (Segregation) নীতি আদিবাসীর পক্ষে ক্ষতিকর হবে।"

আর্ল উইন্টারটন (Earl Winterton) ঃ

"বিচ্ছিন্নতার (Isolation) চেয়ে সংমিশ্রণের (Assimilation) নীতিতেই আমি বেশি বিশ্বাসী। আমার মনে হয়, আপনারা এইটা চাইবেন না যে আদিবাসী অঞ্চলগুলি এক-একটা আধুনিক হুইপস্নেড (Whipsnade) হয়ে উঠুক, যেখানে গিয়ে আপনারা মনের সুখে বলবেন—এই যে এখানে কেমন বিচিত্র একটা নরগোষ্ঠী রয়েছে, যারা ভারতবর্ষের অন্যান্য সমাজ থেকে হাজার বছরের ব্যবধানে পৃথক। আমি মনে করি, তালিকাভূক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়া

আর নতুন কোন অঞ্চলকে 'বহির্ভূত' করা উচিত হবে না।"

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত দ্বারাই প্রভাবিত হলেন। ভারত গভর্নমেণ্ট বিলের তালিকাটি প্রত্যাহৃত হয় এবং প্রস্তাব করা হয় যে, পার্লামেণ্টের কাছে যে সব তথ্য উপস্থিত করা হবে, তার ওপর ভিত্তি করে নতুনভাবে সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

ভারত গভর্নমেণ্ট নতুন করে বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকা তৈরির উদ্যোগ করেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে পেশ করার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট শেষ পর্যন্ত যে তালিকা প্রস্তুত করেন, সেটা এই দাঁড়ায়—

(ক) সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল—(১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল ; (২) নাগা পাহাড় জেলা ; (৩) লুসাই পাহাড় জেলা ; (৪) উত্তর কাছাড় পাহাড় ; (৫) পার্বত্যচট্টগ্রাম ; (৬) স্পিতি ও লাহৌল (কাশ্মীর) ; (৭) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ (মিনিকয় সমেত) ও আমিনদিভি দ্বীপ ; (৮) হাজরা জেলার উচ্চ (upper) টানাওয়াল।

(খ) আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল—(১) গারো পাহাড় জেলা ; (২) মিকির পাহাড় ; (৩) খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ব্রিটিশ অংশ (শিলং মিউনিসিপ্যালিটি ও ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকা বাদে) ; (৪) দার্জিলিং জেলা ; (৫) ময়মনসিংহের শেরপুর ও সুসঙ্গ পরগনা ; (৬) দেরাদুন জেলার জৌনসার বাওয়ার পরগনা ; (৭) মির্জাপুর জেলায় অবস্থিত কাইমুর গিরিমালার দক্ষিণ অংশ ; (৮) ছোটনাগপুর বিভাগ ; (৯) সাঁওতাল পরগনা জেলা ; (১০) অঙ্গুল জেলা ; (১১) সম্বলপুর জেলা ; (১২) গঞ্জাম-ভিজাগাপট্টম ও গোদাবরী এজেন্সি ; (১৩) রায়পুর জেলায় অবস্থিত ঘাড়িয়ার জমিদারী সার্ভিস ; (১৪) বিলাসপুর জেলায় অবস্থিত পদমপুর ও সাতগড় অঞ্চল ; (১৫) চন্দা জেলায় আহিরি জমিদারী ও গড়চিরোলি তহশীল ; (১৬) চিন্দোয়ারা জাগীরদারী ; (১৭) মান্দলা জেলা ; (১৮) দ্রুগ জেলার আউন্ধি, কোরাচা, পানা, বারাস এবং অম্বাগড় চৌকি জমিদারী ; (১৯) বলাঘাট জেলার বৈহার তহশীল ; (২০) অমরাবতী জেলার মেলাঘাট ; (২১) বেতুল জেলার ভঁইসডেহি তহশীল ; (২২) নবাবপুর পেঠা, তালোডা, নন্দুরবার ও শাহাদা তালুক—পশ্চিম খান্দেশের আকরানি মহল ও মেওয়াসি অঞ্চল ; (২৩) পূর্ব খান্দেশের সাতপুরা পাহাড়ের সংরক্ষিত জঙ্গল অঞ্চল ; (২৪) নাসিক জেলার পেইণ্টামহাল ও কল্যাণ তালুক ; (২৫) থানা জেলার মোখাড়া ও উম্বেরগাঁও পেঠা এবং ডাহানু ও শাপুর তালুক ; (২৬) পাঁচ মহল জেলার দোহাদ তালুক ও ঝালোড় মহাল।

এই তালিকা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় (Government of India Order, 1936)। সম্পূর্ণ ও আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের জনসংখ্যা হয় দেড় কোটি।

দেখা যাচ্ছে যে, সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকায় বিরুদ্ধবাদী মিঃ ক্যাডোগানের তালিকার সাথে শুধু দু'টি নতুন নাম যুক্ত করা হয়েছে (স্পিতি ও লাহৌল)। আর দু'টি নতুন নাম, উত্তর কাছাড় পাহাড় ও লাক্ষাদ্বীপ ভারত গভর্নমেণ্ট বিলের মধ্যেই আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল হিসাবে উল্লিখিত ছিল, নতুন তালিকায় এই দু'টি অঞ্চলকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল করা হয়েছে।

কিন্তু আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের যে নতুন তালিকা দেখা যাচ্ছে তাতে ভারত গভর্নমেণ্ট বস্তুত মিঃ ক্যাডোগানের সাধ অনেকখানি পূর্ণ করেছেন। বোম্বাই প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের আপত্তি সত্ত্বেও কতগুলি নতুন অঞ্চলকে আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে যুক্ত করা হলো।

ব্যাপার দেখে আমরা একটা সিদ্ধান্ত করতে পারি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ক্রিয়া ও কীর্তি ১৯৩৬ সালে এসেও দেখা গেল যে, বিশেষভাবে রক্ষা করার জন্য যে সব অঞ্চল ভিন্ন করা হলো, তার প্রায় সবগুলিই ১৮৭৪ সাল থেকে বিশেষভাবে রক্ষিত হয়ে এসেছে।

১৮৭৪ সাল থেকে ১৯৩৬—এই ৬২ বৎসর ধরে অঞ্চলগুলিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং বিশেষ পদ্ধতিতে রক্ষা করে এসেছেন যার জন্য বিশেষ রক্ষার প্রয়োজনটা থেকেই যাচ্ছে গভর্নমেন্টের বিশেষ রক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? ৬২ বৎসর ধরে বিশেষ রক্ষা দিয়ে শাসন করা সত্ত্বেও আদিবাসীদের কোন উন্নতি হয়নি, এবং তাদের সাধারণ শাসনব্যবস্থায় ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হলো না। ১৯৩৬ সালের বহির্ভূত অঞ্চলের তালিকাটি বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের এই ব্যর্থতারই স্বীকৃতি।

এই অর্ডার (Order in Council) নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির সীমা ও শাসন সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্ট আইনের ৯১ ও ৯২ ধারায় প্রধান বিধানগুলি দেওয়া হয়েছে।

tion Acts, ইত্যাদি।

৯১. ধারা অনুসারে—কোন সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলকে বা তার অংশকে আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল বলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঘোষণা করতে পারেন। কিংবা কোন আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল বা তার অংশকে সাধারণ শাসিত অঞ্চলরূপে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু কোন নতুন অঞ্চলকে ভবিষ্যতে আর সম্পূর্ণ বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল বলে ঘোষণা করতে পারা যাবে না।

৯২. ধারা অনুসারে—প্রাদেশিক গভর্নর যদি নির্দেশ না দেন, তবে ফেডারেল বা প্রাদেশিক আইনসভায় গৃহীত কোন আইন (Act) সম্পূর্ণ বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না। গভর্নর ইচ্ছে করলে কোন আইনকে বহির্ভূত অঞ্চলে প্রয়োগ করতে পারেন এবং ইচ্ছে করলে সেই আইনকে তাঁর বিবেচনাসম্মত রদবদল করে নিতে পারেন। গভর্নর নিজেও বহির্ভূত অঞ্চলের শাসনের জন্য রেগুলেশন তৈরি করে নিতে পারেন। এই সব রেগুলেশন গভর্নর-জেনারেলের দ্বারা সমর্থন করিয়ে নিতে হবে এবং সমর্থিত হবার পর আইনে (Law) পরিণত হবে।

৮০ ধারা অনুসারে—সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থার ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর আইনসভার ভোটসাপেক্ষ সম্মতির ওপর নির্ভর করে না। এটা ভোট-নিরপেক্ষ (Non-votable), গভর্নরের সমর্থন থাকলেই হলো। কিন্তু আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুরের জন্য আইনসভায় ভোটসাপেক্ষ সম্মতির জন্য পেশ-করার নিয়ম আছে। কিন্তু আইনসভার ভোট যদি বিরুদ্ধে যায়, তবে নিজ সম্মতি দিয়ে মঞ্জুর করবার ক্ষমতা গভর্নরকে দেওয়া হয়েছে।

৫২ ধারা অনুসারে—আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে শান্তি রক্ষা করা ও সুশাসন বজায় রাখা গভর্নরের বিশেষ দায়িত্ব।

৮৪ ধারা অনুসারে—সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থাঘটিত কোন বিষয়ে (আইনসভায়) প্রশ্ন উত্থাপন বা আলোচনা করতে হলে গভর্নরের অনুমতি প্রয়োজন। আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন বা আলোচনা করতে হলে গভর্নরের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

কতগুলি অঞ্চলকে বহির্ভূত করে রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এই অঞ্চলগুলি সাধারণ শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করার মতো রাজনৈতিক যোগ্যতা লাভ করেনি। কিন্তু যাদের রাজনৈতিক যোগ্যতাকে এইভাবে সোজাসুজি অস্বীকার করা হলো, দেখা যাচ্ছে যে প্রাদেশিক আইনসভায় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের আসন দেওয়া হলো। এক্ষেত্রে ঘোষিত নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যুক্তিগত সামঞ্জস্য নেই।

বহির্ভূত অঞ্চলগুলিকে আইনসভায় যেভাবে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ

(১) আসাম—অনগ্রসর পাহাড়ী অঞ্চল নির্বাচনকেন্দ্রসমূহ, ৫টি আসন। অনগ্রসর

সমতলবাসী আদিবাসী নির্বাচন কেন্দ্র, ৪টি আসন। আসনগুলি আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত (Reserved) আসন।

(২) বাঙলা--জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার জন্য ১টি অসংরক্ষিত (Non-reserved) আসন।

(৩) যুক্তপ্রদেশ--দক্ষিণ মির্জাপুরের জন্য ১টি অসংরক্ষিত আসন, দেরাদুন জেলার জন্য ১টি অসংরক্ষিত আসন।

(৪) বিহার--ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনায় ৭টি সংরক্ষিত আসন। (হরিজনদের জন্যও এই অঞ্চলে ৩টি আসন সংরক্ষিত আছে)।

(৫) ওড়িশা--মোট ৫টি সংরক্ষিত আসন। এর মধ্যে ৪টি আসনে সরকার কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হয়ে থাকে।

(৬) মাদ্রাজ--১টি সংরক্ষিত আসন।

(৭) মধ্যপ্রদেশ--১টি সংরক্ষিত আসন।

(৮) বোম্বাই--১টি সংরক্ষিত আসন।

মাত্র দেড় কোটি আদিবাসী সম্পূর্ণ বহির্ভূত এবং আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে বাস করে। বাকি ১ কোটি সাধারণ অঞ্চলেই থাকে। কিন্তু সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীর সম্পর্কে গভর্নরকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। "গভর্নর যদি মনে করেন যে সম্পূর্ণ বহির্ভূত বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতি অথবা প্রদেশের অন্যান্য অংশের আদিবাসী গোষ্ঠীর লোকদের প্রতি ('to primitive sections of the population elsewhere') কর্তব্য পালনে তাঁর বেশি সুবিধা হবে তবে তিনি একজন অফিসার নিয়োগ করে তার মারফৎ আদিবাসীদের উন্নতির জন বিহিত ব্যবস্থা করাবেন এবং তাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন।"

গভর্নরের এই প্রভূত বিশেষ ক্ষমতার বহর দেখে মনে প্রশ্ন ওঠে, যখন প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলের আদিবাসীর ওপর এতটা বিশেষ ক্ষমতা গভর্নরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন কতগুলি আদিবাসী অঞ্চলকে বহির্ভূত করার কি এমন প্রয়োজন ছিল। বহির্ভূত না করেও তো গভর্নর বিশেষ ক্ষমতার বলে আদিবাসী সমাজকে সস্নেহে শাসন করতে পারতেন। এত সতর্কতার মূল রহস্য হলো, আদিবাসীকে ব্রিটিশ গভর্নর কখনো একলা ছেড়ে দিতে পারবেন না ; যদি হিন্দুরা তাদের বাগিয়ে ফেলে অথবা হিন্দুর প্রভাবে তারা বাগিত হয়ে যায়? আদিবাসীদের প্রতি ব্রিটিশ রক্ষাব্যবস্থার সমস্ত নীতিটারই রহস্য এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে--আদিবাসীকে তার স্বদেশবাসী উন্নততর হিন্দুসমাজের প্রভাব থেকে সরিয়ে রাখাই এই সকল তথাকথিত রক্ষামূলক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতি ও উদ্দেশ্য।

আদিবাসীদের প্রতি গভর্নমেণ্টের রক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান সোপান হলো বহির্ভূত অঞ্চল সৃষ্টি করে খাস গভর্নরী বিবেচনা অনুযায়ী শাসন করা। এই ব্যবস্থা করবার সময় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একটা দিক ভেবে দেখেননি, অথবা ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করে গেছেন। এই সব বহির্ভূত অঞ্চলে হাজার হাজার এমন সব শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অধিবাসী রয়েছে যারা আদিবাসী নয়, যারা ভারতের সাধারণ জাতি, সাধারণত হিন্দু। আদিবাসীরা সমঅঞ্চলবাসী এই অ-আদিবাসীদের সঙ্গে নানা সম্পর্কের সূত্রে যুক্ত এবং তারা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। গভর্নমেণ্ট বহির্ভূত অঞ্চলে বিশেষ রক্ষামূলক শাসন চালাবার সময় স্থানীয় অ-আদিবাসীর কথাটা আদৌ ভেবে দেখেননি।

সম্পূর্ণ বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে অ-আদিবাসীর (Non-Aboriginal) অর্থাৎ সাধারণ জাতির সংখ্যা কিরূপ তার কতগুলি হিসাব দেওয়া যাক্ ঃ

অঞ্চল		সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে আদিবাসীরা শতকরা কত সংখ্যক
সাঁওতাল পরগণা	...	৪৫
সিংভূম	...	৭৬
মানভূম	...	৩২
পালামৌ	...	৪৯
রাঁচী	...	৮০
হাজারিবাগ	...	৩৪
সম্বলপুর	...	৩২
অঙ্গুল	...	১৮
দক্ষিণ মির্জাপুর	...	৬২
বিলাসপুর জমিদারী	...	৩৭
বৈহার তহশীল	...	৫৫.৮
মান্দলা তহশীল	...	৫১.২
চিন্দোয়ারা জমিদারী	...	৬৬.২
ননদুরবার (পশ্চিম খান্দেশ)	...	৩০.২
শাহ্দা (")	...	৩১.৭
গড়চিরোলি তহশীল	...	৩৬.২
কল্যাণ তালুক	...	৪৮.৮
সাহাপুর (থানা জেলা)	...	২৭.৯
ডাহানু (")	...	৪৭.৯
উম্বেরগাঁও পেটা	...	৬৩.৭
মোখডা পেটা	...	৮৩.৬
পেইণ্ট পেটা (নাসিক)	...	৯৮*

ওপরের হিসেব থেকে ধারণা হয় যে, এমন অনেক বহির্ভূত অঞ্চল আছে, যেখানে সাধারণ (অ-আদিবাসী) জাতিরাই আদিবাসীদের চেয়ে সাংখ্যাধিক। অন্যান্য কতগুলি বহির্ভূত অঞ্চলে সাধারণ জাতির লোকেরা সংখ্যায় আদিবাসীদের চেয়ে কম হলেও, নেহাৎ নগণ্য সংখ্যক নয়। বাকি যে যে অঞ্চলে আদিবাসীরা খুবই সংখ্যাধিক (শতকরা ৮০/৯০), সে অঞ্চল সম্বন্ধে অবশ্য আলোচ্য সমস্যার কথা ওঠে না।

আদিবাসী অধ্যুষিত এইসব বহির্ভূত অঞ্চলে প্রাদেশিক ভারতের সাধারণ জাতির লোকেরা (হিন্দু) শুধু শোষক হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং তারা সকলেই শোষক হিসাবে আজও রয়েছে, একথা সত্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসীরাই অ-আদিবাসীকে ডেকে এনে তাদের অঞ্চলে স্থান দিয়েছে। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা সর্দারেরা ১৭ শতকের শেষদিক থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে বহু হিন্দু পরিবারকে আহ্বান করে এনে নিজ অঞ্চলে বসতি করিয়েছে।[১] মান্দলা জেলাতেও বর্তমানে যে সব হিন্দু জমিদার রয়েছে তারা ১৭ শতাব্দীতে স্থানীয় আদিবাসী সর্দারদের কাছ থেকেই জমি লাভ করেছিলেন। মাদ্রাজের খন্দ অঞ্চলে পাহাড়ী সর্দাররা জাতিতে ওড়িয়া, নয়-দশ পুরুষ আগে এদের পূর্বপুরুষেরা খন্দ অঞ্চলে গিয়েছিল। এটাও অনুমান করা যায় যে, তারা খন্দরের গোষ্ঠীগত বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য আমন্ত্রিত

* The Aborigines and their Future–G. S. Ghurye.

১. S.C. Roy, Journal of B & O Reserved Society, 1931.

হয়েই সেখানে গিয়েছিল।[২] খন্দমালে কৃষির উন্নতির জন্য স্থানীয় সর্দারেরা কোলটাদের (হিন্দু কৃষক-মহাজন) ডেকে এনে স্থান দিয়েছিল। এমন কি 'বহির্ভূত' তত্ত্ববাদী ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও স্বয়ং আদিবাসী অঞ্চলে অ-আদিবাসী জনসাধারণকে বসতি করবার জন্য প্রথম দিকে উদ্যোগ করেছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কোলহান অঞ্চলে শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করার পর উক্ত অঞ্চলে সাধারণ ভারতীয়কে বসতি করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বহির্ভূত অঞ্চলে কৃষি ও আবাদ সফল করতে হলে হিন্দু কৃষকের সাহায্য অপরিহার্য, একথা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও বুঝতেন।

বহির্ভূত অঞ্চলে এইভাবে বহু হিন্দু বাস করে আসছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বসতি দু'শ বছরেরও ওপর এবং কোন ক্ষেত্রে ৫০ বছর ধরে চলে আসছে। এটা সত্য যে, বহির্ভূত অঞ্চলের ঔপনিবেশিক এই হিন্দুদের মধ্যে অনেক অজ্ঞ আদিবাসীকে নানাভাবে শোষণ করেছে। কিন্তু এটা মন্দের দিক মাত্র। ভালো দিকও আছে এবং সেটার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। হিন্দুরা যে অঞ্চলে আদিবাসীর প্রতিবেশী হয়ে থাকতে পেরেছে, সেখানে মোটামুটিভাবে একটা সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সমগ্রভাবে উন্নতিমূলক না হলেও এই পরিবর্তনটাই আদিবাসীদের একটা বড় লাভ। ব্রিটিশ সরকারী নীতির ফলে আদিবাসীদের পক্ষে অচল অনড় যাদুঘরের সামগ্রী হয়ে যাবারই কথা কিন্তু হিন্দু সংস্পর্শ সেই প্রাচীনতার কবচকে আঘাত করে আদিবাসীকে যুগ-সচেতন করেছে।

বহির্ভূত অঞ্চলে যে সব সাধারণ ভারতবাসী বাস করে, তাদের আত্মীয়স্বজন ও স্বজাতির অধিকাংশ হলো সাধারণ প্রাদেশিক অঞ্চলের অধিবাসী যারা আধুনিকতর শাসনব্যবস্থার মধ্যে বাস করে। কিন্তু নিজেরা বহির্ভূত অঞ্চল থেকে উদ্ভট পুরাতন অফিসারী স্বেচ্ছাতন্ত্রের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। এই দুর্ভোগের জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে তারা বেচারা অনগ্রসর আদিবাসীকেই দোষী করে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অপরিচ্ছন্ন জঞ্জালভরা নীতিই অনর্থক এই বিদ্বেষের ভিত্তি সৃষ্টি করেছে। আদিবাসী সমাজকে কার্যক্ষেত্রে পুরোপুরি 'ঘিরে রাখবার' (Ring Fence Policies) সামর্থ্য তাদের নেই। নিজেদের স্বার্থের জন্য অ-আদিবাসীকে আদিবাসীর কাছে নিয়ে যেতে গভর্নমেণ্ট বাধ্য হয়েছেন, তবু আদিবাসীকে সরিয়ে রাখবার (Segregate) নীতিকেই তাঁরা আঁকড়ে রয়েছেন। সমগ্র ব্যাপারের পেছনে যেন একটা কূটনীতি কাজ করছে। যে ক্ষেত্রে সত্যিকারের 'তালগাছের বেড়া' তৈরি সম্ভব হয়নি, সে ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তৈরি বেড়া দিয়ে নীতি সার্থক করা হয়েছে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ এবং নেতারা বহুদিন থেকেই গভর্নমেণ্টের আদিবাসী-পলিসির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে আসছেন, বহির্ভূত অঞ্চল সৃষ্টি করার ব্রিটিশ প্রচেষ্টাকে ভারতের জাতীয়তাবাদীরা বস্তুত দেশ ও জাতিকে খণ্ডিত করার ব্যবস্থাই বলে মনে করেছেন। অনগ্রসর আদিবাসীরা 'বিশেষ রক্ষাব্যবস্থা' অবশ্যই দাবি করবে, এবং এই দাবি যুক্তিসঙ্গত। জাতীয় নেতারা এ বিষয়ে কোনই আপত্তি করেন না। আপত্তির প্রধান বিষয় হলো ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যে ভাবে বিশেষ রক্ষাব্যবস্থা করছেন, সেই পদ্ধতিটা। এই পদ্ধতিকে জাতীয়তাবাদীরা সন্দেহের চক্ষে দেখেন, এবং এটাকে জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির পরিপন্থী বলে মনে করেন। আদিবাসীর প্রতি 'বিশেষ রক্ষার' ব্রিটিশ পদ্ধতি বস্তুত জাতীয় অপমানের মতো দেশপ্রেমিক জনসাধারণের চিত্তে আঘাত করেছে।

১৯৩৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে গভর্নরের একটা 'ভদ্রলোকের চুক্তি'ও (Gentlemen's Agreement) সম্পন্ন হয়। গর্ভনর কথার দ্বারা আশ্বাস দেন যে মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যের বিরুদ্ধে

২. Manual of Administration of the Madras Presidency.

গভর্নমেণ্ট মোটের ওপর হস্তক্ষেপ করবেন না এবং তাঁর আইনগত 'বিশেষ ক্ষমতা'র প্রয়োগ যথাসম্ভব না করেই চলবেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি এবং গভর্নরদের মধ্যে এ বিষয়ে প্রশংসনীয় মতৈক্য স্থাপিত হয়। এর ফলে বিহার, ওড়িশা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশে আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলে শাসন ব্যাপারে গভর্নরগণ তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে বস্তুত একরকম প্রত্যাহার করেই নেন। ওড়িশার গভর্নর আনুষ্ঠানিকভাবে যে 'আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল তদন্ত কমিটি' নিয়োগ করেন, সেই কমিটির সদস্য নিয়োগ ও কার্যপরিচালনার বিবিধ বিষয়ে মন্ত্রিরাই প্রধানত উদ্যোগ করেছেন। মিঃ এলুইন ভারতের জাতীয়তাবাদীকে, তথা উন্নততর হিন্দুসমাজকে আদিবাসীর গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির শত্রু বলেই মনে করেন। কিন্তু তিনিই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সম্পর্কে মন্তব্য করে এক জায়গায় বলেছেন ঃ "১৯৩৯ সালে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট এই অর্ডার দেন যে বৈগা এবং অন্যান্য অরণ্যবাসী গোষ্ঠীরা তীরধনুক সঙ্গে রাখতে পারবে।"[১]

বহির্ভূত অঞ্চল সৃষ্টি করে আদিবাসীকে রক্ষা করার ব্যবস্থা সব দিক দিয়ে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে আদিবাসীকে রক্ষা করা বা উন্নত করা, কোনটাই সম্ভব হয়নি। সাধারণ প্রাদেশিক অঞ্চলের আদিবাসীরা যতটুকু সাধারণ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অধীনে এসেছে, তার ফলে তাদের অবনতিও হয়নি। হিন্দু সংস্পর্শও আদিবাসীকে রসাতলে টেনে নিয়ে যায়নি। সুতরাং বহির্ভূত করার 'গোল বেড়া' (Ring Fence) নীতির কোনই দরকার ছিল না। কিন্তু গভর্নমেণ্ট ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এসে এত বিষয়ে ভারতবাসীর হাতে 'দায়িত্ব' ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়েও আদিবাসীকে একটা প্রাচীন পরিবর্তনহীন জীবনে আবদ্ধ করে দূরে সরিয়ে রাখার নীতি ছাড়তে পারলেন না।

ব্রিটিশ শাসনকালের ভ্রান্তিকর নীতি ও ব্যবস্থার প্রসঙ্গ এবং পুরাতন বৃত্তান্ত ও ইতিহাসের আলোচনা ছেড়ে এবার সম্পূর্ণ একটা নতুন ও আধুনিকতম অধ্যায়ে আসা যাক্।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে চলেছে, স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনার ভার গণপরিষদের ওপর দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ভারতের এই উদ্যোগে আদিবাসী সমাজের প্রতি কোন নতুন নীতির আভাস পাওয়া গেছে কি?

গণপরিষদের এক অধিবেশনের মৌলিক অধিকার সাব-কমিটির সুপারিশগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে ২৯ এপ্রিল (১৯৪৭) তারিখে বিশিষ্ট আদিবাসী নেতা ও কংগ্রেস নেতারা যে সব মন্তব্য ও অভিমত প্রকাশ করেন, তার মধ্যে আমরা ভবিষ্যৎ নীতির আভাস অবশ্যই পাই। উক্ত অধিবেশনের বিবরণীতে রেভারেণ্ড জে. জে. নিকলস্ রায় বলেন ঃ

"আদিবাসী অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষ করে আসামের আদিবাসীরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা অসন্তোষ পোষণ করে। তাদের ভয়, ভবিষ্যতে তারা হয়তো শোষিত হবে। এই সন্দেহ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে,তারা আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অথবা বর্মার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে। বিষয়টা যেমন আগে, তেমনি এখনো খুব বেশি জটিল হয়ে রয়েছে। আমি ইচ্ছা করি, ভারত গভর্নমেণ্টের বহির্বিষয়ের (External Affairs) ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসাবে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু একটি বিবৃতি দিয়ে আদিবাসীদের আশঙ্কা দূর করবেন।"

মিঃ জয়পাল সিং বলেন ঃ

"আদিবাসী গোষ্ঠী এবং অনগ্রসর জাতির লোকেরা সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পেতে চায়। বর্তমানে তারা যে সব আইনগত রক্ষামূলক ব্যবস্থার সুবিধা উপভোগ করছে, সেগুলি যেন ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকে। জমিই তাদের জীবিকার ভিত্তি ছিল এবং স্বাধীনতা যেন তাদের এমন অবস্থার দিকে টেনে না নিয়ে যায়, যার ফলে জমিই তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

১. Loss of Nerves–Elwin

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উত্তরে বলেন ঃ

"আমাকে মধ্যবর্তী (Interim) ভারত গভর্নমেণ্টের বহির্বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসাবে বিবৃতি দেবার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু এই গণপরিষদে আমি গভর্নমেণ্টের সচিব হিসাবে আসিনি, এখানে আমি যুক্তপ্রদেশের জনসাধারণের একজন প্রতিনিধি।...আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে এবং আমাদের অন্যান্য ভাগ্যহীন ভ্রাতাগণ যারা বিনা দোষে অনগ্রসর হয়ে রয়েছে, তাদের সকলকেই রক্ষা করা এবং যত বেশি সম্ভব প্রত্যেক বিষয়ে উন্নত হতে সাহায্য করা আমাদের ইচ্ছা। আমি মনে করি ভবিষ্যৎ ভারতের যে কোন গভর্নমেণ্টেরই এই নীতি হতে বাধ্য। আদিবাসীদের প্রতি সমস্ত দেশের সহানুভূতি রয়েছে।"

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেন ঃ

"বর্তমানে প্রচলিত আইনের সাহায্যে আদিবাসীরা যে রক্ষামূলক সুবিধা উপভোগ করছে, ভবিষ্যতে সেই সব সুবিধা বাতিল করে দেওয়া হবে না, এ বিষয়ে ভয় করবার কিছু নেই। কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ঃ আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতাদের কি এই ইচ্ছা যে উপজাতি আদিবাসীকে চিরকাল উপজাতি (Tribes) করেই রাখা হোক্? আমি মনে করি এটা আদিবাসীদের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। বরং সকলের পক্ষে এই চেষ্টা করা উচিত যাতে অনগ্রসর জাতির লোকদের জীবনযাত্রা মিঃ জয়পাল সিংয়ের জীবনযাত্রার সমান স্তরে উন্নীত হতে পারে ; এবং যাতে আজ থেকে দশ বছর পরে আদিবাসীকে উন্নত করার জন্য যেন কোন আইনের সাহায্যের প্রয়োজন আর না হয়। দু'শ বছরের বৈদেশিক শাসনের জন্যই অনগ্রসর শ্রেণীগুলি, আদিবাসীদের সমস্যা এবং অস্পৃশ্যতা পূর্বে যে অবস্থায় ছিল আজও সেই অবস্থায় রয়েছে। অতীতের গভর্নমেণ্ট এই সব ভেদ কায়েম রাখার জন্যই তৎপর ছিলেন। আদিবাসীরা বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সেই অবস্থাতেই তাদের ধরে রাখতে আমাদের আগ্রহও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই।"[১]

ভারতীয় সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ

—এক দল বির্‌হোর এসেছে! সহরের বাইরে কলেজ ময়দানের এক কোণে গাছের তলায় ডেরা নিয়েছে।

হাজারিবাগের বাংলাস্কুলের ছোট খেলার মাঠে কিছুক্ষণের জন্য খেলা থামিয়ে আমরা এই খবরটা প্রথম শুনলাম। আমাদের পরিচিত সেই সর্বঘটের সংবাদদাতা একচক্ষু চীনাবাদামওয়ালা এই সংবাদটি নিয়ে এসেছিল। বহুদিনের পুরাতন একটি ঘটনা, আমরা তখন বাংলাস্কুলের ছাত্র। আমাদের কিশোরজীবনের খেলার মাঠে হঠাৎ এক একদিন অভাবিত ভাবে এইরকম এক একটি বিপুলা পৃথ্বি ও নিরবধি কালের বিক্ষিপ্ত খবর শুনে আমরা চম্‌কে উঠতাম।

খবরটা শুনলাম। তারপর আর কোন কথা নয়। আমরাও পরমুহূর্তে দল বেঁধে ছুটলাম কলেজ ময়দানের দিকে। বির্‌হোরদের দেখলাম। একদল স্ত্রী-পুরুষ বির্‌হোর বসেছিল গাছতলায়। প্রায় উলঙ্গ বললেই চলে। থানার চৌকিদারগুলি বোধ হয় অনেক কষ্টে তাদের কিছু কিছু বস্ত্রতত্ত্ব বোঝাতে পেরেছে। কাঁচা পাকা আর ছেঁড়া নেক্‌ড়ার কটিবাস কেউ কেউ স্বীকার করে নিয়েছিল। শুক্‌নো কাঁটাগাছের ঝুরি পুড়ছিল বির্‌হোরদের সাম্‌নে। কেউ কেউ ক্লান্ত কুকুরের মত মাটীতে লুটিয়ে শুয়েছিল। বির্‌হোরেরা ঘর তৈরী করতে এখনো শেখেনি।

১. Hindusthan Standard, dated April 30, 1947.

চাষ করতেও জানে না। শুধু বল্লম দিয়ে বুনো জানোয়ার মেরে খায়। মাথায় যোগীদের মত বড় বড় রুক্ষ চুলের জটা। চুল আঁচড়াতেও এরা শেখেনি। একজনের হাতে একটা লোহার টাঙ্গি দেখলাম। কিন্তু লোহার অস্ত্র এরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে না। পাথরের কুড়ুল দিয়েই কাজ চালায়। অবশ্য, অন্য জাতের দেখাদেখি সম্প্রতি কিছু কিছু কুড়ুল ও বল্লম ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

বির্‌হোরদের প্রথম যখন দেখলাম, তখন অবশ্য জানতাম না যে--একদল আদি ও অকৃত্রিম ভারতবাসীর দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। আমরাই বিদেশী। আমরা ভারতবর্ষে এসেছি, বির্‌হোরেরা ভারতবর্ষে ছিল।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে। হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের সংগ্রাম পতন ও অভ্যুদয়ের কোন চাঞ্চল্য এদের নাগাল পায়নি, স্পর্শ করতে পারেনি। অতি-প্রাক্-ইতিহাসের ভারতের একটী অপোগণ্ড মনুষ্যত্বের ছবি আজও ছোটনাগপুরের জঙ্গলের আড়ালে বেঁচে রয়েছে। সিন্ধু-গঙ্গা-সরস্বতীর প্রবাহ ভিন্নমুখী হয়ে গেছে, সুকঠিন বিন্ধ্যগিরি মাথা নীচু করে ফেলেছে, সমুদ্রের বুকে নতুন দ্বীপ ভেসে উঠে নতুন মানুষের কলরবে ভরে গেল--কিন্তু সেই প্রথম ভারতবাসীর প্রস্তরযুগ আজও শেষ হলো না। এই জগৎজোড়া পরিবর্তনের অভিনয়ে বির্‌হোরেরা শুধু নেপথ্যে রয়ে গেছে।

বির্‌হোরদের স্বচক্ষে দেখা অর্থ--ভারতের প্রস্তরযুগকে স্বচক্ষে দেখা। ভারতের সকল বিস্ময়কর দ্রষ্টব্যের মধ্যে সব চেয়ে বড় বিস্ময় বোধ হয় বির্‌হোর মানুষেরা। কঙ্কাল নয়, মমি নয়, ফসিল নয়--একেবারে জীবন্ত রক্তমাংসে স্পষ্ট দেহী প্রস্তরযুগ।

এই বির্‌হোরদের দিকে তাকিয়ে আজ আবার আমাদের ঐতিহাসিক কৌতূহল প্রশ্ন করতে চায় ঃ সত্যিই কি তোমরা এই ভারতের ভূমিজ সন্তান? তোমাদের আগে কি আর কেউ ছিল না? তোমরাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম বেদীর সেই ঘসা-পাথরের প্রথম ইষ্টখণ্ডটী স্থাপনা করেছিলে?

বির্‌হোরদের কথা বলতে গিয়ে একেবারে প্রকাণ্ড একটা বড় তত্ত্বের কথা এসে পড়েছে--ভারতীয় সংস্কৃতির কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলার দুঃসাহস করতে গেলে আবার সেই আদি অধ্যায় প্রস্তরযুগের কথা এসে পড়ে। চিন্তার আনাচে কানাচে যুগ-যুগান্তের মানুষের মুখগুলি উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। কঠিন নিরেট প্রস্তরযুগ পাথরের স্তরে স্তরে স্তব্ধ হয়ে আছে। বির্‌হোরেরা সেই স্তব্ধীভূত যুগের একটী পলাতক জীবন্ত ঝরণা মাত্র। সেই বিরাট যুগের একটী ক্ষীণ নিঃশ্বাস। সংস্কৃতির কথা যে সেই বিস্মৃত যত পিতামহদের জীবনেরই কাহিনী। এ কাহিনী জানবার উপায় কি?

হাঁ, জানবার উপায় আছে। এরই নাম অ্যান্‌থ্রপলজী--বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্ব। আধুনিক অ্যানথ্রপলজী যুগান্তের অলিখিত ইতিহাসকে প্রথম গুছিয়ে লিখতে আরম্ভ করেছে। প্রস্তরযুগের কঠিন মৌনতা ভেঙে দিয়েছে। ভূপ্রোথিত করোটীর অদৃষ্টলিখা অক্লেশে পড়ে ফেলেছে। মানুষের শোণিতকণিকার পৃথ্বি-পরিক্রমার কাহিনী শুনিয়ে দিতে পারছে।

ভারতের অলিখিত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় খুঁজতে হলে, ভারতীয় প্রস্তরযুগের কাহিনীটি জানা চাই। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, ভারতবর্ষে কি কোন কালে প্রস্তরযুগ ছিল? বির্‌হোরদের দিকে তাকিয়ে তার একটা প্রমাণ্‌ পাওয়া যায় মাত্র ; কিন্তু ব্যাপক কোন প্রমাণ আছে কি?

(১) প্রস্তরযুগ ঃ প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের যতটুকু কাজ হয়েছে, তার মধ্যেই অজস্র প্রমাণ ধরা পড়ে গেছে যে ভারতে একদিন প্রস্তরযুগের কীর্তি ব্যাপ্ত ছিল। ভারতীয় প্রস্তরযুগের জন্তু জানোয়ারেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সিওয়ালিক গিরিমালার উপত্যকার কয়েকটী নদীবক্ষ খনন করার ফলে জীবজন্তুর ফসিল পাওয়া গেছে। ভারতীয়

প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় আবিষ্কার করেছেন হেলমুট ডি টেরা (Helmutt De Terra)। সিন্ধু ও ঝেলম নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ, কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পীর পঞ্জল এবং লবণ পাহাড় এলাকার (Salt Range) বিস্তৃতভাবে খনন ও অনুসন্ধানের পর ডি টেরা ভারতের আদি-প্রস্তরযুগ (Paleolithic) ও নবপ্রস্তরযুগের (Neolithic) সভ্যতার অনেকগুলি অবস্থান ও নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয় আদি প্রস্তরযুগের এই সংস্কৃতির একটা নামকরণও হয়ে গেছে--সোয়ান সংস্কৃতি। সোয়ান নামে একটী নদীর উপত্যকায় এই সংস্কৃতির বহু উপচার ও উপকরণ পাওয়া গেছে। এই যুগে পাথরের ছিল্‌কা (Flake) তুলে অমসৃণ সামগ্রী তৈরী করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই সোয়ান সংস্কৃতিই হলো পশ্চিম ঘাট, নর্মদা উপত্যকা এবং দক্ষিণ ভারতের আদি-প্রস্তরীয় সংস্কৃতির মূল আধার।

বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতি (Megalithic culture) নামে একটা কথা আছে। প্রাচীন মানুষেরা যেখানে বসতি স্থাপন করতো, সেখানে বড় বড় পাথর গড়িয়ে এনে ঘিরে বা সাজিয়ে রাখতো। সমাধি-ভূমিও এইভাবে বৃহৎ-শিলার সমাবেশে রচিত হতো। হয়তো মানুষ জাতির নগরনির্মাণের শৈশব প্রয়াস এই ভাবেই উন্মেষিত হয়েছিল। ইতিহাসের প্রথম স্থপতিদের এই বৃহৎ-শিলাময় কীর্তি ভারতের নানা স্থানে আছে। একটা কথা আছে, এই বৃহৎ-শিলা সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট যুগ নেই। কোন কোন বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতি মূলত প্রস্তরযুগীয়। কোথাও বা পরবর্তী কালের—লোহা তামা বা ব্রঞ্জের যুগে।

কাশ্মীরে বৃহৎ-শিলার যেসব প্রাচীন জন-অবস্থানের চিহ্ন পাওয়া গেছে, সেগুলি প্রধানতঃ নব-প্রস্তর যুগের। কারণ, এখানে ঘসা পাথর ও জোড়ামাটীর (Band-Ceramic) তৈরী সামগ্রীর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

মধ্য ভারত, দক্ষিণ ভারত এবং ছোটনাগপুরেও বহু বৃহৎ-শিলার অবস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এগুলিকে পরবর্তীকালের সভ্যতার নমুনা বলে মনে হয়। এর মধ্যে ধাতুযুগের সভ্যতার প্রমাণটাই বেশী প্রকট।

(২) ব্রঞ্জ-সংস্কৃতি (Bronze culture)। একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে ভারতে কোন ব্রঞ্জ-যুগ ছিল না। এটা ভুল ধারণা। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে ব্রঞ্জ-যুগের একটা অধ্যায় পার হয়েছে। রাঁচী জেলার বৃহৎ-শিলার অবস্থানগুলি থেকে যেসব সামগ্রী পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ব্রঞ্জের তৈরী জিনিসও আছে। দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ-শিলার অবস্থানগুলি থেকে ব্রঞ্জের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মধ্য ভারতের বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতির সাদৃশ্য আছে, উভয় অবস্থানের ব্রঞ্জের মধ্যে টিনের পরিমাণ সমান [শরৎ রায়]। মহেঞ্জোদাড়ো বা সিন্ধু উপত্যকার খননের ফলে যে সব ব্রঞ্জ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে টিনের পরিমাণ কম।

আসামে যে বৃহৎ-শিলার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তার সঙ্গে মধ্যভারতীয় বা দক্ষিণভারতীয় বৃহৎ-শিলার কোন সাংস্কৃতিক যোগ নেই। পশ্চিম চীন থেকে এই সংস্কৃতি আমদানি হয়েছিল [Hutton]।

এককালে পণ্ডিতেরা একরকম স্থির করেই ফেলেছিলেন যে ভারতের এই বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতি আসলে মিশরীয় সংস্কৃতি থেকে এসেছিল। বর্তমানে এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাস আমরা এখানো পাইনি। উত্তরপশ্চিম ভারতের বৃহৎ-শিলা হলো নবপ্রস্তর যুগের এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ-শিলা হলো ধাতু-যুগের। মাঝখানে একটা বড় রকমের ইতিহাস ও পরিণতির কাহিনী অজানা থেকে গেছে।

প্রস্তরযুগের ভারতীয়ের গৃহস্থালীর এক একটা নিদর্শন আমরা পেয়েছি। কিন্তু গৃহস্থ কই? সেই পাথুরে সংস্কৃতির ভারতীয় ভদ্রলোকদের চেহারাটা কি রকম ছিল? স্যর আর্থার কীথ

এই প্রাগৈতিহাসিক গৃহস্থের মূর্তিটীও খুঁড়ে বের করেছেন। সব চেয়ে প্রাচীন ভারতীয়ের খুলি আজ পর্যন্ত যা পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে 'বায়ানা' মানুষটাই প্রাচীনতম। আগ্রা থেকে কয়েক মাইল দূরে বায়ানা নামক জায়গায় রেলের পুল তৈরী করার সময় নদীতল থেকে ৩৫ ফুট গভীরে এই খুলি পাওয়া গিয়াছে। এই 'বায়ানা বাবাজী' কোন্ যুগের ছিলেন, তা একেবারে সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তাঁর খুলির অস্তিত্ব একেবারে চূণত্বে পরিণত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ভারতীয়ের খুলিটীর নাম হলো 'শিয়ালকোট খুলি'। ইনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক-- তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষ। খুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এঁরা হলেন নৃতাত্ত্বিকের 'মেডিটারেনিয়ান' গোত্রের মানুষ।

(৩) তাম্র-প্রস্তর ও তাম্রযুগ। ভারতে প্রস্তর ও ব্রঞ্জ ছাড়া, তাম্র সংস্কৃতির প্রমাণ কিছু কিছু পাই। কিন্তু তাম্র সংস্কৃতির যুগ সময় হিসাবে ভাগ করা এখনো সম্ভব হয়নি। লোহা তামা ব্রঞ্জ মৃৎপাত্র ও ঘসা পাথরের সভ্য নিদর্শন সব একসঙ্গে জড়াজড়ি করে এক একটী প্রাচীন মানুষের নিকেতনের ধ্বংসস্তূপে পড়ে আছে।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রসঙ্গে এর পরেই হঠাৎ সিন্ধু-সভ্যতার (আনুমানিক ৪০০০--৩০০০ খৃঃ পূর্ব) কথা মনে পড়ে যেতে পারে। সিন্ধু-সভ্যতার আধার মহেঞ্জোদাড়োর (এবং হরপ্পা) মধ্যেও নব প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির ঘসা মৃৎপাত্রের (Black Burnished Pottery) নমুনা পাওয়া গিয়েছে। তাই স্বভাবতঃ ধারণা হয় যে প্রাচীনতর একটী বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতির অধিষ্ঠানের ওপর নতুন 'সিন্ধু-সভ্যতা' নামে একটী সভ্যতার পত্তন হয়েছিল।

সিন্ধু-সভ্যতায় লোহার চিহ্ন নেই। প্রচুর ব্রঞ্জ আছে। তাছাড়া সোনা রূপা তামা ও সীসার ব্যবহার দেখা যায়। সিন্ধু-সভ্যতা এখনো আমাদের কাছে রহস্য হয়ে আছে। সিন্ধু-সভ্যতার লিপিগুলির এখনো পাঠোদ্ধার হয়নি। সিন্ধু-সভ্যতাকে কেউ দ্রবিড় সভ্যতা বলে প্রমাণ করতে ব্যস্ত। কেউ কেউ বলেন ঋগ্বেদোত্তর সভ্যতা। রমাপ্রসাদ চন্দ বেদ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে একটী 'সিন্ধু-জাতির' অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। স্যর জন মার্শাল একেবারে না ভেবে চিন্তেই বলে দিলেন--এটা সুমেরীয় সভ্যতা। বর্তমানে এইসব কোন থিওরীই গ্রাহ্য নয়। সিন্ধু-সভ্যতার সীমানা এখন বহুদূর পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গিয়েছে--বেলুচিস্থানে কাথিয়াবাড়ে ইরানে এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। পঞ্জাব রাজপুতানা ও গঙ্গা উপত্যাকাতেও এই সভ্যতার স্তূপচিহ্ন আছে। বিস্তৃত খনমকার্য ও লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সিন্ধু-সভ্যতার রহস্য ঘুচবে না। (অরেল স্টাইন)

মহেঞ্জোদাড়োতেও মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। কঙ্কালগুলির নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষার পর মনে হয়--সিন্ধু মানবেরা মেডিটারেনিয়ান গোত্র। আধুনিক এসিয়া মাইনরের অধিবাসীর সঙ্গে এদের শারীর গঠনসাদৃশ্য আছে (সিউয়েল ও গুহ)।

সিন্ধু-সভ্যতার প্রসঙ্গে এসেই ভারতীয় সংস্কৃতির একটি নতুন ও বিশিষ্ট অধ্যায় পাওয়া যায়--বহির্ভারত বা বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের কথা। সিন্ধু-মানুষেরা যে কিশ প্রভৃতি মেসোপটেমীয় উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো তার প্রমাণ আছে। কিশ সহরে সিন্ধু-লিপির নমুনা পাওয়া গিয়েছে।

সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে বৈদেশিক সভ্যতার একটা আদান প্রদান হয়তো ছিল। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতা বিদেশ থেকে (প্রাচীন মিশর বাবিলন উর প্রভৃতি) ভারতের পশ্চিম সীমান্তে এসে ঠাঁই নিয়েছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে এবং পরে ভারতের বাইরে থেকে নানা সংস্কৃতির স্রোত ভারতে এসেছে সন্দেহ নেই। বর্তমান 'হিন্দুভারতের' বহু অবৈদিক আচার অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর প্রমাণ সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যে অনেকে খুঁজে পেয়েছেন। আরও একটী জানবার বিষয় এই যে হিন্দুভারতের বহু দেবদেবী মূলতঃ মেসোপটেমিয়ার দেবদেবী। নাইনিতালের নাইনিদেবীর যে মূর্তিটী এখনো রয়েছে, তাকে ভারতীয় বলতে

অনেকের বাধবে। ইনি ব্যাবিলনবাসিনী এবং ভারতপ্রবাসিনী বলেই মনে হয়।

মহেঞ্জোদাড়োর প্রসঙ্গের পর স্বভাবত আর্য আগমনের কথা এসে পড়ে ; কারা এই আর্য, কোথা থেকে এল, সভ্য ছিল না অসভ্য ছিল, এদের কোন লিপি ছিল কি ছিল না-- পণ্ডিতদের মধ্যে এই নিয়ে বিতণ্ডার অন্ত নেই। আর্যেরা সভ্য থাক বা অসভ্য থাক--আর্যদের ভাষা যে ভারতময় ছড়িয়ে পড়লো সেটাই ইতিহাসের পক্ষে সবচেয়ে বড় ঘটনা। আর্যভাষার ইতিহাসের মধ্যে আর্য তথা আর্যভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

বৈদেশিক আক্রমণ বা আগমন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়।

কিন্তু প্রথম আগমন বা আক্রমণ কোনটী? আর্যেরাই কি ভারতের প্রথম আগন্তুক?

সম্প্রতি এ বিষয়ের নতুন একটী বিস্ময়কর--আবিষ্কার হয়েছে। ভারতে আর্যভাষীরাই প্রথম আগন্তুক নয়। তার আগে আর একটী ভাষার (সুতরাং ভাষীর অর্থাৎ সাংস্কৃতিক জাতির) আগমন বা আক্রমণ হয়েছিল।

এখানে খাঁটি নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) জাতির আগমনের কথা তুললে গোলমালে পড়তে হবে। মেডিটারেনিয়ান, নেগ্রিটো আলপাইন ও প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড ইত্যাদি দেহগঠন-গত মূল নরগোষ্ঠীদের কথা এক্ষেত্রে আসে না। ভারতের মানুষের রক্তে ও খুলিতে এই গোষ্ঠীদের সংমিশ্রণের ইতিহাসে রয়েছে। হয়তো বিশ হাজার বছর অতীতে এরা ভারতে এসেছে, চলে গেছে, আবার এসেছে। কোন গোষ্ঠী হয়তো ভারতের মাটিতেই প্রাণিত্ব থেকে নরত্বের স্তরে পৌঁছেছিল। বির্‌হোরদের সেই জীর্ণ মানবীয় মূর্তিগুলি আমরা এখনো ভুলে যাইনি। এ ইতিহাস নিতান্তই অন্ধকার যুগের। প্রাণিতত্ত্বের ইতিহাসের মত সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই ইতিহাসের নিকট ও নিগূঢ় সম্পর্ক নেই।

তাই সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ভাষার আগমনের কথাই বিচার করবো। সেই বিচারে আর্যভাষীরা ভারতে প্রথম আগন্তুক নয়। আর্যদের আগে, এমন কি সিন্ধু-সভ্যতারও আগে ভারতে একটী বিরাট ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃতিবান মানুষের আগমন হয়েছে-- মুণ্ডারি সভ্যতা।

(৪) মুণ্ডারি অর্থাৎ মুণ্ডাদের সভ্যতা। কারা এরা? কোথা থেকে এরা এল? আমরা জানি ছোটনাগপুরের ও উড়িষ্যায় আরণ্য অঞ্চলে মুণ্ডারা থাকে, যাদের আদিবাসী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে এঁদের আর আদিবাসী বলা যায় না। বড় জোর বনেদী বা প্রাচীন অধিবাসী বলা যায়।

মুণ্ডারি সম্বন্ধে ঐ সংস্কৃতিতত্ত্বের লেখকদের এবং আরও অনেকের ধারণা যে তারা ভারতের পূর্বদিক থেকে ভারতে এসেছে। তাদের ভাষা হলো 'অস্ট্রিক' ভাষা (মন্ খ্মের প্রভৃতি)। এটা স্মিট (Schmidt) নামে এক পণ্ডিতের আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র।

কিন্তু নতুন তথ্য আবিষ্কারের পর আমাদের আজ হঠাৎ সন্দেহ হয়েছে--আমাদের এই আদিবাসী আখ্যাত মুণ্ডারাও য়ুরোপীয়ান। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা মুণ্ডারি ভাষার বিচার করে দেখেছেন যে এই ভাষা মূলতঃ ফিনো-উগ্রিয়ান (Finno-Ugrian) বর্গের ভাষা। [ফিনো-উগ্রিয়ান বর্গ অর্থাৎ--হাঙ্গারিয়ান ম্যাগিয়ার, ভোগাল, উরাল, ওস্টিয়াক, কাজানের চেরেমিস, ফিনল্যাণ্ডের ফিন এবং মোদিন (নিজ্‌নি নভোগোরোদ) ভাষার সমবায়] মুণ্ডারি শ্রেণীর ভাষা অর্থ--মুণ্ডারি খরিয়া হো সাঁওতাল প্রভৃতি ভাষা বোঝায়। কেউ কেউ একে কোল বর্গের (বা Kolarian group) ভাষা বলেন। মুণ্ডারি ও সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে ফিনো-উগ্রিয়ান ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তারা পশ্চিম থেকে পূর্বদেশে এসেছে। মুণ্ডা-সাঁওতালদের সঙ্গে ফিনো-উগ্রীয় জাতিদের সংস্কৃতিগত আচার অনুষ্ঠানেরও সাদৃশ্য আছে (De Hevesy)।

(৫) ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় 'দ্রাবিড়' কথাটা বরাবর একটা গোলমাল সৃষ্টি করে

এসেছে। দ্রাবিড় বলতে বিশিষ্ট কোন নরবংশ বা নৃতত্ত্বগত জাতি বোঝায় না। রিজলি সাহেব এই গোলমাল সৃষ্টি করে গেছেন। দ্রাবিড়ভাষীদের একটা 'জাতি' কল্পনা করে নিয়ে তিনি দ্রাবিড় কথাটাকে অ্যানথ্রপলজীর বিচারে নিয়ে এসে উৎপাত করেছেন। বর্তমানে দ্রাবিড় কথাটা ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়েও গোলমেলে হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ ভারতের তামিল, কানাড় বা কর্ণাট, তেলেগু ও মালয়লম্--এই তিন ভাষাই প্রধানতঃ দ্রাবিড় বর্গের ভাষা। এই ভাষীরা কিন্তু জাতিগত ভাবে এক নয়। এই জাতিরা কবে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই না। কিন্তু এই দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক অভিযানের ইতিবৃত্ত লুকিয়ে আছে। দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে উরালিয়ান (Uralian) ভাষার শব্দ ও গঠনের প্রভাব ও সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনেভেলী জেলায় আড়িতানাল্লুর নামে জায়গায় যে এক প্রাচীন সংস্কৃতির ভগ্নস্তূপ পাওয়া গেছে, তাকেই দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাচীনতম নমুনা বলা হয়। আড়িতানাল্লুর হলো দ্রাবিড় সভ্যতার মহেঞ্জোদাড়ো। উরাল ভাষার প্রভাব দ্রাবিড় সভ্যতার বৈদেশিকতা প্রমাণ করিয়ে দেয়। উরালীয় ভাষীদের সংস্কৃতির সঙ্গে ভূমিজ মানুষের (Autochthonus) প্রস্তরীয় সংস্কৃতির সমন্বয় কি দ্রাবিড় সভ্যতার বেদী?

(৬) লৌহযুগ ঃ আর্য ও আর্যোত্তর সংস্কৃতি। সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনের বয়স থেকে বৌদ্ধ সভ্যতার উদ্ভব পর্যন্ত একটানা ২০০০ বছরের ইতিহাস আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এরই মধ্যে লৌহযুগ আরম্ভ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে আর্যেরা (অথবা ইণ্ডিড বা Indid) ভারতে এসেছে। আর্য ভাষার প্রসার হয়েছে। আর্য সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে এবং কালক্রমে সারা ভারতের সংস্কৃতির মূর্তি আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আর্যভাষী আলপাইন এবং আর্যভাষী মেডিটারেনীয়ান, উভয় জাতির শোণিত ভারতে এসে ছড়িয়েছে। দ্রাবিড় এবং মুণ্ডারিদের মধ্যে অস্ট্রেলয়েড প্রাধান্য স্পষ্ট।

ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে পূর্বের চেয়ে পশ্চিমের সঙ্গেই আগে মিতালী হয়েছে। সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার অতি প্রাচীন সম্পর্কের কথা ছেড়ে দিলেও, তার পরবর্তী কালে পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের লিখিত ইতিহাসের প্রমাণ আমরা পাই।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারস্য ও মিশরের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের কথা আমরা পাই। এর চেয়ে পুরনো খবর পাই না। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ও সিন্ধুর একাংশ একদিন পারস্য সম্রাট দারিয়ুসের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এর পর ভারতে গ্রীক-অভিযান ও হেলেনীয় সংস্কৃতির আবির্ভাব। গ্রীক সম্পর্কের মারফৎ ভারতের সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। টলেমির সময়ে ভারতের বৌদ্ধ শিল্পের প্রভাব মিশর দেশের শিল্প ও স্থাপত্যকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল।

এর পর ভারতের সঙ্গে রোমক সাম্রাজ্য ও সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের অধ্যায়। এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে উভয় দেশের সংস্কৃতিতে নতুন সৃষ্টি ও উৎসাহের সাড়া জেগে ওঠে। দর্শন গণিত জ্যোতিষ নাট্য এবং নৌবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে ভারত ও রোমের সাংস্কৃতিকতা এই যোগাযোগের ফলে উন্নত হয়।

ভারতের সঙ্গে পূর্বের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বেশী দিনের কথা নয়। চীনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সাধারণতঃ একটা যুক্তিহীন অতি-বিশ্বাস প্রচলিত আছে। স্যর অরেল স্টাইন এবং ডি সসুরে'র (De Saussure) মত পণ্ডিতেরা চীন সভ্যতার এই অতি-প্রাচীনত্বকে অতিরঞ্জিত সত্য বলে মনে করেন। ভারতের সঙ্গে চীনের মৈত্রীও খুব পুরাতন কাহিনী নয়। চীনের হান্ রাজত্বের (২০২ খৃঃ পূর্ব--২২১ খৃষ্ট পর) পূর্বে চীন ও ভারতের সম্পর্কের কোন ঘটনার কথা পাওয়া যায় না। কৌটীল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃঃ পূর্ব ৪র্থ শতক) 'চীনভূমি' নামে একটা কথা আছে। কিন্তু এই 'চীন' কথাটা বর্তমান চীন বোঝায় কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। চীনবিদ্যাবিশারদেরা (Sinologist) ভারতীয় চীন কথাটার ঐ অর্থ স্বীকার করেন না। সম্ভবতঃ চীন অর্থে মধ্য

এশিয়ার মত অন্য কোন 'রেশমের' দেশ বোঝাতো।

খৃষ্ট পর প্রথম শতকে কুশানদের (চীন-তুর্কীস্থান থেকে) সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ঘটে। কুশানেরা ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। এই সময় ভারতবর্ষের সঙ্গে এশিয়ার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব দেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের অধ্যায় ভালভাবে আরম্ভ হয়।

এর পর 'দ্বীপময় ভারতের' ওপর ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিস্তারের অধ্যায়--যব বলি সুমাত্রা আনাম প্রভৃতি দেশে।

অতি-প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পূর্বদিক থেকে একটী মাত্র ভাষাবান জাতির আগমন বা আক্রমণ কল্পনা করা যায়। এই জাতি হলো স্মিট-কথিত 'অস্ট্রিক' (অর্থাৎ অস্ট্রোএসিয়াটিক, অর্থাৎ মন্-খ্মের-ভাষী অর্থাৎ ইন্দো-চীনবাসী একটী জাতি) জাতির আগমন। পার্বত্য আসামে মন্-খ্মের ভাষার অর্থাৎ অস্ট্রিক সংস্কৃতির বুনিয়াদ খুঁজে পাওয়া যায়।

সংস্কৃতিময় ভারতভূমির ঐতিহাসিক আচরণের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র আমরা করলাম। এর মধ্যে একটী শিক্ষণীয় তথ্য আছে। পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক মিতালী হয়েছে আগে, তারপর হয়েছে পূর্বদেশের সঙ্গে। চীন, মধ্য এসিয়া ও দ্বীপময় ভারত প্রভৃতি পূর্বদেশ থেকে ভারত কোন সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি। এবিষয়ে ভারত শুধু দাতা মাত্র এবং চীন প্রভৃতি পূর্বীয় জাতিরা গ্রহীতা মাত্র। পশ্চিমের সঙ্গেই ভারতের আদান ও প্রদান হয়েছে। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম, দু'পাশের এই দুই সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের মিতালির ফল রাজনীতির দিক দিয়ে একই রকম হয়নি। পশ্চিম বার বার তার সাংস্কৃতিক বন্ধু ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে গায়ের জোরে দাসরাষ্ট্র করে রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পূর্বদিক থেকে এই চেষ্টা হয়নি। চীনের সাম্রাজ্যবাদ পরবর্তী কালে তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত মাত্র অগ্রসর হয়েছিল।

আধুনিক নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের যুক্তপ্রয়াস আমাদের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ ও ঐতিহ্যকে যত অনুমানের ভ্রম থেকে উদ্ধার করবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি। সেই কাজ মাত্র আরম্ভ হয়েছে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের ঐতিহাসিক প্যাটার্ণটুকু বুঝতে পারলে, আমাদের বর্তমান সামাজিকতাও ভ্রমমুক্ত হবে নিঃসন্দেহ। আমরা জানি সামাজিক গোঁড়ামিই সাংস্কৃতিক মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ। নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব আমাদের এই গোঁড়ামিকে ভেঙে ঐতিহাসিক পরিচয়টুকু বুঝিয়ে দেয়। সেইখানেই আমাদের পরম লাভ। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এই রকম কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য নিয়ে দেখা দেয়নি। ভারতে নৃতত্ত্বের চর্চা ব্রিটিশ শাসনের রাজনীতিক উদ্দেশ্যের সাহায্যের জন্যই আরম্ভ হয়। [Treatises on tribes and castes have been compiled in various provinces in India...under orders of local governments, not so much in the interest of anthropological research, but as indispensable aids to the work of civil administration. And the wants of the Magistrate and Collector and those of the anthropologist are very different.–Crooke]

রাষ্ট্রীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিজের হাতে না থাকলে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণা নৃতত্ত্বের আবিষ্কার ও প্রত্নতত্ত্বের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের সংস্কৃতিকে কোন নবতর পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে এই সব তথ্য ও তত্ত্বকে সার্থক করতে পারবো না। ভারতের সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ের পথে সব চেয়ে বড় বাধা এইখানে। এই আক্ষেপের শেষে আমাদের ছেলেবেলার দেখা সেই দীন বির্‌হোরদের মূর্তিগুলিই আবার মনের ভেতর নতুন করে ভেসে ওঠে। এই বির্‌হোরদের জঙ্গলেই আজ টাটানগরের ব্লাস্ট ফার্ণেসে বিংশ শতাব্দীর ইস্পাত সভ্যতা প্রখর হয়ে জ্বলছে। তারই চারিদিকে জঙ্গলের নিভৃতে আদি ভারতের আত্ম বির্‌হোরেরা আজও ঘুরে বেড়ায় পাথরের

কুড়ুল নিয়ে। অর্ধলক্ষ বছরের ব্যবধান বজায় রেখে পাশাপাশি দুই সভ্যতা চলেছে। অথচ, চেষ্টা করলে এক বছরের মধ্যে এই অর্ধলক্ষ বছরের ব্যবধানকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসনে যদি সাংস্কৃতিকতা বা সমাজ মঙ্গলের কোনো উদ্দেশ্য থাকতো, তবে আজ নিশ্চয় দেখতে পেতাম যে আমাদের সেই দুঃখী ও অর্ধনগ্ন প্রস্তর-মানব বির্‌হোরেরা সবাই সভ্যতম ইস্পাত-মানব হয়ে গেছে।

শিল্পের সামাজিক বনিয়াদ

জাতির শিল্পগত অভিরুচির মধ্যেই জাতির চারিত্রিক স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়, একথা আমরা বহু মনীষীর মুখে শুনেছি। কোন জাতির উত্থান পতনের পেছনে যে বহু ও বিবিধ কারণ-পরম্পরার ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, ঐতিহাসিকেরা তার ভেতর থেকেও এই সিদ্ধান্তের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন যে--শিল্প মরে তো জাতি মরে এবং শিল্প বাঁচে তো জাতি বাঁচে।

সুতরাং আমরা কি সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও করতে পারি না যে, শিল্পের অভ্যুত্থান যদি সম্ভব করা যায় তবে জাতির অভ্যুত্থানও অবধার্য? এইরকম সিদ্ধান্ত করতে কোন বাধা থাকে না যদি শিল্পের সামাজিক বনিয়াদটুকু আমরা বুঝতে পারি।

শিল্প কি? শিল্পের সামাজিক বনিয়াদ কোথায়? সন্ধানী মনের কাছেও এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজলভ্য ব্যাপার নয়। এক একটি প্রশ্নের সঙ্গে বহু আনুষঙ্গিক প্রশ্নের ভীড় এসে কোন সরল মীমাংসাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। তবুও আধুনিক কালে সভ্যতার সঙ্কটে বিষণ্ণ মানুষের মনের কাছে এই বিষয়ে যেসব প্রশ্ন ও তথ্যের চাপ তার আত্মজিজ্ঞাসাকে ব্যাকুল করে তুলেছে, তারই অতি সাধারণ কতগুলি নিয়ম ও নীতি লক্ষ্য করা যাক্।

ভক্তিমতী সাধিকা মীরাবাঈ গান গাইতে গাইতে হাতের তারযন্ত্রটীর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন ঃ আরে মোর সারেঙ্গিয়া, মোর দিল্ বিচ সব সুর বাজে। হে আমার বীণ আমার অন্তরের মধ্যেই যে সব সুর বেজে চলেছে! সুরসাধিকা অজ্ঞাতসারেই আর্টের ফিলসফি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের কথাটাই ধ্বনিত করেছেন। শিল্পের বনিয়াদ তার উপকরণের মধ্যে আশ্রিত নয়। শিল্পের ঐশ্বর্য বাহ্যিক আস্পদের মধ্যে নিহিত নয়। শিল্পের বনিয়াদ মানুষের মনের মধ্যেই। রিক্ত ও নিঃস্ব মনের শত কৌশলে ও ব্যায়ামেও আর্টের সৃষ্টি সম্ভব নয়। আর একটী ঐতিহাসিক উদাহরণ বিচার করা যাক্।

সমৃদ্ধ রোম নিশ্চয় উত্তুরে বর্বরদের চেয়ে শিল্পগুণে নিকৃষ্ট ছিল না। তবুও বর্বরদের আঘাতে রোমের জাতীয় শক্তি চূর্ণ হয়ে গেল কেন? শিল্পোন্নত রোমের এই দুর্বলতার রহস্য কি? রোমের বিরাট নাগরিক স্থাপত্য, এত নৃত্য সঙ্গীত কাব্য ও রত্নাভরণের জৌলুসের মধ্যে তা'হলে কি শুধু সামগ্রীটুকুই বড় জিনিস ছিল, তার মধ্যে শিল্প ছিল না?

এখানে প্রশ্নের সোজা উত্তর দেওয়া যায়--না ছিল না। রোমক সভ্যতা উচ্ছন্নে যাবার পূর্ব অধ্যায়ে নিশ্চয় কলালক্ষ্মী বিদায় নিয়েছিলেন। সিন্ধু-সভ্যতায় মহেঞ্জোদাড়োর বেদনাক্রান্ত অন্তিমে বোধ হয় এই ধরনেরই ভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। এবং রীতিমত সংশয়ের সঙ্গে আমরা বর্তমান আমেরিকার মতিগতি ও রুচির দিকে তাকিয়ে দেখছি। সেখানে স্কাই স্ক্র্যাপারের অভ্রচুম্বী ঔদ্ধত্য নিছক ঔদ্ধত্য মাত্র। শিল্প সেখানে নিতান্ত বাহুল্যের ভারে আবর্জনা প্রায়। অজস্র সম্ভারে ইয়াঙ্কির সংসার পরিপূর্ণ কিন্তু সেখানে কলরডো ও নায়েগ্রার ভাষা নূতন সুরে ও গুঞ্জরণে রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। আর্টের ক্ষেত্রে মার্কিনী মন কোন ঐশ্বর্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, শিল্পের অধিষ্ঠান কোথায়? সরকারী গ্যালারীর স্তরে স্তবকে বা মঞ্চের মধ্যে নয়, বড়লোকের বৈঠকখানায় রঙীন আড়ম্বরের মধ্যে নয়, কোন আনুষ্ঠানিক ষোড়শোপচারের মধ্যে নয়। শিল্পের আশ্রয় জাতির মনস্তত্ত্বের মধ্যে। শুধু শিল্পসামগ্রী বা আর্টের বহিরঙ্গটুকু জাতিকে বড় করে তুলতে পারে না। শিল্পীর মনটাই জাতীয় সম্পদ। জাতির অন্তর্লোকে, প্রত্যেক মানুষের মনে শিল্পীর সত্তাটি প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ হয়ে আছে, যার ফলে সৃষ্টি করার প্রেরণা সহজ আবেগের মত প্রত্যেক মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। একমাত্র তাই জাতীয় সংস্কৃতির মূল ভূমিকা। জাতির মনস্তাত্ত্বিক গঠনের মধ্যেই আমরা শিল্পের একটি সামাজিক বনিয়াদ খুঁজে পাই। এর পর আমরা সহজেই সেই রহস্যটুকু বুঝে ফেলতে পারি, কেন এত প্রাচুর্যে ও ঐশ্বর্যে ভরা সুখী ও বিলাসী রোম বর্বরতার কাছে পরাভব মানতে বাধ্য হয়েছিল। কেন মহেঞ্জোদাড়োর রত্নমালা সেই সভ্য জাতির অস্তিত্বকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারেনি।

শিল্পের সামগ্রীগত মূল্যকে কেউ বড় করে দেখে না। শিল্পের মূল্য নির্ণয়ে মণদর বলে কোন পরিমাপের মান নেই। কোন বস্তুর শিল্পগত মূল্য তার ওজনের তারতম্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। বফত্ হানা (বাতাসের বিনুনী) নামে যে অত্যাশ্চর্য মসলিনকে শিল্পী সৃষ্টি করেছেন, তার এক গাঁইটের ও একটী টুক্‌রোর শিল্পগত মূল্য একই।

নন্দলাল বাবুর আঁকা মূল ছবি 'শিবের বিষপানে'র মূল্য এবং ঐ ছবিরই মুদ্রিত কপির মূল্য রসিক মনের কাছে কখনই এক হতে পারে না। কেন? মূল ছবিটীর মধ্যে এমন কোন্ বৈভব আছে যা অ্যালবাম-নিবদ্ধ মুদ্রিত কপির মধ্যে নেই?

এটা কি আশ্চর্য হবার কথা নয় যে য়ুরোপ ও আমেরিকার মত উন্নত মেশিনের দেশের মানুষেরাও যখন সখের জিনিস কেনেন তখন মানুষের হাতে গড়া জিনিসটীর জন্য দু'পয়সা বেশী দাম দিয়ে থাকেন। মেশিনের তৈরী অলংকারে পশ্চিমের ললনাদেরও রুচি তৃপ্ত হয় না। শিল্পীর নিজের হাতের গড়া জিনিসটীর জন্যই তাঁদের স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায়।

হাতে-গড়া শিল্পের মধ্যে কোন্ বিচিত্র সত্তার একটা সজীব স্পর্শ লুকিয়ে রয়েছে, যা মেশিনের নিখুঁত সৃষ্টির মধ্যেও নেই? প্রশ্ন আরও জটিল হয়ে পড়ে, যদি বলা যায় যে ঐ মেশিনও তো মানুষের হাতেই চলছে। তবে মেশিনগড়া জিনিসকে হাত-গড়া জিনিস বলতে বাধা কি?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শিল্পের আর একটী সামাজিক বনিয়াদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শিল্পের মানবিকতা। সর্বক্ষেত্রে, সকল চিন্তা ও কর্মের মধ্যে, সৃষ্টি ও অনুশীলনের প্রয়াসের মধ্যে ব্যক্তি-মানুষের মন বৃহত্তর মানবিক আত্মীয়তার স্পর্শটুকু পাওয়ার জন্য কাঙাল হয়ে রয়েছে। মানুষ তাই নিছক জড় লীলার অগ্নি বায়ু সূর্য ও পবন পর্জন্যকে মানুষের রূপে কল্পনা করেছে। গরু ঘোড়ার মত পশু তাই মানুষের কাছে নিছক পশু নয়। তারা সুশীলা কপিলা ও চৈতক। মানুষের মতই এক একটী সমাদরের নামে তারা মানুষের পারিবারিক অন্তরের সঙ্গী হয়েছে। মানুষ তার বাড়ীর নাম দেয়, গাড়ীর নাম দেয়। বসন্ত রায়ের তরবারিটীর নামও 'গঙ্গাজল'। জড় বা জীব, এমন কি কঠোর বুদ্ধিজ চিন্তার দেহহীন নির্ব্যক্তিক (abstract) সত্তাকেও রূপের ও রসের অনুলেপনে মানুষ তার ওপর কায়া ও প্রাণের আরোপ করে। এই কায়া মানুষেরই কায়ার মত এবং সহস্র কাব্যে তারই মানবিক রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। দার্শনিকের কাছে যে-বিষয় শুধু একটা বাৎসল্যের ব্যাখ্যা মাত্র, শিল্পী মানুষের কাছে তাই যশোদা-কৃষ্ণ। তাত্ত্বিকের কাছে যে-বিষয় দুর্জয় নশ্বরতা ও মৃত্যুলোকের অজ্ঞেয় রহস্য, শিল্পী মানুষের কাছে তাই সাবিত্রী-সত্যবান ও বেহুলা-লখিন্দরের মূর্তি। ছোট ছেলে প্রবৃত্তির বশে যেমন সব জিনিসকে মুখের কাছে টেনে এনে আস্বাদ নিতে চায়, শিল্পী মানুষের প্রবৃত্তির ভঙ্গীও কতকটা তাই। জড় জীব বা নির্বিকল্প চিন্তা—সব কিছুকেই মানুষের

রূপে তৈরী করে নিয়ে, তবেই সে আত্মিকতার আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। শিল্পীর হাতে গড়া জিনিসের মধ্যে, তার ব্যক্তিগত মনের মাধুরী যেন মিশে রয়েছে। ক্রেতা অবশ্যই পয়সা দিয়ে এই শিল্প কিনে থাকেন, কিন্তু তবু এই শিল্পকে হাতে-তুলে-দেওয়া উপহারের মত প্রীতিময় মনে হয়। মেশিনের তৈরী শিল্পকে ক্রেতা এতটা রসোপেত বস্তু মনে করে না। শিল্পের একটা সামাজিক বনিয়াদ—মানবিকতা বা হিউম্যানিজম্।

এইবার আর একটী প্রশ্ন তোলা যাক্। আজকের দিনে আমাদের কাছে অশোক স্তম্ভের মূল্য কি শুধু তার লৌহময় ওজনটুকুর সমান? প্রিয়জনের দেওয়া একটি দু'পয়সা দামের উপহার যাবজ্জীবন যত্ন করে রাখার অভিলাষ কোথা থেকে আসে? ভারতবর্ষের কোহিনুরের দাম কি শুধু বাজারের হীরের দরে যাচাই করা যায়? আজকের বুদ্ধাস্থি কি শুধু অস্থি মাত্র? মাইকেল মধুসূদনের সমাধিক্ষেত্রের একটি গোলাপ ফুলের চেয়ে মার্কেটের একটি দামাস্কা গোলাপের তোড়া, মূল্যগুণে বেশী কি কম? ঠিক এই প্রশ্নের সূত্রেই আমরা আরও বহু জিজ্ঞাসার জের টানতে পারি। একটি সারনাথের পুতুল, একটি জগন্নাথের পটের ছবি, একটি বিবেকানন্দের বাস্ট্, এরা কি শিল্প মাত্র না সামগ্রী মাত্র? এর মূল্যনির্ণয়ের কোন মান আছে কি?

এরাও শিল্প নিশ্চয়, কিন্তু এর আর্ট লৌকিক মূল্যে নির্ণীত হবার নয়। কারণ এর মধ্যে বিগত ইতিহাসের এক ভাবময় সত্তার স্পর্শ রয়েছে। বহু শতাব্দীর বহু মানুষের অনুভব দিয়ে গড়া এইসব শিল্পগত নিদর্শন জাতির মনের বিশেষ একটা শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে রয়েছে। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ঘটনা প্রভৃতির আনুষঙ্গিক সেন্টিমেন্টের সঙ্গে এই সব শিল্পকীর্তি একাত্ম হয়ে আছে, এটাই তার যথার্থ মূল্য। এখানে এসে আমরা শিল্পের আর একটি সামাজিক বনিয়াদ পেলাম। সেন্টিমেন্ট বা অনুভবগত বনিয়াদ।

এর পর একবার কল্পনা করা যাক্, স্পেনীয় দস্যুবণিক সাবেক আমেরিকার অ্যাজটেক্ বা মায়া কারিগরের বুকে বেয়নেট চেপে সোনার মূর্তি তৈরী করিয়ে নিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বন্দী দাস ও শ্রমিক প্রাণপাত করে মিশরের পিরামিড গড়ে তুলেছে ; এক হাতে দাদনের কবলা ও আর এক হাতে বন্দুক নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পেয়াদা বাঙ্গালী তাঁতীর উঠোনে দাঁড়িয়ে মস্লিন তৈরী করাচ্ছে। কিম্বা, আধুনিক ভারতীয় পুঁজিপতির কারখানায় মজুরীভোগী শিল্পী ও কারিগরের দল দাসত্বের অঙ্কুশে তাড়িত হয়ে দিনের পর দিন বহু বিচিত্র দারুময় ও ধাতুময় উপকরণ তৈরী করে চলেছে। এই শিল্পকে আমরা কি সত্যিই 'শিল্প' আখ্যা দিতে পারি? কোন পুঁজিপতি যদি এইভাবে তাঁর পটারি কারখানায় শ্রমিকের শ্রমকে অশ্রদ্ধ বঞ্চনার কৌশলে আয়ত্ত করে, দৈনিক একলক্ষ ধ্যানী শিবের মূর্তি তৈরী করে দু'পয়সা দামে বিক্রী করেন, তবুও কি সমাজতত্ত্বের বিচারে তা সমর্থনীয় হতে পারে? কখনই না। শিল্পের সাধনার পদ্ধতি কখনই এতটা নীতিহীন হতে পারে না। ঐ ধরনের শিল্পরীতি জাতিকে সমৃদ্ধ করা দূরে থাক্, বরং জাতিকে নিঃস্ব করবেই।

সুতরাং নৈতিক ভিত্তি নামে শিল্পের আর একটী সামাজিক বনিয়াদ আছে, একথা যেন আমরা ভুলে না যাই। ক্লিওপেট্রাকে হত্যা করে তাঁর কবরীনিবদ্ধ স্বর্ণপুষ্পটী যাকেই উপহার দেওয়া যাক, তার মধ্যে প্রীতির মহিমা কখনো থাকতে পারে না। গ্রহীতার মন এ উপহার হাত পেতে নিতে শিউরে উঠবে, কারণ তার সঙ্গে এক নীতিহীন নিষ্ঠুরতার অদৃশ্য রক্তবিন্দু মিশে আছে।

আর্টের নীতিগত ভিত্তি সভ্য মানুষ কখনো পরিহার করতে পারে না। মালা আর তরবারির পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দেওয়া শিল্পের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে, নীতিগত ভিত্তিটা কি?

উপমার সাহায্যে একটা উত্তর দিতে পারা যায়। এই উপমা গান্ধীজীর লজিক থেকে ধার করা। মৌমাছি নামে একটী শিল্পী-পতঙ্গের কাজের প্রণালী সবাই লক্ষ্য করেছেন। মৌমাছি

শুধু শিল্পী নয় ; কেমিস্টও। প্রত্যূষের আলোকের সাড়া জাগবার মুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে দিন সমাপনের আব্ছা আঁধারের প্রথম মুহূর্ত পর্যন্ত এই শিল্পী পতঙ্গ ফুলের মধু আহরণ করে বেড়ায়। কিন্তু ফুলের জীবন বিপন্ন হয় না অথবা ফুলের বর্ণ ও সৌরভের কিছুমাত্র হানি হয় না। শিল্পসৃষ্টির নৈতিক বনিয়াদ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদের নিয়মে শ্রমিকের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেই শিল্প সৃষ্টি হয়ে থাকে। সোস্যালিস্ট বিচারেই বলুন বা সরল মানবতাধর্মী বিচারেই বলুন, শিল্পের এই নৈতিক ভিত্তিকে অটুট রাখাই সভ্যতার মর্যাদা।

এইবার আর একটা দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখে শিল্পের সামাজিক বনিয়াদের আর এক দফা সূত্র আবিষ্কার করা যাক্। শিল্প বা আর্টের ক্ষেত্রে বর্তমানে দুটো ক্ষতিকর প্রথা প্রবল হয়ে উঠেছে। এ দুটোর মধ্যেই সামাজিক বনিয়াদ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রথম, ছকবাঁধা (standardised) রীতি। দ্বিতীয়, ওস্তাদী (specialised) রীতি। যে দিন থেকে ক্ষমতাবান সম্প্রদায় সভ্যতাকে মার্কেটের ছাঁচে গড়ে তোলবার জন্য তৈরী হয়েছেন, সেদিন থেকেই এ দুটী মানবতা-বিরোধী রীতি শিল্পের সামাজিক ধর্মকে চাপা দিতে আরম্ভ করেছে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে ব্যক্তিগত অধিকারের নিয়ম। একজন নৃত্যপরা পাভলোভা বা ইসাডোরা ডান্কানের কীর্তি এক লক্ষ নৃত্যকুশলতাহীন মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে দেখে। একজন সুকণ্ঠ ওস্তাদের সঙ্গীত এক হাজার শ্রোতা বোবার মত তাকিয়ে শোনে। মানুষের প্রথম সামাজিক অভ্যুদয়ের মূলে এধরনের ব্যাপার সম্ভব হয়নি। শিল্পের ক্ষেত্রে সেদিন এককতার স্থান প্রধান হয়ে ওঠেনি। সমষ্টিগত উদ্যোগে সৃষ্টি ও চর্চার নিয়মই স্বাভাবিক ছিল। বর্তমানে ‘খেলা’ (sport) নামে আর একটী সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মধ্যে এই ওস্তাদী-রীতিকে বড় করে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিল্প নিতান্তই লোকগত বিষয়। নিজে সৃষ্টিকুশলতাহীন ও নিষ্কর্মা থেকে অপরের শিল্পসৃষ্টিকে উপভোগ করাই সভ্যতাসঙ্গত পন্থা নয়। এবং ছক-বাঁধা মাপে শিল্পসৃষ্টি করলেও সেটা শিল্প হয় না। যেহেতু বৈচিত্র্য সমাজের একটী রূপ ও অঙ্গ, সেহেতু শিল্পের রূপের বৈচিত্র্যও স্বাভাবিক। শিল্পসৃষ্টির শক্তিতে দীনতা দেখা দিলেই ধরাবাঁধা ‘প্যাটার্ণে’র আধিপত্য প্রবল হয়ে ওঠে। শিল্পে ‘ডিজাইন’ ও ‘ফর্ম’ কাম্য বিষয়, কিন্তু তথাকথিত প্যাটার্ণ বা স্ট্যাণ্ডার্ড কদাপি নয়। বর্তমানে দেখতে পাই, শিল্পের ক্ষেত্রে ঘোড়ার আগে গাড়ী লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারিগরেরা এক ছাঁচে এক লক্ষ পরিচ্ছদ তৈরী করেন, মানুষ কষ্টে-সৃষ্টে তার মধ্যে হাত-পা-মাথা গলিয়ে নিজেকে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে। মানুষের দাবীতে শিল্পসৃষ্টি না হয়ে শিল্পের দাবীতে মানুষকে গড়বার চেষ্টা—এই জটিলতার ফলে শুধু লাভ হয়েছে শিল্পের অপভ্রংশ।

একমাত্র সামাজিক জীব মানুষই শিল্প সৃষ্টি করে। বাবুই পাখী যে বিচিত্র নীড় রচনার কৃতিত্ব দেখায়, সেটা তার শিল্পীমনের কাজ নয়, নেহাৎই জৈবিক প্রবৃত্তিজাত আচরণ। একটুখানি রঙ মাখিয়ে দিলে বাবুই পাখীর বাসা আরও সুন্দর হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি এতখানি বিচারবান কোন বাবুই পাখী নেই। সামাজিকতার গুণেই মানুষ শিল্পী হতে পেরেছে, এটা ঐতিহাসিক সত্য। সেই কারণে, শিল্পও নিতান্ত সামাজিকতার ব্যাপার। অর্থাৎ, অপরকে নিবেদন করার জন্য এর সৃষ্টি, নিতান্ত আত্মোপভোগের জন্য নয়। সেক্সপীয়ার আমাদেরই জন্য কাব্য সৃষ্টি করেছেন, তানসেন আমাদেরই জন্য গাইতেন, রবিবর্মা আমাদেরই জন্য ছবি এঁকেছেন। শিল্প নিভৃত তপস্যার মত ব্যাপার নয়। আদান-প্রদানের নিয়মে, প্রচারের ধর্মে ও অপরের অনুভবের সঙ্গে নিজস্ব উপলব্ধির সাযুজ্য ও বিনিময়েই শিল্প সার্থক হয়ে থাকে। যে শিল্পীর দৃষ্টি সামাজিক মনে সাড়া তুলতে পারে না, তাকে ব্যর্থ শিল্প বলেই ধরে নিতে হবে। অপরে বুঝতে পারে, এইটুকু প্রসাদগুণ না থাকলে শিল্প আবর্জনামাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সবাকার স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার ওপরেই শিল্পের সামাজিক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত।

তারপর, শিল্প মানুষের জীবনে আচরণের রূপে প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু এই আচরণও সামাজিক বনিয়াদের সঙ্গে একটা বৈজ্ঞানিক নিয়মে সংযুক্ত। শিল্প ও জীবন--এ দুটী বিচ্ছিন্ন দুটী বিষয় নয়। শিল্প জীবনকে মণ্ডিত অভিভূত বা আচ্ছন্ন করে আছে। জীবন নামে ভিন্ন একটা জৈবিক আচরণ এবং মাঝে মাঝে শিল্প নামে একটা সামাজিক আচরণ, মানুষ এভাবে নিজের সত্তাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে সার্থক করতে পারে না। তবুও আমরা দেখতে পাই, আজকের দিনের নানা ভ্রান্তি ও জটিলতার মধ্যে মানুষ এই একটী সামাজিক বনিয়াদ হারিয়ে ফেলতে চলেছে। 'কাজ' নামে আচরণকে আমরা নিছক জীবিকা অর্জনের একটা শ্রমপূর্ণ ভিন্ন অধ্যায় বলে স্বীকার করে নিয়েছি। এই 'কাজ' সারা হবার পর নাকি মানুষ শিল্প সৃষ্টি বা উপভোগ করে থাকে। এই ভুলের বশেই 'অবসর' নামে একটা অদ্ভুত (Leisure theory) ব্যাপার দেখা দিয়েছে। এই অবসর বিনোদনের জন্যেই নাকি নাচ গান হাসিতামাসা ও শিল্পকলার প্রয়োজন।

এইখানে জিজ্ঞাস্য, কাজের মধ্যেই হাসি গান বর্ণ ছন্দ সৌরভ মিশিয়ে থাকলে দোষ কি? মানুষের সমাজে শিল্পের আবির্ভাব এইভাবেই তো হয়েছিল। প্রথম মানুষ যিনি প্রথম মাটীর বুকে ফসল ফলাবার স্বপ্ন নিয়ে ধানের বীজ বপন করেছিলেন, তিনি সেদিন কাজের প্রেরণাকেই সুন্দর করার জন্য গান গেয়েছিলেন। 'কাজ' নামে আচরণটাই বর্তমানে একটা লক্ষ্মীছাড়া ব্যাপার। ক্লান্তি ও অবসাদই এর একমাত্র উপহার। বাণিজ্যগত সভ্যতার প্রকোপে এই ভুল আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, যদিও মানুষ মর্মে মর্মে জানে যে, রূপরসহীন কাজের মধ্যে তার মন ও শরীর কোনটাই তৃপ্ত হয় না। যেহেতু মানুষ শুধু দেহ দিয়েই কাজ করে না, মন দিয়েও কাজ করে, সেই হেতু কাজের মধ্যে আর্টের সমারোহ থাকা চাই। এটা শিল্পের সামাজিক বনিয়াদ।

শিল্পের সামাজিক বনিয়াদ যেমন আছে, তেমনি সমাজের প্রাকৃতিক বনিয়াদ আছে। কিন্তু এই সহজ সত্যটী আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মৃত হই। সেই জন্যই এমন কথা পণ্ডিতদের মুখে শোনা যায় যে--প্রকৃতিকে পরাভব করে মানুষ এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে এই অপ্রাকৃতিক ধারণা মানুষের শিল্পকে কিছু কিছু বিভ্রান্ত করেছে। আর্ট শুধু জাতীয় ব্যাপার নয়, মোটামুটি আন্তর্জাতিকও নয়, ধর্মতঃ জাগতিক ব্যাপার। মানুষ নিজেই প্রকৃতির অংশ, সুতরাং প্রকৃতিকে জয় করার প্রশ্নই আসে না। এবং মানুষের সৃষ্টি প্রত্যেক শিল্পে এই প্রকৃতির আবেদনটুকু বাদ পড়লে, সেটাও অসামাজিক হয়ে পড়ে। শিল্পী মানুষের কল্পনার মধ্যেও প্রকৃতির পরমাণু সমাবিষ্ট হয়ে আছে। এমন কোন বর্ণ গন্ধ ছন্দ সুর ও সৌরভ মানুষ কল্পনা করতে পারে না, প্রকৃতির মধ্যে যার নজীর নেই। প্রকৃতির মধ্যে যা আছে, তাকে আরো বেশী করে পাওয়াই শিল্পের লক্ষ্য। এমন কোন কবিতা যদি আমরা পড়ি, যা পড়ে হাসি আসে না, কল্পনাও পায় না, রাগও হয় না, ভাবও হয় না—পার্থিব কোন রূপ রস অনুভবের সাড়া জাগে না--সেখানে বুঝতে হবে যে সেটা কবিতাই নয়। কারণ সেটা প্রকৃতিহীন। সেটা অক্ষরের আবর্জনা মাত্র। সেই জন্যেই যদি কোন চিত্রকর জ্যামিতিক উপপাদ্যের মূর্তির মত একটা কিছু এঁকে আমাদের কাছে এসে দাবী করেন যে তিনি 'ছবি' এঁকেছেন, আমরা স্বাভাবিক সংশয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হই। সেই জন্যই কতকগুলি চটুল শব্দ সাজিয়ে একটা কিছু রচনা করে যখন কোন কবি এসে বলেন, এটা কবিতা লিখেছি, তখনই আমাদের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। পনর হাজার বছর আগেকার চাষার গান ও ছড়া আজও আমরা অনুভব দিয়ে উপভোগ করি, সেটা আজও সাহিত্য হয়ে হাজারো উপকথায় ও রূপকথায় আমাদের সঙ্গে বেঁচে রয়েছে। কিন্তু ডাকিনীর তুক্ তাক্ ঝাড়ফুঁকের ভয়াবহ শব্দটংকারকে আজও আমরা সাহিত্য বলে স্বীকার করিনি এবং সেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এর একমাত্র কারণ, প্রাকৃতিকতার অভাব। প্রকৃতির সঙ্গে এসব সৃষ্টির যোগ ছিল না। চিন্তা ও বিকারের মধ্যে যে

প্রাকৃতিকতার পার্থক্য, রূপকথা ও ডাকিনীর মন্ত্রে সেই পার্থক্য। শিল্পের সামাজিক বনিয়াদের আর একটা বিষয় হলো শিল্পের প্রাকৃতিকতা।

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে--শিল্পের উদ্দেশ্য হলো লোকরঞ্জন। সভ্যতার ক্ষেত্রে শিল্পের সার্থকতা সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। শিল্পের আভিজাত্য বা কৌলীন্যের মধ্যেই শিল্পের মৃত্যুর বীজ নিহিত থাকে। 'বহুজনসুখায়' এবং 'বহুজনহিতায়' শিল্পের সাধনা। লোকময়তার মধ্যেই এর আয়ু। শিল্প যদি অল্প কয়েকজন ভাগ্যবানের অনুগ্রহ ও চর্চার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তবে সেই শিল্প মন্দস্রোত নদীর মত নিজের আলস্যেই দূষিত ও পঙ্কিল হয়ে উঠবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই শিক্ষাই বার বার মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে যে, রাজার অনুগ্রহ বা কোন বৃত্তিপুষ্ট ঘরানার চেষ্টার জোরে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সর্বসাধারণের আচরণ রুচি ও কুশলতার মধ্যেই শিল্পের প্রাণপীঠ স্থাপিত। লোকে শিল্পকে সৃষ্টি করলে, তবেই শিল্প লোকোত্তর হবার শক্তি লাভ করে। অজন্তা ঘরানার চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি আজ আর বেঁচে নেই, সেই রীতির ঐতিহ্য কোন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিভার মধ্যে ধারাবাহিক ভঙ্গীতে এগিয়ে আসতে পারেনি। কারণ, সন্দেহ হয়, অজন্তা-পদ্ধতি হয়তো এক কুলীন শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে দেখতে পাই, আল্‌পনা-রীতি আজও বিনা রাজানুগ্রহে ও কোন প্রচণ্ড শিল্পাচার্যের অনুশাসন ব্যতিরেকে জনসমাজে সজীব হয়ে রয়েছে। শিল্পের এই স্বচলতার বনিয়াদ হলো লোকসাধারণের প্রতিভা। গোষ্ঠী বিশেষে শিল্প যদি কেন্দ্রিকতা (Centralisation) লাভ করে, তা'হলে সেই শিল্প সামাজিক বনিয়াদ থেকে বিচ্যুত হবে এবং সে শিল্প অকাল মৌশুমী বাতাসের মত একটা রসিক আবহাওয়া সৃষ্টি করলেও, চিরকালের পরিণামের মধ্যে তার কোন দান থাকবে না।

শিল্পের সৃষ্টির ক্ষেত্রে আর একটী বনিয়াদের সন্ধান পাই এর সহজস্ফূর্তির মধ্যে। শিল্প বিধিবদ্ধতাকে (Codification) সহ্য করতে পারে না। টেক্‌নিকের জ্ঞান এখানে তুলিকার মত উপচার মাত্র, কিন্তু টেক্‌নিক শিল্পের পরিণাম নয় এবং প্রেরণাও নয়। ভাস্কর যদি শুধু প্রতিমালক্ষণের সূত্রগুলি পড়ে, হুবহু মিলিয়ে মিলিয়ে মূর্তি নির্মাণ করেন তবে সেটা নির্জীব শিল্প মাত্র হবে। শিল্পীর জগৎ মাত্রা দিয়ে বাঁধা নয়, কিন্তু সমাজবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই শিল্পে বিধিবদ্ধতা যেমন দূষণীয়, তেমনি খেয়ালী অনাচারও অপরাধ। নিছক কাল্পনিকতার মধ্যে শিল্পের কোন বনিয়াদ নেই, নিছক বাস্তবিকতার মধ্যেও নেই। জাগতিক জীবনের প্রতিটী প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে, সকল মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত নতুন এক রসলোক এই শিল্প। শিল্পীর জগৎ বায়রণের স্বপ্নের মত ঃ A dream which is not all a dream.

জাতীয় 'আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি'

মরুপথে উটের পিটে সওয়ার হয়ে যিনি জয়শলমীর গেছেন, তিনিই জানেন চারদিকের নিসর্গে কী নিদারুণ শোবার কার্পণ্য। আকাশে ও মাটীতে একটা বিবর্ণতা ভ্রূকুটী করে রয়েছে। বনজঙ্গলও দেখা যায়,. কিন্তু তার মধ্যেও প্রাণপূর্ণ সবুজের সাক্ষাৎ কোথাও পাওয়া যায় না। চারদিকে একটা মলিন ধূসরতা—পোড়া পোড়া ভাব। যাত্রীর চোখ বৃথা হয়রাণ হয়, কোথাও একটু বর্ণময় প্রসন্নতার আভাষ পাওয়া যায় না। এই রুক্ষতার আক্রমণে মনমেজাজ একেবারে তেতো হয়ে যাবার আগেই যাত্রীর চোখে পড়বে উটের গলায় একটি রঙীন অলঙ্কার ঝলমল্ করছে। এই অলঙ্কারটীর নাম 'গলাবন'। অর্থাৎ টুকটুকে লাল রেশমী কাপড়ের ওপর ছোট ছোট আয়না আর সুশ্বেত কৌড়ি বিচিত্রিত ভাবে গাঁথা, দুপাশে পেঁজা

পশমের ঝালর। শুধু এই অলঙ্কারটাই নয়, একে একে যেসব সামগ্রী ও উপকরণ চোে পড়বে তার মধ্যে বর্ণাঢ্যতাই সব চেয়ে প্রবল। পিপাসার্ত হলে উটের চালক একটী কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবে। এই কুঁজোর নাম 'কোপি'--উটের বহিঃচর্মের সঙ্গে যে স্বচ্ছ একটী অন্তশ্ছদ চামড়া থাকে, এই কোপি তাই দিয়ে তৈরী। শুধু লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই কোপির গায়ে চিত্রাঙ্কন। বহু বর্ণে রঞ্জিত কোন ইরাণীয় দ্রাক্ষাকুঞ্জ গোলাপবাগ বা কোন শাহী কেল্লার মিনার শোভা কোপির সুবর্তুল অঙ্গে ফুটে রয়েছে। রং এমনি পাকা যে তেলজল লাগলে মুছে যায় না বা বিকৃত হয় না। একে একে সবই চোখে পড়বে। সহযাত্রী রাজপুতের কোমরবন্ধে তরবারি ঝুলছে। কোমরবন্ধের চামড়ার কাজ সাজ ও ডিজাইন, তরবারির খাপ, মাথার পাগড়ী, পায়ের নাগ্‌রা--সব কিছুর মধ্যে রঙের জলুসটাই সব চেয়ে বেশী প্রকট। সেই মুহূর্তে যাত্রীর মন নৈসর্গিক বিবর্ণতার আক্রমণ থেকে মুক্তি পায়, মানুষের জীবনে শিল্পের কীর্তি ও ক্রিয়ার একটী সূত্র ধরা পড়ে যায়। প্রকৃতি যেখানে কৃপণ, মানুষ সেখানে তার নিজের সাধনাকে এনে শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়েছে। প্রকৃতির বিবর্ণতাকে হঠিয়ে দেবার জন্যই বোধ হয় রাজস্থানী শিল্পে এত বর্ণাঢ্যতা। শিল্পী মানুষ তার প্রয়োজনের দাবীকে ঠিক ছাঁদে বেঁধে রেখেছে। আর্টের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যেমন গর্হিত, একেবারে নিতান্তও তেমনি গর্হিত। তাই সর্বত্র ছন্দ তাল মান ব্যালেন্স হার্মনি ও সামঞ্জস্যের বোধ সকল রুচি ও শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে কাজ করছে। বাংলা দেশে 'সাদা'র আদর অন্যদেশের তুলনায় বেশী। ঘন সবুজের দেশে 'সাদা' সত্যই একটী রঙ বিশেষ। শেওলা ঢাকা দীঘীর ধারে একটি সাদা বক বসে থাকলে, শেওলার সমস্ত সবুজত্বে যেন একটা প্রাণের মাত্রা থাকে, নইলে সবটাই সবুজের আবর্জনা মনে হতে পারে। বাংলা দেশের লোকের সাদা ধুতি চাদরের ওপর আগ্রহ বেশী, এটা স্বাভাবিক।

জীবনযাত্রার উপকরণকে শুধু খাঁটি কাজের জিনিস হিসাবে গড়ে তুলেই মানুষের কর্তব্য ফুরিয়ে যায় না। এই কাজের জিনিসের মধ্যেও সুচারুতার আয়োজনকে মানুষের সৃষ্টিবৃত্তির দ্বিতীয় নিয়ম বলেই ধরে নিতে হবে। নইলে ঐ কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ যাত্রীবাহক জীবটার গলায় কৌড়ির মালা পরিয়ে দিতে হয় কেন? মুণ্ডচ্ছেদ করার জন্য নিষ্ঠুর অস্ত্র ঐ তলোয়ারটার খাপের ওপর এত নক্সা কেন? শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলে মনে হয় যে, প্রয়োজনের বিজ্ঞান আর পরিসজ্জার শিল্প--এই দুটি জিনিস ভিন্নতর নয়। এরা বাগর্থের মত একাধারে সম্পৃক্ত। এরা উভয়েই বিজ্ঞান অথবা উভয়েরই শিল্প। এরা সহজাত।

সম্প্রতি কলকাতায় আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি নামে একটী প্রদর্শনী হয়ে গেল। কাজের জিনিসকে কতখানি চারুতায় ভূষিত করতে পারা যায়, সম্ভবতঃ এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যই তাই। অন্ততঃ নাম থেকেই এই ধারণা হয়। আর একটু জোর করে যদি কোন অর্থ ধরা যায়, তবে বলতে হয়--কাজের জিনিস সৃষ্টিতে আর্ট কতখানি প্রেরণা দিতে পারে, এই প্রদর্শনীর সেটাও একটা উদ্দেশ্য। এই প্রদর্শনী সেদিক দিয়ে কতটা সাফল্যের দাবী করতে পারে, তার বিচার দর্শক-সাধারণ ও শিল্পী-সম্প্রদায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া গেল। এ প্রসঙ্গে শুধু কয়েকটী প্রশ্ন তুলতে ইচ্ছে করছে।

আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি আখ্যাত প্রদর্শনী কি শুধু কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের সুরঙ্গীন বিজ্ঞাপন? বাঁধিপোতার গামছার প্রচারের জন্য যদি একটা সাতরঙা পোস্টার এঁকে দর্শকদের সাম্‌নে বিজ্ঞাপিত করা হয়, তবেই কি 'আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি' সার্থক হলো? মামুলি চেহারার ঐ গামছাটীর কোন উন্নতি হলো কি? ব্যবসায়বৃত্তি প্রবল হলে মুনাফার লোভটাই বড় হয়ে ওঠে। তখন পণ্যের উৎকর্ষের চেয়ে পণ্যের প্রসারটাই প্রথম প্রশ্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু আর্টের উপর যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে উৎকর্ষকেই পণ্যের প্রসারের শ্রেষ্ঠ পন্থা মনে হবে। দুর্ভাগ্য, উৎকর্ষ বাদ দিয়ে প্রসার সম্ভব কি না, পণ্য সৃষ্টির ব্যাপারে এইটাই আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থাৎ ফাঁকির আর্ট।

আর একটী প্রশ্ন। প্রদর্শনী অর্থ মিউজিয়ম নয়। কিন্তু সচরাচর আমরা কি দেখি? নতুন পুরাতন, বিশেষ নির্বিশেষে, অচল ও প্রচলিত কতগুলি কীর্তি ও সৃষ্টিকে গ্যালারি করে সাজিয়ে লোকচক্ষুর সাম্‌নে একটা দৃশ্য বিতরিত হয় মাত্র। একেই আমরা প্রদর্শনী বলি। মিউজিয়ম ও প্রদর্শনী—দুটীই শিক্ষাদাতা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু উভয়ের শিক্ষাদানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মিউজিয়মের প্রভাব ও কাজ ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। প্রদর্শনীর কাজ সাক্ষাৎ প্রেরণা দেওয়া, পন্থা নির্দেশ করা, আদর্শ চিনিয়ে দেওয়া। প্রদর্শনী আপনার রুচি ফিরিয়ে দেবে, শিল্পবোধকে হাতেকলমে গুণান্বিত করবে, জটিলকে সরল করবে, অভাব্যকে প্রাপ্তব্য করে তুলবে। বিদ্যায়তন শুধু ছাত্রদের জন্য, প্রদর্শনী সাধারণের বিদ্যায়তন। এক্ষেত্রে সমস্ত জনসাধারণকেই সুশিক্ষিত করার দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রদর্শনীর। এ ছাড়া প্রদর্শনীর অন্য কোন সৌখীন অস্তিত্বের কোন মূল্য নেই।

ভারতের ঐতিহ্যগত অথবা জাতীয় 'আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি' প্রসঙ্গে প্রথমেই একটা মন্তব্য করতে লোভ হয়। শিল্পের ইতিহাসে ভারতীয় শিল্পীর আর্ট নিষ্ঠার যে পরিচয় আমরা পাই, পৃথিবীর কোন দেশে তার সমতুল্য নিষ্ঠা ও সাফল্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এসিয়া মহাদেশের মাত্র দুটী দেশ ভারতের সঙ্গে এ বিষয়ে সমকক্ষতা দাবী করতে পারে—চীন ও ইরাণ। কিন্তু ভারতীয় কারুশিল্পের কতগুলি বিশেষ গৌরব ও গুণ আছে, যা অন্য কোন দেশে নেই! ভারতের সেই জাতীয় 'আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রির' ইতিহাস একটু তদারক করে এই বৈশিষ্ট্যের কয়েকটা হেতু আবিষ্কার করা যায়। সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির নিয়ম কারণ ও তাৎপর্যের কতগুলি গূঢ় ইঙ্গিত আপনা আপনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতের লৌহশিল্পের ঐতিহ্যের কথা উঠলেই প্রথমে মনে পড়ে অশোকস্তম্ভের কথা। দিল্লীতে কুতব মিনারের কাছে এই নিষ্কলঙ্ক কীর্তিটী আজও পথিকের বিস্ময় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতের আরও কতগুলি মুণ্ডা লোহার (Wrought Iron) ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। দেশীয় রাজ্যের অস্ত্রাগারগুলিতে প্রাচীন লৌহাস্ত্রের অনেক নমুনা আছে। ইস্পাতের কাজ ভারতীয়দের অনধিগত ছিল না। তাঞ্জোরের তৈয়ারী পৌরাণিক স্টাইলের অস্ত্রশস্ত্র (পরশু, পট্টিশ, অংকু, কুঠার ইত্যাদি) উঁচুদরের ইস্পাতের কারুকার্যের (steel-carving) প্রমাণ।

কলাই করা (Tinned Metal) ধাতুপাত্রের ব্যবহার উত্তর ভারতে সুপ্রচলিত। এই শিল্পে কাশ্মীরের শিল্পীরাই সব চেয়ে পটু। কাশ্মীরে তৈরী সুদৃশ্য আফ্‌তবা, তশ্‌ত ও সুরাহির (কুঁজো) গঠন ও কারুকার্য যেকোন সৌখীন মানুষের প্রশংসা আকর্ষণ করবে। এই কারিগরী প্রথাটী ইরাণ থেকে আমদানী। তাই কাশ্মীরের ধাতুশিল্পের মধ্যে এসিয়া মহাদেশের বিবিধ ও বিচিত্র ভঙ্গীর এক মহাসমন্বয় দেখা যায়—কফির পেয়ালা ও সিনি (Tray) সমরকন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়, বয়মের (Jar) মধ্যে বোখারার প্রভাব, তামার পাত্রে লাদাখ তিব্বতের স্মৃতি। সব চেয়ে শুনতে আশ্চর্য লাগে 'মার্তাবান' নামে বয়মের কথা। নাম থেকে বোঝা যায়, এই বয়মের আদি নিবাস ব্রহ্মদেশে। ভারতীয় শিল্পের আহরণে পড়ে এই মার্তাবান আজ একেবারে ভারতীয় হয়ে গেছে। কাশ্মীর মূলতান থেকে আরম্ভ করে মোরাদাবাদ পর্যন্ত—ভারতের গ্রাম্য কারিগরের কাছে আজ এই শিল্পের ডিজাইনটি একেবারে হাতের পাঁচ হয়ে গেছে।

মীনার কাজে (Enamelling) ফ্রান্স ও জাপানের সুনাম থাকলেও ভারতের জয়পুরের কাছে সকলকে হার মানতে হয়। গাঢ় লাল রঙ ফুটিয়ে তুলতে জয়পুরী কারিগরের মত কেউ আজও কাজ দেখাতে পারেনি। জয়পুরী মীনাকাররা মন্ত্রগুপ্তির মত এই শিল্পরহস্যকে একেবারে ঘরনা করে রেখেছে।

পাতের কাজে (Plating) ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এর প্রাচীনতা সম্বন্ধেও কোন সংশয় নেই। সোনা আর রূপার পাতের কাজই দেখবার মত। দক্ষিণ ভারতের শিল্পরীতি সাধারণত 'স্বামী' পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই পদ্ধতির মধ্যে পৌরাণিক মূর্তিকে (নন্দী, চামুণ্ডা প্রভৃতি) রূপায়িত করাটাই ডিজাইনের সার কথা। সোনা ও রূপার পাতের কাজে স্বামী রীতির খুবই উৎকর্ষ দেখা যায়। কাশ্মীরী পাতের কাজে ইয়ারকন্দ, লাসা, ও চুনারের ভঙ্গী এসে মিশেছে। গোলাবপাশ (Sprinkler), আসাসোটা (Mace) আতরদান পানদান প্রভৃতি আসবাবের মধ্যে পাতের কাজের দক্ষতা ও সূক্ষ্মতা খুবই অগ্রসর হয়েছে।

তাবের কাজের (Filigri) ইতিহাসে একটা আন্তর্জাতিকতার কাহিনী লুকিয়ে আছে। ঠিক একই ধরনের কাজ আরব মাল্টা জেনোয়ার নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক ও গ্রীসে এবং ভারতের কটকে দেখা যায়। কটকের গ্রাম্য রৌপ্যকারের দশ বছর বয়সের ছেলেও এই 'রূপোর সুতো' তৈয়ারীর কাজে সুপটু। এই সুতো দিয়েই তারপর নানারকম সুগন্ধির আধার ইত্যাদি তৈরী করা হয়। কটকের শিল্পীর সবচেয়ে প্রশংসনীয় গুণ হলো এই যে, তারা যেসব নগণ্য উপচার নিয়ে যত অল্প সময়ের মধ্যে তারের কাজ সারতে পারে, অন্য দেশের শিল্পীদের দক্ষতা সেই পর্য্যায়ে পৌঁছয়নি। আরও প্রশংসা করতে হয়, এই কাজে তাপতত্ত্ব সম্বন্ধে সমূহ জ্ঞান না থাকলে শিল্প ব্যর্থ হয়ে যায়। কটকের শিল্পীদের এই ঐতিহ্যলব্ধ বৈজ্ঞানিকতা আছে।

কোফ্‌তগারী (Damascening) নামে ভারতে বহুপ্রচলিত একটি শিল্প আছে। কোন ধাতুপাত্রের উপর এক বা ততোধিক ভিন্ন ধাতু দ্বারা অলঙ্কৃত করাকেই কোফ্‌তগারী শিল্প বলে। সাধারণতঃ লোহা বা ইস্পাতের পাত্রের উপর সোনা-রূপার কাজ করা হয়ে থাকে। শিখ রাজত্বের সময় পঞ্জাবে অস্ত্রশস্ত্রের ওপর কোফ্‌তগারী কাজের খুবই চলন দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে শিয়ালকোট, যোধপুর জয়পুর ও তাঞ্জোরের কোফ্‌তগারী শিল্প বেঁচে আছে। কোফ্‌তগারীর প্রসঙ্গে একটী দেশীয় স্টাইলের নাম মনে পড়ে যায়—গঙ্গা-যমুনা রীতি। শুধু কোফ্‌তগারীতে নয়, তারের কাজে ও পাতের কাজে গঙ্গা-যমুনা রীতির বেশ আদর আছে। একই সঙ্গে সোনা ও রূপার মিশাল কাজকে গঙ্গা-যমুনা রীতি বলে।

বিদ্‌রী শিল্প—নিজাম হায়দারাবাদের বিদার সহরের নাম থেকেই এই শিল্পটী পরিচিত। ২৪ ভাগ টিন ও ১ ভাগ তামা মিশিয়ে যে-মিশ্র ধাতু তৈরী হলো, তাই দিয়ে তৈরী সামগ্রী সাধারণতঃ বিদ্‌রী নামে পরিচিত। বিদ্‌রীর রং কালো, কখনো ফিকে হয় না, মরচে পড়ে না, ওজনে ভারী। বিদ্‌রী ধাতুর তৈরী পাত্রের ওপর মীনা বা কোফ্‌তগারী সহজেই নিষ্পন্ন করা যায়। বাংলা দেশের কাঁসা মিশ্রধাতু শিল্পে ভারতীয় উন্নতির আর একটী নিদর্শন। বিদ্‌রী কাঁসার লোটা (ঘটি) ভারতীয়দের নিত্য প্রয়োজনের সঙ্গী। এই লোটার সঙ্গে একটু রোমান ঘনিষ্ঠতা আছে (Latin 'Lotus' = Washed)

তামা আর পিতলের পাত্রের ব্যবহার ভারতে সর্বত্র। হিন্দুর পুজোপকরণে তামার বিশুদ্ধতা শাস্ত্রমতে গ্রাহ্য। বিজাপুর, মহীশুর এবং ত্রিবাঙ্কুড়ে পিতলশিল্পের গঠনরীতিতে এখনো প্রাচীন হিন্দু রীতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। চালুক্য যুগের পদ্ধতি এর মধ্যে খুব বেশী প্রকট। তাম্রাধারগুলি গোল বর্তুল বা অষ্টকোনাকৃতি—চালুক্য যুগের মন্দিরগঠনের রীতির সঙ্গে এই রীতির একটা সাদৃশ্য আছে।

ভারতের প্রস্তর শিল্পের বিরাট ইতিহাসের পেছনে আর একটী সেইরকম বিরাট শিল্পের কীর্তি আজ আমাদের কাছে একেবারে অগোচর হয়ে গেছে—ভারতের দারুশিল্প। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির যেসব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়—তার মধ্যে সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কাজ দেখলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তার আগের যুগে শিল্পীসম্প্রদায় কাঠের মত অপেক্ষাকৃত নরম আধারের ওপরেই তাদের হাত পাকিয়ে নিয়েছিল। দারুশিল্পের সেই

ঐতিহ্যই ক্রমে ক্রমে পাথরের গায়ে এসে পড়েছে। কিন্তু সেই প্রাচীন দারুশিল্পের কোন বড় কীর্তি আজ আর বেঁচে নেই। আজ তবু পাষাণের কথা বেঁচে আছে, কিন্তু কাঠের কাহিনী একেবারে পুড়ে গেছে বা পচে লুপ্ত হয়ে গেছে। কাঠের এই নশ্বরতায় ব্যথিত হয়েই কি শিল্পীরা কঠিন পাষাণের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল? হতে পারে। মৃত মহেঞ্জোদাড়ো নগরের কবরে যে-পরিমাণ কয়লার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় সেই প্রাগার্য মহানগর সে-যুগের শ্রেষ্ঠ দারুশিল্পের গর্বে মোড়া ছিল। আকস্মিক কোন অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেই শিল্পগরিমা ভস্মীভূত হয়েছিল। ভারতের প্রাক্-ইসলামীয় পাষাণশিল্পে (মূর্তি গঠনে) কিছু কিছু গ্রীক প্রভাবের আমদানির কথা শুনতে পাওয়া যায় (দৃষ্টান্ত ঃ গান্ধার রীতি)। কিন্তু স্থাপত্যে ভারতের নিজস্ব উদ্ভাবনাই বরাবর প্রধান ছিল। ইস্‌লামীয় যুগে প্রথম প্রথম রাজকীয় প্রচেষ্টার সব স্থাপত্য কীর্তিগুলিই প্রধানত তুর্ক ও ইরাণীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে রচনা করা হয়েছিল। সম্রাট আকবরের সময় থেকে ভারতবর্ষেও যেন য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের হাওয়া একটু একটু লাগতে আরম্ভ করলো। ফ্রান্সে ও ইতালিতে যেমন অখৃষ্টান শিল্প এসে একটা সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে নতুন পরিবর্তনের অধ্যায় আহ্বান করেছিল, ভারতে সম্রাট আকবরও তেমনি অমুসলমান অর্থাৎ হিন্দু শিল্পরীতিকে মুসলমান রাজকীয় কীর্তির মধ্যে স্থান দিলেন। আগ্রার কেল্লা, ফতেপুর সিক্‌রীর প্রাসাদ ও সেকেন্দ্রার সমাধি রচনার মধ্যে সম্রাট আকবর হিন্দু স্থাপত্যের বহু রীতির জের রেখেছেন। ভারতের স্থাপত্যে আর একটী বিপ্লবের সূচনা করলো আর একটী ঘটনা। সম্রাট আকবর জাহাঙ্গীর ও শাজাহান—এঁরা সকলেই স্থাপত্য রচনায় হিন্দু শিল্পীদের নিয়োগ করতে কোন দ্বিধা করেন নি। তার ফলে যেমন নিছক ইসলামীয় রীতির মধ্যে হিন্দু ওস্তাগরের প্রতিভার ছাপ পড়লো, তেমনি নিছক হিন্দু রীতির মধ্যে অভারতীয় (তুর্ক-ইরাণীয় বা সারাসেনীয়) পদ্ধতির প্রবেশ নিষিদ্ধ রাখা গেল না। এই সময়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে এমন কোন হিন্দুমন্দির রচিত হয়নি, যার গঠন-রীতিতে সারাসেনীয় প্রভাব পড়েনি। পাথরের শিল্পের সুন্দর একটী নমুনা যোধপুরী ঝরোকা। এর মধ্যে প্রাচীন হিন্দু রাজপুত পদ্ধতি বজায় থাকলেও কিছুটা ম্রিয়মান হয়েছে নিশ্চয়। সেই সঙ্গে অভারতীয় সারাসেনীয় প্রভাব নানা ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঝরোকা, জালি, চবুতরা, ছত্রী ইত্যাদি রাজপুত স্থাপত্যের রচনার মধ্যে হিন্দু অনুশাসন অতিক্রম করে ইস্‌লামীয় প্রভাব ক্রমে মিশে গেছে। কোনমতেই আট্‌কে রাখা সম্ভব হয় নি। অবশ্য সেই পুরাতন কালেও সে রকম কোন 'কৃষ্টি রক্ষার' প্রচেষ্টা হয়েছিল কি না, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিল্পের ব্যাপারে ছুৎমার্গ আজকের ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানের এক শ্রেণীর মাথার ব্যারাম মাত্র।

প্রস্তর শিল্পে সাধারণত শ্বেতমর্মর, লাল বেলেপাথর, রামখড়ি (Soap stone), নকল ফিরোজা ও সুলেমানী পাথরের কাজ দেখা যায়। নকল জড়োয়ার কাজ ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। প্লিনির লেখায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যাম্বে প্রদেশে রতনপুর নামে একটী গ্রামে পাথরের টুক্‌রোকে যে-উপায়ে রঙ করে রত্নখণ্ডের মত তৈরী করা হয়, সে-শিল্প একমাত্র এই গ্রামটীরই নিজস্ব। চশ্‌ম্‌দার (cat's eye) ও বাবা ঘোরী (onyx) নামে পাথর স্বাভাবিক ভাবেই এখানে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। অন্যান্য নগণ্য চেহারার পাথরের নুড়ি গুলিকে ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে নেয়। তার ফলে নুড়িগুলির গায়ে বিচিত্র বর্ণের সমারোহ ফুটে ওঠে। এই নুড়ির খাঁটিত্ব যাচাই করতে বহু জহুরী গলদ্‌ঘর্ম হয়। আগ্রার তাজমহলের রচনায় অনেকে ফ্লোরেন্টাইন প্রভাব দেখতে পান। অর্থাৎ লাল বেলে পাথরের ওপর শ্বেত মর্মর গাঁথবার ভঙ্গী থেকেই অনেকের মনে এই সংশয় উপস্থিত হয়। স্যর জর্জ বার্ডউড এবিষয়ে গবেষণা করে বলেছেন যে এই ধরনের মার্বেলের গাঁথুনি ভারতে শাজাহানের আগেই প্রচলিত ছিল। এর প্রমাণ স্বরূপ দিল্লীর কাছে হুমায়ুনের সমাধির গঠনরীতি দ্রষ্টব্য। তাজমহলের ইঞ্জিনিয়ার বা স্থপতি ছিলেন জনৈক ভেনিসবাসী, এই কিম্বদন্তীর সত্যতা প্রমাণ হয়নি।

বর্ণক (বা Glazing)। মৃৎশিল্প সভ্যতার একটী মাপকাঠি। ভারতের মৃৎশিল্পের প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই আছে। কিন্তু সভ্যতরতার প্রমাণ হলো মসৃণ মৃৎশিল্প (Glazed Pottery)। মৃৎশিল্পে মসৃণতা সম্পাদনের রীতি নাকি ভারতীয়দের জানা ছিল না। এই প্রথা আসে মুসলমানদের সঙ্গে। কাহিনী আছে, চেঙ্গিস খাঁ তাঁর চীনা স্ত্রীর সঙ্গে চীনদেশ থেকে মসৃণ মৃৎশিল্প আমদানী করেন। তারপর এই শিল্প পারস্যে চালান হয়, সেখান থেকে ভারতে আসে। কিন্তু এই ধারণা খণ্ডিত হয়েছে ভারত সীমান্তের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের আবিষ্কার থেকে। অতি প্রাচীন কালের মসৃণ মৃৎপাত্রের টুক্‌রা পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কারের কথা বাদ দিলেও, আরো প্রমাণ আছে। মাদুরা প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় নগরে এখনো খাঁটি দ্রাবিড় মৃৎশিল্পে এই চেক্‌নাই বা মসৃণতা সৃষ্টির বিদ্যা সজীব হয়ে আছে। মৃৎশিল্পী কুম্ভকারেরা অধিকাংশ হিন্দু, কিন্তু কুজাগর (যারা মৃৎশিল্পের ওপর চেকনাই তোলে বা গ্লেজ করে) সম্প্রদায় মুসলমান। ভারতবর্ষে পোড়া মাটীর (Terra-cotta) সামগ্রী সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটী কালো রঙের (Black Pottery) শ্রেণী আছে। গ্রীস দেশেও প্রাচীন কাল থেকে এই ধরনের মৃৎপাত্রের ব্যবহার প্রচলিত। কাঁচা মাটীর পাত্র পোড়াবার সময় চুল্লীর ধোঁয়া চুল্লীর ভেতরেই আবদ্ধ করে রেখে পাত্রগুলিকে এইভাবে কৃষ্ণকায় করা হয়। মৃৎশিল্পকে রঞ্জিত ও চিত্রিত করার প্রথা সভ্যতমতার প্রমাণ।

ভারতবর্ষে কুজাগরেরাই মৃৎপাত্রকে মসৃণ করা ও রঞ্জিত করা, এই উভয়বিধ কাজ করে থাকে। সাসারামের রঙীন মৃৎশিল্পে একটী ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় আছে। সাসারাম স্টাইল শুধু সাসারামের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ। এখান থেকে বিশ মাইল দূরে গেলে এই স্টাইলের চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ শের শাহের সময় থেকেই এই মৃৎশিল্প প্রচলিত। স্টাইলের এই যুগব্যাপী কূপমণ্ডুকতা থাকা সত্ত্বেও স্টাইলের কেন মৃত্যু হলো না, সেটাই বিচার্য বিষয়। শের শাহী স্থাপত্যের (শের শাহের সমাধি ইত্যাদি) মধ্যে যে সারল্য ও গাম্ভীর্য বর্তমান, সাসারামী মৃৎশিল্পে তার বিপরীত ব্যাপার দেখা যায়—রঙের প্রাচুর্য। এটা হিন্দুসুলভ গুণ। বাংলা দেশের কুম্ভকারেরাই একাধারে ভাস্কর ও চিত্রকর। মৃৎশিল্পে কৃষ্ণনগরের দক্ষতার কথা সবাই জানেন। পেশোয়ারী মৃৎশিল্পের চেকনাই অতুলনীয়। রোমান মেজলিকার (Majolica) মত পেশোয়ারী শিল্পীরা একরকম মিশ্র-মৃত্তিকা চূর্ণ তৈরী করার আর্ট জানে। থৈবারের খড়িমাটী দিয়ে লালমাটীর ওপর প্রলেপ দিয়ে তারপর সফেদার সল্যুশনে চুবিয়ে চেক্‌নাই তোলা হয়। রঙীন করার জন্য থৈবারের লালমাটী, কালো পাথর এবং নীল লাজর্বদ (Cobalt) ব্যবহার করা হয়। জয়পুরী মৃৎশিল্পের উপাদান হলো, কামচিনি অর্থাৎ বরবরা (Felspar) গুঁড়ো করে আঠার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়। মূলতানও এই শিল্পে বিখ্যাত। ভারতে রঙীন টালির আমদানী হয় মুসলমানদের সময়ে। বেলুচিস্তান ও পারস্যের গা ঘেঁসে থাকায় মূলতানের শিল্পে ইরাণীয় প্রভাব খুবই প্রবল। মূলতান রঙীন টালির একটী আড্ডা।

ঠিক প্লাস্টার অব প্যারিসের (Plaster of Paris) মত সিমেন্ট জাতীয় একটী জিনিসের ব্যবহার ভারতে প্রচলিত আছে। এটা ভারতেরই প্রতিভার উদ্ভাবনা। চল্‌তি কথায় একে চুনাম বলা হয়। চুণ বালি এবং মর্মর পাথর একসঙ্গে গুঁড়িয়ে কোন আঠাল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এই 'মাটী' তৈয়ারী করা হয়। রাজপুতানা ও দিল্লীতে এই প্রথা চালু আছে।

মোজেয়িকের (Mosaic) কাজ ভারতে সাধারণত সীসের কাজ নামে আখ্যাত। অবশ্য সীসের কাজ বলতে প্রধানতঃ সিমেন্ট জাতীয় (চুনাম প্রভৃতি) মৃত্তিকার ওপর কাঁচা ও নরম অবস্থায় ছোট ছোট আয়নার টুকরো বসিয়ে দেওয়া বোঝায়। (দৃষ্টান্ত ঃ লাহোরের সীস মহল)

ভারতের দারুশিল্পে বা কাঠের কাজে তিনটী রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়—প্রাচীন হিন্দু, ইস্‌লামীয় এবং শিখ রীতি। প্রথমেই মনে পড়ে ভারতীয় দারুশিল্পের পিঞ্জরার কাজ (Lattice work) পিঁজরার কাজ ভারতীয় দারু-শিল্পে উন্নতরুচির বাহক। আধুনিক কালে য়ুরোপীয়

রুচির গৃহসজ্জার আসবাব বা ফার্ণিচার প্রভৃতির সস্তা ডিজাইনের প্রতিযোগিতা পিঁজরার কাজের অধঃপতন ঘটিয়েছে। ভারতীয় ক্লাসিক দারু-শিল্পের প্রভাব আজও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দরজা জানালা তৈয়ারীর ও পরিকল্পনার মধ্যে বেঁচে আছে। পঞ্জাব স্থাপত্যে বোখর্‌চা (Balcony), তিলি (Panel), ও গম্বুজ (Dome) গঠনের মধ্যে বিস্ময়কর দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশ্মীর দারু-স্থাপত্যে এই পিঁজরার কাজ কোন কালে বহু প্রচলিত ছিল। গুণে ধর্মে কাশ্মীরী পিঁজরা ষোল আনা ইরাণীয়। কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরে এবং অবন্তীপুরের স্থাপত্যে প্রাচীন গ্রীক ডোরিক স্টাইলের প্রভাবটাই সর্ব্বস্ব। কিন্তু সে-অধ্যায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে কাশ্মীরী দারু-শিল্পে কোন বনেদি ঐতিহ্যের রেশ খুঁজে পাওয়া যায় না, য়ুরোপীয় ভঙ্গী হালে আমদানী হয়েছে। নেপাল দারু-শিল্পের একটী বড় আশ্রয়। কিন্তু এর মধ্যে ভারতীয় রীতির প্রভাব খুব অস্পষ্ট। চীন এবং তিব্বতী স্টাইলই নেপালের শিল্প-জীবনে জাগ্রত হয়ে আছে। গ্রোটেস্ক (Grotesque) মূর্তি রচনায় নেপালের দক্ষতা বেশী। ড্রাগন নামে যে-উদ্ভট দানবের অস্তিত্ব য়ুরোপ ও এশিয়ার মূর্তিশিল্পে ছড়িয়ে আছে, ভারতবর্ষের মধ্যে (?) একমাত্র নেপালেই তাকে পাওয়া যায়। নেপালী শিল্পের 'বিজলি' প্রকৃতপক্ষে সেই সুবিখ্যত ড্রাগন।

দক্ষিণ ভারতের দারুশিল্পে চালুক্য স্টাইল সজীব। দক্ষিণী হিন্দু মন্দিরশিল্পের টেক্‌নিক্ অনুসরণ করেই এই দারুশিল্প আজও চালু হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে সূক্ষ্ম চারুতার বিকাশ যেন ক্রমে ক্রমে ব্যাহত হয়েছে। বিরাটত্ব ও কেরামতীর ভাবটাই প্রবল। আর্টের ক্ষেত্রে কেরামতীর আধিক্য অবনতির সূচনা করে। দক্ষিণী শিল্পে শেষ দিকে এই লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। নিরেট পাথরকে কেটে কুঁদে হয়তো একটী দানবের মুখ তৈরী করা হলো, কিন্তু এর মধ্যে এত বেশী কেরামতী দেখবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে যে শিল্পীর রসবোধকে প্রশংসা করার কিছুই থাকে না। দক্ষিণী শিল্পের এই দানবের পাথরের জিভটী হয়তো ঝুলে আছে, দর্শক হাত দিয়ে সেটাকে নাড়লে ঠিক নড়ে ওঠে ; কিন্তু টেনে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কোন দেবতার একটি বিরাট পাথরের রথ তৈরী করা হলো, এই রথের চাকা এমন ভাবে তৈরী যে ছেলে মানুষে হাত দিয়ে তাকে একপাক ঘুরিয়ে দিতে পারে, অবশ্য স্বয়ং রথটি একেবারে অনড় এবং মাটীর সঙ্গে গ্রথিত। একটি তেঁতুল বীজকে দু'বছর ধরে ছুঁচ আর ছুরি দিয়ে কাজ করে হয়তো একটি বংশীধর কৃষ্ণের মূর্তি তৈরী করা হলো। এই কেরামতীর মধ্যে কী নিদারুণ শ্রমের অপচয় হয়ে থাকে, সেটা সহজেই অনুমেয়। আর্টিস্টকে যখন এই ধরনের সার্কাসী মনোভাব পেয়ে বসে ঠিক তখন থেকেই আর্টের দুর্গতি সুরু হয়। দক্ষিণী ভাস্কর্যের এই শিক্ষা আর্টের অন্যান্য ক্ষেত্রে (সাহিত্য কাব্য চিত্র সঙ্গীত নৃত্য) প্রয়োগ করে আমরা শিল্প জগতের এই নিয়মটি বিশ্বাস করতে পারি।

ভারতের কাঠের কাজের মধ্যে চন্দন কাঠের কাজে সূক্ষ্ম কলাসৌন্দর্য দেখা যায়। ভারতের কাঠের পুতুলে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক জীবনের কাহিনী গুপ্তভাবে রক্ষিত। একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে খোঁজ করলেই অনেক তথ্য ধরা পড়ে।

সাদেলী কাজ ভারতের দারুশিল্পের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি। এই পদ্ধতি লতঃ প্রায় তিনশো বছর আগে পারস্যের শিরাজ সহর থেকে আসে। কাঠের তৈরী সামগ্রীর ওপর গজদন্ত, শিং মেহগনি বা রূপার পাতে গড়া এক একটি প্যাটার্ণ আঠা দিয়ে বসিয়ে দেওয়ার কাজকেই সাধারণত সাদেলী কাজ বলে।

কামানগিরি (Wood Painting)। পাঞ্জাবের মুজফ্ফরগড়ে রঙীন ধনুক (ধনুক = কামান) একটি বিশিষ্ট শিল্প। কিন্তু বর্তমানে কামানগিরি বলতে সাধারণতঃ কাঠ রঙীন করার শিল্পকেই বোঝায়। বিকানীরের কাঠের দরজা ও দেয়াল রঞ্জিত ও চিত্রিত করা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, চিত্রিত বিষয়ের মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, শিলাপাত ও মেঘ যেভাবে আঁকা হয়, তার সঙ্গে

কোন চীনা চিত্রের পার্থক্য নেই। 'Papier Mache' নামে শিল্প (কাগজের মণ্ড থেকে শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী) এককালে কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল এবং সৌন্দর্যে ও সৌকর্যে ইরাণের সমকক্ষতা লাভ করেছিল। বর্ত্তমানে কাশ্মীর থেকে এই শিল্প লুপ্ত। রাষ্ট্রীয় ঔদাসীন্য এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। গোড়ার গলদ হলো শিল্পীদের অপরিসীম দারিদ্র্য। কাশ্মীরী 'পাপিয়ে মাশে' ঠিক য়ুরোপীয় প্রথায় কাগজের মণ্ড থেকে তৈরী করা হয় না। ভেজা কাগজ স্তরে স্তরে সাজিয়ে শুকিয়ে, তার ওপর প্লাস্টার অব প্যারিস বা গচ নামে সিমেণ্ট জাতীয় 'মাটী'র প্রলেপ দিয়ে পালিশ ও রঙীন করে নেওয়া হয়।

ভারতের গজদন্ত শিল্পের (Ivory) প্রসঙ্গে প্রথমেই একটী বিস্ময়কর ঐতিহাসিক তথ্যের কথা বলে নিতে হয়। ভারতবর্ষে হাতীর দাঁতের জিনিস নামে যেসব পণ্য ও শিল্প প্রচলিত, তারা সবই বিশুদ্ধ হাতীর দাঁতের তৈরী নয়। নানা রকম কৌটা বোতাম খেল্‌না ও ছুরি তরবারির হাতল যে-হাতীর দাঁতের তৈরী, সেটা ঠিক হাতী নয়--সেটা ম্যামথ। কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু সত্য। অমৃতসর বেড়াতে গিয়ে কোন ছোট রেলস্টেশনে ফেরীওয়ালার কাছ থেকে যে সৌখীন যাত্রী একটি নস্যির ডিবে কিন্‌লো, সে সেই মুহূর্তেও জানে না যে ৫০ লক্ষ বছর আগেকার একটী প্রাচীন জীবের অস্থি দিয়ে তার এই সখের সামগ্রীটী রচিত। এই সস্তা 'হাতীর দাঁত' সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের বাইরে থেকে স্থলপথে চালান আসতো। তুষার অধ্যুষিত সাইবেরিয়া থেকে এই ম্যামথের অস্থি নিয়মিত ভাবে সর্ব্বত্র চালান যায়। সাইবেরিয়ার তুষারভূমির অন্তরালে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর বিরাট সমাধি লুকিয়ে আছে। ম্যামথের হাড় খুঁড়ে বার করা সেখানে একটী খনিজ (?) শিল্প। ওয়েণ্ডেল উইল্কি কয়েক মাস আগে সোভিয়েট রুশিয়ার ইয়াকুতস্ক রেপাব্লিকে পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনিও সেখানে দেখে এসেছেন--'A sizable ivory industry has been built, curiously enough, on the tusks of mammoths, prehistoric animals which once ranged over this area and have been preserved ever since in Arctic cold storage.' এই কারণেই বোধ হয় ভারতের কোন কোন স্থানে এই চালানী গজদন্তকে 'মছলি কা দাঁত' বা মাছের দাঁত বলে।

ভারতের গজদন্ত শিল্পে আফ্রিকার ঐরাবত-জগতের আত্মদান তুচ্ছ নয়। মোজাম্বিক ও জাঞ্জিবার থেকে নিয়মিত ভাবে গজদন্তের চালান আসে। তাছাড়া খাস ভারতীয় হাতী আছে। ভারতের সর্বত্র গজদন্ত প্রচলিত। লক্ষ্য করার বিষয় হলো গজদন্ত শিল্প কোন জাতগত সম্প্রদায়ের হাতে নেই। কোথাও সূত্রধারেরাই কুঁদিকারের (গজদন্ত শিল্প) কাজ করে, কোথাও স্বর্ণকার বা রৌপ্যকার এবং কোথাও মুসলমান ধর্মের লোক। এই কারণে বলা হয়, ভারতের গজদন্ত শিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু পৌরাণিক আখ্যায়িকা থেকে এই অভিমত সমর্থন করা যায় না। সিন্ধুর ব্রাহ্মিনাবাদ সহরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে গজদন্তের তৈরী দাবার ঘুঁটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতীয় গজদন্ত শিল্পে এই ঘুঁটিগুলিই প্রাচীনতম নিদর্শন। অষ্টম শতকে ব্রাহ্মিনাবাদ সহর ভূমিকম্পের ফলে বিধ্বস্ত হয়েছিল। সাঁচী টোপের একটী ফটকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে--'বিদিশার গজদন্ত-শিল্পীরা এই স্তূপের স্থাপত্যে কারুকার্য করেছিল।' যাই হোক্, গজদন্ত শিল্প ভারতীয় জীবনে একটি সজীব শিল্প। পৌরাণিক দেব-দেবী থেকে সুরু করে নর্তকীর বেণীর চিরুনিতে পর্যন্ত হাতীর দাঁতকে কাজে লাগানো হয়েছে। এর মধ্যেও ভারতীয় ঐতিহ্যগত প্রস্তরশিল্প ও দারুশিল্পের টেকনিক অনুসরণ করা হয়েছে।

মোষের শিঙ, ঝিনুক, কচ্ছপের খোলা, শঙ্খ, সজারুর কাঁটা, মাছের আঁইস, পালক, অশ্ব পুচ্ছ ইত্যাদি জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অবশিষ্ট দিয়ে তৈরী ভারতে একটী বিরাট সজীব শিল্প রয়েছে। কোন কোন প্রদেশে শিল্পীদের এই সব এক একটী জাতিগত পেশা। হিন্দুর কাছে

চামর ও মৃগাজিনের মত শুদ্ধ জীবদেহের তৈরী শিঙ্গের মত বাইসনের শিঙের জিনিসও শুদ্ধ। দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা বাইসনের শিঙের পূজোপকরণ ব্যবহার করে।

চর্মশিল্পে ঘোড়ায় জীন (Saddle) ভারতের একটি বিশিষ্ট শিল্প। এর মধ্যে ভারতীয় সুলভ সূক্ষ্ম কারুকার্য ও অলঙ্করণ সবই আছে। বই বাঁধবার কাজে চামড়ার ব্যবহার মুসলমানদের প্রবর্তিত। আলোয়ার লাইব্রেরীর সাদীর গুলিস্তান কাব্যটীর চামড়া বাঁধাই দেখলে চর্মশিল্পেও ভারতের উচ্চ রুচি ও কলাজ্ঞানের অতুলনীয় দক্ষতা স্বীকার করে নিতে হয়। ঢাকার শাঁখারীর শঙ্খশিল্প পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

লাক্ষারঞ্জিত (Lac work) দ্রব্য ভারতে সুপ্রচলিত। শুধু রঞ্জনকার্যের জন্য নয়, লাক্ষারই নানারকম সামগ্রী ও অলঙ্কার তৈরী হয়ে থাকে। ধাতুনির্মিত ও কাষ্ঠনির্ম্মিত সামগ্রীর ওপর লাক্ষার কাজ ভারতের প্রাচীন পদ্ধতি। ল্যাকার কাজ (Lacquer) নামে একটী শিল্প ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতে আমদানী হয়। ল্যাকার একটী উদ্ভিজ্জ তৈল মাত্র, এর সঙ্গে রঙ মিশিয়ে গাঢ় ও আঠাল করে নিয়ে শিল্পকাজে ব্যবহার করা হয়।

ভারতবর্ষে এই ল্যাকার ধরনের একটি বিশিষ্ট শিল্পপদ্ধতি আছে—গোসো'র কাজ। কোথাও কোথাও একে মুনাবাতি'র কাজ বলা হয়! শঙ্খচূর্ণ বা খড়িচূর্ণের সঙ্গে বেলের আঠা মিশিয়ে একরকম আস্তর (বা Stucco) তৈরী করা হয়। এই আস্তর দিয়ে কাঠ পাথর, এমন কি কাঁচের ওপরেও প্রলেপ দেওয়া যায়। গেসোর ওপর রং পাকা হয়ে ধরে। বিকানীরের রায় নিবাসের সমগ্র দেয়াল গেসোর কাজ করা। রাজপুতানার তোঁক নামে দেশীয় রাজ্যে চামড়ার ঢালগুলি পর্য্যন্ত গেসো প্রথায় সুচিত্রিত ও রঞ্জিত করা হয়। তোঁকের গেসোর সঙ্গে জাপানী ল্যাকারের খুবই সাদৃশ্য। তোঁকে গেসো কারিগরদের মধ্যে একটা কিম্বদন্তী আছে যে তাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুস্থানের লোক নয়, তারা কোন সুদূর পূর্বদেশ থেকে এসেছিল। এই কিম্বদন্তীর মধ্যে জাপানী-রীতির প্রভাবের রহস্য খানিকটা ধরা পড়ে। চিত্রিত বিষয়ের মধ্যে মেঘ বজ্র ও বিদ্যুতের আধিক্য জাপানী-রীতির সুস্পষ্ট লক্ষণ।

ভারতের বস্ত্রশিল্পে একটী অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবনা বা পদ্ধতি আছে। পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও এর চিহ্ন নেই। এই কাপড় সাধারণত 'আফ্রিদি মোমের কাপড়' নামে প্রচলিত। মোমজাম ও অয়েলক্লথ নামে যে কাপড় সবদেশেই প্রচলিত, সেটা ঠিক এই ধরণের জিনিস নয়। সাধারণ কাপড়ের ওপর গলিত মোমের প্রলেপ দিয়ে মোমজাম হয়। কিন্তু আফ্রিদি মোমের কাপড় সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস! কুসুম ফুলের বীজ থেকে (Carthamus Ckyacantha) তেল বার করে সেই তেল ১২।১৩ ঘণ্টা জলে সেদ্ধ করে ঠাণ্ডা জলে ফেলে রাখা হয়। এখন এই চিটে মোমের মত বস্তু বা রোগনের সঙ্গে রঙ মেশানো হয়ে গেলে তাক্‌লি প্রথায় এর থেকে সুতো টেনে বার করা হয়। এই পদ্ধতির মৌলিকতা আফ্রিদি প্রতিভার দান হলেও ভারতে নানাস্থানে এই পদ্ধতি প্রসার লাভ করে। বরোদাতে রেড়ীর তেলকে সেদ্ধ করে এই ধরনের প্লাষ্টিক সুতো তৈরী করা হয়। এই পদ্ধতিটী ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হতে চলেছে।

টোপ তোলা (Embossing)—যদিও সর্বপ্রকার ধাতু, কাঠ ও চামড়ার ওপর টোপ তুলে নক্সাকে রূপায়িত করা আধুনিক কালের কারুকলার একটী রেওয়াজ, ভারতীয় ক্লাসিক ও জনগত কারুশিল্পে এই পদ্ধতি বহু প্রাচীন কাল থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বর্তিয়ে আছে।

খচিত শিল্প (বা Marquetry বা Inlaid work)—ভারতবর্ষের পদ্ধতি বিদেশেও অনুকরণ হয়েছে। যে কোন ধাতু বা কাঠ কাঁচ ও চামড়ার ওপর অপর যে কোন একটী ধাতু বা বেলোয়ারী জড়োয়া পাথর ইত্যাদি খচিত করা ভারতীয় শিল্পীর কাছে একটী সুসাধ্য পদ্ধতি। 'বলায়াবনদ্ধ তাম্রাশ্ম'—এর মধ্যে ভারতীয় খচিত শিল্পের (বা inlaid work) প্রাচীনতার আভাষ আছে বৈকি।

ভারতের বয়নশিল্পের প্রগতি শতাব্দী ধরে বিশ্বের বিস্ময় হয়ে ছিল। ভারতের ছিট (Calico) মসলিন, কিংখাব (Brocades) গালিচা, শাল, গাট্টা (Satinette) মশরু, পট্টু, জামদানী, মল্‌মল্‌, গুলবদন ইত্যাদি জিনিস ইরান ও ভারতের যুক্ত কারু-প্রতিভার নিদর্শন।

ভারতীয় মস্‌লিনের নামকরণের কবিত্ব লক্ষ্য করার বিষয়। অব্‌রওয়ান বা স্রোতের জল ; বফ্‌ত হানা বা বাতাসের বিনুণী ; শব্‌নাম বা সান্ধ্য শিশির। জামদানীর প্যাটার্ণের মধ্যে এক ধরণের বুটিদারের নাম 'পান্না হাজারা'--বুটিগুলিকে হাজার হাজার পান্নার মত মনে হয়।

আম্‌লি'র কাজে (Embroidery) ভারতের পদ্ধতি বিশিষ্ট ভাবে ইরাণীয় পদ্ধতি। শাল এবং জামাবর তৈয়ারীর কাজে ভারতের আম্‌লিকরের সূচী পৃথিবীর প্রশংসা অর্জন করেছে। এমব্রয়ডারি শিল্পে উন্নত ধরনের সব সূচীকার্যেই ভারতীয় কারিগরের অধিগত। যথা-- ফুলকারী (Darn stitch), চিকন (Satin stitch) ইত্যাদি। চীনা গ্রন্থি (বা Chinese knot) নামে সূচীশিল্পের নমুনা পাঞ্জাবে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। পেশোয়ারী আম্‌লির কাজে (Herringbone) হেরিং মাছের কাঁটার ভঙ্গী অনুসারে সেলাইয়ের রেওয়াজ আছে।

লেস শিল্প (Lace work) ভারতে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে আসে। দক্ষিণ ভারতে লেসের কাজ বর্তমানে একটী পল্লীশিল্প হয়ে উঠেছে। এর পেজ্জনে ছিল খৃষ্টান পাদ্‌রীদের উদ্যোগ। লেসের কাজ একান্তভাবে য়ুরোপীয় প্রতিভার দান, বর্তমানে এই ধারণাই প্রচলিত আছে। কিন্তু কোয়েটা এবং কান্দাহারে বর্ত্তমানে সাজপোশাকের বর্ডার হিসাবে যে ঝালর লাগানো হয়, সেটা আসলে লেস ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে য়ুরোপীয় রীতির কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এসিয়ার লেসশিল্পের নমুনা হিসেবে বোধ হয় কোয়েটার লেসই শুধু এখনো বেঁচে আছে।

ভারতের জাতীয় কারুশিল্পের একটা অতি-সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল। এর থেকে কতকটা উপলব্ধি হবে যে, ভারতের কারিগরেরা জাতীয় সংস্কৃতির কত বড় বাহক। এই কারিগরেরাই শিল্পী-ভারতেব মেরুদণ্ড। ভারতের কারিগরের স্কন্ধে জাতীয় সংস্কৃতির কতখানি দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, আর একটী দৃষ্টান্ত থেকেই সেটা সুপ্রমাণিত হবে। ধরা যাক, বাদ্যযন্ত্র তৈয়ারীর শিল্প। ভারতের সঙ্গীতাচার্যেরা নিশ্চয় নিজ হাতে স্বরোদ রবাব আর তব্‌লা পাখোয়াজ তৈয়ারী করেন না। সাঙ্গীতিকের সঙ্গী যন্ত্রের জন্য সেই কারিগর নামে পরিচিত মানুষটীকে শুধু তার হাতুড়ি বাঁটালির ওপর নির্ভর করে থাকলে চলে না ; কারিগরকে তার সুরজ্ঞান ও স্বরজ্ঞানের ওপরেও একটা কঠিন পরীক্ষা সইতে হয়।

আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি অতি পুরাতন একটী সত্য। আর্ট জীবনের উপাদান বিশেষ এবং বিচিত্র ইণ্ডাস্ট্রির সমবায় নিয়েই জীবনের রূপ। ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের মেরুদণ্ড এই 'আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি'কে ইংরাজী শাসনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে অমর্যাদা ও দুর্ব্বিপাক সইতে হয়েছে তার গ্লানি আজও আমাদের পদে পদে জীবনের ছন্দকে ক্ষুণ্ণ করে চলেছে। ইংরাজ সমালোচকেরাই ঠাট্টা করে বলেছেন যে, 'ঠগী কয়েদীদের শাস্তি দেবার জন্য' ব্রিটিশ সরকারের প্রথম দৃষ্টি পড়ে ভারতের কারুশিল্পের দিকে। কারুশিল্পকে ইংরাজ সরকার প্রথম সম্মান দিলেন 'কয়েদীর কাজ' (Jail labour) হিসেবে। এখনও কয়েকটী স্কুল আর এক আধটা প্রদর্শনীর বিল্বপত্র ছাড়া ভারতীয় কারুশিল্পের পূজায় সরকারী প্রচেষ্টার আর কোন আগ্রহের নৈবেদ্য দেখা যায় না। ভারতের শান্তিনিকেতন জেলাগুলিই প্রধানতঃ সরকারী কারুশিল্পের আশ্রম। কয়েদী সম্প্রদায়ের হাতে এভাবে সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব পড়লে সুফল যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। ভারতের জাতীয় কারুশিল্পের রম্যতা, সুক্ষ্ম কলাকুশলতা ও সুরুচি দ্রুত অপকর্ষের দিকে নেমে পড়েছে।

তারপর, দেশের শিক্ষিত সাধারণের কথা ধরা যাক তাঁদের ইংরাজী-শিক্ষা উদরান্নের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে, সেজন্যেই একটা কৃতার্থন্মণ্যতা ও আত্মদীনতার আবেগে তাঁরা ইংরাজী শিল্পরুচির ভালমন্দ বাছবিচার না করে একেবারে একটা আদর্শ হিসেবেই মেনে নিলেন।

ফলে, আধুনিক ভারতীয়ের মনের সঙ্গে জাতীয় শিল্পের পুরুষপরম্পরার আত্মীয়তায় একটা বিচ্ছেদ সৃষ্টি হলো। একসঙ্গে শাসক সম্প্রদায় ও নিজদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, উভয়ের সৌহার্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে জাতীয় কারুশিল্প একেবারে অসহায়তার চরমে পৌঁছে গেল।

ভারতের কারুশিল্পের ওপর দেশীয় শিক্ষিতের যতই ঔদাসীন্য ও অবহেলা থাকুক না কেন, বিদেশীদের কাছে শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই কারুশিল্প একটা বড় চাহিদা পেয়ে এসেছে। জয়পুরী মার্তাবান বা মির্জাপুরী ফুলদান শিক্ষিত ভারতীয়ের কাছে অভ্যর্থনা না পেলেও বিদেশী ক্রেতার কাছে তার কদর আছে। সুতরাং অভিভাবকহীন ভারতীয় কারুশিল্পকে বিদেশী বণিকের ব্যবসার খাঁক্তি মেটাবার জন্য আর এক ভাবে বিপর্যস্ত হতে হলো। জোর চাহিদার জের পূরণ করতে গিয়ে পণ্যের কলাগত উৎকর্ষ ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হতে সুরু করলো। সস্তা ডিজাইনের মাল প্রচুর উৎপাদন করা—বিদেশী রপ্তানী ব্যবসায়ীর এই দাবীতে কারুশিল্পকে একটা নাকাল অবস্থায় টেনে নিয়ে এল। এর ফলে কোন কোন শিল্পের এক একটী অনুপম প্যাটার্ণ ও ডিজাইন লুপ্ত হয়ে গেছে। ডিজাইন চুরির ষড়যন্ত্রের কথাও শোনা যায়। কাশ্মীরী শাল ও গালিচার শিল্পে বিদেশী মহাজন ও দেশীয় দাদনদার দালালের মুনাফাবিলাস আর্টের দিক থেকে প্রভূত ক্ষতি করেছে।

এইভাবে জাতীয় শিল্প সত্যই ক্রমে ক্রমে রূপহীন হয়ে পড়লো। অর্থাৎ শুধু ইণ্ডাস্ট্রি রইল, তার মধ্যে সেই আর্ট আর রইল না। ভারতের কারিগর কয়েক পুরুষের মধ্যে তাদের শিল্পীর ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিছক স্থূল প্রয়োজনের উপযোগী মাল তৈয়ারীর পেশা নিয়ে পড়ে রইল। শিল্পীরা প্রায় মজুরের পর্য্যায়ে পৌঁছে গেল।

যদি শুধু ইণ্ডাস্ট্রি বা মাল তৈরী করতেই হয়, তবে মেশিনের প্রতিযোগিতার কাছে কারিগর দাঁড়াতে পারে কি? এতদিন তারা দাঁড়িয়েছিল ইণ্ডাস্ট্রির আর্টের সাধক হিসাবে। আর্টহীন ইণ্ডাস্ট্রিতে মেশিনের কাছে তারা হেরে যেতে বাধ্য। হেরে যেতেও হয়েছে। বিদেশী কারখানার সস্তা শ্রীহীন ও কারুতাবিহীন পণ্যে ভারতের বাজার গ্রাস করে ফেলেছে।

এর পরের অধ্যায় হলো আরও শোচনীয়। ভারতের কারিগরকে ইণ্ডাস্ট্রির শেষ সম্পর্কও ছাড়তে হলো। আর্টহীন শিল্পে মেশিনের সঙ্গে তারা পাল্লা দিতে পারে না। এখন তারা যায় কোথায়?

হুইট্‌লি রিপোর্টে (Royal Commission on Labour) এর আংশিক উত্তর পাওয়া যাবে। জাতীয় শিল্প থেকে বিচ্যুত কারিগর বংশ অগত্যা কারখানার দিকেই জীবিকার জন্য এগিয়ে গেছে, তারা কারখানার মজুর হয়েছে। ভারতের মজুর-গোষ্ঠীর একটী বড় অংশ এই জীবিকাভ্রষ্ট শিল্পীবংশ। "The village craftsman finds himself subjecroed to competition from the larger world. The textile mills have manyweavers drawn from families that, for generations previously, worked at handlooms ; the village worker in hides and leather, the carpenter and the blacksmith are all being subjected to pressure from the factory. In many cases the easiest, perhaps the only, way out of the difficulty is for the village craftsman to transfer his allegiance to the rival which is supplanting him." এই মন্তব্যের একটা তত্ত্ব একটু তলিয়ে বুঝতে হবে—দেশীয় কারুশিল্পের সঙ্গে দেশ-বিদেশের কারখানার যে প্রতিযোগিতার কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা আর্টের ব্যাপার নিয়ে প্রতিযোগিতা নয়। নিছক ইণ্ডাস্ট্রীর প্রতিযোগিতা—কে বেশী মাল তৈরী করতে পারে। কে কত সুন্দর জিনিস তৈরী করতে পারে—প্রতিযোগিতা ঠিক এই পথে দেখা দেয়নি। জুপিটার যাকে হত্যা করে, আগে তাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে নেয়। ভারতীয় কারুশিল্পকে আগে আর্ট-ভ্রষ্ট করে নিয়ে তবেই কারখানার মার মেরে তাকে পরাভূত করা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু ভারতে কয়টি কারখানা আছে? ক'জনের জীবিকার সাশ্রয় হতে পারে ভারতের কলকারখানাগুলিতে? সামান্যসংখ্যক শ্রমজীবীর রোজগারের পথ করে দিতেই ভারতের গোনাগুন্‌তি কারখানাগুলি হিমসিম খায়। কাজেই শিল্পভ্রষ্ট কারিগরের পক্ষে কারখানাতেও স্থান পাবার আশা নেই।

ততঃ কিম্? তারপর এক কানি জমি নিয়ে হালচষা ছাড়া আর পথ নেই। আর্ট গেল, তারপর ইণ্ডাস্ট্রিও গেল। ভারতের কারিগরকে এর পর চাষা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন্ উপদেশ দিতে পারা যায়?

ইংরাজী শাসনের আবির্ভাবের প্রথম কাল পর্যন্ত ভারতে যে-বনেদী কারুশিল্পের পরিচয় আমরা পাই, তার মধ্যে কতগুলি সাংস্কৃতিক তত্ত্বের নিয়ম ধরা যেতে পারে।

(ক) একটা অভিযোগ আছে যে, ভারতের কারুশিল্প 'জাতগত' হয়ে থাকার ফলে এর অবনতি হয়েছে। এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। 'জাত' (Caste) নামে যে সামাজিক সঙ্কীর্ণতার কথা বলা হয়, ভারতরে আর্টের ক্ষেত্রে তার কোন প্রভাব পাওয়া যায় না। ভারতের কারুশিল্পী সম্প্রদায় কোনদিন সামাজিক অসম্মান পায়নি। ব্রাহ্মণ রাজমিস্ত্রী (Mason) আছে, বৈষ্ণব গজদন্ত-শিল্পী বা কুঁদিকার আছে। তাছাড়া কারিগরেরা জাত হিসাবে অধিকাংশই বৈশ্যপদবাচ্য হিন্দু সমাজ শত গোঁড়ামি সত্ত্বেও শিল্পীদের কখনো অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য মনে করেনি।

'জাতগত' শিল্পের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ আছে। পুরুষানুক্রমিক পেশা হিসাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকলে কারুশিল্পের নাকি অবনতি হয় এবং হয়েছে। জানা উচিত যে, ভারতীয় সমাজে কারুশিল্পীর পেশা এতটা জাতগত কোন কালেই ছিল না। তার ওপর, শিল্পীদের একটি সুবৃহৎ অংশ মুসলমান, যাদের মধ্যে জাতপ্রথা ততটা প্রবল নয়। মুসলমান শিল্পীরা ঠিক শিল্প অনুসারে কড়া গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে বিভক্ত নয়। মোগল সম্রাটদের আমলে ওস্তাগর বা রাজমিস্ত্রী সম্প্রদায় ছিল অধিকাংশই হিন্দু (যারা তাজমহল গড়েছিল)। আজ দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য—অধিকাংশ মুসলমান (এরাই হিন্দু মন্দির তৈরী করে)। কারুশিল্প সেরকম কোন জাত হিসাবে বাঁধা থাকতে পারেনি।

তারপর, এক একটী শিল্প গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকলেও তার অবনতি ঘটবেই, এমন নিঃসংশয় প্রমাণ আমরা পাই না। দৃষ্টান্ত—সাসারামের মৃৎশিল্প প্রভৃতি। দেখা গেছে, একটী ক্ষুদ্র গ্রামের একটী পরিবারের সাধনার মধ্যেই কোন বিশেষ একটী শিল্প কয়েক যুগ ধরে অনাহত গৌরবে বেঁচে আছে। এগুলিকে আমরা এক একটী স্কুল বা ঘরানা বলতে পারি। শুধু ভাববার কারণ হচ্ছে যে, এই ঘরানার সঙ্গে বাইরের অগ্রসর জীবনের যোগসূত্রটী ঠিক আছে কি না? ঘরানা যদি কুশলী উদার তৎপর ও নূতনত্বপরায়ণ হয়, তবে অবনতির কোন কারণ আসতে পারে না। প্রাচীন হিন্দু ভাস্কর্য খাস হিন্দুস্তানে লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু সুমাত্রা দ্বীপে সজীব হয়ে আছে। সেখানে গ্রাম্য ভাস্কর পাথর কঁদে হয়াসুর বিরূপাক্ষ বা ত্র্যম্বক শিবের মূর্তি গড়তে পারে। কী প্রাচীন একটী পদ্ধতি আজও ক্ষুদ্রসংখ্যক এক শিল্পী সম্প্রদায়ের হাতে বেঁচে রয়েছে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

(খ) ভারতের কারুশিল্পে কোন কালে কর্মঠ মনোবৃত্তির (Isolation) স্থান ছিল না। এসিয়া ও য়ুরোপ মহাদেশের নানা শিল্পরীতির শত স্রোত ভারতে এসেছে। ভারতীয় প্রতিভার সঙ্গে তার সমন্বয় হয়েছে—নতুন রূপ ও গুণ গ্রহণ করেছে। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাব সমসাময়িক ভারতের শিল্পীজীবনেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। [আপত্তি থাকলে এ'কে ঐতিহাসিক সহ-সংঘটনা বা Parallelism in history বলতে পারেন।] ভারতের জাতীয় কারুশিল্পের ইতিহাসে ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক স্বরূপটীই বড় হয়ে উঠেছে।

বর্তমান ও আগামী কালের ইণ্ডাস্ট্রির ভাগ্যলিপি মেশিনের হাতে। এর জন্য আপশোষ

করার কিছুই নেই। মেশিন একটা মহত্তর মঙ্গলের সূচনা নিয়েই এসেছে--মেশিন থাকবে। মেশিনের সৃষ্টিকে শ্রীমণ্ডিত করাই বর্তমানের আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি। একে সমস্যা বলা যেতে পারে, কর্তব্যও বলতে পারা যায়। প্রাচীন যুগের মানুষ বন্যহস্তীকে বশ করে তার গায়ে আল্পনা এঁকে দিতে পেরেছিল। বর্তমানের মানুষ মেশিনকেও বশ করে একটু আর্টিস্টিক, একটু সৌখীন ও একটু রসিক করে তুলতে পারবে না কেন?

রম্যরচনা

হে মোর দুর্ভাগা দেশ

একটা নাটকের খসড়া--

মহানগরীর বুকে রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। জনহীন পথ। প্রশস্ত রাজপথে দীপস্তম্ভে বাতি জ্বলে না। বিপণির দ্বার বন্ধ ; রথচক্রের ঘর্ঘর নাদ নেই, মোটরের ভেঁপু নেই। মানুষের কণ্ঠস্বর ঘরে ঘরে শঙ্কায় মূর্ছিত হয়ে আছে ; শহরের বাতাসে অদ্ভুত এক বিভীষিকার নিশ্বাস থমথম করছে বিষাক্ত বাষ্পের মত।

নির্ভয়ে ঘোরাফিরা করছে দুটো কুকুর। বন্ধ দুয়ারগুলির দিকে এক একবার তাকিয়ে বিস্ময়ে পথ থেকে পথান্তরে চলে যাচ্ছে তারা। স্তূপীকৃত আবর্জনায় পথ ঘাট কলঙ্কিত হয়ে আছে। প্রত্যেক গলির হিংস্র মুখগুলি প্রেতপুরীর ফটকের মত হাঁ করে রয়েছে।

মঙ্গল গ্রহ থেকে কোন জীব হঠাৎ এসময়ে এসে পড়লে হয়তো মনে করবে, সারাদিনের উৎসবের পর পুরবাসী সকলে পরম ক্লান্তির ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাক্ষসপুরীর এ ছদ্মবেশ সে সহজে ধরে ফেলতে পারবে না।

* * * *

পুরানো গোরস্থানের ভাঙা পাঁচিলের এক পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসেছিল রহমান পাগলা। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে ফিক ফিক করে হাসছিল। সমস্ত দিনটা বড় অসোয়াস্তিতে কেটেছে তার। আজ সমস্ত দিন কোন চ্যাংড়ার দেখা নেই। দাড়ি টেনে উত্ত্যক্ত করতে কেউ আসে নি। রহমান উঠে দাঁড়ালো।

কপালে সিগারেটের একটা রাংতা সেঁটে নিয়ে, পায়ে এক জোড়া ঘুঙুর বেঁধে, ছেঁড়া কম্বলের আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে রহমান আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো।

আজানের শব্দ আসছে না। মসজিদের কাছে নমাজীদের ভীড় নেই। রহমান একটু অবাক হলো, কিন্তু কিছুই ঠাহরে এল না। দুটো কুকুর পরম সুহৃদের মত রহমানের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো। অন্যদিন এরাই আলখাল্লা কামড়ে খিমচে নাজেহাল করে। পাগলা রহমান ভাবছে আজ সব ব্যাপারই কেমন উল্টো রকমের।

* * * *

বুড়ো রাধু বৈরাগী বাজারের মুদির দোকানের আবর্জনা থেকে চাল ডালের দানা কুড়িয়ে রোজ রাত্রে খিচুড়ি রেঁধে খায়। বাজারের পাশে বাগানটায় একটা পোড়োবাড়ির দাওয়াতে তার সংসার—চটের বিছানা হাঁড়িকুড়ি উনুন। আজ রাত্রে কোন দোকানই খোলে নি, খুদকুঁড়োর আবর্জনাও নেই। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে রাধু হয়রান হলো। একে বুড়ো তার উপর বোবা ও বধির। রাধু কাঁপতে আরম্ভ করলো। রাগ ও ক্ষিধে, দুইই খুব জোরে পেয়েছে।

হাঁটুতে একটু জোর এনে লাঠিভর দিয়ে মাটির সরাটা বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো রাধু। বাজার পার হয়ে কাছারীর সড়ক। তারপর কয়েকঘর গেরস্থ বাড়ি। পেটে জ্বালা ধরেছে অনেকক্ষণ। দুমুঠো এঁটোকাঁটা যোগাড় করতেই হবে।

কাছারীর সড়কে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাজছে একটি মাত্র শব্দ—ঠুক্ ঠুক্। রাধু বৈরাগী লাঠি ঠুকে ভিক্ষেয় বেরিয়েছে।

* * * *

গলিতে গলিতে এক একটা মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে—দস্তুর জানোয়ারের ছায়ার মত।

শিকারের লোভে অন্ধকারে চোখ ভাসিয়ে রয়েছে। একটু শব্দ হলেই বিজলী বাতি ঝলসে ওঠে--শিকার এল কি না।

আজ এ নগরীর শিরায় শিরায় মরণের উন্মাদ রাগিণী বেজেছে। পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা। অন্ধ হিংসার ঝড়ে সমস্ত শুভবুদ্ধি লোপাট হয়ে গেছে। ভ্রান্ত স্বার্থে বেধেছে সংঘাত। মূঢ় সম্প্রদায়-প্রেম ভোজালী হাতে পথের আনাচে-কানাচে ওৎ পেতে বসে আছে। আজ এই নগরীতে কীট পতঙ্গ সবাই নিরাপদ ; শুধু মানুষ ছাড়া। বিংশ শতাব্দীর বাংলার এক নগরীর ভদ্র বর্বরতা পঙ্কশয্যা থেকে জেগে উঠেছে কদর্য পরিণাম নিয়ে।

সড়কে সড়কে দলবেঁধে চলেছে খুনিয়ার মানুষের দল। লাঠি, ছুরি, বল্লম, এসিড, সোডার বোতল আর কেরোসিনের টিন হাতে। চোখে গুহামানবের ক্ষুব্ধদৃষ্টি, শত্রুর গায়ের গন্ধ পেয়ে পাগল হয়ে ছুটেছে সব। মুখে দেশমাতৃকা আর পরমেশ্বরের উৎকট স্তুতিধ্বনি।

পাড়ায় পাড়ায় জেগে উঠলো আগুনের তাণ্ডব--লেহি লেহি বিরাট অম্বর। অন্তরীক্ষে কালাপাহাড়ের প্রেতাত্মা প্রসন্ন হচ্ছে। মন্দির পুড়ছে, মসজিদ পুড়ছে--গ্রন্থাগার পুড়ে ভস্মসার হচ্ছে। বস্তিতে বস্তিতে অগ্নিশিখার জ্বালা আর ধোঁয়ার গন্ধে ঘুমভাঙা শিশুর চীৎকার।

* * * *

পাগলা রহমানের পায়ের ঘুঙুরের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। গলির অন্ধকারে একোণ ওকোণ থেকে দশ বারটা লোলুপ ছুরির ফলা আনন্দে শিউরে উঠলো। তার অতি পরিচিত এই খেলার মহল--পাগলের জগতে তো দুশমন নেই। পাগলার চোখে পড়ে নি, ঐ অন্ধকারে মিশিয়ে রয়েছে তার মওতের ভ্রূকুটি।

হঠাৎ টর্চের আলো ঠিক্‌রে এসে লাগলো পাগলা রহমানের মুখের ওপর।

ঘুঙুরের আওয়াজ থেমে গেল। ল্যাম্পপোস্টের নীচে কম্বলের আলখাল্লায় ঢাকা পাগলা রহমানের রক্তাক্ত দেহটা দুচারবার ঘড়ঘড় শব্দ ছেড়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। একটা শেয়াল দৌড়ে ঢুকে পড়লো সুপুরির বাগানে--বোধ হয় ভয়ে ও লজ্জায়।

* * * *

আর একটি অঙ্কের যবনিকা উঠলো অন্য দিকে। রাধু বৈরাগী একটি লাঠির আঘাতে কাটা গাছের মত লুটিয়ে পড়েছে। বুড়ো ভিখিরির চোখ দুটো নিথর হয়ে দৃষ্টি মেলে রয়েছে। একের পর এক হন্তারা আসছে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোরার ঘায়ে হৃদপিণ্ড ছেঁদা করে দিয়ে যাচ্ছে। বোবার কণ্ঠে প্রতিবাদ নেই। মৃত্যুপথযাত্রী ভিখিরির দৃষ্টিতে শুধু এই প্রখর জিজ্ঞাসা জেগে রইল--কি হয়েছে? কেন এই উল্লাস?

দুর্যোগ রাত্রির অবসানে আবার দিনেব আলোতে দেখা দিল--হিংসার উৎসবে বিক্ষত নগরীর কদর্য শ্মশানরূপ। ময়নাঘরে রাধু ভিখিরি আর পাগলা রহমানের লাস এতক্ষণে ঘুম্‌সে উঠেছে। আর--

বাংলার ঘরে ঘরে--আড্ডায় বৈঠকে ক্লাবে সোসাইটিতে--ভদ্রাভদ্র শিক্ষিত ধনী দরিদ্র, উৎকট কৌতূহলে সংবাদপত্রের ওপর মাথা উপুড় করে প্রলুব্ধ দৃষ্টি ঢালছে। কলমের পর কলম হাতড়ে তারা খুঁজছে হতাহতের তালিকা--ক'জন হিন্দু আর ক'জন মুসলমান। রাধু আর রহমান--ভিখিরি আর পাগল। এহেন দুটি জীবেরই গলিত মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করছে লক্ষ লক্ষ ভদ্রসন্তান। তাদের সমস্ত ঐহিক পারত্রিক পরমার্থ, তাদের ধর্ম সংস্কৃতি রাজনীতি ও রাজপদ লাভের পথে বোধ হয় সবচেয়ে বড় কণ্টক ছিল ঐ দুট প্রাণী। এইবার ল্যাঠা চুকে গেছে--সব সমস্যার অতি সহজে সমাধান হয়ে যাবে।

* * * *

উপসংহারে বলতে হয় রাধু আর রহমানের বিশেষ একটা দুর্ভাগ্যের কথা। জীবনে তারা তো কখন বুঝতেই পারে নি যে তারা মানুষ। সমস্ত সমাজের ঘৃণার চোরাবালিতে তারা

কীটের মত কিলবিল করেছে এতদিন। আততায়ীর ছোরা বুকে বরণ করে তারা জীবনে এই প্রথম অর্জন করেছে হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব। কিন্তু দুর্ভাগ্য : এই তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি করার, এই উপাধির গৌরব ভোগ করার আগেই তাদের আয়ু ফুরিয়েছে।

এই নাটকের নাম কি দেওয়া যেতে পারে? সাম্প্রদায়িক বিরোধ?

মরণ কি লাগি

--"একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহু কোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা।"

সৃষ্টির রহস্য এখনও রহস্যই র'য়ে গেছে। এই জড় জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে দার্শনিকের চিন্তা ও বৈজ্ঞানিকের গবেষণার অন্ত নেই। এ বিষয়ে মতান্তরেরও অন্ত নেই।

কিন্তু জড়ের জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে পৃথিবীতে একদিন আবির্ভূত হলো প্রাণ। সেই দিন থেকে শুরু হলো সৃষ্টিকলার নূতন বৈচিত্র্য। এই প্রাণের নব নব রূপোন্মেষ এবং বহুধা অভিব্যক্তি নিয়েই জীবজগতের বিবর্তন এগিয়ে চলেছে।

জড় ও প্রাণে পার্থক্য আছে। জড়ের বিনাশ নেই (অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের এই মত)। কিন্তু প্রাণের বিনাশ আছে, অর্থাৎ জীবের মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রাণের সবচেয়ে বড় রহস্য হলো যে, সে নূতন প্রাণ সৃষ্টি ক'রে যায়। জড়ের থেকে এইখানেই প্রাণের ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' থেকে আরম্ভে যে পংক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার থেকে এই ধারণা হয় যে, প্রাণ পৃথিবীতে পরে এসেছে। বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে বলতে গেলে সকলেই একমত। জড় আগে, প্রাণ পরে। জড়ই প্রবীণ, প্রাণ অর্বাচীন। আর একটা ব্যাপার থেকে এ ধারণা আরও দৃঢ়মূল হয়, জড় প্রাণকে আশ্রয় করে--না, প্রাণই জড়কে আশ্রয় ক'রে বাঁচে। জড়ই প্রাণের পুষ্টি স্থিতির আধার। জড় প্রাণের ভোজ্য।

* * * *

প্রাণ একদিন এসেছিল নব সৃষ্টির মহিমময় বার্তা নিয়ে। কিন্তু কি ক'রে এল? এর উত্তর দেওয়া বৈজ্ঞানিকের কাজ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব বৈজ্ঞানিকই আমাদের 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' রেখেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই স্পষ্ট ক'রে আজও বলতে পারেন নি। আজও আমরা জানি না, বস্তুপুঞ্জের কোন্ আবেগে প্রাণের আবির্ভাব হলো পৃথিবীতে। এ আবির্ভাব কি একদিনে হয়েছিল? কিম্বা বহু কোটি বৎসর ধ'রে পরমাণুর কোন পদার্থধর্মের ক্রমপরিবর্তনে এ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। জড়প্রকৃতির সেই প্রথমটা বেদনার ইতিহাস--সৃষ্টির দ্বিতীয় পরম রহস্য, সেই প্রাণের ইতিহাস আমরা এখনও শুধু কল্পনাই ক'রে থাকি।

* * * *

--'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।' এই কথাটা কি বর্ণে বর্ণে সত্য? জীব মাত্রেরই মৃত্যু হয়, এইটাই নাকি প্রাণের নিয়ম। একদিন কৃতান্তের আহ্বান আসে, প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছেড়ে উড়ে যায়--মর জড়দেহটা শুধু পড়ে থাকে পঞ্চভূতে মিশে যাবার জন্য।

কিন্তু যদি বলা যায় যে, এমন জীব আছে, যার মৃত্যু নেই, তা হলে কি কেউ বিশ্বাস করবে? অথবা যদি বলা হয় যে এমন জীব আছে, যাদের প্রাণ কোন দিনও বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, দেহত্যাগ ক'রে চলে যায় না। অর্থাৎ এমন কোন জীবজগতের কল্পনা করতে পারেন কি, যেখানে নূতন জীব সৃষ্টি চলেছে, অথচ কারও মৃত্যু নেই। সে জগতে শব বলে কিছু নেই, শ্মশান নেই?

স্বর্গ বা অমরাপুরী নামে একটি কাল্পনিক জগৎ অবশ্য আছে, যেখানে আয়ু অনন্ত, যৌবন অনন্ত। মৃত্যু জরাহীন সেজগতে নূতন জীব (দেবতা) সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বর্গে দুটি জিনিস নেই। একটি চিকিৎসক, দ্বিতীয়টি শ্মশান।

কিন্তু ধূলিমাটি, কীট পতঙ্গ, পক্ষী মনুষ্য অধ্যুষিত এই পৃথিবীতেই আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচরে স্বর্গের মতই একটি জীবলোক রয়েছে। জীবলোক না বলে জীবাণুলোক বললেই ভাল, অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া।

'অহং বহুস্যাম্'--উপনিষদের ব্রহ্মন্ নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন, বহুর সৃষ্টির জন্য। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীব এই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যেন প্রাণসৃষ্টির সেই আদি-বিধান এখনও অব্যাহতভাবে চলেছে। ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে পিতামাতা নেই--তবে সন্তানসন্ততি আছে। এদের প্রজননের পদ্ধতির নাম binary fission. এদের পিতামাতা একই দেহে লীন হ'য়ে আছে। এদের পরমায়ু সেইদিন ফুরিয়ে যায়, যেদিন একটি ব্যাকটেরিয়া দ্বিধা হ'য়ে দুই ভিন্ন ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয়। পরমায়ু ফুরিয়ে যায় বটে, কিন্তু মৃত্যু হয় কি? শবদেহ কৈ?

* * * *

প্রাণের প্রথম সৃষ্টিরহস্য আমরা জানি না, কিন্তু এর প্রকাশের বৈচিত্র্য আমরা দেখি। সেটাই কম রহস্য নয়।

উদ্ভিদকে প্রাণী বলা যেতে পারে, কারণ এর জন্ম, মৃত্যু ও বংশবৃদ্ধি আছে। প্রাণীজগতে উদ্ভিদই নাকি প্রবীণতম। প্রাণের প্রথম প্রকাশ হয়েছিল উদ্ভিদের রূপে ; অবশ্য সে উদ্ভিদ কোন ওক বা শাল্মলী তরুবরের মত পরিণত বনস্পতি ছিল না। তাকে উদ্ভিদাণু বলতে পারি। শ্যাওলাই নাকি পৃথিবীর আদিমতম উদ্ভিদ জাতি।

সুতরাং সৃষ্টির ক্রমগুলি সাজালে আমরা এই তথ্য পাই। প্রথমে জড় থেকে উদ্ভিদ আবার জড় থেকেই জীব। কিন্তু মাঝে একটি missing link র'য়ে গেল। জড় থেকে উদ্ভিদ, কিন্তু উদ্ভিদ থেকে কি জীব সৃষ্টি হয়েছে?

এর কোন প্রমাণ নেই। জড়—উদ্ভিদ—জীব, এই রকম কোন ক্রম বা order সাজানো যায় না। প্রাণই একদিন হঠাৎ কোথা হ'তে এসে, 'ভুবনং প্রবিশ্য রূপং রূপং প্রতিরূপ বভুব।' উদ্ভিদ থেকে পরে জীব সৃষ্টি হ'য়ে থাকতে পারে ; কিন্তু উদ্ভিদ থেকে জীব সৃষ্টি হয়েছে, বিবর্তনের এমন কোন প্রণালী দেখা যায় না।

কিন্তু যদি বলা হয় যে, উদ্ভিদ থেকে জীব সৃষ্টি হয় নি বা হয় না, কিন্তু জীবদেহ থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে সেটা বিশ্বাস্য হবে কি? বিশ্বাস্য হোক্ না হোক্ কথাটা সত্য। এমন জীবও আছে, যারা জীবদ্দশাতেই উদ্ভিদ্দশা প্রাপ্ত হয়।

স্যাঁতসেঁতে জায়গায় যদি অনেকদিন ধরে বাঁশ বা কাঠের তক্তা বা গুঁড়ি পড়ে থাকে, তবে তার গায়ে সাদা সাদা একরকম ছ্যাঁতলা পড়ে। একটু নিবিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এই ছ্যাঁতলার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একরকমের পোকা নড়েচড়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত এই পোকাগুলির জীবন। এরা ভূমিষ্ঠ হয় পোকা হয়ে কিন্তু মরে উদ্ভিদ হয়ে। অর্থাৎ কিছুদিন পোকাজীবন যাপন করার পর এরা ঐ ছ্যাঁতলা বা শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদে পরিণত হয়ে যায়। শেষ জীবনটা উদ্ভিদ হয়ে, স্থিরমূল স্থাণু হয়ে এরা লুপ্ত হয়ে যায়। এরকম ট্র্যাজেডি আর কোন্ জীবের ভাগ্যে ঘটে জানি না। পুরাণে শোনা যায়, অভিশপ্তা অহল্যা পাষাণী হয়ে পড়েছিল। কোন্ দুষ্কৃতির কারণে প্রকৃতি এই পোকাগুলির শেষ জীবনে এই ট্র্যাজেডি ঘটিয়ে রেখেছে, তা অনুমানও করা যায় না। এই সব থেকেই মনে হয়, নিয়ম ও ক্রম এবং অনিয়ম ও ব্যতিক্রম, এ দুয়ের মধ্যে বড় একটা ভেদরেখা টানা দুষ্কর।

* * * *

—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। এটা হলো intellectual মানুষের কথা। কিন্তু

বুদ্ধি, বোধি ও বিচারই মানুষের সবটা নয়। ইমোশন বা আবেগ মানুষের শারীর ধর্ম এবং মানসিক ধর্ম দুই-ই। আবেগই মানুষের চরিত্রসৃষ্টি ও তার নীতিতত্ত্ব রচনা করে। তাকে অনেকখানি আবেগকে দলিত ও দমিত করে তবে বুদ্ধির কথা বলতে হয়।

সহজ ইমোশনের প্রেরণায় কিন্তু মানুষ শুধু মরতেই চায়। যেখানে পুলক, ecstasy বা আনন্দের চকিত স্ফুরণ সেখানেই মানুষ 'মরি মরি' করে ওঠে। যেখানে পুলকের পরাকাষ্ঠা সেখানেই মানুষ মরতে চায়। সেখানে মরণ শ্যাম সমান হয়ে দাঁড়ায়।

আহা মরি কী সুন্দর! যে আনন্দের উচ্চকিত ফুকারে জীবনেরই সহজ সরল ব্যঞ্জনা তার মধ্যে মানুষ আবার মরণ খোঁজে কেন? এও প্রাণধর্মের এক অদ্ভুত রহস্য। ডাঃ ফ্রয়েডের তত্ত্ব এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। জীবন ও মরণ--এই দ্বৈত টানে (Ambivalence) মানুষের মন সমান নিয়ন্ত্রিত। মানুষ শুধু জীবনের আবেগে 'শূন্যব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম' পান করতে ছুটে যেতে চায় না। মরণের মুখেও ছুটে যেতে চায়। মরণ তার কাছে কম মোহময় নয়। মানুষের পিপাসী কল্পনা আকুল প্রতীক্ষায় বসে আছে--কবে মৃত্যু এসে তার নীল পাণ্ডুর অধর চুম্বনে ভরে দেবে।

পরাণ কহিছে ধীরে
হে মৃত্যু মধুর।
এই নীলাম্বর তব
একি অন্তঃপুর।।

মৃত্যুরূপা মহাকালী সাধকদের কল্পনা হতে পারে, কিন্তু কবিরা মৃত্যুর এই করালিনী রূপ কল্পনা করে নি।

* * * *

ডাঃ ফ্রয়েডের অভিমত ধরা যাক, কেন এই মরণোন্মুখতা? জীবন ও মরণ--মানুষের অন্তরতম প্রদেশে বা অবচেতনায় এই দুই দেবতার দ্যূতখেলা অবিরাম চলেছে। তাই ডাঃ ফ্রয়েড বলেন, মৃত্যুকে মানুষ ভালবাসে, কামনা করে। যত লোক আত্মহত্যা করে, তারা সকলেই জীবনের ওপর বিতৃষ্ণার বশে তা করে না। বরং মরণের ওপর তৃষ্ণার বশেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয়ে থাকে। কিন্তু কেন করে?

আবার সেই প্রশ্নে ফিরে আসতে হয়। প্রাণের উৎপত্তির প্রশ্ন। সৃষ্টির আদি অধ্যায়ে ছিল জড় ; সেই জড়েরই কোন আকস্মিক পদার্থ ধর্মের পরিবর্তনে বিশ্বনিসর্গ একদিন প্রাণসত্ত্বা হলো। জড়ই প্রাণের জনক। এই সিদ্ধান্ত থেকে একটি থিওরী গড়ে উঠেছে। যেহেতু জড় থেকে জীব উদ্ভুত, সেইহেতু জীবের ধর্ম হলো নিরন্তর জড়ে পরিণত হওয়ার চেষ্টা। কিন্তু মৃত্যু না হলে জড় হওয়া যায় না। তাই 'চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?' জীবনপ্রবাহ অবিরাম কালসিন্ধু পানেই ধেয়ে চলেছে। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র জীব তার সকল রক্ত স্নায়ু পেশী অস্থি শ্বাস প্রশ্বাসের আচরণে মৃত্যুকেই খোঁজে একান্ত মনে ; যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে চায়। জীবন হলো ক্ষণিকের খেলাঘর ; জড়ই আদি অধিষ্ঠান, আপনার গেহ।

রুশে জার্মানে

--চৌদিকে ধায় সমরতরঙ্গ!

ফিনল্যাণ্ড থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সুদীর্ঘ পনর শত মাইল ফ্রন্ট! কাতারে কাতারে সমবেত যন্ত্রারূঢ় স্বস্তিকধ্বজ নাৎসী অনীকিনী। অপর দিকে পঞ্চপ্রহরণে সজ্জিত সোভিয়েট

রুশের রক্তচমু। করাল নরমেধের আয়োজনে বিংশ শতাব্দী শিউরে উঠেছে রুশের সীমান্তে।

সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছে। 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।' সহস্র যোজন দূর থেকে নীড়াশ্রিত নিরীহ পাখীর মত আমরা শুধু এই রুষ্ট কালান্তক ঝটিকার তাণ্ডব কিছুটা কল্পনা করতে পারি। এ রৌরব সমরে কে জেতে কে হারে তার ঠিক নেই।

* * * *

জার্মানী রুশিয়াকে আক্রমণ করেছে। সমস্ত পৃথিবী প্রশ্ন করছে--এ কি মহারথী প্রথা? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব নয়। শুধু যুদ্ধের কথাই মনে হচ্ছে। কী বিপুল আয়োজন! জল স্থল অন্তরীক্ষে কী নিদারুণ মারণযন্ত্রের ঘনঘটা! দুপক্ষের কেউ কম নয়। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের মত বড় বড় আচার্যেরা দুপক্ষেই রয়েছেন। স্টালিন, কালিনিন, মলোটোভ, কাগানোভিচ, ভোরোশিলফ, বুদিনি, ব্লুখের ও টিমোশেঙ্কো। আর একদিকে হিটলার, হিমলার, গোয়েরিং গোয়েবলস, রিবেনট্রপ, রায়েডা, লিস্ট আর ফলকেনহস্ট। নামগুলির চেহারাই এক একটা ট্যাঙ্কের মত।

জার্মান মিলিটারী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। রুশ মিলিটারী প্রতিভার কথা শোনা গেছে! মারণ বিজ্ঞানের সহস্র উপচারে পুষ্ট এই দুই যোদ্ধৃরাষ্ট্রের হানাহানিতে ধ্বংসের যে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে, সেটা নিছক যুদ্ধবিজ্ঞানী ছাড়া আর কাউকে আমোদিত করতে পারে না।

* * * *

এখানে বসে কল্পনায় স্বপ্নের মত অবাস্তব একটা ঘটনাচিত্র দেখতে পাই। উক্রেনের অবারিত প্রান্তর--শস্যশীর্ষে শিহরিত সোনার অঞ্চল। তারই আকাশে রক্তচঞ্চু যন্ত্রবিহঙ্গের গুরুগুঞ্জন। পথে পথে ভীমকান্ত ট্যাঙ্কবহরের উৎকট ক্রেঙ্কার। লক্ষ লক্ষ নাৎসী সৈন্যের ইস্পাতের হেলমেট তরঙ্গবেগে ছুটে চলেছে ভিলনা, মিনস্ক, লেনিনগ্রাড আর ওডেসার অভিমুখে। বিদ্যুৎগর্ভ ঈশানী মেঘের মত নাৎসী শৌর্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে রুশের উপর। নীপারের কালো জল অস্থির হয়ে উঠেছে মরণ যমুনার উজানের মত।

অপরদিকে বিশেষ করে চোখে পড়ে শান্ত অনুদ্বেল রুশ বাহিনীর নিঃশঙ্ক সংগ্রাম। বিদ্যুতের মত সমস্ত দহন জ্বালা নিয়ে অরাতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া রুশের যুদ্ধ-নীতি নয়। শত্রুব্যূহের বিশেষ কোন অংশে সর্বস্ব নিয়ে মরিয়া হয়ে লেগে পড়া তাদের শস্ত্রবিদ্যায় বলে না। তাদের রীতি হলো, পাহাড়ী বোয়া সাপের মত শত্রুকে বিরাট পাকে জড়িয়ে ধীরে ধীরে পিষ্ট করে, তারপর মৃত্যুবর্ষী বোমারু বিমানের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে ভস্মশয্যায় শুইয়ে দেওয়া। এই দুই সমর কৌশলের চূড়ান্ত পরীক্ষার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে।

হিটলার স্বয়ং রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছেন। ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করে নাৎসীবাহিনীকে উৎসাহিত করেছেন। স্বকণ্ঠে অভিযানের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছেন।

* * * *

কিন্তু মস্কো প্রাসাদকূটে, ক্রেমলিনে, বারবার সকলের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে কি না জানি না ; তবে স্টালিন এখনও নীরব, কথা বলেছেন শুধু মলোটোভ। কাউকে আক্রমণের লোলুপ উৎসাহ তাতে ঘোষিত হয় নি ; তাতে শুধু দেশরক্ষার আবেদন ধ্বনিত হয়েছে।

এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যেও বেশ দু'একটা নাটকীয় ঘটনারও খবর পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মজার খবর হলো, হিটলার তাঁর রুশ জমিদারীর গদিতে বসবার জন্য একজন জার ঠিক করে ফেলেছেন। ভদ্রলোক বংশের দিক দিয়ে কাইজারজ। ইনি হলেন কাইজারের নাতি ফার্দিনাণ্ড, ফোর্ড কারখানার মিস্ত্রি ছিলেন। ইতিহাসে অবশ্য এমন ঘটনা বিরল নয়। ভাগ্যবিপর্যয়ে আমীরও ফকীর হয়, আবার ভাগ্যপ্রসন্নতায় ভিস্তিওয়ালাও দিল্লীর মসনদে বসে।

* * * *

আর একটি খবর আছে যেটা আধুনিক মেকানাইজড় অক্ষৌহিণীর যুদ্ধকীর্তি, ইঞ্জিন আর মোটরের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে একটু রোম্যান্টিক বিরামের মত উপভোগ্য।

--প্রুথ নদী পার হয়ে নাৎসী ট্যাঙ্কবাহিনী প্রচণ্ড অগ্নিবমন করে সোৎসাহে অগ্রসর হয়ে চলেছে প্রমত্ত লৌহ-ঐরাবতযূথের মত। সীমান্তরক্ষী রুশ ফৌজ সে দাপটে হঠে যেতে বাধ্য হয়। তারপর আরও জার্মান পদাতিক ও ট্যাঙ্কবহর প্রভঞ্জনের মত এসে আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু সোভিয়েট বোমারু বিমানগুলি অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মান বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দেয়, ফলে তারা পেছনে সরে পড়তে বাধ্য হয়। এমন সময় খড়গধারী রুশ অশ্বারোহীর স্রোত বরফের ধ্বসের মত পলায়নপর নাৎসী ফৌজকে চার্জ করে সেতুর ওপারে পাঠিয়ে দেয়। দেখা যাচ্ছে, আলেকজাণ্ডারের আমলের ঘোড়া আর তলোয়ার এখনও কৌলীন্য হারায় নি।

* * * *

জার্মান ও রুশ দুজনেই বনেদী যোদ্ধা। হূণশৌর্যের পরিচয় য়ুরোপ ও এশিয়া মহাদেশের ইতিহাসে লেখা আছে রক্তলিখায়। তাতার শৌর্যের ইতিহাস গাঁথা আছে য়ুরোপ ও এসিয়ার সমাধিক্ষেত্রের অস্থিপঞ্জরে। জার্মানীর ভাণ্ডারে নানা নূতন আয়ুধ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। রুশেরও আছে মলোটোভের রুটির ঝুড়ি আর বিরাট খবাহিনী। মলোটোভ ইতিহাসের নজীর দিয়েছেন --সমরলক্ষ্মীর বরপুত্র নেপোলিয়ন রুশিয়ায় যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফিরে গিয়েছিল। আবার 'যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল, সে পথ দিয়ে ফিরলো না'ক তারা।' ইতিহাসের অনেক বিজয়ী বীরকে এরকম দুর্ভাগ্যের মার সহ্য করতে হয়েছে।

* * * *

নাটকীয় climax পূর্ণ হয়েছে অন্য একটি ঘটনায়। তাসখন্দের এক খর্জুর কুঞ্জে পাথরচাপা তৈমুরলঙ্গের কঙ্কাল উঠে দাঁড়িয়েছে।

নাহি চাই সে অরণ্য

ফিরে চল! কে যেন হতাশ হয়ে আক্ষেপ করে বলছে, ফিরে চল।

বিংশ শতাব্দীর এই নরমেধের আসর থেকে ফিরে চল। মূঢ় সভ্যতার শিরায় শিরায় রক্ত পাগল হয়ে উঠেছে। ছিন্নমস্তার মত নিজ রুধির পান করে এই বাতুল সভ্যতার তৃষ্ণা শান্ত হবে। এ সভ্যতার ভাণ্ডারে জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই আছে, কিন্তু সব কিছুই মারণ কীর্তির উৎসাহে উদ্‌ভ্রান্ত। দুষ্টমেদে অতিকায় হয়ে উঠেছে এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। একটি যক্ষ্মারোগীর ফুসফুসের ঘা আরাম করতে পারে না, এই তো বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের কৃতিত্ব!

বর্তমান সমাজযন্ত্রের কর্ণধারেরা একটি নিরন্নের অস্থিসার দেহে এক সের মাংস-শোণিতের ব্যবস্থা করতে পারে না, তারাই তাদের নিয়ে ফ্রণ্টে ফ্রণ্টে পলিটিক্সের জুয়া খেলছে! পৃথিবীর মানচিত্রের ওপর তাদের দাবার ঘুঁটি চলেছে দিগ্বিদিকে। স্থল, জল, অন্তরীক্ষে কীটপতঙ্গও উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছে প্রমত্ত মানুষের কদাচারে।

তাই বলতে ইচ্ছে করে, ফিরে চল এই বারুদের ধোঁয়া, মাইন, টর্পেডো, বোমা, ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ও বিস্ফোরকে আচ্ছন্ন বিকৃত ক্ষাত্রবীর্যের তাণ্ডব থেকে! আশাক্ষুণ্ণ পথিকের মত আবার পিছনের পথ ধরে ফিরে চল।

* * * *

একটি শাহীবাগ। এইখানে এসে বসা যাক্। বসরাই গোলাপে ভরা এই বাগিচায় সুগন্ধির মৌতাত। অবিরাম বুলবুলের আলাপ। একটি ঝরোকার ধারে মখমলের রেজাই পেতে বস। লয়লা মজনু বা সিরি ফরাহাদের প্রেমের আখ্যান পড় ; সুর্মাটানা চোখের কোণে বেদনার উষ্ণ জলের ফোঁটা রেশমী রুমালে মুছে ফেল।

কিম্বা চবুতরা ছাড়িয়ে, মণ্ডী পার হয়ে দেওদারের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চল। এঁকেবেঁকে চলে গেছে সড়ক ইদ্গাহের দিকে। মসজিদের মিনারে গম্বুজে পড়েছে ডুবন্ত সূর্যের সিন্দূরের ছটা। সুরবাহারের রণনের মত বাতাসে আজানের শব্দ কেঁপে কেঁপে আসছে।

সন্ধ্যায় কেল্লার তোপ পড়ে। টমটমের গুরু গুরু ধ্বনি। তূর্ক শওয়ারের দল, কড়া কড়া মোচ, কাতার বেঁধে কোতোয়ালী থেকে শহরের বড় দরোয়াজার দিকে পাহারায় চলেছে। ছাউনির ময়দানে রাজপুত সেপাইরা তলোয়ার খেলছে।

ওম্রাহের প্রাসাদে স্ফটিকের ঝাড় ঝলসে ওঠে। নহবতের আলাপে সন্ধ্যা-বাতাস মাতোয়ারা। চকে সরাইয়ের মুসাফিরখানায় মুখর সারেঙ্গীর সঙ্গে গজল আর নৃত্যপরা সুন্দরীর নূপুর নিক্বণ। গোলাবপাশে আতরের উৎস আর নীল পেয়ালায় বিহ্বল দ্রাক্ষারসের ফেনপুঞ্জ। পেশোয়াজের চুম্‌কির ঝিলিক আর সঙ্গীতের মূর্ছনার মত ওড়নার হিল্লোল।

অতীতের এই একটি প্রগল্‌ভ স্বপ্নের তোরণে এসে বারুদের ধুলো ঝেড়ে ফেলে কিছুক্ষণ বসা যাক্।

* * * *

এখানে না হয়, আরও পিছনে ফিরে চল। দশার্ণ জনপদের চৈত্যবৃক্ষের পাশ দিয়ে পথ ধরে চল। রেবা, সিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা ও বেত্রবতীর জলে জবাকুসুমসন্নিভ সন্ধ্যারাগের ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। মৃণালকন্দ চঞ্চুপুটে তুলে নিয়ে মেরুমরালেরা আকাশে সাঁতার দিয়ে চলেছে। শশাঙ্কশেখরের কিরীট জ্যোৎস্নায় অলকাপুরীর ধবলিত সৌধমালা, মণিকুট্টিমের শোভা, ধারাগৃহে জলযন্ত্রের স্নিগ্ধ শীকরোৎক্ষেপ। ভবন দীর্ঘিকার মরকত সোপানে এসে বসা যাক্। বৈদূর্যনাম বিকচ কমলের শোভা দু'চোখ ভরে দেখা যাক্। কুরুবকে ঘেরা এই মাধবী মণ্ডলের চপলকিসলয় রক্তাশোক। গৃহময়ূরীর কেকালাপ মুগ্ধ হয়ে শোন। প্রোষিতভর্তৃকা ললনা পিঞ্জরসারিকার কাছে প্রিয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করছে। আর আছে, প্রিয়ঙ্গুলতিকার মত সুকুমারদেহ জনপদবধূর চকিত হরিণী-প্রেক্ষণ ও ভ্রূবিলাপ।

এইখানে এসে কিছুক্ষণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। এখানে ধূম জ্যোতি সলিল মরুতে করাল কেমিস্ট্রির কলঙ্ক স্পর্শ করেনি। শুধু দেবদারুর শাখাঘর্ষণে হঠাৎ দাবাগ্নি জেগে ওঠে, চমরী মৃগের পুচ্ছ পুড়ে যায়। এখানে আকাশে গন্ধকের ধোঁয়া নেই। মেঘে ঘেরা রামগিরি নাগাজিনে শোভিত পিনাকীর মত ভৈরবসুন্দর।

এইখানে এসে তবুও কিছুক্ষণ আরামে বসতে পারা যায়।

* * * *

ফিরে চল। আরও দূরে। ব্যাধি জরা মৃত্যু ভরা এই সংসারের প্রপঞ্চ পিছনে ফেলে বৈশালীর পথ ধরে হেঁটে চল। কোন সম্বলের প্রয়োজন নেই। পাথেয় শুধু তথাগতের বাণী। একটি মাত্র কাষায় বস্ত্রে দেহ আবৃত করে মহানিবৃত্তির পথে এগিয়ে চল। লিচ্ছবিদের গ্রামে দুটি তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করে নাও। তবেই যথেষ্ট। সকল বিচিকিৎসা, সকল তন্‌হা অতিক্রম করে বিগতাশোক শুদ্ধ বুদ্ধ হতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সঙ্ঘারামে বাতি জ্বলেছে। চৈতগৃহে বন্দনা ধ্বনি শোন—ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। মৈত্রী মহাকরুণার আলোকে প্রদীপ্ত হও। বিসঙ্খারগত চিত্তের সকল তৃষ্ণা ক্ষয় হউক। জন্মকূটের সকল বন্ধন ছিন্ন হউক। 'দিট্‌ঠোহসি পুনঃ গেহং ন কাহসি', আর তাহাকে গৃহরচনা করতে দিও না। স্তূপপাদমূলে আরতিদীপ জ্বালিয়ে শেষ প্রার্থনা কর—সব্বে সত্তা

সুখিতা ভবন্তু। বিশ্বের সকলে সুখী হউক। তোমার মহাপরিনির্বাণের শুভক্ষণ এগিয়ে আসছে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

এখনও পথ শেষ হয় নি। ফিরে চল।

সরস্বতীর তীরে তৃণশ্যামল মাঠে হোমধেনুর দল চরে বেড়াচ্ছে। কুটীর প্রাঙ্গণে সুরচিত যজ্ঞবেদিকা। সাগ্নিক ঋত্বিক পুরোধা—যাজক যজমানের জনতায় যজ্ঞস্থলী সমাকীর্ণ। হবির্গন্ধে আচ্ছন্ন বাতাস। স্তূপীকৃত অরণি ও সমিধ। উদ্‌গাতার কণ্ঠে ঋক্‌মন্ত্রের অনুষ্টুপ সুমন্দ্রে উৎসারিত হচ্ছে।

ছয় ঋতু বার মাস ধরিত্রীর সাজ বদল করে দিয়ে যায়। বিস্মিত ঋষিরা পরম শ্রদ্ধায় আবাহন করে, সবিতৃ, পূষন্‌, পর্জন্য, স্বাহা—প্রসন্ন হও। হে বিচিত্র, তুমি প্রকাশিত হও। 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।'

*　　　　*　　　　*　　　　*

আবার যাত্রারম্ভ। অতীতের কুয়াশা ভেদ ক'রে শীর্ণ পথরেখা ধ'রে ফিরে চল, যেখানে ছায়াভরা পান্থপাদপ এ যুগের যাতনাক্লিষ্ট মানুষের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

ইউনিফর্ম ফেলে দিয়ে গাছের বাকল পরে এই অরণ্যের মাঝে এসে বর্বর মানুষের সংসারে দাঁড়াও। এখানেও সুখ আছে। এটাও সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু উৎসব আনন্দে ভরা মানুষের গৃহস্থালী। এখানে চামড়ার যুদ্ধঢাক উদ্দাম নাদে বেজে ওঠে। বল্লমের ধাতুফলক উল্লসিত হয়। বনে বনে মৃগয়া ও শ্বাপদ সংহারের অভিযান চলে। পাতার কুটীরে বর্বর নারী আগুন জ্বেলে মাংস সিদ্ধ করে। বুনো ফল আর কন্দমূলেই রসনার বিলাস চরিতার্থ হয়।

রাত্রির অন্ধকারে দরিদ্র আদিম মানবের আঙিনায় আগুনের ধূনি জ্বলে। হাড়ের বাঁশি, জয়ঢাক, দামামা আর ঝাঁঝরের বাজনার সঙ্গে নরনারী যুবা বৃদ্ধ শিশু নৃত্যে বিভোর হয়। প্রবীণ ওঝারা মন্ত্র পড়ে, সিদ্ধিকাঠি নেড়ে ভূত পিশাচ মারী মৃত্যু তাড়ায়। গোষ্ঠীর আহত রোগগ্রস্ত বা মুমূর্ষুকে কোলে ক'রে সর্দার চোখের জল ফেলে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

ফিরে চল। সভ্যসাধনার সকল ব্যর্থতার ধিক্কার নিয়ে পুরাকল্পের এই পাহাড়ের গুহার অন্ধকারে আদিম মানবের আত্মীয় হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। এখনো এখানে ফিলসফি ও পলিটিক্স সৃষ্টি হয় নি। এখানে বসে বসে শোন, মহারণ্যের স্তব্ধতা হিংস্র পশুর ধস্তাধস্তির দাপটে শিউরে উঠছে বারংবার। এখানে গান নেই, ভাষা নেই, কেউ হাসতেও শেখেনি। এখানে প্রপোগাণ্ডা নেই, গেস্টাপো নেই। বিংশ শতাব্দীর বিষাক্ত আশ্রয় ছেড়ে এখানে এসে ঠাঁই গ্রহণ করা যাক্‌।

কিন্তু অন্ধকারের ভ্রান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মোহ অচিরে ভেঙে যায়। সারা রাত্রির উপবাসখিন্ন উদরে ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়না লাগে। বাহির হতে-প্রত্যূষের বাতাসের স্নিগ্ধ অভ্যর্থনা গুহামুখে প্রবেশ করে। বাইরে যেতে হবে; কিন্তু পথের মুখে ওৎ পেতে বসে আছে সিংহ-শার্দুলের লালায়িত হিংস্র বৈরতা। অসহায় আদিম মানুষের প্রাণ থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। যুগ যুগ ধরে মানুষের চলার পথে এই সিংহের বাধা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাকে চলতেই, বাইরে আসতে হবে, লড়তে হবে। দুঃসাহসী মনুষ্যত্বের জয়যাত্রার উল্লাসে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে আমাদের অতিবৃদ্ধ বন্য প্রপিতামহ। পাথরের বল্লম হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়।

তারপর, গুহার বাইরে আকাশে সূর্য ওঠে। আলোর রোমাঞ্চ লাগে দিকে দিকে। ব্যর্থতাভীরু গুহাহিত প্রাণ উঁকি দিয়ে দেখে—জীবনের স্রোত সংসারের রঙ বদ্‌লে দিয়ে যায়। উদয়শৈলের শান্তসূর্য প্রতিদিন নবতর ভবিষ্যতের সত্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—উজ্জ্বল ও জ্বালাময়।

অতএব, হেথা নয়, হেথা নয়!—মানুষের আকাঙ্খা ডানা ঝাপ্‌টে ওঠে। সমুখে সংগ্রাম আর সুদূরে ভবিষ্যৎ—শুধু জানি আমরা নতুন হয়ে যাচ্ছি। আগে চল। নাহি চাই সে অরণ্য।

রামরাজের আরাম

'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে'—কোন লাভ হতো না। কালিদাসের কালে একটা রাজা মহারাজা হ'য়ে জন্মালে কিছুটা লাভ হতো অবশ্য। শুধু কালিদাসের কালে কেন, রামরাজত্বেই যদি আমি প্রজা হ'য়ে জন্মাতাম, তাহ'লে আজকের চেয়ে কপালে কী বেশী সুখ সম্পদ লাভ হতো বুঝে উঠতে পারি না। রামরাজের কল্পনায় আজও আমাদের মন টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে—আহা! কী সুন্দর দিনই ছিল! কিন্তু এমন কোন প্রমাণ আছে কি যে, সেদিনের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন সুখ শান্তি সম্প্রীতিতে সত্যই ভরে ছিল? মহাকাব্যের সৌজন্যে আমরা পাই সেদিনের রাজা, রাজকুমার, রাণী বা রাজকুমারীর সুখ দুঃখের সমস্যার কথা। পুরাণকার ও কবি থেকে শুরু ক'রে ভাট চারণ পর্যন্ত সকলেই বীর সামন্ত, রাজা-রাজড়া বা মুনি ঋষির কথা গান ক'রে এসেছে। শুধু ঊর্মিলা সুন্দরীই 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নয়—সেদিনের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম প্রণয়, ত্যাগ বীর্য ও মহত্ত্ব—সব কিছু কাব্যের উপেক্ষিত হ'য়েছে। রাজার বিলাস ও খেয়ালে সেদিনের সাধারণ মানুষ ম্লান মূক মুখে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছে। সেদিনের শম্বুক ও গুহকের জীবনের ট্রাজেডিতেই বেদনাক্রান্ত লক্ষ মানুষের জীবনের ছায়া দেখতে পাই। সেদিনও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ নিংড়ে নিয়ে রাজার প্রাসাদ উঠেছে, রাজপুরীর দেবমন্দিরে সোনার বিগ্রহ বসেছে, আর শীতে গ্রীষ্মে লক্ষ পর্ণকুটীরে দেশের মানুষ পুড়েছে, কেঁপেছে। এই রামরাজের কল্পনাতেই দেখতে পাই, রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গনে মহোৎসব। লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু প্রসাদান্নের জন্য কাতারে কাতারে দাঁড়িয়েছে, আর রাজা প্রসন্নমুখে তাদের 'রঞ্জন' করছেন। রাজা দাক্ষিণ্য দেখাবেন, আর দুঃখজর্জরিত মানুষ হাত পেতে এসে তাঁর দয়ার দান কুড়িয়ে নেবে, এই ছিল তখনকার নিয়ম। কোন এক রাজা তাঁর মেয়েকে কোন এক রাজার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলেন না। ফলে হলো যুদ্ধ। হাজার হাজার প্রজার রক্তে হয়তো খেয়ালী রাজার বাসরঘরের পথ পিচ্ছিল হ'য়ে উঠলো। নিছক দিগ্বিজয়ের দেমাকে রাজা টগবগ ক'রে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে যুদ্ধ মারী ও দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার ছায়া নেমে এল। এই তো ছিল অবস্থা। সে আমলের সেন্সরই বা কি কঠোর ছিল। শুধু রাজার প্রশস্তি গান করা ছাড়া কোন মহাকবির অন্য কিছু বলার উপায় ছিল না। সুতরাং 'রামরাজের' কল্পনায় আর কিছু থাকুক, প্রলুব্ধ হবার মত কিছু নেই।

দরিদ্রনারায়ণ তত্ত্ব

এক একটা বড় নীতি আদর্শ বা প্রবচনের মধ্যে কতখানি বিপরীত ধর্ম প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে, তা আপাতবিচারে চোখে পড়ে না, কিন্তু একটু বিশ্লেষণেই উপলব্ধি হয়। সব চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার দাঁড়ায়, যখন কোন নীতিকে absolute বা অব্যয় একটি আদর্শ বলে ধরে নেওয়া হয়। যীশু খৃষ্ট বলেছেন—Give alms to the poor; আমাদের মধ্যেও আছে 'দরিদ্রনারায়ণের' সেবার আদর্শ। যে জগতে আমাকে দরিদ্রনারায়ণের সেবা ক'রে ধর্মচর্চা করতে হবে, সে জগৎ আর কিছু হোক, সুখী মানুষের জগৎ হবে না নিশ্চয়। আমার ধর্মপ্রবৃত্তির খোরাক যোগাবার জন্যেই সেখানে লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের প্রয়োজন হবে। দারিদ্র্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, নইলে সেবা কি ক'রে সম্ভব? সুতরাং, মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচারেই বোঝা যায়, এ ধরণের নীতির ওপর মানসিক শ্রদ্ধা থাকার ফলে সমস্ত নীতিতত্ত্বের (Ethics) মধ্যে প্রতিক্রিয়া হ'তে বাধ্য। যিনি যত সেবাধর্মী হবেন, তাঁর মনে তত একটি সাদীয় (Sadistic) কমপ্লেক্স সৃষ্টি হবে। তাঁকে সেবা দেখাবার জন্য উপযোগী মালমসলা

খুঁজতে হবে। সুতরাং তার মনের গহনে দুঃখ দারিদ্র্যের জন্য একটা কামনা নিরন্তর জেগে থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? দুঃখের বিষয়, 'দরিদ্রনারায়ণের' আদর্শে উৎকট রকমের অনুপ্রাণিত হ'য়ে অনেক সেবাধর্মী নারায়ণকেও দরিদ্র করতে কুণ্ঠিত নন। তাঁদের চোখের সামনে সর্বদা ভাসছে একটি দরিদ্রময় পৃথিবীর ছবি। এদের হাতে পড়লে পৃথিবীর কি রূপ হবে, তা সত্যি বুঝে উঠা দায়। পসার লোভী ডাক্তার যেমন রোগী না পেলে বা দেশে রোগ না হ'লে ছটফট করেন, এই সেবাধর্মীদের দশাও অনেকটা সেই রকম।

বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতা (Healthy competition)। মুখে মুখে এই কথাটির খুব প্রচলন। প্রতিযোগিতা নাকি উৎকর্ষ লাভের একটি বড় রকমের উপায়। খেলায়, গানে, নাচে, শিক্ষায় সব ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে দ্রুত সাফল্য ও উন্নতি নাকি লাভ করা যায়। কিন্তু কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি স্থূল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম চারুকলাগত আনন্দের ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রতিযোগিতার ব্যাপার না ঢুকিয়ে অন্যভাবে কি উৎকর্ষ লাভের উপায় নেই? প্রতিযোগিতার সরল অর্থ হলো অপর একজনকে হার মানানো পরাজয় করা অথবা উৎকর্ষে বা কৃতিত্বে অতিক্রম করে যাওয়া। যেভাবেই এই প্রতিযোগিতা নিষ্পন্ন করা হোক না কেন, এর আনন্দের মূল ভিত্তি হলো অপরকে পরাজয়। ফলে এতে মানুষের মর‍্যালকে নিগ্রহধর্মী না করে যায় না। সত্য কথা, প্রতিযোগিতামূলক কালচারের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দের চেয়ে পরাজয় করার আনন্দটাই মুখ্য বিষয়। ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ সাধনার কর্তব্য বাদই পড়ে যায়; পরাজয় করার আর্টের চর্চা প্রধান কর্তব্য হ'য়ে ওঠে। দুটি ফুটবল টীমে যখন প্রতিযোগিতা তীব্র হ'য়ে ওঠে, তখন এমনও ব্যাপার দেখা যায় যে, নিজেদের ক্রীড়াকুশলতার উন্নতির দিকে মনোযোগ না দিয়ে অপর পক্ষকে নানা কূট কারসাজি করে, ঘুষের জোরে পঙ্গু করে দেবার প্রয়াস হচ্ছে। প্রতিযোগিতার মধ্যে রয়েছে একটি বিয়োগধর্মী (Negative) ফিলসফি। এর প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত ফল হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া প্রতিযোগিতা মানুষকে আত্মম্ভর ও আত্মকেন্দ্রিক করতে বাধ্য, কেননা এর মধ্যে 'আমি বড় হব' কথাটির সার কথা। প্রতিযোগিতায় কালচারের উন্নতির চেয়ে ক্ষতিটাই বেশী হয়। কতটা ক্ষতি হচ্ছে, তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে প্রতিযোগিতার এই হিংস্র প্রভাবের উচ্ছেদ হ'য়ে যাবার পর। প্রতিযোগিতা না মিটে গেলে সমাজব্যবস্থার এ অনিষ্ট মিটবে না; অর্জুনই যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধানুকী হ'য়ে থাকতে চায়, তবে কত নিরীহ একলব্যের আঙ্গুল কাটা পড়বে কে জানে।